বর্ষ ৩৮ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৩

সূচিপত্র

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ ডক্টর লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩৮ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৩

দক্ষিণপশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

ক. বাংলায় ১৯২১-পূর্ব জাতীয়তাবাদী রাজনীতি : জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারা

উনিশশ একুশ সালে বাংলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে একটা বড় পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল।

এ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে বাংলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারা প্রধানত দুইটি : নিয়মতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসবাদী। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিবিদরা ১৯০৫ সাল হইতে মধ্যপন্থী বা উদারনৈতিক এবং চরমপন্থী—এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভাগটা হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। অধিকার অর্জনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর কতটা চাপ কিভাবে দেওয়া হইবে, এইসব বিষয়ে মতভেদ হইতেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিবিদদের মধ্যে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী ভাগের উদ্ভব হয়।

সীমিত অধিকার অর্জন করিয়া ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগি নয়, বিদেশী শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদই ছিল সন্ত্রাসবাদীদের কাম্য। ব্রিটিশ সরকারকে তাঁহারা উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন অস্ত্রবলে। সরকারী ফৌজ বা পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের দৃষ্টান্ত সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টার ইতিহাসে আছে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তাহার পরবর্তী প্রতিরোধ এইরূপ প্রচেষ্টার গৌরবময় সাক্ষ্য। কিন্তু গোপন আক্রমণে ও ব্যক্তিগত হত্যায় সরকারকে পর্যুদস্ত করাই ছিল সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান উপায়।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সামাজিক উৎপত্তি ও সামাজিক সঙ্গতি

উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি—উভয় প্রশ্নেই নিয়মতন্ত্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে পার্থক্যটা মৌলিক হইলেও রাজনীতির সামাজিক সঙ্গতির প্রশ্নে কিন্তু উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গী এক ও অভিন্ন। অভিন্নতার কারণটা বোঝা অবশ্য কষ্টসাধ্য নয়। নিয়মতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের সকলেরই উদ্ভব ভদ্রলোক নামে পরিচিত প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ইঁহারা

লালিতও হইয়াছেন এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে। পরিবেশটা অবশ্য বিদেশী শাসকদের সৃষ্ট। পেশাগত প্রশ্নে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক প্রধানত বৃত্তিজীবী অথবা করগ্রাহী জমিদার-পত্তনিদার, অকৃষক স্বত্ববান রায়ত বা মহাজন হিসাবে পরভৃত কৃষিনির্ভর এবং অংশত মাঝারি বা ছোট ধরনের ব্যবসায়ী। অর্থাৎ পেশার প্রশ্নে ই'হারা ভদ্র জীবিকাধারী। এই ধরনের পেশা-নির্ভর মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ইংরাজ শাসকদের অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। দেশের সঙ্গতি বা প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজরা এখানে অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ করিতেন না, করিতেন নিজেদের স্বার্থে, সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে মধ্যবিত্তরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আশ্রয়, এমন কি প্রাণশক্তির উৎসকেন্দ্রও, খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন বিদেশী চিন্তাধারা, সংস্কার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। ইংরেজরা এদেশে যে বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রচলন করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, সে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এবং অর্থনৈতিক ও শাসনব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে। বিদেশী শাসকের আমদানি-করা কৃত্রিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট ও তাঁহাদেরই সৃষ্টি-করা কৃত্রিম অর্থনৈতিক ও শাসনব্যবস্থায় পরিপোষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়াছে স্বাভাবিক কারণে। তবে, যে ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে এই মধ্যবিত্ত সমাজের পরিপুষ্টি, তাহাতে সমাজবিচ্ছিন্ন না হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। মধ্যবিত্তের পক্ষে ভদ্রলোক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সপ্তদশ হইতে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইওরোপে মধ্যবিত্তের ভদ্রতায় যে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা দেখা গিয়াছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ভারতবর্ষে তাহা যে সম্ভব হইবে না, এ কথা সহজেই অনুমেয়।

এতক্ষণ যে-সব কথা বলিলাম, তাহাতে মনে হইতে পারে যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সকলেই হয়তো প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত এবং আর্থিক প্রশ্নে সচ্ছল। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত বা পরিগণিত হইতে আগ্রহী তাঁহাদের সকলেই যে সচ্ছল বা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত, এমন নয়। ই'হাদের কিন্তু অনেকেই অর্ধশিক্ষিত, এমন কি ই'হাদের মধ্যে অশিক্ষিতেরও অভাব নাই। মধ্যবিত্ত বলিয়া পরিচিত অনেকেই আবার প্রকৃতপক্ষে স্বল্পবিত্ত; কোনক্রমে দিন চলিয়া যায়, এমন লোকও বিরল নয়। এই শ্রেণীর লোকেদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখিবার জন্যই বোধকরি নিম্নমধ্যবিত্ত কথাটার সৃষ্টি। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিত্তের অবস্থা যেমনই হোক না, নিম্নবিত্ত, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভদ্রজীবিকাধারী প্রত্যেকের কাছেই সচ্ছল শিক্ষিত ভদ্রলোকের চিন্তা, ভাব, আচার-আচরণ, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, পোশাক-পরিচ্ছদ—সবকিছুই আদর্শস্থানীয়, অনন্যচিত্তে অনুকরণ করিবার মতো। তাই শিক্ষা ও বিত্তের ক্ষেত্রে প্রভেদ সত্ত্বেও মানসিকতার প্রশ্নে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থে সম্প্রদায় হিসাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এক এবং অখণ্ড বলিতে বাধা নাই।

এই সমাজবিচ্ছিন্ন ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা, ভাব ও জীবনচর্যার উৎস ও আশ্রয় কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল কলিকাতা শহরে। কলিকাতার প্রতিফলন সম্বল করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল মফঃস্বলের জেলা/মহকুমা শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সমাজ। সকলেই অবশ্য শহরে বাস করিতেন না। শহরে বাস করিবার ভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহারা সন্তান-সন্ততিদের পাঠাইয়াছেন কলিকাতা বা অন্যান্য মফঃস্বল শহরে—সেখানে লেখাপড়া শিখিয়া কোন একটা কাজে ঢুকিয়া পড়িতে পারিবে, এই আশায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময় হইতেই চাকরি জুটিবার সম্ভাবনা ক্রমশই সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল; বৃত্তির ক্ষেত্রও বিশেষ প্রসারিত হয় নাই। এবং

দেশ ও জাতির পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বিজাতীয় শিক্ষার প্রসার ক্রমশ বাড়িয়াই চলিতেছিল। ফলে শিক্ষিত ভদ্রলোকের একটা বড় অংশ বাধ্য হইয়াই গ্রামে বাস করিতেন। আবার পেশা উপলক্ষে বা অন্য কারণে যাঁহারা শহরবাসী, তাঁহারাও সম্বৎসরে এক বা দুইবার কিছুদিনের জন্য গ্রামে আসিতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগসূত্র তো ইঁহারাই। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক গ্রামে বাস করিয়াও বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে যোগসূত্রহীন। এই ধরনের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের অধিকাংশ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কৃষিনির্ভর। কিন্তু সে নির্ভরতা, আগেই বলিয়াছি, পরভৃতের নির্ভরতা—সকরণ সম্পর্কের পারস্পরিক নির্ভরতা নয়। কৃষককে টাকা-বা ধান ধার দিলে, ভাগচাষী বা জনমজুর দিয়া চাষ করাইলে, জমিদার বা পত্তনিদার হিসাবে কৃষক-রায়তের নিকট হইতে অথবা ভদ্রলোক রায়ত হিসাবে কোরফা প্রজার নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ করিলে, কৃষির সঙ্গে যে ধরনের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে, এ সেই ধরনের সম্পর্ক। বৃহত্তর গ্রামীণ জনজীবনের সঙ্গে ইঁহাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ের যোগাযোগ এই সম্পর্কেরই পরিপূরক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাহা উন্নাসিক পৃষ্ঠপোষকের দাক্ষিণ্য মাত্র। গ্রামে ভদ্রলোকরা নিজেদের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, ব্যাবর্তক সমাজ সৃষ্টি করিয়া নিতেন। বিজাতীয় শিক্ষা ও নাগরিক সংস্পর্শের প্রভাবে বিচ্ছিন্নতার যে ঐতিহ্য সৃষ্ট হইত, গ্রামে বসিয়া ভদ্রলোকের নিজস্ব ব্যাবর্তক সামাজিক পরিমণ্ডলে তাহাকে লালিত ও পরিপুষ্ট করিতে অসুবিধা হইত না।

নিতান্ত দৈহিক অর্থে গ্রামকে পিছনে ফেলিয়া সকলেই শহরে আসিয়া বসেন নাই বা প্রকৃত অর্থে নাগরিক হইয়া উঠেন নাই বটে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজজীবন হইতে বিচ্ছিন্নতা এবং সেই বিচ্ছিন্নতা হইতে জাত স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মাভিমান, শহর বা গ্রামে যেখানেই বাস করুন না কেন, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের চেতনায় গভীরভাবে নিবিষ্ট। এতটাই গভীর যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মাভিমান সম্প্রদায় ছাড়িয়া গোষ্ঠীতে এমন কি গোষ্ঠী ছাড়িয়া পৌঁছিয়াছিল ব্যক্তিতে। এই সম্প্রদায়ের রাজনীতি ও নেতৃত্বের মধ্যে যে বৃহত্তর সামাজিক সচেতনতা থাকিবে না, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে উপরতলার সীমিত পরিবর্তনের মধ্যেই সীমিত থাকিবে, ইহাই বোধ করি স্বাভাবিক।

বস্তুতপক্ষে, নিয়মতান্ত্রিক বা সন্ত্রাসবাদী—কাহারও রাজনৈতিক দৃষ্টি বৃহত্তর জনসমাজে গিয়া পৌঁছায় নাই। তত্ত্বগতভাবে কৃষক বা শ্রমজীবীর কথা কখনও কখনও উঠিয়া থাকিলেও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে বৃহত্তর সমাজের কোন স্থানই ছিল না। তবে বৃহত্তর জনসমাজের উপর ভদ্রলোকের দাবিটা ছিল অভিভাবকত্বের। এ দাবি তাঁহাদের সামাজিক প্রাধান্যের প্রসারিত রূপ।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের আর-একটা দিকের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল ঊনবিংশ শতকের মধ্যকাল হইতে, এবং প্রসার হইয়াছিল স্বল্পসংখ্যক উচ্চজাতীয় শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে। পরবর্তীকালে, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, শিক্ষা এবং জাতীয়তাবাদের প্রসার হইয়াছিল ইঁহাদের মধ্যেই। ফলে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রধানত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদের মধ্যে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের প্রসার বিংশ শতকের আগে বিশেষ একটা হয় নাই। ঊনবিংশ শতকে তো বটেই, বিংশ শতকে যখন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনও শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অনেক দূরে—পশ্চিম এশিয়ায়। স্বভাবতই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে মুসলমানদের স্থান ছিল সামান্যই। তবুও বলিতে হয়, সামাজিক চেতনা সংকীর্ণ ছিল বলিয়াই সুবৃহৎ মুসলমান সমাজ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়া

গিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদটাও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের কাছে বড় ধরনের সমস্যা হইয়া দেখা দেয় নাই। অথচ বিভেদের ক্ষেত্র তো শহর ও গ্রাম উভয়ত্রই ক্রমশ প্রসারিত হইতেছিল।

বিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটিয়াছে কিন্তু মুসলমান ভদ্রলোক নেতৃত্বের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসার বিশেষ ঘটে নাই—এ ইঙ্গিত একটু আগেই দিয়া আসিয়াছি। অন্যদিকে যে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিতেছিল তাঁহারা আত্ম-প্রকাশ আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র খুঁজিতেছিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবনের মধ্যে, হিন্দু সাংস্কৃতিক ভাব-ধারা অবলম্বন করিয়া। এই সূত্রে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার রূপ, প্রতীক, আদর্শ ও ভঙ্গী হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ক্ষেত্রবিশেষে তো জাতীয়তাবাদ হিন্দু উপ-জাতীয়তারই সমার্থক। শিক্ষিত মুসলমানের কাছে স্বভাবতই এ-সব গ্রহণীয় হয় নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি ইসলামী ঐতিহ্যের উৎসভূমির দিকে ধাবিত, চেতনায় ইসলামের অতীত গৌরবের কাহিনী সদাজাগ্রত। এই-সব শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের মতাদর্শ ও ইসলামী পবিত্রতা ও পুনরুজ্জীবন-বাদী ওয়াহবী ও ফরাজী ধর্মীয় আন্দোলনের সহযোগে সৃষ্ট মুসলমান উপজাতীয়তা মুসলমান সাংস্কৃতিক প্রভাবপুষ্ট, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের পূর্বগৌরবের স্বপ্নে বিভোর। ধর্মীয় আন্দোলন, বিশেষ করিয়া ফরাজী আন্দোলন, বাংলার গ্রামাঞ্চলেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। ওয়াহবী ও ফরাজী আন্দোলন ও তাহার পর দেওবন্দ ও জৌনপুর হইতে আগত উলেমাদের ইসলামী পবিত্রতা ভিত্তিক মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের বাণী নিরক্ষর মুসলমান কৃষকসমাজের মধ্যে যে বীজ ছড়াইতেছিল, তাহার উর্বর ক্ষেত্র মিলিয়াছিল বাঙালী কৃষকের নিপীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে। বীজ যখন অংকুর হইয়া দেখা দিল, তখন তাহার মূলে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন ব্রিটিশ সরকার স্বয়ং। সহযোগীরও অভাব ছিল না। মুসলমান ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই কাজে আগাইয়া আসিলেন সোৎসাহে। সম্ভবত এই কারণেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও মুসলমান ভদ্রলোক নেতৃত্ব ও মুসলমান কৃষকের মধ্যে যোগাযোগের একটা দৃঢ় সূত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। বাংলার মুসলমান নেতাদের বেশ কয়েকজন উর্দুভাষী ছিলেন। তবুও কিন্তু সাধারণ কৃষকের কাছে তাঁহাদের আবেদন কখনও ব্যাহত হয় নাই।

হিন্দুসমাজে নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব

পরিবর্তন ঘটিতেছিল হিন্দু সমাজের মধ্যেও। হিন্দু সমাজের নীচের দিকে, বিশেষ করিয়া সদ্গোপ, সৎচাষী, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, যোগী, রাজবংশী প্রভৃতি জাতের মধ্যে নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব হইতেছিল প্রায় মুসলমানদের মতো একই ভাবে। সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষাও ইঁহাদের অনুরূপ। তবে হিন্দু সমাজের মধ্যে বলিয়া প্রকাশভঙ্গীটা একটু অন্যরকম। ইঁহারা চাহিতেছিলেন বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে উঁচু জাতের পরিচয়, নবার্জিত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সামাজিক স্বীকৃতি। ভদ্র পরিচয়ের মর্যাদা অর্জনের জন্য সভা-সমিতি স্থাপন, সামাজিক রীতি-নীতি সংস্কার, নূতন চেতনার প্রচার প্রভৃতি নানাভাবে বিভিন্ন জাতের মধ্যে সামাজিক আন্দোলন ঊনবিংশ শতকের শেষ-দিকে বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পরোক্ষভাবে এই-সব আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে-ছিলেন ব্রিটিশ সরকার। ঐতিহ্যগতভাবে কোন জাতের কি মর্যাদা, সেটা স্থির হইত অন্যান্য জাত তাহাকে কি হিসাবে দেখিতেছে, তাহার উপর। নীচের পর্যায় হইতে উপরের পর্যায়ে উত্তরণের ঘটনা বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বিরল নয়, কিন্তু তাহার পিছনে থাকিত দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা—সমাজের মন জয় করিবার প্রয়াস, সময়ও লাগিত প্রচুর। ১৮৭২ সালে দশবাৎসরিক লোকগণনা আরম্ভ হওয়ার

সময় হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত সেন্সাস রিপোর্টে বিভিন্ন জাতের সামাজিক মর্যাদার তুলনামূলক বিবরণ দেওয়ার প্রথা বিভিন্ন জাতের উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা অর্জনের আন্দোলনে প্রচণ্ড উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া দিল। সামাজিক প্রচেষ্টার পরিবর্তে সভাসমিতিতে প্রস্তাব পাশ করিয়া, সেন্সাস অফিসে স্মারকলিপি পাঠাইয়া, বই ছাপাইয়া সেন্সাস কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি আদায় করাই হইল প্রত্যাশিত মর্যাদা লাভের প্রধান উপায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেন্সাস কর্তৃপক্ষ উচ্চতর মর্যাদা ও পরিচয়ের দাবি মানিয়া নেন নাই, তবে বিভিন্ন জাতের দাবি অনুসারে তাহাদের নূতন নামের স্বীকৃতি দিয়া বা প্রত্যাশিত মর্যাদার সপক্ষে বিভিন্ন জাত যে-সব যুক্তি উপস্থাপিত করিতেন সেগুলি রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখিবার মতো অবস্থা কর্তৃপক্ষ বজায় রাখিয়া দিতেছিলেন।

আদিতে বিভিন্ন জাতের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বাভিলাষী উচ্চতর পর্যায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমে শক্তিশালী করিবার জন্য উচ্চতর পর্যায়ের নেতারা আন্দোলন ছড়াইয়া দিতেছিলেন সাধারণ লোকের মধ্যে। জাতবদ্ধ সমাজে উঁচুজাতের মর্যাদা পাইবার মোহ কাহার না থাকিবে? ক্রমশ জাতের আন্দোলন ছোট বড় সকলের মিলিত দাবি হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সামাজিক দাবির প্রশ্নে দেখিতেছি প্রত্যেক জাত স্বতন্ত্র এবং আভ্যন্তরিকভাবে একত্রবদ্ধ। ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন জাত আবার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সকলেই আবার প্রতিষ্ঠিত উঁচু জাতের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, ঈর্ষান্বিত। বিদ্বেষ, ঈর্ষা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল নীচুজাতের আন্দোলন সম্পর্কে উঁচুজাতের উন্নাসিক মনোভাব। আন্দোলন সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া ব্যাপক হইয়া উঠিলে জাত ধরিয়া স্বাতন্ত্র্যবোধ ও হিন্দুসমাজের মধ্যে আভ্যন্তরিক বিদ্বেষ-ঈর্ষাও ব্যাপক হইয়া উঠিল। বিভিন্ন জাতের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ও হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক বিরোধ-বিদ্বেষকে সরকার রাজনৈতিক পর্যায়ে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিলেন নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে (১৯৩২) তপশীলি জাতগুলির স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করিয়া নিয়া।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সংকীর্ণতা

বাংলার জনসাধারণের বৃহত্তম অংশের মধ্যে যে এত বড় সব পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতেছিল এবং সে পরিবর্তন যে একদিন বিপজ্জনক সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে, এ সম্ভাবনার কথা জাতীয়তা-বাদী নেতাদের মনে আসে নাই। মুসলমান সমাজ ও হিন্দু সমাজের নিম্নতর পর্যায়ের নূতন নেতৃত্বকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে টানিয়া আনিবার কোন চেষ্টাই তাঁহারা করেন নাই। বস্তুত, যে মানসিকতা ও সামাজিক দৃষ্টি নিয়া তাঁহারা রাজনীতি করিতেন তাহাতে এ-সব সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কথাও তাঁহাদের নয়। তাঁহাদের রাজনীতি উপরের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। তাই সমস্যা তাঁহাদের যাহা কিছু সে-সবই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়া। তাহার বাহিরে যাহা কিছু, সে সমস্তই তাঁহাদের দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক।

বাংলায় সংগঠিত গণ-আন্দোলনের প্রবর্তক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রায়ই বলিতেন, সন্ত্রাসবাদীরা হয়তো ভারতের স্বাধীনতা আনিতে পারেন কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতা তাঁহারা কখনই আনিতে পারিবেন না।[১] নিয়মতান্ত্রিক নেতাদের সম্বন্ধেও বোধ করি এ কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে। মুসলমান সমাজের ও হিন্দু সমাজের নিম্নতর পর্যায়ের নেতৃত্বে এত বড় পরিবর্তনটাই যখন সন্ত্রাসবাদী ও নিয়মতান্ত্রিক নেতাদের চোখে পড়ে নাই তখন নেতৃত্বের নীচে যে বৃহত্তর সমাজ, সে যে তাঁহাদের চিন্তার মধ্যে কোন স্থান পাইবে না, এ আর বিচিত্র কি!

খ. ১৯২১ সালে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পরিবর্তন : চিত্তরঞ্জন দাশের আবির্ভাব

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করিয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বৃহত্তর জনসমাজে ছড়াইয়া পড়িবার সূত্রপাত হইল ১৯২১ সালে, বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাকালে। পরিবর্তনটা মূলত গান্ধীর প্রভাব-সঞ্জাত। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাতেও তাহার ঢেউ আসিয়া গিয়াছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে এই পরিবর্তন সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। রাজনীতি-জগতে চিত্তরঞ্জন অবশ্য আসিয়াছিলেন নিয়মতান্ত্রিক নেতা হিসাবে। ১৯১৭ সালে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইবার আগেই তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্যে চরমপন্থী অংশের প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এই সময় বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসে আধিপত্য করিতেন উদারনৈতিক মধ্যপন্থীরা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের নেতা। চিত্তরঞ্জন বাংলার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। এ প্রতিষ্ঠা তাঁহার আসিয়াছিল গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া।

গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের রাজনীতিতে অভ্যস্ত চিত্তরঞ্জন যে ১৯২০ সালে গান্ধীর পূর্ণ অসহযোগ প্রস্তাবের প্রাণপণ বিরোধিতা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। আবার গান্ধীপরিকল্পিত গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাও যে চিত্তরঞ্জন মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। তবুও কিন্তু ১৯২১ সালে গণমুখী রাজনীতির প্রবক্তা হিসাবে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব নিতান্ত আকস্মিক নয়। ১৯১৭ সালে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন অস্পষ্ট ও কিছুটা বিভ্রান্তিকরভাবে হইলেও জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টা গ্রামমুখী হওয়া উচিত, এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঁচ বছর পরে, ১৯২২ সালে, এই ধারণাটাই স্পষ্টতর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে। স্বরাজ যে গ্রামভিত্তিক হওয়া উচিত অর্থাৎ গ্রামপর্যায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠাই যে স্বরাজের উদ্দেশ্য, এই কথাটাই ছিল তাঁহার ভাষণের সারমর্ম।

চিত্তরঞ্জনের মতাদর্শ ও সংগঠন

চিত্তরঞ্জন শেষ পর্যন্ত পূর্ণ অসহযোগিতার প্রস্তাব মানিয়া নিয়াছিলেন, স্বরাজ যে গ্রামপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এ কথাও বিশ্বাস করিতেন। হিংসাত্মক রাজনীতির প্রতি তাঁহার অনীহাও সুপরিজ্ঞাত। তবুও চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক চিন্তা গান্ধীবাদ হইতে পৃথক। দরিদ্র, নিরক্ষর, সংস্কারবদ্ধ গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে যেটুকু শক্তি সঞ্চিত ছিল তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া, জনসাধারণকে সচেতন ও স্বয়ম্ভর করিয়া তোলার যে পরিকল্পনা গান্ধীবাদের মূলকথা চিত্তরঞ্জন তাহা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন বলা চলে না। গণমুখী মনোভাব সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ও শাসনসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস তাঁহার শেষ পর্যন্ত ছিল। এইসব কারণেই বোধহয় বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনে প্রধানতম নেতা হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীবাদীরা চিত্তরঞ্জনকে কখনই নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। বস্তুত, ১৯২০ সাল হইতে গান্ধীবাদীরাই চিত্তরঞ্জনের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

যে গ্রামস্বরাজের কথা চিত্তরঞ্জন বলিতেন, মনে হয়, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে গণশক্তির সংযোগে তাহা অর্জন করা যাইতে পারে, এমন একটা ধারণা চিত্তরঞ্জন পোষণ করিতেন। কিন্তু দরিদ্র নিরক্ষর গ্রামবাসী কৃষক ও শিক্ষিত আত্মাভিমানী বৃত্তিজীবী, করগ্রাহী বা পরভৃত কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত

ভদ্রলোকের নিয়মতান্ত্রিক বা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার কোন সূত্র তিনি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। পারাটা যে নিতান্তই দুষ্কর, এ কথা বোধ করি নিঃসংকোচেই বলা চলে। কিন্তু এই মরুতৃষ্ণিকার আকর্ষণ সামনে রাখিয়াই চিত্তরঞ্জন তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মতাদর্শের এই বিভ্রান্তি ছাড়াও চিত্তরঞ্জনের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে আর-একটা বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। মতাদর্শের প্রশ্নে বিভ্রান্তি ছিল বলিয়াই হয়তো সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত কর্মীদল চিত্তরঞ্জন কখনই গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক জীবনে সব সময়েই তাঁহাকে কাজ চালাইতে হইয়াছে সাময়িক সহায়কদের সাহায্যে, জোড়াতালি-দেওয়া ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া। ১৯১৮-১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উদারনৈতিক-মধ্যপন্থী নেতাদের সঙ্গে বিরোধের সময়, ১৯২০ সালে গান্ধীর পূর্ণ অসহযোগিতা প্রস্তাব প্রতিরোধ করিবার প্রচেষ্টায়, ১৯২০ ও ১৯২৩ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেসে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের সময়, সর্বক্ষেত্রেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে সাময়িক ব্যবস্থার উপর। ১৯১৮-১৯ সালে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন হোমরুল লীগের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা। ১৯২০ সালে তিনি সমর্থক সংগ্রহ করিয়াছিলেন সন্ত্রাসবাদী ও নিয়মতান্ত্রিক উভয় দলের মধ্য হইতে। ১৯২১ ও ১৯২১ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্বের জন্য চিত্তরঞ্জন দেখিতেছি সন্ত্রাসবাদীদেরই দ্বারস্থ। সহায়তার জন্য আশেপাশে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিয়মতন্ত্রবাদীরা ছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিরোধ ও সমর্থন সংগঠনে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকাটাই ছিল বড়। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব পাইবার পরও চিত্তরঞ্জন অনুগত কর্মীদল বলিয়া কিছু গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। সংগঠনের জন্য তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছে সন্ত্রাসবাদীদের উপরেই।

চিত্তরঞ্জনের সহযোগিবৃন্দ : সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মী

সংগঠনের জন্য অপরের উপর নির্ভর করিয়া নেতৃত্ব করার কাজটা একেই দুরূহ, তাহার উপর নেতা ও কর্মীদলের মতাদর্শ যদি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়, তবে দুরূহ কাজটা সহজেই অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। চিত্তরঞ্জন ও তাঁহাকে ঘিরিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রকৃত সাংগঠনিক কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থীর সাময়িক মিলনের। সন্ত্রাসবাদীদের ব্যক্তিগত সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি চিত্তরঞ্জন উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে সন্ত্রাসবাদের উপর তাঁহার কোন আস্থাই ছিল না। তবুও যে চিত্তরঞ্জন সন্ত্রাসবাদীদের কংগ্রেসে টানিয়া আনিয়াছিলেন আর সন্ত্রাসবাদীরাও কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সে শুধু পারস্পরিক সুবিধার জন্য। ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমননীতির ফলে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করা সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯১৯-২০ নাগাদ কারামুক্ত হইয়া সন্ত্রাসবাদীরা দেখিলেন দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব। ঠিক এই সময়েই গান্ধীর পূর্ণ অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য চিত্তরঞ্জনের প্রয়োজন হইয়া পড়িল সংগঠিত রাজনৈতিক কর্মীদলের। ঢিলাঢালাভাবে কাজ করিতে অভ্যস্ত আংশিক সময়ের রাজনৈতিক কর্মী নিয়মতন্ত্রবাদীদের নিয়া সুসংগঠিত ও অনুগত কর্মীদলের সমর্থনপুষ্ট গান্ধীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। চিত্তরঞ্জন তখন প্রয়োজন মিটাইতে চাহিলেন সন্ত্রাসবাদী কর্মীদের দলে টানিয়া নিয়া। সন্ত্রাসবাদীরাও দেখিলেন, তখনকার অবস্থায় একমাত্র কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহারা রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারেন। তাই চিত্তরঞ্জন তাঁহাদের সহায়তা চাহিলে তাঁহারা সম্মত হইলেন সহজেই। ইহা ছাড়া, গান্ধী যে গণসংগঠন গড়িয়া তুলিতে-

ছিলেন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যম হিসাবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার ইচ্ছাও তাঁহাদের ছিল। সে সঙ্গে অবশ্য কংগ্রেসে ঢুকিয়া গান্ধীকে প্রতিরোধ করিবার একটা বাসনা যে সন্ত্রাসবাদীদের অন্তত একটা অংশের মনে নাই এমন নয়। ১৯২০ সালে চিত্তরঞ্জন তো গান্ধীর পূর্ণ অসহযোগ আটকাইবার চেষ্টাই করিতেছিলেন। ইহার পর বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তো গান্ধীবাদীরা। এইসব কারণে চিত্তরঞ্জনের হইয়া সন্ত্রাসবাদীদের কাজ করিবার উৎসাহটা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সন্ত্রাসবাদীরা চিত্তরঞ্জনের সহায়করূপে কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেসের বাহিরে তাঁহাদের সন্ত্রাসবাদী পরিচয় ও সংগঠন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করিবার ব্যবস্থাটা তাঁহারা সাময়িক ব্যাপার বলিয়াই ধরিয়া নিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয় বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মধ্য দিয়া আবার পুরাপুরি কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া যায় তবে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসবাদের পথেই আবার ফিরিয়া আসিবেন, ইহাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এ কথা চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার নিয়মতন্ত্রবাদী সহায়কগণ সকলেই জানিতেন। তবুও সংগঠন ক্রমশ সন্ত্রাসবাদী-দের হাতেই চলিয়া যাইতেছিল। উন্নততর সাংগঠনিক কৌশল ও শৃঙ্খলার জোরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের মূল সাংগঠনিক কেন্দ্রগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় নাই। কাজটা আরও সহজ হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার নিয়মতান্ত্রিক সহায়কদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কলাকৌশল নিয়া তাঁহারা এতটাই ব্যস্ত থাকিতেন যে দলীয় সংগঠন সম্বন্ধে মন দিবার বিশেষ সুযোগ তাঁহাদের ছিল না। সাময়িক প্রয়োজনে কিছু লোককে তাঁহারা যে কোন সময় আশে-পাশে জোটাইয়া ফেলিতে পারিতেন, এই মাত্র।

সন্ত্রাসবাদীরাও অবশ্য চিত্তরঞ্জনের উপর কিছুটা নির্ভর করিতেন। কংগ্রেসে তাঁহাদের কাজ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন তিনিই। রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা ছাড়াও ত্যাগ ও দেশপ্রেমের জন্য দেশবন্ধু বলিয়া চিত্তরঞ্জনের যে পরিচয় গড়িয়া উঠিয়াছিল রাজনৈতিক প্রশ্নে তাহার গুরুত্ব তখন কম নয়। এই সঙ্গে অবশ্য এ কথা বলিতেই হয়, চিত্তরঞ্জনের উপর নির্ভরতা ছাড়াও সন্ত্রাস-বাদীদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল ও পরিচয় ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের উপর নির্ভরতা ছাড়া চিত্তরঞ্জনের পক্ষে সংগঠন চালানো সম্ভব ছিল না।

চিত্তরঞ্জনের সহযোগিবৃন্দ : নিয়মতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক কর্মী

সাংগঠনিক ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন সন্ত্রাসবাদীদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিয়মতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারাই তাঁহার আদি ও শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতম সহায়ক। প্রধানতঃ কলিকাতাকেন্দ্রিক বিত্তবান ও প্রভাবশালী বৃত্তিজীবী, করগ্রাহী কিংবা ব্যবসায়ী পরিবারের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকদের মনে চিত্তরঞ্জনের গ্রাম-ভিত্তিক স্বরাজের আদর্শে কোন আস্থা ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইঁহাদের মন পড়িয়াছিল চিত্তরঞ্জনের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির উপর। এই সময়ে গান্ধীবাদী রাজনীতির যে ঢেউ বাংলায় আসিয়া পড়িতেছিল তাহাকে ঠেকাইবার আগ্রহটাও ইঁহাদের বিশেষভাবেই থাকিবার কথা। এই ধরনের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা এবং সন্ত্রাসবাদীদের নিয়া যে দলের প্রধান অংশ গঠিত, তাহার নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জনের পক্ষে ব্যাপকভিত্তিক গণমুখী রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা গড়িয়া তোলা যে কত কঠিন, সে বোধ করি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

চিত্তরঞ্জনের ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক প্রয়াস

বিস্ময়ের কথা, সন্ত্রাসবাদী ও নিয়মতন্ত্রবাদী সংকীর্ণচেতা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের রাজনীতির

এই দুই জগদ্দল দুই পায়ে বাঁধা, মতাদর্শে বিভ্রান্তি সুপরিস্ফুট, নেতৃত্বকালও স্বল্পপরিসর তবুও ইহার মধ্যেই চিত্তরঞ্জন বৃহত্তর সমাজের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে অন্তত আংশিকভাবে সেইদিকে টানিয়া নিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহার প্রমাণ মিলিবে গ্রামোন্নয়নে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টায় এবং সর্বোপরি গ্রামভিত্তিক গণ-আন্দোলনের সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যক্রম যুক্ত করিবার প্রয়াসে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়াস

গান্ধীর প্রচেষ্টায় খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বোঝাপড়ার যে সূত্রপাত হইয়াছিল বাংলার বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন হিন্দু-মুসলমান চুক্তি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গো-হত্যা ও মসজিদের সম্মুখে সংগীতের মতো সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও মুসলমান ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের বৃত্তি ও নেতৃত্বের ক্ষেত্র বিস্তারের প্রশ্ন নিয়া জনচিত্ত সে সময় প্রবলভাবে আলোড়িত। এইসব বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোস-মীমাংসার ভিত্তিতে চুক্তির ধারাগুলি রচিত। চুক্তিতে বলা হইয়াছিল : (১) মসজিদের সম্মুখে শোভাযাত্রা ও গান-বাজনা করা চলিবে না, (২) কোরবানির জন্য গো-হত্যায় বাধা দেওয়া হইবে না, (৩) আহারের জন্য গো-হত্যা সম্পর্কে কাউন্সিলে কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না, (৪) শতকরা ৫৫ ভাগ চাকুরি পাইবেন মুসলমানগণ, বাকী ৪৫ ভাগ থাকিবে হিন্দুদের জন্য, ও (৫) জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি সংস্থায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় মুসলমানরা পাইবেন শতকরা ৬০ ভাগ সদস্যপদ আর বাকীটা পাইবেন হিন্দুরা। হিন্দুপ্রধান জেলায় ব্যবস্থা হইবে ঠিক বিপরীত। সাম্প্রদায়িক আবেগ ও ভদ্রলোকের সংকীর্ণ স্বার্থবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণীত এই চুক্তির দোষ-ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ছিল না এমন নয়। কিন্তু যে সময় উদীয়মান মুসলিম ভদ্রলোক নেতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক আবেগ সরকারী ভেদনীতির বাহক ও পরিপোষক হইয়া উঠিতেছিল সে সময় মুসলমান সমাজকে যতদূর সম্ভব সরকারী প্রভাবমুক্ত করিয়া কংগ্রেসের প্রভাবসীমার মধ্যে টানিয়া আনিবার সাময়িক প্রচেষ্টা হিসাবে এই চুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। শিথিলভাবে হইলেও হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা এই চুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। বস্তুত, মুসলমান নেতৃত্বের একটা বড় অংশের আস্থা যে চিত্তরঞ্জন হিন্দু-মুসলমান চুক্তির ফলে অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তো এই সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

গণসংগঠনের সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেসের যোগস্থাপনের প্রয়াস

অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন কংগ্রেস কর্মীরা গণসংগঠন ও গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছিলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যক্রমের মধ্যে গণসংগঠন ও গণ-আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গণসংগঠনের নেতাদের চিত্তরঞ্জন প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থলে নিয়া আসিয়াছিলেন। এ প্রয়াস তাঁহার দেখিতেছি একেবারে প্রথম হইতেই। ১৯২১ সালে জুলাই মাসে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব লাভ করিবার পরেই চিত্তরঞ্জন পূর্বমেদিনীপুরে গণ-আন্দোলনের স্রষ্টা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকপদে নির্বাচিত করিলেন। ইতিপূর্বে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষপদে চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড পত্রিকার প্রথম ম্যানেজিং ডিরেকটারও ছিলেন বীরেন্দ্র-

নাথ। ১৯২৩ সালের প্রথমদিকে কংগ্রেস-খিলাফত স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠিত হইলে বীরেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সম্পাদক হইয়াছিলেন। বাঁকুড়া ও কুমিল্লায় গণসংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন অনিলবরন রায় ও আশরাফউদ্দীন চৌধুরী। ১৯২১ সালে নবগঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মসমিতিতে চিত্তরঞ্জন ইঁহাদের দুইজনকেই নিয়া আসিলেন। পরে, ১৯২৪ সালে, প্রাদেশিক কংগ্রেসে তাঁহার দ্বিতীয়বারের সভাপতিত্বকালে, চিত্তরঞ্জন অনিলবরনকে একবার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকপদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্যদিকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের তরুণ ছাত্র সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী রাজসাহী ও নদীয়া জেলায় মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির নিপ্পীড়ন ও বাধ্যতামূলক নীল চাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করিতে গিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জনের উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য নিয়া।

চিত্তরঞ্জনের সমস্যা ও সঙ্কট

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সমবায়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস গড়িয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে বিভিন্ন ধারার সমন্বয় ঘটাইবার প্রয়াস চিত্তরঞ্জন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ কাজ যে কত দুরূহ সে ইঙ্গিত আগেই দিয়াছি। বিসদৃশ শক্তির সমবায়ে গঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসকে একত্র সংহত রাখিয়া কোন একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন চালিত করিতে পারিতেন কিনা, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহাই হোক না কেন, সাধনের উপায় সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। যদি থাকিতও, তবুও বিভিন্ন বিসদৃশ শক্তিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও অবকাশ তিনি পান নাই। বস্তুত, কোন ক্রমে সমবায় গড়িয়া তুলিবার পর তিনি অল্পদিনই জীবিত ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের অনেকটাই আবার চলিয়া গিয়াছিল বিসদৃশ শক্তিগুলিকে একত্র রাখিবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় আর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কলাকৌশল স্থির করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবার প্রয়াসে।

সমস্যাটা যে কত কঠিন ছিল তাহা দু-একটা ঘটনার মাধ্যমে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। ১৯২৪ সালের নির্বাচনে কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইবার পর চিত্তরঞ্জন ঠিক করিয়াছিলেন কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার পদে নিযুক্ত করিবেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে ও ডেপুটি মেয়র পদে আশরাফউদ্দীন চৌধুরীকে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের এই মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা আসিল তাঁহার কলিকাতা-কেন্দ্রিক নিয়মতন্ত্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদী সহায়কদের পক্ষ হইতে। কলিকাতা কর্পোরেশনের এমন দুইটি উচ্চপদে গ্রামীণ সংগঠকরা আসিয়া বসিবেন, কলিকাতা-কেন্দ্রিক নেতাদের কাছে এ চিন্তাও অসহনীয়। ইঁহাদেরই চাপে চিত্তরঞ্জন শেষ পর্যন্ত বীরেন্দ্রনাথের পরিবর্তে মনোনীত করিলেন সুভাষচন্দ্র বসুকে আর আশরাফউদ্দীনের পরিবর্তে মনোনীত করিলেন অভিজাত জমিদার পরিবারের ব্যারিস্টার হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে লিপ্ত থাকিয়া কলিকাতা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বিরাগভাজন হওয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। এই উপলক্ষে কলিকাতা-কেন্দ্রিক নিয়মতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ ও সন্ত্রাসবাদী কর্মীরা একযোগে বীরেন্দ্রনাথকে অপমানিত ও অপদস্থ করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'মেদিনীপুরের কেওট আসিয়া কলিকাতায় রাজত্ব করিবে'।[২]—কলিকাতার নেতাদের মুখে এমন কথাও নাকি শোনা গিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ হইলেও পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামীণ গণসংগঠক বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা-কেন্দ্রিক নেতাদের কাছে বরাবরই অপাঙ্‌ক্তেয়। স্বভাবতই, প্রাদেশিক কংগ্রেসের উচ্চতর স্তরে তাঁহার উত্তরণ কলিকাতার নেতারা সুচক্ষে দেখেন নাই। অপরদিকে, সন্ত্রাসবাদের প্রতি বীরেন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা ছিল প্রবল। ফলে

সন্ত্রাসবাদীরাও তাঁহাকে মানিয়া নিতে পারে নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের এই ঘটনা উপলক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেসের উচ্চতর মহলে সন্ত্রাসবাদীদের সহায়তায় কলিকাতা-কেন্দ্রিক নিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্বের গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে বীরেন্দ্রনাথকে তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থল হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। গণ-আন্দোলনের সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় যোগসূত্রটা এমনিভাবে চিত্তরঞ্জনের চোখের সামনেই ছিন্ন হইয়া গেল।

হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সাধারণভাবে মুসলমান নেতাদের মনে আশার সঞ্চার করিলেও, সন্ত্রাস-বাদীসহ অনেক হিন্দু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীই এ চুক্তি মানিয়া নিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অংশটা বড় হইয়া উঠিবে, এ ঘটনা তাঁহাদের কাছে অসহনীয় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, উদীয়মান মুসলমান ভদ্রলোকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের চিন্তা-ভাবনার বাহিরে। অন্যদিকে অনেক মুসলমান রাজনীতিবিদ ও ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলেন মুসলমানদের পাওনাটা হওয়া উচিত ছিল অনেক বেশি। শিক্ষা, বৃত্তি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দুরা যে অনেক আগে হইতেই প্রতিষ্ঠিত, এই ঘটনাটা কোনক্রমে লোপ করিয়া দিতে পারিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন। আবার জাতীয় আন্দোলনে শুধুমাত্র সমর্থনের বিনিময়েই আরও অনেক কিছু তাঁহাদের প্রাপ্য, এমনি একটা ভাবও মুসলমান ভদ্রলোকদের অনেকের মনেই ছিল। এতকাল পর্যন্ত বৃত্তির ক্ষেত্রে বা রাজনীতিতে তাঁহাদের স্থানটা ছিল গৌণ, এইবার সুযোগ বুঝিয়া সবটা একেবারে পোষাইয়া নিতে হইবে,—কাহারও মনের ভাবটা আবার ছিল এইরকম।

কিন্তু অনেক বেশি বিপজ্জনক হইয়া দেখা দিল একশ্রেণীর মুসলমান রাজনীতিবিদের মনোভাব। বিশেষ করিয়া স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি এইসব মুসলমান রাজনীতিবিদের কাছে হইয়া উঠিল কলিকাতার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায়-মাত্র। স্বরাজ্য দল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া দ্বৈতশাসন ঠেকাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলে অনেকে আবার আরও খানিকটা আগাইয়া গিয়া কাউন্সিলে সরকারের বিরুদ্ধে ভোটের বিনিময়ে মূল্য দাবি করিয়া বসিলেন। এ ধরনের দাবিও চিত্তরঞ্জনকে মিটাইতে হইয়াছিল। যে দরিদ্র মুসলমান চাষীর দোহাই দিয়া তাঁহারা রাজনীতি করিতে আসিয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া সে চাষীর কথা তত্ত্বগত প্রশ্নের বাহিরে আর তাঁহাদের মনেই পড়িত না।

চিত্তরঞ্জনের দলে আভ্যন্তরিক বৈসাদৃশ্য ও অসংগতি যে কত প্রবল ছিল, সে কথা আশা করি কিছুটা পরিষ্কার করিতে পারিয়াছি। এমন একটা দলের তো ভাঙিয়া পড়িবারই কথা। তবে চিত্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় যে পড়ে নাই, তাহার কারণ তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্ব, গভীর দেশপ্রেম, দেশবন্ধু নামের মহিমা ও গান্ধীর সমর্থন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থান অধিকার করিবার মতো কেহই ছিলেন না। বৃহত্তর সমাজের কথা মনে রাখিয়া রাজনীতি করিবার মতো সমাজবোধও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ছিল না। বিসদৃশ বিভিন্ন শক্তিকে একত্র করিয়া রাখিবার বন্ধন তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুচিয়া গেল। প্রাদেশিক কংগ্রেসের শিথিল সংগঠনও ভাঙিয়া পড়িল বিভিন্ন ভাগে।

গ. চিত্তরঞ্জন-পরবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস : কলিকাতা-কেন্দ্রিক প্রথম স্তর

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন কলিকাতা-কেন্দ্রিক নিয়ম-তান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিরোধে পরাভূত হইবার পরে গান্ধীবাদী কর্মীরা প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্র হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে-সব গ্রামীণ সংগঠক

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে ছিলেন তাঁহার জীবনকালেই প্রাদেশিক কংগ্রেসে তাঁহাদের প্রভাব কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার নিয়োগের ঘটনা এবং এই উপলক্ষে বীরেন্দ্রনাথের অবমাননাই তো তাহার প্রমাণ। এই ঘটনায় অপদস্থ বীরেন্দ্রনাথ প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থল হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের গ্রামীণ সংগঠক সহযোগী-দের মধ্যে অগ্রগণ্য বীরেন্দ্রনাথ সরিয়া দাঁড়াইবার ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেসে গ্রামীণ কর্মীদের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই কমিয়া আসিতেছিল। চিত্তরঞ্জন অবশ্য বীরেন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২৪ সাল হইতে কাউন্সিল ও কর্পোরেশন নিয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বলিয়া গ্রামীণ সংগঠকদের সম্বন্ধে নজর দিবার সুযোগ তিনি বিশেষ পান নাই।

এ অবস্থায় চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নিয়ম-তান্ত্রিক নেতাদের হাতে গিয়া পড়িল। তাঁহাদের পিছনে ছিলেন মফঃস্বলের কলিকাতামুখী নিয়ম-তান্ত্রিক কংগ্রেসকর্মী ও নেতৃবৃন্দ আর সন্ত্রাসবাদীরা। কলিকাতা-কেন্দ্রিক নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীর সমর্থনে, কিন্তু সংগঠনের উপর তাঁহাদের অধিকার আসিয়াছিল সন্ত্রাস-বাদীদের সক্রিয় সহায়তায়। কর্মীসংঘ নামে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদীরা তো প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাংগঠনিক কেন্দ্রগুলি চিত্তরঞ্জনের সময়েই দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই দুই দলের সহ-যোগিতায় কলিকাতাকে কেন্দ্র ও কর্পোরেশন ও কাউন্সিলের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিল বাংলার কংগ্রেস রাজনীতির প্রথম ও প্রধান স্তর। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কর্পোরেশন হাতে রাখিয়া কাউন্সিলে পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে ক্ষমতা ও অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টাই ছিল প্রথম স্তরের নেতাদের প্রধান কাজ। কর্পোরেশন ও কাউন্সিলে তো নির্বাচন ছাড়া ঢোকা যায় না। তাই নির্বাচনের রাজনীতিও প্রথম স্তরে কংগ্রেস কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

কংগ্রেসের গ্রাম-কেন্দ্রিক দ্বিতীয় স্তর

প্রথম স্তরের কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা নির্বাচনের সময় ছাড়া গ্রামীণ গণ-সংগঠনের সংসর্গ যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়া চলিতেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের সময় গান্ধী বীরেন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রবলতর পক্ষের বিরোধিতার ফলে গান্ধীর উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বীরেন্দ্রনাথ বাহিরে থাকার ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থল হইতে গ্রামীণ গণ-সংগঠকদের সরাইয়া রাখা কলিকাতা-কেন্দ্রিক নেতৃত্বের পক্ষে সহজ হইয়া গিয়াছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্র-স্থল হইতে গ্রামীণ সংগঠকগণ বাদ পড়িয়া যাইবার ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে গ্রামীণ সংগঠনের কোন যোগাযোগই আর রহিল না। গণ-সংগঠকরা সম্পূর্ণভাবে গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতা করিয়া যে-সব গান্ধীবাদী কর্মী প্রাদেশিক কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ বা গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী ধরিয়া নিজেদের পৃথক কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন অথবা নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মক্রম ও প্রভাবের বাহিরে এইসব গ্রামীণ সংগঠকদের নিয়া বাংলায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় স্তরের গঠন। কিন্তু প্রাদেশিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে গ্রামীণ গণসংগঠকরা হইয়া পড়িলেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কোন কোন জায়গায় দেখিতেছি ইঁহাদের কর্মক্ষেত্র মাত্র দু-একটি গ্রাম নিয়া। কোথাও বা কয়েকটি গ্রাম নিয়া গঠিত ইউনিয়ন পর্যায়ে, আবার কোথাও কয়েকটি ইউনিয়নের সমাহারে গঠিত থানার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। থানা ছাড়িয়া কোথাও কোথাও গ্রামীণ সংগঠকদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে

মহকুমা পর্যায় পর্যন্ত। কিন্তু ইহার উপরে জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ সংগঠকরা কখনই বিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রথম স্তরে নেতৃত্বের চরিত্র

কংগ্রেসের প্রথম স্তরের নেতাদের উদ্দেশ্য ও পন্থা এক ও অভিন্ন বটে, কিন্তু মনের মিল তাঁহাদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। মৃত্যুর সময় চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের নেতা ও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রথমেই বিরোধ বাধিল এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়া। প্রধানত, গান্ধীর প্রচেষ্টায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত একই সঙ্গে তিনটি পদই লাভ করিলেন বটে, কিন্তু প্রতিযোগীদের অর্থাৎ সমবেতভাবে 'বিগ ফাইভ' বা মহাপঞ্চক নামে খ্যাত শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও তুলসীচরণ গোস্বামীর নিদারুণ গাত্রদাহের প্রচণ্ড উত্তাপ তাঁহাকে এমনই দগ্ধ করিতে লাগিল যে ১৯২৬ সালের শেষদিকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদ, ছাড়িয়া দিতে হইল। তাহার পরে ১৯৩০ সালে ছাড়িতে হইল মেয়রপদ। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা নিয়া যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছিল, ব্যক্তিগত দ্বেষ ও উপগোষ্ঠীগত কলহের মধ্য দিয়া তাহা অশোভন ও আত্মঘাতী বিরোধে পরিণতি লাভ করিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই ধরনের বিরোধ-বিসম্বাদ হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারে নাই। এই বিবাদ-বিসম্বাদে প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কদের পরিবর্তন অবশ্য কয়েকবারই হইয়াছে। আবার নায়কদের উপগোষ্ঠী বদলের ঘটনাও কম নয়। ১৯২৭ সালে কারাগার হইতে বাহির হইয়াই সুভাষচন্দ্র বসু মহাপঞ্চকের স্থলে যতীন্দ্রমোহন-বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি হয়তো মহাপঞ্চকেরও নেতা। কিন্তু ক্ষমতা যখন যতীন্দ্রমোহনের পরিবর্তে সুভাষচন্দ্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে আরম্ভ করিল, বিশেষ করিয়া ১৯৩৩ সালে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর, মহাপঞ্চকের বিভিন্ন নেতার সঙ্গেই বিভিন্ন সময়ে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ বাধিয়াছে। বিরোধ অবশ্য নীতি নিয়া নয়, ক্ষমতার ভাগাভাগিই ইহার উপলক্ষ। কাহাকে বাদ দিয়া কে কোথায় একটু বেশী নিয়া নিবার চেষ্টা করিতেছে, এইসব নিয়াই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতারা দেখিতেছি পরস্পরের নিন্দায় মুখর। আর এই নিন্দার ভাষা কি কুৎসিত, তাহার ইঙ্গিতই বা কি কদর্য! সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরিয়া এই লজ্জাকর সংকীর্ণতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ব্যক্তিগত লোভ ও দ্বেষ যেখানে প্রবল, সেখানে এসব ব্যাপার তো ঘটিবেই।

এই বিরোধের পশ্চাতে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকাও কম ছিল না। সন্ত্রাসবাদীরা আসিয়াছিলেন প্রধানত অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল হইতে। দুই দলের কেহই কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহাদের দলগত পরিচয় ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। এই দুই দলের মধ্যে সদ্ভাবও বিশেষ ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেস নেতাদের বিরোধ-বিসম্বাদের সুযোগে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সন্ত্রাসবাদী দল তাঁহাদের বিরোধটা কংগ্রেসের মধ্যেই টানিয়া আনিলেন। অনুশীলন ও যুগান্তরের সন্ত্রাসবাদীরা দেখিতেছি সর্বদাই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসী গোষ্ঠীর হইয়া বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত। নিয়মতান্ত্রিক নেতাদের মতো তাঁহারাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর সমর্থক। নিয়মতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদে সবচেয়ে বেশী অনুরাগ ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর। তিনিও কিন্তু বিবদমান সন্ত্রাসবাদীদের কখনো একত্রবদ্ধ করিতে পারেন নাই। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বিবাদের সময় তিনি লড়িয়াছিলেন যুগান্তর দলের সমর্থন লইয়া। অনুশীলন সমিতি তখন যতীন্দ্রমোহনের সমর্থক। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতিই সুভাষচন্দ্রের সমর্থক, আর যুগান্তর তাঁহার বিরোধী।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নেতা ও কর্মিবৃন্দ আর সব কিছু বাদ দিয়া কাউন্সিল, কর্পোরেশন, নির্বাচন ও আভ্যন্তরিক বিবাদ-বিসম্বাদ নিয়াই মগ্ন। দেশের অভ্যন্তরে যে-সব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল সে দিকে মন দিবার মতো অবকাশ তাঁহাদের কই? আগেকার জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতো ইঁহারাও রাজনীতিতে আসিয়াছিলেন সীমিত দৃষ্টি ও কল্পনা নিয়া। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক বোধ ও সামাজিক দৃষ্টি কোনভাবেই ইঁহাদের প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

ঘ. গ্রামাঞ্চলে নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব : অর্থনৈতিক ভিত্তি

গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক হইতে। প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের বাহিরে বিত্তবান বা সচ্ছল রায়তদের (জমির পরিমাণ ও নামে নানাপ্রকার প্রভেদ সত্ত্বেও সাধারণভাবে ইঁহাদের পরিচয় জোতদার বলিয়া) মধ্য হইতে এই নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব। বর্তমান শতকের প্রথমদিকে বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম ও উত্তরের জেলাগুলিতে দেখিতেছি বড় জোতদারের সংখ্যা প্রচুর। অধিকাংশ জমিও ইঁহাদের হাতে। প্রত্যন্ত জেলাসমূহে জলা বা জঙ্গল হাসিল করা জমি বড় বড় খণ্ডে ইঁহারাই বন্দোবস্ত নিয়াছিলেন। মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার জেলাগুলি প্রথমদিকে ছোট রায়তপ্রধান। কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালের অর্থনৈতিক অবনমনের পরে এসব জেলাগুলিতে সচ্ছল রায়ত ছোট রায়তের আর্থিক দুর্গতির সুযোগে তাঁহাদের জমি কিনিয়া বিত্তবান জোতদারে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বেশি পরিমাণ জমির স্বত্ব ছাড়াও জোতদারদের বিত্ত উপার্জনের অন্য উপায় ছিল। বাংলার সর্বত্রই কৃষিঋণের বেশির ভাগটাই দিতেন গ্রামের এইসব সচ্ছল, সম্পন্ন রায়ত। ফসল ব্যবসায়ে স্থানীয় ব্যাপারীও ইঁহারাই। ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর তো অন্ন উপার্জনের জন্য জোতদারের কাছেই দায়বন্ধ। ছোট রায়তও ইঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঋণ ছাড়া তো প্রায় কাহারও চলিত না, আর ঋণের জন্য জোতদার-মহাজনের উপর নির্ভর ছাড়া উপায় ছিল না। ঋণের দায়ে ফসলের একটা অংশ তুলিয়া দিতে হইত জোতদার-মহাজনের হাতে। এই উদ্বৃত্তটা খাটিত মহাজনের ফসল ব্যবসায়ে।

এইসব জোতদার-মহাজন-ব্যাপারী ঘরের ছেলেরা গ্রামের বিদ্যালয়ে বা মফঃস্বল শহরে অথবা কলিকাতা শহরে ইংরাজী লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলে গ্রামের সাধারণ কৃষকের উপর ইঁহাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়া উঠিল। ইংরাজী শিক্ষা, বিশেষ করিয়া আইন শিক্ষার জোরে অশিক্ষিত সাধারণ কৃষক ও সরকারী অফিস-আদালতের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে ভদ্রলোকেরা যে ক্ষমতা ভোগ করিতেছিলেন তাহাতে নূতন শিক্ষিত জোতদার-মহাজন-ব্যাপারী ঘরের ছেলেরা উপস্থিত হইতে লাগিলেন তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে।

গ্রামাঞ্চলে এই নূতন শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ হইতেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভগ্নোন্মুখ জমিদারি ব্যবস্থার আড়ালে। উত্তরাধিকারসূত্রে, পত্তনির মাধ্যমে, ঋণের দায়ে, নীলাম বিক্রয়ে জমিদারি সম্পত্তি সব ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়িতেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, সম্পত্তি এতই ছোট যে বাৎসরিক আয় কুড়ি টাকাও নয়। বড় জোতদার-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে তো বটেই, মাঝারি ও ছোট রায়ত-প্রধান অঞ্চলেও ছোট জমিদার-পত্তনিদার নিতান্তই শক্তিহীন। ছোট ও মাঝারি রায়ত-অধ্যুষিত এলাকায় বড় বা মাঝারি জমিদার বা পত্তনিদারের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু এসব এলাকাতেও স্থানীয় পর্যায়ে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিতেছিলেন জোতদার-মহাজন-ব্যাপারীরা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে যে কৃষি অর্থনীতির উপর ইঁহাদের নিয়ন্ত্রণ, এ কথা ঠিক।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইন্ধন যোগাইতেছিলেন ভূস্বামীরা নিজেরাই। অনেক ক্ষেত্রেই বড় বা মাঝারি জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। খাজনার উপরে বেআইনী আর্থিক দাবি তো ছিলই, তাহার উপর ছিল নির্যাতন ও অপমান। ছোট রায়ত তো আর্থিক দাবি মিটাইতে গিয়াই শেষ হইয়া যাইত। নির্যাতন-অপমানের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস তাহার ছিল না। প্রতিরোধ আসিল জোতদার-মহাজন-ব্যাপারীদের তরফ হইতে। জমিদারের আর্থিক দাবি তাঁহারা অক্লেশে মিটাইতে পারিতেন, কিন্তু জমিদার বা নায়েব-গোমস্তার নির্যাতন নিঃশব্দে সহ্য করা ই'হাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। গ্রামীণ সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ করিয়া তোলার পথে জমিদারের প্রভাব-প্রতিপত্তিই সবচেয়ে বড় বাধা। তাই জমিদারের অত্যাচারটা ই'হাদের বেশি করিয়া বাজিত। অত্যাচার-প্রতিরোধে ই'হাদের প্রচেষ্টা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল এই কারণেই। জমিদারের বিরুদ্ধে ই'হারা অগ্রসর হইতে চাহিলেন সাধারণ কৃষককে সঙ্গে নিয়া। অত্যাচার-প্রতিরোধে সাধারণ কৃষককে টানিয়া আনা বিশেষ কঠিন হয় নাই। কারণটা সহজেই অনুমেয়। তবে সাধারণ কৃষককে নিয়া প্রতিরোধ গড়িয়া তোলায় জোতদার-মহাজন-ব্যাপারীর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। স্থানীয় পর্যায়ে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করিতে পারিলে একদিকে যেমন প্রতিরোধ ব্যাপক করিয়া তুলিয়া জমিদারের সঙ্গে দরাদরিতে শক্তিবৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্যদিকে আবার সাধারণ কৃষকদের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নেও ক্ষমতার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া তোলা সম্ভব। বস্তুত, স্থানীয় পর্যায়ে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন গ্রামের সচ্ছল, সম্পন্ন জোতদার-মহাজন-ব্যাপারীরাই।

নূতন নেতৃত্বের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা

নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব হইতেছিল প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। কিন্তু নূতন নেতাদের মনপ্রাণ পূর্ণ করিয়াছিল ভদ্রলোক হইবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। ভদ্রলোকের মতো জীবিকার ক্ষেত্রে পরভৃত হইয়া শোষণের অধিকার অর্জন তো প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তবুও সর্বসাধারণের কাছে পুরাপুরি ভদ্রলোক বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়া বৃহত্তর সমাজের উপর অভিভাবকত্বের অধিকার পাওয়াটা সময়সাপেক্ষ। তবে পুরা ভদ্রলোক বলিয়া সামাজিক স্বীকৃতি পাইতে সময় তাঁহাদের যতই লাগুক না কেন, কৃষি ও কৃষকের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং জমিদারি নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগঠন জোতদার-মহাজন-ব্যাপারীদের হাতে যে ক্ষমতা আনিয়া দিতেছিল তাহা প্রতিরোধ করিবার মতো শক্তি বা বুদ্ধি কোনটাই ক্ষয়িষ্ণু ভূস্বামী বা উকিল, মোক্তার, চাকুরিজীবী কাহারও ছিল না। বৃহত্তর সমাজ হইতে তাঁহারা এতটাই দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন যে সেই সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণের জোরে যে নূতন শক্তি বিকাশ লাভ করিতেছিল তাহাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন পর্যায়েই তাঁহারা প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই।

নূতন নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক চরিত্র

পুরাতন ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই ছিলেন উ'চু জাতের হিন্দু আর নূতন নেতৃত্ব উদ্ভূত হইতেছিল প্রধানত বাংলার, বিশেষ করিয়া, ভাগীরথীর উত্তরশায়ী অংশের (সাধারণতঃ পূর্ব বাংলা বলিয়া পরিচিত), সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এবং অংশত তথাকথিত নীচু জাতের হিন্দুদের মধ্য হইতে। ভদ্রলোকরা দীর্ঘদিন ধরিয়া ই'হাদের অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে অসম্মান ও অবমাননা। পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের কাছে অবজ্ঞাত অপমানিত ভদ্রলোকগণ সাধারণ্যে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন এইভাবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া

চলিবার ফলে এসব হয়তো সামাজিক অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ও নীচু-জাতের হিন্দুদের নূতন নেতৃত্বের কাছে ভদ্রলোকের আচরণ রূঢ় অমর্যাদাই ছিল না, সংগত কারণেই সাম্প্রদায়িক বা নীচুজাতের প্রতি উঁচুজাতের ঘৃণার অভিব্যক্তি বলিয়া মনে হইয়াছে। এই সূত্রে নূতন নেতাদের ক্ষমতাবিস্তারের প্রয়াসের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মনোভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক দিকটা অনায়াসেই বিকাশ লাভ করিল। অবশেষে দেখিতেছি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই নূতন নেতৃত্বের শক্তি ও জনপ্রিয়তার প্রধান উৎস।

নূতন নেতৃত্বের রাজনৈতিক বিস্তার

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নূতন নেতৃত্বের ক্ষমতা ও অধিকার বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিল। প্রসার অবশ্য ধীরে এবং সীমিতভাবেই হইতেছিল। শাসনসংস্কারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার, দেশশাসনের গৌণ ক্ষমতা কিছু কিছু করিয়া ভারতীয়দের হাতে তুলিয়া দিতেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে সরকার ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেছিলেন সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। এই সূত্রে গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড, জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হইল। বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও প্রাদেশিক পর্যায়ে মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা হইল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে। আপাত-দৃষ্টিতে ১৯৩৫ সালের শাসনসংস্কারে নির্বাচিত সরকারের হাতে প্রাদেশিক শাসনভার পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একেবারে প্রথমদিকে না হইলেও, নির্বাচনের রাজনীতির মুখে পড়িয়া ভদ্রলোক নেতাদের পক্ষে পশ্চাৎ অপসারণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। জয়-পরাজয় যাঁহাদের হাতে, সেই নির্বাচকমণ্ডলী তো নূতন নেতাদের আয়ত্তাধীন। ১৯৩২-এর রোয়েদাদ অনুসারে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভদ্রলোক নেতাদের কোন আশাই ছিল না। সাম্প্র-দায়িক জিগীরে নূতন নেতৃত্বের জয় এক্ষেত্রে সুনিশ্চিত। ক্রমে, এই পথে ১৯৩৭ সালে সম্প্রসারিত নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে নির্বাচনে জিতিয়া নূতন নেতৃত্ব গ্রাম হইতে একেবারে কলিকাতা পর্যন্ত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন। নির্বাচনের পর দেখা গেল বাংলার অ্যাসেম্বলিতে নূতন নেতৃত্বের প্রতিনিধিরাই প্রধানতম রাজনৈতিক শক্তি।

নূতন নেতৃত্ব সম্পর্কে সরকারী নীতি

নূতন নেতৃত্বের এই বিকাশ ও বিস্তার ব্রিটিশ সরকারের আকাঙ্ক্ষিত ছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ক্ষমতার যে অংশটুকু তাঁহারা ছাড়িয়া দিতেছিলেন সেটুকু অনুগত রাজ-নীতিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ইচ্ছা স্বাভাবিক কারণেই তাঁহাদের ছিল। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে প্রাদেশিক সরকারের পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্রই অনুগত লোক খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রাণপণ চেষ্টাও তাঁহারা করিতেছিলেন। ১৯২১ সালে দ্বৈতশাসন চালু করার পর আনুগত্যপরায়ণ মধ্যপন্থীদের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে মধ্যপন্থীদের রাজনৈতিক সম্পর্ক কিছু ছিল না। তাই মধ্যপন্থীদের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেও জেলা হইতে ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে উদ্ভূত নূতন নেতৃত্বই সরকারের আশা-ভরসার স্থল। দ্বৈতশাসনের পাশে এরূপ দ্বৈত ব্যবস্থা সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর হইবারই কথা। উপরন্তু ১৯৩০ সালের পর হইতে কলিকাতার রাজ-নীতিতেও মধ্যপন্থীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত ক্ষীয়মাণ হওয়াতে সরকারের দৃষ্টি পুরাপুরি গিয়া

পড়িল নূতন নেতৃত্বের উপর। গ্রামাঞ্চলে উদীয়মান নেতৃত্বকে ক্ষমতার ভাগ দিয়া প্রতিষ্ঠার সুযোগ করিয়া দিলে দেশের অভ্যন্তরে সরকারী অধিকার ও ক্ষমতা দৃঢ়তর হইয়া উঠিবে, এই আশা ছিল বলিয়াই নূতন নেতৃত্বের প্রতি সরকারের এত পক্ষপাত। নূতন নেতারাও সরকারের মনোভাব ভাল করিয়া বুঝিতেন বলিয়া সরকারের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ও আনুগত্যের অভাব কখনও হয় নাই।

নূতন নেতৃত্বের রাজনৈতিক সংগঠন

গ্রামাঞ্চলের নূতন নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতেছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিতভাবে। বৃহত্তর রাজনৈতিক পর্যায়ে এই শক্তিকে প্রথম সংঘবদ্ধ করিতে আরম্ভ করে ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রজা সমিতি (পরবর্তীকালে কৃষক-প্রজা পার্টি নামে খ্যাত)। কয়েক বছর পরে এই নূতন নেতৃত্বের উপর নির্ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল মুসলিম লীগ। নামটা অসাম্প্রদায়িক এবং বৃহত্তর কৃষকসমাজের জন্য অর্থ-নৈতিক দাবি-দাওয়ার কথা বলিলেও প্রজাসমিতি-কৃষক-প্রজা পার্টি কিন্তু গড়িয়া উঠিয়াছিল বহুলাংশে নূতন মুসলমান নেতৃত্ব ও তাহার সাম্প্রদায়িকতার উপর নির্ভর করিয়া। তাই কৃষক-প্রজা পার্টির রাজনীতিতে অর্থনৈতিক দাবি ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ধ্বনি তুলিতে হইয়াছিল একই সঙ্গে। মুসলিম লীগের তো কথাই নাই। তাহার যাহা কিছু বক্তব্য সে সবটাই সোজাসুজি সাম্প্র-দায়িক ভেদবুদ্ধির কথা। কৃষক-প্রজা পার্টি বা মুসলিম লীগ—কোনটাই সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল হিসাবে কখনই গড়িয়া উঠে নাই। তপশীলভুক্ত হিন্দু জাতগুলিরও সুসংবদ্ধ কোন রাজনৈতিক চিন্তা বা দল ছিল না। জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক বা অসাম্প্রদায়িক কোন দাবি নিয়া ব্যাপক আন্দোলনও ইহারা কখনও করে নাই। তবুও ১৯২৯ সাল হইতে প্রজা সমিতি-কৃষক-প্রজা পার্টি ও ১৯৩৭ সাল হইতে মুসলিম লীগ বাংলায় বিস্তার লাভ করে অত্যন্ত দ্রুত বেগে। একই সময়ে তপশীল হিন্দু জাতগুলির একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নামে কয়েকজন নেতার প্রভাবও বাড়িয়া চলিয়াছিল। সংগঠনের তুলনায় ১৯৩৭ সাল হইতে নির্বাচনী সাফল্যও ইহাদের অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলের নবোদ্ভূত শক্তির সহায়তাই মনে হয় এই সাফল্যের প্রধান কারণ।

ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, কৃষক-প্রজা পার্টি বা মুসলিম লীগ বা তপশীল হিন্দু নেতারা ইংরাজের দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তির কোন কারণও ঘটান নাই। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে গ্রামাঞ্চলের নূতন নেতৃত্বের সমর্থনপুষ্ট এই দুইটি দল ও তপশীল হিন্দু নেতারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমান ও তপশীল হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীর বিপুল ভোটাধিক্যের জোরে কলিকাতার রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন। মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি নির্বাচনে নামিয়াছিল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। কিন্তু নির্বাচনের পর কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের একত্রে গঠিত মন্ত্রিসভা বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক প্রবণতার যুক্তিসংগত পরিণতি। রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে তপশীল হিন্দু নেতারাও এই মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়াছিলেন। এই মন্ত্রিসভা যে ব্রিটিশ সরকারের পরম সন্তোষের কারণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ বোধ করি নাই। যে ভেদনীতি ব্রিটিশ সরকার প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছিলেন, মুসলিম লীগ-কৃষক প্রজা পার্টি ও তপশীল হিন্দুর মিলিত মন্ত্রিসভা তাহার জন্য সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিল।

৩. নূতন নেতৃত্বের প্রসার ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অবক্ষয়

নূতন নেতৃত্বের ক্রমবিস্তার প্রাদেশিক কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিল দুইভাবে। ১৯২১এ

খিলাফত উপলক্ষে মুসলমানরা কংগ্রেসের যতটুকু কাছে আসিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে তাহার তুলনায় অনেক বেশি দূরে সরিয়া গেলেন। অনেক কংগ্রেস নেতা ও কর্মী, বিশেষ করিয়া সন্ত্রাসবাদীরা, মুসলমানদের কংগ্রেসের বাহিরেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান বোঝাপড়াটা ইঁহারা অবাঞ্ছিত বলিয়াই মনে করিতেন। এইবার প্রসার্যমাণ মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার মুখে কংগ্রেসের পরিচয় দাঁড়াইল হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে। পরিচয় আরও সংকীর্ণ হইয়া উঠিল তপশীল হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজনীতির ঘনিষ্ঠতার ফলে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও তাহার পর প্রাদেশিক সরকার গঠন উপলক্ষে এ ঘনিষ্ঠতা এতটাই বেশি যে প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রধানত উঁচুজাতের হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান,—এ কথা বলায় আর কোন বাধা ছিল না। দ্বিতীয়ত, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সাফল্য ও পরে একত্রে সরকার গঠনের ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেসের ঘাঁটি কলিকাতা শহরেই কংগ্রেসের স্থান হইয়া উঠিল গৌণ। সাধারণ সদস্য বা নেতা পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকের অভাব না থাকিলেও জাতীয় কংগ্রেসের শাখা হিসাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়া প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিবার মতো প্রভাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কখনও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপদ্ধতি অনুসারে বাংলার নির্বাচিত সংস্থাসমূহে মুসলমান আসনের সংখ্যা স্বভাবতই বেশি। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে কংগ্রেস অবাঞ্ছিত বলিয়া মুসলমান আসনে সাফল্যলাভ করিবার সম্ভাবনা তাহার ছিল না। এ অবস্থায় হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীই কংগ্রেসের একমাত্র ভরসা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু মহাসভা ও তপশীল হিন্দুদের গোষ্ঠীও হিন্দুভোটের জন্য কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা ও তপশীল হিন্দুদের গোষ্ঠী কর্তৃক অধিকৃত আসনগুলি বাদে কংগ্রেসের হাতে যে কয়টি আসন থাকিল তাহাতে প্রাদেশিক রাজনীতিতে কংগ্রেসের স্থান হইয়া উঠিল গৌণ।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের অবক্ষয়ের কারণ

প্রাদেশিক কংগ্রেসের এ অবস্থাটা, বলিতে গেলে, স্বেচ্ছাকৃত। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির রাজনীতিকে প্রতিরোধ করা যাইত একমাত্র গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার মতাদর্শ কংগ্রেসের ছিল, গণসংগঠকের অভাবও ছিল না। গান্ধীবাদী কর্মীরা ১৯২১ হইতেই গ্রামে সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছিলেন। গান্ধীবাদী দলের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বিবাদ ছিল বটে, কিন্তু গান্ধীবাদী গণসংগঠকদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থলে টানিয়া আনিয়া, গণসংগঠনগুলিকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালেই এ চেষ্টা কিভাবে প্রতিহত হইতেছিল সে কাহিনী আগেই বলিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পরে গণসংগঠকদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থল হইতে দূরে রাখিবার যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল সে সম্পর্কেও বলিয়া আসিয়াছি। ১৯২৬-২৭ সালে গণ-সংগঠকগণ প্রদেশ কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থলে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর হইতেই দেখিতেছি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলার গ্রামাঞ্চলের আর কোন যোগ নাই। কৃষক-প্রজা পার্টি বা মুসলিম লীগের মতো গ্রামাঞ্চলে নূতন নেতৃত্বের সঙ্গেও কংগ্রেসের কোন যোগ ছিল না। ইচ্ছা থাকিলেও যে যোগ সৃষ্টি করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হইত এমনও মনে হয় না। প্রাদেশিক কংগ্রেসের শহরকেন্দ্রিক রাজনীতি নেতা ও কর্মীদের একটা বড় অংশের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও উঁচুজাতের উগ্র অভিমান এবং অন্যদিকে ক্রমপ্রসার্যমাণ মুসলমান ও তপশীল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই

সে পথে সবচেয়ে বড় বাধা।

গণ-সংগঠনের মাধ্যমে কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। সে সুযোগ তাহার ছিলও। কিন্তু বার বার গণ-সংগঠনগুলিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সুযোগ হেলায় হারাইয়াছিলেন। তাঁহাদের জগৎ তো কলিকাতা শহরের মধ্যেই আবদ্ধ। তাই গ্রামীণ বাংলার উদীয়মান নেতৃত্ব যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কলিকাতায় স্থায়ী হইয়া বসিল তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের ক্ষমতাও স্বাভাবিক কারণে হইয়া উঠিল সীমাবদ্ধ।

চ. গ্রামীণ সংগঠকদের প্রাদেশিক কংগ্রেসে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস

চিত্তরঞ্জনের সময়ে ও মৃত্যুর পরে যে দুইবার গ্রামীণ সংগঠকগণ কলিকাতা-কেন্দ্রিক নেতৃত্বের কাছে পর্যুদস্ত হইয়াছিলেন সে দুই বারেই নিয়মতন্ত্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদীরা গণ-সংগঠক গ্রামীণ কর্মীদের অধিকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থল হইতে গ্রামীণ কর্মীদের দূরে সরাইয়া সরাইয়া রাখিবার জন্যই তাঁহাদের এই উদ্যম। প্রাদেশিক পর্যায়ে অসংবদ্ধ গ্রামীণ সংগঠকগণও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বিপর্যস্ত হইয়া ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহাদের করিবার আর কিছু ছিল না। অবশেষে প্রাদেশিক কংগ্রেসে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ তাঁহারা পাইলেন ১৯২৬-২৭ সালে, চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে। সুযোগটা আসিল ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের পুরোভাগে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে। গ্রামীণ সংগঠকগণ এই সুযোগে বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমবেত হইতে আরম্ভ করিলেন।

প্রাদেশিক নেতৃত্বে বীরেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন : উপলক্ষ ও রাজনৈতিক পটভূমি

বীরেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন অবশ্য সম্ভব হইয়াছিল প্রাদেশিক নেতাদের ইচ্ছায় ও উদ্যোগে। অনেকটা এই কারণেই বীরেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিপদে মনোনীত হইলেন। এই বছরের শেষ দিকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচন হইবার কথা। নিয়মতন্ত্রবাদী-সন্ত্রাসবাদী জোটের কাছে গ্রামীণ কর্মীরা কলিকাতায় অবাঞ্ছিত হইতে পারেন, কিন্তু নির্বাচনের সময় গ্রামাঞ্চলের ভোট সংগ্রহে তাঁহাদের উপযোগিতা কে অস্বীকার করিবে? নির্বাচনের মুখে তো আর তাঁহাদের অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, নির্বাচনের কথা ভাবিয়াই বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্তত একটা বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে ১৯২৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। এ পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেসে সকলের স্বার্থই সমান। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মীদের সমর্থন যতীন্দ্রমোহনের কাছে অন্য কারণেও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধে যতীন্দ্রমোহন তখন রীতিমত বিপন্ন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর দলীয় ক্ষমতার সবটাই যতীন্দ্রমোহনের হাতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু দলের মধ্যে শক্তিবৃদ্ধি হইতেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী মহাপণ্ডকের। প্রদেশ কংগ্রেসের এই অন্তর্বিরোধে বীরেন্দ্রনাথ ও গ্রামীণ সংগঠকগণ তখন তৃতীয় পক্ষ। আত্মরক্ষার জন্য যতীন্দ্রমোহন ইঁহাদের দিকে ঝুঁকিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকিবার অন্য কারণও ছিল। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরেই হিন্দু-মুসলমান চুক্তি নিয়া একটা সংকট ঘনাইয়া আসিতেছিল। চুক্তি বাতিল করিবার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের অনেকেই তখন বিশেষভাবে তৎপর। ইঁহারা অগ্রসর হইতেছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের সম্মুখে রাখিয়া। যতীন্দ্র-মোহন চুক্তি রক্ষা করিতে চাহিতেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁহার সমর্থকদের অনেকেই, বিশেষ করিয়া

সন্ত্রাসবাদীরা, চুক্তি বাতিল করিবার পক্ষে। বিরোধিতা এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে ১৯২৪ সালে প্রাদেশিক সম্মেলনে অনুমোদিত চুক্তিটি আর-একবার প্রাদেশিক সম্মেলনে অনুমোদিত না করাইয়া নিলে আর চলিতেছে না। হিন্দু-মুসলমান চুক্তি প্রণয়নে যতীন্দ্রমোহন ও বীরেন্দ্রনাথ—উভয়েই ছিলেন চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাহা ছাড়া প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের মতো বীরেন্দ্রনাথ চুক্তির প্রবলতম বিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের উপর নির্ভরশীলও নন। চুক্তির সংকটের সময় তাই যতীন্দ্রমোহনের কাছে বীরেন্দ্রনাথের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয় বোধ হইয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব সম্পর্কে সংকটের পূর্বাভাস

প্রাদেশিক নেতৃত্বে অন্তর্বিরোধ ও হিন্দু-মুসলমান চুক্তির সমর্থক ও বিরোধীদের শক্তি-পরীক্ষার প্রশ্নেই কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে (১৯২৬) প্রচণ্ড উত্তেজনা সঞ্চার হইবে, এ কথা সকলেই বুঝিতে পারিতেছিলেন। সন্ত্রাসবাদীরা তো ঠিকই করিয়া রাখিয়াছিলেন যে কৃষ্ণনগর সম্মেলনে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি তাঁহারা কিছুতেই অনুমোদিত হইতে দিবেন না। অন্যদিকে, সম্মেলনের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ ঠিক করিয়াছিলেন কংগ্রেসের আদর্শে যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, এবং গণ-আন্দোলনে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহাদের হাত হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর সম্মেলন হইবে তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ। তাঁহার সমর্থনে আগাইয়া আসিতেছিলেন গ্রামীণ সংগঠকগণ।

সংকটের উপলক্ষ

এ অবস্থায় অঘটন কৃষ্ণনগর সম্মেলনে একটা ঘটিতই। তবে সভাপতির অভিভাষণ তাহার সুযোগ করিয়া দিল। অভিভাষণে বীরেন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী ও নিয়মতন্ত্রবাদীদের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলিলেন গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলন ভিন্ন জনসাধারণের পূর্ণ স্বরাজ আসিতে পারে না, তাই কংগ্রেস যদি জনসাধারণের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় তবে তাহার মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকের গোপন সন্ত্রাস বা কাউন্সিলে বাগ্‌যুদ্ধপরায়ণ রাজনীতিকের কোন স্থান থাকিতে পারে না।[৩] তাই 'যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে এখনি ভায়লেন্স করা উচিত, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের সমূহ কার্য-নির্বাহক প্রতিষ্ঠান হইতে এখনই সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যে যে কারণেই হউক মার্কামারা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল কর্মকেন্দ্র হইতে দূরে থাকিবেন...এদেশে আর একদল লোক আছেন যাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া কংগ্রেসেরই সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন...এই শ্রেণীর লোককেও বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা এই বিশ্বাসঘাতকদের হাত হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে।...বাংলার স্বরাজী নেতাগণ যদি গত তিন বৎসরের মত আগামী তিন বৎসরও কেবল কাউন্সিল গৃহেই ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধে পৃথিবী প্রকম্পিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন, তবে কপটতা পরিত্যাগ করিয়া বাংলার জনসাধারণকে তাঁহাদের সে কথা খুলিয়া বলা উচিত। আমি মনে করি যে অধিকাংশ স্বরাজী নেতার হৃদয়ের কথা যদি সত্যই এই হয়, তাহা হইলে অক্ষমতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করাই বিধেয়।'[৪]

সংকটের রূপ

বলা বাহুল্য, বীরেন্দ্রনাথের এইসব উক্তি সন্ত্রাসবাদী বা নিয়মতন্ত্রবাদী কাহারও পছন্দ হইবার কথা নয়। তাহার উপর যে ভাষায় বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন সে যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি তীব্র। কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উত্তেজনাময় পরিবেশে এই ভাষণের প্রতিক্রিয়া হইল প্রচণ্ড। গ্রামীণ

সংগঠকগণ বীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিলেও সন্ত্রাসবাদী ও তাঁহাদের নিয়মতন্ত্রবাদী সহযোগীদের ক্রুদ্ধ প্রতিরোধের মুখে সম্মেলন শেষ হইবার আগেই বীরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে সম্মেলনও ভাঙিয়া গেল।

যে-সব উদ্দেশ্য নিয়া বীরেন্দ্রনাথকে কৃষ্ণনগর সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন করা হইয়াছিল তাহার কোনটাই শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় কৃষ্ণনগর সম্মেলনে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল বটে, কিন্তু এই উত্তেজনাময় বিশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্মসমিতি পুনর্গঠিত করিতে গিয়া যতীন্দ্রমোহন যে নূতন উত্তেজনা ও উপগোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সূত্রপাত করিলেন তাহার মধ্যে পড়িয়া হিন্দু-মুসলমান চুক্তি দৃষ্টির সম্পূর্ণ অন্তরালে পড়িয়া গেল। কিছুদিন বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও চাপে পড়িয়া যতীন্দ্রমোহন বিরোধীদের সঙ্গে আপোস করিয়া নিলেন। এত করিয়াও কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। নির্বাচনের পরেই, বছরের শেষ দিকে, যতীন্দ্রমোহনকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে হইল। ইতিমধ্যে অবশ্য প্রাদেশিক কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে আপোসের চেষ্টায় বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কটাও ঘুচিয়া গিয়াছিল।

প্রাদেশিক কংগ্রেসে গ্রামীণ সংগঠকদের কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস ও ব্যর্থতা

যতীন্দ্রমোহনের বিরোধীরা তাঁহাকে সভাপতিপদ হইতে অপসারিত করিলেন বটে, কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হইবার মতো জোর বা মনের মিল তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। অবস্থাটা এমন যে দুই পক্ষই তাল ঠুকিয়া মুখোমুখি দণ্ডায়মান, কিন্তু ক্ষমতা দখলের সাহস কাহারও নাই। এই সুযোগে বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক-সন্ত্রাসবাদীদের সম্মিলিত নেতৃত্বের বিরোধীরা—প্রধানতঃ গ্রামীণ গণসংগঠকগণ—প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব দখল করিয়া নিলেন। এইবার কিন্তু বিপদের মুখে নিয়মতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসবাদীরা অন্তর্দ্বন্দ্ব স্থগিত রাখিয়া নূতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমবেত হইলেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর এই প্রথম যতীন্দ্রমোহনের উপগোষ্ঠী ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মহাপঞ্চক উপগোষ্ঠী মনেপ্রাণে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব গ্রামীণ সংগঠকদের হাতে চলিয়া গেলে বিপদ তো সকলেরই।

যতীন্দ্রমোহন ও মহাপঞ্চক পরিচালিত নিয়মতন্ত্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের সম্মিলিত দল ও বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রধানত গ্রামীণ গণসংগঠকদের সমাবেশের চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষা ঘটিয়া গেল ১৯২৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। এইদিন প্রথম দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তলবী সভায় গ্রামীণ সংগঠকদের সমাবেশ পরাজিত হইল মাত্র চার ভোটে। পরাজয়টা অবশ্য নিতান্তই আকস্মিক। বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস এই সভায় প্রতিনিধিদের পাঠাইয়াছিলেন নিয়মতান্ত্রিক-সন্ত্রাসবাদী জোটের বিরুদ্ধে বীরেন্দ্রনাথ পরিচালিত সমাবেশকে সমর্থন করিবার জন্য। কিন্তু তলবী সভার অল্প কিছু সময় আগে কলিকাতার নেতাদের প্ররোচনায় তাঁহারা মত বদলাইয়া ফেলিলেন এবং জেলা কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করিয়া ভোটটা দিলেন নিয়মতন্ত্রবাদী-সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে।

গ্রামীণ সংগঠকদের দুর্বলতা ও পরিণতি

গ্রামীণ সংগঠকদের সমাবেশ সংগঠিত দলের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মতাদর্শ ও পন্থায় বিশ্বাসী লোকদের হাত হইতে প্রাদেশিক কংগ্রেস উদ্ধার করিতে হইলে যে সতর্কতা ও সংগঠন প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঁকুড়ার প্রতিনিধিরা

তাঁহাদের জেলা কংগ্রেসের নির্দেশ মান্য করিলেও গ্রামীণ সংগঠকরা প্রাদেশিক কংগ্রেসের উপর দখল রাখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সংগঠন, অর্থবল, লোকবল, প্রচার করিবার সুযোগ—কিছুই তো ছিল না। গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া কলিকাতা-কেন্দ্রিক বিত্তবান নিয়মতন্ত্রবাদীদের শক্তি-সামর্থ্য ও সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠনক্ষমতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া সফল হওয়া ইঁহাদের সাধ্যের অতীত। তাই দেখিতেছি তলবী সভায় পরাজয়ের অল্প কিছুদিন পরেই গ্রামীণ সংগঠকদের সমাবেশ ভাঙিয়া চুরিয়া ছত্রখান। বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের একত্রিত রাখিতে পারেন নাই। পরাজিত গ্রামীণ সংগঠকরা ফিরিয়া গেলেন গ্রামে—যে যাঁহার কর্মক্ষেত্রে। সরাসরি সংঘর্ষে এই পরাজয়ের পর তাঁহারা আর কখনই সমবেতভাবে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব দখল করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল গ্রামে। কলিকাতায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদর দপ্তরের সঙ্গে যে যোগটা রহিল সে নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। গ্রামীণ সংগঠকগণ দু-চার বার হয়তো নির্দিষ্ট প্রশ্নে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় একত্রে ভোট দিয়েছেন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ ওইটুকুই। ফলে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে কলিকাতায় তাঁহাদের পরিচয় কিছু ছিল না। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মসমিতিতে গ্রামীণ সংগঠকগণ অবশ্য স্থান পাইয়াছেন, তবে সর্বক্ষেত্রেই কোন না কোন উপগোষ্ঠীর সহায়তায়। একইভাবে দু-একজন গ্রামীণ নেতা কর্মকর্তার পদও পাইয়াছেন। নিজেদের এলাকা হইতে গ্রামীণ কর্মী ও নেতাদের অনেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য হইয়া আসিতেন। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাদেশিক কমিটিতে ভোট দিবার যে অধিকার ইঁহাদের ছিল সেইটুকুর জন্য বিবদমান উপগোষ্ঠীগুলি সাময়িকভাবে ইঁহাদের সহায়তা অর্জনের চেষ্টা কিছু করিতেন। ইহার বেশী কোন অধিকার বা ক্ষমতা গ্রামীণ সংগঠকদের ছিল না।

ছ. প্রাদেশিক কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্ভাবনা

কংগ্রেস কর্মীদের গ্রামীণ সংগঠনের সংখ্যা কম ছিল না। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, ঢাকা, দিনাজপুর ও শ্রীহট্ট জেলায় তো দীর্ঘস্থায়ী ও রীতিমত শক্তিশালী গণসংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, রাজসাহী, রংপুর, বগুড়া ও যশোহরে বিভিন্ন সময় কংগ্রেসের কর্মীরা গণসংগঠনের পত্তন করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক নেতৃত্ব সক্রিয় হইলে বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো গণসংগঠনগুলি একত্র করিয়া বিস্তৃত গণসংগঠন গড়িয়া তোলা কঠিন হইত না। একমাত্র এইরূপ সংগঠন ও গণ-আন্দোলনের মাধ্যমেই হয়তো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার রোধ করা সম্ভব হইত এবং কংগ্রেস হইয়া উঠিতে পারিত বাংলার প্রধানতম রাজনৈতিক শক্তি। কিন্তু এই সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র কলিকাতা-কেন্দ্রিক নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকিবার ফলে ক্রমপ্রসার্যমাণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাশে কংগ্রেসের ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্র ক্রমশই হইয়া উঠিল সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর। ইহার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া রাজনৈতিক কৌশলের খেলা দেখানো ছাড়া করিবার আর কি-ই বা থাকিবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের পরিণতি

শুধুমাত্র কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া গৌণ শক্তি হিসাবে ক্ষমতাভাগের দরাদরিতে বিশেষ কিছু পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কৌশলের জোরে আপোস করিয়া যেটুকু যা জোটে তাহাই ভরসা। বস্তুত, রাজনৈতিক শক্তির জোরে যে বিশেষ কিছু পাওয়া যাইবে না, এ কথাটা কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতাদের কাছে এতটাই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে কাহার সঙ্গে আপোস, কোন্ সময়ে, কোন্ পরি-

বেশেই বা আপোস করিতে যাইতেছেন, সে চিন্তাও ইঁহাদের অনেকের কাছেই অবান্তর। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সারা দেশ যখন উত্তাল সেই সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইবার পর সুভাষচন্দ্র বসু যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে সরকারের সঙ্গে আপোসের করিবার সুর স্পষ্ট।[৫] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে আপোসে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা কংগ্রেস করিয়াছিল। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা শরৎচন্দ্র বসু। সে প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। দলগত পর্যায়ে আপোসের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবার পরেও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস নেতারা নিজস্ব ক্ষমতা, যোগাযোগ ও কলাকৌশলের জোরে ক্ষমতার ভাগ নিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষক-প্রজা পার্টি, মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কংগ্রেসের মতাদর্শগত কোন মিল থাকিবার কথা নয়। তবুও নলিনীরঞ্জন সরকার, সন্তোষকুমার বসু ও তুলসীচরণ গোস্বামীর মতো কংগ্রেস নেতারা যথাক্রমে কৃষক-প্রজা পার্টি-মুসলিম লীগ, কৃষক-প্রজা-পার্টি-হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়াছিলেন। ১৯২৪ সাল হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রাদেশিক কংগ্রেসের শক্তি ও ক্ষমতার প্রধান উৎস। সেই কর্পোরেশনের উপর কংগ্রেসের দখল কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কর্পোরেশনের উপর আংশিক ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য প্রথমে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আপোস করিবার চেষ্টা করেন। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি আপোস করিলেন মুসলিম লীগের সঙ্গে।[৬] মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোসের সূত্র ধরিয়া সুভাষচন্দ্রকে ১৯৪০ সালের এপ্রিল-মে মাসে কৃষক-প্রজা পার্টি-মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় আনিবার চেষ্টা হইতেছিল এমন সংবাদও পাওয়া যাইতেছে।[৭] মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁহার আপোসের ফলেই ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে কারারুদ্ধ সুভাষচন্দ্রকে মুক্ত করিবার জন্য তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছিলেন স্বয়ং ইস্পাহানী।[৮] পরের বছর অক্টোবরে মন্ত্রী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী উপগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ডঃ বিধানচন্দ্র রায়।[৯] দুই মাস পরে ডিসেম্বরে ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের বিবাদের সুযোগে শরৎচন্দ্র বসু ফজলুল হকের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১০] আপোসে ক্ষমতালাভ করিবার প্রচেষ্টা অবশেষে পরিণতি লাভ করে হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর স্বাধীন বাংলার যৌথ পরিকল্পনায়।

জ. কংগ্রেসের দ্বিতীয় স্তরে গ্রামীণ সংগঠনসমূহের কার্যকলাপ

প্রথম স্তরে কংগ্রেসের রাজনীতির এই শুধুমাত্র কৌশলসর্বস্ব একান্ত বন্ধ্যা রাজনীতির ঠিক বিপরীত চেহারাটা দেখা যাইবে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের দ্বিতীয় স্তরের কার্যকলাপে। দ্বিতীয় স্তরে গ্রামীণ কর্মীরা গড়িয়া তুলিতেছিলেন কংগ্রেসের গণসংগঠন। গান্ধীকল্পিত স্বরাজের আদর্শ অনুসারে একদিকে গ্রামীণ ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা, সামাজিক সাম্য এবং অন্যদিকে দেশবাসীর স্বশাসনের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়া এইসব সংগঠনের জন্ম। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জন্য ব্রিটিশ যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল গণসংগঠনগুলি তাহার বিরুদ্ধে গান্ধীর নির্দেশিত পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। গণসংগঠনগুলির কাজ আরম্ভ হইয়াছিল অর্থনৈতিক পর্যায়ে খাদি ও অন্যান্য কুটীরশিল্প পুনরুজ্জীবন, সামাজিক পর্যায়ে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন ও রাজনৈতিক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস গণপ্রতিরোধ গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা দিয়া। ইহারই মাধ্যমে ঘটিতেছিল গণজাগরণ ও স্বাধিকার-চেতনার উন্মেষ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে গণসংগঠনগুলির রাজনৈতিক কার্যসূচী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বিশেষভাবে।

ফলে গণসংগঠনগুলির কার্যকলাপের বেশির ভাগ জুড়িয়া ছিল অহিংস গণপ্রতিরোধ, সরকারী আইন ও নির্দেশ প্রকাশ্যে অমান্য করিয়া নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

গণপ্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত অহিংসার পথে পরিচালিত করা সম্ভব হইবে কি না, সে সম্পর্কে গান্ধীর নিজেরও বোধ করি সন্দেহ ছিল। ১৯৩০ সালে একটি লেখায় গান্ধী তাঁহার এই সংশয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট করিয়াই দিয়াছেন; লেখাটার অংশবিশেষ পড়িলেই এ কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে। গান্ধী বলিতেছেন : The greatest obstacle in the path of non-violence is the presence in our midst of the indigenous interests of monied men, speculators, scribe-holders, landholders, factory owners and the like. All these do not always realize that they are living on the blood of the masses, and when they do, they become as callous as the British principals whose tools and agents they are.[১১]

আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জনসাধারণ যখন ব্রিটিশ সরকারের এইসব রক্তপিপাসু সহায়কদের চিনিয়া নিতে পারিল তখন দেখিতেছি গণপ্রতিরোধ আর শুধু সরকারবিরোধী আন্দোলনমাত্র নয়। একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার ও সরকারের সহায়ক জমিদার, জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পরিচালিত ব্যাপক গণআন্দোলনে পর্যবসিত। এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল জনসাধারণের সর্বাত্মক মুক্তির সম্ভাবনা।

ঝ. বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য

১৯২১ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সম্বন্ধে সম্প্রতি-কালে অনেক কথাই লেখা হইতেছে। কিন্তু প্রায় সকলেরই বিষয়বস্তু কংগ্রেসের কলিকাতা-কেন্দ্রিক প্রাদেশিক কমিটির অর্থাৎ প্রথম স্তরের কার্যকলাপ। গ্রামাঞ্চলের গণ-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহাদের যে জানা নাই এমন নয়, কিন্তু বাংলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে গণ-সংগঠনগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কেহই করেন নাই। সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত উল্লেখের বেশি কথা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাই-ই। দু-একজন যদি বা একটু বেশি বলিয়াছেন সে শুধু আন্দোলনগুলির দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা কোথায়, সেইটা দেখাইবার জন্য। কংগ্রেস-পরিচালিত গণসংগঠন ও গণ-আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল মেদিনীপুর জেলার পূর্বভাগে। প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময়েই এখানে সরকারী শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, বলিতে গেলে, অবহেলিত। গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন গণসংগঠনগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৃহত্তর জগতের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়াছিল। আজ ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও তাহারা তেমনিই দৃষ্টির অন্তরালে। অথচ প্রথম স্তরের রাজনীতির তুলনায় দ্বিতীয় স্তরের গণ-আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য যে অনেক বেশী, সামাজিক অর্থও যে তাহার অনেক বেশী ব্যাপকতর এবং গভীরতর সে বিষয়ে তো সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

এই প্রবন্ধে প্রথম স্তরের রাজনীতির কথাই বেশি বলিয়াছি। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যে ধরনের রাজনীতি করিতেন তাহার চরিত্র না বুঝিলে দ্বিতীয় স্তরের ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যাইবে না বলিয়াই প্রথম স্তর সম্পর্কে এই প্রবন্ধে এত কথা বলিলাম। কলিকাতা শহর ও বৃহত্তর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ ব্যাবর্তক গ্রামীণ পরিবেশে নিরক্ষর, নিরন্ন জনসাধারণের যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে আন্দোলন কোন অবস্থায় জন্মলাভ করিয়া কি ভাবে ব্যাপক গণপ্রতিরোধের আকার লাভ করিল, কাহার বিরুদ্ধে কি ভাবেই বা সে প্রতিরোধ

পরিচালিত হইয়াছিল, অবশেষে সে আন্দোলন কোন পরিণতি লাভ করিল, আগামী কয়েকটি সংখ্যায় সেই কাহিনী ক্রমান্বয়ে বলিবার চেষ্টা করিব।*

* **বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধ সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সাইন্সেস, কলিকাতা-র আমার গবেষণার সূত্রে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।**

১ আরামবাগের (হুগলী জেলা) গণ-আন্দোলনের নেতা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মুখে এই কথা অনেকবারই শুনিয়াছেন।

২ হেমন্তকুমার সরকার, 'দেশবন্ধুর অন্তরঙ্গগণ', "দৈনিক মাতৃভূমি", ১ আষাঢ়, ১৩৪৬।

৩ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ', কলিকাতা, ১৯২৬, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭২।

৪ উপর্যুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭১।

৫ "অমৃতবাজার পত্রিকা", ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ ও "বেঙ্গলী", ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

৬ প্রেরক : জে এ হারবার্ট, প্রাপক : লর্ড লিনলিথগো, ২০ মার্চ, ১৯৪০, ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস (আই ও আর), এম এস এস　ই ইউ আর এল/পি অ্যান্ড জে/৫/১৪৬।

৭ প্রেরক : হারবার্ট, প্রাপক : লিনলিথগো, ৭ মে, ১৯৪০, আই ও আর　এম এস এস　ই ইউ আর এল/পি অ্যান্ড জে/৫/১৪৬।

৮ প্রেরক : হারবার্ট, প্রাপক : লিনলিথগো, ৮ অক্টোবর, ১৯৪০, আই ও আর　এম এস এস　ই ইউ আর এল/পি অ্যান্ড জে/৫/১৪৭।

৯ প্রেরক : হারবার্ট, প্রাপক : লিনলিথগো, ২১ অক্টোবর, ১৯৪১, আই ও আর　এম এস এস　ই ইউ আর এল/পি অ্যান্ড জে/৫/১৪৮।

১০ প্রেরক : হারবার্ট, প্রাপক : লিনলিথগো, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৪১, আই ও আর　এম এস এস　ই ইউ আর এল/পি অ্যান্ড জে/৫/১৪৮।

১১ এম কে গান্ধী, 'সাম ইমপ্লিকেশনস', "ইয়ং ইন্ডিয়া"তে প্রকাশিত, ৬-২-১৯৩০, এবং "দি কালেকটেড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী" ৪২তম খণ্ডের (নিউ দিল্লী, ১৯৭০) অন্তর্ভুক্ত।

তথ্যের উৎস

উপরে কয়েকটি ক্ষেত্রে সূত্রনির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সে সামান্যই। সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে : (ক) সংবাদপত্র, (খ) সরকারী নথিপত্র, (গ) সরকারী প্রতিবেদন, (ঘ) বেসরকারী ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও (ঙ) প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ।

(ক) সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "বঙ্গবাণী", "আনন্দবাজার পত্রিকা", "অমৃতবাজার পত্রিকা", "বেঙ্গলী", "স্টেটসম্যান", "ফরওয়ার্ড", "লিবার্টি", "অ্যাডভান্স", "মুসলমান", "সার্ভেন্ট" ও "ক্যাপিটাল"। "ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার" নামে পরিচিত বাৎসরিক সংবাদ সঙ্কলনে নিবন্ধ রাজনৈতিক সংবাদের সংক্ষিপ্তসার (অনেক ক্ষেত্রে বিবরণও) তথ্য সংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে।

(খ) সরকারী নথিপত্রের মধ্যে নিয়মিতভাবে সঙ্কলিত "ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট" ছাড়া নিম্নলিখিত সূত্রগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে : 'জেটল্যান্ড কালেকশন—আই ও আর　এম এস এস　ই ইউ আর ডি ৬০৯' : 'বার্কেনহেড কালেকশন—আই ও আর　এম এস এস　ই ইউ আর ডি ৭০৩' : 'লিটন কালেকশন—আই ও আর　এম এস এস　ই ইউ আর এফ ১৬০' : 'ব্রাবোর্ন কালেকশন—এম এস এস　ই ইউ আর/এফ ৯৭ এবং পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সংগৃহীত তথ্যাদি।

(গ) ব্যবহৃত সরকারী প্রতিবেদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ১৮৭২ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত সংকলিত "সেন্সাস রিপোর্ট"সমূহ এবং বর্তমান শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে সংকলিত বাংলার বিভিন্ন জেলা সম্বন্ধে "ফাইন্যাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটলমেন্ট অপারেশনস"।

(ঘ) বেসরকারী ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে আছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কিছু কাগজপত্র ও বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায়ের কাগজপত্র। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাগজপত্র ও বিধানচন্দ্র রায়ের কাগজপত্র এখন নূতন দিল্লীর নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে রক্ষিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিরণশঙ্কর রায়ের কাগজপত্র দেখিতে পাইয়াছি শ্রীসূর্যশঙ্কর রায়ের সৌজন্যে।

(ঙ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, "এ নেশন ইন মেকিং", (কলিকাতা, ১৯২৫), পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৫।
পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, "লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ সি আর দাশ", (কলিকাতা, ১৯২৭)।
নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, "অ্যাট দি ক্রস রোডস", (কলিকাতা, ১৯৫০)।
দিলীপকুমার চ্যাটার্জি, "সি আর দাশ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল মুভমেন্ট", (কলিকাতা, ১৯৬৫)।
আবুল হাশেম, "ইন রেট্রস্পেকশন" (ঢাকা, তারিখবিহীন)।
রজতকান্ত রায়, "নন-কোঅপারেশন মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল", "দি ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ", "মাস্ ইন পলিটিক্স্" ১৯২০-২২।
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, "স্রোতের তৃণ", (কলিকাতা, ১৯২২), ২য় মুদ্রণ, ১৯৭২।
সুরেন্দ্রনাথ ধর, "দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন", (কলিকাতা, ১৩৪১)।
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি", (কলিকাতা, ১৯৬৩)।
প্রমথনাথ পাল, "দেশপ্রাণ শাসমল", ২য় মুদ্রণ, (কলিকাতা, ১৯৭২)।
বিমলানন্দ শাসমল, "স্বাধীনতার ফাঁকি", (কলিকাতা, ১৯৬৭)।
মহম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, "যুগবিচিত্রা", (ঢাকা, ১৯৬৮)।
আবুল মনসুর আহ্মেদ্, "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর", ২য় মুদ্রণ, (ঢাকা, ১৯৭০)।
মোমেন উমারিয়া, "মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল" খণ্ড ১১, সংখ্যা ৪, (ঢাকা, ১৯৭৪)।
বিমলানন্দ শাসমল, "দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র", "দক্ষিণী বার্তা", বিশেষ নেতাজী সংকলন, জানুয়ারি, ১৯৭৬।

আধুনিক ভাস্কর-প্রতীকে

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

এ জীবন ভেঙেচুরে মূল্যায়িত বোধের আকাশে,
নদী-বাঁক অথবা শহর নিয়ে নানা ইতিবৃত্তে ঘুরে
সম্পন্ন সংবাদ পায় ভাষা।
অথচ কালের ছেনি সর্বদাই উচ্চাবচ আঘাতে আঘাতে
প্রতিমাই গড়ে। প্রতিমার
আদিগন্ত ব্যাপ্ত চোখ ভূগোলে ভূগোলে খোঁজে
প্রয়াসের মূর্ত রূপ মানুষের ঊর্ধ্ববাহু দেহে।
এইসব অমোঘ শিল্পে বার বার কেটে কেটে গড়া
বিশীর্ণ গ্রামের শরীর আর অফুরন্ত বনজ উল্লাস—,
পোড়ো ভিটে কাঁটাবন, পোকালাগা ফলের বাগান,—
অমৃত পাখির গান দূর থেকে দূরান্তরে এখনও অঢেল—
মজা নদী ভাঙা বাঁধ, রৌদ্রের রন্ধনে তপ্ত ফুটি-ফাটা মাঠ
অথবা নির্জন পাহাড়ী বাংলো,—উঁকিমারা পাহাড়ের
চূড়াটা কী নীল!
জানলাভাঙা ঘরে ঘরে প্রয়াত কাহিনীছায়া
কবুতরী আলাপে বিভোর।
অথবা হঠাৎ বন্যা প্লাবনে বিপ্লবে রক্তে ক্ষয়ে অবক্ষয়ে,
মূল্যবান যোগে বা বিয়োগে,
সর্বদাই মগ্ন সেই শিল্পপ্রতিভাসে।
তাই তো এ জীবন, দেশ, মানুষের চিত্রপরিবেশ
এ কালের চালচিত্রে শিল্পে রঙে ব্যাপ্ত দিকে দিকে,
আধুনিক ভাস্কর-প্রতীকে॥

প্রত্যাবর্তন

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এসেছিলাম
কিন্তু না পেয়ে যাচ্ছি ফিরে
যাচ্ছি তিমিরে।
সূর্য বহুক্ষণ ছিল
সকাল মধ্যাহ্ন জুড়ে ছিল
ছোট বড় মানুষের ছায়া
সাগ্রহ শরীরে ছিল মায়া,
পিতামহের মতন
মাথায় পল্লব ছুঁয়ে
বৃক্ষটি করেছে আশীর্বাদ;
তারপর যখন
শিশুটি বালক হলো
বালক কৈশোরে এলো
কিশোর যুবক হতে হতে
চোখে ঠোঁটে প্রাপ্তবয়স্ক ব্রতে
শরীরের সীমানা বাড়ালো,
অকস্মাৎ তার সব ক্ষুধা, যাপনের স্মৃতি
কেড়ে নিল ধীমহি ধরিত্রী!

এসেছিলাম
না পেয়ে যাচ্ছি ফিরে
যাচ্ছি তিমিরে,
এবং বাসনা
আর ফিরে আসবো না
সন্ধ্যার পাখির মতো
জননী-লাবণ্য ছিঁড়ে চীৎকৃত জন্মের মতো
বাচস্পতি মানুষের মিথ্যা ম্লান
নোংরা লোভের কাছে
কেন ফিরবো গরিব একাকী,
জন্মান্তর মাঠের সমান কোন
পারাপার নাকি!
অনেক সন্ন্যাসী চলে গেছে
অনেক তীর্থের ধুলো সমাজে এসেছে,

সিন্দুরের শিরোধার্য রঙ
গৃহপালিত পাথরে
অন্যায় রমণে গেছে ঝরে,
তবু কারো সান্ধ্যশঙ্খে
জন্মের পদবী আজো বেজে উঠলো না!
শুধু পাতারা হলুদ হয়ে এলো,
তার শেষ ঝরে পড়া
পিঁপড়ের ভূগর্ভসমাজে হলো
খুবই আলোচনা।

নদীটিও নারীর সঙ্গে
মেতেছিল যৌথ উৎসবে
সাতটি রঙের রঙ্গে
ধ্যানের সৌরভে
এসে মিশেছিল শব্দ, ধ্বনি;
ভালবাসা তোমাকেও আমি
ঐ নীল প্রতিভায় মেলাতে চেয়েছিলাম একদিন!
সেই সক্রিয় জলজগন্ধ
কবিতার মতো অন্ধ
উদ্দাম মাংসের পরিশেষ
সামান্য ঝড়ের নিচে
হঠাৎ তড়িতাহত দেশ!
অধীর সর্বাঙ্গ জুড়ে উঠল খাঁটি
জেলা, গ্রাম, পরগনার মাটি।
মনে হলো একমুঠো ধুলো
তাও তো স্বদেশ,
মৃত্যু, প্রজনন, সবই আমার নিজের আলো
অথবা নিজেরই কালো
শুরু কিংবা শেষ,
আমি শুধু স্পর্শহীন, আমি কেন ছুঁই না কাউকে?
মৃত কিংবা আকাশের স্থায়ী শীতাংশুকে।

এসেছিলাম
কিন্তু না ছুঁয়ে যাচ্ছি ফিরে,
আমার অর্জিত ধ্বনি এখনো আলাপবন্ধ
বীতকাম শব্দের শরীরে;
তাই সে এখনো প্রতিদিন
উষায় উদয় দ্যাখে, ফুল দেখলেই বার বার

নিতে চায় রৌদ্রের হিসাব
(কতোটুকু ক্ষতি হলো কার!)
চায় কিছু ছন্দোবদ্ধ ক্ষমা,
যে ক্ষমা এখনো নতিহীন
যে ক্ষমা শিশু ও বালক কিংবা লিপ্সু যুবক
অক্ষরেরও বড় অহংকারে নরকরোটির মতো
বিষণ্ণ চিতার পাশে আছড়ে আছড়ে ভেঙেছিল।
চেয়েছিল
মৃত্যুর পরেও কিছু স্পষ্ট শব্দ হোক
শব্দই অন্তিম ব্রহ্ম
শব্দই কুহক!
নদী, গাছ, গুল্ম আর মানুষকাহিনী ভরা
প্রাণী-পৃথিবীর কাছে সশরীরে
তাই তো এমন এসেছিলাম,

না পেয়ে যাচ্ছি ফিরে।

অথচ

তুলসী মুখোপাধ্যায়

গাধার ডাকের মতো কারো হাসি গায়ে এসে বেঁধে
কারো কথা বিষের মতন মনে হয়
ভদ্রাসন জ্বলে ওঠে কারো নৈতিকতা দেখে
কারো বা জীবনভাষ্যে শরীর গুলিয়ে বমি আসে......
জন্মাবধি এরকম আরো কতো হাজার সমরে
অনিবার্য কারণবশত আমরা লিপ্ত হয়ে পড়ি—
রোজ লিপ্ত হয়ে পড়ি
সংগ্রাম কমিটি করে ছুঁড়ে দিই যুদ্ধঘোষণা!
ক্রমশ দেয়াল ওঠে আমাদের চারদিকে, ভীষণ দেয়াল
দারোয়ান চৌকি দেয় বন্দুক উঁচিয়ে, কঠিন বন্দুক
কিছু কিছু প্রবেশপত্র বাতিল হয়, দারুণ বাতিল!

অথচ, হায় অথচ, কেবলমাত্র পোষ্য হলেই
যে কোনো কুকুর আমরা কোলে করি পরম সোহাগে
যে কোনো বেরাল নিয়ে তুলতুলে গালে চুমু খাই।

ভালো কি থাকা যায়

ফিরোজ চৌধুরী

কার্নিশহীন কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি
বুকের মধ্যে অনর্গল কড়ানাড়ার শব্দ
কোথায় পালাবো
পৃথিবীর বয়সী একমাত্র আলো তুমি ধরে আছো
তবু মনে হয় এই আছে এই নেই কেমন স্বপ্নমধুর

ভালো কি থাকা যায় কোথাও কোনোদিন
তবু যতটুকু ভালো থাকা যায়
প্রেমে অভিমানে দিন যায় এরকমই যায়
ভালো কি সত্যিই থাকা যায়

তবু স্বপ্নের ভিতর তুমি এক আলোকিত উদ্যান
কোনো দেবশিশু আভাময় হেঁটে যায় বড় কাছাকাছি
প্রতিশ্রুত সমুদ্রযাত্রা বুকের ছিলায় টান ধরে
এবং তোমার ঝরনাময় শরীর বেয়ে গড়ে ওঠে বিদ্যুৎ
আর সেই দহনে নিরন্তর জ্বলতে থাকে ত্রিভুবন

ভালো কি থাকা যায় কোথাও কোনোদিন
তবু যতটুকু ভালো থাকা যায়

বিভাবরী

দিনেশচন্দ্র রায়

বাড়িতে দিলীপদাকে সহজেই পাওয়া গেল। সব শুনে দিলীপদা বলল,—প্রাণেশদা ছাড়া এ ব্যাপারে ডিসিশন পাওয়া মুশকিল। প্রাণেশদা প্রেসারের রুগী, তাঁকে এত রাতে জাগানো যাবে না। দিলীপদা বেণুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নটা যেভাবে হেলাফেলা করে দেখল তাতে দীপু এবং দেবু দুজনে একটুও সন্তুষ্ট হল না। বেণু এ ব্যাপারে অবশ্য কোন কথাই বলেনি, তার প্রতিক্রিয়াও বোঝা গেল না।

—দিলীপ ব্যাটা লেপের তলে ঘুমানোর জন্য তাল করছে, এই এত রাতে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল, দীপু মনে মনে ভাবল। বেণু এই সময়ে নিজেকে ভীষণভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ভেবে নিল; সে ভাবল, দীপু অথবা দেবু যদি নিজে থেকে না বলে তবে ওদের বাসাতে আজকে রাত কাটাবার কোন প্রশ্নই নেই। নিজের আস্তানাতে ফিরে যাবার মতো সাহসও আমার নেই। ঠিক আছে, স্টেশনে চলে যাব। ওয়েটিং রুমে বলে-কয়ে রাত কাটাব।

দেবু ঠিক এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ বলল,—ঠিক আছে, আজকের মতো রাতটা তুই কোনক্রমে কাটিয়ে দে। কাল সকালে যা হয় করা যাবে। দীপু বরং বাড়িতেই ফিরে যা। জিজ্ঞাসা করলে একটা যা হয় গোঁজামিল দিস। আমি বাড়ি চললাম, আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে। দেবু তাদের ছেড়ে একটা শর্টকাট রাস্তাতে বাড়ির পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ধকার ঠান্ডাতে স্থাণুবৎ বেণু আর দীপু চুপচাপ সেই খোলা রাস্তাতে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ আকাশ, বাতাস, রাস্তা—সব কিছু মুছে গেল। এমনি পরিস্থিতিতে দীপুই প্রস্তাব দিল,—চল, প্রাণহরির বাড়িতে যাই, অন্তত ওকে খুলে বললে কিছু একটা হতে পারে।

—দেবুটা মাঝে মাঝে এমন সব কান্ড করে যে সত্যি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখাটা মুশকিল, বেণু কথাটা শেষ করে দীপুর প্রতিক্রিয়ার জন্য চুপ করল, কিন্তু দীপু চুপচাপ প্রাণহরিদের বাসায় যাবার জনশূন্য অন্ধকার গলিটা পার হতে লাগল। দীপুর হঠাৎ মনে হল যে বিভাবরীদের বাড়ির প্যাসেজের আলো নিভে গেলে ঠিক ঠিক এই গলিটার মতো নির্জন এবং অন্ধকার হবে। বেণু দীপুর কাছ থেকে কোন সমর্থন না পেয়েও বকবক করতে লাগল,—দেবু যখনই যা করে সেটা নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য। গতকাল দুপুরে রাতে আমাকে খাওয়ানোর জন্য ছুটে আসাটাও এমনি একটা মনস্তত্ত্ব মাত্র। আমার দারিদ্র্য আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি কারও অনুকম্পা চাই না।

—কিন্তু দেবু হঠাৎ এমনি চলে গেল কেন বুঝতে পারলাম না, দীপু ফিসফিসিয়ে বলে উঠল।

—কারণ নিজের প্রোভাইসের ব্যাপারটা পাকা করার জন্য জীবনগতির সঙ্গে ও সোজাসুজি সংঘাতে যেতে চায় না। নিজের নিরাপত্তার জন্য ও চিরকালই ভীষণ সজাগ, বেণুর কথাতে ঝাঁঝ ফুটে উঠল।

—সেটা বোধ হয় ঠিক নয়।

—নয় মানে? গত বছর চড়ুইভাতিতে গিয়ে সেবকে লোকাল মাস্তানদের সঙ্গে গোলমালের সময় আমাদের বিপদে ফেলে ও কেমন কেটে পড়েছিল তা তোর মনে নেই?

—ছেলেটা খুব মুডি।

—ওরকম মুডের নিকুচি করি।

প্রাণহরি তখনও শোয়নি, একটা নাটকের জন্য পার্ট মুখস্থ করছিল। প্রাণহরিকে ডাকতেই ও উঠে এল, ওদের ডেকে নিয়ে ঘরে বসাল, তারপর সব শুনে বলল,—তোরা দুজন বোস, আমি এখনই সাইকেল নিয়ে জীবনগতির বাড়ি যাচ্ছি। প্রাণহরি একটা চওড়া মাফলার দিয়ে কানমাথা জড়িয়ে নিল, তা না হলে সাইকেল চালালে ভীষণ ঠান্ডা লাগবে। প্রাণহরি বেরিয়ে গেলে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দীপু এবং বেণু আরাম করে বিছানার ওপর বসল।

ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে প্রাণহরি ফিরে এল, হেসে বলল,—সব ঠিক হয়ে গেছে। সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি থেকে কী-সব যা-তা ব্যাপার ঘটে। চল, স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানটা সারারাত খোলা থাকে, একটু চা খাওয়া যাবে। চা সিঙাড়া খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে ডেরার দিকে যেতে যেতে বেণু এলিয়টের ফাঁপা মানুষটা আবৃত্তি করল। দীপু ঠিক করল আজকের রাতটা বেণুর আস্তানায় কবিতা শুনে এবং পড়ে কাটিয়ে দেবে।

তিন

—দাদার ঝোঁক এখন এল পি আর নতুন নতুন বিলিতি রেকর্ডে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিভা একটু হেসে আস্তে আস্তে বলল।

—লংপ্লেয়িংটা তো ঐ সাহেব ছেলেটা দিয়েছে না রে? একমুঠো বাদাম মুখে পুরে রেবা চায়ের কাপটাতে চুমুক দিল।

—হ্যাঁ, সাহেব ছেলেটা এখন দাদার ভীষণ বন্ধু। এত অল্প বয়সে ও বিশেষজ্ঞ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এদেশে এল কী করে বুঝি না। বিভা খুব আলতোভাবে কথাগুলো বলল, রেবার পক্ষে প্রথমে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া মুশকিল হল যে বিভা তাকেই উদ্দেশ করে কথাগুলো বলছে। রেবা কোন জবাব দিল না, খুব মন দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। বিভা রেবার কোন মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বলল,—দেখবে, আর একটু পরেই ছেলেটা এসে যাবে। রেবা ভাবল, ছেলেবেলা থেকে আমরা এক পাড়াতে থাকি, একসঙ্গে লেখাপড়া করি, কিন্তু তবু বিভা আমাকে তুই বলে না। এই ভাবনাটা শেষ হবার পরেই রেবার মনে আরও অনেকগুলো অনুযোগ একসঙ্গে মাথাচাড়া দিল। রেবা ভাবল, বিভার চলাফেরা-কথাবলার মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য বিভা সব সময়েই নিঃশব্দে জিতে যায়। অথচ রেবা গান গায়, বক্তৃতা করে, ইউনিয়ন করে, বিভা এসব কিছুই করে না, তবু বিভার দিকেই সবার লক্ষ্য। যে বিদেশী যুবক বিশেষজ্ঞ এবং বিভার দাদার কথা আলোচনা হচ্ছিল রেবার মন থেকে সেই প্রসঙ্গ একেবারে উধাও হল। রেবা ভাবল, অনার্স ক্লাসে মাস্টারমশায়রা পর্যন্ত বিভাকেই সব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিভাই যেন সবকিছুর শেষ কথা। রেবা বিভাবরীর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল। একটু চাপা রং, মাথায় অপর্যাপ্ত চুল, খুলে দিলে হাঁটু ছাড়িয়ে পড়ে, এখন সন্ধ্যার আগে বিরাট খোঁপা, সোজা নাকের নিচে একটু পুরুষ্টু ঠোঁট এবং ঠোঁটের রংটা মুখের রঙের চেয়ে কালচে। চোখ দুটো আয়ত। কিন্তু গভীর; স্নিগ্ধ, সুশীল। বিভাবরীর দু চোখের দৃষ্টিতে কোন নিষাদহত পাখির চোখের কপোতাক্ষতুল্য তন্ময়তা ক্ষেপণ করে। রেবা চোখ নামিয়ে চায়ে চুমুক দিল। বিভা ততক্ষণে পুরো দুমুঠো মুড়িবাদাম খেয়ে কী ভাবতে ভাবতে আরাম করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। হঠাৎ রেবাই এই নীরবতা ভেঙে বলল,—জানো, বেণু তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছে?

—কোথায়?

—স্ফুলিঙ্গ নামে একটা কাগজে।

—কী লিখেছে?

—সেইসব উদ্বাস্তুরা যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে এপারে এসেছে, হয়তো কোন উদ্বাস্তুশিবিরে আছে, তাদের মনে ভদ্রাসনের স্মৃতি তোমার দু চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।

—মরি! মরি!

—ভাবছি তোমার এত সুন্দর চুল, সেটা বেণুর চোখে পড়লো না কেন?

—একসঙ্গে এত উপমা কোথায় খুঁজে পাবে? আপাতত দুচোখ নিয়ে লিখেছে, তারপর জুতসই উপমা খুঁজে পেলে আমার চুল নিয়ে লিখবে।

—মনে মনে তুমি খুশি হওনি?

বিভা রেবার একথার কোন জবাব দিল না। বাইরের বারান্দা থেকে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে বিভা উঠে গেল। বিভা দেখল, দাদার বন্ধু সেই সাহেব ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। এলোমেলো চুল, রঙীন একটা গেঞ্জি গায়ে, পায়ে হাওয়াই চটি। নিজের কোন যত্ন নেয় না। বিভা দাঁড়াতেই অনুচ্চ কণ্ঠে উইশ করে ছেলেটি সোজা প্যাসেজ পেরিয়ে বাঁয়ে দাদার ঘরে ঢুকে গেল। বিভা আবার বারান্দার দক্ষিণ কোণে রেবার কাছে ফিরে এল।

সন্ধেবেলাতে আজকাল কেমন পাগলাটে হাওয়া ওঠে। ধুলো ওড়ে। অনেকদূরে-বিয়ে-হওয়া কিশোরী মেয়ে সন্ধ্যাবেলা নিজের মা-বাবার জন্য মন খারাপ করে জানলাতে দাঁড়িয়ে দেখে সন্ধ্যা নামছে,—শেষশীতের সন্ধ্যাবেলাতে এই এলোমেলো বাতাস উঠলেই বিভার চোখের সামনে এই চিত্রটা ফুটে ওঠে। আকাশে একটা ধুলোর আস্তরণ। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এমনি চলবে। রেবা বৈষ্ণব-পদাবলীর একটা নোট লিখল এতক্ষণ ধরে, তারপর বলল,—আজ চললাম। আগামীকাল এগারোটা দশ থেকে ক্লাস। আমি এসে ডাকব, না তুমি ডাকবে?

—তুমিই এসো, গেটের সামনে ঠিক সময়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকব।

রেবা শীর্ণা, ঠোঁটের গঠনে সামান্য একটু চাপা মঙ্গোলীয় ছাপ আছে, উচ্চতাতেও অনেক ছোট বলা যায়, চোখে জোরালো পাওয়ারের চশমা। রেবা সাদা জমিনে লাল-ফুল-তোলা একখানা সুন্দর শাড়ি পরেছে। ও প্রতিদিন সন্ধ্যায় নানান সুগন্ধি মাখে।

সরস্বতীপুজো আর সাতদিন পরে। হ্যাঁ, ঠিক আর এক মাসের মধ্যেই বাগানে বেলফুল ফুটবে। বিভা কথাটা ভাবতেই একটু খুশি হল; খুব একটা ঝড়বৃষ্টি এই সময়ে হবেই হবে, তারপর বেলফুলের গন্ধে ম-ম করে উঠবে সন্ধ্যাগুলো। সামনে এত আশা, বর্ষণপ্রত্যাশা এবং বেলফুলের গন্ধে আকুল সন্ধ্যার ভরসা যে রেবা চলে যাবার পর বিভা কোন বিচ্ছেদব্যথা অনুভব করল না। বাইরের কলটা দিয়ে জল পড়ছে, বিভা বাঁদিকে ঘুরে কলটা বন্ধ করল, কিন্তু জল পড়ার শব্দে বৃষ্টি একদিন না একদিন আসবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হল। খুশি হবার ধারাবাহিকতাতে কোন বাধা না পড়ায় সাহসী বিভাবরী সেই ছোট স্থির চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়াল। জোরালো আলোতে সঞ্চরমাণ মাছগুলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চৌবাচ্চার তলা পর্যন্ত মাছগুলো সোজা নেমে গিয়ে ঘাই মেরে আবার উপরে উঠে আসছে। বুদ্বুদে বুদ্বুদে হঠাৎ সেই স্থির চৌবাচ্চার উপরিভাগে তোলপাড় শুরু হল। জল—টলটলে জল, তাতে মাছগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিভাবরীর মুখের প্রতিচ্ছবি বুদ্বুদে এবং মাছের লেজের আঘাতে তোলপাড় জলে ভেঙে ভেঙে গেল। বিভাবরীর মুখ সতীদেহের মতো টুকরো টুকরো হয়ে আবার একসময়ে চিত-করে-শোয়ানো আয়নাতে জোড়া লাগল। ক্ষণেকের জন্য দ্বিধাবিভক্ত দেহ স্বাভাবিক অবস্থাতে ফিরে আসার পর বিভাবরী তার নিজের ধবধবে বিছানার কথা ভাবল। অনেকগুলো শাঁখ বাজলো আশেপাশে। একটু দূরেই শহরের কেন্দ্রস্থল। সেখানে মাইকের ঘোষণা, মিছিলের স্লোগানের কোলাহল তুমুল। কিন্তু সেই পরিত্রাহি চিৎকার ছাপিয়ে

অনেকগুলো উলুধ্বনি শুনতে পেল বিভা।

—রেবার মনে একটা কমপ্লেক্স আছে, কারণ ওর বাবা মুহুরী। বাতাস জোরদার হল। ভারি তসরের শাড়ি, খাঁটি ঘিয়ের হলদেটে রং, জিয়াগঞ্জ থেকে মামা দিয়েছে, এত বাতাসেও বেপথু হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু ডানহাত দিয়ে আলতোভাবে শাড়িটার ভাঁজগুলো একবার সাপটে নিল বিভা। আমার বাবা ধনী, পৈতৃক সূত্রেই ধনী। কিন্তু বাবা একটা মানসিক গোলমালের শিকার হয়েছেন। ছোট বোনটা জন্মাবার পর থেকে বাবা ক্রমশ গম্ভীর হতে শুরু করেন। প্রথমটা কিছুই বোঝা যায়নি। শুধুমাত্র কথাবার্তা একটু কম বলতে শুরু করেন, ইজিচেয়ারে বসে-বসে কী যে ভাবেন। কিন্তু বিরাট সম্পত্তির তদারকি করা, হিসাবপত্র পরীক্ষা করা—সবকিছু বাবার নখদর্পণে। বছর দুয়েকের মধ্যে বাবা প্যাসেজের লাইব্রেরি ঘরে একদম একা-একা থাকতে শুরু করলেন। বাবার দৈনন্দিন রুটিনে তার জন্য কোন পরিবর্তন হল না। বাহ্যিক স্বাভাবিকতা একেবারে মেশিনের মতো নির্ভুলভাবে বজায় থাকল। আজকাল বাবার সঙ্গে সামান্যই কথা হয়। নিজেদের টাকা-পয়সার চাহিদা, অন্যান্য প্রয়োজন কাগজে লিখে বাবার ঘরে পাঠিয়ে দিতে হয়। দাদাও চুপচাপ। শুধু নতুন নতুন জামাকাপড় বানাচ্ছে। রোজ ফুলবাবু সেজে কোঁচানো ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবি গায়ে এসেন্সের গন্ধে চারিদিক মাতিয়ে দাদা পুরো একান্ন আর বাহান্ন সাল কাটিয়ে দিল। তখন এই শহরের ব্যাঙ্কেই কাজ করত। বাহান্ন সালের শেষে দাদা কলকাতা বদলী হবার পর সমানে পাথর ধারণ করা শুরু করল। লাল নীল সবুজ সাদা—নানা রঙের পাথর গলাতে, মাজাতে, আঙুলে ধারণ করত। সেই সময়েই দাদা ধুতিপাঞ্জাবি ত্যাগ করে এবং পুরোপুরি সাহেবী পোশাকে আসক্ত হয়। কিছুদিন যেতেই পাথরের ম্যানিয়া চলে গেল কিন্তু প্যান্ট-কোট-টাই-জুতোর ঘটাপটা বেড়ে গেল। মাঝখানে প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা, বইএর প্রথম সংস্করণ এবং দেশ-বিদেশের নানারকম তাস সংগ্রহে দাদা কিছুদিন মেতে রইল। আপাতত এই সাহেব ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বিদেশী গায়কদের রেকর্ড সংগ্রহ দাদার নতুন শখ। বাহান্ন সালের শেষে দাদা কলকাতা থেকে বদলী হয়ে আবার এই শহরে ফিরবার সময় ট্রেনে দাদার সঙ্গে সাহেবের আলাপ। সাহেব শহর থেকে একটু দূরে একটা সরকারী ফার্মে কী-সব যেন লোকজনকে শেখায়। দাদার কোনদিন বন্ধু ছিল না, দেখা যাক, এই বিদেশী ছেলেটার সঙ্গে ওর কতদিন বন্ধুত্ব থাকে।

জলের দিকে তাকিয়ে থেকেই বিভা বুঝল সাহেব বেরিয়ে গেল। সাইকেল ঠেলে গেট খুলে এবং তারপর গেট বন্ধ করে বাইরে চলে গেল। দাদার ঘরের একটা চড়া গানের রেশ এই ঝোড়ো হাওয়াতেও শোনা যাচ্ছে। নিঃসঙ্গ নির্জন ছোট্ট চৌবাচ্চার পাড়ে দাঁড়িয়ে বিভার হঠাৎ কপালকুণ্ডলার কথা মনে হল। একটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে, তা না হলে টিউটোরিয়ালে আগামীকাল বরেনবাবু ভীষণ বকবেন।

বিভার ঘরটা পরিচ্ছন্ন করে সাজানো। দক্ষিণদিকে দুখানি খাট। পাশাপাশি নয়, অনেকটা ফাঁক-ফাঁক। দুটো খাটের মধ্যে অন্তত দুজন লোক পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। মাথার কাছে একটা ছোট্ট টেবিলে অনেকগুলো তাজা গাঁদা, শেষ বাজারের বেশ বড় সাইজের গাঁদা। উত্তরের দিকে বইয়ের শেলফ, টেবিল চেয়ার, জামা-কাপড়ের আলমারি। দুবোনের এই ঘরটা—তার ছোট বোন প্রভা অর্থাৎ প্রভাবতী একটু অগোছালো। বিভা মনে মনে চায়, কেউ না কেউ ঘরটা অগোছালো করুক। বিভা জানে প্রভা চেষ্টা করলেও ঘরটা তোলপাড় করতে পারবে না। সারাদিন পুতুল নিয়ে খেলে এখন অবেলাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। যদি প্রভা না পারে তবে আর কে অগোছালো করবে? ছেলেরা নাকি আপনভোলা হয়। ঘরে ঢুকে সবকিছু সাজানো-গোছানোর ব্যাপার এলোমেলো করে দেয়। দাদাটা নিজের ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও এক পাও দেবে না। অথচ আমাদের সাবেকী বাড়ির চারিদিকে ভুঁই-

চাঁপা ফুটেছে; বাতাবিলেবুর গাছে ঝেঁপে ফুল এসেছে, মুকুলের ভারে আমগাছগুলো যেন ভেঙে পড়বে। সন্ধ্যাটা কৃষ্ণসার মৃগীর মতো সুবাসে স্বর্গমর্ত আমোদিত করে ছুটে চলেছে। এমনি সময়ে এ ঘরে কেউ দাপাদাপি করুক, সিগ্রেট ফুঁকে যেখানে সেখানে ফেলুক, খুব জোরে হেসে উঠুক, ময়লা পা নিয়ে বিছানার ঢাকনি নোংরা করুক। এই ঘরের স্থিতিস্থাপকতার ওপর বিভার একটা ঘেন্না ধরে গেল। কিন্তু প্রশ্নোত্তরটা লিখতেই হবে। বিভা ভাবল, খেয়েদেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত প্রশ্নটা লিখব। আপাতত একটু বসেই থাকি।

—দিদি, বাবুর ঘরে খাবার দেব কি? ঠাকুর এসে জিজ্ঞেস করল।

—বাবা কি ফিরেছেন?

—হ্যাঁ, ফিরে খাবার দিতে বললেন।

—খাবার দিয়ে দাও।

বিভা জানে প্রভাসচন্দ্র এই রাতের আহারের সময়ে প্রভাকে এবং বিভাকে তাঁর সামনে উপস্থিত দেখতে চান। উপস্থিত না থাকলে তিনি কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলবেন না। উপস্থিত থাকলেও খুব সামান্য দু-একটি কথা, যা সব সময়েই ব্রাহ্মসুলভ পরিশীলনে মার্জিত। ঠাকুর চলে যাবার পর বিভা প্রভাকে খোঁচাতে এবং ঠেলতে আরম্ভ করল। কেউ যখন কিছু করবে না তখন গোলমালটা একা-একা আমিই করব, প্রবল অভিমানে একটু বেশি চ্যাঁচামেচি করেই বিভা প্রভাকে ঘুম থেকে তুলল। প্রভা উঠে বসল, তখনও চোখ বোজা; একটু বা সর্দি লাগবার জন্য মুখ খুলে নিশ্বাস নিচ্ছে। প্রভাকে কোলে নিয়ে বারান্দার ট্যাপ খুলে নিজের হাত ভিজিয়ে ছোট বোনের মুখ সাপটে দিল বিভা। এবার প্রভা পুরো জেগে উঠল, কাঁদা-কাঁদা স্বরে বলল,—দিদি, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

—চল, বাবার খাওয়ার সামনে বসি, তারপর তুই আর আমি দুজন রান্নাঘরে খেয়ে নেবো।

প্রভাসচন্দ্র খাবার টেবিলে চুপচাপ বসে ছিলেন। বেশ লম্বা মেদবহুল দেহ। মুখখানা ভারি, বিরাট ঝোপের মতো গোঁফ। কাঁচাপাকা চুল, সিঁথি মাথার মাঝখান দিয়ে। ইতিহাসের এম এ এবং আইনের স্নাতক। যখন নিজের ব্যবসা দেখাশোনা করা ছাড়াও ওকালতি শুরু করলেন তখন সবাই সেই উজ্জ্বল যুবকের দিকে চেয়ে থাকত। প্রভাসচন্দ্রের চোখের দৃষ্টিতে কোন সঠিক ভাষা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। চোখ দুটো নির্জ্ঞানের মধ্যে ডুবে গিয়ে আবার জ্ঞানের মধ্যে ফিরে আসে। বিভা প্রভাকে কোলে নিয়ে যখন ঘরে ঢুকল, তখন অনেকক্ষণ ধরে চোখ টেনে তুলে প্রভাস তাঁর দুই মেয়েকে দেখতে লাগলেন। তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখে একটা আলো দেখা দিল। তিনি একভাবে দুই মেয়েকে দেখলেন। মোটা ঠোঁটটাতে ফাটা-ফাটা দাগের মধ্যে হাসির প্লাবন এল। ঠোঁটের ফাটা অংশগুলো ভরে উঠতে লাগল। বৃষ্টির জল যেমন করে সূর্যতাপে ভাজা-ভাজা হওয়া মাঠের ফাটা অংশে প্রবেশ করে মাটিকে নরম করে তোলে এবং ফাটা দাগগুলো মিলিয়ে দেয়, তেমনি-ভাবে সেই মৃদু হাসিটা প্রভাসচন্দ্রের পুরুষ ঠোঁটের ফাটা দাগগুলোকে মিলিয়ে দিল। ছোট মেয়ের মুখের দিকে প্রভাস বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সেই সেকেলে শ্বেতপাথরের গোলটেবিলের ওপর কাঁসার থালাতে ঠাকুর ভাত দিয়েছে। বাঁপাশে লবণ, দুটো কাঁচালঙ্কা, একফালি লেবু। থালার চারপাশে পাঁচটি কাঁসার বাটি। একটা বাটিতে বড় সাইজের দুখানা বোয়াল মাছের টুকরো, বেগুন আর বড়ি দিয়ে গা-মাখা-মাখা ঝোল। বাকি চারটি বাটিতে ডাল এবং নানাপ্রকার নিরামিষ তরকারি। শেষ বাটিতে একটু ক্ষীর। ছোট মেয়ের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে ভাতের থালার দিকে তাকালেন প্রভাস। মনে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে পাতে হাত দিতে তিনি যেন সাহস পাচ্ছেন না। দুবার এমনি প্রভার মুখ আর থালার দিকে চোখ ওঠানামা করবার মাঝখানে একবার প্রভাসচন্দ্র নিভে গেলেন। মাথা ঝুলে

পড়ল, নিচের ঠোঁটটা টিকটিকির লেজের মতো তিরতির করতে লাগল। মিনিটখানেক এমনিভাবে থেকে আবার তিনি চোখ মেললেন, বড় আর ছোট দুই মেয়েকে দেখতে লাগলেন, এবং প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে ভাতে হাত দিলেন। নিরামিষ তরকারি শেষ করে মাছে হাত দেবার আগে আবার প্রভার দিকে পূর্ণ সজ্ঞান দৃষ্টিতে তাকালেন। একটা মিচকি চাপা হাসিতে তাঁর চোখ মুখ এবং ঠোঁট ভরে উঠল। নিচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল, তিনি কাঁপা-কাঁপা, ভাঙা কণ্ঠস্বরে আস্তে বললেন,—খুকু, তোদের সেই ছোট নদী কবিতাটি একটু আবৃত্তি কর তো। আরও কিছু তিনি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু একটা অ্যাঁ-অ্যাঁ শব্দে তাঁর কথাগুলো ডুবে গেল। থালার ওপর হাত রেখে তিনি স্থাণুবৎ বসে রইলেন। প্রভা কিছুটা যান্ত্রিকভাবে ঘুমঘুম গলাতে আবৃত্তি করল সামান্য কয়েকটা লাইন। কাতরানো গোছের শব্দটা। ততক্ষণে থেমে গেছে।

—বিভা, তোমার পড়াশোনা ঠিকমত চলছে?

—হ্যাঁ, বাবা।

—তোমাদের কাপড়চোপড় শখের জিনিস কেনার জন্য তিনশো টাকা বাক্সে রেখে দিয়েছি, যাবার সময় নিয়ে যেও।

বিভা চুপ করে রইল। সে জানে বাবা মায়ের মধ্যে দুবার অন্তত এমনি টাকা তুলে তাকে দেবেন। কারণ অবচেতনভাবে বাবা বোঝেন যে মাতৃহীনা বিভা আর প্রভাকে দেখবার কেউ নেই। তাই তিনি চেতনায় ফিরে এলে তাদের জন্য একটু বেশি করে কর্তব্য করতে চান। বিভা প্রতিবাদ করে না, কারণ বিভা জানে যে এটা একটা বাবার মানসিক শান্তি পাবার পদ্ধতি।—খোকাকে বিয়ে দিতে হবে। বিভা, তুমি চেষ্টা কর। খুব ভালো একটা মেয়ে, যে তোমাকে অন্তত চেনে জানে, তোমার বন্ধু হলে ভালো হয়। বিভাবতীর মনে একমুহূর্তের জন্য রেবার মুখটা ভেসে উঠল, কিন্তু তার পরক্ষণেই মুখটা সরে গেল। বিভা বুঝতে পারল সে রেবাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করল।

রেবার ঘর একটু আলাদা। রেবাই তাদের বাড়ির একমাত্র এবং প্রথম যে বি এ অনার্স পড়ছে। সেইজন্যই এ বাড়িতে রেবার আলাদা একটা সম্মান। রেবার বড় দু ভাই চা-বাগানে কাজ করে। তারা তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে বাগানেই থাকে। তৃতীয় ভাইও রেবার চেয়ে অনেক বড়, সে কন্ট্রাকটারি করে। তাতে প্রচুর পয়সা করেছে। পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন দোতলা তুলেছে। রেবার বাবার অনেক বয়স কিন্তু এখনও মুহুরিগিরি করার জন্য কোর্টে যান। রেবার মা নেই। রেবার তৃতীয় দাদার কোন সন্তানসন্ততি নেই। বউদি শান্তশিষ্ট মানুষ। বাড়িতে ঠাকুরচাকরের ঢালাও ব্যবস্থা। রেবার কন্ট্রাকটার দাদার নাম শান্তি। শান্তি রেবার জন্য খুব গর্বিত। সে চায় রেবা পড়াশোনাতে আরও উন্নতি করুক। শুধু তাই নয়, রেবার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুতে না বেরুতে শান্তি সেটা পূরণ করে। রেবার যাতে পড়াশোনার কোন ক্ষতি না হয় এবং তার কাছে অধ্যাপক এবং অন্যান্য অতিথিরা নানা কাজে যাতায়াত করতে পারে সেইজন্য শান্তি দোতলাতে রেবার এবং বাব্যর জন্য দুখানি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঘর করে দিয়েছে। রেবার ঘরখানা খুব বড়। মাঝখানে একটা বেতের সেট পাতা। একপাশে বইপত্তর রাখবার জন্য ঝকঝকে নতুন সেলফ এবং আলমারি। এই ঘরের পাশেই রেবার শোবার ঘর। রাতের খাওয়া শেষ করে রেবা জানালার পাশে বসল। জানালা দিয়ে তাকালে অন্ধকার এবং কুয়াশাতে নানা জায়গা থেকে আগত আলোর রেখা মিলে একটা কেমন পতঙ্গবিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে। এ যেন আলোর বিন্দু এবং রেখাগুলো অন্ধকার দেখে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারপর অন্ধকার, আর কিছু দেখা যায় না।

বিভা খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে অবজ্ঞা করে। মফস্বল শহরের সিনেমা ভাঙলে অনেক রিক্সার হর্ন একসঙ্গে শোনা যায়। সেই চেনা কোলাহল দূরে শুনে রেবা ভাবল,—আগামীকাল একটা ছাত্রী-

মিছিলের নেত্রী হতে হবে। রেবা এই কথাটা ভেবে গর্ব বোধ করল। রেবা ভাবল রিয়ালিটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। আমি ভীষণ লিভিং টাইপ, বিভার মতো কলমকরা সুবর্ণলতা নই। আমার ওপর অনেক ছেলেমেয়ে নির্ভর করে, প্রাধান্য মেনে নেয়। অথচ রেবা যখন আত্মচিন্তাতে মগ্ন হয়ে ভাবতে শুরু করল বিভার সঙ্গে তার বিরোধের ক্ষেত্র কোথায়, তখন সে কিছুতেই সেই বিন্দুটা খুঁজে পেল না। অনেক ভেবে দেখল বিভা কোন ব্যাপারেই তার সঙ্গে প্রতিযোগিতাতে নামতে চায় না। কেন, আমি কি তোমার প্রতিযোগী হবার যোগ্য নই?—শিরশির একটা স্নায়বিক উত্তেজনা ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে ওপর দিকে উঠতে লাগল। ঝিঁ-ঝিঁ ধরার মতো একটা অনুভূতি। কিন্তু বাঁদিকটা একদম স্বাভাবিক, সেখানে কোন গোলমাল নেই। সেই ঝিঁঝিঁটা কোমরে এসে নিতম্বে ছড়িয়ে পড়ল। রেবা প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের বিছানাতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। কাঁদতে-কাঁদতে এই হাস্যকর নাটকীয় পরিস্থিতিটা বুঝতে পারল। রেবা নিজের কাছে ভীষণ লজ্জা পেল।

চার

—দীপু, আমাকে কেন খবর দিয়েছিস? কানু মহারাজ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল; দীপু ঠিক সেই সময়ে ওস্কার ওয়াইল্ডের মধ্যে ডুবেছিল। কানু মহারাজ খৈনি টিপতে-টিপতে ঘরে ঢুকে প্রায় দীপুর গা ঘেঁসে দাঁড়াল। ডোরিয়ান গ্রে থেকে মুখ তুলে দীপু দেখল কানু মহারাজ সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—কী রে, আমাকে কেন সংবাদ দিয়েছিস? কানু মহারাজ পুনরায় কথাটা বলল, তারপর বিছানার ওপর বসে দেওয়ালের দিকে তাকাল। দেওয়ালে একখানা দুর্গামূর্তি ছিল, পাড়ার পুজোতে বাবা সেবার বুঝি সভাপতি ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কানু মহারাজ উঠে পড়ল, বাঁ হাতের তেলোটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে খৈনিটা ঢেলে দিল, তারপর সেই ছবিটার নীচে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। কানু মহারাজ খুব বেঁটে, লম্বায় চার ফুট আট ইঞ্চির বেশি কিছুতেই নয়। মাথায় কাঁচাপাকা চুল একটু বা এলোমেলো। গায়ের রং খুব কালোও নয় আবার খুব ফর্সাও নয়। দুটো হাতই কেমন যেন ছোট ছোট লাগে। মাজায় খুঁট বেঁধে কাপড় পরা, গায়ে একটা ফুলশার্ট এবং ছাই রঙের চাদর। কানু মহারাজের বাবা দেশবিভাগের আগে সৈয়দপুরে ওকালতি করত। তার বাবা মা দেশবিভাগের পর সম্পত্তি বিনিময় করে উত্তরবঙ্গের প্রান্তে নতুন করে প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়। কিন্তু শোনা যায় কানুদার মা কানুদাকে জন্মাবধি ঘৃণা করত। পরিস্থিতি এক সময়ে এমন পর্যায়ে পেঁছিয় যে কানু মহারাজের মাতামহ এবং মাতামহী কনুকে নিয়ে মানুষ করে। কানু লেখাপড়া করেনি। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদেরকে ধরে কানুকে চা-বাগানের চাকরিতে ভর্তি করা হয়। কানুর বাগান থেকে নিকটতম একটা গ্রাম্য স্টেশনের দূরত্ব ছিল প্রায় বারো মাইল। মেইন লাইনের এই স্টেশনে প্রায় সব বড়-বড় ট্রেন থামত। কানু বাগানের কাজে ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই এই স্টেশনে আসত, এবং ফিরে যেত। লোকে বলে, কানু মেয়ে দেখতে আসত। একসময় কানুর চা-বাগানের চাকরি চলে যায়, তখন থেকে কানু শহরে তার নিকট এক ধনী আত্মীয়ের যৌথ পরিবারে বাস করতে থাকে। কানু 'র', 'ড়', 'ছ' এবং আরও অনেক বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না। ফলে সে সব সময়েই আধো-আধো ভাষায় কথা বলে। যদিও সে কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না তবু প্রতিদিন তিনমুঠো বিড়ি এবং প্রায় আধ কৌটো খৈনি খায়। হয়তো খৈনি খাবার জন্যই কানু ঘন-ঘন থুথু ফেলে। এইজন্য কানুর আর-এক নাম গুই সাপ।

কানু একসময় দেওয়ালে তার দীর্ঘস্থায়ী প্রণাম শেষ করল। এবার চৌকিতে না বসে দীপুর

চেয়ারটাতে বসল। দীপু বুঝতে পারল না এবার সে তাকে কী জিজ্ঞাসা করবে। কানু চুপ করে বসে চোখ বুজল। এবং নিজের মুখের ভেতরে খৈনিপাতার একটা জ্বালাময় স্নায়বিক চাঞ্চল্য বোধ করল। তামাকপাতার মাতামাতা নেশা এবং নিচের ঠোঁটের ভেতর জলুনি-পুড়োনিটাকে দেওয়ালে ভগবতীর মূর্তির সঙ্গে একটা সরলরেখা দিয়ে সে মেলাতে চাইল। চোখবোজা অবস্থাতেই কানু চেষ্টা করল নিচের ঠোঁট আর মাড়ির মাঝখানে পুড়ে যাওয়ার তীক্ষ্ম অনুভূতিকে দুই ভুরুর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীভূত করতে। চোখ বুজেই কানু বুঝতে পারল মুখের ভেতর সেই জ্বলে-যাওয়া অনুভূতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপর অনুভূতিটা ওপরের মাড়ি বেয়ে একটা জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার মতো ওপরের টাকরাতে আঘাত করল। কানু বুঝল ওপরের টাকরাটা ভেদ করে একটা গুলতি থেকে ছোঁড়া পাথরের মতো সেই জ্বলন্ত অনুভূতিটা মাথার ভেতরে কোথাও ঢুকতে চাইছে। ঠিক সেই সময়েই কোথাও কোন ছেদ পড়ল। অনুভূতিটা টাকরার মাঝখানে বালির মধ্যে জলের মতো হারিয়ে গেল। দীপু দেখল চোখ খুলে কানু জিজ্ঞাসা করছে,—কানু ভট্‌চাযের একটা মেয়ে কি তোদের সঙ্গে কলেজে পড়াশোনা করে?

—কেন, আপনার রেজিস্টারে মেয়েটার নাম কি এখনও ওঠেনি?

দীপু হাসল, কানুও হাসল, তারপর কানু উঠে ঘরময় পায়চারি শুরু করল, জানলার কাছে গিয়ে পিচপিচ করে দু-তিনবার থুথু ফেলল।

—আচ্ছা কানুদা, আপনি এই টাউনের সব অবিবাহিত মেয়েদের সংবাদ কী করে রাখেন? এমনকি যারা বড় হচ্ছে অথচ পুরো বড় হয়নি তাদের সংবাদও আপনি কি করে মনে রাখেন? দীপুর চোখে দুষ্টুমির হাসি, কথা শেষ করে সে কানুর দিকে তাকাল। কানু তখনও ঘরময় পায়চারি করছে আর জানলার কাছে গিয়ে থুথু ফেলছে। দীপু কিছুক্ষণ কানুর দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল,—আচ্ছা কানুদা, সত্যি করে বলুন, আপনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টাউনের কোন্ কোন্ মন্দিরে প্রণাম করেন?

—কোন মন্দিরই বাদ নেই, মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়ে গণেশ ঘরে ঢুকল।

—তোমার বাবার সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ হয়েছে? গণেশের গলাতে একটু ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল; দীপু বুঝতে পারল না গণেশ সত্যি ঠাট্টা করছে, না তার ঠোঁটের ঐ বাঁকা হাসির জন্য কথাটা অমনি বাঁকা শোনাল।

দীপু ইচ্ছে করেই গণেশ মামার কথার কোন জবাব দিল না। গণেশ মামাকে সে ঘৃণা করে, শুধু ঘৃণাই না, এই মুহূর্তে তাকে একটা লাথি মারতে ইচ্ছা করছে। আজকে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবার সঙ্গে একটা ফয়সালা করতে হবে। গণেশ মামা কী এমন উপকার করছে যার জন্য বাবার প্রতি সে এমনি অপমানজনক বিদ্রূপ করতে সাহস পায়! গণেশমামা লক্ষ্য করল দীপু মুখ গুঁজে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। কানু মহারাজ সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলছে।

গণেশ ভাবল, ভিখিরীর ব্যাটা ভিখিরী, দুদিন পরে এই বাড়িঘর, দাসী চাকর কোথায় যাবে তার কোন পাত্তা পাওয়া যাবে না। জিজ্ঞাসা করলে কথার জবাব দেয় না! গণেশ একটা ব্যাপারে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করল এই ভেবে যে দীপু এবং তার বাবা দুদিন পরে আর খেতে পাবে না। এইটে ভাববার পর গণেশ একটা সাংঘাতিক পয়েন্টে জিতে যাবার তৃপ্তি বোধ করল এবং দীপুর বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গি গ্রহণ করবার মানসিক শক্তি খুঁজে পেল।

—কথা জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দিচ্ছ না কেন? গণেশ দীপুকে একটা ধমক দেবার চেষ্টা করল। গণেশের গলার স্বর শুনে দীপুর ভেতরে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। দীপু শুধু চোখ তুলে

গণেশের দিকে সোজাসুজি তাকাল, গণেশ চোখ নামিয়ে নিল। ছেলেটা রেগে গেছে, আর ওকে ঘাঁটিয়ে দরকার নেই। গণেশ দীপুর ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরের দিকে হাঁটা দিল। দীপু একভাবে অনেকক্ষণ ধরে চোখের পলক না ফেলে গণেশের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই কানু মহারাজ খবর পেয়ে ভেতর-বাড়ির দিকে চলে গেল। এবার দীপু বিছানা ছেড়ে উঠল, টান-টান করে বিছানা ঠিক করল, বালিশ কম্বল মাথার দিকটাতে সমান করে সাজিয়ে রাখল। নিজের বিছানা সম্পর্কে দীপু ভীষণ খুঁতখুঁতে। প্রতিদিন নিজের চাদর নিজে ধোয়। আজ সরস্বতী পুজোর অনেক কাজ, বিকেলে ছাত্র ফেডারেশনের সভা আছে। সুতরাং তাড়াতাড়িতে বিছানার চাদর ধোবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি করে নিজের ঘরটা সে ঝাঁট দিতে লাগল। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে দীপু পড়ার টেবিল সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল। ভাঁজ-করা বিছানা ঢাকনা নিয়ে নিজের বিছানা ঢেকে দিল। তার অনুপস্থিতিতে বাইরের কারো অনধিকারপ্রবেশ দীপু পছন্দ করে না। বাইরে বেরোবার সময় ঘরে সে তালাচাবি দিয়ে যায়।

কানু মহারাজ অস্থির হয়ে উঠল। নানা কাজের অজুহাত দেখিয়ে সুরেশবাবু এবং গণেশকে কোনরকমে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সে বাইরে এল। প্রায় সাড়ে নটা বাজে এবং আর একটু পর থেকেই কলেজের মেয়েরা বার হতে শুরু করবে. প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত গার্ল স্কুলের মেয়েরা সারা রাস্তা জুড়ে কিচির-মিচির করতে করতে স্কুলে যাবে।—এই সময়টা আমার রিক্রিয়েশন। এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে ঘুরে বেড়াই,—কিন্তু এখন রাস্তাতে এইসব মেয়েদের না দেখলে চলবে না। বড় রাস্তাতে নেমে কানু মহারাজ খুব জোরে পা চালাতে লাগল, খুব জরুরী কাজে যাবার ভংগি ফুটে উঠল কানু মহারাজের হাঁটার মধ্যে। সে বুঝতে পারল তার মাথার মধ্যে একটা কাঁপুনি শুরু হচ্ছে।

বর্ষাকালে বিকেলের দিকে ঘাসের ওপর যখন গঙ্গাফড়িং ওড়ে তখন দুটো পাতলা পেঁয়াজের খোসার মতো পাখাতে একটা কাঁপন লাগে। সেই তিরতির কাঁপন শুরু হল মাথার মধ্যে। গঙ্গা-ফড়িংএর দুটো পাখার মতো সেই আশ্চর্য অনুভূতিটা একটা স্থির বাতিকে পরিণত হয়েছে। কানু মহারাজ ভাবল, এগারোটার পরে রাস্তাতে আমার কাজ নেই। সাড়ে এগারোটার মধ্যে একান্নবর্তী পরিবারের স্নানের পালা শুরু হয়ে যায়। আমি বিশেষ একটা স্নানঘরে ঢুকে পড়ব। তারপর আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-স্মৃতি—সব লোপ পাবে। জেল থেকে পালানোর জন্য ফাঁসির আসামী সামান্য একটা ছেনি দিয়ে দিনের পর দিন সকলের অলক্ষ্যে দেওয়াল খোঁড়ে, আমার পরিস্থিতিও তেমনি। প্রতিদিন একঘণ্টা করে সকলের অজ্ঞাতে একজন গোপন ষড়যন্ত্রকারীর মতো আমার কাজ করতে হয়েছে। প্রথমে একটা দশমিক বিন্দুর মতো দাগ দেওয়ালে। শুধুমাত্র খানিকটা আলগাভাবে পলেস্তরা ঝরে পড়ে।

কানু মহারাজ উপস্থিত চিন্তাটা থামিয়ে তার খনন-কাজের সর্বপ্রথম ইংরেজী দাগটা ফুল-স্টপের মতো দেখে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেই কথা ভাবতে লাগল। কানুর পরিষ্কার মনে পড়ল, ম্যালেরিয়া জ্বর এলে যেমন কাঁপুনি লাগে, তেমনি একটা কাঁপুনিতে সারা শরীর কাঁপতে লাগল, ওপরের পাটির দাঁতের সঙ্গে নিচের পাটির দাঁতের ঠকাঠকি শুরু হল। কানুর আরও মনে পড়ল যে তার দুচোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুধু তাই নয়,—তার গলা দিয়ে একটা স্বাভাবিক ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছিল। অথচ তার জ্ঞান টনটনে ছিল। কারণ গলার ঘড়ঘড়ির আওয়াজ যাতে বাইরে না শোনা যায় তার জন্য কলটা সে খুলে দিয়েছিল, জল পড়ার আওয়াজে অন্য শব্দ চাপা পড়ে গেল।

এমনি কাঁপুনির ঝোঁকে কতক্ষণ ছিল তা কানুর মনে নেই। কিন্তু প্রচণ্ড শিহরনে একসময় তার সমস্ত রোমকূপগুলো স্ফীত হয়ে উঠল। প্রতিদিন যেমন যেমন কানুর কাজ অগ্রসর হতে থাকল কানুর উত্তেজনাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে লাগল। রোজ রোজ এমনি প্রবল উত্তেজনা

এবং শিহরনে কানু নিত্য মুক্তির স্বাদ পেতে লাগল। কানুর সবচেয়ে আনন্দ লাগল যখন নিখুঁত-ভাবে তার দেওয়াল খোঁড়ার কাজটাকে অন্য সবার চোখ থেকে আড়াল করে রাখার একটা পাকা কৌশল আবিষ্কার করতে পারল। স্নানঘরের দেওয়ালের ছিদ্র সবার দৃষ্টিপথ থেকে গুম করে দিয়ে কানু মহারাজ যখন বেরোল তখন নিজেকে ভীষণ হালকা মনে হল। অনেকক্ষণ ধরে অনেকদিন পর যদি কেউ কাঁদে তবে সে নিজেকে ঠিক এমনি ভারশূন্য ভাবতে পারে। কানু নিজের সৃষ্টিক্ষমতার চরম সাফল্যকে স্নানঘরের অন্ধকারে ফেলে রেখে নিজেকে এই জগতের সফল মানুষদের মধ্যে একজন মনে করল। কানু জানে যে জীবনে সফল মানুষদের সাফল্যলাভের পর তাদের প্রোফাইলে এবং চোয়ালের মাংসপেশীর গঠনে একটা তারতম্য আসে, সফল মানুষের চিবুক পরিবর্তিত হয়। কানু খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে। সেইদিন বিকেলে খবরের কাগজ পড়বার সময় রাজনৈতিক নেতাদের দু-তিনজনের ছবি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে তার মুখের কোন ছবি তখন তোলা হলে তার মুখে সাফল্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।

কানু মহারাজ যখন তার অকুস্থলে পেঁছিল তখন নিজেকে তার বেশ ক্লান্ত লাগল। বাতাসে শীতের প্রকোপ থাকলেও কানু হাতের তেলো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। পকেট হাতড়ে খৈনির শিশিটা বের করল। খৈনি মুখে দেবার পর সেই চিরচির-করা অনুভূতিতে কিছুক্ষণ মনটাকে উৎক্ষেপ করল, তারপর একটা অদৃশ্য শন্না দিয়ে একটা পাকাচুলের মতো সূক্ষ্ম শীর্ণ মনটাকে তার পুরনো চিন্তার রোমন্থনের সেই অংশে ফিরিয়ে আনল যেখানে ঘামমোছা এবং খৈনি খাওয়ার জন্য কানু চিন্তাটাকে স্থগিত রেখেছিল। চিন্তাটা প্রসঙ্গমত স্থানে ফিরিয়ে আনবার পর কানু আবার নিজের কর্মশক্তি এবং পুরুষকার সম্পর্কে একটা বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করতে লাগল। পুরুষকার সম্পর্কে প্রত্যয় এবং শন্নার অগ্রভাগে চিন্তাটা একটা বিশেষ পর্যায়ে পরস্পরের সঙ্গে মাথাঠোকাঠুকি করল। অনেকগুলো রংমশাল কানু মহারাজের চোখের সামনে জ্বলে উঠল, কানু চোখ বুজল; একটা হলদে সাপের মতো কানু ঢালু বেয়ে নামতে লাগল। তার নিত্য পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের সেই গাছের ছায়াতে দাঁড়িয়ে কানু স্কুলযাত্রী কিশোরীদের দেখতে পারছে না, মেয়েদের কলকাকলী তার কানেও আসছে না। চোখবোজা কানুর ডান গালের একটা মাংসপিন্ড শুধু কাঁপছে। সেই অকস্মাৎ অচৈতন্য থেকে ফিরে চোখ মেলেই সে বুঝতে পারল, স্কুলের মেয়েদের দল আগেই চলে গেছে, কলেজের মেয়েদের মধ্য থেকেই আজ কাউকে বেছে নিতে হবে। প্রতিদিন আমার নতুন নতুন মুখ চাই। মেয়েরা যখন হেঁটে যায় তখন মুখটাই দেখি। তারপর মুখের আদলে মনে মনে শরীরটা তৈরী করে নিই। খেয়ে-দেয়ে সারা দুপুর সেই ছায়াছবি নিয়ে মারপিট করি। ততক্ষণে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যাওয়া আসা শুরু করেছে। কানুকে দেখেই মেয়েদের মধ্যে একটা হাসাহাসি পড়ে গেল। কানু পরিষ্কার শুনতে পেল,—ঐ দেখ, ছারপোকাটা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। মন্তব্যটা কানে গেলেও কানুর কোন ভাবান্তর হল না। কারণ তখন তিন দিনের অনাহারী ক্ষুধার্তের মতো কানু সারা দুপুরের জন্য একটা সুখ খুঁজছে। কানু জানে এইরকম মুখ খোঁজার সময় তার সমস্ত বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। মান অপমান, ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিজের বংশপরিচয়, বয়স—সবকিছু সে ভুলে গেল,—এক লহমাতে একটি শ্যামাঙ্গিনী মেয়ের মুখের ছাপ কানু তার নিজের মনের ছাঁচে তুলে নিল। মেয়েটির চোখ দুটি বড়-বড় এবং টানা-টানা, কালো দুটি মণি হাসি আর খুশিতে যেন নেচে বেড়াচ্ছে। চুলটা টান-টান করে বাঁধা, বেণীটা পিঠ জুড়ে পড়ে আছে, সোজা নাক এবং পাতলা ঠোঁট। তরতরে মুখখানা শ্যামবর্ণ হওয়ার জন্যই বোধহয় আকর্ষণীয় হয়েছে, মেয়েটির দুধে-আলতা গায়ের রং হলে কানু হতাশ হত। শেষ শীতের পরিষ্কার রোদ্দুরে মেয়েটির কালো রং একটা গভীর তলহীন রহস্যের সন্ধান দিচ্ছে। কানু আরো একবার চোখ বুজল, তারপর মেয়েটির মুখখানা ভাবতে লাগল, কানুর

সমস্ত দৈহিক ভারসাম্য যা মাধ্যাকর্ষণশক্তির সনাতন কারণে ভূমির সঙ্গে গ্রথিত আছে সেটা মুহূর্তের মধ্যে লুপ্ত হল। চোখবোজা কানু মহাশূন্যে একটা কালো তমিস্রার মধ্যে মিশে যেতে লাগল। মেয়েটির মুখটাকে কানু পুনরায় খুঁজে পেতে চাইল, বোজা চোখের সামনে পলিমাটির মতো কালো অন্ধকার ছেনে-ছেনে মুখখানাকে গড়তে চাইল। আপাতত মুখখানা গড়তে পারলে দুপুরে শুয়ে শুয়ে মেয়েটার বাকি শরীর গড়ে নেওয়া যাবে। চোখ খুলল কানু। চোখ খোলবার পর সে বুঝতে পারল যে মাথার মধ্যে প্রবল স্নায়বিক তোলপাড়ের জন্য আপাতত কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মাথার মধ্যে আর-একটা ঝাঁকুনি বোধ করল কানু এবং তারপর তার মনে হল একটা উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়ে এক তুলোর পাহাড়ের মধ্যে পড়ল। আস্তে আস্তে কানুর চোখের সামনে সমস্ত ঘরবাড়ি, মানুষ এবং রাস্তাঘাট ফুটে উঠল। কানু ভাবল যে সে এতক্ষণ একটা নেগেটিভ ফিল্ম হয়েছিল এবং ক্রমশ কোন রাসায়নিক আরকের প্রভাবে সে সাদাকালোর পরিষ্কার একটা ফটো হয়ে ফুটে উঠল।

বাড়ির পথে পা বাড়াল কানু। ঠা-ঠা রোদ্দুর, মনে হল বেলা অনেক হয়েছে। রাস্তাঘাটে এই সময় লোকচলাচল কমে আসে, সাইকেল রিক্সার হর্ন বা টুংটাং আওয়াজ পাখির ডাকের মতো করুণ শোনায়। কানু রোজই এইরকম ভরদুপুরে অনুভব করে : আমি আমার মাকে সবসময়েই গর্ভধারিণী বলি। মা বলে কোনদিন ডাকিনি। চিন্তাটা শেষ করেই কানু নিজের একাকিত্ব এবং নির্জনতার বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠল। তার মনে হল এই একা-লাগা ভাবটা ডাকিনী-যোগিনীর মতো তার দিকে ছুটে আসছে। পরমুহূর্তেই কানুর চিন্তাটা নতুন এক দুঃসাহসিক অভিযানে নামল। কানু তার সমস্ত হতাশাকে ভুলে গেল, সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে এই মুহূর্তে তার পরিকল্পনাটা চিন্তার উপরিভাগে ভেসে না ওঠে। নিজের কাছে গোপন রাখার প্রাণান্ত পরিশ্রমে আবার তার কপাল এবং ঘাড়ের পেছন দিকটা ঘামে ভিজে গেল। কানু বুঝতে পারল ডান গালের মাংসপিণ্ডটা কাঁপতে শুরু করেছে।

কানু তার ধনী আত্মীয়বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়াল। দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে মনে হয় গেটের ভেতরে ঢোকা উচিত হবে কিনা, এটা সে বিবেচনা করছে। কিন্তু প্রথমে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটু দূরে রাস্তার পাশে একটা বটপাকুড়ের গাছের দিকে দু-তিনবার প্রণাম করল। প্রণাম করেও তার যেন শান্তি হল না, গেট থেকে সে ধীরে ধীরে আবার বটপাকুড়ের জোড়া গাছের দিকে গেল, ভক্তরা গাছের নিচটা বাঁধিয়ে দিয়েছে, কানু সিমেন্টের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল। সিমেন্ট থেকে মাথা উঠিয়ে আবার হাত জোড় করে ভক্তি দিল,—তারপর গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। বাড়িটা বাহির এবং ভিতর—এই দুই ভাগে বিভক্ত। বাহির-বাড়িতে পুবমুখো একটা পাকা দালানে উকিল গৃহ-কর্তার সেরেস্তা, দুপাশে দুখানা ঘর, কর্তার বড়ছেলে এবং মেজছেলে এই দুখানা ঘরে থাকে, দুটো ঘরের সঙ্গেই লাগোয়া শৌচাগার। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে কানু চারপাশে খুব ভালো করে দেখল। চারপাশে দেখেশুনেও সে নিশ্চিন্ত হল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিজের সমস্ত সজ্ঞান চৈতন্যকে কানু নাকে এবং কানে টেনে এনে প্রতিষ্ঠা করল। অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তার অচল হয়ে গেল। কানু জানে বাতাসে ভেসে-আসা সামান্যতম শব্দ কানে এলেই সে মানুষের উপস্থিতি আন্দাজ করতে পারবে। দুপুরবেলা এখন স্নানের সময়, ভেতর থেকে কেউ বাইরের দিকে এলে বাতাসে তেলের গন্ধ, সাবানের সুবাস, স্নো-পাউডারের মিশ্র ঘ্রাণ আগে-আগে বাতাসে ভেসে আসবেই, অথবা কোন হাসির টুকরো, চলতে চলতে কথার অংশ, চটি অথবা খড়মের আওয়াজ, কাশি বা হাঁচির শব্দ বহুদূর থেকে এলেও নির্ঘাত তার কানে ঢুকবে। প্রস্তরীভূত কানু তার চেতনাকে নাক এবং কান থেকে সারা দেহে ছড়িয়ে দিল, তারপর সাপের মতো ক্ষিপ্রগতিতে বাঁ পাশের ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই কর্তার মেজছেলের দামী বেডকভার দিয়ে ঢাকা টান-টান বিছানার সামনে দাঁড়াল। তারপর বেডকভার

তুলে সাদা ধবধবে চাদরে নোংরা পা-দুখানা ঘসতে লাগল। অনেকগুলো অচেনা দেশের ম্যাপের মতো সাদা চাদরের ওপর ময়লার ছাপ পড়ল। কানুর তখন সারাটা শরীর গরম হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। কানু একটা অপরিমিত শক্তির আধারে পরিণত হল। কানুর মনে হল একজন দিগ্বিজয়ী সেনাপতির মতো তার পায়ের তলাতে হাজার হাজার বাড়ি, অট্টালিকা, নগরবন্দর চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষিপ্রগতিতে বিছানাটা সে ঢেকে ফেলল, তারপর জ্বলন্ত চোখ নিয়ে ঘরের উত্তর দিকে আলনার দিকে তাকাল, শব্দহীন গতিতে সাপের মতো এগিয়ে গিয়ে একখানা পাটভাঙা সাদা ধবধবে ধুতি ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরল, মুঠোর মধ্যে ধরে থাকা রসুনের খোসার মতো দামী ধুতিখানার দিকে সে তাকিয়ে রইল, তারপর ধুতিখানার নিচের দিকটা দুই দাঁতের মধ্যে জোরে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। সামান্য একটু ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধুতিখানা ফেঁসে গেল। এরপর কানু আর কোন দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা ঘুরে আবার গেটের কাছে চলে গেল। তারপর অলসগতিতে ভেতর-বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। কানুর হাঁটার মধ্যে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। দেখলে মনে হবে এইমাত্র কানু গেট খুলে বাইরের বাড়ির সীমানাতে ঢুকল। নিজের ভূয়োদর্শন থেকে সে বুঝতে পেরেছে অগণিত অ্যালিবাই প্রতিনিয়ত প্রতিটি প্রাণীকে রক্ষা করছে। সুতরাং কানু পরিষ্কার বুঝতে পারে পৃথিবীতে যে কোন পাপ করেও মানুষ ঈশ্বর-তুল্য পূজ্য হতে পারে যদি সে অ্যালিবাইএর প্রতিভাধর স্রষ্টা হয়।—কানুদা, তাড়াতাড়ি চান করে নেন, আপনার জন্য বড়মা বসে আছেন, একটি বাচ্চা মেয়ে কানুকে তাড়া দিল।

—দাচ্চি, এক্কনি তান করব, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত আধো-আধো কথা বলে কানু তাড়াতাড়ি তার নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

স্নানঘরে ঢোকবার পর কানু নিশ্চিত বুঝল পাশের বাথরুমে এ বাড়ির মেজমেয়ে স্নান করছে। কানুর সারা শরীর শিহরিত হল, আনন্দে উত্তেজনাতে কানু কলের জল ছেড়ে দিল,—কারণ তার আশঙ্কা হল কলের জলের শব্দ না থাকলে স্নানঘরের মধ্যে তার চিন্তাগুলো বাইরে থেকে কেউ যেন শুনতে পাবে। কানু চোখ বুজেই ভাবল, বড়মা আর একটু বসে থাকুক, কিন্তু মেজোর নগ্নদেহ আমি এতদিনের চেষ্টাতে খনন করা লুকোনো ফুটো দিয়ে দেখবই দেখব। নগ্ন যুবতীদেহ যদি জলে সিক্ত হয় তবে তাতে মোমপালিশের মসৃণতা আসে। বিশেষ করে উরুতে এবং তলপেটে ভরা-যৌবন জলে সিক্ত হয়ে কচিকলাপাতার মতো চকচক করে। কানু বাথরুমের বালতিটাকে উল্টো করে মেঝেতে বসাল, তারপর কলের পাইপ ধরে সেই অদৃশ্য ফুটো থেকে কানু ক্যামোফ্লেজ সরাতে লাগল। সে বুঝতে পারল মেয়েটা তোড়ে-পড়া কলের জলটা মুখের মধ্যে নিয়ে কুলকুচি করে সশব্দে ফেলে দিচ্ছে। চোখ বুজে বুঝল জলের ধারা নগ্ন দেহ বেয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে একই মাত্রাতে মেঝেতে নামছে। এর মানে একটাই—মেজো মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। কলের জল তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেটে তবে এঁকেবেঁকে মাটিতে নামছে। কানু তার ক্যামোফ্লেজ সরানোর পর প্রথমেই একটা সূঁচের মাথার চেয়ে একটু বড় ফুটো বের করল। কিন্তু সেই অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রটা দৃশ্যমান হতেই কানু একেবারে কাঁপতে লাগল। ওল্টানো বালতির টালমাটাল পরিস্থিতিতে তার কাঁপুনির জন্য দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল হল। জলের পাইপ আলগোছে ধরে কানু আবার সাবধানে এবং সন্তর্পণে মেঝেতে দাঁড়াল। সেই ফুটো দিয়ে কানু তাকাতে পারল না। কানুর মনে হল তার সমস্ত শরীরটা পাকিয়ে পাকিয়ে একটা বিড়ে-পাকানো সাপের মতো হবে। মেঝের মধ্যে বসে পড়ে সে প্রচণ্ড জলের তোড়ের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিল। আস্তে আস্তে কানু অর্ধমৃত, জ্ঞানলোপ-পাওয়া জড় পদার্থ থেকে জীবনে চেতন্যে ফিরে এল। কানু ব্রাহ্মণের ছেলে, প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য এই সময়ে তার মন আঁকুপাঁকু করতে লাগল। গায়ত্রী জপ করা এখন সম্ভব হবে না, ফুটোর ওপর ক্যামোফ্লেজটা আবার ঠিক করে

রাখতে হবে। এই ফুটো দিয়ে আমি হয়তো কোনদিনই উঁকি দিতে পারবো না, তবু ওটা থাকুক। একটা ফুটো আছে যার ভেতর দিয়ে তাকালে ওপারে স্বর্গরাজ্য দেখতে পাব—এই চিন্তাটা হয়তো আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।'বেঁচে থাকবার জন্য একটা যুক্তি আমার চাই, ভীষণভাবে চাই।

বিকেলে ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভাতে দীপু উত্তেজিত বোধ করল। দিলীপদা এবং প্রাণেশকাকু দুজনেই উপস্থিত। সভার বিষয়বস্তু, ছাত্রসংগঠনগুলিকে নতুনভাবে সংগঠিত করার জন্য আলোচনা। দিলীপদা এবং প্রাণেশকাকু সে দিকেই গেল না। বরং দিলীপদার বক্তব্যের মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মূল পার্টির মধ্যে কিছু লোক শোধনবাদী রাজনীতির চোরাবালিতে পার্টিকে ডোবাতে চায়। আটচল্লিশ সালে পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবার সময় জেলখানার ভেতরে নীতির ব্যাপারে দুটো চিন্তাধারা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। একদল চায় গোপনে মোটামুটি সংবিধানের মধ্যে কাজ করতে, কিন্তু অন্য দল চায় গণ-আন্দোলনকে জঙ্গী করে তুলতে। চীন বিপ্লবের সাফল্যের পর সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তার গতানুগতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। মার্কসিস্ট আন্দোলনের পুরো ব্যাপারটাকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। দিলীপদা এবং প্রাণেশকাকু দুজনেই অপ্রত্যক্ষভাবে বলতে চাইলেন যে আত্মরক্ষার মূল তাগিদে যদিও রনদিভে থিসিসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তবু তলে তলে পার্টির হার্ডকোরে একটা প্রচণ্ড জঙ্গী গ্রুপ তৈরি করে রাখতে হবে। ঐতিহাসিক সময় উপস্থিত হলে পুরোপুরি ঝাঁপ দিতে হবে। সেইজন্য 'ক' গ্রুপে যাঁরা আছেন তাঁদেরকে পার্টির হাইয়ার অফিসে আসতে দেওয়া হবে না। তাঁদের কোন কথা অথবা আদেশ মানবার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে মামুলি এবং সন্দেহের উদ্রেক করে না, এমন সব অ্যাজেন্ডা দিয়ে সভা ডাকা হবে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে নিজেদের সঙ্গীদের রাজনৈতিক কৌশলগুলো আলোচনা করা হবে। এতে সুফল দুটো। এক, কেউ সন্দেহ করবে না; দুই, নিজেদের সাথীদের মধ্যে কোহেশান থাকবে। ভুলবোঝাবুঝি হবে না।

দীপু দিলীপদার এবং প্রাণেশকাকুর বক্তব্য শোনবার পর জিজ্ঞেস করল,—তাহলে এটা চাকার মধ্যে চাকা। এভাবে কি কোন কাজ চলতে পারে?

দীপু যদিও দিলীপদার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল তবু প্রাণেশকাকুই উত্তর দিল, উত্তর দেবার সময় একটু মিচকি হাসি প্রাণেশকাকুর ঠোঁটে দেখা দিল, হাসিটা নিরামিষও হতে পারে, আবার বিদ্রূপাত্মকও মনে করা যায়,—এটা কোন নতুন কৌশল নয়, সব দেশেই ইনার-পার্টি স্ট্রাগলে এটা একটা গৃহীত কৌশল।

—কৌশলটা ঠিক করে কে, প্রাণেশকাকু? দীপুর কণ্ঠে ঝাঁঝ বুঝতে পারা গেল, দীপু প্রাণেশের ঠোঁটে একটা অনির্ণীত হাসিতে খুশি হয়নি।

—আমাকে সবাই কাকু বলে, প্রাণেশকাকু কেউ বলে না; প্রাণেশ একটু থামল,—এই কৌশলটা ঠিক করে পার্টি লিডারশিপ।

—তার মানে আমরা সমর্থন করব এটা ধরে নিয়েই তাঁরা কৌশলটা ঠিক করে থাকেন?—দেবু সোজা হয়ে বসে প্রাণেশকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলল।

—হ্যাঁ, প্রাণেশের কথাতে এবং ভঙ্গিতে এবার পরিষ্কার মনে হল যে এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনাতে যেতে তার আপত্তি আছে।

—প্রথম কথা, আপনার ভাষাতে হাইয়েস্ট পার্টি লিডারশিপ একটা ঝাপসা ব্যাপার হতে পারে। হয় এটা কোন পদ অথবা ব্যক্তি। এমনি গুরুতর ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করব এটা ধরে নেওয়া খুব বেশি আশা করা হবে। আভ্যন্তরিক গণতন্ত্র বলতে তা হলে আর কিছু নেই নাকি? বেণু প্রায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলল। প্রাণেশ চুপ করে রইল। দিলীপ প্রতি-

বেদন খাতার পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে লাগল। সভা একদম চুপচাপ হয়ে গেল। সেকেন্ডের কোন ভগ্নাংশ সময় চুপচাপ থাকবার পর গুঞ্জন উঠল।

—তার মানে তোমরা শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে গোপন জোটে যোগ দিতে চাও না? বেণুর দিকে তাকিয়ে প্রাণেশ প্রশ্ন করল, প্রাণেশের গলাটা বেশ তীক্ষ্ম শোনাল।

—আদর্শগত জাস্টিফিকেশন ছাড়া সেটা কী করে সম্ভব? পার্টি কংগ্রেসে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে আমরা যে নীতিকে গ্রহণ করেছি তার বিরুদ্ধে একটা গোপন জোটে কী করে যাওয়া সম্ভব? সেক্ষেত্রে পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত থিসিসকে সমর্থন না করলে পার্টিতে থাকব না, বেণু জবাব দেবার সময় কাকাবাবুকে খুব মান্যগণ্য করল এটা কারুরই মনে হল না। প্রাণেশ এবং দিলীপ আরও একটু চুপ করে থেকে পুরো সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। দেবু প্রাণেশ এবং দিলীপের নৈঃশব্দ্যকে কোন আমল দিল না। সে বেশ জোর গলাতেই বলল,—কোন আন্ডারহ্যান্ড প্র্যাকটিসের মধ্যে আমরা নেই। দিলীপ দেবুর মন্তব্যকে কোন গুরুত্ব দিল না কিন্তু সাধারণভাবে সভাকে বলল,—এই মুহূর্তেই এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তাড়াহুড়ো নেই। অনেক আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে। সভার গুমোট ভাবটা কেটে গেল। দু-এক টুকরো হাসি, রসালো মন্তব্যও শোনা গেল। দিলীপ আবার বলল,—আজকের আলোচনা শেষ, শুধুমাত্র কলেজের তিনজন কমরেডের সঙ্গে আমাদের একটু পৃথক আলোচনা আছে। অন্যান্য ছেলেরা উঠে গেল। হঠাৎ এত বড় একটা ঘরের মধ্যে পাঁচজন মানুষকে বড় অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হল।

সন্ধ্যাবেলা দীপু, বেণু, দেবু যখন বড় রাস্তাতে নামল তখনও রাস্তার আলো জ্বলেনি। দীপু বলল,—দিলীপদা আর তোদের কাকুর ভ্যানভ্যানানি শুনে এখন মাথা ঘুরছে। দেবু বলল,—বেণু ব্যাটার টয়েনবী পড়ে আর জিদের ডায়েরি নাড়াচাড়া করে খুব থিয়োরাইজিং করার বাতিক হয়েছে,—শালা তোর এত কূট তর্ক করার দরকার কী? বেণু কোন উত্তর দিল না। দীপু বলল,—দিলীপ আর প্রাণেশকাকু যা বলবে এক কান দিয়ে শুনবি আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিবি। আপাতত ডাইরেক্ট গোলমালের মধ্যে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কলেজ ইউনিয়নের প্রোভাইস ইলেকশনে দিলীপদার সাহায্য একটু লাগবে।

—তোরা তর্ক করার সময়ে সবাই মিলে তর্ক করবি আর যতো দোষ নন্দ ঘোষ। আর কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখন এক কাপ করে চা আর দুটো করে সিঙ্গাড়া খেয়ে কলেজে যেতে হবে। ঠিক সাতটার সময়ে ডেকরেশনের ইনচার্জ লুধিয়ানা সরকার তার দলবল নিয়ে কাজ শুরু করবে। আমি হোস্টেল থেকে চার-পাঁচখানা কম্বল জোগাড় করেছি। রাতে তো আর ঘুম হবে না, তবুও দীপুর মতো ঘুমকাতুরে দু-একজন যদি ভলেন্টিয়ারদের মধ্যে,—দেবু বেণুকে কথা শেষ করতে দিল না, হাসতে হাসতে বলল,—আচ্ছা বেণু সরকারকে সবাই লুধিয়ানা সরকার বলে কেন?

—এখন ওসব কথা রাখ, রাতে শুনবি; বেণু ব্যস্ততার সঙ্গে চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিল। বেণু এগিয়ে গিয়ে পেছনে ঘুরে তাকাল। তারপর চেঁচিয়ে বলল,—বাড়ি থেকে খুব তাড়াতাড়ি দুজনেই কলেজে আসবি। দেবু এবং দীপু দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। শেষ মাঘের পড়ন্ত বিকেলে মোমবাতির মতো স্নিগ্ধ আলোতে পাগলা বাতাসে এবং ধুলোতে কোন পুরনো বাড়ির দরবারকক্ষ। দেবু ভাবল শূন্য বাড়িতে তালা খুলে ঢুকতে হবে। বাবা অফিসের শেষে দুটো ট্যুইশানি সেরে যখন বাড়ি ফেরেন তখন অনেক রাত। রাত দশটার আগে বাড়িতে খাবার কিছু থাকে না। তবে বাড়ির সামনেই মিষ্টির দোকানে বাবা মোটামুটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিকেলে এখন গরম গরম পুরি আর বুটের ডাল খাব। দেবুর ক্ষিদে পেয়েছে, দুটো সিঙ্গাড়া আর এক কাপ চায়ে তার ক্ষিধে একটুও মেটেনি। দীপু ভাবল, সেই বাড়িটা প্রতিমুহূর্তেই ডুবছে, অথচ আমাকে

প্রতিদিন সেখানে ফিরতে হয়। দেবু এবং দীপু দুজনেই তিন মাথার মোড়ে দাঁড়াল। দুজনেই চুপচাপ। ওরা কিছুক্ষণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চলন্ত যানবাহন এবং মানুষের স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি থেকে মনে হতে পারে যে ওরা কেউ কাউকে চেনে না। দেবু ভাবল, আর এক বছর মাত্র, তারপর কে কোথায় চলে যাবে, হয়তো জীবনে আর কারো সঙ্গে দেখাই হবে না। মাঘের শেষে দিন বড় হতে শুরু করেছে। কিন্তু পাহাড়তলীর এই সমতল শহরে ঠান্ডা পুরো মাত্রাতে রয়েছে। দেবু জানে বাংলাদেশের উত্তর অংশের এই শহরের শেষ প্রান্তে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আছে, কোন একসময়ে, কোন্ সময়ে কেউ জানে না, সেখানে সাহেব-মেমরা শীতকালে রেসের ঘোড়া ছোটাত, সেই মাঠটা শ্রীরামপুরি বালি কাগজের মতো রোদে-পোড়া ঘাসে ঈষৎ হলদে। হঠাৎ দেখলে রাশি-রাশি ধান কাটার পর সাত-বিয়ানো মায়ের সূতিকার রক্তশূন্যতা। সেইখানে একটা বা দুটো হাড়, গোরু কিংবা মোষের চোয়াল, রোদেবৃষ্টিতে শুকিয়ে ধুয়ে একেবারে কাপাস তুলোর মতো সাদা ধবধবে। শেষ মাঘের এ বিকেলে তিন মাথার মোড়ে দীপুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার নিজের বাড়ির পথ ধরবার আগে দেবু বিষণ্ণ মাঠটার কথা ভাবতে লাগল। ঘোড়দৌড় মাঠের ধূসরতাতে লুপ্ত বোধ করল।

ঠিক এ মুহূর্তে দেবু নিজের লজ্জা ঘৃণা ভয়—সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তিন মাথার মোড়ের যানবাহন, জনতা, পাগলাবাতাস, ধুলোকে অবহেলাতে উপেক্ষা করে জীবনানন্দ আবৃত্তি করতে পারে।। ঠিক এমনি সময়ে দেবু এবং দীপু দুজনেই শুনল আধো-আধো উচ্চারণে কেউ ডাকছে,—দীপু, দীপু! দুই বন্ধু মাথা ঘুরিয়ে দেখল কানু তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।—তোকে অনেকক্ষণ দূরে দাকতি, তুই তুনতে পাসনি! কথাগুলো বলে কানু দীপুর দিকে তাকাল। দীপু কোন জবাব দিল না, একটু হাসল। কানু বুঝতে পারল, খুব নিশ্চিতভাবে অনুভব করল যে দেবু এবং দীপু দুজনেই তার উপস্থিতিটা পছন্দ করছে না। এটা বোঝবার পর কানু ভীষণ আনন্দ পেল। কারণ কানু নিজের অস্তিত্বকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। প্রতিদিন হাজারবার সেই অস্তিত্বটা নানা কুম্ভীপাকে হারিয়ে যায়। অস্তিত্ব হারাবার পর কানু 'নদীতীরে ভেজা বালির তলাতে চাপা পড়ে আছে',—এই লাইনটা ভাবে। কারণ ভেজা বালির ভারী আস্তরণের মধ্যে ডুবে যাওয়ার কথা ভাবার মধ্যে একটা সামগ্রিক অবলুপ্তির ছবি কানুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেমন বহু নগর বন্দর মাটিচাপা পড়ে তেমনি অস্তিত্বের চাপা পড়াটাও একটা মহাকালঘটিত প্রেতলোকের প্রস্নযোনির অন্ধকার ঘনিয়ে আনে। কানু আঁকুপাঁকু করে আবার মাঝে মাঝে বেঁচে ওঠে, যখন কেউ তার উপস্থিতিকে অপছন্দ করে তখনই কানু নিজের অস্তিত্ব ক্ষণিকের জন্য হলেও তীব্রভাবে জাহির করতে চায়। কানু জানে তার ধনী আত্মীয় কোর্টে বের হবার আগে তার মুখ দেখতে চান না, বাড়ির ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষার দিন বাড়ি থেকে বের হবার সময় তাকে প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চায়। এ বাড়িতে কিছুদিন আগেই একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে,—মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করার আগে নানা ছুতো করে বাড়িশুদ্ধ লোক কানুকে বাড়ির বাইরে পাঠাবার তালে ছিল। কিন্তু কানু নিঃশব্দ ভগ্নদূতের মতো ঠিক ঐসব সময়ে উপস্থিত থাকবেই। আদালতে যাবার মুখে কানুকে দেখে বাড়ির কর্তার মুখ কালো হয়ে ওঠে, কানু সেটা টের পায়, পরীক্ষার দিন গেট খুলে বেরোবার সময় বাচ্চারা ওকে দেখে চমকে ওঠে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও কনে-যাত্রার আগে কানুকে বাইরে পাঠাতে ব্যর্থ হয়ে সবাই অসহায় বোধ করে,—কানু এই মুহূর্তগুলোতেই তীব্রভাবে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে, একখণ্ড জ্বলন্ত গনগনে কয়লার মতো অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার অনুভূতি কানুর ভেতরটা পুড়িয়ে দেয়।

—কী কানুদা! হাঁ করে চুপচাপ কী দেখছেন? এখানে তো আপনার দেখবার মতো কিছু

না। কী বলবেন বলুন। দীপু খুব হাল্কাভাবে কথাগুলো বলল। এই খোলা-রাস্তার জনারণ্যের মধ্যেও বুকচাপা গুমোট লাগছিল, দীপু হাল্কা হয়ে একটু ভারমুক্ত হতে চাইলো। কানু দীপুর কথা শুনে হাসল। এবার পকেট থেকে নস্যি রঙের একটা কাচের শিশি বের করল, শিশিটাকে নিজের ডান হাতের মুঠোর মধ্যে অনেকক্ষণ মুচড়ে মুচড়ে কানু খেলা করল, তারপর বাঁ হাতে শিশিটাকে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দু-তিনবার টোকা দিল। টোকা দেবার মুদ্রা স্পষ্ট হলেও শব্দ শোনা গেল না, আটকে পড়া একটা ট্রাকের হর্নের আওয়াজের তলাতে চাপা পড়ে গেল। কানু এরপর সংক্ষিপ্ত দুটো মুদ্রার সাহায্যে রেডিমেড খৈনিটাকে মুখে ফেলল।

—সুরেশদাকে বলবি, মোগলকাটার শেয়ারগুলো এখন বিক্রি করলে দাম ভালো পাওয়া যাবে। দু-চারটে ইন্টারেস্টেড পার্টি আছে, কানুদার উচ্চারণগুলো স্পষ্ট এবং সাবালক শোনাল। দীপু বুঝতে পারল না কানুদার আধো-আধো কথা এত পরিষ্কার শোনাচ্ছে কিভাবে। কানুদার কথা শেষ হবার একটু পরে দেবু বাড়ি চলে গেল। দীপু বুঝল এইসব বৈষয়িক কথার মধ্যে দেবু থাকতে চায় না। কানু সজ্ঞানে এবং প্রচন্ড চেষ্টাতে কথাগুলো পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করল। কারণ দীপুর বাবা সুরেশচন্দ্র দারিদ্র্য এবং অভাবের জন্য শেয়ারগুলো বিক্রি করছেন—কানু এই বিষয়টা তার বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার করতে চাইল। দীপুরা ধনী—এমনি একটা মিথ বহুদিন চালু আছে, কানু আজকের বিকেলে এই তিন মাথাতে দাঁড়িয়ে সেই মিথটা মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়, সেইজন্য কানু চিরকালের আধো-আধো দুগ্ধপোষ্যতা ত্যাগ করে তার বক্তব্যের প্রতিটি কথা তীক্ষ্ন এবং পরিষ্কার-ভাবে উচ্চারণ করেছে। যে কোন দীর্ঘকালের স্থায়ী বিশ্বাস যা কারও মহত্ত্ব অথবা কোন স্বচ্ছলতার প্রবচন তৈরি করে, সেটা ভাঙতে পারলে কানু মাঝরাতে একরাশ কাঁচের বাসন ভাঙার শব্দ শুনতে পায়। আনন্দে সে একেবারে ডগমগ করে উঠল। বড় বড় মানুষ, সাধারণভাবে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়, কোন কেচ্ছা-কাহিনী তাঁদের সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশ পেলে আপামর জনসাধারণ আনন্দ পায়, কানু সেসব ক্ষেত্রে কোনদিন বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না। ব্যাপারটা তার কাছে অনেক দূরের এবং নৈর্ব্যক্তিক মনে হয়। কিন্তু নিকট পরিচিত এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিমন্ডলের মধ্যে এই ধরনের মিথ ভাঙতে কানু কোন মমতা দেখায় না। নিষ্ঠুরভাবে গুরুজনদের চরিত্রহনন করার মতো সত্য তথ্য পেলে কানু তার শক্তিশেল ছাড়বেই ছাড়বে। কিন্তু কানু কারও বিরুদ্ধে কোনদিন মিথ্যা রটনা বা নিন্দা করবে না। এ ব্যাপারে কানুর সততা কিংবদন্তীর মতো। কানু বুঝতে পারল যে দীপু বুঝতে পেরেছে যে সে তার ভুয়ো ধনিত্বের মিথে একটা আঘাত দিয়ে দারুণ আনন্দ পাচ্ছে। দীপুও এটা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে কানু যে ইঙ্গিত করছে সেটা সত্য। আজ সকালেই এই শেয়ার বিক্রির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য কানুকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তবু দীপু পরিষ্কার বুঝতে পারল যে তাদের পরিবারের স্বচ্ছলতা সম্পর্কে কিংবদন্তী যত ভুয়োই হোক না কেন, সে চায় না সেই ধারণাটা কেউ নষ্ট করুক। তারা গরিব হয়ে যাবে—এটা অন্য কোন লোক ইঙ্গিত করুক, এটা দীপু সহ্য করতে পারছে না। দীপুর সমস্ত শরীর ক্রোধে এবং ঘৃণাতে শক্ত হয়ে উঠল। দীপু ভাবল,—কানু শালা মরুক, একটা ঘেয়ো কুকুরের মতো মরে পথে পড়ে থাক।

[ক্রমশ]

তিমির তরাই-এ পক্ষাঘাত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, হে উৎসুকশ্রবণ, প্রদীপ্তনয়ন, এই গড় হলাম। মার্জনা করুন আমাদের এই সহস্র দৈন্য, লক্ষাধিক অসামর্থ্য—আলোকের সামনে আসার, আজ আমাদের এই দুঃস্থ দুর্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার এই অস্বাভাবিক আকুলতা, এই হুটোপুটি।

মার্জনা করুন সূত্রধরের এই পুনঃপ্রবেশ। তবু বেশিক্ষণের জন্য নয়—কথা দিচ্ছি।

আমি সেই লোকনাথ ভট্টাচার্য, ঠোঁটে সরস্বতীকে পেতে চেয়েছি, তাঁকে পাওয়াতে চেয়েছি আমাদের সকলেরই ঠোঁটে। তবে কি প্রার্থনা আমাদের শ্রুত হল অবশেষে, বরদান ঘটছে দেবীর প্রসারিত হস্তে? এই কনক, ওরে ও বৃন্দাবন, শুনছিস কাঁসর-ঘণ্টা কেউ?

হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, মনে পড়বে আপনাদের—বলেছিলাম, কে জানে, হয়তো নারী-চরিত্র আপনা থেকেই মিলে যাবে আজ। তবে কি তা সত্যই মিলতে চলেছে?

সুভদ্রের স্ত্রী, আপনি এগিয়ে আসুন। সুভদ্র তুমি কোথায় হারিয়ে আছ এই অন্ধকারে, স্ত্রীকে এগিয়ে আসতে বলো! তিনি উঠে আসুন তক্তপোশে, আমাদের এই কয়েকজনের মাঝখানে, মুখে-চোখে তাঁর আলো পড়ুক। ভালো কনক, তোমরাও ডাকো।

—আসুন-না, আসুন-না, মিসেস......কী যেন?

—রায়চৌধুরী। তাই তো? না ভুল বললাম? সুভদ্রটাই বা গেল কোথায়? ও বৃন্দাবন?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ রায়চৌধুরীই, ঠিকই তুমি বললে লোকনাথ।

—বাঃ, এই তো, চমৎকার—এইরকমই তো চাই। আসুন-আসুন, সাবধানে উঠবেন, অ্যাঁ? শাড়িটা সামলে!

বাঃ, দেখি-দেখি, এত কান্না চোখে আজ আপনার! এ কোন্ দুঃখের প্রতিমা! আমাদের নমস্কার নিন। না-না আবার ডুকরে কেঁদে উঠছেন কেন? শান্ত হোন—এই দেখুন চারিদিকের কত চোখের কত দৃষ্টি আজ আপনার চোখে চেয়ে আছে, সমবেদনার কত স্নিগ্ধ হাওয়ার তরঙ্গ এসে ঠেকছে নিশীথিনীর রঙের মতো ঐ আপনার আলুলায়িত কেশরাজিতে, আপনার গালের ঐ বিষাদাচ্ছন্ন উপত্যকায়, ঐ পার্বত্য চূড়ার মতো নাসিকাগ্রে। আপনি যেন সান্ত্বনা পান, শক্তি-সাহস-সামর্থ্য পান, আপনার জন্য প্রার্থনায় আমরা নতজানু হচ্ছি।

—হ্যাঁ মিসেস রায়চৌধুরী, আপনি শান্ত হোন, আপনি আশ্বাস পান।

—ভয়ের কিছু নেই, বুঝলেন?

—এই তো আমরা সকলে রয়েছি।

—তাছাড়া ভয় যদি থাকেও সেটা একটা সামগ্রিক ভয় যা আমাদের প্রত্যেককেই আচ্ছন্ন করেছে আজ।

—আপনি ভীত, আমরাও ভীত।

—অতএব ঐক্য।

—অতএব শক্তি।

—আমরা আপনার কাহিনী শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি।

—আহা অমন তাড়া ক'রো না তোমরা সকলে, আগে ভদ্রমহিলাকে একটু গুছিয়ে নিতে দাও, একটু নিশ্বাস ফেলার সময় দাও।

—ঐ দ্যাখো-না সমানেই কেঁদে চলেছেন, কান্নার স্রোতটা বাড়ছে বই কমছে না।

—আগে উনি কেঁদে নিন তবে, অ্যাঁ?

—সেই ভালো, আপনি যত পারুন কেঁদে নিন।

—এবং যতক্ষণ উনি কাঁদছেন, আমরা ও'র দিকে অমন তাকিয়ে থাকব না—সেটা অশ্লীল হবে। তার চেয়ে বরং চুপ করেই থাকি, চেয়ে থাকি অন্য দিকে।

—অথবা চোখ বুজি, ধ্যানস্থ হই।

—সুভদ্রের স্ত্রী, আপনি শান্ত হোন।

—আপনি শান্ত হোন।

—বাঃ এই তো বেশ হয়েছে, কান্না থেমেছে—মুখ আপনার সদ্য বৃষ্টিধৌত পৃথিবী।

—মাপ করবেন, আপনার নাম কী? জানতে পারি?

—হ্যাঁ কনক, এটা একটা ভালো প্রশ্ন। সুভদ্রের স্ত্রী বা মিসেস রায়চৌধুরী বলে লোককে আর কতক্ষণ ডাকা যায়?

—বা চেনানোর চেষ্টা করা যায়?

—আপনার নাম কী?

—অ্যাঁ? শুনতে পেলাম না! কিন্তু—দয়া করে আরেকটু জোরে!

—শুনলে বৃন্দাবন? সৌদামিনী, না?

—আমার নাম সুনন্দা।

—চমৎকার। তো বলুন সুনন্দা, আপনি কাঁদছিলেন কেন?

—আপনি চুপ করে রয়েছেন কেন?

—আপনি কথা বলুন।

—আমি...আমি স্বপ্নে...

—হ্যাঁ, আপনি স্বপ্নে?

—আপনি চুপ করে রয়েছেন কেন?

—আপনি কথা বলুন।

—আপনি আবার ভেঙে পড়ছেন কেন কান্নায়?

—হতাশায়?

—আমরা তো সকলে রয়েছি।

—আমরা এখনো রয়েছি।

—রয়েছেন উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী।

—আপনাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য রয়েছেন আমাদের প্রার্থনার দেবদেবীগণ।

—রয়েছেন দশ দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা...

—যাঁদের বন্দনা করেছি।

—রয়েছে সভা পেরিয়ে রাত্রির অন্ধকার, অরণ্যের মৌন...

—যাদের সকলেরই নিশ্বাস পড়ছে আজ আমাদের এই তপ্ত মুখে...

—নীরবতার তর্জনীতে ইঙ্গিত আমাদের মতো মানুষের প্রতি, যাতে ধীর হই, স্থির হই, সাহস সঞ্চয় করি।

—জানো ধ্রুব, আমার মনে হচ্ছে উনি আজ আমাদের একটা কথা বলতে চান, এমন একটা কথা যেটা ওঁর পক্ষে ভীষণ, হয়তো আমাদের পক্ষেও ভীষণ...

—এবং তাই যেটা উনি বলতে পারছেন না। সাহসের অভাব।

—এবং সেটা খুব স্বাভাবিকই।

—না-না-না, বলতে পারছেন না ততটা সাহসের অভাবের জন্য নয়, যতটা হয়তো নারীসুলভ এক সংকোচেরই কারণে।

—আপনি চুপ করে থাকবেন না।

—আপনি কথা বলুন।

—মাতৃরূপা যে-শক্তির প্রকাশ এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকাশে-বাতাসে...

—সকল আলোক-অন্ধকারে...

—সকল জড়ে সকল প্রাণে...

—এই আমরা করযোড় প্রার্থনা করছি যাতে আপনি নিজেকে চেনেন দ্যাবাপৃথিবীর সেই শক্তিরই অঙ্গীভূতা হয়ে...

—যাতে উচ্চারণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আপনার জিহ্বাতে এসে ভর করেন...

—যাতে যে-দেবী সর্বভূতে বাণীরূপে সংস্থিতা...

—আপনার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে নমস্কার করতে পারি।

—আপনার মধ্য দিয়ে আমরা এই তাঁকে নমস্কার করছি।

—আমরা এই নমস্কার করছি।

—আপনি মুখ খুলুন।

—আপনি আর চুপ করে থাকবেন না।

—এই সমবেত ভদ্রমণ্ডলী আপনার কাহিনী শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন।

—আমি বলি কি লোকনাথ, কনক ও বৃন্দাবন, প্রথমত সর্বসমক্ষে কোনো কাহিনী বলার অভ্যাস হয়তো নেই, দ্বিতীয়ত নারী...

—বিশেষত সে-কাহিনী যদি আবার নিজেরি কোনো অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত হয়...

—বা নিজেরি কোনো আচরণ সংক্রান্ত হয়...

—এবং সেই অভিজ্ঞতা বা সেই আচরণের মধ্যে আবার এমন যদি কিছু থাকে যা সর্বসমক্ষে বলতে নারী কেন, পুরুষেরই সংকোচ জাগতে পারে...

—আমি তাই বলছিলাম লোকনাথ, বা কনক ও বৃন্দাবন...

—যে ওঁকে এই অত্যাচার হতে মুক্তি দিই, এই তো?

—যে, কোনো কাহিনী বলার জন্যে ওঁকে আর পীড়াপীড়ি না করি, এই তো?

—হ্যাঁ, এবং না। কারণ কাহিনীটা শুনব না, এমন উদ্দেশ্য আমার নেই। আবার কাহিনীটা বলতে গিয়ে উনি এক অত্যধিক মানসিক অত্যাচারে জর্জরিত হবেন, এবং সেটা ঘটবে আমাদের চোখের সামনে—না, এমন কোনো অভিপ্রায়ও আমার নেই।

—তো তোমার অভিপ্রায়টি ঠিক কী, তা অকারণ ভণিতা না করে এবার খুলে বলবে কি শ্রীমান ধ্রুব রুদ্র? বেশি সময় নিও না, কারণ দেখছই তো, এখানে আমরা এই মুষ্টিমেয় ক'জন যেমন, তেমনই সামনের ঐ ওখানের সারে-সারে মাথার সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

—আমার অভিপ্রায়, এমন একটি পন্থাগ্রহণ যাতে কাহিনীটার যেটুকু পারি সেটুকু শুনতে

পাই, এবং একই সঙ্গে সেটা বলতেও ওঁর কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়।

—তো সে-পন্থাটি তাহলে তোমার মতে কী?

—একটা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যম। যাতে এমন না হয় যে আমরা নীরব রয়েছি, শুধু ওঁকেই সর্বক্ষণ কাহিনীটা বলে চলতে হচ্ছে, কখনো ভাষা না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে, কখনো কাঁদতে-কাঁদতে, কখনো চক্ষুলজ্জায় দিশেহারা হয়ে, নতমস্তকে, কপালে হাত রেখে।

—সেটা তো দেখছি কাহিনী শুরু করার আগেই উনি হয়ে রয়েছেন।

—উনি ভাষা না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন...

—উনি কাঁদছেন...

—কেঁদে চলেছেন...

—উনি হয়তো চক্ষুলজ্জাতেই অমন দিশেহারা এখন...

—উনি নতমস্তক...

—উনি কপালে হাত রেখেছেন।

—হ্যাঁ, তা তো দেখতে পাচ্ছি, সব মানছি। কিন্তু তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই পদ্ধতিটা, যদি আপত্তি না থাকে।

—কার আপত্তি?

—এই ধরো, তোমাদের।

—আমাদের আপত্তি থাকুক না-থাকুক, কী আসে-যায়? আসল লোককে আগে জিজ্ঞাসা করো।

—কী জিজ্ঞাসা করব?

—বাঃ, তাঁর আপত্তি আছে কিনা।

—কার আপত্তি আছে কিনা?

—কী সর্বনাশ! সুভদ্রের স্ত্রীর, মানে...কী-যেন...

—মানে সুনন্দার।

—হ্যাঁ, সুনন্দার—মানে যাঁর উপর তোমার পন্থাটি পরীক্ষা করে দেখতে চাও, তাঁর।

—নইলে তুমি কী করতে চাও না-চাও, তাতে আমাদের আপত্তি হতে যাবে কেন?

—আমরা তো কাহিনী শুনতে পেলেই খুশি...

—তা সে-কাহিনী শোনানোর জন্যে যে-পদ্ধতিই তুমি নাও-না কেন...

—বা অন্য যে-কোনো কেউ নিক-না কেন।

—না, আমার সেই পন্থায় ওঁর আপত্তি হবে না, অন্তত ধরে নিচ্ছি হবে না।

—তো বেশ তো, এতই যদি নিশ্চিত তুমি তো আমাদের মতামত চাইছই বা কেন? তোমার পন্থা তুমি সোজাসুজি নিয়ে ফেলো।

—এই হয় মুশকিল ধ্রুবকে নিয়ে...

—খেলোয়াড় মানুষ তো, কিছুরই পরোয়া করে না...

—সব তাতেই আত্মবিশ্বাসটা যেন ওর একটু অতিরিক্তভাবে বেশিই...

—এই দ্যাখো, তোমরা রাগ করবে, কিন্তু আবার আমাকে নিয়ে সেই গালমন্দ শুরু করেছ।

—বালাই ষাট, গালমন্দ? তবে এই কুলুপ আঁটলাম মুখে।

—তবে এই নাক মুললাম।

—তবে এই কান মুললাম।

—তবে এই নাকে-কানে খৎ দিলাম।

—মান-অভিমান বা রাগারাগির কথা এটা নয়—একটু মাথা ঠাণ্ডা করে শুনবে?

—আমরা তো সবসময়ই শুনতে প্রস্তুত ধ্রুব রুদ্র।

—আমার প্রস্তাবে ওঁর আপত্তি হবে না, এমন আত্মবিশ্বাসই যদি থাকে আমার তো সেটাকে তোমরা বাড়াবাড়ি মনে করছ কেন?

—যদি একসময় করে থাকি, এখন আর করছি না।

—আচ্ছা বলো তো, ওঁর কাহিনীটা উনি নিশ্চয় শোনাতে চান, নইলে হঠাৎ অমন কেঁদে উঠতে গেলেন কেন?

—কখন, এই খানিকক্ষণ আগেই?

—হ্যাঁ।

—তা সেটা তিনি কান্না রোধ করতে পারলেন না বলেই, এর সঙ্গে কাহিনীটা শোনানো বা না-শোনানোর ব্যাপারে ওঁর কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নাও থাকতে পারে।

—আচ্ছা বেশ, মানলাম। তবু উঠে তো তিনি এলেন মঞ্চে, যখন তোমরা ডাক দিলে, এলেন না? এবং সেটা তিনি কেন করতে গেলেন? শুধু তাঁর কান্নাধৌত মুখটা দেখানোর জন্যেই? বা তিনি যে সুভদ্রের স্ত্রী, নাম সুনন্দা, রয়েছেন আমাদের এই যাত্রীদের দলে, সামনের সমবেত ভদ্র-মণ্ডলীকে শুধু সে-খবরটা জানানোরই জন্যে?

—হ্যাঁ, ধ্রুব রুদ্রের যুক্তি আছে।

—অকাট্য যুক্তি।

—অতএব বলো তুমি ধ্রুববাবু এবার কী বলতে চাও।

—আমি বলতে চাই, যে-কাহিনীটা আমরা শুনতে চাই, এ নয় যে সে-কাহিনীটা উনি আমাদের শোনাতে চান না। অতএব বলা যেতে পারে, একদিকে আমাদের যেমন, অন্যদিকে ওঁরও তেমনি, আমাদের উভয় পক্ষের ইচ্ছাই এ-মুহূর্তে ধাবিত হচ্ছে একই বিন্দুর অভিমুখে, শুধু মাঝপথে কোথাও হয়তো দুটি-একটি উপলখণ্ড বা বৃহৎ-বৃহৎ পাথরের চাঁই পড়ে আছে যার ফলে ওঁর স্রোতস্বিনীটা প্রয়াগপথে আসতে-আসতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। আমার উদ্দেশ্য তাই এমন একটি অন্য পন্থা-গ্রহণ যাতে সে-বাধার সম্মুখীন ওঁকে না হতে হয়।

—অর্থাৎ বাধাটা যেহেতু ওঁরই, এবং উপলখণ্ড বা বৃহৎ-বৃহৎ পাথরের চাঁই ইত্যাদি যা পড়ে আছে, তাও যেহেতু ওঁরই পথের উপর, সুতরাং যে-পথটা উনি নেবেন বা ওঁর নেওয়া উচিত হবে বলে তোমার মনে হচ্ছে, এখন সে-পথটা উনি না নিয়ে ওঁর হয়ে তুমিই নিচ্ছ, এই তো?

—এবং এইখানে ধ্রুব রুদ্র, যদি মাপ করো তো বলি, তেমন একটা বস্তু কী করে সম্ভব হয়?

—কেমন একটা বস্তুর কথা বলছ তুমি এখন?

—সোজা কথায়, আমাদের প্রশ্নটা হল একজনের পথ অন্যজনে নেয় কী করে?

—আহা-হা ওঁর পথটা উনিই নেবেন, আমি নিতে যাব কেন?

—তুমি শুধু কোন্ পথটা নিলে ওঁর ভালো হবে, সেটা ওঁকে বাতলে দিতে চাও?

—তাও নয়। আসলে ওঁর আর আমার পথ আগেই একবার মিলেছিল একটি বিন্দুতে, এবং সেটা যখন ঘটে, তখন ওঁর আর আমার ব্যাপারের মধ্যে তোমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাই ওঁর এমন একটা অন্য পথেরও সন্ধান জানি যেটা খানিকটা আমারও পথ, এবং যে-পথ তোমাদের হয়নি—আমি সমাধান খুঁজছি সেই পথেরই সূত্রে।

—বাবা, দেখছি খুব গভীর-গভীর কথা বলছ...

—ওঁর পথ আর তোমার পথের এক গোপন মিলন নিয়ে...

—অতএব জানি না এর মধ্যে মাথা গলানো আমাদের একেবারেই উচিত হবে কিনা...

—আশা করি যা বলছ তা সত্যি, নইলে ভদ্রমহিলার সম্মানহানি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে...

—আরে বাবা, আজ শেষে এইরকমই মন হয়েছে তোমাদের? আমি কী বলতে চাচ্ছি, আর কী অর্থ তার তোমরা করতে বসেছ?

—কী তুমি বলতে চাইছ ধ্রুব রুদ্র, সেটা ঝটপট বলেই ফেলো-না তবে!

—সেটা বলতে আমায় দিচ্ছ কোথায়, তার আগেই তো আমার চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে নানান রকম জল্পনাকল্পনা শুরু করেছ।

—আর করব না, এই থামলাম। কথাটা বলে ফেলো এবার, আর ভণিতা না করে।

—সেই পৃথিবীর ছাদের উপর সেদিন আমিই একমাত্র ওঁর কান্না শুনি, যে-কান্না আজ তোমরাও শুনলে, নয় কি?

—হ্যাঁ, সত্য।

—এবং সেইটেই সূত্র।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ সূত্র ওঁর ও আমার--আমাদের দুজনের দুটি বিভিন্ন পথের সেই সাধারণ বিন্দুটি। আজকের কান্নার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনকার সেই কান্না সম্পর্কে আমি ওঁকে দুটি-একটি প্রশ্ন করতে চাই।

—অতি উত্তম। আমাদের সম্মতি রয়েছে। কী বলো বৃন্দাবন?

—সম্মতি রয়েছে।

—লোকনাথ?

—সম্মতি রয়েছে।

—অতএব তোমার প্রশ্ন তুমি করো এবার ধ্রুব রুদ্র, এ-মঞ্চ তোমার।

—তোমাদের দুজনের।

দাঁড়াও একটু ভাইসব, সুভদ্রের স্ত্রী। হে ভদ্রমণ্ডলী, সূত্রধার এই গড় হচ্ছে আপনাদের প্রতি—যাচ্ঞা করছে আপনাদের ক্ষমা, আপনাদের সকলের পদধূলি। দেখুন হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, হে রাত্রির আকাশে-আকাশে কান-পাতা দেবদেবীগণ, দেখুন-দেখুন, আজ এই পালা-গানের কী-এক অভূতপূর্ব বিচিত্র পর্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই উপনীত হয়েছি—আমাদের কাঁধের কাছে উপলব্ধি করছি কী-জানি কার আকস্মিক নিশ্বাসের বাতাস। হে শ্রোতৃমণ্ডলী, দেখুন-দেখুন, অন্ধকার তার অজ্ঞেয় মায়ায় কী করে আপনাদের সঙ্গে এক করে মিশিয়ে দিচ্ছে আমাদের, পর্দার পর পর্দা উঠে যাচ্ছে একে-একে, সব ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে। একটা কাহিনী শুরু হচ্ছে এবার, ধ্রুবের ও সুনন্দার, যা প্রথম শুনছেন শুধু আপনারাই নন, আপনাদের মতো আমরাও সমানই। অতএব আসুন প্রার্থনা করি, আপনাদের সঙ্গে আমাদের এই-যে নবলব্ধ ঐক্য, তাতে রোমাঞ্চ জাগুক আমাদের প্রতি জনার রোমকূপে-কূপে, দৃষ্টি অশ্রুসিক্ত হোক আমাদের পরিচিত-অপরিচিতদের মঙ্গল-কামনায়। আসুন প্রার্থনা করি যাতে ধ্রুব ও সুনন্দার কাহিনী যথাযথ প্রকাশিত হতে পারে আজ এই সভায়, কথার অভাবে তার যাত্রা যেন পীড়িত না হয়। আমরা উপাসনা করি বাকের, তাকে বলি এসো তুমি এসো, আজ এই লণ্ঠনের আলোছায়া আলোয় মোহিনী নর্তকীর বেশে এসো, ভ্রূভঙ্গে কাঁপিয়ে এসো আমাদের হৃদয়ের শান্ত সমুদ্রকে—এসো বাক্ এসো, সুনন্দার ওষ্ঠে এসো, সমবেত জনমণ্ডলীকে বিস্ময়ে আপ্লুত করে ধ্বনিত হওয়ার জন্য এসো। এসো হে ঈশ্বরি, কমল-লোচনে, আমাদের স্তবে সম্মুখা হয়ে এসো। বলো কনক, বৃন্দাবন, আমরা ভজনা করি বাকের,

সেই দেবীকে।

—আমরা ভজনা করি সেই দেবীর।

—আমরা আশীর্বাদ প্রার্থনা করি সেই দেবীর।

—আপনাকে নাম ধরে ডাকতে পারি?

—ঐ তো ঘাড় নেড়ে উনি সম্মতি জানাচ্ছেন, তুমি নিশ্চয় ওঁকে নাম ধরে ডাকতে পারো ধ্রুব রুদ্র। কিন্তু সুনন্দা, আপনি মঞ্চে আসতে যখন স্বীকৃত হয়েছেন, আপনার মুখের উপর যখন আলো পড়েছে, তখন ও-মুখ আপনাকে খুলতেই হবে—এভাবে ঘাড় নাড়া কিন্তু বেশিক্ষণ চলবে না।

—আহা, মুখ উনি খুলবেন, সে-ভারটা আমার। তোমরা আবার মাথা গলাতে শুরু করেছ!

—আচ্ছা বাবা, আর নয়, লোকনাথ আর কথা বলছে না।

—বৃন্দাবন আর কথা বলছে না।

—কনক আর কথা বলছে না।

—আমি বলি কি—অবশ্য যদি কিছু মনে না করো...

—ভণিতা করছ কেন ধ্রুব, ব'লে ফেলো না!

—বলছিলাম, মঞ্চ যখন ছেড়েই দিয়েছ আমাদের দুজনের হাতে, তো অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে আমাদের একলা হতে দাও-না কেন...

—অর্থাৎ আমরা তক্তপোশ হতে নেমেই দাঁড়াই-না কেন...

—হ্যাঁ, সময় হলে আবার তোমাদের ডাকব।

—কোনো আপত্তি নেই। কনক?

—আপত্তি নেই।

—বৃন্দাবন?

—আপত্তি নেই।।

—বলছিলাম এই কারণে, যাতে সমস্ত আলোগুলো এবার পড়তে পারে আমাদের দুজনেরই মুখের ওপর, যাতে আস্তে-আস্তে বাইরের জগৎটা দৃষ্টি হতে মুছে যায়। হয়তো মুখ খোলা ওঁর পক্ষে তাতে সহজ হবে।

—কোনো আপত্তি নেই। আমরা এই নেমে দাঁড়াচ্ছি। এসো কনক, এসো বৃন্দাবন।

—এই নামলাম।

—নামলাম।

—সুনন্দা, ওরা নেমে গেছে। ওদের নামতে যাওয়ার ফলে তক্তপোশ হতে যে-সামান্য ধূলিকণা হয়তো উপরে উঠেছিল, এতক্ষণে তাও নিশ্চয় ঐ তক্তপোশেরই উপর আবার ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। একবার কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করুন, কী-এক আশ্চর্য নীরবতা চতুর্দিকে। শুনছেন? শুনতে পাচ্ছেন?

—প্যাচ্ছি।

—অর্থাৎ এখন আমরা কী বলি না-বলি বুঝলেন, তা শোনবার জন্যে সারা জগৎ টুঁ শব্দটি করছে না।

—ও বাবা, আমি পারব না!

—আপনি কী পারবেন না?

—আমি কিছু বলতে পারব না।

—সেটা আমরা দুজনে মিলে দেখছি। তার আগে আমার একটা কথার জবাব দেবেন?

—ও বাবা, আমি পারব না, আমি কিছুতে পারব না।

—সুনন্দা!

—ও বাবা, আমি বলতে পারব না। আমি কেন এলাম?

—সুনন্দা!

—আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাদের পায়ে পড়ি।

—তো মঞ্চে উঠে আসতে গেলেন কেন?

—আমার ঘাট হয়েছে, আমার অন্যায় হয়েছে—জয় বাবা কেদারনাথ! আমাকে আপনারা মাপ করুন।

—তো মঞ্চে উঠে আসারও আগে আপনি কাঁদতে গেলেন কেন?

—আমার ঘাট হয়েছে, আমার অন্যায় হয়েছে—জয় বাবা কেদারনাথ বদ্রিনাথ! আমাকে আপনারা মাপ করুন।

—সুনন্দা! মাপ করবেন আমার এই গলার স্বর। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে আনার ভার যখন এবার আমারই উপর, জোর না করে আমার উপায় নেই। বলুন আপনি কাঁদলেন কেন? আপনাকে বলতেই হবে।

—জয় বাবা কেদারনাথ! জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—এখন ফেরার পথ আপনার নেই। জানেন আপনি কী করতে চলেছেন?

—না।

—না কী! নিশ্চয় জানেন আপনি।

—কী?

—এখন যা বলছি তার জন্যে পারেন তো আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি জানেন বারাঙ্গনা কাকে বলে?

—না।

—আপনি জানেন না বেশ্যা কাকে বলে?

—আপনি কেন এসব কথা আমায় বলছেন?

—বলছি, কারণ এক বেশ্যা ধরুন ঘরে ঢুকেছে কারুর...

—হ্যাঁ।

—স্বেচ্ছায়। কারণ যার ঘরে ঢুকেছে সে তাকে কোনো জোর করেনি।

—হ্যাঁ।

—ঢুকে সে নিজেই আস্তে-আস্তে দরজাটা বন্ধ করেছে।

—কে?

—ঐ বেশ্যা।

—তারপর?

—তারপর ধরুন একটি-একটি করে তার আভরণ সে উন্মোচন করতে শুরু করল। ঐ দেখুন গলা থেকে হারটা খুলছে...

—তারপর?

—তারপর ঐ দেখুন হাতের বালা দুটো, একটার পর একটা।

—তারপর?

—তারপর ধরুন তার শাড়ি, ব্লাউজ, তাও খুলতে শুরু করল-- একটার পর একটা। নিজে-নিজেই, কারণ তাকে কেউ জোর করেনি।

—ঘরে আর কে আছে?

—বাঃ, যার ঘর সে আছে! সে শুয়ে রয়েছে খাটের ওপর! সে অপেক্ষা করছে!

—তারপর?

—তারপর একে-একে ঐভাবে যখন তার সমস্ত আভরণ উন্মোচিত, সমস্ত বসন উত্তোলিত, বারাঙ্গনা সম্পূর্ণা নগ্না, দেহখানি তার ঐ শায়িত পুরুষের চোখে বসন্তের কোন্‌ প্রস্ফুটিতা কনকচাঁপার মতো, তখন ধরুন শায়িত পুরুষ হাত বাড়িয়ে ডাকল তাকে—দেখুন-দেখুন, ঐ ডাকছে!

—তারপর?

—তারপর আশ্চর্যের আশ্চর্য, কোথাও কিছু নেই, বারাঙ্গনার হঠাৎ কী-মতিগতি হল বোঝা গেল না।

—কী হল?

—ঐ-যে খুলে-ফেলা কাপড়চোপড়গুলো অযত্নে পড়ে ছিল মেঝের উপর, বা যে-শাড়িটাকে হয়তো তাড়াতাড়িতে কোনোরকমে পাট করে টাঙিয়ে রাখে চেয়ারের হাতলে সে নিজেই?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ?

—সেগুলো আবার সে দুমদাম করে পরতে শুরু করল।

—তারপর?

—তারপর এমন উস্কানি যখন তুমি নিজেই দিয়েছ পুরুষটিকে, সে তখন থেমে থাকে কী করে?

—সে কী করল?

—সে ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল! সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটার উপর!

—তারপর?

—মেয়ে তখন হঠাৎ কী-সতীসাধ্বীর রানী গো, কী তার কাকুতি-মিনতি, এই কান্নায় উথলে ওঠে, এই পায়ে পড়ে...

—তারপর?

—এই বলে জয় বাবা কেদারনাথ! এই বলে জয় বাবা বদ্রিনাথ!...আরে-আরে, আপনি আবার অমন কাঁদতে শুরু করলেন কেন? এই সুনন্দা!

—আপনি তাহলে সব দেখেছেন?

—সুনন্দা!

—আপনি তাহলে সব শুনেছেন?

—সুনন্দা!

—আমার সম্বন্ধে এত কথা আপনি কী করে জানলেন?

—সুনন্দা, আপনি এসব বলছেন কী?

—কিন্তু ঐ ঠান্ডায় সেদিন আপনি আড়ি পাততে গিয়েছিলেন? বাইরের ঐ ঝমঝম বর্ষায়?

—সুনন্দা!

—নাকি তাঁবুর মধ্যেই লুকিয়ে ছিলেন কোথাও?

—সুনন্দা! আপনি এসব বলছেন কী?

—কিন্তু সেদিন তাঁবুতে তো কোনো আলো ছিল না, আপনি এসব দেখলেন কী করে?

—আপনি এসব কী বলছেন সুনন্দা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—আপনি সব বুঝছেন, আপনি সব বুঝেছেন...

—সুনন্দা!

—এখন এতগুলো লোকের সামনে আমার মুখোশটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চান।

—সুনন্দা!

—জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—সুনন্দা!

—জয় বাবা কেদারনাথ!

—সুনন্দা!

—নাকি ও-ই আপনাকে বলতে গেছে সব? ওর কাছ থেকে শুনেছেন, না?

—কার কাছ থেকে শুনেছি? কী শুনেছি?

—বুঝেছি, সব বুঝেছি—এতক্ষণে বুঝেছি।

—কী বুঝেছেন? এ তো মহা মুশকিল হল দেখছি। আরে এই লোকনাথ ভটচায, সূত্রধার মশাই গেলে কোথায় গো তুমি?

—কেন? এই তো রয়েছি।

—এবার উঠে এসো ভাই আলোয়।

—কেন?

—আমার যে ভয় ধরতে শুরু করেছে।

—কেন?

—কী জানি, ব্যাপার-স্যাপার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

—কিছু হাতছাড়া হচ্ছে না।

—ম্যানেজ করতে পারছি না।

—খুব পারছ। এবার তোমার গপ্প তুমি সামলাও চাঁদ—আমাদের আবার ডাকা কেন, হ্যাঁ বৃন্দাবন?

—সত্যিই তো, নিশ্চয়—আমাদের তো তাড়িয়েই দিলে মঞ্চ থেকে!

—তাছাড়া জমছে-জমছে-জমছে, প্রচণ্ড ভালো লাগতে শুরু করেছে—এখন রণে ভঙ্গ দেবে না তুমি কর্তা!

—চালিয়ে যাও ধ্রুব রুদ্র!

—তো বেশ, চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু...আচ্ছা দেখুন সুনন্দা, আপনাকে একটা কথা সরাসরি বলছি আমি, একটা সত্যি কথা বলছি। আমি কিন্তু কোনো ঝমঝম বর্ষার রাত্রে অমন কোথাও আড়ি পাততে যাইনি, বিশ্বাস করুন।

—ঐ দেখুন, রাত্তিরটাও বলে বসলেন আপনি!

—মানে?

—মানে আমি শুধু ঝমঝম বর্ষার কথাই বলি, রাত্তিরের কথা তো আমি বলিনি।

—মানে?

—মানে সেদিন ঐ ঝমঝম বর্ষায় ওটা যে রাত্তিরই ছিল, তা পর্যন্ত আপনি জানেন।

—বাঃ, আপনি নিজেই তো বললেন অন্ধকার, তাঁবুর মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে না?

—কিন্তু মিলটা যে সাংঘাতিক, যা শুনেছেন, দেখেছেন, বলছেন...

—বিশ্বাস করুন, আমি ওসব কিছু শুনিনি, আমি ওসব কিছু দেখিনি।

—তো বলতে পারলেন কী করে কথাগুলো?

—সেটা শুধু একটা উপমা দেওয়ার জন্যে! একটা তুলনা দেওয়ার জন্যে!

—কিসের তুলনা?

—আপনার অবস্থাটার।

—আমার কোন্ অবস্থাটার?

—এই-যে ডাক দিতেই অল্পক্ষণের মধ্যে আপনি মঞ্চে ঠিকই এসে হাজির হলেন, অথচ মুখ কিছুতে খুলবেন না—একটু চাপ দিয়েছি কি হয় নতুন করে কাঁদতে শুরু করবেন, নয় গোঙাতে-গোঙাতে বলবেন জয় বাবা কেদারনাথ, জয় বাবা বদ্রিনাথ! আপনিই বলুন, এটা কি খুব উচিত কর্ম হচ্ছে? তাহলে উঠে আসতে গেলেন কেন, ঐ ভিড়ের অন্ধকারে হারিয়ে থাকলেই পারতেন। আপনাকে জোর তো করতে যায়নি কেউ, আপনি নিজে থেকেই এসেছেন—বলুন সত্য কিনা!

—হ্যাঁ সত্যি। আমি তো অস্বীকার করছি না...

—তবে? তবে এই ছিনালিপনা কেন? মাপ করবেন আমার কথার ধরনটা, কিন্তু মানুষের রাগ হয় না? এদিকে এত লোকের আগ্রহ আপনি জ্বালিয়ে রেখেছেন, সকলে হাঁ করে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আপনি যা করছেন তা আমার কাছে মনে হয় একটা ন্যাকামি, একটা ছিনালিপনা, এবং সেই ছিনালিপনার সূত্রেই ঐ বেশ্যার তুলনাটা আপনা থেকেই এসে পড়ে, বলে ফেলি। ব্যস, এর বাইরে আর কিছু নেই—বিশ্বাস করুন। আড়ি পেতে কিছু শোনা, বা অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে কিছু দেখা, এসব কোনো প্রশ্নই নেই।

—তাই যদি সত্যি হয় তো মাপ করবেন, ভারী আশ্চর্য মানুষ যা-হোক আপনি!

—কেন?

—কারণ একজন অপরিচিতা নারীর সঙ্গে প্রথম কথা বলতে গিয়ে যে-তুলনার কথা আপনার মনে জাগে, তা একটা বেশ্যার তুলনা।

—আপনি নেহাত মিথ্যা বলেননি। আমার মনে হয় আপনার কাছে আমার মার্জনা চাওয়া উচিত—অনুগ্রহ করে আমায় মার্জনা করবেন। আসলে কী জানেন, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে আপনার সঙ্গে এ-ধরনের কথোপকথন চালানোর কল্পনাও হয়তো আমি কখনো করতে পারতাম না। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা তো খুব স্বাভাবিক নয় আজ—যা ঘটে গেছে, সেই বিরাট বিপর্যয়ের কথাটাই ভেবে দেখুন একবার! তাছাড়া রয়েছে এই সভাটাও, মঞ্চের উপর আমাদের এই বিচিত্র ভূমিকাটাও, এই অন্ধকার হতে অন্ধকারে অগণ্য মাথার সারি, লণ্ঠনের মায়াময় আলোছায়া-আলো—সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, বুঝলেন!

—জয় বাবা কেদারনাথ! জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—আচ্ছা দাঁড়ান তো একটু, খেই পাছে হারিয়ে না যায়। আপনি কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক-গুলো কথা বলে বসলেন, অনেক ইঙ্গিত দিলেন। এর প্রতিটিকে নিয়েই ভিন্নভাবে লাগতে হবে আমাকে, তার আগে প্রথম যে-প্রশ্নটা করতে চেয়েছিলাম, সেরে নিই—উত্তরটা দেবেন এবার?

—আপনার প্রশ্নটা কী?

—আজ তো দেখলামই, সকলেই দেখলাম। কিন্তু সেদিনও, সেই ছাদের ওপর—কে কেঁদে ওঠে? আপনিই?

—হ্যাঁ।

—কেন? অর্থাৎ কেন কেঁদে ওঠেন সেদিন? কিংবা দাঁড়ান, সেদিনের বদলে আজ কেন কেঁদে

উঠলেন, আগে সেইটে বলুন। হয়তো এ-পদ্ধতিটা আরো সহজ হবে, কেমন?

—জয় বাবা কেদারনাথ!

—সুনন্দা! আসুন, আমার সঙ্গে চেষ্টা করুন একটু! আজ বেরিয়ে যাক একটা-কিছু এ-সভায়, একটা সত্য, একটা তথ্য, একটা গোপন খবর কোনো—যা-ই কিছু হোক-না কেন! আসুন-আসুন, অন্ধকারে আর কত ঢিল ছুঁড়ব এমন!

—জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—সুনন্দা! আজ হঠাৎ অমন কেঁদে উঠতে গেলেন কেন, বলুন! ভালো কথায় যদি না হয় তো এবার জোর করব আপনাকে।

—বলছি। কী জিজ্ঞেস করছেন আর-একবার করুন।

—আজ কাঁদলেন কেন?

—কাঁদলুম, কারণ আপনারা কেউ বললেন-না, কার পাপে এসব ঘটেছে? তাই।

—মানে?

—মানে বলছিলেন-না, এটা ঘটল কার অভিশাপে, কোন্ নরের পাপে, কোন্ নারীর পাপে? তাই। তাই আমি কাঁদলুম, বুকটা আমার ভেঙে দুমড়ে গেল।

—কেন আপনার বুক ভেঙে দুমড়ে যাবে? আপনি কী করেছেন?

—আপনারা আমাকে শাস্তি দিন, আমাকে পদাঘাত করুন।

—সুনন্দা, আপনি কী করেছেন?

—আমি পাপ করেছি, আমার পাপেই এসব হয়েছে।

—এসব হয়েছে মানে?

—এই বরফ শুকিয়ে গেছে, এই চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। আরো কত সর্বনাশ হয়েছে, কত সর্বনাশ, এই পৃথিবী রসাতলে যাবে গো, যাবে—আপনারা এখনো জানেন না, আমি জানি, আমি সব জানি।

—আপনি কী জানেন?

—আমি সব জানি।

—কেমন করে আপনি জানেন? কোত্থেকে জানেন? কে আপনাকে জানিয়েছে?

—আমাকে কেদারনাথ জানিয়েছেন, আমাকে বাবা বদ্রিনাথ জানিয়েছেন।

—আপনি দেখেছেন তাঁদের? তাঁরা সশরীরে এসে আপনাকে বলে গেছেন?

—আমি স্বপ্নে সব দেখেছি।

—তাঁদেরও দেখেছেন?

—তাঁদের দেখিনি। কিন্তু যা দেখেছি, তা আশ্চর্য, তা সত্যি হতে পারে না—তবু তা সত্যি হয়েছে। কী করে হল? এমন আশ্চর্য জিনিস কী করে সত্যি হল? এ-স্বপ্ন বাবা কেদারনাথ আমায় না দেখালে কে দেখাবে? বাবা বদ্রিনাথ না দেখালে কে দেখাবে?

—ঠিক কথা, খুব ঠিক কথা। কিন্তু কী-স্বপ্ন আপনি দেখেন? মনে পড়ে?

—হ্যাঁঃ, মনে আর পড়বে না! মুখস্থ হয়ে আছে।

—বলুন-না তবে!

—আমি স্বপ্ন দেখি, আমরা গিয়ে পৌঁছেছি ঐ ছাদের ওপর, ঐ গোমুখের কাছে—এবং সকলে চমকে চেয়ে আছি, চোখে পলক পড়ে না, দেখছি বলে বিশ্বাস হয় না।

—অর্থাৎ বাস্তবে যেটা শেষ পর্যন্ত ঘটল, তাই—তাই না?

—একেবারে তাই, হুবহু তাই। এমন-কি আপনি যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আরো অনেকে ঠিক যেমন-যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের সকলকে আমি স্বপ্নে দেখি—একেবারে সেইরকম, ঠিক তেমনি-তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

—আর সেই কারণেই আপনি কেঁদে ওঠেন? অর্থাৎ প্রথম দিন, ঐ ছাদের ওপর?

—অ্যাঁ? কোন্ কারণে?

—অর্থাৎ স্বপ্নে যেটা দেখেন, সেইটেই হুবহু এমন বাস্তবে ঘটতে দেখেছেন, তাই কেঁদে ওঠেন? একধরনের ভয়ে, বিস্ময়ে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। কতকটা তাই বটে।

—কতকটা আবার কেন?

—জানি না। জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—আচ্ছা দাঁড়ান তো, স্বপ্নটা আপনি কবে দেখেন? ছাদে পোঁছনোর কদ্দিন আগে?

—আমাকে আপনারা শাস্তি দিন, আমাকে আপনারা লাথি মারুন। আমার মুখে আপনারা থুথু ফেলুন। জয় বাবা কেদারনাথ, জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—স্বপ্নটা আপনি কবে দেখেন?

—জয় বাবা...

—সুনন্দা! এটা বলতে হবে আপনাকে।

—ও শুনছে।

—কে শুনছে?

—ও।

—সুভদ্র?

—হ্যাঁ।

—তা শুনুক। সকলে শুনছে। এটা ওর একলার ঘটনা নয়, বা আপনার একলার ঘটনা নয়, বা আপনাদের দুজনেরই ঘটনা শুধু নয়।

—তা তো নয়ই, নয়ই, এটা যে আরো একজনের ঘটনা।

—এটা আমাদের সকলের ঘটনা। বলুন, আপনাকে বলতে হবে।

—জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—কবে আপনি স্বপ্নটা দেখেন?

—সেই তাঁবুর রাত্রে।

—কোন্ তাঁবুর রাত্রে?

—সেই ঝমঝম বৃষ্টির সন্ধ্যায়।

—কোন্ ঝমঝম বৃষ্টির সন্ধ্যায়? কদ্দিন আগে? কোথায়?

—কেদারনাথ হয়ে ফেরার পথে। সোনপ্রয়াগে।

—ওঃ-হো-হো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই ঝমঝম বর্ষার রাত। সেই রাত্তিরেই তো শেষের দিকে আমাদের তাড়াহুড়ো করে বাস ধরার কথা—আগে পোঁছোতে হবে শ্রীনগর, পরে সেখানে নেমে বাস বদল করে উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী অভিমুখে। হ্যাঁ-হ্যাঁ স্পষ্ট মনে পড়ছে রাতটা, কী ঝড়-ঝাপটা, কী-মেঘের গর্জন, কী-বিদ্যুৎ চমকানো—মনে হচ্ছিল আলো ফুটলে হয়তো দেখব পাহাড়টা একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে। আর তাছাড়া সেই রাত্তিরেই তো...দাঁড়ান-দাঁড়ান...লোকনাথ, এই লোকনাথ?

—বলো।

—সেই রাত্তিরেই তো ভোরের দিকে তুমি পা পিছলে পড়ো?

—নিশ্চয়। এবং তুমি টর্চ হাতে এগিয়ে না এলে মৃত্যু ছিল আমার অবধারিত।

—হ্যাঁ, আপনি বলে যান সুনন্দা!

—আচ্ছা, আপনারা মাপ করবেন, সূত্রধার আবার এখানে মাথা গলাচ্ছে একটু একবার।

—কী চাও লোকনাথ, ব'লে ফেলো!

—এতক্ষণ তোমাদের দুজনকে ছেড়ে দিই একলা, এখন কি আমি যোগদান করতে পারি তোমাদের কথোপকথনে?

—আমার আপত্তি নেই...

—বলছিলাম এই কারণে যে এতক্ষণে ওঁর আড়ষ্ট ভাবটা তো বেশ কেটে গেছে দেখছি, তাছাড়া যে-রাত্তিরের কথা হচ্ছে সে-রাত্তিরে আমারও একটা ঘটনা ঘটে এবং যে-ঘটনার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হল এক্ষুনি...

—বললামই তো, যদি সুনন্দার আপত্তি না থাকে তো আমার কোনো আপত্তি নেই। বরং আমি তো বলব তাতে জমবে হয়তো আরো একটু ভালোই—আমার কেমন গা-ছমছম করতে শুরু করেছিল, একটু একলা বোধ করছিলাম। কী সুনন্দা, রাজী?...হ্যাঁ, দেখে-শুনে মনে হচ্ছে রাজী। অতএব এগিয়ে এসো লোকনাথ, ওপরে উঠে পড়ো।

—যাক, ওঠা গেল তবে। হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, এই গড় হলাম।

—না-না কনক-বৃন্দাবন, তোমরা নয়, এখনো নয়—সময় আসবে, তখন একে-একে ডাক দেব। হ্যাঁ সুনন্দা, এতক্ষণ আমি একলা আপনাকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, এবার লোকনাথও এসে যোগ দিল—আপনার কোনো ভয় নেই। বলুন, আরো ভালো করে বলুন যা বলছিলেন।

—উঃ, মনে পড়ে ধ্রুব? বৃষ্টি তখন থেমেছে, তবু সেই ভোরের অন্ধকারে পথটা কী ভয়ংকর পেছল হয়ে ছিল সেদিন!

—চুপ করো, সুনন্দাকে বলতে দাও এখন। হ্যাঁ, তবে সেই রাত্তিরে আপনি স্বপ্নটা দেখেন। কী দেখেন এবার ভালো করে বলুন। বা সে-রাত্তিরের যদি অন্য কোনো ঘটনা থাকে যা বলতে চান, তো তাও বলুন।

—আছেই তো, খানিকক্ষণ আগে উনি নিজেই তো বলতে যাচ্ছিলেন, শুনলে না? ঐ আড়ি পাতার কথা, হ্যানো-ত্যানো, ইত্যাদি?

—আঃ লোকনাথ, তুমি সূত্রধারই হও আর যাই হও, এভাবে যদি প্রতি কথায় মাথা গলাতে থাকো তো এক্ষুনি আবার তোমায় তলায় পাঠিয়ে দেব।

—মাপ করো ভাই, ক্ষমাঘেন্না করে দাও।

—হ্যাঁ সুনন্দা, আমরা সকলে শুনছি কিন্তু। কী ঘটেছিল সেই রাত্রে?

—হঠাৎ ঝড় উঠেছিল, কী ভীষণ ঝড় উঠেছিল...সবে আমরা ফিরেছি তখন কেদারনাথ থেকে, অতটা পথ হাঁটা, ক্লান্ত...নাঃ, আমি পারছি না, আমাকে আপনারা মাপ করুন, মাপ করুন...

—আপনাকে বলতে হবে...

—সুনন্দা, আপনি বলতে পারবেন...

—সুনন্দা, আমরা প্রার্থনা করছি যাতে আপনি বলতে পারেন...

—আমরা প্রার্থনা করছি যাতে সত্যবাদিনী শক্তি আপনার জিহ্বায় এসে ভর করেন...

—আসুন তিনি আসুন উদার আকাশ হতে...

—অনন্ত আলোক হতে...
—ঐ তিনি আসছেন, ঐ-ঐ, পক্ষ মেলে মুক্ত বিহঙ্গম...
—একটি জ্যোতির রেখা...
—ঐ তিনি কাত হয়ে নামছেন ছোঁ-মারতে-চাওয়া চিলের মতো...
—ঐ ছুঁলেন-ছুঁলেন বলে আপনার স্ফুরিত অর্ধ-কম্পিত ওষ্ঠাধর...
—ঐ আপনি মুখটা ঈষৎ খুললেন...
—ঐ সেই জ্যোতি মিলিয়ে গেল আপনার মুখ-গহ্বরে...
—ঐ আপনি মুখ বন্ধ করলেন...
—ঐ আপনার চোখের চাউনি কেমন পাল্টে যাচ্ছে...
—ঐ আপনি কেমন যেন ভিন্ন মানুষে পরিণত হচ্ছেন...
—আপনাকে আমরা নমস্কার করি...
—আপনার মধ্যে আমরা সেই শক্তিকে নমস্কার করি...
—সেই দেবীকে...
—যে-দেবী সর্বভূতে বাণীরূপে সংস্থিতা...
—তাঁকে নমস্কার করি তাঁকে নমস্কার করি তাঁকে নমস্কার করি...
—আপনাকে আমরা নমস্কার করি আপনাকে নমস্কার করি আমরা আপনাকে নমস্কার করি...
—সুনন্দা ঐ আপনি মুখ খুলছেন...
—সুনন্দা ঐ আপনি কথা বলে উঠলেন বলে...
—এবার চুপ ধ্রুব...
—এবার চুপ লোকনাথ!

—ও-লোকটাকে আমি কখনো দেখিনি আগে, এবং হয়তো আর কখনো দেখব না। এমন-কি কেদারনাথে যাওয়ার পথে সেই প্রথমবার যখন সোনপ্রয়াগে থামি, তখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হ্যাঁ, সেদিন সবে তখন কেদারনাথ থেকে ফিরেছি, সারা শরীরটা ঘামে নেয়ে গেছে, পা দুটো আর চলছে না—আর হ্যাঁ, ছড়ে গিছল একজায়গায়, হাঁটুর ওপর, অথচ শাড়িটা তুলে-যে দেখব একবার, সে-সময়ই পাই না...

—কিন্তু কে লোকটা?
—চিনিনে।
—নাম কী?
—জানিনে।
—দেখতে কেমন?

—তাও-কি ছাই জানি! ভালো করে দেখলুম কোথায়! হয়তো দেখিইনি, একবারও ওর মুখের ওপর ভালো করে চোখ রাখিনি—তাই আবার যদি কোনোদিন দেখা হয়ও, চিনতে পারব না।

—কিন্তু সে করলটা কী? তার কথা উঠছে কেন?

—বলছি। সোনপ্রয়াগে সেই কলটা ছিল, মনে পড়ে? ঐ যেখানে মুখ-টুখ ধুতে যেতুম?

—বেশ মনে পড়ে। ঐ-তো তাঁবুগুলো ছাড়িয়ে একটু ওপরে—আরো ওপরের কোনো ঝরনা থেকে পাইপে বয়ে জল নিয়ে আসা হয়েছে।

—হ্যাঁ। ফিরে আমি সেখানে গেছি হাতমুখ ধুতে, আর শাড়িটা তুলে একটু দেখতেও, কোথায় ছড়ে গেছে না-গেছে। জায়গাটা তো একটু নিরিবিলি, আর তখন সন্ধ্যেও প্রায় হয়-হয়,

ভালো করে কিছু দেখা যায় না, কাছাকাছি কাউকে দেখতেও পাচ্ছি না—তাই শাড়িটা তুলেছি, জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখছি কিছু ক্ষত আছে কি না-আছে, খুঁজে পাচ্ছি না, তবু দেখছি, নিচু হয়ে, কোমরটা বেঁকিয়ে, আর পায়ের ওপর আমার সামনে জল পড়ে যাচ্ছে, কী ঠাণ্ডা, কনকনে ঠাণ্ডা, বড্ড ভালো লাগছে ঐ পরিশ্রমের পর...এমন সময় হঠাৎ কোত্থাও কিছু নেই, কারুর পায়ের শব্দও তেমন পাইনি, হঠাৎ কোত্থেকে একটা হাত খপ করে জাপটে ধরল।

—আপনাকে?

—হ্যাঁ।

—কী করল? পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল?

—না, ঝাঁপিয়ে পড়া নয়—আমাকে শুধু ছুঁল।

—এই-যে বললেন জাপটে ধরল?

—ঐ একই হল, যেখানটা ছুঁল সেখানটা জাপটেই তো ধরল।

—কোন্‌খানটা ছুঁল?

—ওঃ, জয় বাবা বদ্রিনাথ, বাবা কেদারনাথ!

—আঃ থাক না ধ্রুব, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানার কী আছে? দেখছ না বলতে ওঁর কষ্ট হচ্ছে?

—না-না ধ্রুববাবু, জিজ্ঞেস করে আপনি বেশ করেছেন। আমায় বলতে হবে, আজ আমায় কষ্ট পেতে হবে।

—ওরে বাবা, এ-কী পরিবর্তন!

—আপনি বলতে পারবেন, আপনি সব বলতে পারবেন এখন সুনন্দা। শক্তি আপনার জিহ্বায় ভর করেছেন।

—কোন্‌খানটা আবার ছোঁবে? আমি নিচু হয়ে পা'টা ধুচ্ছি—খপ করে আমার বুকে হাত। ...না, আজ এই পাপের কথা আমায় বলতে হবে, আমারই নিজের এই পাপের কথা—ঈশ্বর আমায় শক্তি দিন, ঈশ্বর আমায় সাহায্য করুন।...হ্যাঁ, খুব সম্ভব আমার বাঁ স্তনটাই—ব্লাউজ ছিল, তবু জাপটেই ধরে। হাতখানা শক্ত, পুরুষের মতো, সে-হাতের ছোঁওয়া পাওয়ার অভ্যেস আমার নেই। তাই চমকে উঠি, সারা শরীরে শিহরন বয়ে যায়।

—সুনন্দা, একটি নারী নেই এখানে যার সঙ্গে এসব কথোপকথন চালাতে পারেন—আমাদের ক্ষমা করবেন।

—আপনারা কী দোষ করেছেন? সমস্ত দোষ তো আমারই—বলতে আমাকেই হবে। আর পরপুরুষকে এসব কথা বলা যদি নারীর পক্ষে কষ্টকর হয় তো সেটাকেও আমি মেনে নেব আমার শাস্তির অঙ্গ হিসেবে, আমার প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ হিসেবে।

—বেশ, বলে যান—আপনার শক্তি এবার আমাদেরও শক্তি দিচ্ছে। এইভাবে কথা আপনাকে বলাতে বাধ্য করার জন্য যে-স্বাভাবিক এক অপরাধ-বোধ আমাদের একটু আগে পীড়িত করতে শুরু করে, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই, মুক্তি পাব, মুক্তি যেন ইতিমধ্যেই পেতে চলেছি। সমস্ত সংকোচ জীর্ণ বস্ত্রের মতো গাত্র হতে ফেলে দিতে হবে—এই দিলাম।

—হ্যাঁ সুনন্দা, যা বলছিলেন আপনি। সারা শরীরে শিহরন বয়ে গেল। কিন্তু লোকটাকে দেখলেন? কে সে?

—চমকে উঠেই তার মুখের দিকে একবার তাকাবার চেষ্টা করি, অল্প যেন দেখি-ও। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা ব্যক্তি, এদেশের লোকই হবে, মানে পাহাড়ী—খুব ভদ্রও হয়তো তেমন নয়, অন্তত ভদ্রলোক বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তা নয়। জামাকাপড় অতি সাধারণ, বোধহয় খুব

পরিষ্কারও নয়—অবশ্য বলতে পারব না. ঐ অল্প আলোয় ভালো করে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না তখন।

—বয়স কত হবে?

—বলা শক্ত। এমনিতেই তো পাহাড়ীদের বয়স বোঝা যায় না—তাছাড়া ঐ অল্প আলো তখন, আমারও মনের অমন উথালপাথাল অবস্থা, ভালো করে ঠাওর করতে পারিনি কিছুই।

—তবু একটা আন্দাজ তো করেছিলেন? না তাও করেননি? কিশোর, যুবক...

—ঠিক বলতে পারছি না, তবে মনে হয় যেন মাঝবয়সী, মানে এই চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ বছর হবে হয়তো। শুধু যেটা জানি, তা গালটা খুব কামানো ছিল না, দাড়ি ছিল, খচখচে দাড়ি।

—ঐটুকু আলোতেই দেখলেন সেটা?

—না, ওটা দেখিনি—অনুভব করেছি। পরে।

—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি চেঁচিয়ে উঠলেন নিশ্চয় তখন?

—গিয়েছিলাম বোধহয় চেঁচাতে, মনে নেই। তবে ওর হাতটা সজোরে ঠেলে সরিয়ে দিই, সেটা মনে পড়ে।

—তখন?

—তখন...জয় বাবা কেদারনাথ! তখন ও আমাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়। ওর হাত খেলা করতে থাকে আমার বুকে, এত স্নিগ্ধ, অথচ এত তপ্ত, এত আরামদায়ক সেই হাতের স্পর্শ! আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি আস্তে-আস্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, কেমন একটা মুহ্যমান অবস্থা আমার সারা শরীর-মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যেন মেঘের একটা জাল আমার চতুর্দিকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর সেই জালে সম্পূর্ণ ধরা যখন আমি পড়ে গেছি, তখন কেউ জালটা গোটাতে শুরু করেছে, এবং আমি বুঝছি আর পালাবার পথ আমার নেই, আমি বন্দী কার নাগপাশে—অথচ নাগপাশটা খারাপ লাগছে না, বরং ভালোই লাগছে, খুব ভালো লাগছে, চোখের সামনে সেই উল্টোদিকের অন্ধকার-হয়ে-আসা পাহাড় আমার চোখে আর একেবারেই ভীষণ বলে প্রতিভাত হচ্ছে না। ঐ ঘন অরণ্যও মনে হচ্ছে যেন কোন্ মায়াকানন।

—এভাবে কতক্ষণ চলল?

—জানি না। আমার চৈতন্য নিশ্চয় একেবারে লুপ্ত হয়, তাই সময়ের কোনো খেয়ালই ছিল না। খেয়াল হয় যখন সহসা সেই প্রচণ্ড শব্দ শুনি।

—কিসের শব্দ?

—মেঘের গর্জন। আকাশের দিকে তাকিয়েই বুঝি ভীষণ ঝড় আসন্ন, এবং ঝড় আরম্ভ হল দেখতে-দেখতে, সঙ্গে বৃষ্টি, বোধহয় মিনিট খানেকের মধ্যেই একেবারে নেয়ে গেলাম। অথচ...অথচ যেন নড়ারও ক্ষমতা নেই, সমস্ত শরীরটা এমন অবশ হয়ে গেছে। না-না অবশ ঠিক নয়, সেটা বললে মিথ্যে কথা বলব, একটা মাদকতা, সারা শরীরে একটা আগুনের শিখা—এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনো হয়নি। আর ঐ ঝমঝম বৃষ্টিতে একটু শান্ত হবি, নিবে যাবি, তা নয়, বরং ভেতরের আগুনটা যেন বেড়েই চলেছে, শিখা লকলক করছে।

—তারপর? বৃষ্টিতে ভিজতেই থাকলেন?

—না, বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ যখন ভিজে গেছি, নেয়ে গেছি, তখন একসময় ও নিজেই আস্তে-আস্তে আমাকে ছেড়ে দিল। তার আগে পর্যন্ত আমি তো অচৈতন্য হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম, চোখে সব ঝাপসা, কান ভোঁ-ভোঁ করছে. আর ওর হাত-দুটো আমার দেহের সর্বত্র বিচিত্র সাপের মতো খেলা করে বেড়াচ্ছে। অথচ জানেন, আমি কিন্তু কোনো অংশগ্রহণই

করছি না, অন্তত তখনো না, শুধু জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি একটা পিণ্ডের মতো, স্থাণুর মতো —অবশ্য এটা বললাম নিজেকে নিছক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই, কারণ সামনাসামনি না হোক, ভেতরে-ভেতরে লুকিয়ে-লুকিয়ে অংশগ্রহণ আমি নিশ্চয় করছিলাম, কারণ ও যা করছে সেটায় আমি বাধা তো দিচ্ছিই না, বরং সেটা আমার খুব ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে, তাই এটা যদি অংশগ্রহণ না হয় তো অংশগ্রহণ আর কাকে বলব?

—হ্যাঁ, ও আপনাকে ছেড়ে দিল—তখন?

—হ্যাঁ, ছেড়ে দিল—দিয়ে আমার দিকে আর না তাকিয়ে মুখ ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

—কোন্ দিকে?

—তলার দিকে, যেখানে তাঁবুগুলো রয়েছে একটার-পর-একটা, পাহাড়ের এখানে-ওখানে, উঁচুতে-নিচুতে, সেই দিকে।

—আর আপনি দাঁড়িয়েই রইলেন ঐভাবে?

—না, সেইটেই তো মজা—আমি যা করলাম তা আমি করেছি বলে এখনো নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছি না।

—আপনি তার পিছু নিলেন, এই তো?

—ঠিক, আমি তার পিছু নিলাম, মন্ত্রমুগ্ধের মতো, যেন সে আমার মানুষ কোন্ অনন্ত যুগ ধরে, যেন এইভাবে তার পিছু আমি নিয়ে এসেছি আমার জন্ম থেকে। হ্যাঁ, বলতে গিয়ে এখন মনে পড়ছে, কিন্তু তখন হুঁশ হয়নি, ওর পিছু নিতে গিয়ে সাবানটা-তোয়ালেটা কলের কাছে ফেলেই এলাম—ফেলে যে যাচ্ছি, সে-সম্বন্ধে আমার এতটুকু খেয়াল নেই।

—তার মানে আপনি আমাদের ছোট্ট তাঁবুটার সামনে দিয়েও গেলেন তখন? অবশ্য দেখিনি আপনাদের, কারণ বৃষ্টির ঠেলায় আমরা প্রত্যেকেই যে-যার তাঁবুর ভিতরে মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে রয়েছি তখন।

—ও, তবে ঐ ছোট্ট তাঁবুটা আপনাদেরই ছিল, ঐ কল থেকে নামতে গেলে প্রথমেই যেটা পথে পড়ে?

—আমাদের ছিল মানে সেই সন্ধ্যার জন্যে আমাদের দেওয়া হয়—আমি আর বৃন্দাবন কোনো-রকমে ভাগাভাগি করে রয়েছি। ঐ-তো তাঁবু, দুটো চারপাই রাখলেই আর পা বসাবার জায়গা নেই। কী বৃন্দাবন, মনে পড়ছে?

—খুব পড়ছে। আচ্ছা শোনো ভাই, মাপ করো, এবার কনক আর আমি উঠে পড়ি মঞ্চে, যোগ দিই তোমাদের সঙ্গে? দিতে দেবে? কী লোকনাথ?

—ধ্রুব তুমি বলো।

—সুনন্দা আপনি বলুন।

—বেশ তো, উঠে আসুন-না!

—ওঠা গেল তবে। এসো কনক।

—এই উঠলাম। আঃ, আবার আলোর তলায় এসে বেশ মজা লাগছে।

—না, আর কথা নয়। সুনন্দা, আপনি চলতে থাকুন। হ্যাঁ, তখন পথে প্রথমেই পড়ল লোকনাথ আর বৃন্দাবনের ছোট্ট তাঁবুটা, এবং যেটার সামনে দিয়ে আপনারা এগিয়ে চললেন—তারপর? ঐ বৃষ্টিতেও লোকটিকে আপনি সমানে দেখতে পাচ্ছিলেন?

—সমানে। আমি এক পলকে তাকিয়ে আছি ওর দিকে, ও যেমন চলেছে তেমনি চলেছি ওকে লক্ষ্য করে—মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কখন যে পেরিয়ে গেলাম আমাদের তাঁবুটাও, মানে আমাদের

দুজনের সেই তাঁবু, কারণ সেটাও পথে নিশ্চয় পড়েছিল...

—অর্থাৎ যে-তাঁবুতে আপনার ও সুভদ্রের জায়গা করা হয়?

—হ্যাঁ। ও কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না—ঐ তো ওখানটায় ছিল।

—কার কথা বলছেন? সুভদ্র?

—হ্যাঁ। ও নিশ্চয় সব শুনছে—শুনুক। আমি মহাপাপী, যা হয়েছে তা আমারই পাপে।

—আপনি বলে চলুন, থামবেন না। হ্যাঁ, আপনাদের তাঁবুটার সামনে দিয়েও গেলেন?

—হ্যাঁ, গেলাম মানে...নিশ্চয় গিয়েছিলাম, যদিও সেটা মনে পড়ছে না, আর তখন তো কোনো হুঁশই ছিল না। পা-দুটো চলছে, তাদের ওপর আমার কোনো হাত যেন নেই। যাই হোক, এভাবে কতক্ষণ চলেছিলাম মনে নেই, হয়তো বেশিক্ষণ নয়, হয়তো সামান্য ক্ষণই, হয়তো আমাদের তাঁবুটা ছাড়িয়ে আরো দুয়েকটা তাঁবু বাদেই সেই তাঁবুটা, কিংবা হয়তো একেবারে আমাদের তাঁবুর পাশেই সেই তাঁবু...মনে নেই, আমার কিছু মনে নেই, আমার কিছু হুঁশ নেই...যাকগে, যা বলছিলাম। তারপর দেখলুম ও ঢুকে গেল একটা তাঁবুতে, ঢোকার পথটা খোলাই ছিল—বড় তাঁবু একটা, আমাদেরগুলোর চেয়ে বেশ বড়।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়ছে, ঐ রান্নাঘরটার কাছে, না? ঐ যেটায় পাঁচ-ছ' জন কি তারো বেশি লোক একসঙ্গে থাকে—ওখানকারই লোকজন, হয়তো মিস্তিরি-টিস্তিরি, বা শিবিরের কর্তৃপক্ষের কর্মচারী—তাই তো?

—হয়তো তাই হবে, বলতে পারব না। খুব সম্ভব ঐ লোকটাও শিবিরেরই তেমন কোনো কর্মচারী-টর্মচারী হবে, মিস্তিরি-টিস্তিরি, বা মুটে-মজুরই হয়তো—কিন্তু যেটা স্পষ্ট মনে পড়ে, তা ঢুকে যখন পড়লাম, তখন দেখলাম এক ঐ ও আর আমি ছাড়া তাঁবুটা একদম ফাঁকা, যদিও তাঁবুর একপাশে দেয়াল ঘেঁষে দড়ি টাঙিয়ে যে-আলনার মতো করা ছিল, তার থেকে নানারকমের কাপড়জামা ঝুলছে, খাকীর প্যান্ট-ট্যান্ট, অন্তত অল্প আলোয় সেরকমই তো মনে হল।

—তাঁবুর ভেতরে কোনো আলো জ্বালানো ছিল?

—না, তবে ঐ দরজার কাছটা ফাঁক করা ছিল তো, তাই দিয়ে তখনো কিছু আলো আসছে—যদিও দিন বোধহয় ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, অন্তত সূর্য অস্তে তো নিশ্চয় গেছে...

—আর সূর্য অস্ত না গেলেও ঐ ঝড়বাদলে সেটা বোঝবার যো কোথায়?

—তাও বটে। তবু সব সত্ত্বেও মনে পড়ে, তাঁবুর ভেতরে তখনো কিছু আলো ছিল, আবছা হলেও এটা-ওটা জিনিস দেখা যাচ্ছিল—যেমন পাশাপাশি পড়ে-থাকা বেশ কয়েকটা খাটিয়া, ক্যাম্বিসের দড়ি-বাঁধা, বেশ কতকগুলো চেয়ারও, গোটানো গদী বা পাট করে ফেলে-রাখা গাদা-গুচ্ছের কম্বল, এইরকম কত-কী...

—ও-হো বুঝেছি-বুঝেছি। ঐ সেই তাঁবুটা, ঐ গুদামের মতো জায়গাটা, যেখানে আমাদের মতো যাত্রীদের ভাড়া দেওয়ার জন্যে জিনিসপত্র ভর্তি থাকে...

—হ্যাঁ, খুব সম্ভব সেইটেই হবে...

—তাহলে আপনার লোকটি বোধহয় ছিল গুদামেরই কর্তাব্যক্তি কেউ, বা কোনো কর্মচারী মাত্র, যার জিম্মায় জিনিসপত্রগুলো রাখা আছে।

—হতে পারে, হয়তো আপনিই ঠিক বলছেন। তাহলে ওরই তাঁবু ওটা, ও-তাঁবুতে ও একলাই থাকে...কিন্তু তাই যদি হবে তো জামাকাপড় টাঙানো যে দেখলাম সেগুলো কি তবে ওর একলার? কী জানি বাবা, জানি না—অন্তত তখন কেউ তাঁবুতে ছিল না, সেটা জানি।

—ও তো আগেই ঢুকেছিল আপনার, ঢুকে কী করল?

—ও গিয়ে সটাং শুয়ে পড়ে একটা খাটিয়ার ওপর--চিৎ হয়ে। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, এক দৃষ্টিতে।

—আর আপনি?

—আমি এগোতে থাকি ওর দিকে, এক-পা এক-পা করে, এক দুর্নিবার আকর্ষণে। ফণা তুলে-ধরা সাপের সেই গল্পের কথা মনে পড়ে, যার আওতার মধ্যে এসে পড়েছে নিরীহ কোনো জন্তু, এবং যে-জন্তু চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, যাকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে সাপটা? আমারও দশা একেবারে সেই জন্তুর মতন--বেশ বুঝছি, কাল ঘনিয়ে এসেছে, লোকটা এবার গিলে খাবে আমায়, তবু চুম্বকের টানে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছি, সমানে এগিয়ে চলেছি। আর বাইরের সেই পৃথিবীরই মতন বুকেও তখন আমার কী-প্রচণ্ড ঝড়ঝাপট শুরু হয়েছে, ঢিপ ঢিপ করে এমন শব্দ হচ্ছে ভেতরে যে মনে হচ্ছে যেন কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে সেখানে—তবু আমি নাচার, আমার কিছু করার নেই, আমাকে সমানে এগিয়ে যেতেই হবে। এবার আপনারা কিছু বলুন, আমি আর বলতে পারছি না, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

—জয় কেদারনাথ! জয় বাবা বদ্রিনাথ! এবার আমরাই বলছি। আপনি শক্তি পান। আপনি শান্ত হোন, আপনি সুস্থ হোন—আপনি যা বলতে আরম্ভ করেছেন, শেষ করুন। অনুভব করুন, এ-জনমণ্ডলীর চিত্ত-তটিনীতে কী-আগ্রহের জোয়ারই-না আপনি তুলেছেন! আমরা শান্তিবাচনের পুরোহিত, প্রার্থনা করি দেবদেবীর অনন্ত করুণার কণা--আমাদের ঐকান্তিক কামনা, সমবেত জনমণ্ডলীর এই বিপুল মহান আগ্রহের সম্যক তৃপ্তিসাধন ঘটুক, প্রণম্যা মাতৃময়ী বহ্নির দিকে-দিকে প্রসারিত লেলিহান শিখা প্রশমিত হোক নিবিড় সুধা-বারির শীতল সিঞ্চন-স্নানে, বুকের মরুভূমিতে আমাদের মতো তৃষ্ণার্ত সকলের স্বাদ ঘটুক কচি ঘাসের জন্মের।

—যে-মানসিক বিক্ষোভে সুনন্দা আপনি ক্ষতবিক্ষতা, তপ্তদগ্ধা, তার অবগাহন-স্নান ঘটুক গভীরের ঝরনার হিমশীতল জলে।

—আপনি কাহিনী শেষ করুন সুনন্দা, স্ব-কৃত পাপের স্বীকার ও বর্ণনায় প্রক্ষালন ঘটুক সেই পাপের।

—কিন্তু এ-যে শেষ হওয়ার নয় বলে মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন সবে শুরু হয়েছে। কারণ শেষ করব কোন্‌টা, আমার পাপের এই ছোট্ট কাহিনীটা? কাহিনীটা শেষ হলেই কি পাপের শেষ হবে? আমার তো মনে হচ্ছে যা করেছি, তার ফল এখন সবেমাত্র প্রতিভাত হতে শুরু করেছে, সে-ফল এখন ফলতে থাকবে, সমানে ফলে চলবে।

—তবু সুনন্দা আমরা সাধারণ মানুষ, বেড়া ডিঙিয়ে দৃষ্টি চলে না...

—আমাদের সীমাতেই আমাদের পরিচয় সুনন্দা...

—তবু সুনন্দা আমরা চাইতে পারি ততটুকুই যতটুকু আমাদের চাইতে দেওয়া হয়েছে...

—এবং তাই সুনন্দা চোখের সামনে রয়েছে এখন সেই কাহিনীটাই, তার পরিসমাপ্তির জন্য আমাদের ঈপ্সাটাই, সে-ঈপ্সা আপনি চরিতার্থ করুন।

—বলছি। বলতে আমাকে হবেই। শুধু মাঝে-মাঝে বড় কষ্ট হয়, দম নিতে হয়। হ্যাঁ, খাটিয়ার ওপর ও শুয়ে পড়েছে, এবং আমি ওর দিকে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলেছি। শরীরটা যে কী-ভীষণ ভেজা-ভেজা ঠেকছে কী বলব, বাইরের বৃষ্টিতে তো বটেই, ভিতরেরও এক বৃষ্টিতে —দেহের অভ্যন্তরে আমার কোথাও তরল অগ্নির ক্ষরণ ঘটছে, নদীর পাড় ধসে-ধসে পড়ছে, হাঁটু-দুটো এতক্ষণে কাঁপতে শুরু করেছে ঠক্-ঠক্ করে। ওর থেকে বেশিদূরে আমি আর নেই, ওর চোখটা ইতিমধ্যেই আমায় গিলে খাচ্ছে, অনুভব করছি সেই দৃষ্টির দাঁত হঠাৎ খাবলে নিচ্ছে আমার

গালের এখানটা, কি চিবুকের ওখানটা, আর সেই এক-একটি কামড়ে আমার স্নায়ুতে-শিরায় বা সমস্ত শরীরের অলিতে-গলিতে কী-অসম্ভব এক আনন্দের শিহরন যে বয়ে যাচ্ছে, তা কী করে বর্ণনা করতে পারবে আমার এই অশিক্ষিত জিহ্বা, অপক্ক অকিঞ্চিৎকর আমার কল্পনাশক্তি, আমার এই নারীসুলভ সংকোচ!

—তবু বর্ণনা যা করছেন তা খাসা—আমরা এমন পারতাম না, বিশ্বাস করুন।

—সুনন্দা, মনে হচ্ছে আমাদের প্রার্থনা পৌঁছেছে গন্তব্যে, সরস্বতী আপনার জিহ্বায় ভর করেছেন—এ-সভার বহু জন্মের পুণ্যফল ছিল নিশ্চয়।

—জানি না, বলে চলেছি। ঘোর পাতকী, লজ্জাহীনা, এই প্রগল্‌ভা নারীকে ঈশ্বর মার্জনা করুন। হঠাৎ মনে হল জানেন, দরজাটা অমন খোলা থাকবে? হয়তো বন্ধ করে দেওয়া উচিত—কারণ যদি সামনে দিয়ে কেউ যায়, যদি ভেতরে উঁকি মারে, যদি দেখে ফেলে?

—তাই পিছু হটলেন আপনি আবার?

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি এসে তাঁবুর কাপড়টা নামিয়ে দিলাম—ঢোকার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। পরে ফিরে দাঁড়ালাম, ওর দিকে তাকালাম—দেখি ও আমার দিকে সমানেই চেয়ে আছে আগের মতন। মানুষটা এসে সেই যে শুয়ে পড়েছে, তারপর থেকে তার আর নড়নচড়ন কিছু নেই, তার শরীরে কোথাও এতটুকু স্পন্দন পর্যন্ত যেন নেই—শুধু চোখটা দেখে বোঝা যায় লোকটা জাগ্রত, লোকটা ভয়ংকরভাবে জীবন্ত।

—ঐ চোখটা আপনি তখনো অমন দেখতে পাচ্ছেন? দরজা এবার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও?

—হ্যাঁ, তখনো দেখতে পাচ্ছি—সত্যি, এটা একটু আশ্চর্যই বটে। তবে জানেন, তাঁবুতে একেবারে ঘরের মতো অন্ধকার কখনো করা যায় না, কারণ হাজার সামান্য হলেও ফাঁক-টাক একটু-আধটু একেবারে এড়ানো যায় না, হয়তো কোনো ছিদ্র একটা, হয়তো ছোট্ট একটা গোল বিন্দুই—তবু ফাঁক তো বটেই, এবং তা দিয়ে বাইরের আলো এসে ঢোকে।

—না, সেটা ঢুকতে খুবই পারে, কারণ তাঁবু সত্যিই ঘরের মতো নয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল, বাইরে কি তখনো এমন আলো ছিল যা ঢুকতে পারে? অর্থাৎ, ততক্ষণে তো একেবারে অন্ধকার হয়ে যাওয়া উচিত, নয় কি?

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু জানেন, নিশ্চয় আপনারাও এটা লক্ষ্য করে থাকবেন, পাহাড়ে একধরনের বিচিত্র আলো থাকে—সে-আলো গিয়েও যেন যায় না। তাই সূর্যাস্ত হয়তো হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ, তবু খানিকটা আলো রয়ে গেছে, এটা অস্বাভাবিক নয়। সেদিনও তেমনি ছিল।

—ঠিক-ঠিক, খুবই সম্ভব ব্যাখ্যা, সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

—আপনি তো দেখছি বহু গুণে গুণান্বিতা সুনন্দা, পর্যবেক্ষণশক্তিও আপনার কিছু কম অসামান্যা নয়। হ্যাঁ, তারপর কী হল বলুন।

—তারপর যা করলাম তা এক অতি অসাধারণ কাণ্ড, তা আমার মতো এক সেকেলে মধ্যবিত্ত ঘরের বউ-ঝি করতে পারে এমন উদ্ভট কল্পনাও আপনাদের মনে আসবে না। আর আমার কথা তো ছেড়েই দিন, আমি যে তা করেছি—আমিই করেছি, নিজে থেকে করেছি, ও আমায় করতে বলেনি—এটা যতবার ভাবতে চাই, ততবার আমার নিজেরই কাছে তা অবিশ্বাস্য বলে ঠেকে।

—আচ্ছা? আশ্চর্য! বলুন তবে, শোনা যাক, কী-এমন করে থাকতে পারেন আপনি যা এতটা অবিশ্বাস্য?

—ওর খুব কাছে যখন এসে গেছি, হঠাৎ আমার জামাকাপড়গুলো খুলতে শুরু করলাম।

—হয়তো ঠাণ্ডা লাগছিল, তাই—কারণ ভিজে গেছলেন তো? হয়তো অজান্তে আপনার মনে তখন একটা ভয়ও উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে, কে জানে, এমন চপচপে ভিজে-কাপড়ে বেশি-ক্ষণ থাকলে ঐ পাহাড়ে শীতের শেষে যদি নিউমোনিয়ায় ধরে?

—সেটা একটা কারণ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে—আমার মনে নেই।

—ও কী করেছিল মনে পড়ে?

—ও ভিজে-কাপড়েই বিছানার উপর শুয়ে পড়েছিল।

—সত্যি, আপনার কাহিনীটা খুবই আশ্চর্য।

—আশ্চর্য নয়? বলুন তো?

—বিশেষত নারী হয়ে, তায় আবার এইরকম নারী, এত ঐতিহ্যাশ্রিতা, এত ভারতীয়া, ধর্ম-ভাবাপন্না, এসেছেনও তীর্থযাত্রায় হিমালয়ে।

—তারপর জানেন ব্লাউজটা তাড়াহুড়ো করে খুলতে গেছি, হঠাৎ একটা সুতোর মতো কী গলার হারে আটকে গেল—যত টানি তত জট পাকায়। শেষে হয় হার ছেঁড়ে নয় ব্লাউজটা ছেঁড়ে—একদিকে আলো অতীব কম, ক্রমশই কম, দেখতেই পাচ্ছি না তো খুলব কী করে জট, অন্যদিকে আমার আর তর সয় না, সারা দেহে আগুন জ্বলছে।

—অতএব পরেই যা করছেন, তা আমার সেই বারাঙ্গনার গল্পের পরম্পরা অনুসরণ, এই তো বলতে চান এবার?

—একেবারে তাই, হুবহু তাই। শুধু তফাত যেটুকু, তা আপনার গল্পের কোনো পরম্পরার অনুসরণ আমি করিনি, উল্টে আমারই কৃতকর্মের ক্রমের অনুসরণ করেছে আপনার গল্প।

—হ্যাঁ, সেটা বলাই আরো যুক্তিযুক্ত হবে, মানছি। কারণ কাজটা আপনি আগে করেছেন, আমার গল্পটা পরে বলেছি। কিন্তু গল্পটা মিলে গেল তো সাংঘাতিক!

—এত সাংঘাতিক মিলল যে আমার সন্দেহটা সত্যি এখনো কিন্তু সম্পূর্ণ কাটেনি।

—কোন্ সন্দেহ?

—যে, আমাকে কাণ্ডটা করতে আপনি দেখেছেন।

—না, বিশ্বাস করুন, সেটা সত্যি নয়। এ এক অদ্ভুত ঢিল ছুঁড়ি অন্ধকারে—কী বিদ্ধ করব, কিছু বিদ্ধ করতে একেবারেই চাইছি কিনা, তাও জানতাম না। হ্যাঁ, তাই জানি যদিও এবার পরম্পরাগুলি কী-কী, অন্তত আন্দাজ করতে পাচ্ছি চমৎকার, তবু আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই ধাপের পর ধাপ ধরে সেই সিঁড়িতে নামা। কী বলো লোকনাথ, কনক-বৃন্দাবন?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। বিশেষত আমরা যখন তোমার মতন তেমন কোনো পরম্পরার কথাই আগে থেকে ভেবে উঠতে পারিনি, ওঁর কাহিনীটা বলা বাহুল্য ওঁর মুখেই শুনব। একমত তো তোমরা?

—বাঃ, নিশ্চয় একমত!

—একমত একমত। আর অযথা সময় নষ্ট না করে এবার ধরুন সুনন্দা। হ্যাঁ, হারে আটকে গেছে ব্লাউজ, খুলছে না—তারপর?

—হঠাৎ আমি হারটাই খুলে ফেললাম, হারের সঙ্গে লেগে রইল ব্লাউজটা, সেটাও খুলে ফেললাম। তারপর যে-কোনো কারণেই হোক, হারটা যেহেতু খুলেছি, জানি না কী মনে হল, হাতের চুড়িগুলোও ধাঁ করে একের-পর-এক খুলে ফেললাম—আগে ডান হাত, পরে বাঁ হাত, বা মনে নেই, হয়তো আগে বাঁ হাত, পরে ডান হাত।

—সত্যি, কী কাণ্ড! পরে?

—পরে হাতের আংটিটা ছিল। এই-তো আঙুলে পরে আছি, দেখুন-না!

—ও, এই আংটিটা।

—এটা আমার শাশুড়ি আমায় দেন, আমার সাধের সময়।

—ও, তাই নাকি?

—আর যে-চুড়িগুলো বললাম? এই দেখুন-না হাতে পরে আছি—এ-হাতে চারগাছি, ও-হাতে চারগাছি। আমার বিয়েতে মা দেন। আর সেই হারটাও তো এই পরে আছি, দেখুন-না! এটাও বিয়েতে পাই। অলংকার বলতে শুধু এই এনেছি সঙ্গে—এই হারটা, এই ক'গাছি চুড়ি, আর আংটিটা—ব্যস, আর কিছু আনিনি।

—অর্থাৎ এই যাত্রায়?

—হ্যাঁ। কী দরকার? বিয়েবাড়ির নেমন্তন্নে তো নয়, এসেছি তীর্থযাত্রায়-গয়না পরে দেখাবো কাকে? শেষে যদি রাস্তায় হারিয়ে যায়, বা কেউ চুরিচামারি করে বসে?

—ঠিকই তো, কী দরকার?

—অবশ্য গয়না বলতে এমনিতেও তেমন কিছুই আমার নেই, রাজরানীর ভাণ্ডার নেই—তবু যেটুকু সামান্য আছে, তার সবটা বহন করার তো মানে হয় না। যাই হোক, গয়না বলতে বা অলংকার বলতে এই সঙ্গে এনেছি- এবং এইগুলিই সেদিন তাঁবুর ভিতরে খুলতে থাকি একের-পর-এক।

—খুলে রাখছিলেন কোথায়?

—পাশেই, একটা চেয়ারের ওপর। তাড়াহুড়োয়, অযত্নে—আবার সেগুলো যাতে মাটিতে পড়ে না যায়, পড়ে অন্ধকারে হারিয়ে না যায়, সেদিকেও যে একেবারেই খেয়াল ছিল না, জোর করে এটাও বলতে পারব না।

—বেশ, অলংকারগুলো তো খুলে ফেললেন, খুলে চেয়ারের ওপর রাখলেন, তারপর?

—তারপর আবার কী? তারপর জামাকাপড়গুলো, একের-পর-এক। ব্লাউজটা তো আগেই খোলা হয়ে গেছে, সর্বপ্রথমেই, হারের সঙ্গে। যাই হোক, এবার জামাকাপড়গুলোও তাই খোলা হল, একের-পর-এক, ঐ একই তাড়াহুড়োয়, ঐ একই অযত্নে—ঐ একইভাবে তাদের রাখাও হল চেয়ারের ওপর। এবার আর তো বাধা কিছু নেই, নৈবেদ্যের মতো দেহটা প্রস্তুত, আত্মাহুতি দিলেই হয়। যদিও নৈবেদ্য কথাটা এখানে আপনাদের কানে লাগবে, অন্তত লাগা উচিত, কারণ যা করতে চলেছি তা খুব পাপ কাজ, ভীষণ পাপ গাছ...

—আপনি শেষ করুন কাহিনী, বলে চলুন।

—তারপর জানেন, ঐভাবে যখন সব প্রস্তুত, এবার ঝাঁপ দিলেই হয়, তখন সহসা কোন্ এক অজ্ঞাত ভয়ে আমার গলাটা যেন টিপে ধরল।

—কেমন ভয়?

—জানি না। হয়তো আমার সমস্ত পূর্ব-সংস্কার, ভালোমন্দের অ্যাদ্দিনকার ধারণা, যা নিশ্চয় আমার অজান্তে আমায় সেদিন অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করে এসেছে, সেই কলতলা হতে তাঁবু পর্যন্ত, তা এতক্ষণে হঠাৎ ব্যাঘ্রের মতো লাফ মারল।

—কী হল ঠিক বলতে পারেন? মনে পড়ে?

—জানি না। হয়তো খোকনের মুখটাও একবার এক-পলকের জন্যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আঁতকে শিউরে উঠি। যুক্তি দিয়ে এর কোনো ব্যাখ্যা হয়তো নেই, জানি না, বলতে পারব না—শুধু যেটা করলাম, সেইটেই বলছি।

—বেশ তো, সেইটেই বলুন।

—আমি হঠাৎ মরীয়া হয়ে আমার ঐ ফেলে-দেওয়া জামাকাপড়গুলো তুলতে শুরু করলাম।

সায়াটা তুলে ধাঁ করে পরতে গেলাম- আর ঠিক সেই সময়ই ও, অর্থাৎ ঐ লোকটি, যে এতক্ষণ মড়ার মতো পড়ে ছিল বিছানায়, ও এবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। কাছেই ছিলাম, তাই ও বসে-বসেই এমন জোরে ধাক্কা মারল হাতে যে সায়াটা ধরে ছিলাম, পড়ে গেল মাটিতে—পরে ওর সেই হাত বাড়িয়ে ধরল খপ করে আমায়। কী বজ্র-আঁটুনি সেই! আমি ভয়ে তখন চোখে অন্ধকার দেখছি, কাঁপতে-কাঁপতে বলছি জয় বাবা কেদারনাথ, জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—বুঝলাম, আর বলার দরকার নেই। তাহলে এ-ই ঘটেছিল?

—হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটার শেষ তো এইখানেই নয়, আরো আছে!

—এর পরে স্বপ্নটা আসছে, এই তো?

—হ্যাঁ, কিন্তু স্বপ্নেরও আগে আরো কিছু বলতে হয়।

—ওঁকে বলতে দাও-না ধ্রুব যেভাবে উনি বলতে চান! আশ্চর্য, সব তাতে তোমার অকারণ টীকাটিপ্পনীর দরকার!

—মাপ করো কনক, এই থামলাম—হ্যাঁ আপনি বলে যান সুনন্দা।

—তারপর যখন বিছানায় উঠলাম, মানে ও-ই টেনে তুলল আমাকে...যাকগে, বুঝতেই তো পারছেন, বলব কী!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ আপনি বলে যান!

—তখন একসময় মনে হল, যেন খোকনের গলাটা ও টিপে ধরেছে।

—খোকন কে? আপনার পুত্র?

—হ্যাঁ। তিন বছর বয়স মাত্র। সঙ্গে আনিনি, ওর ঠাকমার কাছে আছে। আসলে প্রথম-প্রথম ঠিক ছিল উনিও আসবেন, মানে আমার শাশুড়িও আমাদের সঙ্গে আসবেন, এবং সে-ক্ষেত্রে খোকনকে রেখে আসব আমার মায়ের কাছে—সেইরকমই কথা ছিল। তারপর আমার শাশুড়ি হঠাৎ বাতের বেদনায় এমন ভুগতে শুরু করলেন...

—বুঝেছি-বুঝেছি, এখন যা বলছিলেন বলুন। হ্যাঁ, খোকনের গলাটা টিপে ধরেছে ও, অন্তত সেরকমই আপনার মনে হল। কখন মনে হল?

—কখন আবার মনে হবে? এসব কথা জিজ্ঞেস করেন কেন? বুঝতে পারছেন না কখন মনে হল?

—ও, বুঝেছি-বুঝেছি, বলে যান।

—খোকনের গলাটা ও টিপে ধরেছে, খোকনের দম বন্ধ হয়ে আসছে, ঐ সাংঘাতিক হাতের চাপে পড়ে খোকনের চোখ-দুটো উপড়ে বেরিয়ে আসার যোগাড়—আর এসব ঘটছে আমারই চোখের সামনে, আমার ছেলেটাকে ও খুন করছে, এবং চোখ দিয়ে সেটা দেখছি বলে আমার বুকটা ফেটে গেল-গেল বলে। অথচ আমি কিছু করতে পারছি না—শুধু তাই নয়, আপনাদের এ-কথা বলব কী করে, বলা যায় না, বলা পাপ, কারণ একই সঙ্গে তখন আমার কী-ভালোই-না লাগছে, আমার সমস্ত শরীরে তখন আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, কোন্ সরযূর নদী সহসা বাঁধ-ভাঙা বন্যায় প্লাবিত করল-করল বলে আমার মরুর গহ্বর।

—বুঝলাম, বুঝলাম।

—যাই হোক, পরে মনে পড়ে কখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম, জামাকাপড়গুলো একে-একে পরলাম, গয়নাগুলোও—পরে বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে।

—আর ও?

—ও নিশ্চয় ওর বিছানাতেই পড়ে রইল, জানি না। ওর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কের শেষ

হয়ে গেছে তখন, আমাকে নিয়ে ওরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন যখন এই কাহিনীর মাধ্যমে সেই মুহূর্তটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছি—না, হয়তো ততটা চাওয়া নয়, যতটা বাধ্য বোধ করা—অর্থাৎ কাহিনীটা বলার দরকার, এবং সেটা বলতে গিয়ে মুহূর্তটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হচ্ছে...

—আপনি কি বলতে চান আপনার একেবারেই ভালো লাগছে না?

—কী ভালো লাগছে না?

—মুহূর্তটাকে এইভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে?

—কী করে বলি ভালো লাগছে না! কারণ ভালো যে লাগছে, অন্তত একধরনের ভালো এখনো যে লাগছে। আমি মহাপাতকী, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই...

—হ্যাঁ, যা বলছিলেন?

—হ্যাঁ, সেই মুহূর্তটা—এখন যখন সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করছি, নিজেকে দেখছি ঐ তাঁবু হতে বেরিয়ে আসতে, তাই মনে হচ্ছে যা হয়তো আমি ভেবে থাকতে পারি তখন।

—অর্থাৎ সেদিন যখন ঐ তাঁবু হতে বেরিয়ে আসছেন, তখন কী ভেবে থাকতে পারেন?

—হ্যাঁ।

—কী ভেবেছিলেন?

—হয়তো ভেবেছিলাম, অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমি গোটা একটা জীবন বেঁচে গেলাম, একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন। আর এখন যখন এই বেরিয়ে যাচ্ছি, সে-জীবনের নিঃশেষ সমাপ্তি ঘটিয়ে চলেছি। তাই পেছন ফিরে যে একবার তাকাবো ওর দিকে, বা কোথায় কেমনভাবে পড়ে রইল ও বিছানার ওপর, এ-ব্যাপারে এতটুকু কোনো কৌতূহলও পর্যন্ত যেন আমার নেই তখন।

—কিন্তু সত্যিই কি তাই? অর্থাৎ সত্যিই কি সেই জীবনের সঙ্গে আপনার বর্তমান ও আসল জীবনটার কোনো সম্পর্ক আর নেই?

—উত্তরটা তো জানেনই, সুতরাং কেন অনর্থক প্রশ্নটা করছেন? সম্পর্ক যদি না-ই থাকবে তো আমি চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে আজ আপনাদের সামনে এমন দাঁড়াতে এসেছি কেন? যাই হোক, তাঁবু থেকে বেরোলাম।

—হ্যাঁ, বেরোলেন—তারপর?

[ক্রমশ]

লোকটা

সত্যেন্দ্র আচার্য

বিকেলের আলো মরে গেলে সন্ধ্যা নামল। আবছা অন্ধকারের ভেতর তেমনিভাবে বসে থাকল সুমনা। ঠিক এমনিভাবেই বসে বসে একটু আগের গোধূলি দেখেছে বাইরে। দেখতে দেখতে সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা থেকে সূর্যের শেষ রং মরে যেতে দেখেছে চোখের ওপর। অন্ধকারে সব এখন একাকার। অস্পষ্ট, আবছা আলো দেখতে দেখতে চোখের ওপর মেমে এল, সব অন্ধকারে ডুবে গেল। সেই কখন থেকে তেমনি অগোছালো, তেমনি ভাবনার ভেতর ডুবে রইল সুমনা। ইচ্ছা হয়েছিল একবার আলো জবালে, কিন্তু জবালল না। জবাললেই যেন মনে হয় সে আসছে। সেই দীর্ঘকায় সুপুরুষ লোকটা ভারি জুতোর শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছে।

সুমনা ভয় করে লোকটাকে। কেন ভয়, কিসের ভয়, অত বোঝে না সুমনা। কিন্তু ভয় করে। অল্পদিনের সান্নিধ্যে বুঝেছে সুমনা, লোকটা কেমন অদ্ভুত। কী চায় এই পৃথিবীতে, কিসে খুশী হয়, কেনই বা ঘৃণা করে এ বাড়িটাকে, এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনেক সময় ব্যয় করেছে সুমনা, উত্তর খুঁজেছে। কিন্তু—

কিন্তু হঠাৎ এখন চমকে উঠল সুমনা। সিঁড়ির ওপর পদশব্দ শুনে চকিতে আলো জবালল সুমনা। নিজেকে একটু গোছালো করল, তারপর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকল। কিন্তু না, কেউ এল না। কেউ ঘরে ঢুকল না। সেই দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সুপুরুষ লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়াল না।

তখন সুমনা আবার ভাবল তার স্মৃতিকে। তার কথাগুলোকে। মাত্র অল্পদিনের বন্ধুত্ব সুমনার সঙ্গে। বরং আলাপই বলা চলে। এই অল্পদিনের সান্নিধ্যে একদিন কেন জানি, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যে নিজের অভিমত প্রকাশ করে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলল লোকটা। কিন্তু নিষ্কৃতি দিল না। যদিও বড় একটা আর আসে না এ-বাড়িতে, কিন্তু ওই—

যেখানেই সুমনা, ঠিক যেন ছায়ায় ছায়ায় সেখানে গিয়ে হাজির। সুমনা আবার ভাবল লোকটাকে। লোকটার কথাগুলোকে—'কাপুরুষ আমি নই, মহাপুরুষও, কিন্তু রঙিন মুখোশ আমার আবরণ নয়। তাই বাইরে আর অন্তরে আমি এক। তোমাদের মতো মেয়েদের হেফাজতে এই নরককুণ্ডের কাছে ভালবাসার জন্য দ্বারস্থ হওয়ার চাইতে ভালবাসাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।'

এবার সত্যিই পদশব্দে চমকাল সুমনা। ভারি জুতোর উদ্ধত আওয়াজ ওপরে উঠে আসছে। যেন কুঁকড়ে গেল সুমনা। ভয়ে কাঠ। কিন্তু না, কেউ এল না। পদশব্দ একেবারে এবারে ওপরে উঠে এসে সুমনার সামনে এসে দাঁড়াল। সুমনা চোখ তুলে তাকাল, বিনয়। সুমনা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। মুখ বুজে বেশ একটু ভাবল। ভেবে একমুখ হেসে ফেলে বলল,—সেই কখন থেকে বসে আছি, আর—এই বুঝি আসার সময় হল?

বিনয় কৌতুকের সুরে বলল,—ভীষণ অপরাধ করে ফেলেছি। তারপর একটা চেয়ার টেনে সুমনার মুখোমুখি বসতে বসতে বলল, কী করব বল? তোমার ভাষায়, তোমার সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আবার কুঁকড়ে গেল সুমনা। হাত বাড়িয়ে পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে আলোটা জ্বেলেছিল

আগেই, এখন উঠে গিয়ে পাখার গতিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—কোথায়? কোথায় দেখা হল?

বিনয় আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে বলল, ওই তো মোড়েই। বিনয় এখন সুমনার চোখে অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখল, কী যেন খুঁজল চোখের ভেতর। তারপর নিতান্ত প্রসঙ্গচ্ছলে বলল,—আমাকে আসতে দেখে মোড়ের চা-এর দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে হঠাৎ হাত ধরে সে কী হাসি! হেসে-টেসে বলল,—আসুন না, চা খাই একটু।

—খেলে? সুমনা গলার ভেতর সমস্ত কৌতূহল চেপে রেখে ওইটুকু শুধু উচ্চারণ করল।

—কী করি বলো? বিনয় একটু নড়েচড়ে বসে আবার সিগারেট টানল। বলল,—হাজার হোক তোমার বন্ধু তো, প্রত্যাখ্যান করি কী করে?

সুমনা চুপ করে থাকলে বিনয় বলল,—তারপর একসময় লোকটাই বলল, যান যান মশাই, অনেকক্ষণ কথায় কথায় আটকে রেখেছি। আপনার আবার প্রিয়ামিলনে দেরি হয়ে যাচ্ছে। শেষ পরে আমাকেই আবার দোষারোপ করবেন।

সুমনা নিতান্ত তাচ্ছিল্যে বলল,—ওঃ।

বিনয় উঠে দাঁড়াল। চোখের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আরো কাছে সরে এল। ওর কপাল, চোখের ভেতর, গলার নিচেটা লক্ষ্য করে বলল,—কী বেরোবে না?

সুমনা দরাজ গলায় হেসে সব কিছু অবলীলায় যেন গোপন করে বলল,—রাজাবাদশার হুকুম যখন, না বেরিয়ে পারি। তেমনি কপালে আর চোখে উচ্ছলতা সাজিয়ে রেখে বলল,—একটু বোসো, তৈরী হয়ে নি। ও-ঘরে যেতে যেতে সুমনা বলল,—ভয় নেই, বেশীক্ষণ ভোগাব না, আসছি।

গলির মোড়ে এসে সুমনা বলল,—এবারে দেখা হলে আর যেন কথা বোলো না। অযথা এত সময় নষ্ট করেছ, এর পর দেখা হলে পুরো সন্ধ্যাটাই মাটি হয়ে যাবে।

বিনয় পাশাপাশি ঘন হয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল,—তুমি ওকে ভয় পাও কেন? হাজার হোক মানুষ তো। বাঘ ভালুক হলে না হয় কথা ছিল।

—ভয়? সুমনা তেমনি তাচ্ছিল্যে উচ্চারণ করল,—ভয়? কিসের ভয়?

আবার হাঁটল বিনয়।—ওর সঙ্গে তোমার তো একসময় বন্ধুত্ব ছিল।

—ছিল।

—হঠাৎ তবে ঘৃণা কর কেন? বিনয় যেন উত্তর খুঁজে না পেয়ে ওইটুকু প্রশ্ন করে বসল। তোমার বন্ধুদের ভেতর ও তো খুব কৃতী পুরুষ। আগে আগে তুমিই তো কত গল্প করেছ। কত প্রশংসা করেছ। বিনয় ওইটুকু বলে কথায় কথায় মোড়টা এবং মোড়ের মাথায় কৃষ্ণচূড়াগাছের ছায়া পার হয়ে এল। না, লোকটা নেই। লোকটা এল না।

রাত দশটার কাছাকাছি বাড়ি ফিরে সুমনা দেখল, মা তখনো ফেরেনি। মা ফেরেন আরো পরে, হয়তো এ পাড়া আরো নিঝুম হয়ে গেলে। কিংবা ফেরেন না কোন-কোনদিন। কেন ফেরেন না, কেন রাত করে ফেরেন, এ নিয়ে কোন তর্ক নেই, কোন বচসা নেই, এটা নিয়মের ভেতর দাঁড়িয়ে গেছে। একজন লোক এ বাড়িতে আসেন। মধ্যবয়সী পুরুষ, মার বন্ধু। মা ওঁকে আপ্যায়ন করেন। লক্ষ্য করেছে সুমনা, ওঁর কাছে বাধ্য কুকুরের মতো মাকে বসে থাকতে হয়। ল্যাজ নাড়তে হয় সময়ে অসময়ে। এসব কেমন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

মা-র এই বন্ধুর সঙ্গে বাবা বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। সেই থেকে এ-বাড়ির ভাল-মন্দ, এ-বাড়ির তদারকি উনিই করেন। মা-র তাতে দ্বিধা নেই। মা-র ইচ্ছাকে ছাপিয়ে এ-বাড়ির সমস্ত ইচ্ছাকে ছাপিয়ে ওঁর আবহসংগীত বাজে। মা-কে, সুমনাকে অবলীলায় শুনতে হয়। তারিফ

করতে হয়। নাকি মা-র ভাষায় বাঁচতে হয় বলে।

এই বাঁচাতেই সুমনার ভয়। এই নিয়মের ভেতর থাকতে থাকতে এক-এক সময় হাঁফিয়ে ওঠে সুমনা। অনাবশ্যক মা-র বন্ধু হয়তো এ-ঘরে তখন ঢুকে পড়েন। লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে অধীর আগ্রহে সুমনার ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করেন। কুশল নেন। মা-র বেনামিতে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। এ-সবের অর্থ বোঝে সুমনা। অন্তত বেশি করে বুঝিয়ে দিয়েছে লোকটা। লোকটা একদিন বলেছিল,—জানো সুমনা—

—কী?

—তোমার বাবা ওঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি।

—জানি।

—জানো না।

—কী?

—লোকটা বলেছিল,—কিছু জানো না, আমি জানি।

সুমনা অন্তত কিছুক্ষণ কথা বলেনি। লোকটা বলেছে,—এই সুখ, এই শান্তি তোমাদের চিরকালের হোক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

সুমনা ফুলে-ফুলে কাঁদছিল। কাঁধের ওপর হাত রেখে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল,—পৃথিবীকে সুন্দর করার স্পর্ধা আমার নেই, কিন্তু তোমাদের এই স্বাচ্ছন্দ্যকে ভেঙে দিতে পারি। সে সাহস আমার আছে।

তবু কথা বলেনি সুমনা। সন্ধ্যার করুণ ছায়া নেমে আসছিল আস্তে আস্তে। লোকটা বলেছিল,—জানি, তোমার বাবা আর কোনদিন ফিরে আসবেন না। কিন্তু আমি আসব। তোমাদের দেখেও সুখ।

সুমনা চোখ তুলেছিল। লোকটা বলেছিল,—জানো, এ মুহূর্তে তোমাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি। কারণ, এই ক্লেদ তোমাকেও স্পর্শ করবে। অথচ তোমাকে আমি ভালবাসি।

—তুমি চলে যাও।

—কেন?

যেন ভয় পেয়ে গেছিল সুমনা।—আমি চীৎকার করব। তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি আমি।

—অপরাধ? লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তোমাদের সবকিছু জানি বলে? কিন্তু—

—কী? সুমনাও কঠোর হয়েছিল।

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল,—তুমি ছলনা করেছ এতদিন। এই নরকের ভেতর ডেকে এনে তুমি আমাকে ঠকাতে চেয়েছ। লোকটা আরো যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর প্রতিহিংসা সাজিয়ে রাখল। মুখাবয়বে একটা নিষ্ঠুর হিংস্রতা ঝুলিয়ে রেখে বলল,—এই নরকের জল-হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য করেছ আমাকে। এই নোংরামির পচা পুকুরের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছ। লোকটা যেন ক্রোধে ফুলছিল।—তুমি মনে রেখো সুমনা, যতদিন বাঁচব, তোমার সুখের ঘরের চৌকাঠে আমি চন্ডাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।—লোকটা চলে গিয়েছিল।

আস্তে আস্তে মা এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরভর্তি অন্ধকার। এই অন্ধকার, নির্জনতা, এই একাকিত্ব মা-এর বড় ভয়। গা-টা কেমন শিরশির করে। ভয় যেন জড়িয়ে ধরে। মা ডাকতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন। নিজের ঘরে বড় চুপিচুপি ফিরে এসেছিলেন।

এখন আকাশে তাকাল সুমনা। একটু আগের সচ্ছল আকাশ এখন মেঘের আড়ালে। রাশি নক্ষত্র আগের মতো এখন আকাশভর্তি ছড়িয়ে নেই। লোকটাকে ভাবলে সুমনার মনে হয় সে

যেন বড় নির্জন প্রান্তরে একক দাঁড়িয়ে আছে। এই জীবন, এমনিভাবে বাঁচার অর্থ অনেকদিন খুঁজেছে সুমনা। খুঁজতে খুঁজতে কতদিন ঢুকেছে বাবার ঘরে। যে ঘর এখন বন্ধ, কেউ খোলে না। মাঝে মাঝে খুলে মা-এর দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিচুপি ঢুকে পড়ে সুমনা। ঘরে ঢুকে নিজের হাতে জানলাগুলো খুলে দেয়। বাবার বহু জ্বলন্ত স্মৃতি এ ঘরে তখন চোখের ওপর জ্বলে। বাবার শিকারের শখ ছিল। তার জ্বলন্ত উদাহরণ এ ঘরে থরে থরে সাজানো। সব নিজে হাতে সাজিয়ে চলে গেছেন বাবা।

বাবা আর ফিরে এলেন না। এ ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ বসে থেকেছে সুমনা। ঘরের ভেতর অসমাপ্ত জীবনকাহিনীর একটা পান্ডুলিপি আছে। কতদিন পড়বার চেষ্টা করেছে সুমনা। ঠিক বাবার ছবির নিচে। এই দম্ভপূর্ণ, কৃতিত্বপূর্ণ লোকটার জীবনের অসহায় বিবর্ণ পাতাগুলো এখন আরো মলিন, জীর্ণ হয়ে এসেছে। বহুকালের পুরনো কাগজের গায়ে বড় বড় অক্ষরে নিজের কান্না যেন নিটোল মুক্তোর মতো এত দম্ভের ভেতর ছড়িয়ে রেখে গেছেন বাবা।

এমনি একাত্ম হয়ে ভাবতে ভাবতে যেন একটা বোধহীন বেবাক পুতুল হয়ে গেছিল সুমনা সেদিন, আর ঠিক সে মুহূর্তেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল লোকটা, লোকটা ঘরে ঢুকে শ্লেষের সুরে লম্বা করে উচ্চারণ করেছিল,--কিছু মনে কোরো না, তোমার অনুমতি ছাড়াই ঢুকে পড়েছি।

সুমনা তাকালে লোকটা বলেছে,—জানি এ ঘরে কেউ ঢোকে না। একটু ইতস্তত করে লোকটা বলেছে,--আরো জানি--

—কী?

—ঘটনাটা এ ঘরেই ঘটেছিল।

সুমনা বলেছে, ঠিক আছে, ও ঘরে বোসো, আমি আসছি।

—না।

—জোর তোমার।

—না। আমি রাজপুত্র নই। পরের ঘরে জোর কিসের? ব্যঙ্গাত্মক গলায় লোকটা বলেছে,—অবিশ্যি জোর করার মতো সম্পর্ক ছিল আগে, কিন্তু এখন জানি আমি কেউ না। কিন্তু সর্বনাশ আমার হাতের মুঠোয়।

—আমি লোক ডাকব।

—কিন্তু আমি কোন আগন্তুক নয় যে হঠাৎ পথ ভুলে ঢুকে পড়েছি।

—আমি চীৎকার করব।

—করো। খুব উদাস গলায় লোকটা বলল, তারপর হেসে বলল, তোমার গলায় অনেক জোর, পরখ করে দেখতে পার। লোকটা যেন একটু দম নিল, নিয়ে বেশ আরাম করে বসে পড়ল চেয়ারে। কিন্তু তাতে কি তোমার মৃত বাবার আত্মা শান্তি পাবেন? আরাম করে বসে পা নাচাল কিছুক্ষণ, তারপর ভর্ৎসনার সুর এনে বলল, যারা তোমার চীৎকারে এ ঘরে ঢুকে পড়বে, তারা বরং কৌতূহলী হবে, অন্ধকারে তুমি আমি মুখোমুখি বসে আছি বলে। লোকটা এবার অদ্ভুত একটা নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়ে বলল,—তার চেয়ে তোমার বাবার গল্প বলি শোনো। তারপর হাসি থামিয়ে বাঁকা করে বলল,—সে বড় অদ্ভুত গল্প। আচ্ছা, তোমার মা নেই ঘরে?

—জানি না।

—আহা, রাগছো কেন? ক্রোধ অনল, স্পর্শ করলে অপরকেই শুধু পোড়ায় না, নিজেকেও দাহ করে। আমি যেমন জ্বলছি।

লোকটা থামল না। যেন কিছু ভ্রূক্ষেপ করল না। বলল,—তোমার বাবা শিকারে গিয়ে একটা

লেপার্ডের বাচ্চা এনেছিলেন। বাবা ফিরে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বাচ্চাটা ঘরের ভেতর ছেড়ে দিলেন। সেই তোমার মা-এর বন্ধু অসহায়। তোমার বাবা নিশ্চল মূর্তির মতো, তবু দম্ভভরে দাঁড়িয়ে। তোমার মা চীৎকার করে উঠেছিল। বন্ধুটি অসহায়। তোমার মা হাত জোড় করে বাবার কাছে মিনতি ভিক্ষা করছিল। মিনতিভরা গলায় কী যেন বোঝাচ্ছিল বন্ধুটি। বাবা পাষাণ। আর তুমি? তুমি তখন আয়ার হাত ধরে পার্কে বেড়াতে গিয়ে দোলনা চড়ছ।

আর ভাবল না সুমনা। আঁচলটা সংযত করে কাঁধে তুলল। বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। রাস্তাটা দেখল ভাল করে। না—গলির মোড়ে, কি কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার ওপারে কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

এই পুরনো ঘর, এই পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আজ চলে যাবে সুমনা। যেন পালিয়ে যেতে চেয়েছে এখান থেকে। এই পরিবেশ ছেড়ে, এই মোহ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে বলেই সুমনার সুখ। বিনয়ের চাকরি বাইরে, সুমনা জানে, সেখানে মা-র বন্ধুর নিঃশ্বাস নেই, মা-এর অক্ষম সোহাগ নেই। তবু কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করল সকাল থেকে। বিনয়ের কাছে সবকিছু গোপন করেছে সুমনা। সব দিয়েও যেন কিছু সরিয়ে রেখেছে।

সকালের আলো ফোটার আগেই সুমনার ঘুম ভেঙেছিল। তবু কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করল সুমনা। বিনয়ের সঙ্গে রেজেস্ট্রী করার মুহূর্ত থেকে ভেবেছে সবকিছু বলে ফেলে, স্বীকার করে, কিন্তু যতবার বলবার চেষ্টা করেছে, ততবার যেন কে তার গলা টিপে ধরেছে। সবকিছু তেমনি গোপন রয়ে গেছে।

ঘুম ভেঙে বাইরে তাকাল সুমনা। গলির মোড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছটার অস্তিত্ব এই খোলা জানালার ভেতর থেকে অনুভব করা যায়।

দেখতে দেখতে চোখের ওপর সব কেমন উজ্জ্বল হল। কৃষ্ণচূড়াগাছের পাতার ওপর সূর্যের রং ছড়িয়ে পড়লে সুমনা উঠে বসল বিছানার ওপর। তারপর বাইরে এসে দাঁড়াতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি। চমকে উঠল সুমনা।—তুমি?

—আসতে নেই? খুব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিল লোকটা।

বেশ কিছুক্ষণ বারান্দার ওপর নিথর দাঁড়িয়ে থেকে সুমনা বলল,—তোমাকে বোঝাই দায়। এতদিন পরে এমনি করে আসার কী যে অর্থ, তা আমি ধরতেই পারি না।

লোকটা হাসল,—শুনেছি পালিয়ে যাচ্ছ? তারপর সেই নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়ে তেমনি সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা।—আমার গতিবিধি খুব জটিল, না? ধরতে পার না?

সুমনা কঠোর হয়ে বলল,—তোমাকে কবেই ভুলে গেছি।

—তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার সর্বনাশ আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছ, মাঝে মাঝে তাই তোমাকে আমার মনে পড়ে। লোকটা এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—আমি ঠকেছি, ঠকানো তোমাদের ব্যবসা, তাই জানাতে এলাম। এবার আর হাসল না লোকটা। বলল,—কেমন আছ? বিয়ের পর কেমন দেখতে হয়েছ তাই দেখতে এলাম। লোকটা এবার গলার স্বর পাল্টে বলল,—রোজ ভাবি বিনয়ের সঙ্গে দেখা হবে, বিনয়ের দোষ নেই, আমি আর ঠিক সময়মত মোড়ের মাথায় আসতে পারি না।

সুমনা যেন আঁতকে উঠল। তারপর ভয়ে, বিষাদে সুমনা কেঁদে ফেলল,—আমি তোমাকে চিনি না।

লোকটা যেতে গিয়েও থমকালো। ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্লেষের গলায় বলল,—নতুন জীবনের পথে পা দিচ্ছ, চোখের জল দিয়ে নতুনকে অভ্যর্থনা করতে নেই। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা তোমাদের ওপর।

আমাকে যখন চেনো না, আমার কাছেই বা কাঁদবে কেন?

কিছু যেন বলতে গেল সুমনা। কিন্তু পারল না, কথা খুঁজে পেল না। হাওয়ায় সুমনার আঁচল উড়ছিল। লোকটা সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল,—আজ যেন নতুন করে দেখছি তোমাকে, নতুন চোখে। কেন বলো তো?

সুমনা চোখ তুলল এবার। নিচু গলায় বলল,—জানি না।

লোকটা এই প্রথম তাকাতে গিয়েও চোখ নামাল। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে বলল,—ভয় নেই, কথা দিচ্ছি। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলল,—বিনয় এলে হেসো। যাচ্ছি।

স মা লো চ না

কাঁদো, প্রিয় দেশ— অন্নদাশংকর রায়। শংকর প্রকাশন। কলিকাতা, ৬। মূল্য আট টাকা।

ভূমিকাটি সহ মোট তেরটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি লেখার কাল বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পর থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত। কয়েকটি লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বাকিগুলি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে যে নাজুক পরিস্থিতি ঘটে—রাজনৈতিক দিক থেকে, তার জন্য কেউ প্রকাশ করেনি। এখানে অন্নদাশংকরবাবু সবকটিই একসঙ্গে ছেপে দিয়েছেন। বাংলাদেশের ভিতরে যে টালমাটাল কাণ্ডকারখানা হলো, তা নিয়ে বাংলাদেশের বাইরে বুদ্ধিজীবী সমাজ কোন সমালোচনা করতে পারেন কিনা, সে অধিকার ও দায়িত্ব তাঁদের আছে কিনা, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। অদ্ভুত পরিস্থিতি আজ সৃষ্টি হয়েছে, পৃথিবীর জনমতের ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীতেও বুদ্ধিজীবীদের এমন ধরনের সুবিধাবাদী নীরবতা ছিল না। কোন একটা হত্যাকাণ্ড বা প্রতিবিপ্লব ঘটলে দুনিয়ার বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলপতি ও লেখকেরা মার মার শব্দে প্রতিবাদের ঝড় তুলতেন। স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সকল প্রগতিবাদী ও বিপ্লবীদের কী ধরনের সোচ্চার প্রতিবাদ, এমনকি বুদ্ধিজীবীরা অস্ত্রহাতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমর্থনে গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন, সেদিনকার পরিস্থিতির তুলনায় বাংলাদেশে যে কাণ্ডটি ঘটলো, তাতে বুদ্ধিজীবীদের নীরবতায় অতি অদ্ভুত এক নৈতিক অবসাদ ও দায়িত্বহীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয় পৃথিবীতে আজ আর আদর্শগত জনমত বলে কোন শক্তি নেই, যার উপর নির্ভর করে কোন নির্যাতিত দেশের মানুষ নিজেদের অভ্যুত্থানে বিশ্বের কিছুমাত্র সাহায্যেরও আশা করতে পারে। আদর্শবাদের বদলে সুবিধাবাদ প্রাধান্য পেয়ে গেছে। বিশ্বজনমতের ভূমিকার এই অবক্ষয় কেমন করে ঘটলো, তার ইতিহাস ও বিচার এখানে করতে যাবো না। এই ক্লান্ত, অবসন্ন, উদাসীন বিশ্বজনমত আজ রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্রের ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ে সুবিধাবাদী স্বার্থ-বিচারের অন্ধগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

বাংলাদেশের ব্যাপারে এটাই প্রমাণিত হলো যে, যে-কোন হত্যাকাণ্ডই হোক না কেন, ত্রিশ লক্ষ লোকের জেনোসাইডই ঘটুক না কেন, কোনো জাতির পিতা বা প্রধান সবংশে অতর্কিত হত্যাকাণ্ডের শিকারই হোন না কেন, জেলেবন্দী নেতাদের ঘুমন্ত অবস্থাতে মেরে ফেলাই হোক না কেন, কোটিখানেক লোককে প্রাণভয়ে একবস্ত্রে ভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে হলেও, পৃথিবীর মানবতা-বুদ্ধি ও জনমত একবাক্যে তার প্রতিবাদ করবে না, কোন না কোন গোষ্ঠীগত রাজনীতির ক্ষুদ্র স্বার্থে—এদের নিন্দা করা তো দূরের কথা, সমর্থন মিলে যাবে, আশ্রয় মিলে যাবে জঘন্য হত্যাকারীদেরও। বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষদের ও বুদ্ধিজীবীদের এই শোচনীয় অধঃপতনের লক্ষণটা মানবজাতির একটা মহাসংকটের ইঙ্গিতবহ।

ভারতে—বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার—বুদ্ধিজীবীদের এ বিষয়ে একটা অতিরিক্ত হ্যান্ডিক্যাপ আছে। অন্যান্য দেশ যতটা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে, ভারতীয়রা বাংলাদেশের ব্যাপারে স্রেফ বাস্তব কারণেই তা পারে না, কেননা তৎক্ষণাৎ দোষারোপ উঠবে যে ভারত বাংলাদেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, যেটা দেখিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলেরা আরও বেশী সুবিধা পাবে, এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম তাতে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরকারি বাস্তববুদ্ধির

নিষেধাত্মক নির্দেশ নেবে আসবে। ফলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে আজ বিশেষ কিছু আলোচনা হয়ই না এদেশে, যতটুকুও বা হয় তা ডিপ্লোমেটিক প্রয়োজনের সীমানা অতিক্রম করে না।

এতৎসত্ত্বেও অন্নদাশংকর রায় মহাশয় সাহস করে কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করেছেন। "কাঁদো, প্রিয় দেশ" বইটিতে কান্নাকাটি সামান্যই আছে। মুজিবর রহমানের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও, অন্নদাবাবু এই বইতে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির ব্যাপারে বেশ ক্রিটিক্যাল মতামত দিয়েছেন, কান্নাকাটির বদলে তর্ক-বিতর্কের প্রাধান্যই বেশী পেয়েছে, ভাবপ্রবণতা বা সেন্টি-মেন্টালিটির আতিশয্য নেই, বরং একটু কমই আছে—প্রয়োজনের তুলনায়—এমনও মনে হয়েছে।

পূর্বপাকিস্তানে বাংলাভাষার পুনর্জাগরণের আন্দোলনের জন্মসূত্র থেকেই পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা এ বিষয়ে আগ্রহ নেন, তাঁদের মধ্যে অন্নদাশংকর অন্যতম প্রধান। ১৯৫৩ সালেই বিশ্বভারতীতে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার কিছু সাহিত্যিকদের নিয়ে তিনি একটি বৈঠক করেছিলেন। তারপরে ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষাশহীদ দিবস পালনের একটা রেওয়াজ পশ্চিমবাংলায় ভালভাবেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই ভাষা আন্দোলনের পিছনে যে একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠতে থাকে, আমার যতদূর জানা আছে, অন্নদাশংকরবাবু সেই রাজনৈতিক প্রশ্নটি এদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত করতে চাননি। তিনি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নন, বিশেষ করে ভিন্‌দেশের রাজনীতিতে নাক গলাবার অধিকার আছে বলে তখন স্বীকার করতেন না, অন্তত প্রকাশ্য সভাসমিতিতে। হয়তো এটা নীতিগত কারণে ততটা নয়, যতটা কৌশলগত প্রয়োজনেই। কিন্তু এই বইতে অন্নদাবাবু সেই সীমা মানেননি, ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য, বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে উপমহাদেশীয় ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকারণ ও তাদের জটিলতা সম্বন্ধে কোন আত্মশাসন বা রাষ্ট্রশাসনের সীমা মানেননি।

বস্তুত বাংলাদেশের ব্যাপার-স্যাপারগুলি কি কেবলই আভ্যন্তরিক, এমন কি পাকিস্তানেরও? আজকের ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ঐতিহাসিক বন্ধনেই একটিই রাজনৈতিক পটভূমিকাতে আজও আবন্ধ। একটি দেশকে দুটি অথবা তিনটি দেশে বিভক্ত করতে গিয়েই যাবতীয় রক্তক্ষয়ী কাণ্ডকারখানা চলেছে, যা ছিল ইন্টিগ্রেটেড, তাকে ডিস-ইন্টিগ্রেটেড করতে গিয়েই এত রক্তপাত ও অনর্থ ঘটেছে। অবশ্য সম্পূর্ণ ইন্টিগ্রেশন বা সংহতি কোনকালেই ছিল না, ছিল নানা ঈর্ষা দ্বেষ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা। এই আভ্যন্তরিক বিরোধ বা বিভেদগুলির জন্য সাম্রাজ্যবাদকে এদেশ থেকে বিদায় দিয়ে সম্মিলিত স্বাধীনতা পেতে যখন দেরি হচ্ছিল, তখন আভ্যন্তরিক বিরোধটা বহির্গামী করে দিয়ে সমস্যার সমাধানের একটা সুবিধাবাদী তাড়া পড়ে যায়। অর্থাৎ ইন্টারন্যাল সমস্যাটাকে এক্‌স্‌টারনেলাইজড করে, ভাই-ভাই-ঠাঁই-ঠাঁই নীতির মাধ্যমে বা দুইজাতিতত্ত্বের রাজনীতি গ্রহণ করে দেশটাকে ভাগ করা হয়, এবং আশা করা হয় যে ভারতবর্ষের খণ্ডিত অংশগুলি স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা পেলেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, দেশবিভাগ এই সমস্যার সমাধান না করে তাকে আরও বেশী ভয়ংকর করে দিল। যা ছিল একদা মাঝে মাঝে আভ্যন্তরিক দাঙ্গাহাঙ্গামা, তা হয়ে দাঁড়ালো সীমান্ত বরাবর যুদ্ধ। একদা আভ্যন্তরিক দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপের সামান্যই সুযোগ ছিল। ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে পরোক্ষ একটু-আধটু ছাড়া। এই ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের বিভাগের সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তিধর সাম্রাজ্যগুলি অবাধে নাকগলানো শুধু নয়, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সেই আগুনের ইন্ধন যোগান দিতে সুযোগ পেলো। এই পরিস্থিতির শেষ পরিণাম যাই হোক না কেন, ইতিহাসের একটি মস্ত শিক্ষা হয়তো আমরা এ থেকে নিতে পারি যে,

সুবিধাবাদী স্বার্থে কোন আভ্যন্তরিক সমস্যাকেই আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করে দিয়ে তার কোন সমাধান হয় না, বরং সমস্যাটি আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায় এবং ভয়াবহ আকার গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, এই যুক্তি বা বিচার আমার, অন্নদাশংকরবাবুর নয়।

স্পষ্ট করে এই প্রশ্নটি অন্নদাশংকরবাবু না তুললেও, অস্পষ্টভাবে এই প্রশ্নটি তাঁর লেখাতে মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে ভূমিকাতেই, যেখানে পশ্চিমবঙ্গেরই একজন মুসলমান দোকানদারের মুখ দিয়ে মুজিবর রহমানের হত্যা ও মুজিববাদের পতনের পক্ষে একটা শক্ত, যদিও নিষ্ঠুর যুক্তি বা সাফাই প্রকাশ পায়। উক্ত ভদ্রলোকের উক্তিটি বা প্রশ্নটি সত্যিই এমন গভীর যা জাতিগত বিদ্বেষ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভাষা দিয়েই যদি একটি জাতি হয়, তবে এখনকার বহুভাষাভাষী ভারতও একটি জাতি হতে পারে না। ভারতের বাঙালীরা (পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের) যদি তাদের ভাগ্য পশ্চিমা মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গেই বরাবর নির্ধারিত করে রাখতে পারে, তবে বাংলাদেশের বাংলাভাষাভাষীরাও পাকিস্তানের উর্দুভাষীদের সঙ্গে একত্র থেকে অখণ্ড পাকিস্তানের মধ্যেই বা কেন তাদের জাতীয় সত্তা বা আইডেন্টিটি রক্ষা করতে পারতো না? ভারত-প্রেমিক মুজিবর রহমানকে বিদায় দিয়ে, উক্ত দোকানদার মনে করেন যে এই প্রথম তাঁরা স্বাধীন হলেন! তাছাড়া আমি এমন কিছু কিছু (সংখ্যায় খুবই কম) বাঙালী (বাংলাদেশের) প্রগতিশীল ব্যক্তির প্রশ্ন শুনেছি যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ও শেষপর্যন্ত জয়ী হওয়াতে যদি ঐতিহাসিক দিক থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কি লজিক থাকে?—কেন ভারত ও বাংলাদেশ তবে এক হয়ে যাক, এ প্রশ্ন উঠছে না? বস্তুত কোন লজিক দিয়েই যেমন ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়নি, তেমনি কোন লজিক দিয়েও বাংলা-দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সুসম সেটেলমেন্ট হচ্ছে না। এখানে লজিকটা তত্ত্বগত নয়, স্বার্থগত, একদল নবজাত মধ্যবিত্তের স্বার্থসঞ্জাত।

অন্নদাশংকরবাবু খোদ মুজিবর রহমান সাহেবকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবে থেকে বাংলা-দেশের আইডিয়াটা তাঁর মাথায় এলো। বঙ্গবন্ধু বলেন, ১৯৪৭ থেকেই। সুরাবর্দী ও শরৎ বসুর স্বাধীন যুক্ত বাংলার প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন থেকেই মুজিবর রহমান অপেক্ষা করছিলেন কবে সময় হবে যখন বাংলাদেশ ও বাঙালীর দাবিটাকে স্বতন্ত্র করে তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারবেন। 'একটা কমিউনাল পার্টিকে ন্যাশানাল পার্টিতে রূপান্তরিত করা চারটিখানা কথা নয়'। বাংলাদেশ নয়, বাংলাভাষা নিয়ে যখন ছাত্রদের মধ্যে একটা আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত হয়, তখনই মুজিবর রহমান তাকে লুফে নেন, এই ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালীজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা, আইডেন্টিটি ও স্বাতন্ত্র্যের রাজনীতিকে দাঁড় করাতে অগ্রসর হন। যুক্ত বাংলার লেশমাত্র সম্ভাবনা না দেখে, শরৎ বসু ও সুরাবর্দীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে, মুজিবর রহমান বিশেষভাবে মর্মাহত হন, কিন্তু 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' এই নীতির অনুসরণে পূর্ববাংলাকেই বাংলাদেশ তথা জয়-বাংলা রূপে দাঁড় করাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু দুই বাংলার মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি করার কোন সেতুই স্বাধীন বাংলার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়নি, কলকাতায় আসার পথ দিল্লী হয়েই দাঁড়িয়ে গেলো, পশ্চিমবাংলা যেমন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নতুন কোন নিজস্ব সত্তা বা শক্তি পেলো না, স্বাধীন বাংলাদেশও পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের কাছে একমাত্র কিছুটা ভাষাগত বিনিময়যোগ্য কৃষ্টিসম্পদ ছাড়া আর কিছু পেলো না, নিজস্ব সত্তা বা আইডেন্টিটির ভিত্তিভূমিটা তেমন জোরদার ঐতিহাসিক লজিকের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো না। বাংলাদেশের দশা হলো হ্যামলেটের মত To be or not to be-র মত দ্বিধাগ্রস্ত—যার সুযোগ নিচ্ছে আবার সেই পাকিস্তানপন্থীরাই।

দ্বিতীয় বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য শেষ পর্যন্ত মুজিবর রহমান যে প্রায় একনায়ক ও

একদলতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চালু করতে যান, অন্নদাশংকরবাবুর মতে তা সর্বৈব ভুল হয়েছিল। স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—এই চারটি ভিত্তির গণতান্ত্রিক ভিত্তিটা উড়িয়ে দিতে গিয়েই মুজিবর রহমান তাঁর নিজের উত্থানের পথটাকে অস্বীকার করেন, এবং স্বৈরতন্ত্রের লাইসেন্স প্রকারান্তরে দিয়ে দেন। আর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও তানজেনিয়ার কায়দায় একদেশ, একদল ও সেই দলে আমলাতান্ত্রিক অফিসারদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে ব্রিটিশ ও ভারতীয় গণতান্ত্রিক ধারাকে বর্জন করেন। এর ফলে মুজিবর রহমান একটা মস্ত ভুল করেন বলে অন্নদাবাবু প্রচুর যুক্তি উপস্থিত করেন। বলা বাহুল্য, এই যুক্তিধারার মধ্যে অন্নদাশংকরবাবুর নিজের আমলাতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা (আই-সি-এস হিসেবে) ও ব্রিটিশ ঐতিহ্যের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। মোট কথা, অন্নদাবাবু নিজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদীক্ষা ও ঐতিহ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি, বলা চলে বোধহয়, যদিও তিনি মহাত্মা গান্ধীর একজন বিশেষ ভক্ত ও তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত মনে করেন। বস্তুত, এই জটিল বিতর্কে তিনি অনেক দেশের ও অনেক মতবাদের কথা তুললেও, মহাত্মা গান্ধীর পথে বাংলাদেশের কোন মুক্তির পথ এবং মুক্তির পরে দেশগঠনের কোন পথ ছিল কিনা, সে-বিষয়ে তেমন কিছু আলোচনা করেননি, গান্ধীবাদ সেখানে অবান্তর বা irrelevant বলেই যেন ধরে নেওয়া হয়েছে। বস্তুত মুজিবর রহমানের আন্দোলনের কৌশলে মহাত্মা গান্ধীর কোন প্রভাব ছিল কিনা—কোন সময়েই—এমনকি প্রথম দিকেও—সে আলোচনা নেই। অহিংসা কথাটাই গান্ধীজীর একমাত্র বক্তব্য ছিল না, তাঁর অর্থনৈতিক সামাজিক ও কৃষ্টিগত বক্তব্যকে অস্বীকার করে একমাত্র অহিংসা দিয়েই গান্ধীকে বোঝা সম্ভব নয়।

সমাজতন্ত্র করতে গিয়ে যে ধরনের শ্রেণীগত ভিত্তি দরকার বাংলাদেশে তার সামান্যই ছিল বা আছে বলে অন্নদাবাবু যে একটি দুটি কথা বলেন, তা খুবই খাঁটি। "ইতিমধ্যেই বহু লোক সোভিয়েটমার্কা কালেকটিভাইজেশনের দুঃস্বপ্নে আতঙ্কিত হয়েছিল। শেখ সাহেব তাদের অভয় দিয়েছিলেন। তবু জোতদার শ্রেণীকে রাজী করানো যেত না। আর জোতদার শ্রেণীই তো এখন শাসকশ্রেণী। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রায় সবাই জোতদার। একটি নয়া ধনিকশ্রেণীও পাকিস্তানী আমলে পয়দা হয়। সেটিরও এখন নবীন যৌবন। সমাজতন্ত্র কি এই দুই শ্রেণীর ছাড়পত্র না নিয়ে এগোতে পারে? প্রথম বিপ্লবের অবিসংবাদিত নায়ক দ্বিতীয় বিপ্লব ঘোষণা করে বিসংবাদিত নায়ক হয়েছিলেন।' আবার, 'জনপ্রিয় না হলে ভোট পাওয়া যায় না, কিন্তু কঠোর না হলে কাজ পাওয়া যায় না'। এই কঠোর হতে গিয়েই, শাসনতন্ত্র ঢেলে সাজাতে হয়। শক্ত শাসন আনতে গিয়ে তিনি অনেকেরই অপ্রিয় হন, এবং নিজের মৃত্যু ডেকে আনেন, অথচ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী কোন স্তর থেকেই কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ এলো না।

বাংলাদেশের এই জোতদার ও নব্যধনিক শ্রেণী বা new class সম্বন্ধে, আমার মতে, আরও বেশী সমীক্ষা হওয়া দরকার। মুসলীম লীগের প্রতিপত্তি পূর্ববঙ্গে মুসলমান জোতদার শ্রেণীর অভ্যুদয় থেকেই সৃষ্টি হয়, কেননা হিন্দুরা সেখানে জোতদার ছিলেন না, ছিলেন জমিদার, যাঁদের সঙ্গে চাষবাসের সামান্যই সম্পর্ক ছিল। মাটির সঙ্গে সত্যিকার যোগসূত্রই ছিল না, একমাত্র নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ছাড়া যারা শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চেষ্টা করেন। হিন্দু জমিদার ও মধ্যবিত্তদের তাই অনায়াসে উৎপাটিত বা বিতাড়িত করা সহজ হয়। দাঁড়িয়ে যায় মুসলমান প্রজারা—বিশেষ করে তাদের জোতদার অংশ। এরাই মুসলীম লীগ ও পরে আওয়ামী লীগের শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। মুসলীম লীগ থেকে আওয়ামী লীগের বিবর্তন ঘটে ইতিমধ্যে আর-একটি উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবে, উঠতি ধনিক যাদের বলা হয়। এই উঠতি ধনিক বা উচ্চমধ্যবিত্তদের প্রতিপত্তি হয় একটা নতুন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নানা ধরনের আমলা, অফিসার ও

ব্যবসাদারদের আবির্ভাবে।

কিন্তু এই নবসুবিধালব্ধ-হিন্দু অফিসারহীন শূন্যস্থান পূরণকারী হাজার হাজার বাঙালি নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুত্ব পছন্দ করেনি, তথাপি পাকিস্তানের সুবিধাগুলি নিতে কসুর করেনি। কিন্তু তাদের কোন অর্থেই দেশগঠনধর্মী বুর্জোয়াশ্রেণী বলা যায় না, পশ্চিমী জগতে বুর্জোয়াদের যে একটা পজিটিভ বা কনস্ট্রাকটিভ ভূমিকা ছিল, তা তাদের মধ্যে ছিল না। তারা ছিল পরাশ্রয়ী ও ভোগবাদী। কনজিউমারস লিজার ক্লাস বলতে যা বোঝায়, সেটাই ছিল বা আজও আছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী। এই শ্রেণীর ভোগবাদের নমুনা বা স্ট্যান্ডার্ডটাও ছিল পশ্চিমী affluent সোসাইটির ধরনের। যে কোন ব্যক্তি ঢাকার মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্তদের ঘরবাড়ি, বৈঠকখানা, বিদেশী গাড়ি ইত্যাদির বহর দেখলেই তা বুঝতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণী অনেক কালের, কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের জন্ম ও প্রসার এই সেদিনের, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তের তুলনায় অতিশয় দরিদ্র। অথচ এই পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তদের নিজেদের দেশের তৈরী জিনিসে কোন গর্ব নেই, বিদেশী জিনিস কার ঘরে কত আছে তা দেখাতেই ব্যস্ত ছিলেন। এই মধ্যবিত্ত বা নয়াধনী ও জোতদার শ্রেণীর উপর নির্ভর করে কোন সমাজতন্ত্র গড়া চলে কি? এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রকে দাঁড় করাতে হলে, এদের সাহায্য না নিয়ে—এদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয় এবং সেটা করবে কোন্ শ্রেণী? নীচেকার দরিদ্র চাষী ও মজুরেরা; কিন্তু তারা এখনও কোথায়, তারা এখনও সমরাঙ্গণে প্রবেশই করেনি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিভ্রান্ত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার দরকার হয়, তাই ওই দেশে সাম্প্রদায়িকতা যেয়েও যায় না। বস্তুত আজ পৃথিবীতে যেখানে যেখানে সাম্প্রদায়িকতা আছে, তার প্রেরণা ধর্ম থেকে আসে না, আসে এই অতৃপ্ত মধ্যবিত্তদের অনির্বাণ ভোগবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকেই, সে বাংলাদেশেই হোক, আর লেবাননেই হোক। একথা হয়তো অন্নদাবাবু স্বীকার করবেন না যে আজকের সদ্যস্বাধীন, অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলির ক্রমবর্ধমান অসহায়তা ও অসন্তোষের মূলে আছে এসব দেশে যে নতুন একটা বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছে—নানা ধরনের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে এবং পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির ভোগ্যমানের ঝকঝকে স্ট্যান্ডার্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তারাই। দুর্নীতি ও দুরাকাঙ্ক্ষা আসে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের বহর বাড়াবার পথেই, করাপশন সেই পথেই আসে; একটা জাতিও যদি তার রিসোর্সের বাইরে ও নিজেদের শক্তির বাইরে বেশী বড় হবার লোভ করে তার পক্ষেও পরনির্ভরতা বাড়ে বই কমে না আত্মনির্ভরতা থাকে না। এ যেমন বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ভারত ও অন্যান্য সদ্যস্বাধীন অ্যাফ্রো-এশীয় দেশগুলি সম্বন্ধেও সত্য। Nature of the present discontentment এবং তার নানা স্ববিরোধী ও আত্মঘাতী প্রকাশের কারণ তাই প্রাচীন সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম থেকে বোঝা যাবে না, বুঝতে হবে তার নয়া, বুভুক্ষু, মধ্যবিত্ত সমাজের অতৃপ্ত ভোগবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে। এই বেসিক ইন্ধনের কথাটা না বুঝে, প্রতিটি দেশের মধ্যবিত্তের detailed ভুলত্রুটি ও কমিশন ও অমিশনের মধ্যে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বান্বেষণ করলেও বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না, কোন সত্যিকার আলোকপাত হবে না। আমি মনে করি অন্নদাবাবুর বইতে অনেক মূল্যবান বিচার-বিতর্ক ও স্পেকুলেশন থাকলেও সত্যিকার কোন আলোকপাত হয়নি, আমরা জানি না কী করলে বাংলাদেশের সত্যিই একটা সুস্থির ও বলিষ্ঠ স্থিতি আসবে, অথবা ভারতের সঙ্গে সত্যিকার সহজ ও সুন্দর সম্পর্কটা স্থাপিত হবে। অবশ্য একটি লেখকেব কাছ থেকে এতটা কারো দাবি করা উচিত নয়, সত্যিকার গবেষণা যদি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিকেরা করতে বসেন, তবেই হয়তো একটা পরিষ্কার পথ বের হতে পারে। তবে এ কাজে অন্নদাবাবু স্বল্পপরিসরের মধ্যেও হাত দিয়েছেন, কিছু যোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন,

তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ এবং এই চেষ্টা যদি অন্যান্যদের এই বৃহৎ কাজে হাত দিতে উৎসাহ দেয় তবে বাংলাদেশ কেন, ভারতের পক্ষেও তা অনেক উপকারে আসবে।

পান্নালাল দাশগুপ্ত

Ganga and Rhein: Glimpses of Indo-German Contact. Published under the arrangement with Messrs. Abhi Prakashana. Calcutta. Price not mentioned.

ফেডরল রিপাবলিক অব জার্মানির কনসল-জেনরল ডব্লিউ. ফন্ আইশ্বোর্নের ভূমিকাসহ আলোচ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তু কতিপয় পূর্বপ্রকাশিত রচনার বিক্ষিপ্তপ্রায় সংকলন। ভারত-জার্মানির সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সুষ্ঠু নিরীক্ষা সংস্কৃতিমান সামাজিকমাত্রেরই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু এমত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন বিষয়গুরুত্বে স্পষ্টতর ধ্যানধারণা। সমকালীন সরকারী মহিমা প্রচারণের দৃপ্ত চারিত্র নির্ধারণ অসাধ্যসাধন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গবেষণাকর্মের প্রেক্ষিতে সময়ান্তরে এমত এলোমেলো পুস্তিকা প্রকাশনের প্রেষণা যাই হোক না কেন, সন্ধিৎসু পাঠক কিন্তু কার্যত নিরুৎসাহই হবেন শেষাবধি। ভারতবিদ্যাচর্চায় উৎসৃষ্ট জার্মান মনীষার চমকপ্রদ আখ্যান বিশ্বস্তার ইতিবৃত্তে এক বিস্ময়কর ঘটনা। অবশ্য মাতুলহীন হওয়া অপেক্ষা অন্ধ মাতুলেও যেহেতু আমরা আকাঙ্ক্ষিত তাই এমত লোকায়ত নিবন্ধসংকলন অতীব অস্বাস্থ্যকর নয়।

ইংরেজ ও ফরাসীদের মতো রাজনীতিক সম্পর্ক ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষ আবিষ্কারে জার্মান পণ্ডিতকুলের প্রবল প্রয়াস সবিশেষ প্রশংসনীয়। সংস্কৃতচর্চায় জার্মানজাতির পুরোধা হাইনরিশ্ রোট ও ইওহানেস্ এরনস্ট্ হানক্সলেডেনের পর ইওহান্ গেঅর্গ আডাম্ ফরস্টার, ইওহান্ গট্ফ্রীট্ হ্যরডার প্রমুখ ভারতপ্রেমিকের কথা উল্লেখ্য। সর্বোপরি একজন ইওহান্ ভোলফ্গাঙ্ ফন্ গোয়েটের "শকুন্তলা"-প্রশস্তি সর্বজনবিদিত। "ফাউস্ট্" (১৭৯৭)-এর প্রস্তাবনায় (Vorspiel auf dem Theater) "শকুন্তলা"-র সাদৃশ্য স্পষ্টতর। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে গোয়েটে পুনর্বার 'শকুন্তলা' পাঠ করেন আঁতোআন্ লেওনার দ্ শেঝির ফরাসীস তরজমায় এবং অনুবাদককে লেখা তাঁর এক চিঠিতে ভারতীয় কবির প্রশংসায় পুনরায় তিনি পঞ্চমুখ হন। জার্মান ভাষায় মূল সংস্কৃত থেকে প্রথম 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর অনুবাদক বেন্হার্ট হিরট্সেল্ তাঁর ভূমিকায় (১৮৩৩) গোয়েটের উক্ত চিঠিটি উদ্ধার করেছেন।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (২ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৬) সংস্কৃতভাষা বিষয়ে উইলিয়ম্ জোনসের ঐতিহাসিক ঘোষণার প্রেক্ষিতেই য়ুরোপীয় বিদ্বৎসমাজ প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাণিত হন। ইতিপূর্বে *A Grammar of the Persian Language* (১৭৭১)-এর ভূমিকায় তিনি স্পষ্টতই লিখেছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রসারেই য়ুরোপে এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সম্ভাবিত, যার পোষকতায় অবশ্য কোনও মেদিচি পরিবারই প্রত্যক্ষতর নয়। ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞানচর্চার নিদর্শন হিসাবে কার্ল ভিল্হেলম্ ফ্রীড্রিশ্ ফন্ শ্লেগেল্ প্রকাশ করেন তাঁর যুগান্তকারী *Ueber die Sprache und Weisheit der Indier* (১৮০৮)। ভারতসংস্কৃতি সম্পর্কে সন্ধিৎসাবর্ধন ব্যতিরিক্ত তৌলনিক ভাষাবিদ্যাবিষয়ক অবহিতিও এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট। অতঃপর গ্রীক, লাতীন, পারসীক ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক বিচারে সংস্কৃত ধাতুরূপ বিষয়ে ফ্রান্ট্স্ বোপ্ প্রথম প্রকাশ করলেন তাঁর মূল্যবান গবেষণাকর্ম *Ueber das Conjugationssystem der Sanskrit-*

sprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, persischen und germanischen Sprache (১৮১৬)। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এই যে নব্যপরিচয় য়ুরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের ঘটল তার অভিব্যক্তি আজও অনুভূত হয়ে চলেছে।

Ganga and Rhein পুস্তিকায় ভারত ও জার্মানির ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, ফ্রীড্রিশ্ মাক্স ম্যুলারের সঙ্গে ভারতীয় মনীষার সৌহার্দ্য, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জার্মানি সফর, সুভাষচন্দ্র বসু ও জার্মানজাতি, ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হেল্‌মুট্ ফন্ গ্লাসেনাপ্, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও জার্মানি (১৮৭০-১৯৪৫) এবং ভারতবিদ্যাচর্চায় জার্মানির বিদ্বৎ-সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা আভাসিত। অতীতের সুদৃঢ় সম্পর্কের কথা নিঃসন্দেহেই মূল্যবান। কিন্তু এমত মহার্ঘ বিষয়ের যথাযথ উপস্থাপনে এক আয়াসসাধ্য নিষ্ঠা এবং সুসম্বদ্ধ প্রক্রিয়া অনিবার্য নয় কি?

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

সতু সেন : আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত। আশা প্রকাশনী। কলিকাতা, ৯। মূল্য বারো টাকা।

বাংলা নাট্যশিল্পের ইতিহাসে সতু সেন একটি প্রথিতযশা নাম। দোষে-গুণে জড়ানো তাঁর ব্যক্তিত্ব আজও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

ইনজিনিয়র হবার জন্য সতু সেন আমেরিকা পাড়ি দেন। মাঝপথে প্রখ্যাত হাসান সাহেদ সারওয়ার্দি সাহেবের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই প্রেরণায় তিনি পূর্বসংকল্প ত্যাগ করে ভিন্নতর এক জগতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই জগৎ থিয়েটারের জগৎ।

আমেরিকায় পোঁছে কঠোর অর্থাভাবের মধ্যে চলতে থাকে তাঁর সাধনা—নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ল্যাবরেটরি থিয়েটারে। শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে সেখানে তিনি পেয়েছিলেন স্তানিস্লাভস্কির যশস্বী শিষ্য রিচার্ড বোলিস্লাভস্কি আর মাদাম মারিয়া উসপেনস্কায়াকে। উসপেনস্কায়াই তাঁকে দিলেন 'মুড প্রোজেকশন' সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। শিক্ষান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তিনি প্রায় পাঁচ-সাতটি নাটক স্বাধীনভাবে পরিচালনা করেন; তার মধ্যে শেকভের "থ্রী সিস্টার্স" আর সেরভেনটিসের "ডন কুইকজোট" সবিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

সতু সেন যখন আমেরিকায় তখনই শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর দলবল নিয়ে আমেরিকা রওনা হন। আমেরিকায় শিশিরকুমার খুবই বিপাকে পড়েন। সেই সময়ে, বলতে গেলে বুক দিয়ে আগলে, যে মানুষটি তাঁকে সকল দুঃখ আর বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তিনি সতু সেন।

দেশে ফেরার পর স্বভাবতই তাঁর প্রতিভার প্রয়োগক্ষেত্র হল রঙ্গমঞ্চ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি ইট-কাঠ-পাথরে, পর্দায়, উইংস-এ, ইলেকট্রিক সুইচে তাঁর শিল্পী-হাতের স্পর্শ আজও অম্লানভাবে উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

থিয়েটারে তাঁর প্রথম কৃতিত্ব আলোর ব্যবহার। আলোকে দিয়ে তিনি অভাবনীয় নাটকের সৃষ্টি করলেন—প্রয়োজনমতো জ্বালিয়ে-নিভিয়ে, কমিয়ে-বাড়িয়ে, আর তারই সঙ্গে অব্যর্থ রঙটিকে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে আলোর ব্যবহারে তিনি যে মায়ালোক সৃষ্টি করলেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চে তা যথার্থই অভূতপূর্ব। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যেভাবে তিনি মঞ্চে ঝড় বা বৃষ্টিপাতের

ধ্বনিদ্যোতনা এনে দিতেন, বা যেভাবে ধূ-ধূ প্রান্তরের প্রতিভাস সৃষ্টি করতেন, তা সত্যই বিস্ময় জাগায়।

থিয়েটারে তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্ব ঘূর্ণ্যমান মঞ্চের প্রতিষ্ঠা। এর দ্বারা অভিনয় প্রবল গতিবেগ-সম্পন্ন হল। এই গতিসঞ্চার যে কী তাৎপর্যমণ্ডিত এক কৃতিত্ব তা উপলব্ধি করা যাবে দুই কালের বাংলা নাটক মনোযোগ দিয়ে মিলিয়ে দেখলে। পাঁচ-ছ ঘণ্টার অভিনয়ের স্থানে এই সর্বপ্রথম তিন ঘণ্টার সময়-সীমায় দুটি করে নাটক অনুষ্ঠিত হতে পারল।

"আত্মস্মৃতি" প্রধানত সতু সেনের মৃত্যুশয্যায় রচিত—সতু সেন মুখে বলে গেছেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত অনুলিখন করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষক পর্ব কথকের প্রবাসজীবন। এই অংশে একটি গুরুতর তথ্যগত প্রমাদ ঘটেছে—আমেরিকা যাত্রায় যাঁরা শিশিরকুমারের সহযাত্রী ছিলেন তাঁদের তালিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম উল্লিখিত হয়নি। 'মঞ্চকারু' স্টেজক্রাফট সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ, সম্পাদককর্তৃক অনূদিত। 'আলো'-অংশের অনুবাদ করেছেন সমীর রায়, 'অভিনয়'-অংশের পার্থ সেন।

প্রবীর সেন

ভ্রম সংশোধন : এই সংখ্যায় ৭ম পৃষ্ঠার ১৪শ পঙ্‌ক্তিটির শুদ্ধ পাঠ এইরূপ হবে—'সংগ্রহ করিয়াছিলেন সন্ত্রাসবাদী ও নিয়মতান্ত্রিক উভয় দলের মধ্য হইতে। ১৯২১ ও ১৯২৩ সালে...।'

কৃষি সংবাদ

না, বর্ষাকাল নয়। বসন্তের মেঘলা দিনে মাঠভরা সবুজ ধানের
অতিদূর বিস্তার মাত্র। কিন্তু বর্ষার আমন ধানের
ক্ষেত বলে ভুল করবেন না। বর্ষার আমন ধান নয়, বসন্তের
বোরো ধান। বর্ষার আমন ধান নয়,.........

বছর	বোরোর এলাকা (একর)	বোরো চালের উৎপাদন (টন)
১৯৪৭-৪৮	২৫·৩ হাজার	৯·৫ হাজার
১৯৫১-৫২	৪১·৪ ,,	১৫·৭ ,,
১৯৫৯-৬০	৯৮·৯ ,,	৪৩·৫ ,,
১৯৬৫-৬৬	৭৪·৩ ,,	৩৬·৯ ,,
১৯৭২-৭৩	৬·৫০ লক্ষ	৭·২৯ লক্ষ
১৯৭৩-৭৪	৮·০৩ ,,	৭·২৯ ,,
১৯৭৪-৭৫	৮·৪১ ,,	৮·৫৬ ,,
১৯৭৫-৭৬	৭·৮৮ ,,*	১২·০০ ,,*

* = অনুমিত

পশ্চিমবঙ্গে বোরো ধান সবুজ বিপ্লব আনছে।
পশ্চিমবঙ্গে বোরো ধান বিপুল সমৃদ্ধির দিশারী॥

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

ক

শরীরের যেমন
পুষ্টি দরকার
আপনার চুলেরও
তেমনি দরকার
পুষ্টির
285 ml.
DELIGHTFULLY PERFUMED
A HAIR OIL OF
DISTINCTION
FOOD & TONIC FOR HAIR
DEY'S MEDICAL STORES LTD
CALCUTTA-16
কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল
চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে
দে'জ মেডিকেলের তৈরী
PX/DM/KB-1/78

Only Chloride could beat Chloride's 'long-life' record!

Chloride India's advanced technology presents

Exide supreme

Tomorrow's battery here today!

Exide 'Supreme' is the end result of years of intensive research and development. Its unique high-grade polypropylene container and special power-packed construction makes Exide 'Supreme' the sturdiest, most advanced battery for your car. Proof of its superiority is the instant acceptance in sophisticated international markets. And Exide 'Supreme' is manufactured by Chloride India—so it's got to be the best!

1. **LONGER LIFE** because of improved plate and battery design.
2. **MORE POWER** because it has special through-partition inter-cell connectors and shorter plate pitch resulting in instant starting even in extreme weather conditions.
3. **PEAK EFFICIENCY** because special li[illegible] construction mini[illegible]es surface leakage and terminal corrosion.

Exide Supreme has already been accepted as original equipment fitment in Ambassador, Premier and Standard cars. Also being used by the State Transport undertakings.

This battery is available for replacement in Ambassador, Premier and Standard cars.

A CHLORIDE PRODUCT

CIC-42/81

"এতদিন এই বস্তীতে আছি এই প্রথম দেখলাম কেউ আমাদের জন্য ভাবছে।"

মরিয়ম বিবি। ঠিকানা ৮নং কাশিয়াবাগান বস্তী। প্রায় পঞ্চাশ বছর এ বস্তীর বাসিন্দা। বয়স ৭৫।
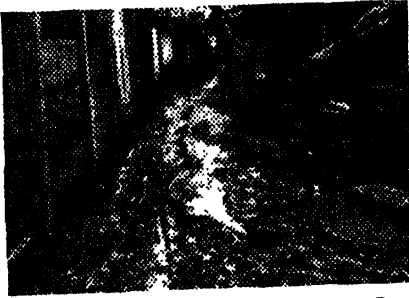
কাশিয়াবাগান বস্তী পাঁচ বছর আগে যা ছিল

এখন চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা

"আমাদের এই বস্তীতে কোন দিন যে পাকা রাস্তা, পাকা নর্দমা হবে, টিউবকল বসবে, ভাবতেও পারিনি,"—বললেন মরিয়ম বিবি। গত পঞ্চাশ বছরে তিনি এ বস্তীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপই হতে দেখেছেন। ভাবতেন, "আমাদের ভাগ্যই এ রকম।" বছর পাঁচেক আগে একদিন দেখলেন, কারা সব ফিতে নিয়ে মাপামাপি সুরু করেছে। তারপর সুরু হল ভাঙচুর। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন সেদিন মরিয়ম বিবি। তারপর ব্যাপারটা আস্তে আস্তে বোঝা গেল। তাঁর কাশিয়াবাগান বস্তীর রাস্তায় জীবনে প্রথম আলো দেখলেন। খাটা পায়খানার জায়গায় হয়েছে পাকা স্যানিটারী পায়খানা আর পাকা নর্দমা, জলের কল। আগে যেখানে কলেরা-বসন্তের ছড়াছড়ি ছিল, আজ তা অনেকটা বন্ধ হয়েছে। মরিয়ম বিবি বললেন, "এটুকু বা আমাদের জন্য আগে কে করেছে? শেষ জীবনটা অন্ততঃ একটু ভালোভাবে থাকবো।"

CMDA

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি

এ কথা বললে বেশী বলা হবেনা যে আমাদের রাজ্যের অর্থ-নৈতিক পুনর্জাগরণ বিদ্যুতের যোগানের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রধানতম সংস্থা হিসাবে রাজ্যের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা সর্বদাই সচেতন। বর্তমানে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ৬৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরনে আমরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিন যা ছিল কেবল স্বপ্ন আজ দিনের পর দিন তাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি দিকে দিকে।

এ পর্যন্ত আমরা ৯,৯০৯টি মৌজায় (১০,৪৪৭টি গ্রামে) বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া গত ৪ বছরে ২৩০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও বেশী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ ও পরিবহন লাইন পাতা হয়েছে, ফলে সুদূর গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান আরো উল্লেখজনক। ১৯৭৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১৪৫ টি গভীর নলকূপ, ৬৯৫২ টি অগভীর নলকূপ এবং ৬৮৯ টি রিভার লিফট পাম্প বিদ্যুৎ চালিত করার ফলে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

দু বছরের মধ্যে সাঁওতালডিহিতে দুটি ১২০ মেগাওয়াট ইউনিট চালু করা হয়েছে, ফলে এখানে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কলকাতার আশে-পাশের শিল্প এলাকার চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাঙলার বিদ্যুৎ চাহিদাও মেটাচ্ছে। আমাদের সম্প্রসারণ কার্যসূচী এগিয়েই চলবে। সাঁওতালডিহির ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কোলাঘাটের ৩ X ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট ও ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট স্থাপন করে সেই কেন্দ্রের সম্প্রসারণের কাজও একই রকম দ্রুতগতিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ট্রান্সমিশন লাইন পাতার কাজও চলেছে।

উত্তরবঙ্গে আমরা এখন নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজে ব্যস্ত। এদের মধ্যে আছে ২ মেগাওয়াটের রিংচিনটন এবং ৮ মেগাওয়াটের জলঢাকার ২য় পর্য্যায়ের কাজ। ৫০ মেগাওয়াটের রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ চলেছে। নতুন ডিজেল জেনারেটিং সেটগুলি বসানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী বাবদ ৬৯.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আরো বেশী টাকা সংগ্রহের জন্যে।

আরো বেশী বিদ্যুৎ যোগান দিতে আমরা প্রতিনিয়তই সচেষ্ট— বলতে গেলে এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মানেইতো দেশের দশের সার্বিক উন্নতি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

হীরা আদমি হরিলাল

স্টাফ রিপোর্টার, ২৮ মার্চ—কয়েকটি শিশুর জীবন বাঁচালেন গেটম্যান হরিলাল। বাঁচাতে পারলেন না নিজেকে। হরিলাল ছিটাগড় লেভেল ক্রসিংয়ের গেটম্যান। সকাল তখন সাড়ে নটা। শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেন

আসছে। হঠাৎই হরিলালের নজরে এল লাইনের ওপর খেলারত শিশু। একেবারে ট্রেনের মুখোমুখি। ছুটে গেলেন তিনি। লাইন থেকে সরিয়ে দিলেন শিশু কটিকে। শুধু সরাতে পারলেন না নিজেকে। তার মহান মৃত্যুর সাক্ষী রইল সেই শিশুরাই।

নিজের প্রাণ দিয়ে শিশুদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন হরিলাল। একটি দুর্লভ মহত্ত্বের চিহ্ন রেখে গেলেন লোহা মাটি পাথরের ফাঁকে।

তাঁর নাম ঘিরে থাকবে আমাদের গর্ব শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা।

অযথা প্রাণের ঝুঁকি নিতে গিয়ে যদি তাঁর কথা স্মরণ করেন, যদি থেমে যান, সেই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি সত্য শ্রদ্ধার্ঘ্য। নিজের জীবন বা হরিলালের মতো আর কোন মহৎ জীবন বিপন্ন ক'রে তুলবেন না।

পূর্ব রেলওয়ে

পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষণের জন্য জনগণের প্রতি আবেদন

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ডাক দিয়েছেন দেশের সব মানুষকে—বিশদফা কর্মসূচীর রূপায়ণে। এসেছে সর্বস্তরে কর্মচাঞ্চল্য—অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এই বিশদফা কর্মসূচী। জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে যখন আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি, সেই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন অতীত ইতিহাসকে অতন্দ্র প্রহরীর মত রক্ষণাবেক্ষণ করা—এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রতিটি মানুষকে শাণিত সজাগ চেতনা নিয়ে অতীত ইতিহাসের প্রাচীন স্থাপত্যকলার স্বাক্ষরবাহী দেবদেউল, গীর্জা, মসজিদ, মঠ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য আবেদন করেছেন।

অনেক ভাঙাগড়ার সাক্ষী এই গঙ্গা-যমুনাবিধৌত বাংলাদেশে যুগ থেকে যুগান্তরে কত অসংখ্য মানুষ তার স্বপ্নসাধনা দিয়ে গড়ে তুলেছে সৃজনধর্মী শিল্পকর্ম। বিবর্তনের ধারায় একদিন দেখা দিল এই মাটিতে মদগর্বী ক্ষমতালোলুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। শত চেষ্টায় তারা মুছে ফেলতে পারেনি জাতীয় ঐতিহ্যসমন্বিত পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু। মহাকালের অবক্ষয়কে উপেক্ষা করে, অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে আজও দাঁড়িয়ে আছে শতসহস্র পুরাকীর্তি। এদের দেখলে মনে হয়—"হে স্তব্ধ অতীত, কথা কও, কথা কও"।

বর্তমান দিনে জাতীয় সরকার ঐতিহ্যবাহী পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষণে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার সাফল্য ও শক্তির মূল উৎস হল দেশের আপামর জন-সাধারণ। এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। তাই এই ক্ষেত্রে জন-গণের কর্তব্য কি তা নীচে সন্নিবেশিত হল :—

১। পুরাকীর্তির অলঙ্করণ কাজসমূহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ—এই নীতি সবাইকে অবহিত করা প্রয়োজন।

২। পুরাকীর্তি বা তার অলঙ্করণের উপরে নাম লেখা, দাগ কাটা বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা নিষিদ্ধ। এই নিষেধের অমান্যকারীকে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করা উচিত।

৩। পুরাকীর্তির উপরে বা আশেপাশে গাছ জন্মালে জনসাধারণ যেন যৌথ প্রচেষ্টায় সেগুলি নির্মূল করেন এবং স্থানটি যথাসম্ভব আবর্জনামুক্ত রাখেন।

৪। জনসাধারণের নজর রাখা উচিত যে পুরাকীর্তির অভ্যন্তরে বা প্রাঙ্গণে যেন কেউ আগুন না জ্বালায় কেননা ধোঁয়ায় পুরাকীর্তির ঔজ্জ্বল্য নষ্ট ও অন্যান্য ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং পুরাকীর্তির স্থলে সাধুসন্তদের ধুনি জ্বালানো বা বন-ভোজনের জন্য রান্না করা থেকে নিবৃত্ত করা উচিত।

৫। ইদানীং নানারকম প্রত্নসম্পদ বা পুরাকীর্তির গাত্র থেকে অলঙ্করণাদি অপহরণের জন্য সমাজবিরোধী দুষ্টচক্র সক্রিয় আছে। এদের উপর কড়া নজর রাখা উচিত এবং ঐজাতীয় কোন ঘটনার আভাস পাওয়ামাত্র স্থানীয় বি ডি ও, এস ডি ও এবং পুলিসের গোচরে আনা প্রয়োজন। ইতি—

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
রাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ৪৫১৭/৭৬

for
exceptional
tonal
contrast
national-148
EXPORTER:
BUDAPEST
HUNGARY
FORTE
Photo Sheet Films,
Roll Films—120 size
SPEED CHOICE: 160, 320 & 400 ASA
also available: colour papers
SOLE IMPORTERS & DISTRIBUTORS:
PHOTO CINE STORES
H.O. 3B JAWAHARLAL NEHRU ROAD, CALCUTTA 700013
BRANCHES AT MADRAS, BOMBAY & NEW DELHI
Our New Delhi Branch opened at 1/10/B Asaf Ali Road, New Delhi 110001

বর্ষ ৩৮ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩

সূচিপত্র

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ ডক্টর লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩৮ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী

অন্নদাশঙ্কর রায়

একদা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী ছিলেন পূর্বসূরী, আমরা 'প্রবাসী', 'ভারতী' ও 'সবুজপত্রে'র পাঠক ও লেখকরা ছিলুম তাঁদের উত্তরসূরী। এখন আমরাই হয়েছি পূর্বসূরী, কিন্তু আমাদের উত্তরসূরী কারা তা আমরা বলতে পারব না। অন্তত আমি তো কারো নাম করতে পারছিনে। কথাটা আরো স্পষ্ট হবে যখন আমি নিজের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে চেষ্টা করব।

আমার পূর্বসূরীদের অন্বিষ্ট ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন। প্রাচ্য বলতে তাঁরা বুঝতেন প্রাচীন ভারত আর প্রতীচ্য বলতে আধুনিক ইউরোপ। তাঁদের কাছে প্রাচীন ভারত মহান হলেও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, সুতরাং আধুনিক ইউরোপকে তার চাই। এটা ইউরোপের স্বার্থে না হোক, ভারতের স্বার্থে। এখন এই জায়গাটাতে জাতীয়তাবাদের আপত্তি ছিল। আমাদের সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে ইউরোপের যদি গ্রহণযোগ্য কিছু না থাকে তবে ইউরোপের সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে আমাদেরই বা গ্রহণযোগ্য কিছু থাকবে কেন? ইউরোপ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে আমরাই বা স্বয়ংসম্পূর্ণ না হতে পারব কেন? ওরা যদি আমাদের পাত্তা না দেয় আমরাই বা কেন ওদের পাত্তা দেব? দৈহিক অর্থে ওরা আমাদের জয় করেছে বলে কি মানসিক অর্থেও জয় করবে? মনেপ্রাণে যদি ওদের দাস হই তবে কি কোনোদিন আমরা স্বাধীনতা ফিরে পাব? এর নাম সম্মানজনক সমন্বয় নয়, এটা 'দাস মানসিকতা'।

'দাস মানসিকতা'-বিরোধী ঢেউ যখন ওঠে তখন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের মিলনের কল্পনা কোথায় ভেসে যায়। আগে তো দেশ স্বাধীন হোক, তার পরে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে স্বাধীন ইউরোপের মিলনের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু স্বাধীনতা যাকে বলা হচ্ছে সেটারই বা স্বরূপ কী? সেটাও কি ইউরোপীয় অর্থে স্বাধীনতা নয়? ইটালির স্বাধীনতার মতো উচ্চবর্ণের স্বাধীনতা কি ভারতের কাম্য? গান্ধীজী বলেন, না, ওটা সত্যিকার স্বাধীনতা নয়। 'হিন্দ্ স্বরাজ' লিখে তিনি তাঁর স্বরাজের সংজ্ঞা দেন। তাঁর ঝোঁকটা জনগণের স্বাবলম্বনের উপরে। জনগণের স্বশাসনের উপর। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসির দৃষ্টান্ত তিনি খোদ ইংলন্ডে দেখে হতাশ। আর ওদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন তাঁর চোখে সভ্যতাই নয়। আমি তো বিষম দোটানায় পড়ে যাই। এসব যদি বর্জন করি তো ইউরোপের আর বাকী থাকে কী! সমন্বয়টা তা হলে কিসের সঙ্গে

হবে? আর স্বরাজ থেকে যদি এসব বাদ পড়ে তবে স্বরাজের জন্যেই বা কেন আমি জীবনপাত করব? জনগণের স্বাবলম্বন ও স্বশাসনের জন্যে জনগণই সংগ্রাম করুক। অথচ এটাও তো ঠিক যে পরাধীনতার অবসান দেশসুদ্ধ সকলেরই কাম্য। চীন যদি স্বাধীন দেশ হয়, জাপান যদি স্বাধীন দেশ হয়, ইরান যদি স্বাধীন দেশ হয় তবে ভারতই বা না হবে কেন? দেশেবিদেশে আমরাই বা কেন ব্রিটিশ-প্রজা বলে পরিচয় দেব? আর স্বাধীন দেশ হলে আমাদের রেল স্টীমার কলকারখানা থাকবে না, এই বা কেমন কথা? আর্মি নেভি থাকবে না তো দেশরক্ষা করবে কে? নিরস্ত্র জনগণ?

প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সমন্বয়বাদীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের, জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে গান্ধীবাদীদের পার্থক্য দিন দিন প্রকট হয়। আমি একবার এ শিবিরে যাই, একবার ও শিবিরে যাই, একবার সে শিবিরে যাই। কোথাও স্থির থাকতে পারিনে। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে আমার ছিল একটা নাড়ীর টান, মূল ইংরেজীতে তথা বাংলা অনুবাদে ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ে আমি তার সঙ্গে একপ্রকার সাযুজ্য অনুভব করেছিলুম। কাউকেই আমার অনাত্মীয় মনে হতো না। শেক্সপীয়ারকে বা স্কটকে, টলস্টয়কে বা ডিকেন্সকে, মোপাসাঁকে বা চেখভকে, ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বা শেলীকে। ওঁরা যে বিদেশী একথা ভাবতে আমার অন্তরের অনিচ্ছা। মানুষ হয়ে আমি জন্মেছি, এটাই বৃহত্তর সত্য। ভারতীয় হয়ে জন্মেছি, এটা ক্ষুদ্রতর সত্য।

অথচ স্বদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমি স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে। এক এক করে সব ক'টা সাম্রাজ্য ভেঙে গেল বা যাচ্ছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই কি অটুট? প্রথম মহাযুদ্ধের পর পোলান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা পায়। ভারত কেন পাবে না? সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা ছিল। স্বাধীন ইটালি শেষকালে কিনা ফাসিস্ট বনে গেল। স্বাধীন ভারতও কি ফাসিস্ট বনে যাবে না, যদি ইটালির অনুসরণ করে? গান্ধীজী অকারণে ইটালীয় স্বরাজের থেকে ভিন্ন ধাঁচের স্বরাজ—হিন্দ্ স্বরাজ—চাইছেন না। গান্ধীজীর স্বরাজ কখনো মুসোলিনির স্বরাজ হবে না। কিন্তু পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসির উপরেও আমার স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল, সেটা ইংলন্ডের ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে। সাহিত্যের পর ইতিহাসেই আমার অনুরাগ। এক-এক সময় সাহিত্যের চেয়েও বেশী। দেশের জন্যে আমি কেবল স্বাধীনতা চাই তা নয়, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসিও চাই। সেক্ষেত্রে ইংরেজরা শত্রু নয়, গুরু। আর আধুনিক যুগে ফলিত বিজ্ঞান কি কেউ এড়াতে পারে? দেশে যদি লোহা থাকে তবে ইস্পাতের কারখানাও থাকবে। আর যিনি যাই বলুন, আক্রমণের সময় সশস্ত্র সৈন্যই কাজে লাগবে বেশী, অহিংস অসহযোগীর পালা পরে, যদি যুদ্ধে হার হয়।

তিনটে শিবিরের সঙ্গে যোগ দেয় আরো একটা শিবির। সেটা মার্কসবাদী। তার সঙ্গে আমার কোনোপ্রকার সাযুজ্য ছিল না। ভারতের পক্ষে সেটা শ্রেয় বলেও মনে হতো না। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে অবশ্যম্ভাবী বলেও আমি বিশ্বাস করতুম না। অথচ ত্রিশের দশকে লক্ষ্য করি ইংলন্ডের, ফ্রান্সের, জার্মানির তথা ভারতের বুদ্ধিজীবীরা কেউ লাল, কেউ গোলাপী রঙে মন রাঙিয়েছেন। আমার মনের রংটা তা হলে কী? কালো, না ধূসর, না বাদামী, না শাদা? একটা না একটা ইডিওলজি না হলে কি বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়? আমি কমিউনিস্ট, না সোশিয়ালিস্ট, না ক্যাপিটালিস্ট, না ফাসিস্ট? আমার প্রবণতাটা অ্যানার্কিজমের দিকে, যেমন কবি-চিত্রকর-গায়ক-বাদকদের হয়। কিন্তু সেটার সঙ্গে ভায়োলেন্স এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে তার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে না পারলে লোকে ভুল বুঝবে। তখন আমি তার সঙ্গে নন্ভায়োলেন্ট বিশেষণটি জুড়ে দিই। তার মানে আমি অহিংস নৈরাজ্যবাদী। সংশয়শীলরা বলবে, সোনার পাথরবাটি। যে যা বলে বলুক, আমি কিন্তু ইডিওলজি হিসাবে ওর চেয়ে ভালো কিছু খুঁজে পাইনি। হয়তো ওর

দুশো বছর দেরি আছে। তা হলে তো আমি দুশো বছর এগিয়ে রয়েছি। ইতিহাস তো আজ এখনি শেষ হয়ে যাচ্ছে না। বিংশ শতাব্দীই তো শেষ শতাব্দী নয়। আজ যেটা অবাস্তব আজ থেকে দুই শতক পরে সেটাই হতে পারে বাস্তব।

উত্তরসূরীদের যদি কিছু দিয়ে যেতে হয় তা হলে আমি দিয়ে যাব অহিংস নৈরাজ্যবাদ। এটা ইডিওলজি হিসাবে। এ ছাড়া সেই যে প্রথম সম্পাদ্য সেটাও পূর্বসূরীদের হাত থেকে নিয়ে উত্তরসূরীদের হাতে তুলে দিয়ে যাব। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের মিলন এখনো ঘটেনি। এখন তো আর 'দাস মানসিকতা'র প্রশ্ন ওঠে না। আমরা এখন ইংরেজ-ফরাসীদের মতোই স্বাধীন। জাতীয়তাবাদী ও গান্ধীবাদী—এই দুই শিবিরের মধ্যে মীমাংসা গান্ধীজী থাকতেও হয়নি, এখনো হচ্ছে না। কবে হবে কেউ বলতে পারে না। আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, অনেক লিখেছি। কিন্তু কোথাও তেমন মাথাব্যথা দেখছিনে। আর মার্কসবাদী শিবির তো এখন দুনিয়ার বহু দেশ জয় করে বর্ধিষ্ণু হয়েছে। তার প্রেস্টিজ এখন তুঙ্গে। তার নামটা না হোক, আদর্শটা তো আজকাল মুখে মুখে। অগ্নিপরীক্ষার দিন দেখতে পাওয়া যাবে কে কতদূর রক্তপাত সমর্থন করবেন। বিনা রক্তপাতে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে খতম করতে পারবে না। আইনসম্মত সংস্কারকে বিপ্লব বলে না। আমার উত্তরসূরীরা যদি বিপ্লবী হয় তবে আমি তাদের পূর্বসূরী হই কী করে?

আর্ট বড়ো না ইডিওলজি বড়ো? এ প্রশ্ন আমার জীবনে বার বার উদিত হয়েছে। জাতির দিক থেকে, সমাজের দিক থেকে ইডিওলজি যতই গুরুতর হোক না কেন, মানুষের রূপবোধ ও রস-বোধকে তৃপ্ত করা তার সাধ্য নয়। যার সাধ্য তার নাম আর্ট। ইডিওলজির ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনের ডাক পড়ে। তারা সবাই মনোনীত হয়। কিন্তু আর্টের আঙিনায় যাদের ডাক পড়ে তারা শত শত হলেও তাদের ভিতর থেকে মনোনীত হয় মাত্র কয়েকজন। মনোনয়ন করেন সরস্বতী। অনুমোদন করেন মহাকাল। ইনি ন্যাশনালিস্ট বা উনি মরালিস্ট বা তিনি সোশিয়ালিস্ট বলে যে সরস্বতীর মনোনয়ন পাবেন বা মহাকালের অনুমোদন, এটা উচ্চাশা। সামান্য একজন কারিগরও এঁদের চেয়ে বেশী আশা করতে পারে। যদি নিজের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে যায়।

আমি নিজেই বুঝি যে আমার নিজের কাজ হচ্ছে রস ও রূপ সৃষ্টি, অথচ সেই কাজে আমার নিষ্ঠার অভাব হয়েছে। আমি নিরুপায়। আমার ভিতরে গ্যেটের মতো এক daimon আছে। না, দানব নয়, এর অন্য বানান, অন্য অর্থ। সেই অদম্য শক্তি আমার হাত চেপে ধরে আমাকে দিয়ে যা লিখিয়ে নেয় তা আর্ট নয়। তবু সেও একদিক থেকে শ্রেয়। আমিও ইতিহাসের হাতের পুতুল। পুতুলনাচের ইতিকথায় আমারও একটা অংশ আছে। হয়তো অকিঞ্চিৎকর। তবু তা আমারই। সে কাজ আর-কাউকে দিয়ে হলে আমাকে দিয়ে করানো হতো না। এখানে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে আমার ভিতরকার সেই ডাইমন বাইরের কোনো ব্যক্তি বা দল বা গোষ্ঠী নয়, যার আমি বাহন বা ভৃত্য বা পুত্তলিকা। যদি সাংবাদিক হতুম তা হলে হয়তো তাই হতুম। হবার সাধ ছিল, সাধ্যও ছিল, কিন্তু আমার নিয়তি আমার কান ধরে সংবাদপত্রের অফিস থেকে কলেজে নিয়ে গেছে, সেখান থেকে সিভিল সার্ভিসে। নিজে বিড়ম্বিত হয়েছি, কিন্তু পাঠকদের বিড়ম্বিত করিনি। যেখানে আমি স্রষ্টা বা শিল্পী নই সেখানে আমি মানবিকবাদী ও অতন্দ্র প্রহরী। বাল্যকালে পড়ে-ছিলুম, 'Eternal vigilance is the price of Liberty'. সেটা আমার জীবনের সাথী হয়েছে।

গান্ধীজীর উক্তি 'আমার জীবনই আমার বাণী'। আমি তো ওকথা বলতে পারিনে। আমি বলব, 'আমার বাণীই আমার জীবন'। আমার বাণীর জন্যেই আমি বেঁচে আছি ও বেঁচে থাকতে চাই। গর্ভধারণের মতো এটাও একটা দায়, মহাদায়, মহত্তর দায়। এর থেকে মুক্ত না হয়ে মুক্তি নেই আমার। লিখি আর লিখে মুক্তি পাই। অন্তঃসত্ত্বা যেমন মুক্তি পায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে।

বারো তেরো বছর বয়সে যেমন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব শুরু তেমনি ষোল সতেরো বছর বয়সে টলস্টয় ও গান্ধীর। কিন্তু প্রথমোক্ত দুজনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেমন নির্বিরোধ দ্বিতীয়োক্ত দুজনের সঙ্গে তেমন নয়। এঁদের সঙ্গে আমি মনে মনে দ্বন্দ্বরত হয়েছি। দীর্ঘকাল ধরে চলেছে সেই দ্বন্দ্ব। অবশেষে এসেছে সন্ধি ও প্রত্যয়।

কতকগুলো ফান্ডামেণ্টাল প্রশ্ন নিয়ে আমি বাল্যকাল হতেই চিন্তাগ্রস্ত। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, কী করব, কেন করব, কেমন করে করব, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে কী সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে কী সম্পর্ক, জীবনের অর্থ কী, সার্থকতা কিসে, প্রেম কী, রস কী, রূপ কী, ধর্ম কী, নীতি কী, ইনটেলেকটের দৌড় কতদূর, ইনটুইশনের কী মূল্য, ইমোশন কি ভালো, ইনস্টিংক্ট কি মন্দ, আত্মা কি অমর, কিসে আমাকে অমৃত করবে—এমনি অসংখ্য জিজ্ঞাসা। সেই সঙ্গে ছিল—রাষ্ট্র না হলে কি চলে না, আদালত, জেল, পুলিশ ও ফৌজ কি অপরিহার্য, রাষ্ট্রহীন সমাজ কি একটা অবাস্তব কল্পনা, রাষ্ট্র যদি থাকে তো তার উপর সওয়ার হবে সমাজ না সমাজের উপর সওয়ার হবে রাষ্ট্র, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কী সম্পর্ক, কতদূর নিয়ন্ত্রণ মানা উচিত, তারপরে কি অমান্য করাই কর্তব্য, অমান্য করলে সেটা কি হবে সিভিল বা অহিংস, শাসক-শক্তি যদি ক্ষমতা ছেড়ে দেয় তার জায়গায় কি বসবে নতুন এক শাসকশক্তি, সে কি পারবে সর্ব-সম্মতিক্রমে শাসন করতে, কেউ যদি তার নিয়ন্ত্রণ অমান্য করে সেও কি অঙ্কুশ প্রয়োগ করবে, না সে স্বেচ্ছায় গদি ছেড়ে দেবে, তার ফলে যদি এমন অবস্থা হয় যে কেউ কাউকে শাসন করতে পারছে না, তখন সেই অরাজকতা কি সহ্য হবে না, অরাজকতার নীট ফল কি কঠোর সামরিকতা নয়? ক্ষমতা সংক্রান্ত এই সব মূলগত প্রশ্নের মতো ছিল ধন সংক্রান্ত মূলগত প্রশ্ন। ক্যাপিটালিজম, সোশিয়ালিজম, কমিউনিজম, ফাসিজম ইত্যাদি বিবিধ ইজম তো ধন উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ইত্যাদিকে ঘিরে। সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। কতক লোক আর-সকলের শ্রমের সুযোগ নিয়ে ধন সঞ্চয় ও নিয়োগ করেছে। তাদের শূন্যতাই কি সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে ও সে সমৃদ্ধি সমভাগ হলে সকলেই সমৃদ্ধ হবে?

এসব প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী ও টলস্টয় যা বলেছেন তারই গুরুত্ব ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশী, যদিও অবিসংবাদিতরূপে নয়। কতরকম মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে মার্কসবাদের প্রতিও আকৃষ্ট হই। রুশবিপ্লবের সাফল্যের মূলে ছিল মার্কসবাদ। সেই থেকে তার হঠাৎ উপজাত প্রেস্টিজ। আবার চরম প্রতিক্রিয়াও। সমাজের শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চাইলে বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লব অনিবার্য। তার মাশুল তো কোটি কোটি প্রাণের বিনাশ। অবশ্যম্ভাবী প্রতিবিপ্লব যদি এড়াতে হয় তবে তার আগে সম্ভবপর বিপ্লবও এড়াতে হয়। শ্রেয় সত্যাগ্রহ।

গান্ধী-টলস্টয়কেও আমি আমার পূর্বসূরী মনে করি ও নিজেকে তাঁদের উত্তরসূরী। কিন্তু আমার নৈতিক-রাজনৈতিক জীবনে এঁদের প্রভাবই প্রবলতর হলেও সারস্বত-সাহিত্যিক জীবনে আমি রবীন্দ্র-প্রমথ ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। আমার এই দুই পরম্পরাকে আমি মেলাতে চেষ্টা করেছি। পুরোপুরি মেলাতে পারিনি। রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি যখন করি তখন গান্ধী-টলস্টয়ের দিকে তাকাইনে, তাকালে তাকাই সেই টলস্টয়ের দিকে যিনি 'সমর ও শান্তি' আর 'আনা কারেনিনা' লিখে বিশ্বসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছিলেন। আগে শিল্পীর আসনটা অর্জন না করলে পরবর্তী বয়সের ঋষি টলস্টয়কে চিনত কে? তাঁর কথা শুনত কে? আমার কথাও কি শুনবে, যদি না তাঁরই মতো সৃষ্টি করে তাঁরই মতো আসন করে নিতে পারি? গান্ধীজীর মতো অহিংস সংগ্রাম চালিয়ে জনজীবনে অগ্রগণ্য অবস্থিতি অর্জন করতে পারা তো দূরের কথা।

আমার কণ্ঠস্বরের পেছনে না আছে আর্টের দিগ্বিজয়ী কীর্তি, না রাজনীতির ঐতিহাসিক

পটপরিবর্তন। আমার কণ্ঠস্বর নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর। মুষ্টিমেয় শ্রোতাকে নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে কথা বললে যেমন হয়। তিনশো জন পড়বে, একশো জন ভাববে, দশ জন বলবে, "ঠিক কথা"। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে লেখার কাজে নিযুক্ত থাকার পর দেখছি আমার পক্ষপাতী পাঠকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নয়, সহস্র সহস্র নয়, শত শত বললেও বাড়িয়ে বলা হয়। তবে সংখ্যার অভাব পুষিয়ে দেবার মতো অনুরক্ত পাঠকও যে নেই তা নয়। অবাক হয়ে যাই মাঝে মাঝে তাঁদের দেখা পেয়ে ও কথা শুনে।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষানবীশির পর আমি নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে আমি সারস্বত মহলের লোক ও পেশায় না হোক নেশায় একজন শিল্পী। জীবনে যদি কিছু করে থাকি তো শিল্পের সাধনা। তার আড়ালে রসের সাধনা। এ দুটো এমনভাবে ওতপ্রোত যে বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গেই আমার মেলে বেশী। এক-এক সময় মনে হয়েছে আমি তাঁদেরই উত্তরসাধক, রবীন্দ্র-প্রমথর নয়। তবে আমার মধ্যে আধুনিকতার ভাগ এত বেশী যে আমি কিছুতেই আমার যুগকে ভুলতে পারিনে। বিংশ শতাব্দীকে আমি হজম করেছি। বিংশ শতাব্দী করেছে আমাকে হজম। দেশ আর যুগের মধ্যে যদি বেছে নিতে হয় আমি বেছে নেব যুগকে। এই যে যুগকে বেছে নেওয়া—এটাই আমাকে একঘরে করেছে। যুগটা পশ্চিমকেন্দ্রিক। তাই আমি পশ্চিমঘেঁষা। দেশপ্রেমিক ও গণদরদী উভয় আসরেই আমি খাপছাড়া। আমার অস্তিত্বটাই অনেকের চোখে দুঃসহ। তবু আমি আমিই।

শিল্পী হিসাবে, বুদ্ধিজীবী হিসাবে আমি পশ্চিমদিকে তাকাই ও পশ্চিমের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিই। তা যদি না করি তবে আমি সেকেলে হয়ে যাবই। যেমন সেকেলে ছিলেন মাইকেল-বঙ্কিমের পূর্বসূরী দাশু রায় ও ঈশ্বর গুপ্ত। পূর্বসূরী মনোনয়নে মাইকেল ও বঙ্কিম দুজনেই হয়েছেন পশ্চিমমুখো। একজনের পূর্বসূরী মিলটন, আরেকজনের স্কট। এঁরা আবার প্রাচীন ভারতেরও উত্তরসূরী। কিন্তু পুরানো বোতলে নতুন মদ। এঁদের পরে আরো একদল এলেন যাঁদের বোতলটা নতুন, কিন্তু মদটা পুরানো।

রেনেসাঁসের পরের অধ্যায় রিভাইভাল। শব্দ দুটো শুনতে একই রকম। কিন্তু দুটোর তাৎপর্য দুরকম। রেনেসাঁসবাদীরা চেয়েছিলেন স্বকালের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, সুতরাং বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রাখতে। রিভাইভালবাদীরা চেয়েছিলেন স্বদেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, সুতরাং অতীতের সঙ্গে সংযোগ রাখতে। এই দুই বাদের এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র শেষবয়সে রিভাইভালকেই বরণ করেছিলেন, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে যাননি, ফিরেছিলেন প্রাচীন ভারতে, রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বকালে প্রত্যাবর্তন করেন, পশ্চিমে অভিযান করেন ও নোবেল প্রাইজ নিয়ে ফিরে আসেন পশ্চিম থেকেই।

আমিও যে কখনো রিভাইভালের স্বপ্ন দেখিনি তা নয়, কিন্তু আমার মানস-সরোবর প্রাচীন ভারতে নয়, আধুনিক ইউরোপেই। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনে রবীন্দ্রনাথের মতো আমারও মোহভঙ্গ হয়। তিনি লেখেন 'সভ্যতার সংকট' অর্থাৎ বিশ্বসভ্যতার সংকট। ততদিনে তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। নইলে বিশ্বকবি হতেন কোন্ সূত্রে? আমি সেদিন সেই সংকটকালে পশ্চিম থেকে অভিনব প্রেরণা আর পাইনে। আমার মতে পশ্চিম একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে। তা হলে কি আমি প্রাচীন ভারত থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে হাত বাড়িয়েছি? না, আমার মতে প্রাচীন ভারতের যা দেবার ছিল তা হাজার বছর আগেই ফুরিয়ে গেছে। যেটা ফুরিয়ে যায়নি সেটা তার ধর্ম। ধর্ম আর দর্শনবিজ্ঞান বা কাব্যনাটক এক নয়। এসব বিদ্যার বা কলার বহতা স্রোত ভারতে নয়, ইউরোপে। কিন্তু ইউরোপ তো আত্মঘাতী। তার দিকে তাকিয়ে কী পেতে পারি?

তখন আমি তৃতীয় একদিকে দৃষ্টিপাত করি। সেটা আমাদের লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতি। তার ধারা আবহমানকাল বহতা রয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহে শুকিয়ে যায়নি। পরাধীনতায় ক্ষীণ হয়নি। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দীন হয়নি। আমিও কি তার থেকে প্রেরণা পেতে পারিনে? সেই প্রবাহে যোগ দিয়ে সৃষ্টি করতে পারিনে?

কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা করে এই উপলব্ধি করি যে আমার মন সোফিসটিকেটেড, আমার হাত সোফিসটিকেটেড, আমার জীবনযাত্রাকে যতই সরল করে আনি না কেন সেটা কি কখনো জন-জীবনের মতো সরল হতে পারে? উল্টে জনজীবনই জটিল হয়ে উঠছে। বাউলও হচ্ছে সোফিসটি-কেটেড। যাত্রার বিষয় হয়েছেন লেনিন, স্টালিন, মাও ৎসে-তুং, আলেন্দে আর—কী আশ্চর্য—হেলেন অব ট্রয়। এর পরে হয়তো ক্লিওপেট্রা, মেসালিনা, জোন অব আর্ক, রোজা লুকসেমবুর্গ। লোকসংস্কৃতি যে অভিমুখে চলেছে সেটার কতকটা পলিটিকাল ও কতকটা কমার্শিয়াল। এই ভালগার জিনিসটা কি ফোক আর্ট! এর থেকে প্রেরণা পাব আমি!

শুধু লোকসংস্কৃতি কেন, কাব্য নাটক গল্প উপন্যাসও তো চলেছে একই পথে। তার কতক পলিটিকাল, কতক কমার্শিয়াল। পলিটিকালের চেয়ে কমার্শিয়ালেরই ভাগ বেশী। ওদিকে সমাজ-তন্ত্রের নামাবলী, এদিকে মোটা আয়ের পেশাদারি। এটাও একপ্রকার সমন্বয় বইকি। এর অঙ্গে একটু ধর্মের গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে এর মতো সফল পণ্য আর কী হতে পারে? পশ্চিমও এ কৌশল জানে না।

People's আর popular দুই এক নয়। যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা পপুলার, কিন্তু পীপলস নয়। এতে বাস্তব যতখানি আছে তার চেয়ে বেশী আছে কামনাপূরণ। নইলে লোকে কিনবে কেন? কিন্তু এইভাবে যেটা গড়ে উঠছে সেটা জনগণের সাহিত্যও নয়, বিদগ্ধজনের সাহিত্যও নয়। না জনমানসের প্রকাশ না বিদগ্ধ মানসের সৃষ্টি। বিদগ্ধদের সৃষ্টির ধারা দিন দিন শুকিয়ে গেলেও আমি বিস্মিত হব না, কিন্তু ব্যথিত হব, যদি তার পরিবর্তে জনগণের প্রকাশের ধারা দিন দিন পরিপুষ্ট না হয়। যদি বিদগ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্যও নিঃশেষ হয়ে যায়। যদি পীপলস বলতে বোঝায় পপুলার।

বিস্মিত হব না, বলেছি। কেন বিস্মিত হব না? কারণ আজকাল 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'সবুজ-পত্রে'র মতো মাসিকপত্র নেই, থাকলেও তাদের সে উৎকর্ষ নেই। আছে কয়েকখানি ত্রৈমাসিক, কিন্তু তাদের পাঠকসংখ্যা এত কম যে লেখার প্রচার হয় না। প্রচার না হলে লিখে মনও ভরে না, পেটও ভরে না। যাতে প্রচার হয় এমন সাপ্তাহিক আছে, কিন্তু তাদের উপরে হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণ, নয় গোষ্ঠীগত হস্তক্ষেপ। দৈনিকপত্রের সাময়িকীর বেলাও একই কথা। পত্রিকায় না ছাপিয়ে সরাসরি বই করে বার করার পথ অবশ্য খোলা, কিন্তু বিজ্ঞাপন না দিলে বই কাটে না, দিলেও তাতে জুয়াখেলার মতো প্রভূত ব্যয়।

যাক, আমি তো এখন সত্তর পার হয়েছি। অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে যাওয়াই আমার ভাবনা। আর-সব ভাবনা উত্তরসূরীদের।

এই কি নিয়তি

গৌরকিশোর ঘোষ

[কবি শঙ্খ ঘোষ, প্রিয়বরেষু]
তবে কি নিয়তি এই
কবিতার শবাধারে স্তূপীকৃত পুষ্পের গোপনে
সব শব্দ তুলে দেব ?

কতটা চতুর আমি কত বা কৌশলী
শব্দব্যবহারে
রেখে যাব তারই কিছু করুণ প্রমাণ ?

গদ্যের গাণ্ডীবে জ্যা
কখনোই যোজনা করব না ?
কখনোই
লক্ষ্যভেদী শব্দের সুতীক্ষ্ণ শর
ছুঁড়ব না ? যেহেতু তা
স্থির লক্ষ্যে ছুটে যায় প্রকাশ্যেই
এবং সুচতুর চক্রজাল ছিন্ন ক'রে
মৎস্যচক্ষু বেঁধে ?
যেহেতু টংকারে তার বজ্রের নির্ঘোষ,
ভেঙে দেয় মোহনিদ্রা ?

হায় ব্রতধারি,
বনবাসে আর কতদিন ?
মোহনিদ্রা আর কতদিন ?

শব্দের ধ্বনিমুগ্ধ
অর্জুন ! অর্জুন !
এই বৃহন্নলা-বৃহন্নলা
ছলনার খেলা
শব্দ নিয়ে এই মিথ্যে লুকোচুরি খেলা
কতদিন, আর কতদিন !

বীর্যবন্ত শব্দের ভ্রূণ
যা হত অরাতিঘ্ন শর সুতীক্ষ্ণ কঠোর

ক্রমাগত উপমার ব্যঞ্জনার
অচরিত্র অর্থহারা দিশাহারা পরিক্রমা শেষে
তবে কি পড়বে খসে
তূণেরই অতলস্পর্শ বন্ধ্যা অন্ধকারে?
কোনোদিনই দেখাবে না মুখ?
টংকার দেবে না কার্মুক?

অবিরাম নিষ্ফল ব্যায়ামে
শব্দ যদি ওজন হারায়
হৃত-অর্থ হয় ক্রীতদাস হয়
শব্দের ঠোকায় বিন্দুমাত্র স্ফুলিঙ্গও না
ওঠে যদি
শূন্যগর্ভ তবে সেই শব্দের আধারে
সেই শবাধারে
তুলে কি হবে না দিতে কবিতারও শব?

এই কি নিয়তি?

হায় ব্রতধারি, হায়!

দূরবর্তী তুমি

কৃষ্ণ ধর

তোমার কাছে আমি পেঁছুতে পারছি না
তুমি প্রকৃতই দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছো রোজ
তোমার কাছে যেতে হলে
আমাকে এখন সকালে ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হয়
যেতে হবে অনেক বিরুদ্ধ পথ
ডিঙোতে হয় পাথুরে ডাঙা, কাঁটাবন
সাঁতরাতে হতে পারে খর নদীজল
আমার সাধ্য কি তোমার কাছে পেঁছুই?
তুমি প্রকৃতই দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছো রোজ

তুমি দিব্যি ওইখানে বসে আছো
আলপিনের ডগায় যেন বা ধরে আছো ঘূর্ণ্যমান পরমাণু
আর আমি সেই সূক্ষ্মতার দিকে নজর রাখতে রাখতে
দুচোখে অন্ধকার দেখছি।

তোমাকে পাবার জন্য একদিন সব কিছু
তছনছ করে দিতে পারতুম
আজ মনে হয় তোমার কাছে পেঁছুতে গেলে
আমি হাঁপিয়ে উঠব

এই জলজঙ্গল, কাঁটাবন, পাথুরে জমি
তোমার হাতে ধরা আলপিনের ডগায় ঘূর্ণ্যমান পরমাণু
আমাকে সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে
মাধ্যাকর্ষণের বাইরে, এই কেন্দ্র থেকে দূরে
অন্য কোনো সৌরলোকের দিকে হয়তো
এক অবিশ্বাস্য অপ্রতিরোধ্য গতিতে

সেখানে অবিকল অন্য এক আমির মুখোমুখি হতে,

তুমি ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছো রোজ।

লগ্ন দ্রুত চলে যায়

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

লগ্ন দ্রুত চলে যায়। এলানো গভীর কেশপাশে
মঞ্জরিত স্মৃতিগুচ্ছ, মুখে গাঢ় নীলিমার ব্রত,
সম্পন্ন শরীর তার তরঙ্গের নিপুণ বিন্যাসে
দ্যুতিময় স্বচ্ছ কণা আবহে ছড়ায় ক্রমাগত।

ভোরের নদীর মতো শুয়ে আছে একা, বিবসনা,
কোমল কিরণ মাখা অঙ্গে অঙ্গে, অথচ ভিতরে
রাত্রির রহস্য ভরা উদ্ভিন্ন ছায়ার আনাগোনা,
যতটুকু দেখা যায় তার বেশি থাকে অগোচরে।

তবু মূঢ় নীলকণ্ঠ বারংবার ডুব দিয়ে খোঁজে
গোপন দৃশ্যের ভাষা, ব্যর্থ ফিরে আসে তরুডালে,
শিকড়ের ষড়যন্ত্রে পুনরায় মাটির সহজে
যেতে চায়—প্রতিহত স্বচ্ছতার কঠিন আড়ালে।

সেখানে নিক্কণ নেই, নেই গন্ধ, নেই প্রসাধন,
নেই কোনও স্পর্শ, বর্ণ, রচেছে যে বিমূর্ত কুহক
নিজস্ব অতল দিয়ে, শুধু অবিরল উন্মীলন,
বিবসনা সেই নারী অমরার অমোঘ স্মারক।

স্থির হও, নীলকণ্ঠ, তুমি যার সম্মোহে আপ্লুত
যদি তাকে পেতে চাও ধ্বংস করো নিজেকে দারুণ,
মিশে যাও নিরাধারে অনিলে আকাশে, লগ্ন দ্রুত
চলে যায়, জ্বালো তীব্র আহুতির বিদগ্ধ আগুন।

দুঃখ

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

নৌকা ছিল, অনেক বড়ো নৌকা ছিল,
ছিল না ঘাট, না— ছিল না সিঁড়ি—
বাগান ছিল, ঘরও ছিল এবং পোষা বেড়াল,
ঠোঁটের মধ্যে ভিজেমাটির কথা বলার আড়াল,
কমলালেবুর কোয়ার মত হৃদয় ছিল।

অথচ তখন চতুর্দিকে ছড়ানো হিমবাহ,
কেটলি থেকে চলকেছিল দারুণ নিরুৎসাহ।
কথা ছিল, বলার মতন কথাও ছিল।

এখন আর কিছুরই জন্যে করি না পীড়াপীড়ি।

বিভাবরী

দিনেশচন্দ্র রায়

রাত বারোটাতে লাইটিংএর কাজ শেষ হল। ডেকোরেশনের আর যেটুকু বাকি আছে সেটা শেষ করতে বড় জোর আর দু ঘণ্টা লাগবে। কলেজের গেট থেকে পুজোমণ্ডপ পর্যন্ত সমস্ত আলো জ্বলে উঠল। দুপুররাতে আলোতে আলোময় ক্যাম্পাসে ত্রিশটি ছেলে চীৎকার করে উঠল, —থ্রি চিয়ার্স ফর লুধিয়ানা সরকার। লুধিয়ানা সরকার একটু মোটাসোটা ছেলে। পরনে একটা খাকি প্যান্ট আর ফুলহাতা মোটা হলদে সোয়েটার। খুব বড় একটা মই বেয়ে নামতে নামতে লুধিয়ানা সরকার একটু হাসল। মই বেয়ে নামবার সময় লুধিয়ানার মাজা থেকে মুখের অংশ ছায়াতে পড়ল। মাঝামাঝি এসে সরকার বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লাফ দিল। লাফ দিয়ে মাটিতে পড়া মাত্র লুধিয়ানা সরকার একরাশ আলোর মধ্যে একেবারে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল। সরকারের মুখটা ফোলাফোলা, চোখ দুটোও তেমনি। পশ্চাৎদেশ একটু যেন বেরিয়ে এসেছে, ঠোঁটদুটো মোটা, নাক এবং চিবুকের গড়ন খুব সুন্দর। সরকারকে দেখলেই মনে হয় ছেলেটা আদরে মানুষ এবং খাওয়া-দাওয়া করতে ভালোবাসে। সরকার ঠিক তোতলা না হলেও কথা বলার সময় কেটে কেটে কথা বলে। স্বাভাবিকভাবে একটানা কথা বিনা বাধাতে বলতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সরকার খুব নীচু গলাতে কথা বলে, কোন সময়েই চেঁচাতে পারে না। আস্তে-আস্তে কেটে-কেটে কথা বলার জন্যই বোধ হয় মনে হয়, সরকারের কথাগুলো গলার মধ্যে আটকে থাকে এবং উচ্চারণের স্পষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। মই থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে সরকার সামান্য সময়ের জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে সরকার উঠে দাঁড়াল। তার দুটো হাতই পিছনে। পিছনে হাতদুটো রাখবার জন্যই সরকারের বুকের সিনা একটু চিতিয়ে উঠল, মাথাটা একটু পেছনের দিকে হেলে গেল। মনে হল, ট্রাপিজের খেলা দেখিয়ে সরকার এরিনাতে এইমাত্র নেমে অপর্যাপ্ত আলোর মধ্যে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাচ্ছে। সরকার এই ভঙ্গিতে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। উপস্থিত কেউই বুঝতে পারল না ঐভাবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে কেন। কিন্তু সরকারের দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে প্রদর্শনীর আকর্ষণ ছিল। সবাই আলোময় ভূমিতে দাঁড়ানো সরকারের দিকে তাকিয়ে রইল। সরকার মুখ দিয়ে একটা বু-বু-বু-বু শব্দ করল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। সোজা হয়ে দাঁড়াবার পরও সেই বু-বু-বু-বু শব্দ থামল না। সবাই জানে যে ইন্টার-মিডিয়েট সায়েন্সে সরকার তিনবার ফেল করেছে। চা-বাগানের মালিকের আট নম্বর ছেলে। ইলেকট্রিক আর ডেকোরেশনের কাজ খুব ভাল জানে। সরকার একটু পাগলাটে আছে, সময়ে অসময়ে নানারকম মুখভঙ্গি করে, মুখ দিয়ে বিচিত্র সব শব্দ করে, মাঝে মাঝেই মাথাটা পুরোপুরি ন্যাড়া করে ফেলে। আলোর এলাকা থেকে অনেকদূর অন্ধকারে সরকার চলে গেল, সেখানে দু-চোখের ওপর কপালে ডানহাতের তালু দিয়ে আড়াল রচনা করে আলোর এফেক্টটা দেখতে লাগল। সরকার বু-বু-বু-বু শব্দটার পরিবর্তন করে ক্রমাগত দ্রুত লয়ে বলতে লাগল—ডাওকি—ডাওকি—ডাক, ডাওকি—ডাওকি-ডাক, ডাক-ডাক—ডাউকি, ডাউকি। কপাল থেকে হাত নামিয়ে সরকার আবার আলোর এলাকাতে ফিরে এল, তারপর ডাক—ডাক—ডাক বলতে-বলতে আবার মই বেয়ে উঠল। তিনটে বাল্ব খুলে নিল। আলোর মোট যোগফলের মধ্যে পাতলা ছায়া নামল। কিন্তু সরকার নিজের পরিকল্পনামতো বালবের জায়গাগুলো রদবদল করার পরে আলোকপাত

আরও তীব্র এবং সমপরিমাণ হল। এবার মনে হল সরকার তৃপ্তি পেয়েছে। ওপরে, নীচে, ডানপাশে এবং বাঁ পাশে অনেকক্ষণ ধরে দেখবার পর তার মুখে একটা হাসি ফুটল। ততক্ষণে সে চুপ করে গেছে। এবার সে আস্তে আস্তে বলল—টুব পালো টয়েছে। হাবু পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে জোরে হেসে চিৎকার করে বলল, —শালা ঢং না করে স্পষ্ট করে বল্, খুব ভালো হয়েছে। সরকার হাবুর দিকে তাকাল, কিন্তু কোন কথা বলল না। দেবু, বেণু, দীপু এবং অন্যান্য ছেলেরা মিলে ততক্ষণে আসল পুজোর জায়গা এবং আলোকিত অঞ্চল থেকে অনেক দূরে বড় বড় শালকাঠের গুঁড়ি জ্বালাতে ব্যস্ত। তখনও আগুন ধরেনি, ধোঁয়াতে আশপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সবার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। রাশি-রাশি ধোঁয়া শীতের মাঠের শিশির আর কুয়াশার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আলোর দিকে আসতে লাগল। লুধিয়ানা সরকার সেই সাদাটে ধোঁয়ার কুন্ডলীর দিকে তাকিয়ে রইল। সরকার পরিষ্কার দেখল, ধুনি জ্বালাবার জায়গা থেকে প্রথমে ধোঁয়া আকাশমুখী হচ্ছে, তারপর আস্তে-আস্তে সমস্ত বিচ্ছিন্ন ধোঁয়ার রেখাগুলো একটা সরলরেখাতে সংহত হয়ে পূর্বদিকে মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে এবং গড়াতে-গড়াতে শ্লথগতিতে আলোকিত পুজোমন্ডপের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই ধোঁয়ার কুন্ডলীর আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে সরকারের মনে কোন সন্দেহ রইল না। একবারমাত্র সরকার ভাবল যে ধোঁয়ার কুন্ডলীটা মন্ডপে প্রবেশ করবার পর তীব্র আলোটা কুয়াশাতে আচ্ছন্ন হবে। সাধারণত নাটকে কোন সাবকনশাস রোলে নায়িকা যখন একা-একা মঞ্চে কিছু খুঁজে বেড়ায় তখন এই পরিস্থিতিটা খুব এফেক্টিভ হবে। কিন্তু পরক্ষণেই যদি দিনের আলোতে ফিরে আসতে হয় তবে ভীষণ মুশকিল হবে। কারণ সেক্ষেত্রে ইচ্ছামত ধোঁয়া হঠিয়ে দেওয়া যাবে না। এই চিন্তাটা সরকারের মন থেকে সরে যেতেই সে কুন্ডলীকৃত ধোঁয়াকে বিরাট অজগর ভাবল। মস্তিষ্কের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য প্রচন্ড তাড়না সে অনুভব করল। সরকার ভাবল, এবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করি অথবা ফেল করি, আমি আর পড়ব না। আমি বিয়ে করব। বিয়ে না করে আমি মরে যাচ্ছি। ঠিক এই সময়ে এ অজগরটা আমাকে গিলে ফেলুক, এটা আমি চাই না। মুখ দিয়ে সে হাবুডাবু, ডাবুহাবু হাবুডাবু, ডাবু—অবিরত নামতা পড়ার সুরে বলে যেতে লাগল। এমনি কথা বলার সময় তার ডান পায়ের হাঁটুটা সুরের সঙ্গে তাল রেখে নাচাতে লাগল। সরকারের তাড়িত ভাবটা আরও তীব্র হল। ক্ষিপ্তগতিতে সরকার ঐ আলোময় বৃত্তের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। ছুটোছুটির ধরনটার সঙ্গে তার বর্তমান কাজের মিল থাকায় মনে হতে পারে সে ইলেকট্রিকের কোন ব্যাপার ঠিকঠাক করছে। ছুটোছুটিতে সে হাঁফিয়ে গেল। তার অবিরত 'হাবুডাবু ডাবুহাবু' আবৃত্তিটা তখন আর পুরোপুরি শোনা যাচ্ছে না। শুধু 'হাডুডুডুডুহাডুহা' ধরনের একটা গোঙানির মতো বিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ সরকার মাঝামাঝি একটা জায়গাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই বিচিত্র দ্রুত লয়ের হাডুডুহা থেমে গেল। সরকার হঠাৎ খুব শান্তভাবে মেন সুইচটা অফ করে দিল। অতগুলো নিওন একসঙ্গে নিভে গেল। তীব্র রাতকে-দিন-করা আলোর বন্যা একপলকে অদৃশ্য হল। সেই অন্ধকার মন্ডপের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে সরকার দেখল মাঠের পূবপারে দীপুরা আগুন জ্বালাতে পেরেছে। মোটা মোটা শালকাঠের আগুন লেলিহান। একটা বিচিত্র পবিত্রতাবোধ সরকারের মনে জাগল। একেবারে চুপচাপ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দূরের সেই লেলিহান আগুন এবং তার চারপাশে ছায়ার মতো যুবকদের দেখতে লাগল। শীতের মাঝরাতে আগুনের চারপাশের উষ্ণতার প্রত্যাশা সরকারকে খুশি করে তুলল। দীর্ঘবিলম্বিত লয়ে একটা রাতের পাখির মতো সে ডেকে উঠল,—হা—টি—ম—টি—ম—টিম।

আগুনের চারপাশে চল্লিশজন যুবক। প্রত্যেকের হাতে ধোঁয়া-ওঠা চায়ের গ্লাশ। একটা

ছোট্ট ঝুড়িভর্তি টাটকা গরম নিমকি। আগুনের চারপাশে দারুণ হাসির শব্দ, কয়েক লাইন গানের কলি। চল্লিশজন যুবক খোলা আকাশের নীচে। এই বিরাট আগুনের কুন্ডের পশ্চিম কোণ থেকে দীপুই প্রথমে বলল,—বেণু, তুই আজ বিকেলে এস-এফ অফিস থেকে বেরুবার সময় বলেছিলি, লুধিয়ানা সরকারের নামরহস্য খুলে বলবি—এখন বল।

—ব্যাপারটা হাবু ভালোভাবে জানে, বেণু পাশ কাটাতে চাইল।

—মাইরি হাবু, তোর শালা পায়ে পড়ছি, তুই ঘটনাটা খুলে বল—দেবুও প্রায় হাসতে হাসতে পাশে আর-একটা ছেলের গায়ে গড়িয়ে পড়ল, পাশের ছেলেটি তেমনি আবার গা এলিয়ে দিল তার পাশের ছেলেটির গায়ে। এমনি ধাক্কাধাক্কিতে দেবুদের লাইনে অনেকগুলো ছেলে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। হাতের গেলাসের চা ছলকে এর ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লো।

বেণু বললো—তোরা একেবারে উজবুক নাকি? গল্পটা শোনার আগেই হি হি করছিস।

—হাবু, গল্পটা আমার দারুণ উইক পয়েন্ট। তুমি যদি মুখ খোল তবে তোমাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেব, লুধিয়ানা সরকারের ফিসফিস গলাটাও ভীষণ চড়া মনে হল।

দেবু বলল—সরকার ভাই, আজ আর রাগ করিস না। এমনি আগুনজ্বালা রাত আর কোনদিন আসবে না। আজ গল্পটা বলতে দে। এরপর আমরা কে কোথায় চলে যাব।

কে কোথায় চলে যাব—এই লাইনটা কেমন একটা নাইলনের সরু সুতোর মতো চল্লিশজন সদ্য-যুবকের গলাগুলোকে একটা সূক্ষ্ম ফাঁসে আটকে দিল। সেই দিগন্তব্যাপী রাতের মাঝখানে ত্রিফলা বর্শার মতো আগুনটার দিকে আশীটি তীক্ষ্ম চোখ পলক না ফেলে তাকিয়ে রইলো।

—দুপুর রাতে বাড়ি ফেরবার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। কিছু দেখতে পাইনি। বড় আমগাছটা থেকে একটা লতা বিকেলের ঝড়ে ঝুলে পড়েছিল। এই রাত দুপুরে লতাটা কপালে লাগতেই সারা গা শিরশির করে উঠল। মনে হল সেই বালক বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যৌবনে বাড়ি ফিরছি। লতাটা কোন কঙ্কালের আঙুল।

—কি রে, তোরা সব চুপ করে গেলি কেন?

—খুব বৃষ্টির শব্দের মধ্য দিয়ে বেণুর গলার আওয়াজটা অলৌকিক মাছের মতো সাঁতার কেটে এল। ছেলেগুলো সব একসঙ্গে কলরব করে উঠল।

—হাবু, গল্প বল্।

—লুধিয়ানা, আজ ভাই পারমিশান দে।

—সরকারের গল্পটা শুনে তোমাদের খুব প্রাণ খুলে হাসবার কোন কারণ নেই। আমরা সবাই এমনি বোকা। আর আমাদের প্রত্যেকেরই এমনি এক-একটা বোকামির কাহিনী আছে। সেই কঙ্কালগুলো আমরা সকলেই লুকিয়ে রাখি, হাবু থামল। হাবুর গল্প বলার ধরনের মধ্যে এমন একটা মুন্সিয়ানা আছে যে সবাই হাঁ করে তার কথা শুনছিল। হাবু থামতেই প্রত্যেক নিজের নিজের গেলাসে তেড়ে-ফুঁড়ে চুমুক দিতে লাগল। ভঙ্গি দেখে মনে হল হাবুর গল্পটা সবাই খুব মন দিয়ে শুনতে চায়। চা পান করার জন্য যেটুকু সময় ব্যয় করতে হবে এবং মন বিক্ষিপ্ত করতে হবে গল্প শোনার সময় সেটুকুও কেউ করতে রাজী নয়। সুতরাং হাবুর এই থামা এবং নতুন করে কথা আরম্ভ করার আগেই যে যার চা শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটা হাপুস-হুপুস আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। সরকার একটা সিগারেট ধরাল। সে এই চ্যাংড়াগুলোর ছেলেমানুষির ব্যাপারে একটা উদাসীনভাব মুখে ফুটিয়ে তুলল।

গত বছর জানুয়ারির প্রথমে দারুণ শীত পড়েছিল। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে সাতই জানুয়ারি থেকে পনেরো-ষোলো জানুয়ারি পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড হিমেল শীত পড়েছিল।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, দশই জানুয়ারি সকালে আমাদের বাড়ির সামনে খোলা জায়গাতে চাদর মুড়ি দিয়ে রোদ উপভোগ করছিলাম। ঝকঝকে দিন হলেও গায়ে রোদ্দুরের তাপ লাগছিল না। চাপা একটা হি-হি-করা বাতাসে হাড়-মজ্জা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। সত্যি, সেই দিনটা ভীষণ ঠান্ডা ছিল। আমি বসে-বসে কমার্শিয়াল জিয়োগ্রাফিতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি সরকার ওর ছোটকাকার বিরাট কালো গ্রেটকোট আর মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ পরে হঠাৎ হাজির। হাতে একখানা মোটা, হ্যাঁ—বেশ মোটা বই, খাকি রঙের কাগজ দিয়ে মলাট দেওয়া। বারান্দাতে অনেকগুলো মোড়া ছিল। তাছাড়া যারা আমাদের বাড়িতে গিয়েছে তারা জানে যে আমার ঘরখানা একেবারে বাইরের দিকে এবং ভেতর-বাড়ির সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। সেই নিরিবিলি তাপহীন রোদে ভাসা বারান্দাতে খাকি কাগজের মলাট দেওয়া বইখানা কোলের ওপরে রেখে সরকার চুপচাপ মোড়ার ওপর বসে পড়ল। সাধারণত সরকার এলে খুব হৈচৈ করে। ভেতর-বাড়িতে গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, চা-টা খায়। কিন্তু সেদিন সেই মোটা কালো ওভার-কোট আর বাঁদরটুপি মাথায় স্ট্যাচুর মতো মোড়াতে বসে রইল। কোলের ওপর সেই মোটা বইখানার ওপর হাত দুখানা আলতোভাবে রাখা আছে। সেদিন সরকারকে ধীরস্থির বিদেশী কোন পাদ্রীর মতো লাগছিল। হঠাৎ সরকারকে অতটা গম্ভীর এবং সোলেম দেখে আমার ভীষণ হাসি পেল। আমি প্রথমে খুক-খুক করে এবং পরে বেশ শব্দ করে হাসতে লাগলাম। কিন্তু তাতে সরকারের গাম্ভীর্যের প্রাচীরে একটুও টোল খাওয়াতে পারল না। সরকার শুধুমাত্র তার গাম্ভীর্যই মেনটেন করছিল না, একেবারে একটা কথা পর্যন্ত তখনও বলেনি। একসময়ে আমার হাসি থেমে গেল। ক্রমে ক্রমে আমি নিজেও বেশ সিরিয়াস হয়ে গেলাম। আমি পরিষ্কার বুঝলাম, বাবুয়া সরকারের জীবনে কোন গুরুতর সমস্যা এসেছে। তোমরা অনেকেই জান না যে সরকারের ডাকনাম বাবুয়া। সুতরাং দ্বিরুক্তি না করে বাড়ির ভেতরে গেলাম। সরকার আর আমার নিজের জন্য দু কাপ গরম-গরম চা নিজে হাতে বয়ে আনলাম।

সরকার এতক্ষণ পরে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে নিজে একটা সিগারেট ধরাল এবং আমাকে একটা দিল। সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিয়ে বেশ বড় বড় চুমুকে সরকার চা-পান শুরু করলো। আমিও প্রতি মুহূর্তে ভাবতে লাগলাম, এইবার চুমুকটা শেষ হলেই সরকার একটা কাহিনী শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, হুস হুস করে সরকার চা শেষ করবার পরও অনেকক্ষণ সিগারেট টানল, কিন্তু মুখ খুলল না। চুপ করে থেকে সেদিন একটা টেনশন করে ছাড়ল। এইরকম একটা চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে সরকারের নীচের ঠোঁটটা নড়ছে দেখলাম। ও কি কথা বলতে চাইছে? না, ওটা একটা নার্ভাস টেনশন? এটা বুঝতে বুঝতেই আমার অনেক সময় কেটে গেল, যদিও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম যে সরকার কথা বলার চেষ্টা করছে। কথা শুরু করার আগে সরকার তোতলাতে লাগল। আমি ওকে স্টেডি হবার জন্য সময় দিলাম।

—আমাদের পাশের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। সার্কেল ইনসপেকটার। কিন্তু ওর মেয়ে ছন্দা একেবারে মারমার-কাটকাট। ছন্দাকে দেখে আমার তিনরাত্তির ঘুম নেই। খিদে চলে গেছে। ছন্দা আমাকে একেবারে ধসিয়ে দিয়েছে। খুব থেমে থেমে সরকার কথাগুলো বলল। সরকারের কথা বলার মধ্যে তোতলানো এড়াবার চেষ্টা বুঝতে পারলাম। কথাগুলো বলে সরকার ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাল। সত্যি কথা বলতে কি, প্রচন্ড হাসি পাচ্ছিল আমার, কিন্তু তার করুণ অবস্থা দেখে হাসি চেপে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সরকার আমার হাসি চাপবার ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারল। সে বলল, আমার এই ক্রাইসিসের সময়ে তোর হাসি পাচ্ছে? হাসি পেলে হেসে ফেল। আমি সত্যি রিডিকুলাস। হঠাৎ সরকারের কথাবার্তা একটা সংলাপের

পর্যায়ে পেঁৗছুল। এবার আমার সংকট শুরু হল। কারণ সরকারের এই রিমোটভাব এবং তার সঙ্গে ধারালো কথাবার্তাতে আমি কিছুটা বোকা বনে গেলাম। সামলে উঠবার জন্য বললাম, —ছন্দাকে দেখে তোর মাথা ঘুরে গেছে। ঠিক আছে, আবার তোর মাথা ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় যেন পড়েছি যে এ-সব প্রেমের বেগ নব্বই দিনের বেশি থাকে না।

—তোর কথা ঠিক নয়। কারণ সত্যি বলছি, তুই হাসিস না, ছন্দাকে দেখবার পর থেকে আমার মধ্যে মৃত্যুচিন্তা প্রবল হয়েছে।

—তার মানে তুই লঙ্কার মতো জুতোর কালি খেয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবছিস নাকি?

—লঙ্কার কেসটা আমরা ঠিকমত বুঝিনি বোধহয় হাবু। কোন প্রেমঘটিত আত্মহত্যাকে তুই এত হাল্কাভাবে দেখিস না।

—সরকার, তুই বোকার মতো কথা বলবি না। কোন একটা মেয়ের জন্য কোন একটা ছেলের আত্মহত্যার কোন হেতু নেই।

—হাবু, জুতোর কালিতে আমার খুব একটা আকর্ষণ নেই। কিন্তু ইলেকট্রিক কানেকশানে দু আঙুল লাগিয়ে আমার জ্বলে যেতে কোন বাধা নেই।

—সরকারের ভাবসাব দেখে এবার সত্যি আমার ভয় হল। আমি সরকারকে তেড়ে-ফুঁড়ে বোঝাবার জন্য উঠেপড়ে লাগলাম। কিন্তু সরকার আমাকে থামিয়ে দিল। ইসারাতে আমাকে চুপ করতে বলল। তারপর আবার চুপ করে গেল। এবার ভীষণ রাগ হল। যত ছিল ন্যাড়াবুনো সব হল কীর্তনীয়া। সরকারের মতো প্রেমে পড়ে আত্মহত্যার ভয় দেখাবে এটা সহ্য করা মুশকিল।

হাবু এবার নিশ্বাস নেবার জন্য আরও একেবারে চুপ করল। আগুনের চারপাশের অনেকগুলো ছেলে হো হো করে হেসে উঠল। দেবু আর বেণু ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে সরকারকে কিল মারতে শুরু করল। হাসির একটা হুল্লোড়ে আগুনটা যেন উসকে উঠল। জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফটফট করে কাঠ ফাটার শব্দ হল।

হাবু এবার চেঁচিয়ে বলল,—তোমরা সব চুপ করো। গল্পটার আসল অংশটা এখনও বলা হয়নি। এত হল্লা করলে বলা যাবে না। সবাই চুপচাপ গল্প শোনো। সরকার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তার কোলের ওপর সেই খাকি কাগজের মলাট দেওয়া মোটা বইটা তুলে আমার হাতে দিল। সরকার যে স্টাইলে বইখানা আমার হাতে তুলে দিল তাতে মনে হতে পারে যে কোন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সভাতে কোন কৃতিত্বের জন্য সে যেন বইখানা আমাকে প্রাইজ দিল। যাই হোক, বইখানা হাতে নিয়েই আমার চোখে পড়লো এক টুকরো কাগজ দিয়ে একটা বিশেষ পৃষ্ঠা চিহ্নিত করা হয়েছে। অনেকক্ষণ থেকেই বইটা সম্পর্কে কৌতূহল ছিল। তাই বইখানা হাতে পেতেই সেই চিহ্ন-দেওয়া অংশই খুলে ফেললাম। বইখানা খুলে আমি তাজ্জব। এইরকম একখানা বইএর সঙ্গে সরকারকে হঠাৎ আমি মেলাতে পারলাম না। সমস্ত ব্যাপারটা হজম করতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। একটু সামলে নিয়ে ধীরভাবে চেয়ে দেখি গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপনের একটা ঘোষণা। ঘোষণাটা আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে : এই আশ্চর্য রুমাল দ্বারা আপনি যাহাকেই স্পর্শ করিবেন তিনি আপনার প্রতি যতই বিরূপ অথবা বিরূপা হোন না কেন, একমুহূর্তে আপনার পদতলে লুটাইয়া পড়িবেন। পাঁচটাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলেই এই আশ্চর্য রুমাল এবং তার প্রয়োগবিধি ডাকযোগে পাঠানো হইবে। এই আশ্চর্য রুমালের শক্তি ব্যর্থ প্রমাণিত হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে। অবিলম্বে পোস্ট বক্স ৯৩, লুধিয়ানা এই ঠিকানাতে টাকা পাঠান।

—বিজ্ঞাপনটা দু-তিনবার পড়তে পড়তেই আমি বুঝতে পারলাম যে সরকারের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম যে ব্যাপারটাতে সরকারের মানসিক আকর্ষণ এত

তীব্র এবং গভীর যে কোন যুক্তিই ও মানবে না।

সরকার বোধহয় আমার মনের ভাবটা অনুমান করল। একটু হেসে বলল,—তুই ভাবছিস হাবু, যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোর যা ইচ্ছে তুই ভাবতে পারিস, কিন্তু তুই দেখবি এই রুমাল এসে পড়লে শুধু একবার কোনরকমে টাচ করতে পারলেই ছন্দাকে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাব। দোহাই হাবু, কোন জ্ঞান দিবি না। শুধু চুপচাপ আমার সঙ্গে থাকবি।

ঠিক চারদিন পরে লুধিয়ানা থেকে একটা আশ্চর্য সুন্দর প্যাকেটে সেই আশ্চর্য রুমাল আর তার প্রয়োগবিধি এসে গেল। সরকার ভি পি ছাড়িয়ে নিল কিন্তু প্যাকেটটা খুলল না। সন্ধ্যাবেলাতে সেই না-খোলা প্যাকেটটা নিয়ে আমার ঘরে এল। ইতিমধ্যে আমি স্থির করেছিলাম যে আশ্চর্য রুমালের ব্যাপারে আমি সরকারকে সঙ্গ দেব কিন্তু কোন মতামত দেব না। পরতের পর পরত কাগজ ছাড়াতে ছাড়াতে একসময় একটা ছোট্ট প্যাকেট পাওয়া গেল। সেই ছোট্ট প্যাকেটটাও প্রথমে মোটা কাপড় দিয়ে মোড়া, তারপর আবার আর-একটা মোড়ক। অবশেষে ব্যান্ডেজের কাপড়ের চারদিক সেলাই করা লেডিস রুমালের একটা অধম সংস্করণ পাওয়া গেল। সঙ্গে টাইপ করা একটা ছোট্ট কাগজ। কাগজে এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমিক নম্বর দিয়ে পর পর দশটি নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্দেশগুলো খুব পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। ভুল বুঝবার কোন অবকাশ নেই। মোটামুটি একটা সাধারণ দুই লাইনের বাক্যকে দশটি বাক্যাংশে ভাগ করা হয়েছে। নির্দেশনামাতে রাজকীয় হুকুমনামার গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। যেদিন প্রার্থিত পুরুষ বা রমণীর অঙ্গে এই আশ্চর্য রুমাল স্পর্শ করানো হবে সেদিন যিনি স্পর্শ করাবেন তিনি অবশ্যই উপবাসে থাকবেন। ঊষাকালে কোন নদীতে স্নান করে অভুক্ত অবস্থাতে রুমাল হাতে নিয়ে তাঁকে থাকতে হবে। নদীর বিকল্পে অন্য কোন ব্যবস্থাতে স্নান করলে চলবে না। তারপর সুযোগ-সুবিধামত রুমালটা কোন প্রকারে প্রার্থিত পুরুষ অথবা নারীর দেহে ছুঁইয়ে দিতে হবে। ছোঁয়ানোর মুহূর্তের মধ্যেই সেই বিরূপ অথবা বিরূপা পুরুষ কিংবা নারী পদতলে লুটিয়ে পড়বে।

আমরা দুজন দশটি নির্দেশনামা বারবার পড়লাম। এতবার পড়ার জন্যই বোধহয় সব কথাগুলোর অর্থ গোলমেলে লাগতে লাগল। পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশগুলোর আমি যে ব্যাখ্যা করি সরকার সেটা মানতে চায় না। ফলে নির্দেশগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে দুজনের মধ্যে একটা মাঝারি রকমের ঝগড়া হল। ঝগড়াটা হয়ে ভালোই হল; কারণ আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে নির্দেশনামার প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। সুতরাং এরপর আমরা প্রয়োগের দিকটা নিয়ে চিন্তা শুরু করলাম। সরকারের বাড়ি নদীর পারে, সুতরাং তার পক্ষে সূর্য ওঠবার আগে নদীতে ডুব দিয়ে আসা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমরা জান সরকারের একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। শীতকালে ও কোনদিন স্নান করবে না, এমন কি দাঁতটাও রোজ মাজতে চায় না। কোন মেয়ের ভালোবাসা পেতে রোজ স্নান করা এবং দাঁত মাজা যে একটা প্রধান কর্তব্য, এটা সরকার বুঝতে চায় না। সুতরাং যথারীতি সরকার ঊষাকালে নদীতে সে বছরের প্রচণ্ড শীতে ডুব দিয়ে স্নান করার ব্যাপারে গাঁইগুঁই শুরু করল। আমি বললাম, রুমালের আশ্চর্য ফলাফল কতগুলি অবশ্যকরণীয় আচার পালনের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং তুমি যদি ভোরবেলা এই শীতকালে ডুব দিয়ে চান না কর তবে রুমাল দিয়ে গলাতে ফাঁস দিলেও মরবার আগে পর্যন্ত ছন্দা তোমার দিকে তাকাবে না। আমার প্রস্তাবে সরকার এবার খুব ঘাবড়ে গেল। সুতরাং অনেক কষ্টে নির্ধারিত দিনের অতি ভোরে সে নদীতে ড়ব দিতে এবং দাঁত পরিষ্কার করে মাজতে রাজি হল। কথা থাকল একটু বেলা হলেই আমি ওদের বাড়ি যাব। ততক্ষণে সরকার স্নানটান সেরে জামাকাপড় পরে একেবারে ফিটফাট হয়ে থাকবে। শনি এবং মঙ্গলবারের মধ্যে মঙ্গলবারটাই

আমরা নির্ধারিত দিন হিসেবে স্থির করলাম। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠল, রুমালটা কোন্ সময়ে এবং কিভাবে ছন্দার শরীরে স্পর্শ করানো যাবে। আমি বললাম, বিকেলের দিকে ছন্দা যখন স্কুল থেকে ফিরবে তখন বড়পুলের মুখে সাইকেল নিয়ে দাঁড়াবি। ছন্দা অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যখনই বড় রাস্তাতে পড়বে তখনই সাঁ করে সাইকেল নিয়ে ছন্দার পাশ দিয়ে যাবার সময় বাঁ হাতে রুমাল দিয়ে ওর গায়ে ঠেকিয়ে দিবি। কিন্তু এমন যদি হয় যে ছন্দা মেয়েদের দলের মাঝখানে থাকে তবে বেশ জোরে সাইকেল চালিয়ে ছন্দার পেছনে এসে ব্রেক করা, মাটিতে পা লাগিয়ে ব্যালান্স রাখা, ওরই মধ্যে বাঁহাতে রুমাল স্পর্শ করানো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাওয়া।

—কিন্তু ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক। সরকারের গলাতে আশঙ্কা অনুভব করেছিলাম।

—প্রচণ্ড বিপদের ব্যাপার। একটু এদিক ওদিক হলে ধোলাই খেতে হবে। আমিও সরকারের সামনে ঝুঁকির দিকটা খুলে বলি। কিন্তু সরকার আমার পরিকল্পনাটা গ্রহণ করল না। ও বলল, —সকাল দশটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছন্দা যখন রাস্তাতে উঠবে তখন ও একা থাকবে। সুতরাং সেই সময়টাই সব দিক দিয়ে প্রশস্ত। সাঁ করে পাশ দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে রুমালটা একটু ছুঁইয়ে দেওয়া মাত্র। এবার আমি রেগে গেলাম। বললাম,—তোর মাতব্বরিটাই বেশি। ঐ সময়ে পুরো ডি সি অফিসের ভিড়টা রাস্তাতে থাকবে, তোকে রুমাল ছোঁয়াতে দেখলে, অতগুলো লোক প্রথমত সাক্ষী হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত ছন্দার বাবার কাছে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট হয়ে যাবে। ছন্দার বাবা কথায় কথায় থানা-পুলিশ করে। সরকার আমার গালাগালি ঘাড় গুঁজে চুপচাপ হজম করল, তারপর আস্তে আস্তে চোখ তুলে আমার ক্রুদ্ধ দুই চোখের দিকে তাকালো এবং করুণভাবে বলল,—হাবু, এত রিস্ক থাকা সত্ত্বেও পুরো রুমাল ছোঁয়ানোর ব্যাপারটা আমি সকালবেলাতেই করতে চাই।—কেন? আমি রাগে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর দেবার জন্য সরকার একটু সময় নিল, তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল,—আমি বিকেল পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারব না।

যাই হোক সেই মঙ্গলবার সকাল দশটাতে বড় রাস্তার মোড়ে প্রথমে সাইকেল নিয়ে সরকার এবং পেছনে সাইকেল নিয়ে আমি। সকালে অবগাহন স্নান করে এবং দাঁত পরিষ্কার করে ঘসা-মাজার পর ভালো জামাকাপড়ে সরকারকে বেশ ঝকঝকে লাগছিল। আমার অথবা সরকারের মুখে কোন কথা নেই। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে আমরা ছন্দাদের বাড়ির সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছি। আমার বুকের মধ্যে এত ঢিপঢিপ করছিল, চারপাশে কোনদিকে আমার কোন খেয়াল ছিল না। একদৃষ্টে সরকারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছন্দাদের বাড়ির সিঁড়ির দিকে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু এই অপেক্ষা করার সময়েই আত্মরক্ষার আর-একটা কৌশল আমার মাথায় খেলে গেল। ছন্দাকে দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেই সরকার প্রাণপণে যখন সাইকেল ছোটাবে তখন ইচ্ছে করেই আমি ওর পেছনে পড়ে যাব। তাতে ঘটনাটার পুরো প্রতিক্রিয়া আমি দেখতে পাব অথচ সরকারের সঙ্গে আমাকে কেউ জড়াতে পারবে না। ঠিক তাই হল। দশটা পনেরো মিনিটে ছন্দা একা একা বড় রাস্তা দিয়ে স্কুলের দিকে হাঁটা শুরু করল। অপলক নয়নে সরকার মিনিট পাঁচেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ছন্দা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। সরকার তার রু র‍্যালে সাইকেলে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। ও খুব ভালো সাইকেল চালায়। বাঁহাতে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ফাঁকে রুমাল ধরে শুধুমাত্র ডান হাতে সাইকেল চালিয়ে প্রায় উড়ে চলল। আমি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সরকারের পিছু ধাওয়া করলাম। সরকার নক্ষত্রবেগে ছন্দার গা ঘেঁষে প্রায় উড়ে উধাও হয়ে গেল। দূর থেকেই আমি দেখতে পেলাম যে ছন্দা কেমন ভয় পেয়ে জড়োসড়োভাবে দাঁড়িয়ে। ছন্দাকে ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড়। আমি ছন্দার কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলাম যে ছন্দার চুলের

ক্লিপে লুধিয়ানার সেই আশ্চর্য রুমালটা আটকে আছে। আমি এক লহমাতে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। সরকার রুমালটা ছন্দার গায়ে ছোঁয়াতে গিয়ে চুলের ক্লিপে আটকে গেছে। মনে হল ছন্দা বেশ স্মার্ট মেয়ে, কোনপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে রুমালটা চুল থেকে খুলে নিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে হাঁটতে লাগল।

হাবু এবার থামল। এবার তার চুপ করার ধরন দেখে মনে হল যে গল্পটা যেন শেষ হয়েছে। আগুনের চারপাশে প্রায় চল্লিশজন একেবারে চুপচাপ করে বসে আছে। সবাই আশা করছে হাবু আরও কিছু বলবে। দীপু এই নিস্তব্ধতা ভেঙে জিজ্ঞাসা করল,—তারপর?

তারপর মাসদুয়েক সরকারের কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। সুতরাং শেষটা যে যার মতন কল্পনা করে নাও। কিন্তু ঘটনাটা কিভাবে যেন জানাজানি হয়ে যায়, আর সেই থেকে বন্ধুদের মহলে লুধিয়ানা সরকার নামে বাবুয়া খ্যাত হয়ে যায়।

আগুনের চারপাশে এবার আর কোন নতুন চিৎকার উঠল না। সবাই যেন কেমন চুপ মেরে গেল। সরকার সেই আগের মতোই চোখ বুজে সিগারেট টানছে। দীপু, বেণু আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। দেবু অন্য কয়েকটি ছেলের সঙ্গে অনুচ্চকণ্ঠে কী যেন গল্প করছে। ভোর হয়ে আসছে। অন্যান্য ছেলেরা খুব তাড়াতাড়ি স্নান-টান সেরে পুজোমণ্ডপে ফিরে আসবার জন্য যে যার বাড়িতে চলে গেল। শুধুমাত্র দেবু, বেণু আর দীপু কলেজে রয়ে গেল। ওরা তিনজন আরও একবার চা খেল। বেণু চা খেয়ে বলল,—চল্, নদীতে চল্। সারারাত্রি জাগার পর চল্ নদীতে চল্ কথাটা কেমন একটা খোলামেলা কুয়াশা, ঠাণ্ডা বাতাস, নিস্তরঙ্গ জলের আর ভেজা বালির চিত্রকল্প রচনা করল। রাত জাগার পর যে স্থবিরতাতে ওরা তিনজন জবুথবু হয়ে বসেছিল এক মুহূর্তে সে ঝেড়ে ফেলে তিনজনই উঠে দাঁড়াল। গাছপালার আগডালে তখন সকালের প্রথম রোদ্দুর বাচ্চা গাঙ্‌শালিকের গায়ের রং, একেবারে মগডালে রোদ্দুর অথবা গাঙ্‌শালিক লুটোপুটি খাচ্ছে। কুয়াশা-ঢাকা এবং ভোরবেলার আলোতে চমকানো কুয়াশা বুকে পিঠে মেখে এই তিনজন অনতিতরুণ যুবক আড়াআড়িভাবে রেসকোর্সের মাঠ পার হতে শুরু করল। তিনজনেই চুপ করে ছিল। তিনজনই জানে আজ ও আগামীকাল ওরা যা করবে সবকিছুই শেষবারের মতন। ফাইন্যাল পরীক্ষার পর আর কোনদিন এমনি একসঙ্গে কিছু করা যাবে না। সবাই বুঝতে পারছে যে রেসকোর্সের মাঠের মধ্যখানে অজস্র সময়ের ঢেউয়ে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। দেবু, বেণু, দীপু—নিজেদের পায়ের তলাতে কোন মাটি স্পর্শ করতে পারছে না। সে অন্ধকার জগতে কোন আলো নেই। কালো পাথরের নিরবচ্ছিন্ন একটা স্লেটের দেওয়ালে ওদের দৃষ্টি আটকে গেল। তারপর অনেকক্ষণ-নিভে-যাওয়া সেজবাতির পলতের মতো হারিয়ে গেল। দীপু ভাবল এই অন্ধকারে আমার আলো কোথায়, বেণু চিন্তা করল, এই অন্ধকারের নৈরাজ্যলোকের কী নাম? ঠিক সেই মুহূর্তে দীপু প্রথমে সেই গ্যাস-লাইটারের আগুনের শিখার নীলাভ একটা শিখা দেখতে পেল। শিখাটা আকারে বড় হতে শুরু করল। দীপুর দ্রুতগতিতে হাঁটা, মাঝে মাঝে এবড়ো-খেবড়ো জায়গাতে পা পড়লে ধাক্কা খাওয়া অথবা ঐ ক্রমাগত আয়তনে বড় হতে থাকা নীলাভ আগুনকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেও কোন লাভ হল না। মাঠের ওপারে কুয়াশাতে হারিয়ে যাওয়া অদৃশ্য নদীর দিকে খুব জোরে হাঁটতে হাঁটতে দীপু বুঝল আগুনের বিস্তার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে তত দীপু একখণ্ড জমা মাখনের মতো গলে যাচ্ছে। একটা অসহ্য আনন্দে দীপু অগ্নিশিখার দিকে প্রলুব্ধ হল। কিন্তু দীপু হঠাৎ একটা পেছুটান অনুভব করল; এ আগুনের মধ্যে আমি গলে গেলে, মিশে গেলে আর ফিরব না, তবে বিভাবরীকে কে দেখবে? বিভাবরীর জন্যই এই পূত যজ্ঞাগ্নির মধ্যে সমিধতুল্য ভস্ম হতে চাই না। বিভাবরীর জন্য আমার করণীয় আছে।

—দেখ্, নদীর পারে পৌঁছুতেই কুয়াশাটা কেমন পাতলা হয়ে গেল। সকালবেলার সেই প্রথম আলোতে প্রচুর ধোঁয়া ওঠা নদীর ক্ষীণস্রোতের দিকে তাকিয়ে বেণু যখন কথাগুলো বলল, তখন ভীষণ উচ্ছ্বসিত শোনাল।

দেবু বলল,—দেখ্, পার থেকে কালো পলির চরা একেবারে জল পর্যন্ত নেমে গেছে। ঠিক একখানা কালো পরিষ্কার শ্লেটের মতো দেখাচ্ছে। নদীটা শ্লেটের ওপর চক দিয়ে আঁকা যেন। বেণু দেবুর কথা শুনতে শুনতে কাপড় খুলল। জামা, গেঞ্জি, কাপড় ভেজা ঘাসের ওপর জড়ো করে রাখল। তারপর দৌড়ে নামতে গিয়ে পলিতে আর বালিতে পা দেবে যাওয়ার জন্য এগুতে পারল না বেণু। কাদার মধ্যে বসে পড়ল। বসে-বসেই বেণু কাদা থেকে নিজের পা তুলে নেবার জন্য ছটফট করতে লাগল। এই ছটফটানির জন্যই বেণুর সারা গায়ে কাদা মাখামাখি হল। বেণুকে এই মুহূর্তে একমেটে-হওয়া দুর্গাপ্রতিমার অসুরের মতো লাগছে, দীপু হাসতে হাসতে কথা-গুলো বলল। দেবুও দীপুর কথাগুলো শুনে হাসতে লাগল। কিন্তু দেবু কাদামাখা বেণুর দিকে ফিরেও তাকাল না, অথবা দীপুকেও দেখল না। দেবু দেখল নদীর এপারের শেষ পোস্ট থেকে একটা লম্বা তার টেনে নদীর অপর পারে এক পোস্টের সঙ্গে বাঁধা। তারপর ঘন নলখাগড়ার বনের মধ্য দিয়ে পর পর অনেকগুলো পোস্ট আস্তে নিঃশব্দে দিগন্তে ধু ধু। মেরুপ্রমাণ সুদূরতার কম্পমান তীব্র নিঃসঙ্গতাতে ঘরে-ফেরা সারসের মতো দেবু মাঝ আকাশে তির তির করে কাঁপতে লাগল। ইতিমধ্যে নদীর জলে ঝাঁপ দেবার পর পর দুটো ঝপাৎ শব্দে কপালকুণ্ডলার উপসংহার এক সেকেন্ডে ভেবে দেবু বাস্তবে ফিরল এবং নদীতে ঝাঁপ দিল। তীব্র ঠান্ডাতে প্রথমে এই তিনজন যুবক এই সাতসকালে ধোঁয়া ওঠা একচিলতে স্রোতের মধ্যে যেন জমে গেল। হাতপায়ের কোন সাড় নেই। সবকিছু অবশ হয়ে আসতে লাগল। জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ওরা তিনজনই স্থাণু বনে গেল। ধোঁয়াজলে কিছুক্ষণের জন্য তিনজন যুবকের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু আস্তে আস্তে তিন বন্ধুই বুঝতে পারল তাদের প্রত্যেকের দেহ থেকে একটা উত্তাপ বেরুচ্ছে। দেবু ভাবল, ঐ টেলিগ্রাফ পোস্টগুলো দূরে দূরে বহুদূরে গোপাল ঘোষের ছবির মতো দূরে চলে গেছে। বিশেষ দূরত্বের পর আর কিছু ভাবা যায় না। শুধু রীনাকে ভাবা যেতে পারে। রীনাকে আমি ভালোবাসি। বহুদিন পরে রীনাকে ভালোবাসার ব্যাপারটাতে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরে দেবুর ভালো লাগল। দেবু এবার উঠে দাঁড়াল। সারা গা ভেজা। গা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দেবুর শরীরে প্রভাতের আলো চকচক করছে।—নিজের বোনকে নিয়ে দীপু কোন আলোচনা করে না। তবে কি রীনাকে যে আমি ভালোবাসি এটা দীপু চায় না? দেবু ততক্ষণে পাড়ে উঠে গেঞ্জি দিয়ে গা-মাথা মুছছে। আপাতত গেঞ্জি ছাড়াই চলে যাবে। একটু চড়া রোদ উঠলেই আধ ঘণ্টার মধ্যে গেঞ্জিটা শুকিয়ে যাবে। দেবু ধুতি পরতে পরতেই দেখতে পেল বেণু আর দীপু ধীরে ধীরে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে পলিমাটির ওপরে নিজেদের পায়ের ছাপ ফেলে পাড়ের দিকে উঠে আসছে। বেণু বলল,—এই বোধহয় শেষ পায়ের চিহ্ন। এরপর আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ব। টইটুম্বুর নদীর স্রোতে এই পায়ের ছাপ ধুয়ে মুছে যাবে। আর মাত্র দশ বছর। তারপর আমরা পেটমোটা মধ্যবিত্ত—দীপু ফোড়ন কাটল। পকেট থেকে চিরুনি বের করে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে দেবু বলল,—দ্যাখ, ঐ টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো কী দারুণ একটা রিমোটনেসে শেষ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যেবেলা কলেজ প্রাঙ্গণের সব আলো জ্বলে উঠল। পুজোমণ্ডপ থেকে অনেকটা দূরে হলঘরের মধ্যে মাইক টেস্টিং হচ্ছে। আর ঘণ্টাখানেক পরেই সারস্বত সম্মেলন শুরু হবে। দেবু, বেণু আর দীপু বহু চিন্তাভাবনা করে ছিমছাম দুঘণ্টার একটা প্রোগ্রাম দাঁড় করিয়েছে। দীপুকে পুজোমণ্ডপের সামনে তদারকিতে রেখে দেবু আর বেণু ফাংশানের ব্যাপার নিয়ে হলঘরের মধ্যে

ব্যস্ত। পুজোমণ্ডপের সামনে প্রচুর ভিড়। কলেজের মেয়েদের ভিড়ই সবচেয়ে বেশী। মাইক টেস্টিং একটু জমে উঠতেই পুজোমণ্ডপের সামনে ভিড় কমতে শুরু করল। সেজেগুজে আজকের সন্ধ্যার ফাংশানের জন্য মেয়েরা হলঘরের কাছাকাছি দলে-দলে ভাগ হয়ে গল্পগুজব করছে। দীপু পুজো-মণ্ডপের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু পরেই তাকেও ফাংশানে যেতে হবে। পাতলা ভিড়ের মধ্যে দুটি শীর্ণা বিবাহিতা মহিলা। দীপু ভিড় থেকে চোখ সরিয়ে দূরে ছাত্রীদের দঙ্গলের দিকে তাকাল। ঠিক এমনি সময়ে একটা কণ্ঠস্বর দীপুর কানে এল,—এই কলেজেই আমরা পড়েছি। আজ আর মনেই হয় না এটা আমাদের কলেজ। কথাটা শোনবার পর দীপু একদম চুপচাপ হয়ে গেল। মাথা নীচু করে দীপু বুঝতে পারল তার পিঠে বুকে কপালে হাতে পায়ে অনেকগুলো ঠাণ্ডা চোরা স্রোত বইছে। দীপু ভাবল এই দীর্ঘশ্বাস বুঝি তাকে জমিয়ে এখনি একটা আড়াই হাজার বছরের খনিতে পরিণত করবে। তার মানে, আমরাও হারিয়ে যাব, এমনি শেষমাঘের সন্ধ্যাতে শীর্ণ কণ্ঠস্বরে নিজেকে জিজ্ঞাসা করব—এটা কি আমাদের কলেজ? এমনি করে কি সবাই পর হয়ে যাব?

—এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর ওদিকে সবাই আপনাকে খুঁজছে। ডলিরা সবাই মিলে আমাকে পাঠাল। বিভাবরী চুপ করল, তারপর তেমনি ধীর কণ্ঠে বলল,—চলুন, চলুন।

বিভাবরীর কথা শুনতে শুনতে দীপু পূর্ণদৃষ্টিতে ওকে দেখবার জন্য প্রলোভিত হল। ড্যাবড্যাব করে তাকাতে দীপুর কেমন লজ্জা করছিল, কিন্তু বিভাবরীর মুখ থেকে চলুন! চলুন! কথাটা শোনবার পর যেন একটা নিঃশব্দ আপৎকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, দীপু পূর্ণদৃষ্টিতে বিভাবরীর দিকে তাকাল। বিভাবরীর দুচোখে দীপু আটকে গেল। দীপু অনুভব করল পদ্ম-কোরকের মতো একটা চেতনা বিভাবরীর দৃষ্টির সময়হীন গহিন দরিয়াতে ফুটে রয়েছে। তারাদের অস্পষ্ট আলোতে সেখানে অগণিত পুরাণ, গাথা, কিংবদন্তী আর প্রতীক লাল-নীল মাছের মতো শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে সাঁতার কাটছে। ইতিহাস, সংস্কৃতি, সংগীত, কবিতা এবং ন্যায়শাস্ত্রের সীমানার বাইরে সেই অলৌকিক পদ্মের কুঁড়ি থেকে মৃদু বাতাসে দীপু শিশুর মুখের দুধ-দুধ গন্ধ পেল।

—এত ভাবছেন কী? অদৃশ্য মাইকের আওয়াজ এবং ছাত্রছাত্রীদের গুনগুন শব্দের দিকে বিভাবরী চোখ ফিরিয়ে কথাগুলো বলল, সুতরাং দীপু বিভাবরীর বাঁ চিবুকের প্রোফাইলটা আরও অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেল।

—একটু অপেক্ষা করুন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দীপু বুঝল ইনিশিয়েটিভ না নিলে সুমুখের ভিড়ের চিৎকারে গুঞ্জনে আর দু-মিনিটের মধ্যেই বিভাবরী গায়েব হয়ে যাবে। সেই অনির্ণীত খরস্রোতাতে বিভাবরীকে ছেড়ে দিতে দীপু চাইল না। বিভাবরী নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে দীপুর নিজের অবস্থা তার নিজের কাছেই কেমন গোলমেলে হয়ে যাবে। এমন সময় রেবা, ডলি এবং আরও কয়েকটি মেয়ের গলা দূরে শুনতে পাওয়া গেল। দীপু বুঝল কলরবটা তাদেরকে আক্রমণ করতে আসছে। ডলি, রেবা এবং আর পাঁচটি মেয়ে এল। বিভাবরী আর দীপুকে দেখেই রেবা কলকলিয়ে উঠল,—তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আর আমরা তোমাদের খুঁজে মরছি। এখনই ডেপুটি কমিশনার এসে যাবেন। দীপু রিসিভ করবে। সবাই খুঁজছে। রেবা কথা বলতে বলতেই মুখটা ঘুরিয়ে বিভাবরীর দিকে তাকাল,—বিভা, দীপুকে ডাকতে তোর এতক্ষণ লাগল? বিভাবরী কোন উত্তর দিল না। তার দুচোখ আরও গভীর এবং ব্যাপ্ত হল। চাপা একটা হাসি প্রথমে দু ঠোঁট—তারপর ঠোঁট আর নাকের মাঝখানের ধু-ধু বালিয়াড়িতে স্থির হল। বিভা চুপ করে গেল। ডলি একবার ভালো করে বিভাবরীকে তাকিয়ে দেখল। রেবা ডলির দিকে নিজেদের সৃষ্ট একটা ব্যস্ততাতে

এগিয়ে গেল, ফলে বিভা আর দীপু বেশ কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটবার সুযোগ পেল। ঢাকাই শাড়ির ওপর গাঢ় ঘিয়ে সাদা চাদর, মাথার চুল টানটান করে টেনে বাঁধা। প্রসাধনের প্রলেপ মোমবাতির আলোর মতো একটা স্নিগ্ধ আভা মুখে রচনা করছে। নিঃশব্দে বিভা আর দীপু পাশাপাশি হেঁটে ফাংশন হলের দিকে এগিয়ে এল। দীপু বুঝতে পারল এখন পাশাপাশি হাঁটার মধ্য দিয়ে সে বিভাবরীর ওপর একটা অস্পষ্ট অধিকার ঘোষণা করছে।

রেবা খুব চঞ্চলভাবে হাঁটাচলা করছে। বারবার স্টেজে উঠছে আর নামছে। মেয়েদের ডেকে ডেকে অন্তত তিনবার স্টেজ ডেকোরেশনটা একটু একটু অদলবদল করছে। শেষবারের মতো একবার সবকিছু ঠিক আছে কিনা এটা দেখবার জন্য রেবা একটু দূর থেকে ডলিকে একটু চেঁচিয়ে ডাকল। ডলি একদল মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, রেবার ডাক সে শুনতে পেল না। ডলির কানে রেবার ডাক না পেঁছুলেও ঐ দলে আর-একটি মেয়ে শুনতে পেয়েছিল। সেই মেয়েটি ডলিকে ঠ্যালা দিয়ে বলল,—তোকে মক্ষিরানী ডাকছে। ডলি মেয়েটির কথা শুনে পেছন ফিরে তাকাল এবং রেবাকে দেখল। ডলি একটু হেসে বলল,—সত্যি রেবাটার সবতাতেই বেশী। হাজার বার মাতব্বরি গেট দিয়ে স্টেজে যাচ্ছে আবার নীচে নেমে আসছে। একে ডাকছে, ওকে হাঁকছে। দলের একটি মেয়ে মূল বক্তব্যে না গিয়ে প্রশ্ন করল,—মাতব্বরি গেট কোনটা? মেয়েটির প্রশ্ন শুনে আর সবাই কেমন চুপ করে গেল, অথচ মেয়েটির প্রশ্নের আন্তরিকতা সম্পর্কে কেউ কোন সন্দেহ করল না, একটু এদিক ওদিক হলেই মেয়েটির প্রশ্ন ন্যাকামি-ন্যাকামি শোনাত। ডলি বলল,—স্টেজের ডান পাশে অডিটোরিয়াম থেকে যাতায়াতের জন্য একটা ছোট্ট দরজা আছে দেখ নি? ওটাকেই আমরা সবাই ঠাট্টা করে মাতব্বরি গেট বলি। যত দেখবে মাতব্বর, অর্থাৎ 'আমাকে-দেখো আমাকে-দেখো আমাকে-দেখো' পার্টি,—সব ঐ দরজা খুলে একবার স্টেজে ঢুকবে আর বেরুবে। ডলি থামল, চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর বলল,—রেবার মতো ছেলেপোকা আর নেই।

—রেবা ওর প্রাণের বন্ধু, বিভাবরীর একেবারে উল্টো চরিত্র, একটি ফর্সা মেয়ে মুখ টিপে হেসে মন্তব্য করল। ডলি ফর্সা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল,—আসলে বিভাবরীর মধ্যে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যার সঙ্গে রেবা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে না।

—সেইজন্যই ও এই লাউড ব্যাপারগুলো করে, মন্তব্য করার পর ফর্সা মেয়েটি ওদের জোট থেকে বেরিয়ে হলের দিকে হাঁটা দিল। অপেক্ষমাণ রেবার দিকে ডলি এগুতে শুরু করল।

সভাপতিবরণ হয়ে গেল। নিমন্ত্রিতদের কপালে একটা করে চন্দনটিপ পরিয়ে দিল রেবা। প্রোগ্রাম এবং স্টেজ ম্যানেজমেন্টটা পুরো প্রাণহরির হাতে দিয়ে দেবু আর বেণু বাইরে বেরিয়ে এল। ওরা দুজন উত্তর দিকের বারান্দাতে গিয়ে দুটো সিগারেট ধরাল। দেবু একটু হাঁফছাড়া ধরনের লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল,—আর কোন চিন্তা নেই। সামনের দিকে কিছু দেখছে এমনি ভঙ্গি বেণুর মুখে, ও যেন দেবুর কথা শুনতেই পায়নি। দেবু বেণুর ভঙ্গিটা সোজাসুজি না তাকিয়েও বুঝতে পারল, কিন্তু ক্লান্তিজনিত কারণে দেবু বেণুর দৃষ্টি অনুসরণ করতে চাইল না। এখন আর নতুন কোন উত্তেজনা তার একেবারেই ভালো লাগছে না। নিজের পলায়নটাকে পুরোপুরি করার জন্য দেবু সিগারেটে টান দিয়ে চোখ বুজল। চোখবোজা অবস্থাতেই দেবু বেণুর গলা শুনল,—অত নিশ্চিন্ত হোস না, ঐ দেখ জীবনগতি মার-মার, কাট-কাট মোষের মতো এগিয়ে আসছে। জীবনগতিকে দেখেই বোঝা গেল সে ভীষণ রেগে আছে। নিজে বাঁহাতের তালুর ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি মেরে জীবন প্রায় চিৎকার করে বলল,—এই ফাংশন আমরা বন্ধ করে দেব। দেবু অনুভব করল জীবনের মুখ থেকে থুথু ছিটে এসে তার গালে লাগল। আপনা-আপনি দেবু দাঁত চেপে ধরল, ওর চোয়ালের হাড় ওঠানামা করা শুরু করল। জীবন তখনও চিৎকার করছে,

—আমাদের সংগঠনের রমাকে দিয়ে গেস্টদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়ানোর কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল তোমাদের ফেডারেশনের রেবা সরকার কপালে রাজটীকা দিচ্ছে। চারটে ছাত্র-সংগঠনের মধ্যে প্রোগ্রাম সমানভাবে ভাগ করে দেবার কথা ছিল, কিন্তু গানে ডলিকে পুরো বাদ দেওয়া হয়েছে। দেবু জবাব দেবার জন্য বোধহয় একটু রুখেই এগিয়ে এল। বেণু হাত বাড়িয়ে দেবুকে থামিয়ে দিল। বেণু দেবুকে কোন কথা বলতে দিতে চাইল না এবং দেবু কথা বলে ফেললেও যাতে চাপা পড়ে যায় এমনি একটা চিন্তা থেকে সে চেঁচিয়ে উঠল,—এই সামান্য ব্যাপারে এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? রেবা একটা গান গাইবে এবং ডলিও একটা গান করবে। চন্দনটিপের ব্যাপারটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন তোদের কোন ছেলে করবে। আমি এখনই প্রোগ্রাম অ্যামেন্ড করে দিচ্ছি। জীবনগতি এবার মাটির দিকে তাকাল। বোঝা গেল ও একটু নরম হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ জীবন আবার তার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ফিরে গেল,—দেবু, তুই একটু আগেই রেগেমেগে রং দেখাচ্ছিলি, সাবধান করে দিচ্ছি, তুই আমার সঙ্গে লাগতে আসবি না।

—কেন? দেবুও রুখে উঠল,—তুই কি উল্লাপাড়ার জমিদার?

বেণু ইতিমধ্যে দেবু এবং জীবনের মাঝখানে পজিশন নিল। দুদিক থেকেই প্রচণ্ড ধাক্কা-ধাক্কিতে বেণু বেসামাল বোধ করল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক ক'টি ছেলে ছুটে এসেছে। দেবু আর জীবনকে ওরা ঠেলে দুদিকে নিয়ে চলল। সেই ঠ্যালাঠেলির মধ্যেও জীবনের গলা শোনা গেল,—দেখবো শালা, তুই কি করে প্রোভাইসে জিতিস। দেবুর কোন উত্তর শোনা গেল না।

সভাপতি এবং প্রধান অতিথির ভাষণ শেষ হয়েছে। এই দুটো বক্তৃতা আগেভাগে রাখা হয়েছে যাতে পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো বিনা বাধাতে এগিয়ে চলে। তাছাড়া জমজমাট একটা নাচ-গান-আবৃত্তির পর বক্তৃতা ঠিক জমে না। হৈচৈ হয়। সেইজন্য প্রোগ্রাম প্রস্তুত করার সময় এই দুটো ভাষণ আগেভাগে রাখা হয়েছে। দুটো ভাষণের পর আবৃত্তি। আবৃত্তির পর ছোট্ট একটা নাচ। তারপরই রেবার গান। নির্মলেন্দুর গলা মাইকে গমগমিয়ে উঠল। নির্মলেন্দু আবৃত্তি করছে। এই সময় দীপু ছোট্ট একটা স্লিপ কাগজ নিয়ে দ্রুত বেণুর সামনে এসে দাঁড়াল।—এদিকে আর এক বিভ্রাট। দীপু তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলে গেল।—কেন আবার কী হল? বেণুর গলাতে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।—এই দ্যাখ, প্রাণহরি স্লিপ পাঠিয়েছে স্টেজ থেকে। দীপু স্লিপটা বেণুর দিকে এগিয়ে দিল। বেণু স্লিপের দিকে তাকালও না, দীপুর চোখে চোখ রেখে খুব নিচু স্বরে এবং ক্লান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল,—কী হয়েছে খুলে বল না।

—রেবার একটা বাড়তি গান প্রোগ্রাম থেকে বাদ দেওয়াতে ও ফাংশানে কোন গানই গাইতে রাজী নয়। খুব কান্নাকাটিও করছে।

—চল দেখি কী করা যায়।

ওরা হল থেকে সিঁড়ি বেয়ে পথে নামল, বেণু এটা ধরেই নিল দীপু জানে রেবা কোথায় আছে এবং সেইজন্যই অবচেতনভাবে দীপুকে তার আগে হাঁটতে দিল। বেণু এবং দীপু দুজনেই দেখল যে ছেলেদের কমনরুমের কাছাকাছি ছাতিমগাছের নীচে, অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে রেবা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে কাঁদছে। ডলিসমেত পাঁচটি মেয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। ফাংশানের সন্ধ্যাতে সাজগোজকরা মেয়েদের শরীর থেকে সুগন্ধ সেই অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ছাতিমছায়াকে সৌরভে ভরে রেখেছে। প্রথম বসন্তের অন্ধকার অদৃশ্য কৃষ্ণসারসম বাতাসকে সুরভিত করে তুলল। বেণু সেই অন্ধকার এবং সুরভি এই দুটোকেই জম্বুদ্বীপের মশলাবনের অনুষঙ্গে ভেবে জীবনানন্দীয় প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হল। ক্রন্দনরতা রেবাকে সুবেশা তরুণীদের ভিড়ে প্রোষিত-ভর্তৃকার নকলচিত্র হিসাবে কল্পনা করল। ক্যালেন্ডারের পক্ষে ছবিটা সত্যি দারুণ হবে। একটু ব্য

সুলভ। বেণু সিদ্ধান্ত নিল, রেবাটা সত্যি রিডিকুলাস। বেণুকে দেখেই ডলি বলল,—আমি সত্যি গান করতে চাই না। আমাদের অর্গানাইজেশনের ছাত্রনেতার সঙ্গে ব্যাপারটা আমি বুঝে নেব। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

—ডলি, তুই আমাকে ভুল বুঝিস না,—ভাঙা-ভাঙা গলাতে রেবা বলল,—দোষ তোর নয়, দোষ আমার ফেডারেশনের নেতাদের। বেণু অভিযোগটা শুনবার পর ভাবল রেবার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি শুনে মনে হচ্ছে যে ওর সর্দি লেগেছে। বেণু প্রথমেই কড়া হতে চাইল,—আমি প্রোগ্রাম অ্যামেন্ড করেছি। আমাকে সে অধিকার তোমরাই দিয়েছ। সুতরাং স্টেজ ডিসিপ্লিন ডিম্যান্ড করে তোমরা দুজনেই গান গাইবে। বেণুর বক্তব্যটা একটা বক্তৃতার আকার ধারণ করল। ডলি চুপ করে গেল। বেণু বুঝল গান গাওয়ার ব্যাপারে তার তেমন কোন আপত্তি নেই। কিন্তু রেবা প্রায় চিৎকার করে উঠল,—আমি কিছুতেই গান গাইব না। কেন আমাকে দুটো গান গাইতে বলা হল এবং তারপর আমাকে না জানিয়ে একটা গান বাদ দেওয়া হল? কথাগুলো বলে রেবা কান্নাতে ভেঙে পড়ল। এই সময়ে বেণু দীপুর কানে কানে কিছু বলল। দীপু প্রায় ছুটে হলের দিকে চলে গেল। বেণু একা অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দীপু অনেক কষ্টে বিভাবরীকে অন্য একটা মেয়ের সাহায্যে বাইরে ডাকিয়ে আনল। বারান্দার এককোণে বিভাবরী দীপুকে জিজ্ঞাসা করল,—কী ব্যাপার? ভীষণ জরুরী তলব মনে হচ্ছে! দীপু কোনরকম ভূমিকা না করে রেবাকে নিয়ে যে সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা খুলে বলল এবং তারপর খুব আন্তরিকভাবে বলল,—ঐ তো ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি গিয়ে রেবাকে একটু বোঝালেই সব মিটে যাবে। আপনার কথা রেবা কিছুতেই ফেলতে পারবে না। বিভার মুখে অন্তত দুটি ছায়া পড়লো এবং সরে গেল। শ্রাবণ মাসের দুপুরে আকাশে মেঘেদের ঘোরাফেরাতে এমনি ছায়া ক্ষণিকের জন্য ঘাসে-ছাওয়া মাঠে পড়ে এবং চলে যায়। বিভা এর পর বারান্দার উত্তরে একটু সরে গেল। দীপু বিভার সঙ্গে তার দূরত্ব কমাবার জন্য এগিয়ে গেল। বিভা এবং দীপু নিশ্চিত হল যে ওদের দুজনের কথা ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না। বিভা দীপুর দিকে গভীরভাবে তাকাল। তারপর খুব নীচু গলাতে বলল,—আগামীকাল সন্ধ্যার সময় আপনি আমাদের বাড়িতে একটু যাবেন। কথাটা বলে বিভা আর দাঁড়াল না। দ্রুত হলঘরের প্রবেশপথের দিকে অগ্রসর হল। দীপু প্রায় দৌড়ে সেই ছাতিমগাছের তলাতে ফিরে এল, বেণুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল,—সব শুনেও বিভাবরী এই প্রসঙ্গে একটা কথাও বলল না।—কোন কথাই বলল না? বেণু সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল।—সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল যার সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। এমন ভাব দেখাল যাতে মনে হয় ও যেন কিছুই শোনেনি। দীপু পরিষ্কারভাবে জবাব দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে বেণু পুরোপুরি খুশী হল বলে মনে হল না।

—ও প্রসঙ্গে একটা কথাও বলল না?

—না, দীপু জবাব দিল।

বেণু একটু কৌতূহলের সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসা করল,—অন্য কথা আর কী বলল?

দীপু প্রশ্নটা শুনে এক মুহূর্ত কী ভাবল, বেণু লক্ষ্য করল দীপু তার মাথার ওপর দিকে দূরে আলোকিত পুজোমণ্ডপের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে বেণুর চোখে চোখ রেখে বলল,—আগামীকাল আমাকে একবার ওদের বাড়িতে যেতে বলেছে। দীপুর জবাব শুনে বেণু আর দাঁড়াল না। ছাতিমগাছের ছায়াতে রেবাকে ঘিরে যে ভিড়টা তখনও দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। বেণু ওদের কাছে গিয়ে বলল,—রেবা, তুমি অবুঝ হয়ো না। আমরা সবাই বন্ধু। পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধা আমাদের সবারই বোঝা উচিত। প্রোগ্রাম যেভাবে অ্যামেন্ড করা হয়েছে সেটাই

বজায় থাকবে। আমার মনে হয় ব্যবস্থা মেনে নিলে আমরা সবাই দম ছেড়ে বাঁচি। বেণু কথাগুলো বলেই নিজের কাছে নিজে পরিষ্কার হয়ে গেল। রেবা ততক্ষণে মুখ তুলেছে। বক্তব্য শুনে ওর ঠোঁটের ওপর দিকে অনেকগুলো কুঞ্চন ওর মুখখানাকে সেই অপেক্ষাকৃত ছায়া এবং অন্ধকারেও অন্যরকম করে তুলল। রেবা বুঝতে পারল বেণুর প্রস্তাব এখন গ্রহণ না করা মানে আজকের অনুষ্ঠান থেকে বাদ পড়া। এখন এই মুহূর্তে বেণু এবং দীপু তার সিদ্ধান্ত শোনবার জন্য ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে। ওদের দুজনের স্থির দৃষ্টি এই মুহূর্তে ভালো লাগছে। এই শীতের সন্ধ্যাতে রেবা দুই যুবকের দুজোড়া চোখের ব্যগ্র দৃষ্টিতে উত্তাপ পেল। চারিদিকের কোলাহল এবং তীব্র আলোর তুলনায় এই ছায়াময় অন্ধকারে তখন সবাই চুপচাপ। ছয়টি তরুণী এবং দুইটি তরুণের মৌনব্রতে ছয়ফুট বাই তিনফুট গাছের ছায়াটা বিচ্ছিন্ন। যতক্ষণ ওরা কথা বলছিল ততক্ষণ কথাগুলোই মূল শব্দস্রোতের সঙ্গে এই একচিলতে ছায়াটাকে দড়ির মতো বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সবাই চুপ করে যেতেই সেই দড়িটা ছিঁড়ে গেল। এমনি সময় দেখা গেল প্রাণহরি ছুটে আসছে। প্রাণহরিকে দেখেই বেণুরা বুঝল রেবার প্রোগ্রামের সময় এসে গেছে। প্রাণহরি পেঁৗছানোর আগেই রেবা বুঝল আর সময় নেই। বেণুর পক্ষে তাকে বাদ দিয়ে প্রোগ্রাম চালানোও অসম্ভব নয়। কারণ রেবা জানে ডলি চান্স ছাড়বে না। সে গান গাইবেই গাইবে। এই শেষ কলেজ ফাংশন। এর পর কে আর তাকে সাধবে। সুতরাং বেণু তখন প্রাণহরিকে দেখেই বলল,—এই তো রেবা, এর পরেই রেবার প্রোগ্রাম, প্রাণ, তুই রেবাকে নিয়ে স্টেজে চলে যা। প্রাণহরি রেবাকে স্টেজে পাঠিয়ে বেণুকে পাশে টেনে নিল,—প্রিন্সিপাল বললেন যে তাঁকে এইমাত্র ডি সি বলেছেন যে বাজারে পেশোয়ারী ফলওয়ালাদের সঙ্গে কিছু লোকাল ছেলেদের গোলমাল হয়েছে, টাউনে খুব টেনশন চলছে। কিছুটা কারটেল করে তাড়াতাড়ি ফাংশনটা শেষ করতে হবে। কারণ কোন হাঙ্গামা হলে মেয়েদের বাড়ি পেঁৗছানো নিয়ে ভীষণ সমস্যা দেখা দেবে।

—তাহলে জীবনগতি, আমি, তুই, দীপু আর দেবু মিলে পাঁচ মিনিটের একটা গোপন বৈঠক করে প্রোগ্রাম কমিয়ে ফাংশনটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই। বেণুর গলাতে আগ্রহ প্রকাশ পেল, বোঝা গেল সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব বেণু বুঝতে পেরেছে। প্রাণহরি যখন ওদের ডাকতে হলের দিকে গেল তখনও বেণু সেই গাছের ছায়াতেই দাঁড়িয়ে রইল। বেণু কলেজের প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রিকশা নিয়ে দশজন অভিভাবক কলেজে ঢুকছেন। অভিভাবকরা প্রায় একসঙ্গেই দুজন ভলান্টিয়ারকে ধরলেন, তারপর নিঃশব্দে মেয়েদের ডেকে নিয়ে রিকশার পাশে বসিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত ব্যাপারটা দ্রুতভাবে নির্বাক ছবির রীলের মতো ঘটতে লাগল। বেণু ভাবল,—প্রাণহরি কি ওদের নিয়ে ফিরবে না? বেণু পরিষ্কার বুঝতে পারল যে প্রায় প্রতিটি মিনিটের সঙ্গে গেটে অভিভাবকদের ভিড় বাড়ছে। শহরের অবস্থা অতি দ্রুত জানাজানি হয়ে যাবে। কিন্তু প্যানিক হবার আগে উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং সুশৃঙ্খলভাবে সবকিছু ম্যানেজ করতে হবে। বেণু কর্মকর্তা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি বোঝে। কিন্তু দেবু আর দীপু কি মারা গেছে? প্রাণহরি কি হারিয়ে গেল? জীবনগতি কোথায়? বেণু বুঝতে পারল এই চারজন ছাড়া তার পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ একটা চরম আপৎ-কালীন সংকটে ছাতিমগাছের ছায়াতে এই আলোকসজ্জার কনুই-এর অন্ধকারে দু-রাত-জাগা বেণু ক্লান্ত হয়ে তার চারজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছে। বেণু মনে মনে ভাবল সে এই ছাতিমগাছের একচিলতে অন্ধকারে ছায়ার রূপ ধারণ করেছে। সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কি দেবু বেণু প্রাণহরি আর জীবন এই গাছের গুঁড়ির চারদিকে চরকির মতো তার খোঁজে ঘুরছে অথচ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না? বেণু জানান দিতে চাইল যে সে তার নির্ধারিত জায়গা থেকে এক পা নড়েনি।

গলা দিয়ে বেণুর কোন জবাব বেরুল না। বেণু বুঝতে পারল তার অদৃশ্য ছায়া ঘিরে চার যুবক বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছে।—এই বেণু! বেণু! বেশ মজা তো, গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিস? জীবনের চিৎকার এবং কিছুটা অট্টহাসিতে বেণু চমকে উঠল।—তোরা চারশালা মারা গেছিস না বেঁচে আছিস? বেণু খেঁকিয়ে উঠল।—মরে ভূত হয়ে তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, প্রাণ-ভরে দ্যাখ! প্রাণহরি হেসে হেসেই কথাগুলো বলল।

আলোচনার পর ঠিক হল যে শেক্সপীয়রের নাটকের একটা অংশ নেপু, শ্যামা আর বিশু অভিনয় করবে। কারণ ওটা খুব ভালোভাবে তৈরি হয়েছে। তারপরই অনুষ্ঠান শেষ হবে। জীবন-গতি সাধারণভাবে শহরের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির কথা মাইকে ছাত্রছাত্রীদের বলবে। অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করার কথা ঘোষণা করবে। রেবার গান শেষ হওয়ামাত্র স্টেজ ডার্ক আউট করে দেওয়া হল। প্রিন্সিপ্যাল এবং ডেপুটি কমিশনার অডিটোরিয়ামে নেমে এলেন। পনেরো মিনিটের মধ্যেই অভিনয় শুরু হল। মার্চেন্ট অব ভেনিসের একটা নির্বাচিত অংশমাত্র। মেরেকেটে আধ ঘণ্টার ব্যাপার। ড্রপসিন ওঠবার পর অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করল।

ইতিমধ্যে একটা পুলিসের গাড়ি কলেজের সামনে দাঁড়াল। গাড়িভর্তি পুলিস। প্রত্যেকটি পুলিশই সশস্ত্র। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমেই একজন অফিসার সোজা গটগট করে হলঘরের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দাতে উঠলেন। পুলিশ অফিসারটির বয়স অল্প, বিরাট গোলন্দাজী গোঁফ, খুব ফর্সা, চোখে একটা কপিশ ভাব। চোখের এই কটা-কটা রংটা দৃষ্টিকে গভীর এবং অগভীর অংশে ভাগ করেছে। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেই মার্জারদৃষ্টিতে প্রথমে পায়ের পাতা ডোবানো জল, তারপর হাঁটুজল, মাজাজল এবং অবশেষে বাঁও মেলে না। যেখান থেকে বাঁও মিলবে না সেখান থেকেই একটা বিপজ্জনক গভীরতাতে মানুষটি একদম বোধের অগম্য। দীপু, বেণু আর জীবনগতি এগিয়ে এল। অফিসারটিকে ঘিরে ধরল। হাফপ্যান্টের পর হাফশার্ট। মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপি। তারপর একজোড়া ঘন মোটা কালো ভ্রূ। সেই দুই স্তরের গভীরতাতে বিন্যস্ত দৃষ্টি। অফিসারটি হাসলেন। সুন্দর হাসিটি। দুটি ঠোঁটের মধ্যে আবদ্ধ হাসি। থুথনি বা গালে কোন কুঁচিমুচি সৃষ্টি করল না। এমনি চলন্ত একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাঝখানে এসে সপ্রতিভ হাসিটি কিছুটা পাদপূরণের কাজ করে। দীপু লক্ষ্য করল অফিসারটির ভাবভঙ্গি, দৃষ্টি, কথা অথবা ভাবপ্রকাশের মধ্যে কোনপ্রকার ভয় অথবা তাড়াহুড়োর আভাস নেই। খুব ধীরে অফিসারটি বেণুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আপনাদের ফাংশান আর কতক্ষণ চলবে? তারপরেই থেমে একটু লজ্জিতভাবে বেশ তাড়াতাড়ি বললেন,—আমার নাম সুভাষ সেন। কোতোয়ালির ও সি। দীপু, বেণু, দেবু আর বন্ধুরা। দীপুই কথা বলল কিন্তু আর সবাই হাত তুলে নমস্কার করল। দেবু বুঝতে পারল সুভাষের দৃষ্টির কপিশ অংশে প্রত্যাগত বেলেহাঁসের মতো স্মৃতি ফিরে আসছে। সেই স্মৃতি যৌবনের, কলেজ জীবনের, ফাংশানের, গতকাল কী হবে ভাবতে না পারার বৈরাগ্যের। কলেজের ফাংশানের রাতে দুটো চোখ ঝিনুকের বোতামের মতো এখনও কি ছেলেদের সারারাত স্বপ্নে দেখা দেয়? সুভাষ সেন শার্টের ডান পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে ভাবল। সুভাষের চোখের অগভীর স্তরের কটা অংশে তখন জলজ গাছপালালতার মধ্যে পাখার ঝটপটি, সমবেত যুবকবৃন্দ সম্পর্কে স্নেহ এবং প্রশ্রয়।—ফাংশানটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে ভালো হয়, কারণ ছাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রোগ্রাম শেষ হলে ডি সি-র সঙ্গেও আলোচনা আছে। কোথায় একটু বসা যায় বলুন তো? সুভাষ এদিক ওদিক তাকাল।—চলুন হলের শেষে ঐ কোনার ঘরটাতে বসি, জীবন কথা বলে হাঁটা দিল। এটা বোঝা গেল জীবন ধরেই নিয়েছে যে তাকে সবাই অনুসরণ করবে। ছোট ঘরে বসবার পর বেণু সুভাষের

জন্য চা আনতে পাঠাল। একটা বড় টেবিল ঘিরে সবাই বসল, বসবার পর দীপুই আবার কথা বলল,—টাউনের অবস্থা কি খারাপ?—খুব টেন্স, সুভাষ সিগারেটের প্যাকেট নাড়তে নাড়তে জবাব দিল। দেবু বুঝল সুভাষ টাউনের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্যানিকের বিষয়ে ফিরে যেতে চায় না। এখন ভোরবেলার আলোতে পাখির ডাক, দুটো চওড়া খসখসে পাতা জোড়া দিয়ে পাখি বাসা বানিয়েছে, ডিম পেড়েছে। ডিমগুলোর রং নীল কিন্তু তাতে লালের ছিটে। ততক্ষণে চা এসে গেছে। হল থেকে খবর এল শেক্সপীয়রের নির্বাচিত নাট্যাংশ শেষ হতে আর পাঁচ মিনিট। সুভাষ সেন তড়িঘড়ি চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। হলের মধ্যে গিয়ে ডি সি-কে রিপোর্ট দিতে হবে। চুমুকের শব্দটা দ্রুত এবং লম্বা হয়ে টিকটিকির লেজের মতো দেওয়ালে দৌড়ে গেল। সুভাষ সেনের এই দ্রুত চা পান করার ভঙ্গিতে সমস্ত পরিবেশটা প্রভাবিত হয়ে গেল। চা শেষ করে ঘরের বাইরে যেতে যেতে ও সি সাহেব দরজার চৌকাঠ থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন,—আপনারা সবাই এইখানেই বসুন। এখনি কথা বলে আসছি। ফিরে এসে ছাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছানোর প্ল্যান ছক কেটে ফেলা যাবে। সুভাষ সেন বেরিয়ে যেতেই ঝড়ের বেগে শ্যামা এসে ঘরে ঢুকল। দেখেই বোঝা গেল শ্যামা কোনরকমে কসটিউম বদলে এসেছে। মুখের মেক-আপটা পর্যন্ত পুরোপুরি তোলেনি। শ্যামার পুরো মুখ রাগে ফুলে উঠেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। ঘরশুদ্ধ লোক প্রথমে শ্যামার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতেই পারল না ওর কী হয়েছে। বেণু কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল,—কিরে শ্যামা, কী হয়েছে? শ্যামা দুই হাতে কপাল ধরে চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়ল। প্রায় আধ মিনিট ঘরের মধ্যে শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না। সবাই শ্যামার অবস্থা দেখে একেবারে থ মেরে গেল। শ্যামার কাছে গিয়ে ওর পিঠে পিঠ রেখে বেণুই আবার বলল,—বল্ না ভাই কী হয়েছে? শ্যামা আস্তে দুটো হাতই কপাল থেকে সরিয়ে নিল। তারপর হাত দুটো সোজাসুজি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। দুই হাত সমান্তরালভাবে টেবিলের ওপর রাখা অবস্থাতে ঋজু বসার ভঙ্গিতে মনে হল শ্যামা কোন শপথ গ্রহণ করছে। শ্যামা লম্বাতে খাটো, রং বেশ কালো, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা হলেও পাটপাট নয়। মাথার ডানপাশের চুলগুলো খাড়া হয়ে আছে। শ্যামার মুখ-ভর্তি তখনও রং এবং একঘর চুপ-করে-যাওয়া লোকের মাঝখানেও ওকে বহুরূপীর মতো লাগছে। শ্যামার গালে এবং ঠোঁটে চোখের জল লেগে পেন্টিং অনেকটা জোলো হয়ে লেপটে গেছে। শ্যামাকে হঠাৎ ক্রন্দনরত এক জোকার মনে হচ্ছে। এইমাত্র স্টেজে হাজার লোককে হাসিয়ে উইংসে ঢুকেই যেন কোন মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে। দেবু এবং দীপু শ্যামাকে ঝাঁকি দিল,—বল না ভাই কী হয়েছে? দীপুর গলাতে সত্যিকারের সহানুভূতি ফুটল। হলের ভেতরে মাইকে জীবনগতি যে অন্তিম ঘোষণা করছে তা মাঝে মাঝে টুকরো টুকরোভাবে এই ছোট ঘরের মধ্যে ভেসে আসছে। শ্যামা অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,—নেপু আমার সমস্ত কেরিয়ার আজ শেষ করে দিল।

—তার মানে? বেণু ফিরে প্রশ্ন করল। ঘরশুদ্ধ লোক তখন শ্যামার দিকে তাকিয়ে আছে।

—আমার মুভি ডাইরেক্টার হবার সব আশা মাটি করে দিল, শ্যামা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে টেবিলের ওপরে হাতখানা অপরিবর্তিত রেখেই আঙুলগুলো নাড়াতে লাগল। তারপর নিজের মনে বলতে লাগল,—দেবকীদা, ছবিদা এবং বিকাশদাকে এবার কলকাতা গিয়ে কী বলব?

—কেন, এমন কী হয়েছে যে ভবিষ্যতে সিনেমা ডাইরেক্টর হবার সব সুযোগ নষ্ট হল? দেবুর গলাতে এবার একটু ঠাট্টা খুব সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেল।

—আজ যা হল তাতে আর আমার ভবিষ্যতে সিনেমা ডাইরেক্টার হবার কোন আশাই নেই,

শ্যামা প্রায় চিৎকার করে কথাগুলো বলল, তারপর কোন মন্তব্যের অপেক্ষা না করেই বলল,—নেপু মোদক খেয়ে এসে আমার আর তার নিজের পাঠ দুটোই সমানে বলে গেল, আর স্টেজের মধ্যে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আমি একটা কথাও বলার সুযোগ পেলাম না, একটা অ্যাকশানও দেখাতে পারলাম না। ছবিদা, বিকাশদা আর দেবকীদাকে আমি কী বলব?

—কিছুই বলবি না। ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায় আর দেবকী বসু কি সূক্ষ্মদেহে এসে তোর অভিনয় দেখে গেলেন? তাঁরা আজকের অভিনয়ের কথা কী করে জানবেন? দেবু এবার তার কণ্ঠে বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না। শ্যামা দেবুর কথার কোন জবাব দিল না। শুধু অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিতে দেবুর দিকে তাকাল। ওর মুখের রং তখন আরও এধার ওধার হয়ে গেছে। থুতনির কাছে লেপটানো রংটাকে ভারতবর্ষের ম্যাপের শেষে সিংহলের মতো প্রায় ত্রিভুজাকৃতি লাগছে। শ্যামা প্রথমে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শ্যামার বেরিয়ে যাওয়া আর সুভাষ সেনের পুনরায় প্রবেশের মাঝখানে সময় এত কম যে শ্যামার আচরণ নিয়ে হাসাহাসি অথবা কোনপ্রকার মুখরোচক আলোচনার সুযোগ কেউ পেল না। সুভাষ সেন ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন না। টেবিলটার ওপরই এক পাশে বসলেন,—প্ল্যানটা প্রিন্সিপাল এবং ডি সি দুজনেই অ্যাপ্রুভ করলেন। এখন আপনারা খুব তাড়াতাড়ি পুরো ব্যাপারটা অরগানাইজ করে ফেলুন।

—কিন্তু প্ল্যানটা কী? দেবু প্রশ্ন করেই দেখল প্রিন্সিপাল ঘরে ঢুকছেন। যারা বসেছিল তারা সবাই উঠে দাঁড়াল, সুভাষ সেনও টেবিল থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। প্রিন্সিপাল ছোট্ট-খাট্ট মানুষ। মাথায় বিরাট টাক। ধবধবে ফর্সা রং। দুধের মতো সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধুতিতে ভীষণ অভিজাত লাগছে। বেণু ভাবল, প্রিন্সিপালের চেহারা একেবারে রোমান সেনেটারের মতো। প্রিন্সিপাল কোনপ্রকার ব্যস্ততা দেখালেন না, সকলের মাথার ওপর দিয়ে পুলিশ ইনসপেক্টরের দিকে তাকালেন,—ইনপেক্টর, আমার মনে হয় ছয়জন অধ্যাপক নিয়ে আমি ক্যারাভানের সঙ্গে যাব। শেষ মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তবে কোয়ার্টার্সে ফিরে আসব। ইটস এ টেরিবল রেসপনসিবিলিটি।

—আপনার অসুবিধা হবে না স্যার? সুভাষ সেন প্রাক্তন ছাত্রের মতো কথাগুলো বলল।

—মাই ডিয়ার বয়, দিজ আর দি নাইটস অব লভ নাইটস, মোটা চশমার কাঁচের আড়ালে প্রিন্সিপালের চোখ দুটো বিস্ফারিত হল, একটু-বা ভেজা-ভেজা লাগল,—সুতরাং আজকে ওদের বাড়ি না পৌঁছে নিজে বাড়ি ফিরতে পারব না। ফেরবার সময় বরং আপনারা পৌঁছে দেবেন।

সুভাষ হাসলেন, কোন জবাব দিলেন না। সুভাষের কটা চোখের হাঁটুজলের জলাভূমির দৃষ্টিটাই এখন প্রখর। গভীর এবং অগভীর অংশের মাঝখানে একটা দীর্ঘস্থায়ী মেরুগোধূলি। সুভাষ সেনের জৈবিক ভূগোলের এই ব্যাপারটা দেবু আগাগোড়া লক্ষ্য করে চলল।—আমরা ডাবল ফাইলে লাইন করে যাব। সামনে কিছু ডাকাবুকো ছেলে থাকবে, দুপাশে আমরাও থাকব, ছেলেরাও থাকবে, একদম শেষে গাড়িটা। প্রিন্সিপাল সাহেব এবং অধ্যাপকরা গাড়িতে, আমি আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে। দেবু দেখল, ইনসপেক্টার আবার সেই হাসি দিয়ে কথাটা শেষ করলেন।

—কিছু হকিস্টিক বের করি, কী বলেন? প্রয়োজন আছে? বেণু ইনসপেক্টারের দিকে তাকাল। জবাব না দিলেও বেণু মনে মনে সুভাষের সম্মতি বুঝল।

আজ কুয়াশা নেই। মধ্যবসন্তের তীব্র বাতাস বইছে। রেসকোর্স থেকে নদীর গন্ধ নিয়ে বাতাস দাপাদাপি করে শহরে ঢুকছে। ফলে শিহরিত এবং শোভাযাত্রায় পর্যবসিত তিনশত পূর্ণ-যুবতীর দেহবাস এসেন্স এবং সুগন্ধি ফুলেল বেলফুলে উন্মনা। বেণু আকাশে তাকাল, দেবু বাতাস শুঁকল, শুধুমাত্র দীপুই দেখল যে জীবনগতি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে অকস্মাৎ মুক্ত রাস্তা

থেকে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। দীপুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনগতির আততায়ী মনোবৃত্তি এবং মূল শোভাযাত্রা থেকে ছিটকে পড়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে আত্মগোপন করা বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। হঠাৎ মেয়েরা গান গেয়ে উঠল। সবাই নয়। মাঝে মাঝে। গ্রুপে গ্রুপে। একটা সুরেলা কোলাহলে সুগন্ধে এবং প্রবল বাতাসে বেণুর মনে হল স্বাধীনতার ছয় বৎসর পরে সে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে পারে। বেণু বুঝলো, যৌবন সময়ের স্থাপত্যে একটা ব্যালকনির মতো। সেই ব্যালকনির সামনে যে ধূ-ধূ ধোঁয়া,—যা কুয়াশা হতে পারে, রাতের নদী হতে পারে, মুছে-যাওয়া কোন খ্রীষ্ট-পূর্ব পুঁথির পাতা হতে পারে,—সেইটাই ইতিহাস। আমি, আমরা, আমাদের বন্ধুরা, বান্ধবীরা কোন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত নই। আমরা ইতিহাসের কাছে দত্তক। পড়াশোনা যেন শেষ না হয়, যৌবন যেন থাকে; চাল-ডাল-লাকড়ির প্রহসনে আমরা ভাঁড়ের অভিনয় করতে চাই না। ইতিহাসে আমরা আমাদের স্থান চাই।

মূল রাজপথে লোকজন নেই। প্রত্যেক মফস্বল শহরেই সবসময় ভীষণ গোলমালের মধ্যেও কিছু খালি রিকশা অনেক রাতে ঝমঝমিয়ে বাড়ি ফেরে। তেমনি দু-একখানি রিকশা। টহলদার পুলিশি ট্রাক, ধেড়ে ইঁদুরের মত কিছু কুকুর। দীপু যেন কোথায় পড়েছে যে প্লেগে আক্রান্ত নিষ্প্রদীপ শহরে রাজপথে ঘুরে বেড়ানো ধেড়ে ইঁদুরগুলোকে আলোকসম্পাতের বিভ্রম এবং মৃত্যু-গ্রাসজনিত কারণে খুব বড় বড় দেখায়। গান থেমে গেছে। লাইনের শেষের দিকে আগুনের পরশমণি, তারপর চুপচাপ। একদল ছেলে কোকিলের ডাক ডাকল। দু-একটা হরিধ্বনিও শোনা গেল। সবচেয়ে বড় কথা, কেউ চিন্তিত নয়। দীপু বুঝতে পারল ছাত্রছাত্রীরা সবাই একটা শ্রেণী হিসেবে এই মুহূর্তে নিজেদের মূল ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছে। শোভাযাত্রা তাদের কৌলিক এবং যূথবদ্ধ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে না।

পথযাত্রার পরিকল্পনাটা এমনভাবে করা হয়েছে যে শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রধানত শোভাযাত্রা চলেছে। এই প্রধান সড়কের আশেপাশেই মুখ্য জনবসতি। সুতরাং যেমন শোভাযাত্রা এগুতে লাগল ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও কমতে শুরু করল। মিছিল শহরের উপকণ্ঠে এল। যতগুলি বাড়ি এ-পর্যন্ত দেখা গেছে প্রত্যেকটা বাড়ির সামনেই আত্মীয়স্বজন এবং বাবা-মায়েরা দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ ইতিমধ্যে এই কথাটা রটনা হয়ে গেছে যে শহরের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য পুলিশ প্রহরায় এবং ছাত্র-অধ্যাপকদের তদারকিতে মেয়েদের বাড়ি বাড়ি পেঁৗছে দেওয়া হচ্ছে। শহরের বাতাসে আতঙ্ক পুরোমাত্রায় রয়েছে। চারিদিকে নিশুতি। কী যেন একটা ভীষণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তা জুড়ে ছায়া, অন্ধকার, আলো, মাঝে মাঝে কিছু মানুষের ভিড়। রাস্তাতে আলো এবং ছায়া অন্ধকারকে টুকরো টুকরো করে নানা আকারে পরিণত করেছে। সারাপথ জুড়ে একটা মরা মেলা। দোকানগুলো ফেলে দোকানদাররা পালিয়েছে। প্রত্যেকের ভয় হচ্ছে তাদের পায়ের তলাতে এই মাটির পুতুলগুলো গুঁড়িয়ে যাবে। দীপু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল বিভাবরীদের বাড়ির সামনে চিন্তিত মুখে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। সেই তেলাপিয়া মাছে ভরা চৌবাচ্চার ওপর প্রচন্ড জোরালো আলো জ্বলছে। পুরো গেটটা জাপটে ধরে একজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। বিভা এবং রেবা মিছিল থেকে বেরিয়ে সোজা গেটমুখো। খোলা গেটে ঢুকতে ঢুকতে বিভাবরী দুবার ফিরে তাকাল। রেবা কাউকে উদ্দেশ করে বলল,—এখান থেকে দারোয়ানের সঙ্গে আমি বাড়ি চলে যাব। শেষ মুহূর্তে, যে যার ঘরে ফেরার সময় এল। কিন্তু তখনই একটা মারাত্মক সংবাদ এল সুভাষ সেনের কাছে,—আজ রাতে কলেজ হোস্টেল আক্রান্ত হতে পারে। মাঝরাস্তাতে কোন আলোচনা হল না। সুভাষ সেন পুলিশের গাড়িতেই শুধুমাত্র বেণু, দেবু আর দীপুকে তুলে নিলেন। প্রিন্সিপাল এবং অধ্যাপকরা আগেই বসে ছিলেন। অন্যান্য ছাত্ররা যে যার বাড়িতে

চলে গেল। শুধু দুজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছাত্র দেবু এবং দীপুর বাড়িতে সংবাদ দেবার দায়িত্ব নিল।

কলেজের তিনটি ব্লক। দুটো ব্লকই মুখোমুখি। তৃতীয় ব্লকটি পূর্বদিকে পশ্চিমমুখো। একটা সরলরেখার মতো উত্তর-দক্ষিণে অন্য দুটি ব্লককে যুক্ত করেছে। ফলে মনে হতে পারে পুরো হোস্টেলটাই পশ্চিমমুখো। ইংরেজী 'ই' অক্ষরের মাঝখানের টানটা না থাকলে যেমন হবে। এই দিকে বড় লোহার গেট। গেটের পাশে পাহারাদারের ছোট্ট একটা ঘর। তাতে গেঞ্জিগায়ে অথবা আদুলগায়ে যে লোকটা সবসময় বসে বসে ঢোলে সেই এই হোস্টেলের দারোয়ান। নাম রামপিরীত। হোস্টেল ঠিক বড় রাস্তার ওপরে নয়। একটা গলি দিয়ে সামান্য ভেতরের দিকে। পুলিশের গাড়ি হোস্টেলে ঢোকবার পরই সবাই মিলে কমনরুমে গিয়ে বসল। দ্রুত একটা বৈঠক হল। ঠিক হল, হোস্টেলের চারিদিকের যে-সব পয়েন্টে আলো নেই সেই পয়েন্টগুলোতে এখনই বাল্ব লাগাতে হবে। হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় একশো আটজন। দলে-দলে ভাগ হয়ে ছাত্ররা পাহারা দেবে। একেবারে পশ্চিমদিকের বারান্দাতে একটা পুলিশ পার্টি একজন সাব-ইনসপেক্টরের অধীনে থাকবে। দীপু-বেণু-দেবু কমনরুমে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি প্রীতিবাবুকে নিয়ে একটা কন্ট্রোলরুম তৈরি করবে। যে কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই থানায় এবং টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হবে। ছোট্ট পরামর্শসভার পর সবাই যখন কমনরুম থেকে বেরিয়ে এল তখন প্রীতিবাবু খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—দেশভাগ হবার পর বর্তমান পরিস্থিতিতে আদরপাড়া থেকে মুসলমান কসাইদের পক্ষে কি হোস্টেল আক্রমণের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব? প্রীতিবাবু নিজের দৈনন্দিন রুটিন এবং পরিচিত বিছানা বাদ দিয়ে পুরো রাতটা কমনরুমে কাটাতে চান না। খুব সূক্ষ্মভাবে একটা আলোচনার মাধ্যমে তিনি পুরো ঘটনাটাকে সহজ করে দিতে চান। কয়েকটি ছিন্ন সেকেন্ডের মধ্যে প্রীতিবাবু আশাবাদী হয়ে উঠলেন, তিনি ভাবলেন, প্রিন্সিপাল অথবা সুভাষ সেন হঠাৎ বলে উঠবেন,—ঠিক বলেছেন। অত তোড়জোড়ের কিছু নেই। আপনি বরং বাড়িতেই থাকুন। ঐ তো এখান থেকে দশহাত দূরে, বাড়তি কিছু দরকার হলে এখান থেকে আপনাকে চেঁচিয়েও ডাকা যাবে। কিন্তু প্রীতিবাবু কথাটা পাড়তেই প্রিন্সিপাল বললেন,— ইউ নেভার নো। কথাটা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার মধ্যেই প্রীতিবাবুর প্রস্তাবের সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেল। প্রীতিবাবুর দিকে বিন্দুমাত্র আর কোন মনোযোগ প্রিন্সিপাল দিলেন না। সুভাষ সেনের দিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপাল বললেন,—ইনসপেক্টার, আপনাদের কোন ভ্যান যদি পাবলিসিটির জন্য বের হয় তবে দয়া করে ব্যবস্থা করবেন যাতে একথা ঘোষণা করা হয় যে কলেজ আগামী সাতদিন বন্ধ থাকবে।

—কোন অসুবিধা হবে না স্যার। এখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই হানড্রেড ফরটি ফোর প্রোক্লেম করতে হবে। সেজন্য মাইক নিয়ে জিপ বেরোবে। প্রোক্লেম শব্দটার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে। শব্দটা ব্যবহার করে সুভাষ সেন তৃপ্তি বোধ করল।

—থ্যাঙ্ক ইউ, গুড নাইট। প্রিন্সিপাল হোস্টেলের লাগোয়া তাঁর বাড়ির পথ ধরলেন। প্রিন্সিপাল একটু দূরে যেতেই দীপু, বেণু আর দেবু সুভাষ সেনের সঙ্গে পুলিশের গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। সুভাষ সেন যেন শুধুমাত্র কথা বলার জন্যই বললেন,—প্রচণ্ড শীত করছে। গাড়ির ফ্রন্টসীটে বসতে বসতে সুভাষ আবার বললেন,—চলি ভাই।

আজকের ঘটনার এই দ্রুত পটপরিবর্তনের জন্য বেণু মনে মনে খুব খুশী হল। তা না হলে ফাংশানের শেষে গভীররাতে নিজের ডেরাতে ফিরে অন্তিম কলেজ জীবন, ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্নতাবোধে বেণুকে পাগল করে দিত। বেণু ঠিক জানে এমনি রাতে ঘরে ফেরার পর উত্তেজনাতে জ্বর এসে যেত। তারপর সারা রাত সেই জ্বরে ভাজা-ভাজা হত। কিছুই খেতে পারত না। ক্ষুধা, হতাশা,

যৌবনের খরস্রোতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা অসংখ্য স্বপ্নের মধ্যে সারারাত তাকে শূন্যে দোলাত। এইসব ফাংশানের রাতে অবচেতনভাবে বেণু ভাবে যে এই অনুষ্ঠানটা আর কোনদিন শেষ হবে না। চলবেই চলবে। এমনি সুগন্ধি তরুণীরা সেজেগুজে করিডোরে ঘুরবে, নানা ক্লাইসিস আসবে, ভিড় আর আলো, দর্শক, প্রিন্সিপাল, অধ্যাপককুল—সবাই থাকবে। ফাংশান কোনদিন শেষ হবে না। কিন্তু বেণু এটাও জানে ফাংশন শেষ হয়, ছাত্রীদের তড়িৎগতি চটিগুলোর শব্দ প্রতি-ধ্বনির মতো গেট পেরিয়ে যায়। প্রিন্সিপাল আর অধ্যাপককুল অন্তর্হিত হবেন। তারপর এই শহরে থেকেও কতদিন, কোনদিনই বুঝি সে আর কলেজে আসবে না। তবু ভালো, ফাংশানটা শেষ হতেই রায়টের আতঙ্ক সৃষ্টি হল, হোস্টেল আক্রান্ত হতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিল। বৃহৎ ঘটনাবলীর সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ রয়ে গেল। ফাংশানটারই জের টেনে ফাল্গুনের মাঝরাতে হিমে শীতে সামান্য কাঁপতে কাঁপতে অদূরে আদরপাড়ার দিকে ওরা চেয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত হবার একটা আশঙ্কা।

এত অন্ধকারেও আদরপাড়ার দু-একটা টিনের চালা, এমনি খড়ের ঘর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সারাটা বস্তিতে সামান্য একটু আলোর রেখাও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বা আক্রমণের প্রস্তুতি পুরোপুরি অন্ধকারের মধ্যেই নিচ্ছে। দীপু নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের শেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল যে অন্ধকারকে স্বাভাবিক ক্যামোফ্লেজ হিসেবে ব্যবহার করে মুসলমান কসাইরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। কসাইরা যে হোস্টেল আক্রমণ করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হোস্টেলের চিলেকোঠাতে বসে দীপু এবং দেবু পর্যবেক্ষণরত আছে। আজ রাতে এটাই তাদের ডিউটি। কোনপ্রকার অস্বাভাবিক কিছু দেখামাত্র কার্নিসের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। ইতিমধ্যেই বড় বড় বর্শা, মোটা লাঠি, টাঙ্গি, তলোয়ার জোগাড় করা হয়েছে। অস্ত্রগুলো পৃথক পৃথকভাবে চারটি গ্রুপের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। কলেজ ল্যাবরেটরি থেকে প্রচুর অ্যাসিড এনে নানাভাবে সেগুলো বিভিন্ন পাত্রে পোরা সম্পূর্ণ। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এই অ্যাসিড ছোঁড়বার জন্যই দশজন ছাত্রের একটা পুরো দল ঠিক করা আছে। আক্রমণ সামনের দিক থেকে আসবে। কিন্তু পাছে প্রাচীর টপকে কোন আক্রমণকারী অলক্ষ্যে ঢুকে না পড়তে পারে তার জন্য পেছনের প্রাচীর বরাবর ছাত্ররা প্রাচীরের ওপর বসে পাহারাতে। আঙিনার মাঝে বাকি দুটি গ্রুপ রিজার্ভ। এসব ছাড়াও প্রায় পাঁচজন সশস্ত্র পুলিশ রয়েছে। বারান্দাতে তারা বিশ্রাম করছে। শুধুমাত্র বিপদ দেখা দিলে পুলিশ আত্মপ্রকাশ করবে। দীপুর সাথে দেবু চিলেকোঠার দুটো বেঞ্চি জোড়া করে তার ওপর প্রথমে শুয়ে একটু হাত-পা টান করেছিল। কিন্তু এখন সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট জানলা দিয়ে দীপু আরও সূক্ষ্মভাবে আদরপাড়ার কসাই বস্তিটাকে লক্ষ্য করতে লাগল। দীপু ভাবতে চেষ্টা করল কসাইরা কী কী অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

প্রীতিবাবু এর মধ্যে বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে এসেছেন। সন্ধ্যাবেলার ধুতি-চাদরের বদলে এখন পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে। শৌখিন বিলিতী কম্বলে কানমাথা জড়িয়ে চিলেকোঠার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। চিলেকোঠার ভেতরে একটা জানলা আধখানা খোলা। মাঝরাতের ঠাণ্ডা বাতাস তিস্তা-বুড়ীর গা ছুঁয়ে একেবারে হু হু করে ভেতরে ঢুকছে। দীপুর কানমাথা কম্বলে জড়ানো, কিন্তু নাকে এবং ঠোঁটে তীব্র ঠাণ্ডাটা সে বেশ উপভোগ করছে। ডানহাতের তালু দিয়ে নাক ঠোঁট বেশ করে রগড়ে নিয়ে একটু ধরা গলাতে দীপু বলল,—আসুন স্যার, এখানে বসুন। প্রীতিবাবু বসতে বসতে একটু নিশ্চিন্ত আরামে বললেন,—কী হালচাল বল, ওদের ওদিকে কোন অ্যাকটিভিটি কি দেখতে পেলে?—একদম না, দীপু বাইরের দিকে তাকিয়েই জবাব দিল,—নেগেটিভ ফিল্ম আলোর সামনে ধরলে যেমন ফ্যাকাশে, ভুতুড়ে সাদা-সাদা ছায়া দেখা যায়, আদরপাড়ার বাড়িঘরগুলো

অন্ধকারে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। প্রীতিবাবু ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিলেন। বাড়িঘর ছেড়ে হোস্টেলে রাত কাটাতে প্রীতিবাবুর সেই প্রাথমিক বিরক্তিভাবটা একেবারেই নেই। সিগারেট টানতে টানতে নিজেকে বেশ হালকা লাগছে। চারিদিকে ছেলেদের কথাবার্তা, হাঁটাচলা এবং হাসি-ঠাট্টাতে প্রীতিবাবু নিজেকে বেশ রিফ্রেশড ভাবলেন।—আরে দেবুটা খুব ঘুমচ্ছে। এমনভাবে ঢাকা-ঢুকি দিয়েছে যে আমি বুঝতেই পারিনি ওটা দেবু, প্রীতিবাবুর গলাতে পুরোপুরি খোলামেলা ভাব, পিকনিকের সকালে যেমন হয় ঠিক তেমনি। প্রীতিবাবু জোড়াসন পেতে বসে বললেন, —জানলাটার একটা পাল্লা আপাতত বন্ধ করো। আধ ঘণ্টা পরপর দেখলেই হবে। ভীষণ ঠাণ্ডা আসছে। দীপু জানলা বন্ধ করে দিল।—আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের এই স্বাধীনতার কী অর্থ হয়? প্রীতিবাবুর গলা শুনে দীপু সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকাল। কারণ দীপু বুঝতে পারল যে প্রীতিবাবুর কথার মধ্যে কোন প্রাণ নেই। তাঁর চোখের দৃষ্টি জোলো, চশমার কাঁচের আড়ালে চোখটা ঝলসে উঠছে। মুখে একটা কিছু বললেও দীপু বুঝতে পারল প্রীতিস্যার সম্পূর্ণ অন্যরকম কিছু করতে চান ঘরে যার সঙ্গে তাঁর উচ্চারিত কথাগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। ইতিমধ্যে দীপু অনুভব করল কম্বলের মধ্য দিয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে প্রীতিবাবুর হাত তার কম্বলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীপুর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না যে প্রীতিবাবু কম্বলের কোন ফাঁক দিয়ে তার শরীর স্পর্শ করতে আগ্রহী। হাতখানা কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর কম্বলঢাকা হাঁটুর ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। দীপুর সঙ্গে নিজের দূরত্বটা একটু কমিয়ে আনবার জন্য প্রীতিবাবু ঘষটে ঘষটে বসা অবস্থাতেই দীপুর দিকে এগিয়ে এলেন। প্রীতিবাবুর নিশ্বাসের শব্দ ঘুমন্ত দেবুর শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ ডুবিয়ে দিল। দীপু লক্ষ্য করল প্রীতিবাবু নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছেন। প্রথম কয়েকটা মিনিট দীপু নিজের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারল না। কিন্তু একটু পরেই একটা শিরশির ভাব পায়ের মধ্যে খোঁচাতে লাগল। এর ফলে দীপুর সারা শরীরে একটা সঙ্কোচনের সৃষ্টি হল। শীতের শেষবেলাতে কাটা ঘায়ে যেমন টানভাব লাগে ঠিক তেমনি লাগতে লাগল। এইরকম অনুভূতির মধ্যেই দীপু সিদ্ধান্ত নিল যে সম্মুখের জানলাটা খুলে দেওয়া উচিত। দেবু উঠে দাঁড়িয়ে জানলাটা খুলে দিল। দু-তিন ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এতক্ষণ বুঝি পাল্লাতে ওত পেতে ছিল, খুলতেই হুমড়ি খেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নাকে ঠোঁটে ঠাণ্ডা বাতাসের চিমটি খেয়ে শরীরের ধরা ভাবটা কেটে গেল। ঠিক এ সময়েই বিভাবরীর মুখখানা দীপুর চোখের সামনে ভেসে উঠল, বিভাবরীর মুখের আদল এবং ঠাণ্ডা বাতাসের অনুভূতি একটা স্পষ্ট বিন্দুতে মিলে গেল। দীপু জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারল যে প্রীতিবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

হোস্টেল আর আদরপাড়ার মাঝখানে একখণ্ড পোড়ো জমি আছে। এত অন্ধকারেও সেখানে সলক-সলক লাগে। থোকা-থোকা জোনাকি, মাঠটা মহাশূন্যে। জোনাকির অবিরত উল্কাপাতে প্রলয় আসন্ন মনে হয়। সমতল থেকে উড্ডীন হয়ে অন্ধকার একটা ঘনত্বের সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ বেণুর চিন্তার এই কসমিক বাতাবরণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। বেণু পরিষ্কার দেখল অনেকগুলো ছায়া-মূর্তি মাঠের মাঝখানে। পশ্চিমদিকে একটা অবজারভেশন পোস্ট থেকে সেই পোড়ো জমিটার মাঝখানে অনেকগুলো ছায়ামূর্তির উপস্থিতি সম্পর্কে বেণুর কোন সন্দেহ রইল না। যদিও বেণুর বারবার একটা বিভ্রান্তি ঘটতে লাগল,—একবার তার মনে হল আদরপাড়া থেকে ছায়ামূর্তিগুলো হোস্টেলের দিকে এগিয়ে আসছে, আবার তার পর মুহূর্তেই বেণু পরিষ্কার দেখতে পেল যে ছায়া-গুলো হোস্টেলের দিক থেকেই আদরপাড়ার দিকে যাচ্ছে। তবে কি ঐ ছায়ারা একবার হোস্টেল থেকে আদরপাড়ার দিকে যাচ্ছে এবং পরমুহূর্তেই গতি পরিবর্তন করে হোস্টেলের দিকে ফিরে আসছে? এই পর্যন্ত ভাববার পর বেণু বুঝতে চেষ্টা করল, তা হলে ঐ ছায়ামূর্তিগুলোর উদ্দেশ্য কী?

এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অন্ধকারে ঐ মাঠের মধ্যে ছায়ামূর্তিগুলি একদল আততায়ী ছাড়া আর কেউ নয়, কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কী? ওদের আক্রমণের লক্ষ্য হোস্টেল অথবা আদরপাড়া? আদর-পাড়া এবং হোস্টেল উভয়ত নয় তো? কয়েকটি ভগ্ন মুহূর্তের মধ্যে বেণু বুঝতে পারল না সে কী দেখছে। কিন্তু ততক্ষণে একটা হুইসিল তীক্ষ্মভাবে বেজে উঠল। সেই হুইসিলের শব্দ আড়া-আড়িভাবে অন্ধকারকে চিরে দিল, বড় আয়নার গায়ে ফাটা দাগের মতো দেখতে হল। হোস্টেলের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উঠল। সমবেত একটা চিৎকার শোনা গেল ; শাঁখ বাজল, তারপর অনেক-গুলো ছোটাছুটি। পায়ের শব্দে তোলপাড়। কে কোথায় যাচ্ছে জানে না। দেবু ঘুম থেকে উঠেই দৌড়ে নীচে নামল, পেছনে দীপু। বেণু ততক্ষণে প্রচণ্ড চিৎকার করে এলোপাথারি বন্দেমাতরম থামাল। হোস্টেলের বারান্দাতে পুলিশ পার্টিকে হুঁশিয়ার করে দিল। দেবু, বেণু এবং দীপু তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। অহেতুক ত্রাস, ছুটোছুটি, চিৎকারের পর একটা স্থায়ী শৃঙ্খলা ফিরে এল হোস্টেলে। কিন্তু ততক্ষণে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল আদরপাড়াতে, সেই আগুনের আলোতে হোস্টেলের ভিতর, বাহির, বারান্দা সলক হয়ে গেল। সেই পোড়ো মাঠের নীহারিকাতুল্য ধূসরতা এবং ধাবমান জোনাকির স্ফুলিঙ্গ বিরাট আগুনের শিখাতে লুপ্ত হল। প্রচণ্ড চিৎকার শোনা যাচ্ছে। আল্লা হো আকবর, পরপর তিনবার। তারপর ধাতব পদার্থের সংঘর্ষজনিত শব্দ, আবার আল্লা হো আকবর। নারীকণ্ঠের সমবেত আর্তনাদ ফেউ-এর ডাকের মতো মধ্যরজনীর সোনার অঙ্গ থেকে বস্ত্রহরণ করল। নগ্ন এবং ক্রুদ্ধ আগুন আকাশ রাঙাচ্ছে, নিচে কন্ট্রোলরুমে ফোন বেজে চলল। থামল। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। চিলেকোঠাতে দাঁড়িয়ে দেবু-দীপু-বেণু সেই আগুনের উত্তাপে একটু আরাম বোধ করল। সেই আরাম উপভোগ করার জন্য যুবকেরা নিজেদের নিজেরাই ঘৃণা করতে শুরু করল। তবু ভীষণ আরাম লাগছে।

আগুন অদ্ভুতভাবে একটা পরিকল্পনামতো ছড়াতে শুরু করল। উত্তরের বাতাস ফুঁ দিয়ে আগুনটা উসকে দিল। ঝাউগাছের মতো মোচাকৃতি হয়ে আগুনটা গগনমুখী। বাতাস তীব্র। পেত্নীর নিশ্বাসে একটা ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হল, অনেকগুলো কুম্ভীপাকের মধ্যে কাগজ, ন্যাকড়া আর ধুলো উড়তে লাগল। কড়িবরগা থেকে চালের টিনগুলো ছুটে ছুটে নীচে পড়ছে। ঠিক এইরকম সময়ে বাতাসটা এলোমেলো হয়ে উঠল। ঘন ঘন দিক্‌পরিবর্তনের মধ্যে আগুনটা অনেক-গুলো সরু সরু শিখাতে লকলকিয়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই আবার একটা অখণ্ড বিরাট আগুনে পরিণত হল। আগুনের ফুলকিগুলো নানা দিকে ছুটছে। পর পর অনেকগুলো বাঁশ ফাটার শব্দ। আগুনের সোঁ সোঁ শব্দ একটা সময় তীব্র হল, একটা চালাঘর ভূমিশয্যা নিল। ছাগল আর পাঁঠা-গুলো একসঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার করছে। শব্দের এতো বিভ্রান্তির মধ্যেও একটা গোরুর হাম্বারব অন্য সব কোলাহলকে হঠাৎ চেপে দিল। দক্ষিণ থেকে পুবে এবং তারপর উত্তরে আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর একটা গোলাকার আগুনের রিংএর মধ্যে আদরপাড়া জ্বলতে লাগল।

সেই সময় প্রথম আক্রমণকারীরা বুঝতে পারল আগুনের গোলকধাঁধাতে ওরা আটকে গেছে। আক্রমণকারীরা কুড়িজন, বোঝা যায় তাদের বয়স অল্প। প্রায় সকলের মাথাতেই একই ধরনের মাঙ্কিক্যাপ। তার উপর রুমাল দিয়ে মুখ বাঁধা। এই প্রচণ্ড আলোতে রুমালগুলো ভীষণ ধবধবে ফর্সা লাগছিল। রুমালগুলো আনকোরা নতুন। লুঠ করার পর দোকান থেকেই একদল মাঙ্কিক্যাপ আর মুখে রুমাল বেঁধে সোজা এখানে এসেছে। নাকের ওপর বাঁধা ফটফটে সাদা রুমাল ও মাঙ্কি-ক্যাপ কানের ওপর দিকে একটা জায়গাতে মিলে গেছে।

ফায়ার ব্রিগেড এবং পুলিশ একই সঙ্গে এল। ফায়ার ব্রিগেড সোজা ঘটনাস্থলে চলে গেল। পুলিশের গাড়িটা ওদের অনুসরণ করল। একটু পরেই একটা জীপগাড়ি দারুণ স্পিডে ঘটনা-

স্থলের দিকে গেল। আগুন তখন কমে এসেছে। ফায়ার ব্রিগেডের ইঞ্জিনের শব্দ। প্রবলবেগে জলের ধারা আগুনের মধ্যে পড়তেই হুসহুস শব্দ করে চারিদিক ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সোঁদা-সোঁদা পোড়ো গন্ধে বাতাস ভারি। অনেকগুলো টর্চ জ্বলছে আর নিভছে। পেঁয়াজ রসুন সম্ভার দিয়ে খুব কড়া করে রান্না করলে যেমন গন্ধ বের হয়, তেমনি একটা ঘ্রাণের হলকা। বাড়িতে কোন একটা গাছ কাটলে কাটা গাছের গোড়া থেকে সদ্য-সদ্য একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি সুবাস বাতাসে। রবারপোড়া গন্ধ দপদপ করে ঘুরছে। একটা সাদা অ্যাম্বুলেন্স এল। জীপগাড়িটা মুখ ঘোরাচ্ছিল সুতরাং হেডলাইটের আলোতে ফুটফুটে অ্যাম্বুলেন্সটাকে আরও সাদা দেখাল। তীব্রগতিতে জীপ-খানা হোস্টেলের দিকে এগিয়ে আসতেই অ্যাম্বুলেন্সখানা অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা পড়ল। হোস্টেলের গেটের সামনে জীপখানা এসে থামল। গেটে তালা দেওয়া। কিন্তু রামপিরীত গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একগোছা চাবি। ড্রাইভারের সিটের পাশে পুলিশের পোশাকপরা একজন অফিসার হাত নেড়ে বারবার গেটটা খুলতে বলল। কিন্তু রামপিরীত কোন পাত্তা দিল না। সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। জীপগাড়িটার পেছন থেকে একজন অফিসার লাফ দিয়ে নামল। বোঝা গেল পেছনের সিটের থেকে যে অফিসারটি নামল পদমর্যাদাতে সে সামনের সিটে বসা অফিসার অপেক্ষা ছোট। গেটের আলোর দিকে এগুতে এগুতে ডানদিকে ঘাড় ফিরিয়ে অফিসারটি লক্ষ্য করল সাদা অ্যাম্বুলেন্সটা ফিরে যাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গি এবং তাকানোর ধরন দেখে মনে হয় হোস্টেলের গেটের সামনাসামনি এসে রামপিরীতের মুখোমুখি হতে অফিসারটি আরও একটু সময় নিতে চায়। সুভাষ সেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে খুব সহজভাবে বললেন,—গেটটা খুলে দাও, পুলিশ সাহেব ভেতরে যাবেন। রামপিরীত সেলাম দিল, তারপর খুব ভদ্রভাবে বলল, --হুজুর, আপনারা অপেক্ষা করুন। প্রিন্সিপাল সাহেবকে ফোন করতে হবে। তাঁর আদেশ ছাড়া গেট খোলার হুকুম নেই। সুভাষ খুব সহজভাবে বলল,--তাড়াতাড়ি ফোন করো ভাই। সুভাষের কথা শেষ হতেই পুলিশ সাহেব নেমে এল,—কী ব্যাপার? এরা দরজা খুলছে না কেন? এস পি সাহেবের কথার ভাবে মনে হয় গেট না খোলার জন্য সুভাষই দায়ী। পুলিশ সাহেবের মুখ বিরক্তিতে কোঁচকানো। সুভাষ বিনীতভাবে বলল,--স্যার, এই আগুনটাগুন দেখে ওরা গেট বন্ধ করে দিয়েছে। প্রিন্সিপালকে ফোন করতে গেছে। এখনই গেট খুলে দেবে। এস পি সাহেবের মুখে কোঁচকানো ভাবটা গম্ভীর হল। বারান্দাওয়ালা টুপি পরে থাকায় পুলিশ সাহেবের ঠোঁটের ওপর থেকে কপালের সামান্য খোলা অংশ পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে ছায়াচ্ছন্ন। বিরক্তির জন্য মাংসপেশীর সঙ্কোচন হয়েছে ঠোঁটের দুপাশে। তারই প্রতিক্রিয়াতে সাহেবের নাকের দুই দিক, দুই গাল, চোখের দৃষ্টি বিভিন্ন রেখাতে একই সঙ্গে সংকুচিত এবং বিস্তৃত। মনে হয় সদ্য সদ্য প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে ভদ্রলোকের মুখটা গড়া হয়েছে,—এখনও শুকোয়নি। টুপিটা পেছনে ঠেলে দিলেও মুখের সেই ভঙ্গিটা একই রকম রইল। টুপিটা পেছনে ঠেলে দেবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। কারণ টুপিটা আঁটোসাঁটো হয়ে যেমন ছিল তেমনি থাকলে শীত কম লাগত। কিন্তু পুলিশ সাহেব ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন যে হোস্টেলের ছেলেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এতগুলো ছেলে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে গেটের ওপার থেকে তাতে কোন একটা দৈহিক অ্যাকশন নেওয়ার প্রয়োজন অবচেতনভাবে সাহেব উপলব্ধি করল। এই প্রতিক্রিয়াতে তাড়িত হয়েই টুপিটা পেছন দিকে ঠেলে দিল। গাল চুলকানো, নাক ঘসা, চোখ মুখ রুমাল দিয়ে মুছেও পরিপূরক ভঙ্গি গ্রহণ করা যেত। কিন্তু টুপিটাকে পেছন দিকে ঠেলে দেওয়াটাই এস পি সাহেবের কাছে সহজ মনে হল। এরপর ডানপাটার ওপর দেহের ভারসাম্য রেখে বাঁপাটা আলগা করে দিল। সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকে পড়লেই রান রেসের আগে রেডির ভঙ্গিটা স্পষ্ট হয়ে উঠত।

প্রিন্সিপাল খুব তাড়াতাড়ি চলে এলেন। এতো তাড়াহুড়োতে চুল আঁচড়াতে ভুলে গেছেন। প্রশস্ত টাকের চারপাশে পাকা চুলগুলো এলোমেলো। পরনে কালো সার্জের ট্রাউজার, গায়ে সাদা ধবধবে পুরোহাতা সোয়েটার। গলাতে আবার একটা মাফলার জড়ানো। শেক্সপীয়রের নাটকের দুপুর রাতের কোন কোর্ট সিনে ডিউকের মতো লাগছে। বিজলিবাতির বদলে পুরনো ধরনের কতকগুলি লণ্ঠন প্রহরীদের হাতে দিলে ভালো হত। রীতিবিপরীত গেট খুলে দেবার পর প্রিন্সিপালই বাইরে গেলেন। কিন্তু পুলিশদের ভেতরে আসবার আমন্ত্রণ করলেন না। প্রিন্সিপাল রাস্তাতে এসেই সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—কী ব্যাপার? পুলিশ সাহেব কোনপ্রকার সৌজন্যসূচক হাসি হাসল না। আক্রমণাত্মক একটু শ্লেষের সঙ্গে বলল,—আমাদের আপনারা অনেকক্ষণ আটকে রেখেছেন। প্রিন্সিপাল প্রতি-আক্রমণ করলেন না। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের পুলিশ সাহেব নামে যুবকটির মুখের দিকে খুব সোজাসুজি তাকালেন। লম্বা, তীক্ষ্ম সুদর্শন যুবকটিকে হয়তো অন্য কোন সময়ে দেখলে ভালো লাগত, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে যুবকটির মুখভঙ্গির মধ্যে বড় বেশী দম্ভ ফুটে উঠেছে। প্রিন্সিপাল এক লহমাতে ভেবে নিলেন যে এই তরুণ রাজপুরুষটি নিজেকে বোধহয় টিমুর মনে করে। প্রিন্সিপাল মারলোর নাটক এবং টিমুরের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের মধ্যে গভীরভাবে লিপ্ত হলেন না। খুব সুন্দর মিষ্টি করে বললেন,—আদরপাড়াতে আগুন দেখে গেট বন্ধ রাখতে বলেছিলাম। আই অ্যাম রিয়ালি সরি। বাট হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ।—আই ওয়ান্ট টু সার্চ দি হোস্টেল। পুলিশ সাহেবের ইংরেজী অ্যাকসেন্ট শুনে প্রিন্সিপাল খুশী হলেন। খুব হাল্কা ও নরমভাবে আবার বললেন,—হোস্টেল কেন সার্চ করবেন বুঝতে পারছি না।—আই হ্যাভ রিজনস টু বিলিভ দ্যাট আরসন অ্যান্ড মার্ডার হ্যাজ বিন কমিটেড বাই হোস্টেল বয়েজ ওনলি। তাছাড়া, আপনাদের কলেজের জীবনগতি সমস্ত শহরে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। আমাদের ধারণা তাকেও এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এতক্ষণ পর দুপায়ের ওপর নিজের দেহের ভারসাম্য সমান-ভাবে বণ্টন করে এস পি সাহেব সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু প্রিন্সিপাল আরও একবার সম্মুখ সমর এড়িয়ে গেলেন।—আদরপাড়াতে কি মার্ডার হয়েছে?—হ্যাঁ, অন্যসব লোকজন ভেগে গেছে, আমরা শুধুমাত্র দুটো ডেডবডি পেয়েছি। সুভাষ সেন এবার জবাব দিল। প্রিন্সিপাল একই টোনে বললেন, —আমার ছেলেরা হোস্টেল ছেড়ে এক-পা বের হয়নি। আপনার ইনসপেক্টর এই সুভাষবাবুই একটু আগে সব ব্যবস্থা করে গেছেন। তাছাড়া হোস্টেলের মধ্যেও পুলিশ এসকর্ট ছিল। জীবনগতি এখানে নেই, সে অপরাধ করে থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

—কিন্তু হোস্টেল আমাদের সার্চ করতেই হবে—, পুলিশ সাহেব কথাটা শেষ করতে পারল না। অনেকগুলো আগুনের শিখাতে তখন পুব, পশ্চিম আর দক্ষিণের আকাশ লাল হয়ে গেছে। ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা অবিরাম বেজে চলেছে। কোন সময় মনে হচ্ছে ঘণ্টাগুলো ছুটছে। একটু পরেই মনে হল ঘণ্টা একটা জায়গাতে দাঁড়িয়েই বেজে যাচ্ছে। ঘণ্টার শব্দগুলো অসংখ্য পাথুরে ঢিলের মতো রাতের গভীরে পড়তে লাগল। মুহূর্তগুলো কেমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।—কিন্তু হোস্টেল খানাতল্লাসি করতেই হবে, পুলিশ সাহেব ব্যস্ততা দেখালেন,—আমরা আর দেরি করতে পারব না, কথা শেষ করে পুলিশ সাহেব গেটের দিকে এগুলেন। ফায়ার ব্রিগেডের ছুটন্ত ঘণ্টা খুব দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, শোনা যায় কি যায় না, আবার কাছে, গুলির আওয়াজ, অনেক মানুষের চিৎকার।

—আপনার কাছে কি সার্চ ওয়ারেন্ট আছে? প্রিন্সিপাল সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন। —না, পুলিশ সাহেব জবাব দিলেন, কিন্তু এইরকম পাবলিক ডিসটারবেন্সের সময় আমরা আইনের অত ডিটেলসে না গিয়েও সার্চ করতে পারি।

—তবে আমাদের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ডি সি-কে একবার কী করণীয় জিজ্ঞাসা

করতে চাই, প্রিন্সিপাল প্রস্তাব দিলেন এবং এস পি রাজি হল। ডি সি সাহেবের অনুমতি অনুসারেই যখন খানাতল্লাসি শেষ হল তখন রাত আড়াইটে। আত্মরক্ষার জন্য জোগাড় করা অ্যাসিড বাল্ব, অস্ত্রশস্ত্র এবং লাঠিসোটা কয়েকটা ঘর থেকে আবিষ্কৃত হল। ততক্ষণে বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ হোস্টেল ঘিরে ফেলেছে। রাত সোয়া তিনটাতে তিনজন পুলিশ অফিসার তিনটি লরি নিয়ে হাজির। হোটেলের সব ছেলেরাই গ্রেপ্তার হল। যে অবস্থাতে যে ছিল সেইভাবে ট্রাকে উঠল। অসহায় প্রিন্সিপাল এগিয়ে এসে বললেন,—আমাকেও নিয়ে চলুন। পুলিশ অফিসারটি হেসে বললেন,—স্যার, তাই কি হয়? আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের কোন হুকুম নেই। এরপর অফিসারটি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল,—এসব তামাসা স্যার, সব সুভাষ সেনের তামাসা। ও দেখাতে চায় রায়ট থামাবার জন্য ও কোনপ্রকার বাছবিচার না করে কঠোরতম ব্যবস্থা নিয়েছে। সুভাষ সেন কলকাতার খুব প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতিনিধি। পুলিশের চাকরি ছাড়াও সমস্ত উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তার একটা গোপন কমিটমেন্ট আছে। এটাও একটা বিরাট রাজনীতি। প্রিন্সিপাল মাথা নীচু করে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রীতিবাবু কই, প্রীতিবাবু? রামপিরীত জবাবে বলল,—প্রীতিবাবুর বাড়িতে মাইজি আগুন দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ওঁর অবস্থা খারাপ। ট্রাকগুলো স্টার্ট দিল। ইঞ্জিনের আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়ে ছেলেরা গান গেয়ে উঠল। খুব কাছাকাছি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির ঘণ্টার শব্দে সমবেত কণ্ঠের গান চাপা পড়ল। প্রিন্সিপাল আলোজ্বালা নিশুতিতে ভরা হোস্টেলের গেটের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

[ক্রমশ]

প্রয়োজন, ইচ্ছা ও উপায়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমরা যখন নেহাত ছেলেমানুষ ছিলুম, তখনই এই ইংরেজী লোকবাক্যটিকে আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, নেসেসিটি ইজ দি মাদার অব ইনভেনশন। ট্রানস্লেশন-বইয়ে ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাটাও দেওয়া ছিল। 'প্রয়োজনই হয় উদ্‌ভাবনার জননী'। গাঁয়ের ইশকুলের মাস্টার-মশাই বলেছিলেন, কথাটা মিথ্যে নয়, তবে তর্জমাটা কদর্য। পরে বুঝতে পারি, শুধুই কদর্য নয়, অন্যাবশ্যক বটে। বিশেষত, প্রায় তুল্যমূল্য আর একটি ইংরেজী লোকবাক্যের (হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে) অতি চমৎকার একটি বঙ্গজ সংস্করণ যখন রয়েইছে, তখন—প্রয়োজনের সঙ্গে উদ্‌ভাবনার সম্পর্কটাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেও—সেটাকেই এক্ষেত্রে কাজে লাগানো চলত। বলা যেত, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। তাতে যে অর্থের খুব-একটা হেরফের হত, এমন মনে হয় না।

কিন্তু সে-কথা থাক। আসল কথা হচ্ছে এই যে, প্রয়োজনই বলি আর ইচ্ছাই বলি, সেটা একটু জোরালো ধাঁচের হওয়া চাই। পূর্বে-উদ্ধৃত লোকবাক্যে যাঁরা বিশ্বাস রাখেন, তাঁরাও নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, প্রয়োজন যতক্ষণ না প্রবল হয়ে দেখা দেয়, কিংবা ইচ্ছা না হয় ঐকান্তিক, ততক্ষণ তার পূরণের পথ কিংবা উপায় উদ্‌ভাবিত হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, যাঁর খেজুর খাবার প্রয়োজন অত্যন্ত প্রবল ও ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, তিনি (খেজুর যদি না দোকানে লভ্য হয়, তাহলে) তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য খেজুরগাছে উঠবার কৌশল শিক্ষা করবেন, কিংবা (কষ্টকর সেই শিক্ষাকে যদি তিনি এড়িয়ে যেতে চান, তাহলে) এমন লোকের সাহায্য গ্রহণ করবেন, যে খেজুরগাছে উঠতে জানে, কিংবা (তেমন লোকের সন্ধান যদি না-মেলে, তাহলে) একটি মই সংগ্রহ করবেন, কিংবা (মইও যদি সংগ্রহ করা না-যায়, তাহলে) নিজেই একটি মই বানিয়ে নেবেন। এর কোনওটিই না-করে তিনি যদি স্রেফ খেজুরতলায় শয্যা পেতে চিত হয়ে শুয়ে থাকেন, এবং আশা করতে থাকেন যে, জোরে হাওয়া বইলেই বৃন্তচ্যুত খেজুর অমনি তাঁর মুখের মধ্যে খসে পড়বে, তাহলে—তাঁর এই নিরুদ্যম ভূমিকা দেখে—মাত্র একটি সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছতে পারি। সেটা এই যে, তিনি খেজুর খেতে ইচ্ছুক অবশ্যই, কিন্তু প্রয়োজন বিশেষ প্রবল নয় বলেই তাঁর ইচ্ছাও বিশেষ বলবতী নয়, ফলত তাঁর ইচ্ছাপূরণের কোনও উপায় এক্ষেত্রে উদ্‌ভাবিত হল না।

উপায়-উদ্‌ভাবনা বস্তুত প্রয়োজন ও ইচ্ছার সূত্র ধরেই আসে। আমরা জানি যে, খাদ্য যখন মজুত করা যেত না, মানুষকে তখন রোজকার খাদ্য রোজ সংগ্রহ করতে হত। বন্য যে-কোনও জন্তুর দিন যে-ভাবে কাটে, মানুষের দিনও তখন সেইভাবেই কাটত; উদয়াস্ত তাকে ব্যস্ত থাকতে হত উদরপূর্তির ধান্ধায়। সময়ের এই যে বিপুল অপচয়, আমরা ধরেই নিতে পারি যে, এর থেকে সে—অন্যবিধ কর্মে নিরত হবার প্রয়োজনে—মুক্তি পেতে চেয়েছিল, এবং মুক্তিলাভের সেই ইচ্ছা দিনে-দিনে অত্যন্ত বলবতী হয়ে উঠেছিল। সভ্যতার উন্মেষ ও অগ্রগতিকে যাঁরা কার্যকারণের সূত্রে গেঁথে বিচার করতে চান, অন্তত তাঁরা নিশ্চয় বলবেন যে, তা যদি না হত, মনুষ্যজীবনে কৃষিকর্মের প্রসার তাহলে দ্রুত ঘটত না। কৃষিকর্মের সূচনা যে ঠিক কবে কোথায় কীভাবে হয়েছিল, সে-বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলবার উপায় নেই। হয়তো নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এর সূচনা। তবু এই মৌল সত্যের তাতে খণ্ডন হয় না যে, প্রবল প্রয়োজনের দ্বারা তাড়িত হয়েই মানুষ সেদিন সেই আকস্মিকতার ফসলকে আঁকড়ে ধরে। নইলে, কিছু মানুষ কৃষিকর্ম অবলম্বন করলেও, অধিকাংশ

মানুষ তাদের পূর্ব-বৃত্তিতেই অটল থাকত, বিভিন্ন ভূখণ্ডে মানবজীবন এত দ্রুত ও এত ব্যাপক-ভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে উঠত না। বলা বাহুল্য, নিতান্ত-উদরপূর্তির ধান্ধা থেকে মুক্ত হবার যে প্রয়োজন সেদিন মানবজীবনে অনুভূত হয়েছিল, কৃষিকর্ম সেই প্রয়োজন অনেকটাই মেটাতে পেরেছে। বছরের কিছুটা সময় চাষবাসে লাগালে, বাকী সময়টা তার উদরপূর্তির ভাবনা থাকে না। সেই উদ্বৃত্ত সময়টা সে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে পারে। কিংবা অন্য কাজে লাগাতে পারে। সে ছবি আঁকতে পারে, স্তোত্র রচনা করতে পারে, গান গাইতে পারে।

প্রয়োজনের তাগিদে যে-মানুষ সময়ের সাশ্রয় করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, তারই উদ্‌ভাবিত কৃষিনির্ভর জীবনবিন্যাস তারই ইচ্ছাপূরণের উপায় হয়ে দেখা দিয়েছে। মানবসভ্যতার ক্রমিক অগ্র-গতির দিকে তাকালে প্রয়োজন ইচ্ছা ও উপায়ের এই অঙ্গাঙ্গ সম্পর্কটাই খুব স্পষ্ট হয়ে আমাদের চোখে পড়ে। আমরা বুঝে নিতে পারি যে, গতিবেগ বাড়াবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে চাকা উদ্‌ভাবিত হত না। আমরা অনুমান করতে পারি যে, জাহাজ উদ্‌ভাবিত হবার আগে সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ও সেই প্রয়োজন মেটাবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়ে উঠেছিল।

লিখিত ইতিহাস ও প্রমাণপঞ্জী যেক্ষেত্রে লভ্য, সেক্ষেত্রে অবশ্য অনুমান অথবা কল্পনা করবারও কোনও দরকার হয় না। ইতিহাস ঘেঁটেই আমরা বলে দিতে পারি যে, কোন্ প্রয়োজনের তাড়নায় আমরা ভূর্জপত্র বর্জন করে কাগজ কিংবা লিপিকরদের বর্জন করে মুদ্রণযন্ত্র বানিয়ে নিয়েছি। মিলানের শাসনকর্তার প্রয়োজন হয়েছিল এমন একটি ব্যবস্থার, রণক্ষেত্রে তাঁর সৈন্যদল যাতে নিজেরা সুরক্ষিত থেকে শত্রুপক্ষের উপরে আঘাত হানতে পারে। প্রয়োজন মেটাবার ইচ্ছায় সেকালের শ্রেষ্ঠ মনীষা লেওনার্দো দা ভিঞ্চিকে তিনি কাজে লাগিয়ে দেন। ইচ্ছাপূরণের উপায় উদ্‌ভাবিত হতে অতঃপর দেরি হয়নি। পঞ্চদশ শতকে (১৪৮৪) দা ভিঞ্চি তাঁকে যে 'চলমান দুর্গ' বানিয়ে দেন, সেটা আধুনিককালের ট্যাঙ্কেরই অন্যতম আদি-সংস্করণ। এই একই পথে, অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন ও প্রয়োজননিবৃত্তির ইচ্ছার সূত্র ধরে, এসেছিল প্রথম সেলাইকল স্পিনিং জেনি আর জেম্‌স ওয়াটের স্টীম এঞ্জিন। এসেছে হাওয়াগাড়ি আর উড়োজাহাজ। এসেছে বিজলি-বাতি, বিজলি-পাখা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন। এসেছে এমন আরও হরেক রকমের জিনিস, আমাদের প্রয়োজন না-ঘটলে ও প্রয়োজন মেটাবার ইচ্ছা না-থাকলে যাদের উদ্‌ভাবনা এত দ্রুত ঘটত না, এবং যা উদ্‌ভাবিত হবার ফলে আমাদের জীবন নিশ্চয় আগের তুলনায় অনেক সহজ ও স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে। প্রতিটি উদ্‌ভাবনা সম্পর্কেই যে এ-কথা সত্য, তা অবশ্য নয়। সে-কথায় পরে আসা যাবে। ইতিমধ্যে যেটা স্বীকার্য, তা এই যে, প্রয়োজন সত্যিই উদ্‌ভাবনার কাজটাকে উশকে দেয়।

২

প্রয়োজন ও উদ্‌ভাবনার সম্পর্ক নিয়ে আর কোনও কথা বলবার আগে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। জানা দরকার, প্রয়োজন কাকে বলে। নানাজনে এই প্রশ্নের নানা উত্তর দেবেন। যে-উত্তর নিয়ে তর্ক ও মতদ্বৈধের আশঙ্কা সবচেয়ে কম, সেটা এই যে, যার বিহনে আমরা অসুবিধা বোধ করি ও সেই অসুবিধার অবসান-অর্জনার্থে যা পাবার জন্য আমরা উৎসুক হই, তা-ই আমাদের প্রয়োজন। এই উত্তরটা যদি মেনে নিই, তাহলে দেখা যাবে, অধিকাংশ প্রয়োজনই সার্বদেশিক সার্ব-কালিক অথবা সার্বজনিক নয়। দেশকালপাত্রভেদে প্রয়োজনেরও ভেদ ঘটে যায়। এক দেশে যার প্রয়োজন হয়, অন্য দেশেও যে তার প্রয়োজন হবে, এমন কোনও কথা নেই। এককালে যা প্রয়োজনীয় বস্তু, অন্য কালে তা প্রয়োজনীয় বলে গণ্য না-ও হতে পারে। একজনের যেটা চাই-ই, অন্যজনের

সেটা না-হলেও কোনো অসুবিধে হয় না।

উদাহরণ দেওয়া যাক। যিনি শীতপ্রধান দেশে—ধরা যাক ইংল্যান্ডে—বাস করেন, শীতবস্ত্রের বিহনে তাঁর অসুবিধে হবেই, এবং শীতবস্ত্র সংগ্রহের জন্য তিনি উৎসুক হবেনই। আবার সেই একই মানুষ যখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—ধরা যাক মধ্য আফ্রিকার কোন এলাকায়—আসেন, তখন শীত-বস্ত্র না-থাকলে তাঁর কোনও অসুবিধে হয় না, এবং তা সংগ্রহ করবার জন্য তিনি উৎসুকও হন না। সেই বিচারে শীতপ্রধান দেশে শীতবস্ত্র যদিও প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পড়ে না। কালের কথায় বলা যেতে পারে, পালকি ও অশ্বের বিহনে ক্লাইভের আমলের কলকাতার লোকেরা অসুবিধে বোধ করতেন ও এই দুটি যান-বাহন সংগ্রহ করতে উৎসুক হতেন। অর্থাৎ সেই আমলের কলকাতায় পালকি ও অশ্ব প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ত। এ-কালের কলকাতায় সেক্ষেত্রে পালকি অথবা অশ্ব ছাড়াই শহরের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো অব্দি অক্লেশে চলে যাওয়া যায়। ফলত, পালকি ও অশ্বের বিহনে এ-কালের কলকাতার লোকেরা কিছুমাত্র অসুবিধে বোধ করেন না এবং পালকি ও অশ্ব সংগ্রহের জন্য উৎসুকও হন না। অর্থাৎ সেকালে যদিও পালকি ও অশ্ব প্রয়োজনীয় যান-বাহন বলে গণ্য হত, একালে হয় না। পাত্রভেদেও এই একই ব্যাপার। রাম অসুস্থ, তার ওষুধ খাবার দরকার আছে; শ্যাম অসুস্থ নয়, তার ওষুধ খাবার দরকার নেই। ওষুধ জিনিসটা রামের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, কিন্তু শ্যামের ক্ষেত্রে নয়। যদু একজন ছা-পোষা গেরস্ত লোক, বেবিফুড জোগাড় করতে না-পারলে তাঁর অসুবিধে ঘটে। মধু সেক্ষেত্রে ঝাড়া-হাত-পা সন্ন্যাসী, তাঁর কাচ্চাবাচ্চা নেই, সুতরাং বাজারে বেবিফুড থাকল কি না-থাকল তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথাও নেই। অর্থাৎ যদুর ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজনীয় পণ্য, মধুর ক্ষেত্রে সেটা নয়।

কিছু-কিছু জিনিস কিন্তু সর্বদেশে সর্বকালে সর্বজনের পক্ষে প্রয়োজন। যেমন জল, যেমন হাওয়া, যেমন খাদ্য। এই তিনের ব্যতিরেকে জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়; মনুষ্যজীবনের এগুলি ন্যূনতম চাহিদা। এই তালিকাকে আর ছাঁটাই করবার উপায় নেই।

কিন্তু, অন্যদিকে, একে বাড়াবার উপায় আছে অসংখ্য। সত্যি বলতে কী, মানবসভ্যতার অগ্রগতির যে ইতিহাস, এক হিসেবে সেটা এই তালিকাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যাবারই ইতিহাস। শুধু তা-ই নয়, কোন্ দেশ এই চাহিদার ফর্দকে কতটা লম্বা করতে পেরেছে, এবং সেখানকার জনসমাজের শতকরা কতজনের কতসংখ্যক চাহিদা মেটাতে পেরেছে, তারই নিরিখে আমরা নির্ধারণ করতে অভ্যস্ত হয়েছি যে, সেই দেশ কতটা সভ্য অথবা প্রগত। তা নইলে, কোনও দেশের সভ্যতা কিংবা প্রগতির পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা নিশ্চয় হিসেব কষতে বসতুম না যে, সেখানকার জনসংখ্যার কত-শতাংশ মোটরগাড়ির মালিক, কিংবা শতকরা কতজনের বাড়িতে ফ্রিজ আর টি ভি আছে।

বলা বাহুল্য, একটু আগেই যে ন্যূনতম চাহিদার উল্লেখ করেছি, সেগুলি মিটবার ঠিক পরে-পরেই যে মোটর-ফ্রিজ-টি ভি-র চাহিদা দেখা দিচ্ছে, তা নয়। মাঝখানে থাকছে আরও অসংখ্য প্রয়োজন। যার খাদ্যের প্রয়োজন মিটছে, সে চাইছে মাথা গুঁজবার ঠাঁই। যার মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিলছে, তার দরকার হচ্ছে লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র। এবং তারই সঙ্গে দেখা দিচ্ছে শিক্ষা-চিকিৎসা-কর্মসংস্থানের চাহিদা। আদি-মানবের ন্যূনতম প্রয়োজন নিশ্চয় জল হাওয়া আর খাদ্য পেলেই মিটত। কিন্তু সভ্য মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন—যদি না তিনি সন্ন্যাসী হন, তবে—শুধু ওইটুকুতেই মেটে না। যেমন জল, হাওয়া ও খাদ্য, তেমনি আশ্রয়, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানও তাঁর চাই-ই। সত্যি বলতে কী, যে-জনসমাজ এই আটটি চাহিদাকে তাঁর ন্যূনতম চাহিদা বলে ভাবতে শেখেনি, তাকে সভ্য-জনসমাজ বলে গণ্য করা যায় কিনা, সেটা সন্দেহের বিষয়। অন্যদিকে, যে-রাষ্ট্র তার প্রজাপুঞ্জের এই নূনতম চাহিদা মেটানোকে আশু কর্তব্য বলে গণ্য করেনি, এবং চাহিদা

মেটাবার উপায়-উদ্‌ভাবনে যথাসাধ্য উদ্যোগী হয়নি, তাকেও সভ্য-রাষ্ট্র বলে গণ্য করা চলে না।

স্বীকার করা ভাল যে, পৃথিবীর নানা দেশে এমন জনসমাজ অনেক রয়েছে, যার একাংশের ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম চাহিদা মিটেছে, কিন্তু অন্যাংশের ক্ষেত্রে মেটেনি। যে-অংশের মেটেনি, সচ্ছল দেশগুলিতে তারা সংখ্যালঘু, কিন্তু দরিদ্র দেশগুলিতে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আগে এই দেশ-গুলিকে 'আনডারডেভেলাপ্‌ড কান্‌ট্রি' বলা হত। তাতে তাদের মান বাঁচত না। সম্ভবত সেই কারণেই তাদের অভিধা পরে পালটানো হয়েছে। 'আনডারডেভেলাপ্‌ড' না-বলে, বিগত কয়েক বছর ধরে, বলা হচ্ছে 'ডেভেলাপিং'। কিন্তু অনুন্নতই বলি আর উন্নতশীলই বলি, প্রকৃত ছবিই তাতে পালটায় না, এবং এই সত্যটাও তার দ্বারা ঢাকা পড়ে না যে, তাদের অনেকেরই অবস্থা এখনও যথাপূর্ব। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তর দেশ সম্পর্কে এ-কথা সত্য। মোট লোকসংখ্যার বেশির ভাগই এ-সব দেশে ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য ও বস্ত্র পায়। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ও অস্বাস্থ্যকর। যতসংখ্যক ইশকুল-কলেজ-হাস-পাতাল থাকলে তাদের শিক্ষার ও চিকিৎসার প্রয়োজন ঠিকমতো মেটানো যেত, অনেক ক্ষেত্রে তার সিকির সিকিও নেই। এবং তাদের কর্মসংস্থানের যে সুযোগ ও ব্যবস্থা এ-সব দেশে রয়েছে, তাও প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। ফলে অনাহার, অর্ধাহার, অপুষ্টি, আশ্রয়হীনতা, অশিক্ষা, অকাল-মৃত্যু ও বেকারির ব্যাধি এ-সব দেশে অতিমাত্রায় ব্যাপক। উপরন্তু কোন-কোনও দেশে রাষ্ট্রকর্তারা এ-ব্যাপারে নির্বিকার। আপন-আপন জনসমাজের ন্যূনতম চাহিদাগুলিকে মেটাবার জন্য যে-উদ্যোগ না-থাকলেই নয়, তাঁদের নীতি ও কর্মে তা চোখে পড়ে না। কোন-কোনও ক্ষেত্রে ঘোষিত নীতির মধ্যে চোখে পড়লেও তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে ফাঁকি থেকে যায়। নীতি ও কর্মের অসংগতি ক্রমে প্রকট হয়ে ওঠে। জনসমাজের ছোট-ছোট কয়েকটি অংশ, তার ফলে, সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারে বটে, কিন্তু বৃহত্তর অংশের দুর্দশা কিছুতেই ঘোচে না।

৩

যে-সব মানুষের ন্যূনতম চাহিদা আজও মেটানো যায়নি কিংবা মেটানো হয়নি, শুধুই যে অনগ্রসর ও অনুন্নত (কিংবা অগ্রসরমাণ ও উন্নয়নশীল) দেশগুলিতে তাদের সংখ্যাধিক্য, এমন কথা ভাবলে ভুল করা হবে। বস্তুত, সচ্ছল গুটিকয় দেশের ছবি যা-ই হোক, সমস্যাটাকে আরও বৃহৎ পটভূমিকায় স্থাপন করলে দেখতে পাব, বঞ্চিত এই প্রজাপুঞ্জের ভারে গোটা পৃথিবীই প্রপীড়িত হচ্ছে। অনুন্নত ও উন্নত (বলা বাহুল্য, বৈষয়িক অর্থে) দেশগুলিকে মিলিয়ে যদি হিসেব কষা হয়, তাহলেই এর প্রমাণ মেলে; দেখা যায় যে, সামগ্রিক মানবসমাজের এরাই বৃহত্তর ভাগ। আমাদের কবি বলেছেন, "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে-জাতির নাম মানুষজাতি"। উদাত্ত এই ঘোষণাকে যদি সত্য বলে মেনে নিই তো দেখব, সেই মানুষ-জাতির অবস্থা বিশেষ উৎসাহজনক নয়। তাদের বেশির ভাগই প্রয়োজনমতো খেতে-পরতে পায় না। তাদের বেশির ভাগেরই গৃহপরিবেশ অস্বাস্থ্য-কর। তাদের বেশির ভাগেরই ইশকুল-কলেজে যাবার কিংবা চিকিৎসিত হবার তেমন-কিছু সুযোগ-সুবিধে নেই। তাদের বেশির ভাগই, বেকার না হোক, আনডার-এমপ্লয়েড। অর্থাৎ অর্ধ-বেকার।

ঐতিহাসিক বলেছেন, মানব-ইতিহাসকে খণ্ড-খণ্ড করে দেখলে উৎসাহিত হওয়া চলে না; কেননা যুদ্ধ-বিগ্রহ মারী-বিপর্যয় ইত্যাদির ছবিটাই তখন বড় হয়ে আমাদের নজর কাড়ে। অথচ, সামগ্রিকভাবে যখন মানব-ইতিহাসের দিকে তাকাই, তখন লক্ষ্য করি, মানুষ তার অরণ্যচারী আদিম অবস্থা থেকে কত অল্প সময়ের মধ্যে কী বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছে; সেই অগ্রগতি দেখে

উৎসাহিত না-হয়ে উপায় থাকে না। মানবসমাজকে কিন্তু খণ্ড-খণ্ড করে না-দেখে গোটা পৃথিবীর পটভূমিকায় রেখে দেখলেও দুঃখ পেতে হয়। কেননা, সেক্ষেত্রেও দেখা যায়, তাদের অধিকাংশেরই জীবন আজও দুর্দশার দ্বারা গ্রস্ত; তাদের অধিকাংশেরই ন্যূনতম চাহিদা অদ্যাবধি মেটেনি।

একদিকে তো এই অবস্থা। অন্যদিকে, সেই একই মানবসমাজের চক্ষুকর্ণে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে এমন-সমস্ত বিজ্ঞাপনের ছবি ও ভাষা, যা আরও 'উচ্চমার্গে'র নানা 'চাহিদা'র কথা তাকে মনে করিয়ে দেয়, এবং জানিয়ে দেয় যে, সেগুলো না-মেটালেই নয়। কোনো ছবি দেখিয়ে দেয় যে, গাছে যেমন কাঁঠাল ঝোলে, একটি তরুণের দেহকাণ্ড অবলম্বন করে পাঁচ-ছটি সুন্দরী মেয়ে প্রায় সেইভাবেই ঝুলে রয়েছে। ছবির ক্যাপশনে প্রতিশ্রুতি থাকে : অমুক কোম্পানির বানানো তমুক সাদা শার্ট পরুন; দেখবেন, মেয়েদের চিত্ত জয় করতে আর আপনার কিস্সু অসুবিধে হচ্ছে না। কোনো ছবি দেখায় যে, অতিশয় রূপলাবণ্যবতী ও উন্নতপয়োধরা একটি তরুণী তাঁর চক্ষুতে খুবই বিলোল একটি কটাক্ষ ফুটিয়ে তাকিয়ে আছেন। ক্যাপশন জানায়, তিনি তরুণী নন, চল্লিশোত্তীর্ণা, কিন্তু তবু যে তাঁর নারীত্বের 'গৌরব' আজও অবনমিত হয়নি, তার কারণ, তিনি ব্যবহার করেন অমুক কোম্পানির তমুক-মার্কা ব্রা। যার পেটে ভাত নেই, সেই পুরুষও অতঃপর ওই রমণীরঞ্জন শার্ট সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হয়; এবং যার পরনে কাপড় নেই, সেই নারীরও অতঃপর ওই 'গৌরব-রক্ষাকারী' ব্রায়ের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের বেতারেও বিজ্ঞাপনের বাজনা বাজে : আপনার চাই কুকিং রেন্‌জ। চলচ্চিত্রের চটুল মেয়েটি রূপবান যুবকের গালে গাল রেখে বলে : মম্‌ম্‌, তুমি নিশ্চয় অমুক কোম্পানির শেভিং লোশন মেখেছ, তাই না? জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদাগুলি যাদের মেটেনি, তারাও এইসব দেখে এবং শোনে। এবং, ন্যূনতম চাহিদাগুলির কথা ভুলে গিয়ে, আরও দূরবর্তী নানা চাহিদার চিন্তায় মগ্ন হয়। অর্থাৎ কোন্ চাহিদা আগে মেটানো দরকার, এবং কোন্‌টা পরে, এইসব বিজ্ঞাপন সেই অগ্রপশ্চাৎ-বোধটাকেই নষ্ট করে দেয়। বাস্তব অবস্থার পার্স্‌পেকটিভ মুছে যেতে থাকে ও সেক্ষেত্রে একটা কৃত্রিম পার্স্‌পেকটিভ তৈরি হয়। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতবার ব্যাকুলতা ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে।

এটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। যেমন উন্নত (বৈষয়িক অর্থে), তেমনি উন্নয়নশীল নানা দেশে—বাস্তব পার্স্‌পেকটিভ্‌কে মুছে দিয়ে ও একটা কৃত্রিম পার্স্‌পেকটিভ বানিয়ে নিয়ে—এই ব্যাকুলতাকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ও পরিকল্পিতভাবে তৈরি করে তোলা হচ্ছে। যেমন সচ্ছল দেশগুলিতে, তেমনি অসংখ্য দরিদ্র দেশেও এর পিছনে কাজ করছে অতিশয় তীক্ষ্ণ কিছু মস্তিষ্ক। শুধু দামী শার্ট, ম্যাজিক-ব্রা, কুকিং রেন্‌জ বা আফটার-শেভ্ লোশন বলে কথা নেই, ট্রানজিস্টর, রেকর্ডপ্লেয়ার, টেপরেকর্ডার, স্টিরিও, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, প্রেশার কুকার, গ্যাস লাইটার, ইলেকট্রিক টোস্টার, টি ভি ইত্যাদি অসংখ্য পণ্যের চাহিদাকে, পিছন থেকে ঠেলা মেরে, গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয় শিক্ষা চিকিৎসা ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের চাহিদার সামনে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে যে, এইসব 'চাহিদা' মেটানোর নামই সভ্যতা।

যিনি বলেছিলেন, আগে খাদ্য কিনতে হবে, পরে ফুল, তাঁর পার্স্‌পেকটিভে কোনও ভুল ছিল না। আজ সেক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে হরেক দেশে হরেক মাধ্যমের আশ্রয় নিয়ে অন্যতর প্রয়োজনের ঢাক পেটানো হচ্ছে। যে-মানুষের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথার উপরে ছাত নেই, এবং শিক্ষা-চিকিৎসা-কর্মসংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ যে-মানুষ পায় না, তাকেও শুনতে হচ্ছে : চিরকাল যদি যুবক থাকতে চান তো ব্যবহার করুন অমুক কোম্পানির তমুক-মার্কা হেয়ার-ডাই। [আগামীবারে সমাপ্য]

তিমির তরাই-এ পক্ষাঘাত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বেরিয়েই দেখি, বাইরেটা ততক্ষণে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে—বৃষ্টির বেগটা আগের চেয়ে যেন একটু কম, কিন্তু হাওয়ার বেগটা অনেকগুণে বেড়ে গেছে। শোঁ-শোঁ-শোঁ-শোঁ, কী-প্রচণ্ড শব্দ যে সেই হাওয়ার কী বলব! মনে হচ্ছে পাহাড়ের কিছু অংশ যেন উড়ে বেরিয়ে যাবে, হয়তো এই একখণ্ড বিরাট শিলা আমার মাথায় পড়ল বলে, আমায় গুঁড়িয়ে দিল বলে—আর সেটা নিশ্চয় উচিত বিধানই হবে, কারণ যে-পাপ করে বেরিয়ে আসছি এখনই, তাতে অন্ধকারকেও মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

একেবারে অন্ধকার তখন?

—হ্যাঁ, এক ভীষণ অন্ধকার, আকাশে-মাটিতে-পাহাড়ে মিলে নিরবচ্ছিন্ন এক অন্ধকার। তবু ভাগ্যিস, শিবিরের বিজলী বাতিগুলো দূরে-দূরে জ্বলছে, নইলে ফিরতেই পারতাম না পথ চিনে।

—ফিরতে মানে আপনাদের তাঁবুতে ফিরতে?

—হ্যাঁ। টলতে-টলতে, হাওয়ার বেগ সামলাতে-সামলাতে, হোঁচট খেতে-খেতে।

—যখন ফিরলেন, সুভদ্র তখন তাঁবুতে?

—হ্যাঁ, ও কিন্তু একেবারেই উতলা হয়নি। ভেবেছিল, আমি হয়তো গিছলাম অণিমাদের সঙ্গে গপ্প করতে, বৃষ্টির ফলে আটকা পড়ে গেছি।

—তাতে আপনি কী বললেন?

—একবার মনে হল, ওর কথায় সায় দিয়ে বসি, কারণ তাহলে যুতসই একটা অজুহাত আমায় ভেবে-চিন্তে বার করতে হচ্ছে না, বরং ও নিজেই সে-অজুহাতটা আমার গ্রহণের জন্য এগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আবার পরক্ষণেই মনে হল, যদি বলি হ্যাঁ, অণিমাদের সঙ্গেই ছিলুম, এবং পরে মিথ্যেটা প্রকাশ পেয়ে যায়? তখন? কারণ পরের দিন কথাচ্ছলে ও-ই হয়তো প্রসঙ্গটা পেড়ে বসল অণিমার কাছে ও, তখন অণিমা বলে উঠল সে কি, সুনন্দা তো আসেনি আমাদের কাছে? তখন?

—অতএব কী করলেন আপনি?

—আমি ওকে সত্যি কথাটা বললাম।

—বললেন?

—না-না, সবটা নয়, ঐ লোকটার কথা নয়—সেটা তো শুধু এখন বলছি, আর এখন তো সে-কথাটা বিশ্ববাসীকেই বলছি!

—তাহলে কী বললেন সুভদ্রকে তখন?

—বললাম কেদারনাথ থেকে ফিরেই আমার কলতলায় যাওয়ার কথা, হাতমুখ ধুতে চাওয়ার কথা। আর সেটা সত্যিও।

—কিন্তু তার পরে কী হল? অর্থাৎ কলতলায় যাওয়া থেকে এখন নিজের তাঁবুতে ফিরে আসা, এর মধ্যে তো বেশ কিছুটা সময় গেছে—এ-সময়টা আপনি কোথায় কাটিয়েছেন বললেন?

—বললাম, কলতলায় হাত ধুচ্ছি পা ধুচ্ছি, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি নামল, এবং তা নামতেই ভয় পেয়ে দে-ছুট দে-ছুট, কোথায় পড়ে রইল সাবান তোয়ালে তার তোয়াক্কা না করেই ছুট।

—আর ও সেটা নির্বিবাদে মেনে নিল?

—কেন মেনে নেবে না বলুন? আমি ওর স্ত্রী, ওর পুত্রের মা, আমার কথায় সন্দেহ করার

কোনো অবকাশ তো আগে আসেনি ওর।

—সেটা একটা কথা বটে। সত্যিই তো, মেনে না নিয়ে হঠাৎ কেন সন্দেহ করতে যাবে?

—মেনে তো নিল বটেই, এমন-কি এটাও বলল যে ও, তাই বলো, আমি তখন থেকে খুঁজছি তোয়ালেটা-সাবানটা, ভাবছি গেল কোথায়? তো চলো-চলো, কোথায় ফেলে এসেছ খুঁজে বার করে আনি, হয়তো এতক্ষণে ঝড়ের ঠেলায় উড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে!

—তো টর্চ হাতে ও তখন বেরোল?

—হ্যাঁ, সঙ্গে আমিও। কলতলায় গিয়ে দেখি যেখানে যেমনটি ফেলে রাখি, সেখানে ঠিক তেমনটি পড়ে আছে সাবান, তেমনটি পড়ে আছে তোয়ালে। শুধু বৃষ্টির জলে-জলে সাবানের শরীরটা আদ্ধেক হয়ে গেছে, আর হলদে তোয়ালেটাকেও নেহাতই পাংশুবর্ণ ঠেকছে। ভয় ছিল পাছে খুঁজে পাই লোকটার পদচিহ্ন বা আমার পাপের অন্য কোনো চিহ্নাবশেষ।

—যেটা বলা বাহুল্য পাননি?

—না, সব ধুয়ে মুছে গেছে—তাছাড়া তখনো তো বৃষ্টি পড়েই চলেছে। যাক, তাঁবুতে ফিরে এলাম, ফিরেই ভেজা জামাকাপড় বদলে নিলাম, মাথাটা মুছে নিলাম।

—আশ্চর্য, ও জিজ্ঞেস করল না কলতলা থেকে দৌড়ে গেলেন কোথায়?

—ও জিজ্ঞেস করার আগেই আমি জানিয়েছি।

—কী জানিয়েছেন?

—জানিয়েছি যে ভয় পেয়ে যেই ছুট দিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে পথ হারিয়ে ফেলি—এই নতুন জায়গা, পাহাড়-বন-বাদাড়, এর মধ্যে কিছুতেই আর আমাদের তাঁবুটাকে ঠাওর করতে পারি না। তাছাড়া ঐ ক্লান্তির শেষে কেদারনাথ থেকে ফিরেছিও তো মাত্র কিছুক্ষণ আগে, এবং ফেরার পরে আমাদের যে-তাঁবুটা এবার দেওয়া হয় তাতে ঢুকেছিও হয়তো বড়জোর কয়েক মিনিটেরই জন্যে, সুতরাং ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান-হারানো অবস্থায় মনে থাকবে কী করে কোন্ তাঁবুটা আমাদের!

—ঠিক কথা, অতীব উচিত কথা।

—তাই আমি দৌড়োতে-দৌড়োতে নামছি তো নামছিই, শেষে দেখি সামনে একটা বড়গোছের তাঁবু, খালি, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্যে ঢুকে পড়ি। পরে বৃষ্টির বেগটা যেই একটু ধরেছে বলে মনে হল, আবার বেরিয়ে পড়লাম—খুঁজতে-খুঁজতে শেষে পেঁছিলাম এসে নিজের তাঁবুতে।

—হ্যাঁ, সুভদ্রের চোখে মোটামুটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত, সন্দেহের প্রশ্নই ওঠে না। বেশ, এই পর্যন্ত তো খাসা এল, কিন্তু পরে?

—আসছি সে-কথায়। পরে গণ্ডগোল যা হল, সেটাও একমাত্র আমাকে নিয়েই, এবং আমি যদি মুখ না খুলতাম তো সুভদ্রও আমাকে কোনোদিনই সন্দেহ করত না। আর বলা বাহুল্য, সে-মুখটা আমি এখনই খুলছি, যেমন ওর কাছে, তেমনি আপনাদেরও কাছে—এই প্রথম।

—এগুলো জানা—পরের ঘটনা বলুন।

—তারপর খেতে যাওয়া, রান্নাঘরের মতো সেই জায়গাটায়—আপনাদের নিশ্চয় মনে পড়বে।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, খাসা জায়গাটি, মাটির দাওয়া বাইরে, ভিতরে মাটির মেঝে, সেখানে কিছু যাত্রী কিছু পাহাড়ী সবাই একসঙ্গে পাত পেতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়া—পরে গরম-গরম চাপাটি-শব্জি, রান্না যেই হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে উনুন থেকে তুলেই পরিবেশন।

—হ্যাঁ, বেশ বাড়ি-বাড়ি ভাব জায়গাটায়। যাই হোক, ও বলল খেতে যাওয়ার কথা। আমার এতটুকু খিদে ছিল না, কিন্তু পাছে ও কিছু আবার সন্দেহ করে বসে, সঙ্গে গেলাম—খেলামও। কী খেলাম না-খেলাম মনে নেই, তবে কিছু নিশ্চয় খেয়েছিলাম—আর যা খেয়েছিলাম, তা হজম না

হয়ে গলায় আটকে থাকে সারারাত। কী রাত, কী রাত, উঃ!

—বলুন সেই রাতের কথা এবার, আমরা শোনার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছি।

—তাঁবুর আলোটা নেবানো যায় না, মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, কারণ কোনো তাঁবুতেই সুইচ নেই। আলোগুলো তাঁবুতে-তাঁবুতে জ্বালানো থাকে নিরাপত্তারই কারণে।

—তাই বুঝছেন এমনিতেই ঘুম হওয়া মুশকিল, তবু ঘুম একসময় এসে যায়, কারণ এসব তাঁবুতে মানুষ সাধারণত খুব ক্লান্ত থাকে।

—বিশেষত যাত্রীরা, যারা সারাদিন পথ হেঁটেছে বা বাস্-এ ঠোক্কর খেতে-খেতে ভ্রমণ করেছে —তাছাড়া ঘুম এসে যায় আরো এক কারণে। ঠাণ্ডার চোটে।

—হ্যাঁ, একবার কম্বলটা মুড়ি দিলেই তারপর আলো জ্বলছে কি না-জ্বলছে কে দেখছে!

—আর স্লিপিং ব্যাগ থাকলে তো কথাই নেই, ভেতরে ঢুকে যাও সুড়ুত করে—ঢুকেই চোখ বোঁজো। সত্যি কথা বলতে কি আমার তো কোনো অসুবিধেই হয়নি। যাক, আপনি বলে চলুন সুনন্দা—আপনার ঘুম আসছে না সেই রাত্রে, তারপর?

—কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমার আবার মুশকিল কী জানেন, আমি মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে একেবারে পারি না—নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তাই একে তো ঐ নাকের ডগায় একশো পাওয়ারের বাল্‌ব্ জ্বলছে, তায় সন্ধ্যেয় যা করেছি তা তো শুনলেনই—ঘুম আসবে কোত্থেকে সে-রাতে? মনের যেন আর বোধশক্তি বলে কিছু নেই, যেন একটা অদ্ভুত স্তম্ভিত ভাব। পাশের খাটে ও ঘুমিয়ে পড়েছে—আমি কখনো চোখ খুলছি, কখনো চোখ বোঁজার চেষ্টা করছি। কিন্তু চোখ খুলেই থাকি বা বোঁজারই চেষ্টা করি, কলতলার ছবিটা কেবলই ভেসে উঠছে।

—কী ছবি? আপনি দেখলেন কী কলতলায়? এই তো বললেন লোকটার মুখটা পর্যন্ত আপনার মনে পড়ে না?

—কিন্তু তার হাতটা তো মনে পড়ে, হাতের স্পর্শটা মনে পড়ে, সেই তাঁবুতে চেয়ে-থাকা তার নিষ্পলক চোখটা মনে পড়ে—আমার সমস্ত সত্তাটা তাতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কখনো-কখনো আবার এমনও ভাবছি, এটা কী করলাম আমি, কেমন করে করতে পারলাম আমি? একসময় হঠাৎ মনে হল, যা করেছি, তার ফলে যদি আমার বাচ্চা হয়, যদি আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ি? পরেই ভাবলাম, সেটা যদি হওয়ার থাকে তো আমি এখনই গর্ভবতী হয়ে গেছি, আমি বহন করছি এক বীজ—কিসের বীজ, কোন্ সর্বনাশের? এবং জানেন, স্বপ্নের সূত্রপাত হল সেইটা দিয়েই।

—বলুন-বলুন, সেই স্বপ্নটা বলুন এবার।

—ঘুম বলব না, তবে তন্দ্রা এসে যায় একসময়, হয়তো তখন বেশ রাত। দেখি নড়তে পারছি না, পেট আমার এত বড় হয়েছে। এবং আশেপাশে যারা রয়েছে আমার—কারা ঠিক মনে নেই—তারা যেন সবাই আমায় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। এই যেমন, আমি যদি কারুর চোখে তাকাই সে সঙ্গে-সঙ্গে চোখ নিচু করে। সুভদ্রও যেন রয়েছে কোথায়, কাছাকাছিই, সর্বস্বান্তের মতো উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে—ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, এমন সাহস কেউ পাচ্ছে না। এরকম একটার পর একটা দৃশ্য ছায়াছবির মতো দেখছি, দৃশ্য জাগতে-না-জাগতে মিলিয়ে যায়। হঠাৎ দেখি আমি শুয়ে আছি, সেটা বোধহয় কোনো হাসপাতাল-টাসপাতাল, নাকে উৎকট ওষুধের গন্ধ আসছে—আর আমার পাশেই শুয়ে আছে বিরাট এক শিশু।

—কত বিরাট?

—তা লম্বায় প্রায় আমারই মতন। কান-দুটো কুলোর মতন, মুখ থেকে বিকট দাঁত বেরিয়ে

আসছে বকাসুরের মতো বা তাড়কাসুরের মতো—ঐ ছেলেবেলায় মহাভারতের পাতায় যেমন ছবি দেখি না? সেইরকম।

—কিন্তু সেটা যে শিশু তা কী করে ধরে নিচ্ছেন?

—শুধু শিশু নয়, আমারই শিশু—আমিই তাকে প্রসব করেছি, হয়তো মাত্র কিছুক্ষণ আগেই। কারণ আমি যে তাকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে পাশ ফিরছি, স্তনটা বাড়িয়ে দিচ্ছি ওর মুখে।

—হ্যাঁ, এমন স্বপ্নদর্শনের ব্যাখ্যা খুবই সম্ভব, এটা আসছে আপনার অপরাধ-বোধ থেকে।

—যাক, এটা যা হল হল, এর পরেরটা আরো সাংঘাতিক।

—পরেরটা মানে?

—মানে পরেই যা দেখলাম, ঐ স্বপ্নেই।

—কী দেখলেন?

—একেবারে সেই পৃথিবীর ছাদের ঘটনা, হুবহু।

—সেটা ঘটতে আপনি দেখলেন?

—হ্যাঁ, যখন বাস্তবে সেটা তখনো ঘটেনি, শুধু ঘটতে চলেছে—যদিও সেটা ঘটবে, এমন উদ্ভট কল্পনা তখন কেউই করতে পারেনি।

—কী আপনি দেখলেন ঠিক, বলতে পারেন?

—আমি দেখলাম সেই ছবিটি, আমরা সবাই চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে, স্তব্ধ, স্তম্ভিত, নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আর কী বেদনা ভিতরে বুকে, যেন আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমরা রাতারাতি অনাথ হয়ে গেছি, যেন আমাদের ধন-সম্পদ-প্রাণ আমাদের বাণী-কল্পনা-মান বা আমরা যা-কিছু আপন বলে মনে করে এসেছি এ-পৃথিবীতে, তার সব হঠাৎ কেড়ে নেওয়া হয়েছে আমাদের কাছ থেকে।

—ঠিক বলছেন, একেবারে ঠিক।

—এমন-কি আপনারা কে কেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন বা আমি নিজে কোথায় কীভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম তা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাই।

—অর্থাৎ যেভাবে আমরা সত্যিই দাঁড়াবো একদিন, বাস্তবে, সেটা আগেই আপনি স্বপ্নে দেখেন? অর্থাৎ যে-দাঁড়ানোটা সত্যিই দাঁড়ালাম শেষ পর্যন্ত, আপনার স্বপ্ন দেখার বহু পরে?

—বহু পরে নয় ধ্রুব, দু' রাত্রি পরে—না-না, তিন রাত্রি পরে।

—ঐ হল লোকনাথ, ঐ হল। তিন রাত্রিটা কি কিছু কম হল? ভেবে দ্যাখো, বাহাত্তর কি প'চাত্তর ঘণ্টা বাদে যেটা ঘটবে—এবং ঘটবে মানে? এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা—সেটা তিনি স্বপ্নে দেখছেন, একেবারে হুবহু। আচ্ছা সুনন্দা, এখানে একটা কথা আমাকে বলুন। আপনি এখুনি জানালেন আমরা কে কী করেছিলাম, কে কেমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কার মুখের ভাবটি ঠিক কীরকম ছিল, ইত্যাদি-ইত্যাদি আপনি হুবহু দেখেন, স্বপ্নে—দেখেন তো?

—হ্যাঁ, বললামই তো, ঠিক সেইরকমই দেখি।

—আপনি নিজে কী করছিলেন, নিজে কেমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাও দেখেন?

—হ্যাঁ, দেখি তো।

—তার মানে নিশ্চয় আপনি নিজেকে কাঁদতেও তাহলে দেখেন?

—দাঁড়ান, এটা ঠিক মনে পড়ছে না, বলতে পারছি না।

—শোনো ধ্রুব, যদি কিছু মনে না করো তো এখানে আমি একটা কথা বলি। মানুষ সাধারণত অন্যকেই নিরীক্ষণ করে, নিজেকে খুব একটা নিরীক্ষণ করে না। তাই উনি নিজে কী করছিলেন

তখন, সেটার দিকে হয়তো ততটা নজর দেননি।

—তার মানে তুমি কি এই বলতে চাও যে ওঁর নিজেরও ক্ষেত্রে যেটা শেষ পর্যন্ত ঘটল বাস্তবে, সেটাকেও উনি ওঁর স্বপ্নে ঠিকই দেখেন, তবু যদি সে-কথা নিশ্চিতভাবে এখন তাঁর মনে না পড়ে তো তার কারণ হল এই যে স্বপ্নের সেই মুহূর্তে যেটা উনি বেশি করে নিরীক্ষণ করেন, সেটা ততটা তাঁর নিজের আচরণ নয় যতটা অন্যদেরই আচরণ?

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, বৃন্দাবন তুমি কিছু বুঝছ কিনা জানি না, কিন্তু এদের এই অদ্ভুত পেঁচালো কথার ভঙ্গীতে আমার মাথাটা একেবারে গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে।

—কী হল কনক আবার তোমার?

—আমি যা জানতে চাইছি ধ্রুববাবু, তা এককথায় হল এই : তুমি এখুনি লোকনাথকে একটা তিন-মাইল লম্বা প্রশ্ন করলে, কোথায় তার আরম্ভ আর কোথায় তার শেষ তা জানি না লোকনাথের মনে আছে কিনা—কিন্তু আমার মতো নেহাৎই সাধারণ ব্যক্তির জন্যে সোজা বাংলায় প্রশ্নটার অর্থ বলবে কি?

—আচ্ছা লোকনাথকেই আমি ঘুরিয়ে প্রশ্নটা পাড়ছি তবে—পাড়তে দেবে?

—সে কি কথা! নিশ্চয়।

—আমরা এখন একটা বিশেষ মুহূর্ত নিয়ে কথা বলছি—বলছি তো? সে-মুহূর্তটা বাস্তবে পরে ঘটে, সুনন্দার স্বপ্নে আগে ঘটে। কেমন কনক, এ পর্যন্ত বুঝতে পারছ, মেনে নিচ্ছ?

—হ্যাঁ কর্তা, বুঝতে পারছি, মেনে নিচ্ছি।

—বেশ। আমরা এখন জানি, কারণ এই তো কিছুক্ষণ আগে সুনন্দা নিজেই সে-কথা আমাদের সকলের কাছে স্বীকার করেছেন, যে বাস্তবের সেই মুহূর্তে তিনি নিজে কেঁদে ওঠেন। কী, হয়েছে?

—হয়েছে।

—বেশ। এখন আমার প্রশ্ন, এবং এ-প্রশ্নটা আমি সুনন্দাকেই করি আগে, স্বপ্নের মুহূর্তটাই যেহেতু বাস্তবের মুহূর্ত হল এবং বাস্তবের মুহূর্তে যেহেতু তিনি কেঁদে ওঠেন, তাই স্বপ্নের মুহূর্তেও কি তিনি নিজেকে সেইভাবে কাঁদতে দেখেন? কী, বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?

—না, এখনো তো হচ্ছে না।

—পরেও হবে না। মন দিয়ে শোনো, এবং তা শুনলেই বুঝবে। যাক, আমার সেই প্রশ্নের উত্তরে সুনন্দা বললেন যে স্বপ্নতেও তিনি নিজেকে কাঁদতে দেখেছিলেন কিনা, তা তাঁর মনে পড়ছে না। কেমন, হল তো, কী কনক?

—হল।

—তখন লোকনাথ বলছে কিনা, যে মানুষ সাধারণত নিজেকে ততটা নিরীক্ষণ করে না, অন্যকেই নিরীক্ষণ করে। অর্থাৎ, স্বপ্নের সময় আমাদেরই নিরীক্ষণ করেছিলেন সুনন্দা, নিজেকে ততটা নিরীক্ষণ করেননি—এবং তাই স্বপ্নের সেই মুহূর্তে নিজেকে তিনি কাঁদতে দেখেছেন কি না-দেখেছেন, সেটা যদি তাঁর মনে না পড়ে তো তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, বরং তেমন মনে না-পড়াটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হবে। অর্থাৎ এইরকমই যুক্তি ছিল লোকনাথের—কী লোকনাথ, ঠিক বলছি?

—একেবারে ঠিক।

—তখন আমি যা জানতে চাই তা হল এই। লোকনাথ কি তবে এটাই বলছে যে বাস্তবে যেমন কাঁদেন, স্বপ্নতেও উনি ঠিক তেমনি কাঁদেন, কিন্তু তখন নিজেকে নিরীক্ষণ করেননি বলে সেই

কান্নার কথাটা তাঁর মনে পড়ছে না? কী লোকনাথ?

—হ্যাঁ, বলা যায়—অন্তত সেটা বললে আমার খুব আপত্তি হবে না।

—কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আমার একটু ছোট্ট আপত্তি হবে।

—কী আপত্তি?

—তাহলে বাস্তবের কান্নাটা ওঁর মনে পড়ল কেমন করে?

—মানে?

—মানে যখন আমি ওঁকে চেপে ধরলাম, তখন উনি তো দিব্যি স্বীকার করলেন যে হ্যাঁ, উনিই সেই ব্যক্তি যাঁর কান্নার স্বর আমি শুনি সেদিন, সেই পৃথিবীর ছাদের উপর। বুঝছ আমি কী বলতে চাচ্ছি?

—কী আশ্চর্য! এই সোজা কথাটা ঢুকছে না তোমাদের মাথায়! স্বপ্নের বেলায় নিজের আচরণটা উনি লক্ষ্য করছেন না, অথচ বাস্তবের বেলায় করছেন- এটা কী করে হয়, লোকটি যখন একই, আচরণটিও একই? আরে, অমন হাঁ করে তাকাচ্ছ কেন?

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, বাস্তবের বেলায় নিজের আচরণটা উনি লক্ষ্য করছেন বলছ?

—নিশ্চয় করছেন। নইলে সে-আচরণটা যে উনি করেছেন এটা তাঁর মনে পড়ছে কী করে?

- এখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য ও আমাদের মহামান্য বন্ধুবর ধ্রুব রুদ্র মহাশয়, তোমরা আমার মতো নগণ্য নির্বোধ দীনহীন একটি ব্যক্তিকে সামন্য কিছু কথা বলতে দেবে?

—বেশ তো, কী কথা বলো-না কনক!

—আমার একটা প্রশ্ন আছে ধ্রুবকে।

—বেশ তো, করো-না তোমার প্রশ্ন!

—আমার তো মনে হয় তোমাদের বাক্যবিন্যাসে এই-যে সূক্ষ্ম বাছবিচারের জাল বিস্তার করে চলেছ, তাতে তোমাদের কোন্ মোক্ষটা মিলছে জানি না, কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা নিছক অর্থহীন তর্ক মাত্র।

—কেন-কেন?

—কেন-কেন আবার কী? কারণ আমাকে স্পষ্ট করে বলো তো ধ্রুববাবু, তুমি কি এইটেই প্রমাণ করতে চাও যে যে-কান্নাটা উনি বাস্তবে কাঁদেন, সে-কান্নাটা উনি স্বপ্নে কাঁদেননি?

—আহা আমি প্রমাণ করতে চাইব কেন? আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাই না। শুধু উনি যেটা নিজেই বলছেন, একমাত্রই তারই ভিত্তিতে কী ঠিক ঘটেছিল বা না-ঘটেছিল সেই সত্যটা আমি খাড়া করার চেষ্টা করছি। এবং এটা-যে করতে চাচ্ছি, তারও একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে—সেই প্রয়োজনটার কথাতেও আসছি যথাসময়ে, এই এলাম বলে।

—ওরে বাবা, আবার তোমার প্রয়োজন কিছু লুকোনো আছে কোথাও ও যার কথা তুমি পাড়লে বলে! তার মানে আবার নিছক কিছু তার্কিকতা, শুধু সূক্ষ্ম যুক্তির বিশ্লেষণ—এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ চোখে দেখাই যায় না। আমার তো এবার ভয় ধরতে শুরু করছে দেখছি।

—আচ্ছা বেশ কনক, তোমার প্রশ্নটাতেই আপাতত ফিরে যাওয়া যাক। তুমি বলছিলে, স্বপ্নে উনি কাঁদেননি, বাস্তবে উনি কেঁদেছেন, এই তো?

—আমি বলছিলাম না, তুমিই বলছিলে—তুমিই সেটা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে এ-জনমণ্ডলীর এমন এই মহামূল্য সময় নষ্ট করে চলেছ।

—আচ্ছা বেশ, মেনে নিলাম, যেহেতু প্রতিবাদ করলেই অনর্থক তর্কটা বেড়ে যাবে। মেনে নিলাম, এইটেই প্রতিপাদ্য বস্তু আমার—অর্থাৎ বাস্তবে উনি কাঁদলেন, স্বপ্নে কাঁদলেন না।

—এবং এইখানেই আমার বক্তব্য শ্রীমান ধ্রুব রুদ্র, এটা এমন একটা সহজ সত্য যে তা প্রমাণ করতে এত পাঁয়তাড়া কষার কোনো দরকারই ছিল না।

—কোন্‌টা সহজ সত্য?

—বাঃ, একমাত্র বাস্তবেই উনি কেঁদেছেন, স্বপ্নে কাঁদেননি—সেই সত্য!

—তো কী করে সেই সত্যটা এত সহজ বা অবধারিত বলে ঠেকছে তোমার কাছে?

—যেহেতু স্বপ্নে উনি একটা সর্বনাশের ছবি দেখেন, এবং বাহাত্তর কি পঁচাত্তর ঘণ্টা বাদেই যখন সেই একই সর্বনাশ বাস্তবেও প্রত্যক্ষ করেন, তখন উনি বুঝতে পারেন যে ওঁর সেই স্বপ্নটা সত্য ছিল। আর সেটা তিনি তখন বুঝলেন বলেই সেই সাংঘাতিক বোধের চেতনায়, এক আতঙ্কে ও এক শিহরনে তিনি কেঁদে উঠলেন—যেন প্রায় নিজেরি অজান্তে। এ ছাড়া আর-কী ব্যাখ্যা হতে পারে ঘটনাটার? কী, মানছ না ধ্রুব?

—মানব না কেন? উনি স্বপ্নে কাঁদেননি, বাস্তবে কেঁদেছেন, সেটা তো আমিও বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তাই যদি হয় তো তাহলে অন্য দুয়েকটা প্রশ্নও উঠতে বাধ্য।

—যেমন?

—যেমন, তাহলে স্বপ্নে উনি দেখেছেন বলেই কোনো জিনিস যে বাস্তবেও হুবহু সেইভাবেই ঘটবে, এমন মেনে নেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

—অর্থাৎ?

—এই ধরো স্বপ্নে-দেখা ঐ সর্বনাশের ছবিটা, যেটা হুবহু উনি বাস্তবেও প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু স্বপ্নে সেই একই দৃশ্যে উনি নিজেকে কান্নারত দেখছেন না, যদিও বাস্তবের সেই দৃশ্যে উনি কাঁদছেন, যে-কান্না আগের এক দ্বিতীয় ব্যক্তিও শুনল, এবং যে-কান্নার কথা উনি নিজেই স্মরণ করতে পারলেন পরে। অর্থাৎ যেটা বলছি, তা ওঁর স্বপ্নটা এবং ওঁর বাস্তবটা একরকম ঠেকলেও আসলে কিন্তু ঠিক সম্পূর্ণ এক নয়—অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে।

—ধুত্তোরি তার নিকুচি করেছে, বৈসাদৃশ্য আছে তো আছে, বৈসাদৃশ্য থাকবেই—কারণ স্বপ্ন যেটা সেটা স্বপ্ন, বাস্তব যেটা সেটা বাস্তব। আর আমরাই বা অনর্থক তক্ক করে মরছি কেন, উনি নিজেই যখন সামনে রয়েছেন! হ্যাঁঃ, বলে-না, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক-তো, সুনন্দা আপনিই বলুন—আপনার কী মনে হয়?

—আমার মনে হয় উনি যা বললেন, ঐ কনকবাবু, ঐটেই সত্যি। বাস্তবে আমি কেঁদে উঠি, কারণ আমার স্বপ্নটা সত্য হয়েছে দেখে আঁৎকে উঠি। আঁৎকে উঠি কেন? কারণ স্বপ্নটা আমি দেখি আমার সেই পাপকর্মের রাত্রিতে—পাপটার আগে নয়, পরেই।

—অর্থাৎ আপনার পাপের সঙ্গে আগাগোড়া ব্যাপারটা একটা সূত্র আপনি আবিষ্কার করছেন, এই তো?

—হ্যাঁ নিশ্চয়, সেটাও বলে দিতে হবে?

—দাঁড়ান-দাঁড়ান, শুনলেনই তো কিছুক্ষণ আগে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিয়ে আমাদের এই মহামান্য বন্ধুরা কত কটাক্ষপাত করছিলেন! ধ্রুব রুদ্র হ্যানো, ধ্রুব রুদ্র ত্যানো, ইত্যাদি-ইত্যাদি। আসলে জিনিসপত্র আমার মাথায় ঢোকে একটু আস্তে-আস্তে—আমাকে তাই ব্যাপারটা আমার মতো করে বুঝে নিতে দিন সুনন্দা, অ্যাঁ? আপনি কি বলতে চান যে যা-কিছু এইসব হয়েছে তা আপনার ঐ পাপের জন্যেই হয়েছে?

—অন্তত আমার চোখে তো মনে হয় তা-ই।

—কিন্তু সেই চোখটা তো আপনার একলারই নেই সুনন্দা, আমাদেরও আছে।

—হ্যাঁ, তা তো আছেই।

—শুধু তাই নয়, আপনার চোখ দিয়ে আপনি যে-দৃশ্যটা দেখলেন, আমাদের বিভিন্ন চোখ দিয়ে আমরাও প্রতি জনা সেই একই দৃশ্য দেখলাম।

—এ-ও মেনে নিচ্ছি।

—তবে এখানে আমার প্রশ্ন হবে, আপনার কৃতকর্মের জন্যে আপনি শাস্তি পান, সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু সেই কর্মের জন্যে আমরা শাস্তি পাব কেন? আমরা তো আপনার ঐ পাপ-কর্মটা করিনি?

—এখানে ধ্রুব, আগে ওঁকে বলতে দাও-না স্বপ্নে উনি ঠিক কী-কী দেখলেন, এখনো সবটা শোনা হয়নি।

—বেশ, আপনার স্বপ্নটাই আগে শেষ করে নিন তবে।

—প্রথমেই তো সেই হাসপাতাল-টাসপাতালের দৃশ্য...

—না, তারও আগে তো বললেন আপনার সেই অন্তঃসত্ত্বার অবস্থার কথা, কারা যেন আপনার চারপাশে ঘুরছে, সুভদ্র মুখ নিচু করে এককোণে উবু হয়ে বসে আছে...

—হ্যাঁ, সেইটেই সর্বপ্রথম—পরে হাসপাতাল, সেই বিকট শিশু, বকাসুর-তাড়কাসুর, দুধ খাওয়ানোর জন্যে স্তন এগিয়ে দিচ্ছি মুখে।

—ঠিক। পরেই পৃথিবীর ছাদের উপর ঘটনা।

—পরেই পৃথিবীর ছাদের উপর ঘটনা।

—এবং এখানে আপনি ঠিক কী দেখলেন?

—বললামই তো, যেটা বাস্তবে দেখলাম, ঠিক সেই একই দৃশ্য হুবহু দেখেছিলাম।

—তবু, মনে করবার চেষ্টা করুন।

—ঐ তো, আমরা যে যেমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সকলে ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছি...

—আমরা প্রত্যেকে কে কেমন দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেটা ভালো করে নিরীক্ষণ করার মতো মনের অবস্থা আপনার ছিল তখন?

—কখন? স্বপ্নে, না বাস্তবে?

—বাঃ, প্রশ্নটা খুব ভালো করেছেন। ধরুন দুটোতেই, যেমন স্বপ্নে তেমনি বাস্তবে।

—বলতে পারব না। তবে মোটামুটি একটা ধারণা তো করতে পারা যায়...

—মোটামুটি মানে?

—এই ধরুন আমরা-যে এইখানে আজ দাঁড়িয়ে আছি, আজ এই সভায়, এই সন্ধ্যায়, আমি রয়েছি, আপনি রয়েছেন, ওঁরা তিনজনে রয়েছেন, বাদবাকী লোকসব কাছে-দূরে চারপাশে গোল হয়ে বসে আছেন—কেমন, আছেন তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলে যান।

—গোল হয়ে বসে আছেন, তাঁদের মুখ দেখা যাচ্ছে না, যদিও আমাদের কয়েকজনের মুখ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ ওখানটা অন্ধকার, এখানটা আলো, এই তো?

—বেশ তো, তারপর?

—হ্যাঁ, যেটা বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তারও আগে আরেকটা ছোট্ট কথা বলে নিই। ঐ-যে বললাম ওরা গোল হয়ে চারপাশে বসে আছে, সেটাও আমরা ধারণা করে নিচ্ছি মাত্র, কারণ ওদের একটা অত্যন্ত সামান্য অংশকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঐ যারা নেহাতই সামনে বসে রয়েছে, নেহাতই তাদেরই—এমন-কি তাদেরও যে দেখতে পাচ্ছি বলছি, সেটাও ভালো করে নয়, খুব স্পষ্টভাবে নয়,

বরং আবছাভাবেই।

—বেশ তো, তাও মেনে নেওয়া গেল।

—কিন্তু ওদের কথা যদি বাদ দিই, ঐ যারা নেহাতই সামনে বসে আছে, তো জনতার বৃহৎ অংশটাকে আমরা একেবারেই দেখতে পাচ্ছি না। তবু বলছি, ওরা গোল হয়ে বসে আছে, ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, ওরা আমাদের কথা শুনছে—কেন বলছি এসব কথা? কারণ সেই-রকমই মোটামুটি ধারণা আমাদের, নয় কি?

—এটাও মেনে নেওয়া গেল।

—যদিও আসলে হয়তো গোল হয়ে বসে ওরা নেই, হয়তো শুয়ে পড়েছে, কিংবা এই অন্তহীন সভার কার্যক্রম যেভাবে চলছে তা দেখে বিরক্ত হয়ে অনেকে হয়তো বাড়িই ফিরে গেছে এতক্ষণে, এবং তাই আসলে হয়তো এ-সভা এতক্ষণে ভর্তি হয়ে গেছে শূন্য স্থানে, একটি-দুটি লোক এখানে-ওখানে, পরেই বিরাট-বিরাট ফাঁক—কে জোর করে বলতে পারবে ওরা আছে কি না-আছে, থাকলেও কেমনভাবে আছে? আপনি পারবেন?

—নিশ্চয় পারব না। সে-ভানও আমি করতে যাব না। কিন্তু আপনি তো সেই পৃথিবীর ছাদের উপর বা আপনার স্বপ্নে আমাদের প্রত্যেককে ঠিক কীভাবে দেখেছেন না-দেখেছেন বলতে গিয়ে সেই ভানটাই করছেন।

—ভান নয়—বললাম-না, মোটামুটি ধারণামাত্র? যে-একই রকমের ধারণা এ-সভা সম্বন্ধে আমি করছি, আপনি করছেন, লোকনাথবাবুও করছেন—বলুন-না লোকনাথবাবু!

—হ্যাঁ, সুনন্দার সঙ্গে আমি নিশ্চয় এ-ব্যাপারে একমত, কারণ সত্য এক জিনিস, ধারণা আরেক জিনিস। তবে এর মানে এ নয় যে ধারণা সত্য হতে পারে না বা ধারণায় একটা বিশেষ কোনো পদার্থ যেমনভাবে ঠেকে, সত্যেতে সেটার একটু অদলবদল হলেই ধারণাটাকে সম্পূর্ণ অমূলক বা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

—তাছাড়া ধ্রুববাবু ধরুন, এই-যে আজ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমি-আপনি-এ'রা, ধরুন এইভাবে সকলের দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থায় আপনি আমাদের একটা ফোটো তুললেন, কেমন? পরে ধরুন সেই ফোটোটা যখন তিনদিন বা চারদিন বাদে আমি দেখতে পেলাম, তখন কি সেটা দেখেই আমার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে যাবে না যে হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক-ঠিক, একেবারে এইভাবেই তো আমরা সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম সকলে?

—নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে, কিন্তু মাপ করবেন যদি বলতে বাধ্য হই যে এখানে আপনার যুক্তিতে একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছেন আপনি। আপনার সেই ভুলটা কী হচ্ছে বলব?

—বলুন।

—ফোটোগ্রাফি একটা যন্ত্রের ব্যাপার, সে-যন্ত্র স্মৃতি নিয়ে কারবার করে না। যদি এখন ফোটো তুলি তো আমরা যে যেমন দাঁড়িয়ে আছি, ফোটোতে বলা বাহুল্য ঠিক সেভাবে উঠে আসবে। এবং আপনি যখন সেই ফোটো তিনদিন বাদে দেখছেন তখন বলা বাহুল্য আপনার মনে পড়ে যাচ্ছে যে হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইভাবেই তো আমরা সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন-কি আপনার যদি নাও মনে পড়ে কে কেমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম যখন ফোটোটা তোলা হয়, তবু ফোটোটা দেখার সময় পাগলের মতো এমন সন্দেহ আপনি কখনোই তুলতে যাবেন না যে আমরা কি সেদিন সত্যিই এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, না ফোটোটা ভুল উঠেছে? বুঝছেন কী বলতে চাচ্ছি?

—বুঝছি।

—তাই আপনার যদি মনে ঠিক নাও পড়ে, তবু আপনি সঙ্গে-সঙ্গে বলবেন হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেশ

মনে পড়ছে, আমরা তো সেদিন এইভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। এবং এটা আপনি বলছেন কেন? কারণ ক্যামেরা যন্ত্রটা ভুল করতে পারে না, বিজ্ঞানের উপর এ-বিশ্বাস আপনার আছে। নয় কি?

—এখানে ধ্রুব, সুনন্দার হয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই।

—নিশ্চয় তুমি বলতে পারো বৃন্দাবন, অনেকক্ষণ ধরে তুমি কিছুই বলোনি।

—আমার মনে হয়, আমরা কয়েকজন যারা এ-সভার কার্যক্রম অনুসরণ বা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছি, তারা প্রত্যেকেই নানান দোষে দোষী, এবং সে-দোষের কিছু-কিছু ইতিমধ্যেই এমন বিপুলাকার ধারণ করেছে যে আমাদের শ্রোতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমা চাওয়ার মুখ আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। এ-ব্যাপারে সূত্রধার হিসেবে লোকনাথের দায়িত্বটা আবার হয়তো অন্যান্যদের থেকে আরো একটু বেশি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, সূত্রধার হিসেবে আমি নতমস্তকে স্বীকার করব আমার সমস্ত অক্ষমতা—বাস্তবিকই, সভার কার্যক্রম যেভাবে চলবে বলে আশা করেছিলাম, সেভাবে অনেকাংশেই তা চলেনি, এবং সেসব ক্ষণে তরণী যাতে অন্য স্রোতে পড়ে বিপথে চলে না যায় সেটা দেখার মুখ্য দায়িত্ব ছিল আমারই। সে-দায়িত্ব আমি সবসময় পালন করতে পারিনি, এবং এটাও বলব বৃন্দাবন, কোনো-কোনো সময় সে-দায়িত্ব আমি ইচ্ছা করেই পালন করতে চাইনি। কেন জানো? কারণ কোন্‌টে ঠিক পথ, কোন্‌টে ভুল পথ, এটা কে বলবে? আমি? আমি অত বিজ্ঞ নই, বিশেষত আজ তো নই-ই, আমরা কেউই আর বিজ্ঞ নই। তাছাড়া, আমাকে সূত্রধার করতে স্বীকৃতও হয়েছ, এটা আমার প্রতি তোমাদের এক বিশেষ সস্নেহ পক্ষপাতিত্ব, যে-কারণে বিশ্বাস করো আমি প্রভূতভাবে গর্বিত। কিন্তু সূত্রধার হয়েছি বলেই যে প্রতিক্ষণে নিজের কর্তৃত্ব ফলাবো, চৌমাথার পুলিশের মতো একে থামাবো ওকে চলতে দেব, তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। উলটে আমি চেয়েছি, এ-পালাগান তার পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে নিজের একটি স্বাভাবিক গতি ও রূপ পাক, তাতে কথা যদি কখনো উল্টোপাল্টা ঠেকে, প্রসঙ্গ পরস্পরবিরোধী হয়, বা যেটা প্রয়োজনীয় সেটা যদি ক্ষণেকের জন্যে চাপা পড়ে যায় আর যেটা অপ্রয়োজনীয় সেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তো সে-ক্ষেত্রে আমি বলব সেরকম মাথা চাড়া দিয়ে সেটা উঠুক-না, ক্ষতি কী!

—ক্ষতি অনেক। বিশেষত বড়-বড় ভুল যা হয়েছে, তার শুধু দুটো-একটা আমি এখানে বলতে চাই, অবশ্য যদি অনুমতি দাও।

—বললামই তো, আমি কাউকেই থামাচ্ছি না এখানে, কোনো প্রভুত্বই জাহির করছি না, অনুমতি তোমার রয়েছে।

—উত্তম। সব থেকে প্রধান ভুল যেটা হয়—যেটা লোকনাথ একলাই নয়, আমি এবং কনকও করি—তা গোড়ার দিকে ধ্রুবের বুদ্ধিশুদ্ধি নিয়ে কিছু অমার্জনীয় ফাজলামি করা, এবং যার ফলটা হয়েছে সাংঘাতিক। জানি না তোমরা ঠিক লক্ষ্য করেছ কিনা।

—কী বলতে চাচ্ছ বলো তো?

—ধ্রুবকে নিয়ে অমন টিটকিরি কাটা হয় বলেই ও এখন দেখাবেই দেখাবে, এবং সেটা ও মারাত্মকভাবে দেখিয়ে ছাড়ছেও, যে বুদ্ধিশুদ্ধিতে আমাদের কারুর থেকে কম যাওয়া তো দূরের কথা, উল্টে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের উত্থাপন বা বিশ্লেষণে আমরা কেউই ওর ধার-কাছ মাড়াতে পারি না।

—হে-হে, এটা কিন্তু খুব জব্বর বলেছে বৃন্দাবন।

—দ্যাখো-না ভদ্রমহিলা একটা কথা পাড়তে পারছেন না, অমনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আপনি ঠিক দেখেছেন, না ভুল দেখেছেন? বা আপনি যে ঠিক দেখেছেন, তার প্রমাণ কী? হ্যানো-ত্যানো

ইত্যাদি-ইত্যাদি। প্রাণ একেবারে পাগল করিয়ে ছাড়ে। তার ওপর রকমারি কথা কত—স্বপ্ন, বাস্তব, প্রতিপাদ্য...উরিঃ দাদা-রে-দাদা, শুনে মাথার ভেতরটা ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে।

—তা যা বলেছ ভাই! আমরা সম্পূর্ণ একমত, অবশ্য ধ্রুব কী বলবে জানি না...

—আমি কিচ্ছু বলছি না, বৃন্দাবন ওর কথা শেষ করুক আগে।

—দ্বিতীয় বড় ভুল আমার মতে যা হয়েছে, তা সরাসরি লোকনাথের, যখন সূত্রধার হিসেবে ও পাত্রপাত্রীর পরিচয় জ্ঞাপন করছে।

—উদাহরণ?

—উদাহরণ এখানে একটি দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি। আমার নিজের সম্বন্ধে খুব একটা নাটুকে ঢং করে যা তুমি বললে- এই যেমন আমার নামে অনুপ্রাসের ঝংকার-টংকার, বা সেই নাম যিনি রেখেছিলেন তাঁর চিত্তের এক সম্ভাব্য ধর্মভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গ—সে-বিষয়ে আমি কোনো উচ্চবাচ্য করতে চাই না, কারণ তাতে নিজের কথা বলতে হয়, যেটা আমি বলতে চাই না, কারণ সেটা আমার অভিরুচিতে বাধে। না, আমি যা বলতে চাই তা কনকের কথা, অর্থাৎ কনকের পরিচয় দিতে গিয়ে লোকনাথ যা বলেছে সেই কথাটা, এবং সেটাও আমার মনে হয় লোকনাথের পক্ষে করা উচিত হয়নি।

—কী কথা বলেছি কনক সম্বন্ধে?

—কনক নামটা যখন আওড়াও, আজ প্রথমবার এই সভায়, নামটা বলেই পুং কথাটা তুমি উচ্চারণ করো।

—হ্যাঁ, সেটা করি, মনে পড়ছে।

—শুধু তাই নয়, পরে ভালো করে যখন পরিচয় দিচ্ছ তখনো ঐ একই প্রসঙ্গের জের টানো, বলো মেয়ে করতে-করতে বিধাতা কনককে পুরুষ গড়ে ফেলেছেন—এমন-কি এটা পর্যন্ত বলো তুমি যে রক্তমাংসের নারী যদি না-ই মেলে তো ভেবেচিন্তে কোনো একটা নারী-চরিত্র খাড়া করে কনককেই তাতে তুমি নামিয়ে দেবে আজ।

—হ্যাঁ, সেটাও বলেছিলাম, কিন্তু তা তো কোনো ভুল অর্থে নয়, ওকে কোনো অসম্মানের জন্যে নয়, বরং পাছে ও ক্ষুণ্ণ হয় ভেবে পরেই ব্যাখ্যা করতে বসি...

—কী ব্যাখ্যা করতে বসো সেটা আমাদের জানা আছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কনক সম্বন্ধে তোমার উক্তির সত্য-মিথ্যা আমি যাচাই করতে বসছি না—কনককে তুমি নিশ্চয় আমাদের কারুর-কারুর থেকে আরো ভালো করে চেনো, আরো বেশিদিন ধরে চেনো, সুতরাং যা বলেছ তার একটা ভিত্তি হয়তো আছে, বলতে পারব না। যদিও আমার সম্বন্ধে যদি ওরকম উক্তি কেউ করত এবং সে-উক্তি যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ সত্যও হত, তো আমি অন্তত ক্ষুণ্ণ নিশ্চয় হতাম। যাক গে, আমার বক্তব্য বিষয় আপাতত তা নয়- -উল্টে আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা ঐ উক্তিটা যদি তুমি না করতে তো কনক আজ যেমন ব্যবহার করছে, এ-সভায়, হয়তো সেরকম ব্যবহার করত না।

—কেমন ব্যবহার করছে বলো তো?

—দেখছ না, ওর একটা অদ্ভুত যুদ্ধং দেহি ভাব, যেন আক্রমণ করার জন্যে সর্বদাই ফিকির খুঁজে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য, গলায় কেমন একটা আক্রমণাত্মক স্বরও এনে হাজির করেছে—বিশেষত গোড়ার দিকে তো ধ্রুব বেচারাকে বাক্যবাণে কী-নাস্তানাবুদই-না করে ছাড়ল! এসব ও করছে কেন? কারণ তুমি ওকে সর্বসমক্ষে মেয়ে বলে, অন্তত মেয়েলি বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছ।

—এটা কিন্তু আমার একেবারেই উদ্দেশ্য ছিল না জানো...

—উদ্দেশ্য তোমার কী ছিল না-ছিল সেটা তুমি হয়তো জেনে থাকতে পারো, অন্তত কেউ সেটা জানলে তুমিই জানবে, আমরা জানি না। আমি শুধু বলছি ফলটা কী হয়েছে, এবং সে-ফলটা

সকলেই দেখতে পাচ্ছি। ও যে মেয়েলি নয়, একেবারেই নয়, সেটা সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে প্রমাণ করতে ও বদ্ধপরিকর।

—তো সেটায় এমন কী-দোষ হয়েছে?

—ওর পক্ষে দোষ কিছু হয়নি, বরং ভালোই হয়েছে, কারণ ওর চরিত্র বা স্বভাব সম্বন্ধে তোমার উক্তি যদি কোনো অন্ধকার সৃষ্টি করে থাকে লোকের মনে তো এখন নিজের ব্যবহারের দ্বারা সে-অন্ধকার ও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমার বক্তব্য যা, তা একদিকে যেমন কনকের এই ব্যবহার, তেমনি অন্যদিকে ধ্রুবের ঐ সব তাতে এঁড়েতক্ক...এবং যে-দুটোর জন্যে আমি কিন্তু ওদের কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করছি না, বরং বলছি এ-সভায় এমন কিছু-কিছু ঘটেছে বা কথিত হয়েছে যার ফলে হয়তো ঐরকম ব্যবহার না করে ওদের উপায় ছিল না...

—আরে বাবা, তুমিও-যে দেখছি এক প্রকাণ্ড ভণিতা শুরু করলে—যা বলবার বলে ফেলো না!

—বলছি, এ-দুয়ের ফলেই এ সভার কার্যক্রম অতিরিক্তভাবে ব্যাহত হয়েছে।

—যেমন?

—যেমন আবার কী! আমরা আলোচনা করলাম কী এখনো পর্যন্ত বলতে পারো? হ্যাঁ, পৃথিবীর ছাদের উপর সেই দৃশ্যটা, যেটাই মুখ্য ঘটনা, সেটা সম্বন্ধে আভাস দিতে পেরেছি, মানছি। কিন্তু তারপর? তারপর তো এই ভদ্রমহিলাকে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল...

—এবং সেটাকে তুমি এ-সভার বিস্ময় ও সার্থকতার পক্ষে একটা কম আশ্চর্যকর ঘটনা বলে মনে করো? আগের ক'দিনে এত চেষ্টা তো করা হয়েছে, কিন্তু নারী-চরিত্র তোমার মিলেছে একটাও? আজ সেই নারী-চরিত্র তুমি পেলে, কেমন আপনা থেকে, কোনো চেষ্টা পর্যন্ত না করে—এবং চোখ তো আছে, চেয়ে দ্যাখো, কী-সাংঘাতিক নারী-চরিত্র একটি! এবং তাঁর কাহিনীটাও কী একইরকম ভয়ংকর!

—আহা সেটা অস্বীকার করছে কে? ওঁকে পেয়ে নিশ্চয় এ-সভা ধন্য—কিন্তু ওঁর সেই কাহিনীটা, সেই ভয়ংকর আশ্চর্য কাহিনীটা, সেটা বলতে দাও ওঁকে!

—বাঃ, সেটা উনি তো বললেন, শুনলে না?

—বললেন, কিন্তু কত বাধাবিপত্তির পর, তোমাদের অনাবশ্যক তর্ক ও কথার জালে কত জর্জরিত হওয়ার পর। এবং এক্ষেত্রে আরো মজার যা, তা এই-যে ভদ্রমহিলা যিনি কিছুতে মঞ্চে উঠবেন না, শেষে মঞ্চে উঠলেন, পরে কিছুতে মুখ খুলবেন না, শেষে মুখ খুললেন—অবশ্য তার আগে যাতে তিনি মুখ খুলতে পারেন, তার জন্যে কত প্রার্থনা আমাদের, যে-দেবী সর্বভূতে বাণীরূপে সংস্থিতা তাঁকে কত আবাহন, ইত্যাদি-ইত্যাদি করে তো শেষে সুভদ্রের স্ত্রী মুখ খুললেন—একবার ঐ-যে শ্রীমুখ তিনি খুললেন, মজা হল, তারপর থেকে তাঁর সেই বাণীর তোড় সামলায় কে এখন! তোমাদের পাকে-চক্রে পড়ে উনিও বাচাল হয়ে উঠলেন।

—ছি-ছি বৃন্দাবন, এরকম অসম্মানসূচক উক্তি তুমি নারী সম্বন্ধে করবে না...

—তাছাড়া বৃন্দাবনকে আমারও কিছু বলার আছে এখানে লোকনাথ!

—বলো কনক।

—উনি যদি মুখ না খুলতেন, ঐ যাকে বাণীর তোড় বলছ সেটা যদি ওঁর না ঘটত, তো অমন কাহিনীটা তুমি শুনতে পেতে? এখন কি লজ্জায় সংকোচে বা এক আত্মধিক্কারের ভাবে সেই সুনন্দাকে তুমি চুপ করিয়ে দিতে চাও? এবং সেটা করলে তোমার সভা হু-হু করে এগিয়ে যাবে?

—ওঁকে থামাতে আমি একেবারেই চাই না। উল্টে ওঁর সেই কাহিনীটা যাতে উনি সুষ্ঠুভাবে বলতে পারেন, যাতে কাহিনীটা বলার বদলে তোমাদের হাঁপিজাপি পাঁচশো প্রশ্নের উত্তর দিতেই

উনি অনর্থক মুখরা না হয়ে ওঠেন, আমার কাম্য একমাত্র তাই। এই ধরো উনি একটা স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রসঙ্গ পেড়েছেন এখন থেকে বহুক্ষণ আগে, কিন্তু স্বপ্নে যে তিনি দেখলেন কী, সেটার একটা আংশিক বৃত্তান্ত মাত্রই আমরা শুনতে পেলাম এখনো পর্যন্ত—এ নয় যে সেই স্বপ্নের সবটা উনি বলতে চান না, খুবই চান, আমরাও শুনতে চাই, খুবই চাই, তারই জন্যে তোমাদের শ্রোতৃবৃন্দ অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাস হয়ে—তবু না, কিছুতেই না, কোনো উপায় নেই, স্বপ্নটা আগাগোড়া ওঁকে বলতে দেওয়া হবে না। কেন? যেহেতু ধ্রুবের প্রতিপাদ্য আছে, অমুকের অন্য তর্ক আছে, তমুকের একটা তৃতীয় প্রশ্ন আছে—এর শেষ নেই, নেই। এ কী জ্বালা রে বাবা!

—সুনন্দা, আপনি আপনার স্বপ্ন শেষ করুন—আমরা সক্কলে মিলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাকে আর বাধা দেব না। বলো ধ্রুব!

—বেশ, বাধা দেব না।

—বলো কনক!

—বাধা দেব না।

—আর বৃন্দাবন তো বাধা দেবেই না, সেটা জানা আছে। হ্যাঁ সুনন্দা, আপনি দেখলেন যেটা আমরা পরে পৃথিবীর ছাদের উপর দেখলাম। এক্কেবারে সেই এক দৃশ্য, না? কোথাও তুষার আর নেই, শুকনো রুক্ষ পাহাড়, গন্ধকের রঙের মতো, সর্বত্র গর্ত-গর্ত...

—হ্যাঁ, যতদূর দৃষ্টি যায়।

—তারপর? স্বপ্নের সেখানেই শেষ?

—না-না-না, একেবারেই না। হঠাৎ ছবি পাল্টে যায়। পরেই দেখি, আমাদের হাত-পা'গুলো কেমন বেঁকে গেছে, আমরা কেমন ভয়ংকর কুৎসিত হয়ে গেছি, ঘামে চামড়ার সঙ্গে আমাদের লোমকূপগুলো এত সেঁটে রয়েছে এবং সেই লোমকূপগুলোর গোড়ায়-গোড়ায় কোথাও এমন কালো-কালো বিচিত্র সব পোকার বসতি হয়েছে যে কোন্‌টা পোকা কোন্‌টা ঘাম কোন্‌টা লোমকূপ আর কিছু চেনবার যো নেই। আর রাম-রাম, গন্ধে ভূত পালায়।

—এখানেই শেষ?

—কোথায় শেষ? পরেই যেন একটা-কিছু বলতে চাইলাম, মানে আমি, এবং বলতে গেলামও —কিন্তু যেই বলতে গেছি, দেখি স্বর বেরোচ্ছে না, শুধু বোবাদের মতো গলা থেকে একটা বিকট আওয়াজ বেরোল, এবং সেটা শুনেই আশেপাশে যারা ছিল তারা আমার দিকে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকালে। শেষে তাদেরও একজন-দুজন কিছু বলতে গেল, কিন্তু পারল না, তাদেরও গলা থেকে ঐ একই বোবার মতো আওয়াজ বেরোতে থাকল।

—সত্যি, ভয়াবহ। এই তাহলে আপনার স্বপ্ন?

—দাঁড়ান, আরো আছে। ছবি পাল্টায়। দেখি এবার বিরাট একটা মাঠ, শুকনো খটখটে, আর সেখানে এসে জড়ো হয়েছে জানি-না কত শত-শত বা হাজার-হাজার লোক, আমিও রয়েছি, বোধহয় আপনাদেরও কেউ-কেউ রয়েছেন—শকুনের পাল উড়ে যাচ্ছে আমাদের মাথাগুলোর খুব কাছ দিয়ে-দিয়ে। হঠাৎ দেখি কী জানেন, একেবারে আমার পাশেই?

—কী?

—আমার এক বাল্য-বান্ধবী আছে, জানেন, তার নাম টেঁপি—আমরা সখি পাতাতাম। ওর খুব ঘটা করে খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়, ভারী সুখী হয়েছে, এখন তিনটি সন্তান—বাড়িতে লক্ষ্মীশ্রী ধরে না।

—হ্যাঁ, কী হল সেই টেঁপির?

—হঠাৎ দেখি, সে আমার পাশেই—দেখি, পরনে শতছিন্ন বস্ত্র তার, হাতে কুষ্ঠ, ন্যাকড়া জড়ানো। পরে ও মা, নিজেদের দিকে তাকাতে গিয়েও দেখি একই কান্ড, আমরা সকলেই কুষ্ঠরোগী, সকলেরই হাতে-পায়ে এখানে-ওখানে ন্যাকড়া জড়ানো—আমার স্বামীর দেখি নাকের কাছটা গর্ত, নাকটাই নেই আর।

—অর্থাৎ সারা দেশ ভরে গেছে কুষ্ঠরোগীতে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, সারা দেশ ভরে গেছে ভিখিরিতে, অনাথে—ভরে গেছে বোবাতে, কারুর বাক্য আর নেই। বলুন তো, এ আমি কী দেখলাম, এ আমি কী করলাম!

—এই শেষ?

—হ্যাঁ, এই-ই শেষ। কেন, এততেও হয়নি—আপনারা কি আরো কিছু শুনতে চেয়েছিলেন?

—না, তা নয়। তবে আপনি যা স্বপ্নে দেখেছেন বললেন সেটা আমরা এখনো না দেখলেও অনুমান করা চলে যে সেরকম জিনিস ঘটতে পারে, হয়তো একদিন সত্যিই ঘটবে, আস্তে-আস্তে—হ্যাঁ-হ্যাঁ ঘটবে এই দেশেই, এই পুণ্যভূমিতেই। কিন্তু এর জন্য আপনার একলার এত উতলা বোধ করার দরকার নেই।

—কেন বলছেন দরকার নেই? যা হয়েছে, এবং আরো যা নিশ্চয় হবে, তার কারণে আমার দায়িত্বটা আমি এড়াই কী করে? নইলে সেই রাত্রেই অমন স্বপ্নটা আমি কেন দেখতে গেলাম?

—সুনন্দা, আবার আমি মুখ খুলছি, কিছু মনে করবেন না।

—মনে করব কেন ধ্রুববাবু?

—আমার মনে হয় সুনন্দা, আপনি আগাগোড়া ব্যাপারটায় নিজেকে একটা অতিরিক্ত প্রাধান্য দিচ্ছেন। কারণ কী এমন করেছেন আপনি বলুন তো? মাত্র একটি বারের জন্যে আপনার পদস্খলন ঘটেছে, আপনি ব্যভিচারিণী হয়েছেন, এই তো? কিন্তু একটি নারীর সেই তুচ্ছ ক্ষুদ্র পাপে হিমালয়ের তুষার অন্তর্হিত হবে, সারা পৃথিবী উচ্ছন্নে যাবে? কী বলছেন আপনি? ইতিহাসের প্রথম ব্যভিচারিণী আপনি নন সুনন্দা, শেষ ব্যভিচারিণীও নন।

—হ্যাঁ, এখানে ধ্রুবের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই একমত। না সুনন্দা, এর পেছনে নিশ্চয় আছে অন্যের বা অন্যদের আরো অনেক বড় অন্যায়, আরো ভয়ংকর এক অত্যাচার, সহস্রগুণে প্রচণ্ডতর কোনো পাপ।

—অথবা পাপ-পুণ্যের প্রশ্নই-বা এখানে টানা কেন লোকনাথ? কারণ যা হয়েছে তা হয়তো নিছক এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় বই নয়, হয়তো কাল সকালেই হিমালয়ের মাথায়-মাথায় আবার বরফ গজিয়ে যাবে, কিংবা পরশু গজাবে, বা একমাস বাদে।

—তুমি যা বলছ তা সত্য হোক ধ্রুব, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—এইটেই চাইব আমরা। তবে ভয় কী জানো, যা ঘটেছে, তার পরে আশ্বাস বড় একটা পাচ্ছি না—মনে হচ্ছে, সুনন্দার স্বপ্নের প্রথম অর্ধাংশটাই শুধু সত্য হয়নি, বাকী অর্ধাংশটাও সত্য হবে।

—কী-যে বলে! ঐ বকাসুর-তাড়কাসুর মানুষের পেটে গজাবে?

—মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো কান, ওগুলো হয়তো হবে না, তবে বকাসুর-তাড়কাসুরের মতো ধ্বংসের প্রতীক সন্তান-সন্ততি খুবই জন্মাতে পারে এ-পৃথিবীতে। আর কুষ্ঠরোগ তো হতেই পারে, কত লোকের হচ্ছে—এই তো আসার পথে ঋষিকেশেই দেখে এলাম, এবং নামার পথে শীঘ্রই আবার দেখব।

—এবং এবার শুধু ঋষিকেশেই নয়।

—ঠিক বলেছ কনক, এবার শুধু ঋষিকেশেই নয়। তারপর ধরো সেই বোবার প্রশ্নটা, সেটা

কি ইতিমধ্যেই ঘটতে শুরু করেনি? দেখি কার সাহস আছে অস্বীকার করে! কী হে ধ্রুব, এত বাচাল এই তো ছিলে, হঠাৎ মুখে কথা সরে না কেন? কনক, তুমিও চুপ তো?

—চুপ, কারণ যে আমাদের গলাটা টিপে ধরেছে, তার নাম আমরা উচ্চারণ করতে পারি না। সভায় নয়, নিজেদের মধ্যেও নয়, এমন-কি একলা থাকার নীরব ক্ষণে পর্যন্ত নয়। আমাদের অধিকার নেই।

—সুনন্দা কেঁদে ওঠে যখন এ-সভায় প্রশ্ন তোলা হয়, এ-অভিশাপ কার পাপে, নরের না নারীর? কী, কেউ পারো এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে?

—উত্তরটা জানি, সকলেই জানি—কিন্তু বলার অধিকার নেই।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, এই গড় হলাম। দেখছেন তো, ঘাটে কী করে পেঁাছে যাচ্ছি আস্তে-আস্তে? হ্যাঁ-হ্যাঁ, অনুমান ঠিকই করতে পারছি, এতক্ষণে আপনাদের কল্পনায় চিড়িক-চিড়িক বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে—কত বাজে প্রসঙ্গে সময় নষ্ট করেছি সভার, ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই। তবু এত-যে কথা, কিচিরমিচির, তাতে ব্যক্ত হচ্ছে না যেটা বলতে চেয়েছিলাম। উল্টে এই স্তূপীকৃত তুচ্ছতার দ্বারাই চিহ্নিত করতে চাই বলতে না-পারায় সেই অক্ষমতাটা আমাদের। জানেন, যেটুকু বলে ফেলেছি, তাতেও ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছি। কার্যটা নয়, কার্যের কর্তা বা কর্ত্রীর নামও নয়, শুধু সেই কার্যের অন্যতম ফল হিসেবে যেটাকে মনে করছি আমরা আমাদের এই বাতুল মরীয়া মুহূর্তে, ঐ তুষারের অন্তর্ধানটা, সেটাকে নিছকই এক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করলাম মাত্র। যদিও সে-উল্লেখটা কতখানি বিবেচনার কাজ হল জানি না, কারণ এমন ঘটনা খুবই ঘটতে পারে, হয়তো ঘটছেও, যা প্রকাশ করার অধিকার কারুর নেই।

দেখছেন তাই ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, এ-তিমিরাচ্ছন্ন তরাই-এ আমরা ইতিমধ্যেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অনেক শব্দ অনেক নাম অনেক কথা আমাদের ভাণ্ডার হতে নির্বাসিত। হয়তো ক্রমশই আরো কথা হারাতে থাকবে, সম্পূর্ণ বোবা হয়ে যাওয়ার ঐ পথে।

এই গড় হলাম। এ-কথার উচ্চারণে, এ-ক্রিয়ার কারণে স্ফূর্তির স্রোতস্বিনী আমাদের শিরায়-শিরায়, মধুবাত অন্তরের অরণ্যে।

ঐ-যে হাড়িপা মুনির প্রসঙ্গ পাড়ি, মনে পড়ে? এবার সময় হচ্ছে তার কথায় আসার—ঐ নিছকই একটা ঘটনা হিসেবে, তার বেশি নয়।

এ-তিমির তরাই-এ, কুহকাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আপনাদের এ-গ্রামে, এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমরা গড় হলাম। পক্ষাঘাতগ্রস্ত; তবু গড় যে হচ্ছি, এবং গড় হলাম তা যে বলছি, সে-কথার উচ্চারণে, সে-ক্রিয়ার করণে স্ফূর্তির স্রোতস্বিনী আমাদের ধমনীতে-শিরায়, মধুবাত অন্তরের অরণ্যে।

এক যাত্রাকে বর্ণনা করার এই-যে যাত্রা আমাদের, তাতে এ-অবধি আজ আমরা কোথায় পেঁাছলাম? কোথাও কি পেঁাছেছি? নাকি যে-কোনো পেঁাছনোর প্রসঙ্গটা পাড়াই এখানে ভুল, যেহেতু পেঁাছনো মানেই গন্তব্যে পেঁাছনো, ও তাই মাঝপথে বা মাত্র খানিকটা এগিয়ে যদি নেহাতই নিশ্বাস নিতেও একটু থামি, আশপাশ নিসর্গের দিকে তাকিয়ে ঠাওর করার চেষ্টা করি কোথায় এলাম না-এলাম, সেটাকে পেঁাছনো বলা চলবে না? এবং সে-গন্তব্য যেহেতু এখনো সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে বলেই প্রতীয়মান, পেঁাছনো কথাটা তোলাই-বা কেন?

তাছাড়া হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, যাত্রার বর্ণনার যে-যাত্রাটা, তার গন্তব্যে কী করে পেঁাছবো যদি যার বর্ণনা দিতে বসেছি, সেই আসল যাত্রাটারই গন্তব্যে না পেঁাছে থাকি? কিন্তু সে-গন্তব্যে কি পেঁাছইনি আমরা, উঠিনি পৃথিবীর সেই ছাদে? উঠেছি, কিন্তু ওঠাটা তো মাত্র পায়েরই গন্তব্য ছিল; তার সঙ্গে মনের গন্তব্য যা ছিল, তা পৃথিবীর সেই ছাদে ওঠার পর যে-

জিনিসটা দেখতে চেয়েছিলাম, দেখব বলে আশা করেছিলাম, সেটা দেখতে পাওয়া, অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া। কই, তা তো পূর্ণ হয়নি! আমরা ক্ষুদ্র তুচ্ছ, আমাদের সকল শক্তি-সামর্থ্য তুচ্ছ. তাই মহানুভবা করুণা যদি-না বর্ষিত হয় আমাদের উপর তো কোন্ স্পর্ধায় বোঝাতে চাইব আপনাদের যে পায়েরটা নয়, নয় নয় কিছুতেই নয়, বরং বলবার মতো সকল যাত্রাতে মানুষের একমাত্র যথার্থ গন্তব্য হল ঐ মনেরটাই? পোঁছনো তো নিছক শারীরিক ক্রিয়া কোনো নয়; শারীরিক ক্রিয়াটা থাকবেই—তবু তার উপরেও যা থাকবে, যাকে থাকতেই হবে, তা এক পরিপূর্ণতার উপলব্ধি। আসলে গন্তব্য যেমন পায়েরটা, তেমনি মনেরটা, উভয়ের যথোচিত মিলনেই হর-গৌরীর সংগম, আকাশ-পৃথিবীর মিলিত করতালি, আরতির কাঁসর-ঘন্টা। ছোট মুখে এই বড় কথা মাপ করুন।

আমরা তাই কোথাও পোঁছোতে একেবারেই পারিনি, আসল সে-যাত্রাতে তো বটেই, আজকে বর্ণনার এ-যাত্রাতেও; শুধু অন্ধকার, মুঠো-মুঠো আরো অন্ধকার অর্জন করেই চলেছি, তা ছুঁড়ে দিচ্ছি আপনাদের চোখের উদ্দেশে, এ-সভার স্তব্ধ গুমট শূন্যেতায়-শূন্যেতায়। তার উপর, এসব অসার্থকতা সত্ত্বেও, যখনই মনে হয়েছে হয়তো এসে হাজির হচ্ছি কোনো সত্য উপলব্ধির উচ্চারণের একেবারে চৌকাঠে প্রায়, তখনই সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করেছি কী-এক অনতিক্রম্য অসামর্থ্যে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পঙ্গু হয়ে আসছে, কথা আটকে যাচ্ছে, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, বা খুঁজে পেলেও মুখ খোলার সাহস পাচ্ছি না—দেখছি দিকে-দিগন্তে চাবুক উদ্যত হয়ে আছে।

অতএব এদিকে অন্ধকার হাতড়ে, অন্যদিকে ক্রমশই আরো এক বিপুল ও বীভৎস অন্ধকারের জন্ম দিতে-দিতে, হয়তো কোনো আলোর উদ্দেশে, অথবা আলো কোথাও নেই জেনেই আমরা এগোচ্ছি-পেছোচ্ছি-ঘুরপাক খাচ্ছি লক্ষ্যভ্রষ্টের মতো কত অলিতে-গলিতে, নিজেদের সঙ্গে পাকে-পাকে জড়িয়েছি, ক্রমশই আরো জড়াচ্ছি, আপনাদেরও। তবু আশ্চর্য যা, তা এত সত্ত্বেও কী-এক সংকল্পের চেতনা যেন কামড়ে ধরে আছে আমাদের হাঁটু-গোড়ালি-পায়ের চেটো, কোথায় চলেছি না জেনেও কিছুতেই চলাটাকে থামাতে পারছি না; চলছি-চলছি-চলছি, সমানেই চলে চলেছি। এবং অপার কারুণিক হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, আপনাদের অগ্রিম মার্জনা ভিক্ষা করে বলি, এ-ক্ষেত্রে হয়তো আরো আশ্চর্য যা, তা আমাদের বর্তমান মোহান্ধতায় এই চলাটাকেই বা এই এগোনো-পেছোনো-ঘুরপাক খাওয়াটাকেই মনে করছি বৃহৎ বিশ্বসমাজের সব মানুষের সকল অধ্যবসায়ের প্রতীক হিসেবে, তাকে একাত্ম করতে দেখছি যাবতীয় মানবের সকল কর্মপ্রেরণার সঙ্গে। যেন আগাগোড়া মানুষের ইতিহাসটাই এই—সে চলেছে-চলেছে, চলতে হবে বলেই, একমাত্র চলারই মাধ্যমে তার অস্তিত্ব ঘোষিত হতে পারবে জেনেই, অথবা তা না জেনেই, চলা নিয়ে নিজের সঙ্গে তার এই এক বাধ্যবাধকতার চুক্তি। তা এমন চলার শেষে কোনো লক্ষ্যে সে পোঁছোক বা না-পোঁছোক, সেরকম পোঁছনোর মতো কোনো জায়গা থাক বা না-থাক।

সকল মানুষের সঙ্গে তুল্য হতে পারার হেন স্পর্ধিত কল্পনা কেন, বিশেষত আমাদের, এই ক্ষুদ্র-তুচ্ছের? বলছি, শুনে রাখুন, এ-দলে এমন ছেলেও আছে যে এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে জানে না নাম লিখিয়ে রেখেছে কত কাল, তবু আজো চাকরি মেলেনি যার, একটা পিওনেরও না। সেই সুনীল কিনা অনাদি-অনন্ত কালের বিশ্বমানব? অথবা অনর্থক সুনীলকেই-বা কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা এ-ক্ষেত্রে? আমাদের যে-কোনো কাউকেই ধরুন-না, এই ধরুন আমিই, এই আপনাদের সূত্রধার—কী নামহীনতায় বিধৃত সেই আমারও সারাটা জীবন, সকল প্রচেষ্টা, তার যত আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ-অভিনিবেশ! উদাহরণের ফর্দ তৈরী নাই-বা করতে গেলাম!

মানছি—তবু হ্যাঁ, এবং না; কারণ জানেন, উল্টো প্রশ্নও করা চলে এখানে, জানতে চাওয়া চলে, এরা, অর্থাৎ এই আমরা, বিশ্বমানব নয় কেন? বিশ্বমানব কি এইসব তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা-নাম-

হীনতার বাইরে, একটা অন্য ধাতুতে গঠিত অন্য ব্যাপার? দ্বিতীয়ত, আমাদের এই যাত্রাটাই দেখুন-না, অর্থাৎ হিমালয়ের পথে আমাদের সেই আসল যাত্রাটা, দেখুন-না নিছক হিমালয়টাও, এদের মাহাত্ম্যটা কি কম? এই আশ্চর্য নিসর্গ, বিরাট-বিরাট শৃঙ্গ, ভয়াবহ অরণ্য নিচের দিকে, এবং তার মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে আমাদের বুকে সর্বক্ষণ বহন করা এক অকল্পনীয় অবর্ণনীয় মহানের চেতনাকে—এসব তো স্বভাবতই আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে ভাবতে যে এ এক আশ্চর্য দেশ ও তার অধিবাসী এই আমরাও এক আশ্চর্য মানব; আমরা সীমাবদ্ধ নই আমাদের মধ্যেই, বরং আমাদেরই খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে ঐ নীল-নীল নিবিড় মর্মন্তুদ নীলাকাশে, ঐ দূর বহু উচ্চের চূড়ার কোমর জড়িয়ে ধরে-থাকা মেঘে, হাওয়ায় হঠাৎ-হঠাৎ যে-সুর, তাও বহন করে চলতে-চলতে আমাদেরই নিশ্বাসের গান। এই চলা অনাদি-অনন্ত কালের, এই আমরা যুগের ও যুগ-যুগান্তের।

কী, সেই অতি-পরিচিত ভ্রূকুটি আবার? বলা কি হচ্ছে যে অনাদি নেই, অনন্ত নেই? হ্যাঁ-হ্যাঁ জানি, বলতে হবে না যে যে-হিমালয়ের বয়স পৃথিবীর অন্যান্য অনেক পর্বতমালার তুলনায় কম, সেই হিমালয়ের মধ্যেও আবার এই গাড়োয়ালের দিকটা বিশেষতই এক সাম্প্রতিক ঘটনা মাত্র, হয়তো নেহাত লাখখানেক বছর আগে এর উৎপত্তি, এবং যে-কারণে দেখছেন-না, মনে হয় এদিকের পাহাড়গুলো যেন এখনো স্থিতিশীল কোনো রূপ নিতে পারেনি, কেবলি ভাঙছে চুরছে ঝুর-ঝুর করে পড়ে যাচ্ছে আবার গজাচ্ছে! দেখছেন-না এদিকের পাহাড়গুলো কেমন যেন চুনের পাহাড়, যেন বালির পাহাড়, নেড়া পাহাড়। জানেন, আমাদের মনে পড়ে, ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে, গোমুখ যাওয়ার পথে চীরবাসা ও ভোজবাসার মাঝামাঝি একটা জায়গায় রাস্তা, বেশি নয়, বোধহয় সবশুদ্ধ চল্লিশ কি পঞ্চাশ গজ একটা অংশ পেরোনো। উরিঃ সর্বনাশ! প্রথমত তো আগাগোড়া এই অংশটায় যেখানে পা রাখছেন, সেখানে কোনোরকমে একটা কি বড়জোর দুটো পা রাখার জায়গা আছে। দ্বিতীয়ত, জায়গা যেটাকে বলছি এখানে, সেটা কোনো জায়গা নয়, কারণ সেটা ক্রমশই ঝরে-ঝরে পড়ে যাচ্ছে গভীর খাদের দিকে তলায়, এবং ঝরে-ঝরে পড়ে যাচ্ছে শুধু পা রাখার সেই জায়গাটুকুই নয়, সেই বিশেষ বাঁকটার আগাগোড়া পাহাড়টাই, যেমন উঁচুর দিকে, তেমনি নিচুর দিকে। ফলে জায়গাটা পেরোনোর সময় ভর হিসেবে আপনি যে হাত রাখতে যাবেন কোথাও, তার উপায় নেই; কারণ হাত যাতেই রাখতে যাবেন, সে-পাথর ছোট হোক বড় হোক মাঝারি হোক, আপনার হাতের স্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গে তা ঝুর-ঝুর করে কম-সে-কম বেশ কয়েক শো ফুট তলার দিকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করবে, খুব সম্ভব আপনাকে নিয়েই। আর জায়গাটা যেহেতু রীতিমতো ঢালু, উপর থেকে সরাসরি গভীর তলার দিকে প্রায় পঁচাত্তর ডিগ্রী কোণের মতো, তাই পা পিছলে যদি পড়েন একবার তো ঠেকবেন যে কোথায় গিয়ে তা কেউ বলতে পারবে না। মাঝপথে যে আটকা পড়বেন, কোনো গাছে বা বড় পাথরের চাঁই-এ ঠোক্কর খেয়ে, সে-সম্ভাবনাও নেই—কারণ যতদূর চোখ যায়, সেখানে কোথায় দেখছেন গাছ বা সেরকম কোনো পাথরের চাঁই? যেন শুধু বালি আর বালি—বললামই তো, বালির পাহাড়, যেন চুনের পাহাড়, নেড়া পাহাড়। তবু বলতে নেই, সেই সর্বনাশও আমরা নিরাপদে পেরিয়ে আসি, পেরোন আমাদের দলের মিসেস সরকার পর্যন্ত, যিনি ইতিমধ্যেই তখন এত কাবু যে গঙ্গোত্রী থেকে ঐ ঢালু জায়গাটা পর্যন্ত যে-পথ আমাদের অনেকের পেরোতে লেগেছে সেদিন ঘণ্টা চারেক, তাঁর লেগেছে প্রায় দশ ঘণ্টা। অবশ্য ভদ্রমহিলার বয়সটা আছে, পঞ্চাশের উপরই হবে, তাছাড়া এক ঐ বাড়ির হেঁসেল ঘাঁটা ভিন্ন জীবনে অন্য ব্যায়াম তেমন করেছেন বলে যেহেতু মনে হয় না, এ-পথ তাই তিনি ভাঙবেন কী করে? তবু ভাঙলেন, সেটাই আশ্চর্য, এমন-কি প্রাণ হাতে করে পেরোলেন সেই মারাত্মক জায়গাটা। কৃতিত্ব তাঁর তো বটেই, অনেকখানি গাইডেরও, নিশ্চয়।

যাক, কথা হচ্ছিল এদিককার নেড়া পাহাড়ের, তার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের। চলতে-চলতে

এমন জায়গাও নজরে পড়েছে প্রায়ই, পাহাড়ের ঐ পথেই, যেখানে ভূপৃষ্ঠকে ভারী উৎকট মনে হয়েছে—যেন মারী-গুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ, যে-অঙ্গ রুক্ষ, ধুলোয় ধূসর, আর মারী-গুটিকাগুলো হল ঐ গাত্র হতে ইতস্তত বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে আসা পাথর, কেমন যেন একটা অপার্থিব-অপার্থিব ব্যাপার। তবু, কথা যা, তা হয়তো মাত্র লাখ খানেক বছর আগে এসব কিছুই ছিল না, থাকলেও কোন্ ঢাকনার অন্তরালের অন্ধকারে কোন্ ভিন্ন রূপে সুপ্ত ছিল তা কেউ জানে না। আর গোমুখ থেকে ঐ-যে হুড়হুড় করে গঙ্গা বেরিয়ে আসছে, যাকে স্তুতিমুখর মুনি-ঋষিরা ডেকেছেন দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে/ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে বলে, সে-গঙ্গাও যেহেতু অঙ্গ এদিককার এই হিমালয়েরই অংশের, তাও তাই নয় অনাদি কালের। অতএব ওসব শিবের জটা-ফটার আজেবাজে কথা কেন? ঊর্ধমুখী ইতিহাসে তাকে টেনে নিয়ে যাবে কতদূর?

জানি-জানি, এসব তো অতি-সাবেকী তর্ক। আসলে দৈহিক কালের পরিমাপে কোনো অনাদি বা অনন্ত আছে কিনা জানি না, হয়তো নেই, তবু মানুষের মনের পরিমাপে তা আছে; এবং সেই-খানেই তার একমাত্র সত্য, অকাট্য অস্তিত্ব। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মাত্র একটি ক্ষণের মধ্যেও অনন্তকে ধরা যায়, মানুষ ধরেছে, জানেনই তো, অন্তত বহু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছেন তো—সুতরাং আর যুক্তি কেন?

হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, আমার সঙ্গীরা আপাতত নীরব, আমি তাঁদের অনুমতি নিয়ে পূর্ব-প্রসঙ্গ পাড়ছি। না, এমন কথা আমরা বলছি না, আশা করি আপনারাও কেউ বলবেন না, যে সুভদ্রের স্ত্রীর যে-আশঙ্কা, তাঁর ঐ-যে হাহাকার ও বিপুল নৈরাশ্য, এসব পাগলের প্রলাপ মাত্র। বরং তাঁর দিক থেকে দেখতে গেলে মানতেই হবে, কার্য-কারণের একটা সম্বন্ধ এখানে খাড়া করা চলে, বোঝা চলে যে তাঁর এই অসামান্য ভয়টা তাঁর নিজের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত যখন তাঁরই মুখে শুনলাম তাঁর বৃত্তান্ত, জানলাম তিনি কী করেছেন, পরে কী-স্বপ্ন দেখেছেন, ও তারো পরে যা ঘটল সেই বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের সম্পর্কটা কী দাঁড়াচ্ছে। নিজেকে যে তিনি অপরাধিনী সাব্যস্ত করতে এমন প্রলুব্ধ হয়েছেন, ভাবছেন এত বড় সর্বনাশের একমাত্র কারণ তাঁরই পাপকর্মটি, তাঁর হেন মনোভাবটিকে আমরা খুবই অনুধাবন করতে পারছি, এমন-কি তাঁর প্রতি আমাদের সমস্ত সহানুভূতিও রয়েছে। তবু হাতজোড় করে তাঁর মার্জনা ভিক্ষা করব আগে, বলতে বাধ্য হব যে একটি বিচ্ছিন্ন বলাৎকার যত ঘৃণ্যই হোক, যতই নৃশংস হোক, তা এমন এক পাপ নিশ্চয় নয় যার ফলে সমগ্র মানব-সমাজ বা সেই সমাজের অন্তত মোটা একটা অংশ দুঃখের-ধ্বংসের-পতনের অনিবার্য বন্যায় পর্যবসিত হবে। না-হয় বলাৎকার এটা নয়, না-হয় হোক-না তাঁর পক্ষে এটা আরো বড় এক পাপ, একটা ব্যভিচার যাতে তিনি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছেন, এমন-কি হয়তো যা ঘটেছে তার জন্যে এক অর্থে তিনিই ঐ পাহাড়ী লোকটি থেকে আরো বেশি দায়ী, যেহেতু সেই কলতলায় পাহাড়ীটির প্রথম আচরণের সঙ্গে-সঙ্গেই যদি তিনি উপযুক্ত দাবড়ানি কিছু দিতে পারতেন, হয়তো চেঁচিয়ে উঠলেন বা জোর করে তার হাতটা সরিয়ে দিলেন, তো সে-ক্ষেত্রে হয়তো কিছুই ঘটত না, অর্থাৎ লোকটি সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে মুখ-ঢাকা দিয়ে পালাতো। এটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বলা চলে, পাহাড়ী নয়, সুনন্দাই দায়ী পরে তাঁবুতে যা ঘটল তার জন্য। মান্য সবই চলে; এমন-কি যতই অযৌক্তিক ঠেকুক-না কেন, সুনন্দার এ-আশঙ্কাকেও আমরা সম্ভাবনা হিসেবে ধরতে প্রস্তুত থাকব যে তাঁবুতে সাধিত কর্মের ফলে সুনন্দা হয়তো সত্যিই গর্ভবতী হবে বা ইতিমধ্যেই হয়েছে, এবং সময়ে যে-সন্তান সে প্রসব করবে তাকে দেখতে সত্যিই হবে বকাসুর বা তাড়কাসুর বা বৃত্রাসুর বা সেরকম কোনো দৈত্যের মতো, যদিও বাস্তবে প্রমাণ নেই বলেই তেমন দৈত্য দেখতে হতে পারে কেমন তা নিয়ে আমরা কল্পনাই করতে পারি। তবু হাজার আজগুবি ঠেকলেও নিছক তর্কের খাতিরে আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকব

যে বেশ, সুনন্দা বকাসুর প্রসব করছে, কারণ সে একদা এমন ব্যভিচারিণী হয়েছিল—যেমন কর্ম তেমন ফল, যার কর্ম তার ফল। কিন্তু এই কার্য-কারণের মধ্যে আমরা যারা বাইরের লোক, যারা সুনন্দার পাপকর্মে কোনোরকমে সহায়তা করিনি, এমন-কি সে-কর্মের কথা সুনন্দা একটু আগে নিজে না বললে আমরা কখনো জানতেও পারতাম না—সেই আমরা এসবের মধ্যে আসি কোত্থেকে? জড়িত হই কী করে? আর শুধু আমরাই বা কেন, সারা বিশ্বসংসার, ঐ যাদের ও স্বপ্নে দেখেছে বিরাট এক প্রান্তরে সমবেত হতে এবং যাদের ক্রমাগতই ছেয়ে ফেলছে পাল-পাল শকুনের দল, ঐ সখি-পাতানো তার সেই বাল্য-বান্ধবী, কুষ্ঠরোগী একের পর এক, হাতে ন্যাকড়া-জড়ানো, হ্যানো-ত্যানো, এত অসংখ্য লোক তাদের সমস্ত আশা-ভরসা-নিয়তি নিয়ে জড়িত হচ্ছে হিমালয়ের কোন্ প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্যের অজান্তে সাধিত এক পদস্খলিতা রমণীর পাপকর্মের সঙ্গে?

তাছাড়া কোনো বলাৎকার বা এক ব্যভিচারিণী নারীর কারণে যদি বিশ্বজগৎকে লোপ পেতে হয় তো সে-জগৎ লোপ পেত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই, যেহেতু ঠিক যেমন অমানিশার পরিষ্কার আকাশকে ছেয়ে থাকে নীহারিকাপুঞ্জ, তেমনি রাজারাজড়াদেরই হোক বা সাধারণ জনসমাজেরই হোক, দেশে-দেশে যুগে-যুগে মানুষের ব্যক্তিগত ইতিহাস এমন কত পদস্খলন, কত ব্যভিচারের কাহিনীতে মুখর।

না সুনন্দা, আমাদের সীমিত বিবেচনা-শক্তিতে মনে হয়, এমন এক অস্বাভাবিক চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনি নিজের উপর অত্যধিক অবিচার করছেন। অন্যদিকে, নিজের কর্মের উপর এমন একটি অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ করে অন্তত পরোক্ষে সেই নিজেকেই আপনি এক উৎকট প্রাধান্য দিচ্ছেন; কিন্তু সেরকম প্রাধান্য পাওয়ার বা চাওয়ার মতো যোগ্যতা বা অধিকার কোনোব্যক্তিমানুষের নেই, কখনো ছিল না, কখনো থাকবে না। আপনি কতখানি পাপ করেছেন জানি না, যা করেছেন তাকে নিরপেক্ষ বিচারে পাপ বলা চলে কি না-চলে তাও স্থির করতে আমাদের মতো সর্ব অর্থে সামান্যেরা নিতান্তই অপারগ; তবু শোকসন্তপ্ত চিত্তের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ সহানুভূতি আছে। তাই বলছি, নিজের উপর এমন করে সারা জগতের অভিশাপ আপনি না-হয় নাই কুড়োতে চাইলেন; আশ্বস্ত হোন, তেমন পাপীয়সী আপনি নন। নিজেকে মুক্তি দিন এই-হাহাকারের ঘূর্ণিপাক হতে।

তবে হ্যাঁ, সুনন্দা যে-স্বপ্নটা দেখেছেন, সেটা অন্য প্রশ্ন, এবং তার গুরুত্ব কিন্তু আমরা একেবারেই কমাচ্ছি না। কমাবোই-বা কেন, কমাতে চাওয়ার আমরা কে? বিশেষত যখন স্বচক্ষে আমরা দেখেছি সত্য হতে সে-স্বপ্নের একটা প্রধান অংশকে, হয়তো তার সব থেকে অস্বাভাবিক অংশটাকেই? কারণ হিমালয়ের চূড়ার সব বরফ শুকিয়ে গেছে, এ তো উদ্ভটতম কল্পনারও অতীত এক ব্যাপার—তবু, তা সত্ত্বেও, সেটাই বাস্তবে পরিণত হতে আমরা দেখলাম; এবং তা আমাদের আগে দেখেছেন সুনন্দা, স্বপ্নে। আর এই অলৌকিক যদি ইতিমধ্যেই বাস্তব, তবে আর-যা দেখেছেন তিনি স্বপ্নে, তাও ঐ বকাসুর বা তাড়কাসুর পুত্রের মতো একটা-দুটো খুঁটিনাটি বাদ দিলে অন্যান্য বহুলাংশে একদিন-না-একদিন সত্য হতে খুবই পারে—না, শুধু পারে না, বরং তা সত্য হতেই বাধ্য, যেহেতু আমাদের মতো অজ্ঞের চোখেও ব্যাপারটা নিছক এক কার্য-কারণের সোজা ছকে পড়ে যাচ্ছে, একটা ঘটেছে বলেই অন্যটা না ঘটে যায় না।

অবশ্য ভুল দেখেছি কিনা জানি না, যদিও ভুলের সম্ভাবনা কম বলেই মনে হয়, কারণ এতগুলো চোখ একসঙ্গে ভুল দেখবে সেটা হয় না। পরে, ভুল যদি না দেখে থাকি তো যেটা দেখলাম, সেটা ঘটে থাকতে পারে হয় হিমালয়ের সর্বত্র নয়, শুধু গোমুখ ও তার আশপাশের একটা এলাকা জুড়েই—যদিও সে-ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্ন মাত্র একটি এলাকা হতেই তুষার উবে গেল এবং অন্যান্য এলাকায় তা যেমন চিরকাল ছিল তেমনি রইল, সেটা কী করে সম্ভব হবে জানি না। যাই হোক,

আপাতত এ নিয়েও মাথা না-হয় না ঘামালাম। যা ঘটেছে, হতে পারে তা এক অতি-তুচ্ছ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মাত্র, হতে পারে ঐ উচ্চে হিমালয়ের মতো আশ্চর্য এক স্থানে তা এমন ঘটে থাকে, খুব ঘন-ঘন না হলেও হয়তো ক্বচিৎ-কদাচিৎ। এবং হতে পারে যে তেমন কিছু যখন ঘটে, তা ঘটে অতি অল্প সময়ের জন্যেই, এই ধরুন আজ তুষার উবে গেল এবং কাল বা পরশু বা তরশু কি বেশ তো না-হয় ধরুন পাঁচ-দশ-বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যে আবার সে-তুষার হিমালয়ের মুকুটে-মুকুটে যথাপূর্ব গজিয়ে গেল। তবু সামান্য ক্ষণের জন্যেই হোক বা সামান্য এলাকা জুড়েই হোক, ঐ বিপর্যয়ের ফলে যে-বিপুল পরিমাণ বরফ গলবে, তা তলার পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রে—কে জানে যা ঘটেছে, তার ফলে ইতিমধ্যেই আর ঋষিকেশ নেই, হরিদ্বার নেই, গাঙ্গেয় উপত্যকা নেই। হয়তো ইতিমধ্যেই ধ্বংসের তছনছ লীলা জনপদে-জনপদে, গরু-বাছুরের শব প্রলয়ের রক্তিম বন্যায় তীব্র গতিতে ধাবমান, যেটা আমরা এখনো জানছি না বুঝছি না, যেহেতু অপেক্ষাকৃত অনেক তলায় নেমে এলেও এখনো রয়েছি উচ্চে, এখনো পাহাড়ে, যেখানে জল জমতে পারে না। আর সেটা যদি ঘটে থাকে—ঘটেছে বলেই আশঙ্কা করছি, অন্তত ঘটারই সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে—তবে আর বাকী কী রইল সর্বনাশের? এবং তাই সুনন্দার স্বপ্নের যে-অংশটা সত্য হয়েছে বলে এখনো চাক্ষুষ প্রমাণ পাইনি আমরা কেউ, তাও যে সত্য হওয়ারই পথে অনিবার্য বেগে ছুটেছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশও আর থাকছে না। কারণ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আর তুষার যদি না জমতে পারে হিমালয়ের মাথায় তো ঐ বরফ-গলা বন্যার জল একদিন সূর্যের অগ্নিবর্ষী ছটায় রিক্ত সর্বস্বান্ত ভূমিখণ্ডে ধীরে-ধীরে শুকোবে, সে-মাটির বিরাট-বিরাট ফাটল-ধরা গাত্রে খটখটে মরুভূমি জাগবে—যতদূর চোখ দেখা যায়, দেখা যাবে সেই অন্তহীন মরুর বিধ্বস্ত প্রান্তর, মড়কের রঙ্গমঞ্চ, যেখানে হাজির হবে একদিন ঐ শকুনের পাল, হাতে ন্যাকড়া-জড়ানো কুষ্ঠরোগীর দলও। না-না ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, সুনন্দার স্বপ্নটা নিয়ে টিটকিরি কাটা সমুচিত হবে বলে আমাদের মনে হয় না।

আসলে জানেন, এমন একটা ঘটনা যদি ঘটে, যখন ঘটে, তা পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই ঘটুক-না কেন, সেটা বিচ্ছিন্ন থাকে না, তার প্রকোপ পড়ে দেশে-দেশান্তরে, সমগ্র প্রাণী-জগতে—প্রাণহীন পদার্থেও তা অচিন্তিত রূপান্তর বহন করে আনে। এ-ক্ষেত্রেও সেইরকমই ঘটতে বাধ্য, কারণ যে-সর্বনাশ হয়ে গেছে বা শীঘ্রই হবে বা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছি, তা হবে না শুধু হিমালয়ের এই অংশের, বা নিছক ঋষিকেশ কি হরিদ্বারের, কি গাঙ্গেয় উপত্যকারই—সে-সর্বনাশ হবে সারা পৃথিবীর। তবে জানেন, প্রথমত, আমরা অতি সাধারণ মানুষ, অজ্ঞ, বিজ্ঞানের ছাত্রও নই, তাই বলতে পারব না এ-সর্বনাশের ফল হবে কত সুদূরপ্রসারী বা তার প্রকোপ আগামী বহু দিন-মাস-বছর-শতাব্দী ধরে কোন্ অনন্ত রূপ বা রূপান্তর নিতে থাকবে দেশে-দেশান্তরে; দ্বিতীয়ত, ছোট বলেই, তুচ্ছ বলেই, সীমিত বলেই, এ-সর্বনাশের সম্মুখীন হওয়া মাত্র আমরা ভাবতে বসেছি শুধু আমাদেরই কথা, বন্যার জল হতে রক্ষা করতে চাইছি আমাদেরই পোঁটলা-পুঁটলিগুলোকে—ভাবছি বৃহৎ বিশ্বসমাজের নয়, বরং শুধু আমাদেরই ভূমিখণ্ডের কথা, আমাদেরই আত্মীয়স্বজন প্রিয়-পরিজন চেনা-জনের কথা।

অতএব স্বপ্নটা যদি সুনন্দা নাও দেখত, বা দেখলেও তার কাহিনীটা আজকের এই সান্ধ্য মঞ্চে এভাবে না শোনাতে আসত আমাদের, এবং আমরা যদি শুধু দেখতাম যা দেখেছি ঐ পৃথিবীর ছাদের উপর, আর কিছু নয়, তাহলেও, সুনন্দার সংলাপের কোনো সাহায্য না নিয়েই, আমরা নিজেরাই পাড়তে পারতাম প্রসঙ্গ একে-একে ঐ মড়কের রঙ্গমঞ্চের, পাল-পাল শকুনের, হাতে ন্যাকড়া-জড়ানো কুষ্ঠরোগীর ভিড়ের। অর্থাৎ সুনন্দা, আপনার স্বপ্নটা আমরা মানছি, এবং আপনারই মতো তাকে এক ভীষণ গুরুত্বও দিচ্ছি। কেন শুধু আপনি বা শুধু আমরা, ঐ হাড়িপা-

জুড়িপা-মুড়িপা মুনি, যিনি আপনার স্বপ্নের কথা শোনেননি, কিংবা পৃথিবীর ঐ ছাদের উপরও আমাদের সঙ্গে যাননি, সেই তিনিও যা আভাস দিলেন আগামী কালের, তাও তো কত জায়গায় অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল আপনার স্বপ্নের সঙ্গে, আমাদের আশঙ্কার সঙ্গে।

আপনি তো ছিলেন সেই ভিড়ে, ছিলেন না? গুহার অন্ধকারে? হ্যাঁ-হ্যাঁ, সমবেত ভদ্র-মহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, আপনাদের কৌতূহল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বলছি হাড়িপার সঙ্গে আমাদের সেই সাক্ষাৎকারের কথা। শুধু, তার আগে, পৃথিবীর ছাদের উপরকার সেই দৃশ্য যে-মনোভাবের সঙ্গে আমরা গ্রহণ করছি বা তার উপর যে-ব্যাখ্যা আরোপ করতে চাইছি, সে-সম্বন্ধে একটি ছোট্ট কথা এখানে যোগ করতে সাধ যায়, বিশেষত হাড়িপার প্রসঙ্গটা উঠল বলেই—কেন, সে-কারণটা আপনারা এখুনি উপলব্ধি করতে পারবেন।

আগেই বলেছি, তুষার যে ওখানে অমন হঠাৎ নেই দেখলাম, সে-ঘটনাটাকে নিছক এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মেনে নেওয়া যায়। সে-বিপর্যয় সাময়িক হতে পারে, আবার স্থায়ীও হতে পারে—আমাদের বর্তমান কথা তা নয়। কথা যা, তা বিপর্যয়টাকে যদি নেহাত প্রাকৃতিক আখ্যাই দিই তো বলা চলে, তার সঙ্গে মানুষের কোনো কৃত কর্মের বা সেই কর্মজনিত তার কোনো ভালো-মন্দ বোধের সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ যা হয়েছে, তা হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মেই বা অনিয়মেই, তা হত এ-পৃথিবীতে মানুষ একেবারে না থাকলেও—কট্টর যুক্তিবাদী যাঁরা, এবং আমরা তাঁদের ঈর্ষা করি, তাঁরা হয়তো স্বভাবতই এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষপাতী হবেন। কিন্তু অন্য আরেকটি যে-দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া চলে, যা আমাদের মতো বাতুল কেউ-কেউ নিশ্চয় নেবেন, তা বিপর্যয়টিকে সোজাসুজি মানুষের সঙ্গে যুক্ত করবে, বলবে প্রাকৃতিক নিয়ম বা অনিয়ম খুবই থাকতে পারে, তবে এটা হয়েছে মুখ্যত মানুষেরই পাপে—অর্থাৎ আমি মানুষ, আমি একটা জিনিসকে ভালো বলি, অন্য আরেকটা জিনিসকে মন্দ বলি, আমি ভালো কাজ করি, আমি মন্দ কাজ করি, এবং ঐ যেটা ঘটেছে সেটা যেহেতু যেমন পৃথিবীর পক্ষে তেমনি মানবসমাজের পক্ষে এক প্রচণ্ড মন্দেরই সংকেত বহন করছে, তাই বিপর্যয়টির সঙ্গে আমি বা আমার মতো কোনো মানুষ বা মানুষদের দ্বারা কৃত কোনো মন্দ কর্মের সম্পর্ক শুধু সম্ভবই নয়, স্বাভাবিকও হবে। এমন যদি আমরা ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি তো তার কারণ, প্রথমত, হয়তো সাম্প্রতিক নানান ঘটনাবলীতে আমাদের মন অতীব পঙ্গু এখন, পিঁপড়ের কামড়েও সে চমকে ওঠে—সে-সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যে কী-কী, তার ফিরিস্তি লম্বা না হলেও এখানে সেগুলো আওড়ানোর প্রয়োজন বোধ করছি না যেহেতু জানি তা সর্বজনবিদিত, ও তাই আপনাদের অনুরোধ করব, চিন্তাশক্তি খাটান এবার, অনুমান করতে আপনাদের কষ্ট হবে না আমি কী বোঝাতে চাইছি না-চাইছি। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর ছাদের উপর দেখা বিপর্যয় সে-ঘটনাবলীর অন্তর্গত মাত্র, তা-ই সব নয়; এবং সে-বিপর্যয়টা ফল মাত্র, কারণ নয়, কারণ রয়েছে অন্যত্র—অন্তত তেমন কোনো কার্য-কারণের একটা সূত্র যে এখানে রয়েছে, আমাদের বর্তমান মানসিক অবস্থায় সেইরকম ধারণাই আমরা পোষণ করতে চাইছি।

যা হয়েছে তা যে শুধু প্রাকৃতিক এক বিপর্যয়ই নয়, আমাদেরই কোনো কৃত কর্মের ফলও, এমন ভাবতে চাওয়ার এক সম্ভাব্য দ্বিতীয় কারণ হল এই যে আমরা এ-দেশের মানুষ, এই পুণ্য-ভূমিতে জন্ম আমাদের— এখানকার যত ইতিহাস, যত কাহিনী গাথা গান ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি, তা আমাদের কল্পনাশক্তিকে গোড়া হতেই এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত করেছে, অবাস্তবকে বা অপ্রাকৃতকে আমরা বাস্তবের বা প্রাকৃতের সহোদর ভাইএর মতো মেনে নিয়েছি; শুধু তাই নয়, অনেক সময় ঐ অপ্রাকৃতটাই যেন প্রাকৃত থেকেও আরো সত্য আমাদের কাছে। অবশ্য এসব কথা এমন ফেনিয়ে আমার মতো অক্ষম কেন বলতে যাবেই-বা আপনাদের, যে-আপনারা আরো কত বেশি

জানেন, আরো কত বেশি বোঝেন আমার চেয়ে আরো কত বেশি ভালো করে। এই-যে দাঁড়িয়ে আমরা এই মঞ্চে এখন, অগ্নুন্তি অন্ধকারের মধ্যমণির মতো এই-যে লণ্ঠনের আলোছায়া আলো এখানে ও যার ফলে আমাদের মুখচোখগুলো রহস্যময় ঠেকছে আপনাদের কাছে, জানি তো, ঠিক এই মুহূর্তে সেই আপনারাই আমাদের গ্রহণ করছেন যেটুকু আমরা তার থেকে অনেক বেশি করে—জানি আপনাদের দৃষ্টি আমাদের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী গিলে-গিলে খাচ্ছে, আমরা দৈত্যের মতো বিরাট হয়ে উঠেছি আজ সন্ধ্যায়, মাথা ছুঁচ্ছে আকাশ, হাত-পা প্রসারিত হচ্ছে দিকে-দিগন্তে। কী, ঠিক বলছি না? আমাদের দেখে এখন আপনাদের মনের ভাবটা এইরকম নয়?

তাছাড়া এ-দেশের হই বা অন্য-যে-কোনো দেশেরই হই, আমরা মানুষ, সেইটেই-যে সব থেকে মোদ্দা কথা এখানে। শুধু অন্যান্য প্রাণীদের মতো প্রাণই নয়, আমাদের-যে কল্পনাশক্তিও আছে, আমাদের-যে সৌন্দর্যচেতনা আছে, ন্যায়-অন্যায়ের একটা বোধ আছে, যেটা অন্য কারুর নেই। এক দিকে, যুক্তিশক্তি বলে জিনিসটা একমাত্র আমাদেরই আছে; আবার অন্যদিকে, মহান মুহূর্তগুলিতে যখন ঘণ্টা বেজে ওঠে, নিজেদের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা বিরাটতর হতে যাই, তখন সব যুক্তিকে বিদায় দিয়ে অযৌক্তিক হওয়ার ক্ষমতা ও অধিকারও আছে একমাত্র সেই আমাদেরই, এ-পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণীর বা পদার্থের নয়। অর্থাৎ সমবেত সুধিবৃন্দ, বিপর্যয়টির সম্মুখীন হয়ে তার প্রতি যে-মনোভাব আমরা গ্রহণ করছি, সেটাকে দোষযুক্ত জেনে এখন তার সাফাই গাইতে বসিনি; বরং বলতে চাই, সেটাই একমাত্র উচিত ও স্বাভাবিক মনোভাব যা এমতাবস্থায় আমাদের মতো মনুষ্যপদবাচ্য প্রাণীরা গ্রহণ করতে পারতাম। আমাদের নৈরাশ্য আজ দিকদিগন্তপ্রসারী, হাহাকার রুদ্ধ বাষ্পের মতো ফেটে পড়তে চাইছে; তবু, এত সত্ত্বেও, এখনো-যে যুক্তির অতীত এক ভালো-মন্দের বোধ, এক পাপ-পুণ্যের চেতনা হতে নিজেদের সর্বাংশে বিতাড়িত করিনি, এটা ভাবতে আমরা সুখী বোধ করছি। আসুন, আমাদের এই সুখে অংশগ্রহণ করে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সুরটিকে আপনারাও ধ্বনিত করে তুলুন, এ-সভার নানান ভীষণ অন্ধকারে অদৃশ্যে কিছু আলোক বর্ষিত হোক।

সুনন্দা যেটা করলেন, ঐ সবকিছুর জন্য নিজেকে অমন অপরাধিনী সাব্যস্ত করা, তত্ত্বের দিক থেকে তাই তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ তেমন নেই; বরং মনোভাব হিসেবে তার প্রতি সমস্ত সম্মতিই আমাদের আছে। কারণ বিপর্যয়টাকে মানুষের দায়দায়িত্ব হতে মুক্ত না করে তিনি তাকে যুক্ত করছেন এক পাপ-পুণ্যের বোধের সঙ্গে, মানুষেরই কৃত কর্মের সঙ্গে। শুধু তাঁর গণনায় গোলমালটা হচ্ছে যেখানে, তা দাঁড়িপাল্লায় দুদিক সমান হচ্ছে না, পাপের তুলনায় পাপের ফলটা লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি গুণে ভারী ঠেকছে। অতএব এখন দেখতে হয়, যদি এ-প্রসঙ্গে সুনন্দার পাপটাকে আমরা গ্রাহ্যের বাইরে রাখতে চাই এবং বিপর্যয়ের সামনে যে-মনোভাব নিচ্ছি সেটাও বজায় রাখতে চাই, তাহলে কী-এমন পাপকর্ম কে বা কারা করে থাকতে পারে যা ওজনে সমান হবে তার এই ভয়াবহ ফলের সঙ্গে।

উত্তরটা সুপ্ত ছিল আমাদের মনের ভিতরে, হাড়িপাই প্রথম সেটাকে জাগিয়ে তুললেন, যেন অনেক যত্নে হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে প্রদীপের সলতেটায় জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠিটি ধরালেন। এবং উপমাটা প্রায় আক্ষরিক অর্থে সত্যে দাঁড়িয়ে যায়। কারণ এখনো বেশ মনে পড়ছে, সেদিন গুহার অন্ধকারে আমরা যখন গাদাগাদি করে জড়োসড়ো হয়ে বসেছি, একজনের হাঁটুর উপরে অন্যজনের কনুই, গুহায় কেন ঢুকেছি জানি না এবং ঋষির কথা প্রসঙ্গত এক-আধজনের মুখে শুনলেও তিনি কেমন বা তাঁকে সত্যিই আমরা দেখতে চাই কিনা তাও জানি না, এবং বলা বাহুল্য তাঁকে দেখছিও না যেমন নিজেদেরও দেখতে পাচ্ছি না সেই স্যাঁৎসেতে অন্ধকারে, তখন যেই অমন মুখটি খুললেন

তিনি, কথাটি বললেন, মনে হল যেন কোণে-কোণে মশাল জ্বলে উঠল, যেন ভ্রূকুটি লক্ষ্য করলাম আমাদেরই পরস্পরের। যা বললেন তিনি, তার সাড়া মিলল আমাদের অন্তরে-অন্তরে।

তিনি বললেন—এবং যখন বলতে শুরু করলেন, তাঁর স্বর কম্পিত-মূর্ছিত হতে থাকল জানি না কোন্ পাথরের দেয়ালে-দেয়ালে—বললেন, হ্যাঁ, হতে পারে, আসলে ঠিক সেইটেই হয়েছে। বললেন, যখন একজনের পাপ রূপ নেয় লক্ষ জনের পাপের, এবং সে-পাপের দ্বারা সে-ব্যক্তি যদি লক্ষ জনের জীবনকে আচ্ছন্ন করতে পারে অভিশাপে-অকর্মণ্যতায়, তবে এক সূর্য লক্ষ সূর্য হয়ে জ্বলবে আকাশে, তা তখন ঐ তুষারের তেপান্তর অগস্ত্যের গণ্ডূষের মতো শুষে নেবে। অবশ্য শুষে নেওয়ার বা জলকে বাষ্প করার প্রক্রিয়া আসবে পরে—আগে যা আসছে, তা ঐ বরফটাকে গলানোর মতো অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সুনন্দার উক্তিরই প্রতিধ্বনি করে হাড়িপা-জুড়িপা-মুড়িপা মুনি বললেন, এই পুণ্যভূমিতে একটা ব্যভিচার ঘটেছে, একটা যুগান্তকারী বলাৎকার। বললেন, তিনি দেখতে পাচ্ছেন, কী করে একদিন হাত-পা বেঁকে আসবে মানুষের, সে পঙ্গু হবে দেশে-দেশান্তরে, তার জননেন্দ্রিয়ে কামড় বসাবে এসে বিকটাকার খেঁকশিয়াল। মনে পড়ছে যেন, প্রশ্ন করা হয় বোধহয় আমাদেরই মধ্য থেকে, যাদের অমন দেখছেন তিনি ঐ দূরদৃষ্টিতে, তাদের মধ্যে কি আমাদেরও কেউ-কেউ রয়েছে?

বলা বাহুল্য, এ-প্রশ্নটা যে করে, সে যোগী নয়, সাধক নয়, সে আসক্তিরই উপাসক—ঐ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত নামক তিন বিভিন্ন অবস্থার যে-উল্লেখ মুনি পরে করবেন, তার দ্বিতীয়টিতেই সে-ব্যক্তির সর্বক্ষণের অস্তিত্ব। ঋষি বলবেন, সে স্বপ্নের মধ্যে আছে—অর্থাৎ যেটা আমরা প্রত্যেকেই। কারণ প্রশ্ন যে করে, সে তো আমাদেরই একজন, এবং যে-প্রশ্ন সে করে, সেটা তার মুখ থেকে না বেরোলে হয়তো বেরোত আমাদেরই অন্য কারুর মুখ থেকে—আর সেই কারণেই, প্রশ্নটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই, বেশ মনে পড়ছে একাগ্রতায় আমাদের সকলের কান খরগোশের মতো খাড়া হয়ে ওঠে, জানতে চাই, দেখি-তো দেখি-তো, ঐ পঙ্গু মানুষের ভিড়ে মুনি আমাদেরও কাউকে দেখছেন কিনা। কারণ তখনো, যেমন এখনো, একমাত্র স্বার্থান্বেষণেই নিয়োজিত আমাদের সমস্ত মুহূর্ত—তাই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে আসলে যেটা জানতে চাইছি, সেটা ততটা আমাদের যে-কোনো কারুর কথা নয়, যতটা আমার কথা, একমাত্র আমারই নিজের কথা; মুনি কি সেই ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? এখানে ধ্রুব ভাবছে ধ্রুবের কথা, সুনন্দা সুনন্দার কথা, লোকনাথ লোকনাথের।

হাড়িপার উত্তরও তাই ঝটপট: আরে বেটা, তখনো তুমি ভাবছ তোমার নিজেরই কথা? পরেই প্রশ্নকর্তাকে তিনি বলছেন যে না, সে-ভিড়ে প্রশ্নকর্তা রয়েছে কিনা তিনি দেখতে পারছেন না, যেহেতু ভিড়ের মধ্যে সে থাকলেও তাকে এখন চেনা দুষ্কর, যেমন দুষ্কর চেনা যে-কোনো কাউকে। কেন? কারণ, আবার সেই সুনন্দারই স্বপ্ন—চেনা যাচ্ছে না, কারণ রোগে ক্ষয়ে রিক্ততায় সব মানুষ কেমন একরকম, একেবারে যেন একই রকম দেখতে হয়ে গেছে; তাদের জামাকাপড়গুলোর রঙও এককালে নিশ্চয় ভিন্ন-ভিন্ন ছিল, আজ তার সবই ধুলায় ধূসর, মলিন, জীর্ণ। আর সকলেরই চোখে কী-একই রকম এক আশ্চর্য নিস্তেজ দৃষ্টি, যাতে আশার চিহ্ন আর নেই—একের পর এক যেন মরা মাছের চোখ। অথচ মৃতও নয়, কারণ প্রাণ আছে, এক বিচিত্র প্রাণহীন প্রাণ তখনো আছে—হায়, কেন আছে!

অবশ্য না-চিনতে পারার সব থেকে বড় কারণ হল ঐ ক্ষয়, ঐ রোগ, যা তখন ব্যাপ্ত সকলেরই দেহের সর্বত্র। এই যেমন, এককালে নাকটা যেখানে ছুঁচলো ছিল, আজ সেখানটা ভোঁতা, সেখানে এক অস্বস্তিকর মসৃণতা—সব কেমন গোল-গোল, সরল রেখা কোথাও নয়, বরং কেমন এক মোলায়েম

বক্রাকৃতি। অথবা কনুইটার যেখানে ধার ছিল, চাইলে যা দিয়ে গুঁতো দেওয়া যেত কাউকে, হাড়িপা দেখছেন আজ সেখানে শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের মতো এক বঙ্কিম কোণ মাত্র, যা দিয়ে চাইলে ক্রীড়া-রসিক পোকামাকড় দিব্যি গড়িয়ে পড়তে পারে। এদিকে গাত্রে রোম কোথাও নেই, ফাঁপা চামড়ায় এক ফাটল-ধরা মসৃণতা, যে-চামড়া দিয়ে এবার জুতো বানালেই হয়। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে চেনা তো যাচ্ছেই না, তাদের একজনকে আরেকজন হতে পৃথক করাও সম্ভব হচ্ছে না।

এমন-কি কে যুবা কে বৃদ্ধ, অথবা কে নারী কে পুরুষ, তা পর্যন্ত বিচার করা আর যাচ্ছে না আজ। আজ সব একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু হাড়িপা-জুড়িপা-মুড়িপা মুনি, কেন আপনি অমন আজ-আজ করে কথা বলছেন? গোমুখ থেকে প্রত্যাবর্তনের এই পথে আমরা ভয়ে-বিস্ময়ে-দুশ্চিন্তায় ইতিমধ্যেই হতবাক; তায় আপনি যা বলতে শুরু করেছেন, তার ফলে এখন ভাষাটাই না ভুলে কি উপায় থাকবে? কারণ আজ-আজ করে যার বর্ণনা আপনি দিচ্ছেন, কই, তা তো এখনো ঘটেনি। কারণ এই তো দিব্যি মাথা ঘোরাচ্ছি, হাত দিয়ে নাকের ছুঁচলো ডগাটা ছুঁচ্ছি; অথবা এই তো বেশ চিনতে পারছি সুনীলকে, বা অমুকের স্ত্রীকে, বা চোখ থেকে খুলে-আনা ও এখন দুই আঙুলে ধরে-থাকা ধ্রুবের চশমাটাকে। কোথায় তবে সেই আজ আপনার, কেন আজ?

প্রশ্নটা করে বোধহয় আমাদের কেউ, কিংবা আসলে করেনি; কিংবা আসলে তা এর-ওর মনেই উঁকিঝুঁকি মারছিল, যখন মুনি তাঁর সাধনার অর্জিত ক্ষমতায় সেটা অনায়াসে শুনে ফেললেন। তাই বললেন, গতকাল আজ ও আগামী কাল, বা এক বছর কি এক দশক আগের বা পরের অবস্থা, এগুলো একটি রেখারই সামনের বা পিছনের বিন্দুবিশেষ, এবং সেই কারণে দূরে চোখকে নিয়ে যাওয়াতে অভ্যস্ত যিনি করেছেন, তিনি চাইলে রেখার যে-কোনো বিন্দুতে স্বয়ং স্থির থেকে ঘাড়টা এদিকে-ওদিকে ঘোরাতে পারেন, দেখতে পারেন সামনে বা পিছনে কী হচ্ছে না-হচ্ছে। এবং শুধু দেখাই নয়, তারই সঙ্গে কানে নানান শব্দ শোনা, নাকে নানান ঘ্রাণ পাওয়া, যে-শব্দও তিনি শুনছেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ এই মুহূর্তেই—যে-ঘ্রাণও তিনি পাচ্ছেন। কিসের শব্দ? তা ঐ লক্ষ সূর্যের অগ্নিবর্ষী প্রান্তরে প্রায় নীরবতারই সামিল এক অস্পষ্ট গোঙানি যেন, কেমন এক খোলা-খোলা আওয়াজ, যা বেরিয়ে আসছে মানুষেরই কণ্ঠ হতে বা তার এককালীন ছুঁচলো নাকের পরিবর্তে আজ যা রয়েছে সেই জায়গাটা হতে—এবং সেটা একটা শব্দ বই নয়, তাকে কেউ স্বর বলবে না, তা কোনো কথা নয়, কোনো সংলাপ নয়, কোনো অর্থপূর্ণ ধ্বনি পর্যন্ত নয়। এমন-কি তা হয়তো ইচ্ছাকৃতও নয়, নিশ্বাসের সঙ্গে যেন হঠাৎ-হঠাৎ আপনাআপনি বেরিয়ে আসছে, অনেকটা তারা যে এখনো বেঁচে আছে সেইটেরই যেন এক প্রমাণ হিসেবে। এবং সেই শব্দও যা, তা তাদের পরস্পরের মধ্যে এত সাধারণ, এত একই রকম, যে সেখানেও ব্যক্তিত্বের ছাপ কোথাও নেই—অর্থাৎ শব্দ শুনে বোঝা যাবে না সেটা অমুকে করল না তমুকে করল। মনুষ্য-জগতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এক আশ্চর্য নামহীনতা, পরিচয়হীনতা, ব্যক্তিহীনতা।

অবশ্য সেটা যে নামহীন বা পরিচয়হীন বা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন, অথবা সে-শব্দ শুনে যে তা ঠিক কার গলা বা নাক হতে বেরোচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না, এমন বলারও বিশেষ অর্থ হয় না। কারণ সেটা বললেই এরকম ধরে নিতে হয় যে সে-শব্দ বার করছে যারা বা তা বেরিয়ে আসছে যাদের থেকে, তারা যেমন এক দলের মানুষ, তেমনি অন্য আরেক দলের মানুষও রয়েছে যারা সেই শব্দের কোনো অর্থ আছে কিনা, বা তা কতখানি নামহীন বা পরিচয়হীন বা ব্যক্তিত্বহীন, অথবা কোনো গৃহীত বা বিদিত অর্থে তাকে একেবারেই শব্দ বলা যায় কিনা, সেটা বোঝবার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, এমন একটি অন্য দলের মানুষ যারা সেই শব্দ শোনার জন্যে ঐ একই জায়গায় তখন

উপস্থিত রয়েছে। না-হয় গোটা একটা দলের মানুষ নাই হল, না-হয় মাত্র একটি মানুষই হল, সেও কি তখন থাকতে পারে সেইখানে সে-শব্দ শোনার জন্যে বা তা বোঝার জন্যে? হাড়িপার উত্তর হল, সেরকম কেউই তখন থাকবে না, তবে প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হয় কারণ হাড়িপা সেই পরের ঘটনাটাকে আজ এইখানে বসে দেখছেন, যা শব্দ উঠছে সেখানে তখন তাও এইখানে বসেই শুনছেন; অতএব একদিকে একদল লোক রয়েছে যারা দৃশ্য ও শ্রাব্য, অন্যদিকে রয়েছেন আরেকজন যিনি দর্শক ও শ্রোতা। কী-ঘ্রাণ পাওয়া যাবে বা না-যাবে সেদিন, সেই লক্ষ সূর্যের ছটার তলায়, সে-সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য হবে—অর্থাৎ সেই একই প্রশ্ন ও উত্তর। অর্থাৎ, ঘ্রাণ পাওয়ার মতো থাকবে কি কেউ? এবং পরে, না, থাকবে না, কিন্তু সে-ঘ্রাণ পাচ্ছেন আজ হাড়িপা।

তাঁরই মতন জিনিসটা এখনই হুবহু দেখতে পাওয়া, বা সে-ঘ্রাণটাকে শুঁকতে পারা, সে-শব্দটা শোনা, তা নিশ্চয় আমাদের মতো সামান্যদের সাধ্যাতীত। তবু খানিকটা কল্পনা করা যায়, যায় না কি?

ভাবতেই মজ্জায়-মজ্জায় হাড়ের ভিতরে-ভিতরে যেন এক কন্‌কনে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল, যেন যে-তুষার হঠাৎ অন্তর্হিত হিমালয়ের মুকুট হতে, তার খানিকটা এসে বাসা বেঁধেছে আমাদেরই শরীরের গোপন খোপে-খোপে। আমরা কেউ-কেউ তাই সভয়ে নিজেদের কনুইএর দিকে তাকাবার চেষ্টা করি, নাকের ডগাটা এখনো কতখানি ছুঁচলো তা পরখ করার জন্যে সেখানে আস্তে অতি-আস্তে আঙুল বোলাতে চাই—এত আস্তে, এত সাবধানে, যাতে তা করতে গিয়ে যেন নিজেরাই নিজেদের নজরে না পড়ে যাই। আশ্চর্য যা, তা প্রত্যেকেই ভাবছি একই রকম কথা, এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেককে এড়াতে চাইছি। যেন যে-নোংরাটা আমাদের ঘিরে ধরছে বা এই ধরে ফেলল বলে, তার চেতনামাত্রেই আমরা এত লজ্জিত যে সে-সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরকে কিছু জানতে দিতে চাই না—যেন ব্যাধিটা গোপন, মাত্র আমারই, একজনেরই, এবং তার অস্তিত্ব আমাদের দলের অন্য কাউকে জানাতে চাইছি না।

এমনই কসরত শুরু হয়েছে যখন, তখন চেয়ে থাকতে-থাকতে কখন হঠাৎ মনে হয় ঐ তো, কনুই-এর ধারটা তো আর সেরকম নেই, কেমন এক মসৃণতা যেন এখনই অভিযান চালিয়েছে আমাদের দেহের সর্বত্র, যেন সে-দেহে কোথাও আর এমন কোণ নেই যেখানে দুটি সরল রেখা এসে মিশছে—যেন উঁচু-নিচু এখনো যা আছে দেহে, তা এক মোলায়েম ঢিবিরই মতো, আগাগোড়া যেন একটি বক্র রেখারই অগ্রসর গতি। এমন মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ দেখতে পাই, আমারই সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, এক অন্য মানুষ ইতিমধ্যেই, যার চোখে এক অদ্ভুত রুগ্ন ভ্যাপসা দৃষ্টি, নাকের কাছটা গর্ত। এবং এ-ছবি আমি একলা দেখছি না, আমাদের অনেকেই, হয়তো সকলেই—অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্নভাবে সকলেই নিজেকে দেখছে, ঐরকম এক অন্য মানুষ হিসেবে। এইভাবেই, আবার কখন সম্বিৎ ফিরে আসে, দেখি, না-না, নাকটা তো আগের মতনই রয়েছে, যেমন ছুঁচলো ছিল সেইরকমই আছে। কিন্তু কী হতে পারে, বা কী নির্ঘাত হবে একদিন, তার একটা ধারণা পেয়ে গেলাম, কল্পনায় সেই দূরের নিজেদের দেখলাম।

কনক তুমিই, না বৃন্দাবন তুমিই, মনে নেই কে, কিন্তু আমাদেরই একজন বোকার মতো, ন্যাকার মতো প্রশ্নটা করে বসে : এমন কী-ব্যভিচার কে করে থাকতে পারে, কোন্‌ বলাৎকার?

—এটা কিন্তু ভালো হল না লোকনাথ, আমি অমন কোনো প্রশ্ন করিনি।

—তবে ভুল হয়ে গেছে ভাই, মাপ করে ফেলো কনক।

—এবং আমিও করিনি।

—তোমার ক্ষেত্রেও তবে ভুল হয়ে গেছে বৃন্দাবন, মাপ চাইছি। কিন্তু প্রশ্নটা কেউ করে,

আমাদেরই একজন, মনে পড়ছে? তোমরা তো ছিলে গুহার মধ্যে, ছিলে না? কী কনক?

—না, আমি ঢুকিনি। ঐ তো ঢোকার মুখটায় ঐটুকু গর্ত, তায় ঢুকে পড়লে তোমরা জানিনে কতজন—কী করে জায়গা যে হল তোমাদের, সেইটেই আশ্চর্য।

—সে কি! ঢোকোনি? আশ্চর্য! কোথায় ছিলে তখন তবে?

—বাইরে ছিলাম, ঘুরছিলাম। একটা সাঁকো ছিল কাছাকাছি মনে পড়বে তোমাদের, কাঠের সাঁকো, যার তলা দিয়ে তুমুল গর্জনে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, ঐ গৌরীকুন্ড না কী-যেন জায়গাটা, তার প্রায় সামনেই, ঐ গঙ্গোত্রীতেই, মনে পড়ছে তো? আমি সেই সাঁকোটার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম তখন।

—আর তুমি বৃন্দাবন?

—আমিও ঢুকিনি।

—আরে, এ তো রীতিমতো আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি! তবে এতগুলো লোক যে ঢুকলো আমার সঙ্গে, তারা কারা? ধ্রুব, তুমি?

—না স্যার, আমিও নই। তবে হ্যাঁ, ঢোকে বেশ কিছু লোক, সেটা জানি, স্বচক্ষে দেখি। ঢোকার জন্যে গর্তটার মুখে কেউ-কেউ নিচু হয়ে জুতো খুলছে, তাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুমি বৃন্দাবন বোধহয় আমারই সঙ্গে ছিলে তখন, না? আমরা দুজনে বোধহয় একটু হাঁটতে বেরোলাম, নাকি জল খেতে, বা পেচ্ছাব করতে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আমরা দুজনে বেরোই। কিন্তু না লোকনাথ, ঢুকে তোমরা ছিলেই, সন্দেহ নেই। আমিও দেখেছি।

—যাক বাবা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচছি। তোমাদের রকমসকম দেখে আমার তো ভয় ধরে যাচ্ছিল, মনে হতে শুরু করেছিল হাড়িপার ব্যাপারটাও মায়া মাত্র, আসলে ঘটেনি, নিছক নিজেরই এক কল্পনার সঙ্গে আমি বাস্তবকে আবার হয়তো গুলিয়ে ফেলছি।

—আরে দূর-দূর, ওসব ভাবছ কেন! হাড়িপার গপ্পও তো তুমি আমাদের কাছে করেছ, কী কনক, করেনি লোকনাথ?

—বিলক্ষণ করেছে। হাড়িপা কী বললেন না-বললেন, তাঁকে দেখে বয়স বোঝা যায় না বা হ্যানো-ত্যানো, বা গুহায় ঢুকেই সে-কী অন্ধকার, পরে কী করে আস্তে-আস্তে একটি-একটি করে বস্তু ফুটে উঠতে থাকল চোখে, ইত্যাদি-ইত্যাদি...

—গুহার সেই বর্ণনা, সেই আরেক জায়গায় ছোট্ট গর্ত কেটে কেমন এক গবাক্ষ করা...

—একটা জানলা যেন, এবং কী-সুন্দর তার উপর এক পর্দা পর্যন্ত টাঙানো...

—হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই রুমালের সাইজের পর্দা, গেরুয়া কাপড়ের...

—এবং হাড়িপা যেখানটা বসেছিলেন, সেখানটা কী-চমৎকার এক গদীর মতো করা, যা বিছানা-কে বিছানা, ধ্যানে বসার জন্যে আসন-কে আসন...

—এমন-কি ধ্যান সম্বন্ধে হাড়িপার সেই প্রশ্নটা, অর্থাৎ লোকনাথের এক প্রশ্নের উত্তরে যে-পাল্টা প্রশ্ন তিনি করলেন—কী লোকনাথ, সকলের গোচরার্থে এখানে আওড়ে দিই একবার তোমার সেই কাহিনীটা?

—দাও-না দাও-না, দেখি কেমন মনে আছে?

—অতএব হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, সমবেত সুধিবৃন্দ, এই গড় হলাম। সে-কাহিনী এবার আপনারা শুনুন তবে। আমাদের সূত্রধার মহাশয়, শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য, মাথাটি নিচু করে সেই দরজা-রূপী গর্তের মধ্য দিয়ে সবে তখন ঢুকেছেন গুহায়, অবশ্য তিনি একলাই নন, তাঁরও আগে দলের আর কেউ-কেউ ঢুকে পড়েছেন, অথবা তাঁর পরেই ঢুকছেন। যাই হোক, ঢুকে

তো লোকনাথ পড়লেন, ঢুকে আসনও গ্রহণ করলেন, আসন মানে মাটির স্নিগ্ধ দাওয়া মাত্র—মাটির না পাথরের, লোকনাথ?

—হয়তো পাথরেরই, শুধু সেই পাথরের উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া, ঠিক মনে পড়ছে না।

—যাই হোক, আসন গ্রহণ করলেন, এবং তা করার সঙ্গে-সঙ্গে চোখে অন্ধকারও দেখলেন। আসলে বাইরের ঐ আলো থেকে গুহায় ঢুকেই আর কিছু দেখতে পেলেন না, সাময়িকভাবে, শুধু ঢুকে ঐ অন্ধকারের মধ্যে যেই মনে হল পায়ের তলায় খালি জায়গা পাচ্ছেন অমনি বসে পড়লেন, পরে অচিরেই অনুভব করলেন তাঁর হাঁটুতে হাঁটু ঠেকছে অন্যের, অর্থাৎ বুঝলেন ঘর বা সেই গুহা ততক্ষণে তাঁরই দলের লোকে ভর্তি হয়ে গেছে বা খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। অবশ্য সে-গুহা তাঁরাই ভর্তি করলেন না তাঁরা ঢোকার আগেই সেখানে অন্য কেউ বা কারা এসে উপস্থিত ছিলেন তা তিনি সে-মুহূর্তে জানতেন না, এবং সেরকম কোনো প্রশ্ন নিজেকে করার মতো মনের অবস্থাও তখন তাঁর ছিল না। যাই হোক, তিনি বসলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আস্তে-আস্তে দৃষ্টিশক্তি ফিরতে থাকল— প্রথমেই, একেবারে সামনে, সেই গদীর উপর উপবিষ্ট মুদ্রিতনয়ন হাড়িপা মহারাজকে দেখলেন। দেখছেন দেখছেন তাকিয়েই আছেন, কেউ কোনো কথা বলে না, শেষে কখন লোকনাথ স্বয়ংই হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বসলেন—জানতে চাইলেন, ধীর স্বরে ও যথোচিত বিনীতভাবেই, কিসের এমন ধ্যান করছেন হাড়িপা মহারাজ? হুট করে এমন একটা প্রশ্ন করে বসার পিছনে লোকনাথের অবশ্য বলবার মতো তেমন কারণ কোনো ছিল না—এক যা ঘটে থাকতে পারে এই যে এসব ব্যাপারে আমাদের মতো অন্যান্য সাধারণ গৃহীরা যেমন আনাড়ি হয়ে থাকেন, তেমনি আনাড়ি আমাদের সূত্রধার মহাশয় হলেও তিনি হাড়িপা-জাতীয় মুনিঋষিদের জীবনযাত্রায় এক অহেতুক আগ্রহ দেখাতে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। অথবা এমনও হতে পারে—কিছু মনে ক'রো না লোকনাথ...

—না-না, মনে করব কেন?

—হতে পারে হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, যে আমাদের মহামান্য সূত্রধার মহাশয় তখন হাড়িপার চোখে একটু জাতে উঠতে চান, তত্ত্বকথা তিনিও-যে বলতে পারেন, অন্তত সেসব ব্যাপারে তাঁরও-যে উৎসুক্য একটা আছে, সেটা হাড়িপাকে দেখাতে তিনি চান, এবং হয়তো তাই এমন একটা আশার স্ফুলিঙ্গও তখন তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে যে প্রশ্ন শুনে অভিভূত হয়ে হাড়িপা তাঁকে বলবেন বা-বা বেটা, একটু কাছে এসে এগিয়ে ব'সো তো সই! অবশ্য পাছে তাঁর প্রতি অবিচার করে বসি—বিশেষত যখন এ-মুহূর্তে সর্বসমক্ষে আলোচনাটা চলছে—তাই হুট করে অমন একটা প্রশ্ন হাড়িপাকে করে বসার পিছনে লোকনাথের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে এটুকুও এখানে যোগ করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে হ্যাঁ-হ্যাঁ, এমনও লোকনাথ খুবই ভেবে থাকতে পারেন যে এসেছেনই যখন এমন পুণ্য স্থানে, তখন সেখানকার অধিবাসী মহাত্মাদের অন্তত এক-আধজনের সঙ্গে দেখা না করে, বা শুধু দেখাই নয়, দেখার পর তাঁদের সঙ্গে পারমার্থিক কিছু কথা একেবারেই না বলে তিনি ফিরবেন কেন? বিশেষত যখন যাওয়ার পথে, অর্থাৎ গোমুখের পথে গঙ্গোত্রীতে সেই প্রথমবার থামার সময় এমন একটা ইচ্ছাপূরণের কোনো অবকাশই আমাদের কেউই পায়নি? তখন তো কোনোদিকেই আমাদের কারুরই কোনো খেয়াল ছিল না, শুধু দেহের ক্লান্তির জন্যে মাঝে-মাঝে না থামলে নয় বলেই থামছি, কোথাও-কোথাও রাত না কাটালে নয় বলেই কাটাচ্ছি, নইলে সমস্ত মন আমাদের পড়ে রয়েছে তখন একমাত্র চরম গন্তব্যেরই শেষের বিন্দুতে— সর্বদা আকুলতা, কতক্ষণে পৌঁছোব সেখানে, দেখব যা দেখতে এসেছি! আর এটাও তো কিছু কম সত্য নয় যে এসব জায়গায় এলে লোকে সাধারণত মুনি-ঋষি-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করতে চায়ই, কারণ ঐ মুনি-ঋষি-সন্ন্যাসীরাও যে এখানকার আগাগোড়া অভিজ্ঞতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এই

সামগ্রিক নিসর্গ-শরীরের অন্যতম হাত-পা। আর হ্যাঁ, কারণগুলো আলোচনা করছিই যখন, তখন অন্য সেই আরো একটি সম্ভাবনাকেও গ্রাহ্যের বাইরে আমি রাখতে চাই না—বরং বলব, যদিও জানি না সে-সম্বন্ধে লোকনাথ তখন সচেতন ছিল কিনা বা তখন না থাকলেও পরে তা নিয়ে ভাবতে বসে ইতিমধ্যে সচেতন হয়েছে কিনা, আমার তো আপাতত মনে হচ্ছে অমন একটা প্রশ্ন যে করে বসল সেদিন লোকনাথ, তার একমাত্র কারণ হল সেই সম্ভাবনাটাই, অর্থাৎ কারণ হিসেবে যে-সম্ভাবনার কথাটা আমার এখন মনে জাগছে। সমবেত সুধিবৃন্দ, হে উৎসুকশ্রবণ, প্রদীপ্তনয়ন, কী সেই সম্ভাবনা? উত্তরটা আপনারা আন্দাজ করতে ইতিমধ্যে নিশ্চয় পারছেন, কারণ সে-উত্তরটি খুঁজে পাওয়ার জন্যে আকাশপাতাল ভাবার দরকার নেই, বরং অতি সোজা বলেই তা আপনাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর ছাদে পৌঁছে অপ্রত্যাশিত ঐ বিপর্যয়ের আবিষ্কারের ফলে আগাগোড়া ফেরার পথটায় সকলেরই মন এমন বিভ্রান্ত হয়ে ছিল তখন যে ত্রিকালদর্শী বলে আপামর জনসমাজে যে-ঋষিদের খ্যাতি গাওয়া হয়, তাদের কারুর সাক্ষাৎ মিললে এবার কী হতে পারে না-পারে সে-সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়া স্বাভাবিকই ঠেকা উচিত। লোকনাথের প্রশ্নটাও ঐ খাতেরই ছিল—কারণ জায়গা ও পরিস্থিতি বিচার করলে প্রসঙ্গটা যথাযথ উত্থাপনের জন্য গোড়ায় অমন একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করাই বিবেচ্য বলে ঠেকতে পারে। অর্থাৎ, যেই বলা হল, যা লোকনাথ বললেন, যে কিসের অমন ধ্যান করছেন মহারাজ?—অমনি সেই প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু পরের প্রশ্নটিও লুক্কায়িত রয়েছে : আপনি কি তবে ধ্যান করছেন সেই বিপর্যয়েরই, এখানে কি এই অন্ধকার গুহার দেয়ালে বন্ধ থেকেই সেটাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনার তৃতীয় নয়নে? এবং সেই দ্বিতীয় প্রশ্নের মধ্যেও তখন লুক্কায়িত তৃতীয় প্রশ্ন, যেটি হল এই : তাই যদি হয় তো আপনি ভাবছেন তবে এখন কী, আপনি কি আমাদের এই বর্তমান নৈরাশ্যে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেন? এবং কথাবার্তা যা হল পরে, তা তো শেষ পর্যন্ত ঐরকম একটি খাতেই প্রবাহিত হল, হল না? অবশ্য সে-কথাবার্তা তখন শুধু লোকনাথ ও হাড়িপার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, তা ছড়িয়ে পড়ল এর-ওর আরো কয়েকজনের মধ্যে। কী লোকনাথ, এইরকমই তো তুমি বলো আমাদের, না?

—হ্যাঁ বলি, কিন্তু তুমি আসল কথায় এসো এবারে—এত কারণ নাই-বা দেখালে!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই কথাতেই আসছি এবার। একটু দেরি হয়ে গেল, মাপ করে ফেলো ভাই।

—মাপ আমার তত নয়, মাপ চাও শ্রোতাদের। আসলে দোষ তোমার একলারই নয়, আমাদের অনেকেরই এটা একটা রোগ দেখছি যে কথা বলতে পেয়েছি যদি একবার তো পারি তো কিছুতে থামব না, তা যায় যাক পৃথিবী রসাতলে—এবং সে-পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছেও, সন্দেহ নেই।

—মাপ চাইছি তবে হে সমবেত সুধীবৃন্দ, ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ। আমার স্বপক্ষে যুক্তি শুধু এই যে, যে-কারণগুলি ব্যাখ্যা করলাম, আমার মনে হয় আমাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার প্রত্যেকটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত...

—আমরা তো কেউ সেটা অস্বীকার করছি না...

—এবং শুধু জড়িতই নয়, আমাদের বর্তমান অবস্থাটির সম্যক হৃদয়ঙ্গমের জন্য ঐ কারণ-গুলির প্রত্যেকটিরই আলোচনা প্রয়োজনীয় ছিল বলে আমার মনে হয়েছে।

—আঃ, বাড়াবাড়ি করছ কনক! মেনে তো আমরা নিয়েছি সবাই। নাও, এবার এগিয়ে চলো।

—কোথায় যেন এসেছিলাম...হ্যাঁ, হাড়িপাকে লোকনাথের প্রশ্ন, কিসের অমন ধ্যান করছেন মহারাজ? মিনিট খানেক কোনো উত্তর নেই, মানে মহারাজ চুপচাপ। এদিকে এত লোকের নিশ্বাস-প্রশ্বাসও ধীরে-ধীরে শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তখন, এক অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাট কৃষ্ণ পক্ষীর মতো ডানা বিস্তার করছে গুহার ভিতরের দেয়াল হতে দেয়ালে। ভাবতে থাকে লোকনাথ,

প্রশ্নটা কি আবার করা দরকার? না এ-প্রশ্ন না করে সে এবার অন্য আরেকটা প্রশ্ন করবে, এমন একটা প্রশ্ন যার উত্তর হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজে পাওয়া যেতে পারে? না-কি একই প্রশ্ন সে আবার করবে, কিন্তু এবার একটু জোরে, যেহেতু হয়তো প্রথমবার মহারাজ ঠিক শুনতে পাননি? কিন্তু এ-চিন্তা জাগলেই অন্য আরো একটি গুরুতর বিবেচনার সম্মুখীন না হয়ে পারে না লোকনাথ, এবং সেটি হল এই। মহারাজ শুনতে পাননি, কারণ হয়তো হয় তিনি শুনতে চাননি, নয় ধ্যানে এমনই নিমগ্ন তিনি যে তাঁর সঙ্গে লোকনাথের দূরত্ব এত সামান্য হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্নটা পৌঁছোতে পারেনি তাঁর কাছে। উভয় ক্ষেত্রেই পরের পদক্ষেপটি ঠিক করার আগে বিলক্ষণ সাবধানতা অবলম্বনের দরকার। কারণ, প্রথমত, যদি শুনতে চাননি বলেই শুনতে পেয়ে থাকেন তো প্রশ্নটি আবার করলে অনর্থক তাঁর উষ্মা জাগানোর সম্ভাবনা রয়েছে, এবং সে-ক্ষেত্রে সেরকম সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া লোকনাথের এবং সামগ্রিক অর্থে আমাদের প্রত্যেকেরই পক্ষে এমতাবস্থায় খুব সমীচীন বলে বিবেচিত হতে পারে না। যেহেতু এমনিতেই যা ঘটে গেছে তা কিছু কম সর্বনাশ নয়, তার উপর হাড়িপার অকারণ উষ্মা জাগালে পাছে তিনি শাপ দিয়ে বসেন! দ্বিতীয়ত আবার, যদি ধ্যানে নিমগ্ন বলেই প্রশ্নটা তিনি না শুনে থাকতে পারেন, তাহলে সেটা পুনরায় আরো জোরের সঙ্গে পেড়ে তাঁর সেই গভীর ধ্যানটি ভাঙার চেষ্টা কি খুব উচিত কাজ হবে? এবং সম্ভাব্য ফল উভয় ক্ষেত্রেই এক, যা হল মহারাজের অহেতুক উষ্মা জাগানো। কী দরকার বাবা? এইরকম যখন ভাবছে লোকনাথ, তখন তার সমস্ত সন্দেহের সমুদ্র শান্ত করে মহারাজ আপনা থেকেই চোখ খুললেন, ধীরে-ধীরে। যেন ফুল ছিল বলে আগে জানা যায়নি, কুঁড়িটা আকার নিয়ে ছিল এক সবুজ পিণ্ডের, এখন তা ধীরে-ধীরে প্রস্ফুটিত পদ্ম—অর্থাৎ চোখটা যা হল, তাই বলছি। কী, ঠিক বলছি লোকনাথ?

—মোটামুটি ঠিকই বলছ বলে তো মনে হচ্ছে, অন্তত এখনো।

—এবং তোমার সেই মনের ভাব-টাব যা জাগছে বলছি, যা আমার অনুমান মাত্র, কী, সেগুলোও কি মিলছে?

—হ্যাঁ, বলতে পারো মিলছে, অন্তত এখনো। কিন্তু এগিয়ে চলো প্লীজ, এত দাঁড়িও না।

—তথাস্তু তথাস্তু। অতএব মহারাজ চোখ খুললেন, এবং সেই খোলার প্রসঙ্গে কুঁড়ি ভেদ করে একটি পদ্মফুলের ফুটে ওঠার উপমাটা নেহাত অনুপযোগী নয়—কারণ, প্রথমত, তাঁর চোখ দুটি বেশ বড়-বড়, টানা-টানা। দ্বিতীয়ত, যখন চোখটা খুললেন তখন দেখা গেল, সেই চোখের সাদা অংশে জায়গায়-জায়গায় যেন অস্ফুট গোলাপী রেখার টান, যেন শিল্পীর তুলির আঁচড়—তা বলে কাপালিকের লাল-চোখ তা হয়ে যায়নি, তাতে ভয়ানকের কোনো ইঙ্গিত নেই, একেবারেই নেই, বরং এক স্নিগ্ধতারই আমেজ—এক কথায়, ঐ সাদায়-গোলাপীতে মিশে যেন পদ্মের পাপড়িরই আভাস জাগিয়ে দেয়। তার উপর তপশ্চর্যার চোখ, শান্ত, যে-শান্তময়তা সমাহিত প্রকৃতিরই এক শান্তির মতো, দেহখানি ভোরের নীরব নিস্তরঙ্গ সরোবর, এবং যে-সরোবরে ঐ ফুটে উঠছে পদ্ম। আবার অন্যভাবে, কৃচ্ছ্রতার ঐ কণ্ঠ ঋষির, তাও যেন কোন্ মৃণাল-ভুজ, যার উপর সারা মুখখানি এক বিরাট কুঁড়িরই ক্ষেত্র, চোখ যেখানে ফুল ও যা ফুটল।

—এখনো মোটামুটি ঠিকই বলছ, যদিও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ শান্ত সমাহিত ভাবটা কি খুব রইল, অর্থাৎ চোখ যেই খুললেন মহারাজ?

—আসছি স্যার আসছি, সে-প্রশ্নে আসছি লোকনাথ। যখন আমার কাহিনীটা শেষ হবে, তখনই বিচার ক'রো কতটুকু ভুল বা ঠিক বললাম না-বললাম।

—শোনো শ্রীমান কনক, এবং লোকনাথ!

—বলো বৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

—আমাদের সবিনয় অনুরোধ লোকনাথ, এবার তোমার কাহিনীটা তুমি নিজমুখেই শেষ করো। কারণ কনকের আদিখ্যেতার ঠেলায় এ-জনমণ্ডলীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছে। কী ধ্রুববাবু, তোমার মতটাও শুনিয়ে দেবে নাকি?

—আমি সম্পূর্ণ একমত তোমার সঙ্গে। আসলে রাজী হয়ে আমরাই প্রথমে ভুল করেছিলাম।

—খাসা খাসা! কী রাজী আবার তোমরা হতে গেলে? হয়ে আমায় উদ্ধার করলে?

—ঐ-তো লোকনাথ তোমায় বলতে দিল ঘটনাটা, এবং তাতে আমরাও আপত্তি করলাম না। সেই আপত্তি না-করাটাই রাজী হওয়া, আবার কী!

—হয়েছে হয়েছে, তবে আমিই শেষ করছি ঘটনাটা।

—করো লোকনাথ!

—আসলে যেটুকু বলল কনক, ওর সে-বৃত্তান্তে ভুল নেই।

—ভুল না থাকতে পারে, কিন্তু বাড়াবাড়ি আছে, অন্তত আমাদের তো তা মনে হয়েছে।

—আসলে আমিই তো ওকে বলতে বলি।

—তুমি বলতে বলোনি, ও-ই তোমার হয়ে বলতে চায়, এবং তুমি অনুমতি দিয়েছিলে।

—ঐ একই হল, এবং ওর প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতাবোধও আছে, সেটাই বা না-মেনে যাই কোথায়? কারণ ভেবে দ্যাখো তো, কী-সন্দেহের মধ্যেই-না পড়ে যাই আমি, একসময় সত্যিই মনে হচ্ছিল ঐ হাড়িপা-টাড়িপা আসলে হয়তো মিথ্যামাত্র, আমিই মনে-মনে সব সাজিয়ে তুলেছি। যাক, সেটা যে সত্যি নয়, ঘটনাটা যে সত্যিই ঘটেছিল, হাড়িপা বলে ব্যক্তিটি আছেন, তাঁর দর্শন আমরা পাই, তাঁর সঙ্গে এইসব বাক্যালাপ আমরা করি, এটার নতুন করে প্রমাণ পেলাম কনকের বৃত্তান্তেই। এবং সেটা কি একটা কম সান্ত্বনা আমার নিজের পক্ষে?

—সান্ত্বনাটা তোমার একলারই-বা হতে যাবে কেন, সেটা আমাদের সকলেরই পক্ষে, বিশেষত আজ যখন এক ভয়াবহ সন্দেহের দোলায় আমাদের সবই অন্ধকার—চোখে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালো-কালো ছায়ার মতো নৃত্য করছে।

—একেবারে। ভীষণ ঠিক কথা বললে তুমি বৃন্দাবন। সান্ত্বনাটা যেমন আমার পক্ষে, তেমনি তোমাদের সকলের পক্ষে, সমবেত এই জনমণ্ডলীর পক্ষে, যাদের কেউই, যেমন তোমরাও অনেকে, হাড়িপাকে হয়তো দেখেনি। তবু সান্ত্বনাটা তাদের কোথায়, এবং কেন, এই প্রশ্নই কি কেউ করছেন মনে-মনে, আমাদেরই যাত্রীদলের মধ্যে, অথবা অন্ধকারে আচ্ছন্ন সম্মুখের জনমণ্ডলীর ভিতরে? উত্তর তবে এই—সান্ত্বনা, হাড়িপার সঙ্গে আমার দেখা হল বলে নয়, বরং সে-দেখার যে-স্মৃতিচারণ পরে আমি করেছি বন্ধুজনের মধ্যে, সেটা যে সত্যই একটা সত্য ঘটনার স্মৃতি, নিছক আমার কল্পনাবিলাস নয়, সান্ত্বনা এই উপলব্ধিতেই। অতএব বুঝছেন তো, আজ যখন এই মুহূর্তে আমরা ক্ষতবিক্ষত, কত ভয়ে কত সন্দেহে কত দুঃস্বপ্নে বা নেহাতই দুঃস্বপ্নের কল্পনায়, এই যখন অনেকেই ও ক্রমশই পারছি না সত্য হতে মিথ্যাকে বা ঘটনা হতে কল্পনাকে পৃথক করতে, তখনো যে সম্পূর্ণ সম্বিৎ হারাইনি, মনে আমাদের রয়েছে সত্যের উপলব্ধি, অতীত ঘটনার স্মৃতি, এমন একটা খবরে বল আমি একলাই পাবো কেন বলুন, দেখছি তো, আপনারাও সকলে পাচ্ছেন। তাই হয়তো এখনো আশার অবকাশ রয়েছে, উৎসবের সকল উৎস শুকায়নি।

—না লোকনাথ, তুমি ঠিকই বলছ, উৎসবের সকল উৎস নিশ্চয় শুকায়নি, অন্তত এখনো নয়, নইলে কেন আজ আমরা মিলেছি এইভাবে, কেন আলোয়-অন্ধকারে কাছে-দূরে দূরে-দূরান্তরে এই আকুল চোখের সারি একের পর এক, বুক জ্বলছে সকলের এক আগ্রহের ধিকি-ধিকি আগুনের

আঁচে, কেন আয়োজন এই পালাগানের? তবে প্রসঙ্গ যখন পাড়ছিই আজ সন্দেহের, বা সত্যের, বা কোন্‌টে ঘটনা এবং কোন্‌টে ঘটনা নয় তার, তখন এখানে বলতে কি দেবে আমায় আমারও একটা ছোট্ট সন্দেহের কথা?

—অর্থাৎ? কী বলতে চাইছ খুলে বলো কনক।

—বলছি, সব সত্ত্বেও আমার একটা সন্দেহ জেগে রয়েছে, ঐ হাড়িপার ব্যাপারেই। সে-সন্দেহের কথাটা কি পাড়তে পারি?

—বলা বাহুল্য, নিশ্চয় পারো।

—তুমি বললে, হাড়িপার সঙ্গে তোমার দেখাটা সত্যিই হয় কি হয়নি, এই নিয়ে তোমার মনে যে-বিশ্রী প্রশ্ন একটা জাগতে থাকে, তোমার কাছে সেই প্রশ্নের সমাধান ঘটল যখন কনক নামক আমি এক তৃতীয় ব্যক্তি তোমার ও হাড়িপার সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্তটি আওড়াতে বসলাম—এই তো? এবং আমার সেই বৃত্তান্তটি কেমন? একেবারে তোমার ঠিক মনের মতো। অতএব তোমার সঙ্গে হাড়িপার দেখাটা যে হয়ই, এবং ঠিক এইভাবেই হয়, সে-দেখায় এই-এই কথাবার্তা চলতে থাকে, কথাবার্তার মধ্যে-মধ্যে এই-এই ভাব জাগতে থাকে তোমার মনে, এখন সে-সম্বন্ধে তোমার আর কোনো সন্দেহেরই অবকাশ রইল না। এবার এর উত্তরে আমি যদি বলতে চাই, সন্দেহের অবকাশটা সামান্যই রয়ে যাচ্ছে?

—কী করে?

—কারণ আমার বৃত্তান্তে প্রমাণিত হচ্ছে না যে দেখাটা সত্যিই হয়, কারণ আমার সেই বৃত্তান্তটা তোমারই কথিত আগের এক বৃত্তান্তের উপর নির্ভরশীল। কারণ তোমাদের দেখাটা যখন হয়, তখন সে-দেখায় আমি উপস্থিত ছিলাম না—বৃন্দাবন উপস্থিত ছিল না, ধ্রুবও উপস্থিত ছিল না।

—অর্থাৎ আমি যা বলেছি তোমায়, হাড়িপার সঙ্গে আমার সেই সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্তটা, যে-একই বৃত্তান্ত তুমিও এইমাত্র আমাদের সকলকে আরো একবার আওড়ে শোনালে, তোমায় বলা আমার সেই বৃত্তান্তটা, অর্থাৎ যখন সেটা তোমায় বলি প্রথম বার...

—প্রথম বার শুধু কেন, দ্বিতীয় বার তৃতীয় বার চতুর্থ বার, এত বার করে না বললে আমার অমন মনে থাকবে কেন আদ্যোপান্ত ঘটনাটা?

—যাই হোক, বক্তব্য তোমার, সেই-যে বৃত্তান্তটা আমি তোমায় এত বার করে বলেছি, সেটা একটা মিথ্যার বৃত্তান্ত?

—সত্য-মিথ্যা বড় প্রশ্ন, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা জানি না। হয়তো নেহাত মনে যেটা ঘটে, মানুষের নিছক কল্পনায় যেটা ঘটে, কখনো-কখনো সেটার সত্যতা কোনো বাস্তব ঘটনা হতে কিছু কম নয়, এমন-কি কখনো-কখনো হয়তো তার সেই সত্যতা বহু বাস্তব ঘটনার সত্যতা হতে বেশিই।

—কী বলতে চাইছ তুমি?

—বলতে ঠিক চাইছি না, শুধু একটা ছোট্ট সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারছে মনে, অনুমতি পেলে সে-সন্দেহের কথাটা জানাতাম এখানে।

—সে-অনুমতি তো তোমাকে বার-বার দেওয়া হচ্ছে, অতএব অত ভণিতা কেন?

—তবে ব্যাপারটা হল এই। বাস্তবে ঐ দেখাটা তোমার হয়ই-নি হাড়িপার সঙ্গে।

—বাস্তবে হয়নি তো মনে-মনে হয়েছে নাকি?

—এক ধরনের তাই। এবং সেটাকে আমি মিথ্যার পর্যায়ভুক্ত একেবারেই করছি না, বলছি না তুমি আমাকে বা অন্য যে-কোনো কাউকে এভাবে ঘটনাটা বলেছ, তার দ্বারা তুমি আমাদের ধাপ্পা

দিয়েছ। বরং হয়তো ঐ সাক্ষাৎকারটা তোমার কাছে কোনো বাস্তব ঘটনা হতেও আরো অনেক বেশি সত্য, যেহেতু ঐ সাক্ষাৎকারটাকে তুমি মনে-মনে এমন ভীষণভাবে চেয়েছ, কল্পনায় তাকে জন্ম দিয়েছ, তাকে বার-বার ঐ কল্পনাতেই উল্টেছ-পাল্টেছ, সে-সাক্ষাৎকারের শরীরটা, তার আগাপাশ-তলা, পায়ের চেটো বা কানের লুকানো পেছনটা, সব-সব রূপ পরিগ্রহ করেছে তোমারই মানসিক উত্তাপে, তোমার এক অসহ্য প্রেম ও যত্নে, এক আকুল আবেগে। এবং সেই কারণেই হয়তো ঐ মহারাজ আসলে নেই, হাড়িপা-জুড়িপা-মুড়িপা মুনির সশরীরে এখনো আসার আছে এ-পৃথিবীতে, ঐ-যে জনমণ্ডলীকে তুমি তাঁর সামনে উপবিষ্ট থাকতে দেখেছ বলে জানাচ্ছ, তার অস্তিত্বও রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে কোনোদিন ছিল না, কখনো থাকবে না।

—মানে মানে মানে? সে-জনমণ্ডলীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আমি নিজেই তো ছিলাম, যে-একই আমি তোমাদের চোখের সামনে এই দাঁড়িয়ে রয়েছি। কী, আমি দাঁড়িয়ে নেই? আমার হাত-পা নেই? রক্ত নেই, মাংস নেই? ছোঁও-না আমাকে, আমি কি বারণ করছি?

—আ-হা-হা, সেটা কি কেউ অস্বীকার করছে? কিন্তু সেক্ষেত্রেও, তোমার শরীরটা আছে, আবার মনও আছে। এবং যে-ঘটনাটা তুমি বলেছ আমাকে বা আমাকে ছাড়াও আমাদের অন্য কাউকে, হাড়িপার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সেই বৃত্তান্তটা, সেটা ঘটনা নিশ্চয়ই, অত্যন্ত তীব্রভাবে ঘটিত এক ঘটনাই, তবু সে-ঘটনাটা ঘটে থাকতে পারে শুধু এমনই এক স্তরে যার সঙ্গে বস্তুজগতের সম্পর্ক ক্ষীণ। অর্থাৎ, ঘটনাটি ঘটেছে যে-স্তরে, তা মানসিক মাত্র। একটা কল্পনা, নিছকই কল্পনা।

—বেশ, আমাকে না-হয় বাদই দিলে, কিন্তু সে-জনমণ্ডলীতে আরো তো লোক ছিল, যাদের কেউ-কেউ নিশ্চয় এখনো রয়েছে আজ, এই এখানেই!

—তা থাকে তো এই গড় হচ্ছি, ঘাট স্বীকার করছি, প্রত্যাহার করে নিচ্ছি আমার কথা।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে নিয়ে এক মহা আপদ হল দেখছি, আবার সন্দেহের ঝড় তুললে। এত লোক ছিল সেদিন সেই গুহায়, আমাদের দলেরও কত লোক ছিল, একে-একে তো ঢুকলাম মাথাটা নিচু করে, গুহার ছোট্ট দরজার সামনে একের পর এক জুতো খুলে। অবশ্য ভিতরে ঢুকেই অন্ধকার, কাউকে চেনার মতো চোখের শক্তি ছিল না। তবু ভিতরে ঢুকে অত ভিড় সত্ত্বেও কোনো-রকমে বসতে পেরেছি যখন, একে-অন্যে হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বা কনুই-এ কনুই, মনে পড়ে তখন সেই স্পর্শের মাধ্যমে অন্তত আমাতে যে-অনুভূতি জেগেছিল, সেটা একটা পরিচিত অনুভূতিই, অর্থাৎ যাদের গায়ের সঙ্গে ঠেকছে আমার গা, সেই স্পর্শই বলে দিচ্ছে তাদের আমি আগেও ছুঁয়েছি, তারাও আমায় আগে ছুঁয়েছে—একে-অন্যের যে-নিশ্বাসের ভাপে সেই ছোট্ট গুহার অন্ধকার অচিরেই গমগম, ধীরে-ধীরে নাকে এক সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ গন্ধ ঘামের, তাও চেনা, রীতিমতো চেনা। ঘামগুলোর নাম পর্যন্ত যেন দিতে পারি, যেন বলতে পারি এ-ঘামটা ওর, ও-ঘামটা তার, অন্য ঐ ঘামটা অন্য সেই আরেকজনের। কী করে পারব সেটা করতে? কারণ এরা যে সব আমাদের দলেরই লোক, এদের সঙ্গে যে এ-যাত্রায় আমি হাঁটছি এতদিন ধরে, এত পথ ধরে। হ্যাঁঃ, এখন বললেই হল এরা কেউ ছিল না সেদিন গুহায়, আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার বানানো!

—বললামই তো, সে-প্রমাণ যদি থাকে তো আমি উঠিয়ে নিচ্ছি আমার কথা, নতমস্তকে মাপ চাইছি।

—কী বলছ, প্রমাণ? চাও প্রমাণ? তবে নাও তুমি কত প্রমাণ চাও। কে কোথায় হারিয়ে আছো অন্ধকারে, এবার এসো তো তোমরা, যারা আমাদেরই দলের লোক, যারা সেদিন ছিলে আমার সঙ্গে গুহায়, দেখি এগিয়ে এসো তো তোমরা একে-একে। এগিয়ে আসতে যদি দ্বিধা থাকে তো হাত তোলো, অথবা হাত তুললে পাছে সে-হাত অন্ধকারে যদি না দেখতে পাই তো গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে

ওঠো, বলো আমি শ্রীমান অমুক বা শ্রীমতী তমুক, আমি ছিলাম লোকনাথ তোমার সঙ্গে সেদিন সেই গুহায়। কী, সব এমন চুপচাপ কেন? যে-অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি এই-তো একটু আগেও শোনা যাচ্ছিল সম্মুখের জনমণ্ডলীর এখান হতে ওখান হতে, তাও যেন হঠাৎ থেমে গেল বলে মনে হচ্ছে —কেন? সেদিনের সেই গুহার অন্ধকারে আমি যে ছাই প্রত্যেককে দেখতে পাইনি ভালো করে, নইলে তোমাদের নাম ধরে-ধরে নিজেই এখুনি ডাকতে পারতাম। নাকি তোমরা যারা সত্যিই ছিলে সেদিন আমার সঙ্গে, এখন কনকের এই হতচ্ছাড়া প্রশ্নে তাদেরো মনে সন্দেহের ঢেউ উঠতে আরম্ভ করেছে? তবে কি সেই তোমরাও ভাবতে বসেছ, যে-যার নিজের মনে একা-একা, নিজেকে নিজে নীরব প্রশ্ন করছ এই বলে যে তাহলে কি জিনিসটা সত্যিই ঘটেছিল, নাকি আগাগোড়া ব্যাপারটা কল্পনা মাত্র? কিন্তু বন্ধুগণ, ভাইয়েরা-বোনেরা, একই পথের পথিকদলের আমার সেই অতীব আপনজনেরা, সেরকম কোনো সন্দেহ যদি জেগে থাকেই তোমাদের কারুর মনে তো সাবধান, একা-একা যুঝতে চেয়ো না সন্দেহের সঙ্গে, কারণ সে-ক্ষেত্রে যতই যুঝতে যাবে, ততই দেখবে তোমাদের হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, চোখে নাচছে অন্ধকার প্রলয়ঙ্করী কালীমূর্তির মতো, এবং ময়াল সাপের মতো ক্রমশই সে-সন্দেহ তোমাদের জাপটে ধরছে, তোমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে আনছে, অচিরেই মৃত্যু অবধারিত। না, যুঝতে গেলে একা-একা নয়, নিজের মনে-মনে নয়, বরং ও-মনটা খোলো, কথা বলে ওঠো, একে-অন্যে বাক্যালাপে জিনিসটা খোলসা করে নাও। ধরো তুমি অমুক আরেকজন তমুককে বললে, কী রে, আমরা তো সত্যিই ঢুকি সেদিন গুহাটায়, ঢুকিনি? ঐ-তো লোকনাথের সঙ্গে? হাড়িপা তো সত্যিই সেদিন ঐভাবে বসেছিলেন, ঐ পুরু-পুরু কাপড়ের গদীমতন জিনিসটার ওপর, যেটা আসন-কে আসন বিছানা-কে বিছানা, এবং লোকনাথও হঠাৎ কোথাও কিছু নেই নীরবতা ভেঙে দুম করে অমন একটা প্রশ্ন করে বসল—বসল না? কই, প্রশ্নটা করো তো দেখি তোমরা কেউ কাউকে, এবং যেই-না করেছ প্রশ্নটা, দ্যাখো, হাতে-হাতে প্রমাণ পাও, যে-লোকটিকে প্রশ্ন করলে, সে বলে উঠছে,—নিশ্চয় নিশ্চয়, দ্যাখো-তো খামাখা কী-সন্দেহের ঝড়টাই-না কনক তুলে বসেছিল! কই, করো প্রশ্নটা কেউ কাউকে! এখনো চুপচাপ? ওঃ-হো-হো, বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি, ইতিমধ্যে হয়তো আরো একটা সন্দেহে দুলছে তোমাদের কারুর-কারুর মন—না, হয়তো ততটা সন্দেহ নয় যতটা একটা ভয়, কিংবা হয়তো ঠিক ভয়ও নয়, একটা দ্বিধা, একটা ছোট্ট দ্বিধা, না? ভাবছ, সেদিন একে তো ঐ অবস্থা মনের, তায় গুহার ঐ অন্ধকার, সুতরাং কেউই কাউকে ভালো করে দ্যাখোনি, আর সেটা যদি না করে থাকো তো কোন্ সাহসে মুখ খুলবে দুম করে, প্রশ্নটা করতে যাবে অন্য কাউকে? মানছি, এমন একটি দ্বিধার ভাব যদি জেগে থাকে কারুর-কারুর মনে তো আমি অন্তত তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে যাব না, কারণ আমার নিজের ক্ষেত্রেও তো ঠিক ঐ একই ব্যাপার ঘটে, কারণ, কই, আমিও তো সেদিন কাউকেই চিনতে পারিনি। তবে সেক্ষেত্রেও, মুক্তির উপায় ঐ একটাই, ঐ মুখ খোলাতেই—নীরব থেকেছ কি সন্দেহ আরো ঘনীভূত হবে। বেশ তো, অন্য কাউকে সরাসরি উদ্দেশ করে প্রশ্নটা পাড়তে পারছ না কারণ জানছ না সে তোমার সঙ্গে সেদিন ছিল কি না-ছিল গুহায়, কিন্তু আমি দোষ করলাম কী? আমাকে তো কেউ-কেউ বলে উঠতে পারো এখন, হ্যাঁ-হ্যাঁ লোকনাথ, আমি ছিলাম তোমার সঙ্গে, পারো না? না-হয় এটাও ধরে নিতে রাজী রইলাম যে লোকনাথ বলে সেদিন তোমরা কেউ চেনোনি আমায়, যেহেতু আমি যেমন তোমাদের স্পষ্টভাবে লক্ষ করিনি, তোমরাও তেমনি আমায় কেউ লক্ষ্য করে উঠতে পারোনি, তাই বলতে পারছ না, লোকনাথ, ছিলাম তোমার সঙ্গে। নাও, এমন-কি এটাও মেনে নিলাম যে হাড়িপাকে সেই হঠাৎ প্রশ্নটা যখন করে বসলাম, তখনো কেউ বোঝোনি তোমরা যে সেটা আমারই গলা ছিল, যদিও তেমন একটা সম্ভাবনা কী করে জাগতে পারে জানি না, যেহেতু এই পথে যাত্রার সেই প্রথম হতেই আমার

গলা তোমরা শুনেছ যখন-তখন, যেমন সময়ে-অসময়ে আমি শুনেছি তোমাদের কতজনের গলা, কেউ কিছু বলেছ শুনলে চোখ বুজেও বলে দিতে পারি কে বলছে কথাটা, ঠিক কোন্ ব্যক্তি বা ব্যক্তিনী। যাক গে, ধরে নিলাম সেদিন আমার গলাটাও চেনোনি—কিন্তু এখন? এখন তো এই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছ আমায়, মঞ্চের সবগুলো আলো আমার মুখে, এবং শুনছ সেদিন হাড়িপাকে সে-প্রশ্নটা আমিই করেছিলাম। অতএব তোমরা যারা ছিলে সেদিন গুহায়, গলা চেনো আর নাই চেনো, প্রশ্নটা উত্থিত হতে শুনেছ, তারা এখনো কেন দ্বিধা করছ চুপচাপ বসে, কেন বলে উঠছ না যে হ্যাঁ-হ্যাঁ, হাড়িপা সত্য, হাড়িপার সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা সত্য, এবং এমন একটা প্রশ্ন যে হাড়িপাকে করে কেউ সেদিন, তাও সত্য? সাহস করে যদি একজনও এগিয়ে আসো প্রথমে তো সঙ্গে-সঙ্গে সে সমর্থন পাবে অন্য অনেকের, দ্যাখো-না একবার, চেষ্টা করো! আরে, তবু তোমরা কেউ টুঁ শব্দটি করবে না, হাত তুলবে না, এগিয়ে আসবে না? তোমাদের এমন ব্যবহারের অর্থটা তবে কী? দ্যাখো তো কনক, এ এক আচ্ছা ঝামেলায় তুমি ফেললে যা-হোক আমাদের!

—মাপ করো ভাই, তবে এই আমি আমার প্রশ্ন উঠিয়ে নিচ্ছি। তুমি এগিয়ে চলো এবার তোমার গল্পে। অবশ্য অন্যদেরও যদি আরো কোনো সন্দেহ ইতিমধ্যে জাগ্রত না হয়ে থাকে—কী বৃন্দাবন, তোমার কিছু বলার রয়েছে?

—আমার মনে হয়, কাহিনীর শেষটুকু এবার আমরা লোকনাথের মুখ থেকেই শুনতে চাই, লোকনাথকে সেটা বলতে দেওয়া যাক। ধ্রুব কী বলো?

—আমারও তো তাই মনে হয়, কারণ কনকের প্রশ্নে যে-সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে ও যার একটা মিটমাট চেয়ে লোকনাথ দলের অন্যান্যদের আহ্বান জানিয়েছে, তার একটা উত্তর এখুনি-এখুনি দেওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এবং সেটা যদি সম্ভব না হয়, অর্থাৎ লোকনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে কেউ যদি এগিয়ে না আসে সন্দেহটা ভঞ্জন করতে, তার মানেই যে হাড়িপা মিথ্যা, সাক্ষাৎকারটা ঘটেনি, আগাগোড়া ব্যাপারটা লোকনাথের কল্পনা-বিলাস বই নয়, এটাও মেনে নেওয়া হয়তো খুব উচিত নাও হতে পারে। কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে আমাদের সকলেরই মনটা কেমন একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে, চোখে একটা বিভ্রান্ত দৃষ্টি সকলেরই, এমন অবস্থায় অনেক সত্যকে মিথ্যা মনে হতে পারে, অনেক মিথ্যাকে সত্য মনে হতে পারে। প্রশ্নটা তুমিই তোলো কনক, সন্দেহের মূলে তুমিই, তবু তুমিও বোধহয় মানবে আমার কথাটা।

—বোধহয় মানব। অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, আমাদের প্রত্যেকেরই মনটা আজ এমন একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে যে লোকনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে কেউ যদি এগিয়েও আসে, বলে যে হ্যাঁ, সে ছিল লোকনাথের সঙ্গে গুহায়, হাড়িপার ব্যাপারটা সত্যি, সাক্ষাৎকারটা ঘটেছে, তাতেও ঘটনাটার অকাট্য সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া হয়তো চলবে না—এই তো?

—অনেকটা তাই। অতএব চলো লোকনাথ, এগিয়ে চলো, গল্পটা শেষ করো।

—ধুত্তোরি তার নিকুচি করেছে, এটা যদি নিছক গল্পই হয় তো আমার বয়ে গেছে তা শেষ করতে। আগে জিনিসটা খোলসা করে নেওয়া দরকার—যা বলছি তা সত্য না মিথ্যা, ঘটনা না কল্পনা?

—কিন্তু মনে তো হচ্ছে না সেটা তুমি এখুনি-এখুনি প্রমাণ করতে পারছ। এই-তো পাড়লে তোমার প্রশ্নটা, আহ্বান জানালে শ্রোতৃমণ্ডলীকে, আমাদের দলের যে-কোনো লোককে—কিন্তু কই, কেউ কি এগিয়ে এলো?

—তবে কি যা-কিছু আলোচনা করলাম এতক্ষণ ধরে, তার সবই ঐ একই সন্দেহে আচ্ছন্ন হতে পারে, অর্থাৎ সত্যও যেমন হতে পারে তেমনি সম্পূর্ণ মিথ্যাও হতে পারে? ঘটনা, অথবা নিছক কল্পনা?

—সব উত্তরই সম্ভব এখন, অর্থাৎ কোনো-একটি বিশেষ উত্তরই একমাত্র উত্তর নয়—অন্তত মনে তো হতে শুরু করেছে সেইরকমই।

—তবে সুনন্দার ঐ কাহিনীটা?

—সেটা তো স্বপ্ন, সুনন্দা নিজেই তো সেটাকে স্বপ্ন হিসেবে বর্ণনা করল!

—বা-বা-বা, ঐ পাহাড়ী লোকটাও স্বপ্ন, তার সঙ্গে সুনন্দার সেদিন সন্ধ্যায় তাঁবুর ঘটনাটা স্বপ্ন?

—সুনন্দা এগিয়ে এসো, উত্তর দাও।

—এসো এগিয়ে সুনন্দা—এসো, দেরি করছ কেন?

—দ্যাখো লোকনাথ, এ এক কোন্ ধরনের নীরবতা আবার নেমে আসতে শুরু করেছে আমাদের মধ্যে। দ্যাখো-দ্যাখো, আমাদের হাড়ের মধ্যে কেমন এক কাঁপুনি ধরছে হঠাৎ—অবশ্য দেখার বস্তু এটা নয়, অনুভব করার।

—না-না-না, একবার এমন একটা সন্দেহকে প্রশ্রয় দিলে তো আমাদের সমস্ত ভিত্তি নড়ে উঠবে, কোনোকিছুরই সত্যতা সম্বন্ধে আর নিশ্চয়তা থাকবে না। আচ্ছা ধরো সেই পৃথিবীর ছাদের উপরে দেখা জিনিসটা, আর তুষারের নয়, বরং কেমন যেন গন্ধকের মতো সেই হাহাকারের পাহাড়, সেটা তো আমরা দেখেছি, সকলে একসঙ্গে দেখেছি—দেখিনি? নাকি সেটা নিয়েও এবার সন্দেহ তুলতে শুরু করবে তোমরা? কী কনক, ধ্রুব, বৃন্দাবন?

—মনে তো হচ্ছে দেখেছি, তুমি কি বলো ধ্রুব?

—আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

—বৃন্দাবন?

—হ্যাঁ, এখনো তো যেন ভেসে উঠছে চোখে। তবে আমার চোখে যেটা ভেসে উঠছে, সেটাকে তো তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি না, জানতে পারছি না সেই একই জিনিসটা তোমাদেরও চোখে ঠিক ঐ একইভাবে ভেসে উঠছে কিনা। কথাটা হল, বুঝলে লোকনাথ, সব যেন হঠাৎ গুলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

—না-না-না বৃন্দাবন ধ্রুব ও কনক, সমবেত হে জনমণ্ডলী, এমন মুহূর্তে এ-পাপের প্রশ্রয় আমরা দেব না। বুঝতে কি পারছ না যা করছি, তার দ্বারা আমরা নিজেদেরই অস্বীকার করতে চলেছি? অস্বীকার করছি আমাদের অস্তিত্বকে, আমাদের মনের মধ্যে নিহিত যে-কোনো সত্যের জ্ঞানকে, আমাদের সব সাধকে, স্মৃতিকে, স্বপ্নকে, কল্পনাকে? অস্বীকার করছি আমাদেরই কৃত কর্মকে, আমাদের উচ্চারিত বাক্যকে?

—ধুত্তেরি তার নিকুচি করেছে, তোমার বাক্যকে-বাক্যকে-বাক্যকে! কিসের বাক্যটা আজ আছে তোমার, বা আমাদের যে-কোনো কারুর? সব স্বাধীনতা তো কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

—ও-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায় না কনক, কোনো স্বাধীনতাই কখনো কেড়ে নেওয়া যায় না—তীর ধনুকে যুততে যদি না পারো তো তবু তা তূণের আড়ালে মজবুত থাকে।

—ঘেঁচু থাকে। মাপ করো কথাটাকে, কিন্তু মুখ সামলাতে পারলাম না।

—ঘেঁচু থাকে? মানে?

—মানে ও-তীর থাকে না, কারণ সেই তীরটা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঐ-যে তুষারের জায়গায় গন্ধকটা দেখলে তোমরা, সেটা দেখলে তো, দ্যাখোনি? নাকি এখনো বলবে যে সে-তুষার যদিও দেখা যাচ্ছে না তবু তা রয়েছে? তবে তার জায়গায় যে-কালো-কালো দৈত্য-গুলোকে দেখছ এখন, রুক্ষ কর্কশ পাথরের চাঁই, ঐ গর্ত এখানে-ওখানে, কুমিরের মতো বিরাট-

বিরাট হাঁ, এখন কি বলতে চাও যে না-না-না সেগুলো নেই, আসলে নেই?

—ঐ দ্যাখো, তাহলে মেনে নিচ্ছ যে জিনিসটা আমরা দেখেছি?

—মানে?

—মানে কিছুক্ষণ আগেই বলছিলে না যে সব নিয়েই এখন সন্দেহ জাগছে, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা, কোন্‌টা ঘটনা কোন্‌টা কল্পনা, তা আর জানা যাচ্ছে না? বলছিলে না?

—হ্যাঁ, সেটা তো আমি একলাই না, সকলেই বলছে। দেখলে না, তোমার একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে তো কেউই এগিয়ে এল না, এল কি?

—তা আসেনি, সত্য, এবং তার ফলে আমাদের সকলের মনে, অন্তত আমার মনে তো বটেই, যে-একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, একটা আলোড়ন, একটা নতুন আশঙ্কার ঢেউ, তাও সমানই সত্য। আর তাই তো বলছি, এখুনি নিজেই তুমি নিজেকে যেভাবে অস্বীকার করলে, তার ফলে আমার সেই বুকের আলোড়নটা যেন একটু প্রশমিত হতে শুরু করছে—মনে হচ্ছে, সব-কিছু আগাগোড়া এক মিথ্যারই নামান্তর নয়, মিথ্যার বাইরে কিছু জিনিস আছে যা সত্য, আছে ঘটনা যা ঘটেছে, মনে রয়েছে তার স্মৃতি যেটা নিছক কল্পনা নয়।

—শ্রীমান লোকনাথ, তোমার কথার মারপ্যাঁচে আমরা কুপোকাত। যা বলছ, একটু সহজ করে বলবে কি?

—কথাটা অতি সহজ, শ্রীমান কনক। একটু আগেই অনেক জিনিস নিয়েই আমরা সন্দেহ তুলছিলাম, তুলছিলাম তো? শেষে প্রশ্ন উঠল, পৃথিবীর ছাদের উপর যেটা দেখেছি বলে বর্ণনা করেছি আগে, সেটাও কি তবে সত্যিই দেখেছি? স্পষ্ট উত্তর দিতে কেউ এগিয়ে এল না, সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকল। অবশেষে, এই এখুনি মাত্র, আমার অন্য একটা কথাকে খণ্ডন করতে গিয়ে তুমি নিজেই বলে বসলে, তুষারের জায়গায় কালো-কালো দৈত্যের মতো রুক্ষ কর্কশ পাথরের চাঁই আমরা আসলে সত্যিই দেখেছি, দেখেছি কুমিরের বিরাট-বিরাট হাঁ-এর মতো ঐ গর্ত এখানে-ওখানে। অতএব, মানছ তো, সেটা আমরা দেখেছি তবে—মানছ কিনা?

—হ্যাঁ, হয়তো মানতেই হয়, আসলে মানতে পারলে আমিও তোমার মতোই সুখী বোধ করব। তবু, বললামই তো, তবু...

—আরে-আরে, এখনো তবু, কিসের তবু?

—বললামই তো, কথায়-কথায় আজ আমরা এত যুক্তি টানছি, সত্যের বা মিথ্যার এত প্রসঙ্গ পাড়ছি যে হয়তো জলটা তাতে ক্রমশই আরো ঘুলিয়ে উঠছে। যেন ক্রমশই আর জেনে উঠতে পারছি না এর মধ্যে আমাদের কোন্ কথাটা সত্য বা কোন্ যুক্তিটা সত্য, অথবা কোন্ সত্যটা সত্য বা কোন্ মিথ্যাটা সত্য।

—অর্থাৎ সমগ্র ব্যাপারটাকে একটা ত্রিভুবন-জোড়া হেঁয়ালির অন্তর্গত করতে চাও, এই তো?

—আমি কি চাই না-চাই, সেটা প্রশ্ন নয়—জিনিসটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে, সেইটেই প্রশ্ন।

—জিনিসটা কোথাও দাঁড়াচ্ছে না। যেরকম প্রশ্ন তুমি তুলতে শুরু করেছ, তাতে শীঘ্রই মনে হতে পারে এই-যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছি, হয়তো এটাও সত্য নয়, মিথ্যা—ঘটনা নয়, কল্পনা।

—বললামই তো, সম্ভব, সবই সম্ভব।

—তবে মাপ করো শ্রীমান কনক, সেটা হলে সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রচণ্ড প্রহসনের পর্যায়-ভুক্ত হয়ে যাবে, এক নিষ্ঠুর নির্লজ্জ প্রহসন। জানব আমাদের মুক্তির কোনো উপায়ই নেই, আমরা ভূত-প্রেত মাত্র—কি তাও নয়, কারণ ভূত হতে গেলে এককালে যে প্রাণ এবং দেহধারী কিছু-একটা

ছিলাম, সেটা মেনে নিতে হয়, এবং যেটা আমরা এক্ষেত্রে মানছি না।

—হয়তো মানছি না।

—মানছ না? হায়-হায়-হায় হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, আজ এ-কী সর্বনেশে অবস্থায় এসে দাঁড়ালাম আমরা! শ্রীমান কনক, বোঝবার চেষ্টা করো এ-মুহূর্তে এই সর্বগ্রাসী সন্দিগ্ধতার প্রভাবে কী ঘটতে পারে না-পারে।

—কী ঘটতে পারে? কীই-বা না-ঘটতে পারে? বরং মনে তো হচ্ছে ক্রমশই, ঐ ঘটনা বলে বস্তুটাই নেই, কোথাও ছিল না, কখনো থাকবে না।

—তার মানে আমাদের অতীত মিথ্যা, বর্তমান মিথ্যা, ভবিষ্যৎ মিথ্যা? আমাদের সাধ-স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা, আজকের এই হাহাকার মিথ্যা, আমাদের যুদ্ধ মিথ্যা, যুদ্ধের বাসনা বা অঙ্গীকার মিথ্যা, আমাদের সকল সম্ভাব্য জয় বা পরাজয় মিথ্যা?

—মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।

—আশ্চর্য আশ্চর্য আশ্চর্য! আচ্ছা তুমি ধ্রুব দাঁড়িয়ে অমন দেখছ কী? তুমিই-বা বৃন্দাবন অমন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে শুনছটা কী? সাড়া দাও, এগিয়ে এসো, প্রতিবাদ করো কেউ! আমি একলা এভাবে আর যুঝব কতক্ষণ! সন্দেহ যে বিকট মেঘের মতো আমাকেও ঘিরে ধরতে শুরু করেছে—দেখছ না, চোরাবালিতে আমাদের পা আটকে গেছে, আমরা ধসে পড়ছি, ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছি! আরে, সবাই চুপচাপ? অতএব তোমারই জয় হতে চলেছে কনক?

—আবার জয়! কিসের জয়? কে চাইছে জয়?

—আর তুমি সুনন্দা, তুমিই-বা অমন মাথা নিচু করে আর দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ? ভুলে গেলে, খানিকক্ষণ আগেই কী-বাচাল তুমি হয়েছিলে, নারী হয়েও নিজেরই ব্যভিচারের কাহিনী শতমুখে উচ্চারণ করেছিলে? সেই পাহাড়ী লোকটা কি তবে সত্যিই ছিল, না ছিল না? সেদিন কি তুমি সত্যিই কলতলায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, না দাঁড়াওনি? তখন চোখমুখ কি সত্যিই ধুতে চাও, না চাওনি? ধরো হয়তো সেই পাহাড়ী আজ এখানে আছে, আমাদের মধ্যেই আছে, লুকিয়ে কোথায় কোন্ অন্ধকারে—ধরো সে হয়তো আমাদের কথাগুলো গিলছে বসে-বসে, ধরো আজ এই মঞ্চের সকল আলোয় উদ্ভাসিত তোমার ঐ মুখটার দিকে সে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, দেখতে চাইছে আমাদের এই এত প্রশ্ন-প্রসঙ্গের ফলে তোমার সেই মুখে সামান্যতমও কোন্ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না-হচ্ছে। ধরো আমাদের এই এত আলোচনায় তোমার দেহের গন্ধের স্মৃতি তাকে আবার একই রকম আকুল করে তুলল, তার শিরায় আবার নেচে উঠল কোন্ মরণ-মত্ত দৈত্য, ধরো ঐ সে উঠে আসছে তার জায়গা ছেড়ে, ভিড়ের ঐ অন্ধকার হতে—যদি সে সেটা করে এখন তো তুমি তাকে চিনতে পারবে সুনন্দা? আবার তুমি নিচু হবে, যেন ওকে দেখতে পেয়েও পাওনি এমন ভাব দেখাবে? এবং তখন ও-তে আর তোমাতে মিলে তোমরা দুজন ঝমঝম বর্ষণের বিগত কোন্ সন্ধ্যায় কৃত এক নিভৃত নিবিড় কীর্তির পুনরাবৃত্তিতে মত্ত হবে, আজ এই সভায়, এই মঞ্চের আলোয়, এই পাঁচশো কি হাজার চোখের সামনে? আর সেটা যদি ঘটে যায় একবার তো সুনন্দা তো ফিরে পাচ্ছেই তার অতীতকে, ফিরে পাচ্ছে অতীত এক সত্য সম্বন্ধে তারই অন্তরে নিহিত নিশ্চয়তার বোধটাকে—কিন্তু সে-ক্ষেত্রে তুমি কনক, বা ধ্রুব কি বৃন্দাবন তোমাদের কেউ, তোমরাও কি অবশেষে মানবে সেটাকে ঘটনা বলে, এমন একটা ঘটনা যা ঘটল এবার তোমাদেরই জলজ্যান্ত চোখের সামনে? কী, বলো কনক!

—হ্যাঁ, নিশ্চয় মানব, কেন মানব না? কিন্তু কথা হচ্ছে, সেরকম একটা ঘটনা ঘটতে যাবে কেন?

—সে-প্রশ্ন আলাদা। ধরো ঘটল, ঘটে গেল, তখন?

—ঘটবে, যেহেতু তুমি সেটা চাও? যেহেতু প্রমাণ করতে চাও সুনন্দার ঘটনাটা ঘটেছিল?

—শুধু সুনন্দারই নয়, একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটে গেছে আমাদেরও সকলেরই জীবনে—সেটা যে ঘটেছে, নিছক একটা কল্পনা নয়, তার প্রমাণ চাই। বুঝছ, এটা নিজের কাছে নিজে প্রাঞ্জল হওয়ার একটা কসরত মাত্র, সন্দেহের অন্ধকার ঘোচানোর চেষ্টা শুধু। তাই একটা ঘটনা ঘটাতে চাই, আর ঘটার পরে সেটা যে সত্যিই ঘটল, তার সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ হতে চাই। এবং সেটা একবার হলেই দেখবে আমরা আবার ফিরছি আমাদের নিশ্চয়তার পথে, ভ্রষ্ট শক্তি বা প্রত্যয়গুলো ছোট-ছোট রবারের বলের মতো আবার একে-একে ফিরে আসছে হাতের মুঠোর মধ্যে।

—তো বেশ, ঘটাও দেখি ঘটনাটা।

—কোথায় তবে লুকিয়ে আছে সেই পাহাড়ী লোক, কোন্ অন্ধকারে, তুমি এগিয়ে এসো, এ-মঞ্চ তোমার অপেক্ষা করছে। দ্যাখো অপেক্ষা করছে সুনন্দাও, দ্যাখো তার চোখে কেমন এক আবেশ যেন ইতিমধ্যেই ঘনিয়ে উঠতে শুরু করেছে, স্বেদের শিশিরে সিক্ত হচ্ছে তার কপাল। চাও তো আমরা নেমে যাচ্ছি মঞ্চ ছেড়ে, তোমাদের দুজনকে ছেড়ে দিচ্ছি এই জমিটুকু, একমাত্র যেখানটাতেই আলো ও যার বাইরে শুধু অন্ধকার, তাই চাও যদি তো অনায়াসেই মনে করতে পারো ফিরে গেছ তোমাদের সেদিনের সেই তাঁবুতে, বাইরের পৃথিবীতে শুধুই রাত্রি, শুধুই দিকে-দিগন্তে পরিব্যাপ্ত জনহীনতা, শুধুই ঝমঝম বর্ষণের অক্লান্ত গর্জন। আরে-আরে, চোখ চালাচ্ছি চতুর্দিকে, তবু তুমি কোথায় গো মশাই? এদিকে দেখছ না লগ্ন যে বয়ে যায়, সুনন্দা আকুল হতে ক্রমশই আকুলতর। আমি জানি নিশ্চয় জানি, শাড়ির আড়ালে ওর হাঁটু-দুটো এখনই ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে, ওকে এখুনি-এখুনি গিয়ে না ধরলে এই ঢলে পড়ল বলে। সে কি, এখনো কেউ এগিয়ে আসছে না? বেশ তবে সুনন্দা, আমিই হব তোমার সেই পাহাড়ী লোক—এই এসে পড়লাম বলে। দ্যাখো এই ধরেছি তোমায়, দ্যাখো এই সেই কলতলা আবার- -সেদিন যেমন করো, এখনো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঠিক তেমন নিচু হও, আরো একটু নিচু হও, এই-তো এই-তো. সুন্দর, চমৎকার, সত্যিই, কী-অসামান্য বক্ষ-দুটি তোমার...

—আরে-আরে, লোকনাথ! লোকনাথ!

—লোকনাথ! লোকনাথ! এ কী করতে চলেছ তুমি?

—লোকনাথ! লোকনাথ! সুনন্দা! সুনন্দা!

—হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, সমবেত হে জনমণ্ডলী, আমাদের সূত্রধারকে আপনারা মাপ করুন, তার মস্তিষ্কবিকার ঘটেছে। আমরা কথা দিচ্ছি, অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে ফিরিয়ে আনবই, এখনই।

[ক্রমশ]

সমালোচনা

বাংলা পীর সাহিত্যের কথা—গিরীন্দ্রনাথ দাস। শহিদ লাইব্রেরী। বারাসাত, চব্বিশ পরগনা। মূল্য তিরিশ টাকা।

বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে গাজী ও পীরদের কীর্তিকলাপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইঁহাদের অনেকেই বাংলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইসলামের অগ্রদূতরূপে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সসৈন্যে। তাই গাজী ও পীরদের সম্পর্কে যেসব লোককথা প্রচলিত এবং সেইসব কাহিনী নিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অনেকখানিই জড়িয়া রহিয়াছে যুদ্ধজয়ের কাহিনী—সম্মুখযুদ্ধে কিংবা বিভিন্ন কৌশলে স্থানীয় ভূস্বামীকে পরাজিত করিয়া ইসলামে ধর্মান্তরিত করিবার কাহিনী। রাজাকে না পারিলে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে প্রজাদের। আবার পরাজিত রাজাকে বাধ্য হইয়া গাজী বা পীরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে, এমন বৃত্তান্তেরও অভাব নাই।

পীর ও গাজীদের নিয়া প্রচলিত এইসব লোককথার পিছনে ঐতিহাসিক সত্য অনেকটা আছে, ইহাই সম্ভব। মুসলমান বিজয়ী বাহিনী বাংলায় প্রথম প্রবেশ করে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে। তারপর সমগ্র বাংলা মুসলমান শাসকদের করায়ত্ত হইতে লাগিয়াছিল প্রায় দেড়শত বৎসর। ইহার পরেও স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতা হিন্দু ভূস্বামীদের হাতেই থাকিয়া গিয়াছিল। ইঁহাদের অপসারিত করিয়া ও ইঁহাদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া মুসলমান আধিপত্য দৃঢ়মূল করিতে সময় লাগিয়াছিল প্রচুর।

মুসলমানদের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা বাংলার অভ্যন্তরে কিভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার অনেকটাই আজও অজ্ঞাত। মুসলমান রাজশক্তি কোন্ কোন্ এলাকা প্রত্যক্ষভাবে জয় করিয়াছিল, আর কোন্ কোন্ এলাকাই বা পীর ও গাজীদের দ্বারা অধিকৃত, তাহারও স্পষ্ট বিবরণ আমরা জানি না। পীর ও গাজীরা যেসব এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন সেসব এলাকায় তাঁহারা ইসলামের বিজয় পতাকা তুলিয়াছিলেন কি শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, নাকি সুফীপন্থী পীরগণ আগে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে জনচিত্ত জয় করিয়া তাহার পর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? অর্থাৎ ইসলামের বিজয় অভিযান কতটা সামরিক-রাজনৈতিক আর কতটাই বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক—এ প্রশ্নের সদুত্তর আজও পাওয়া যায় না।

জনচিত্ত জয়ের যে একটা প্রশ্ন ছিল পীরকাহিনীর লৌকিক ইসলামে তাহার ইঙ্গিত মিলিবে। পীরগণ দেখিতেছি নানান অলৌকিক কাণ্ড ঘটাইতেছেন : লোহার বেড়ায় ফুটিতেছে চাঁপাফুল, ব্যাঘ্রবাহিনী নিয়া পীর অবিশ্বাসী রাজার রাজধানী আক্রমণ করিতেছেন, প্রয়োজনমত সাদা মাছি হইয়া উড়িয়া যাইতেছেন, শরীরে অস্ত্রাঘাত সত্ত্বেও তাঁহারা অক্ষত থাকেন, কারাগারেও তাঁহাদের বন্দী করিয়া রাখা যায় না। বড় খাঁ গাজীর মতো কোন কোন পীর তো আবার ছেলেবেলা হইতে প্রহ্লাদের মতো। পিতার ইচ্ছামত সিংহাসনে বসিতে সম্মত না হওয়ায় ক্রুদ্ধ পিতা গাজীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবার জন্য জল্লাদকে আদেশ দিলেন, কিন্তু অস্ত্রাঘাত বিফলে গেল, কোন ক্ষতই হইল না। গাজীকে দশটা হাতির নীচে ফেলা হইল। কিন্তু তাহাতে হাতির পা আর দাঁতই ভাঙিয়া গেল। গাজীকে তখন ফেলা হইল অগ্নিকুণ্ডে, কিন্তু আগুন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল

না। দশমণ ওজনের পাথর গলায় বাঁধিয়া গাজীকে সাগরের জলে ফেলা হইল। কিন্তু আশ্চর্য, পাথর জলে ভাসিয়া উঠিল। এত করিয়াও পুত্রকে বশীভূত করিতে না পারিয়া অবশেষে পিতাই হার মানিলেন। গোরাচাঁদের মতো পীরেরা আবার হিন্দু যোগীদের অভীষ্ট দেবতার দর্শন করাইয়া দিয়া ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার ঠিকই ধরিয়াছেন, এইসব কাহিনীর মধ্যে প্রচলিত হিন্দু লৌকিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের প্রভাব স্পষ্ট। তবে ওই যে যোগী বা ভক্তকে তাঁহার উদ্দিষ্ট দেবতার দর্শন করাইয়া পীর তাঁহাদের ইসলামে দীক্ষিত করিতেছেন তাহার মধ্যে রহিয়াছে পীরদের কার্যপদ্ধতির ইঙ্গিত। লৌকিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই ধর্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার তাঁহারা করিতেছিলেন। ইহার সঙ্গে চালাইতেছিলেন মুসলিম রাজশক্তি প্রসারের প্রচেষ্টা।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিষয়টি ইসলামের অগ্রদূতগণের সঙ্গে গোপজাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। শাহ সুফী সুলতান পাণ্ডুয়ার রাজা পাণ্ডুদাসকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন নগর ঘোষ নামে এক গোয়ালার সহায়তায়। পাণ্ডুয়ার কালু ঘোষ নাকি ওই এলাকার প্রথম ধর্মান্তরিত মুসলমান। বালাণ্ডায় পীর গোরাচাঁদের সহায়কও একজন গোয়ালা। স্থানীয় রাজশক্তির সঙ্গে গোয়ালাদের একটা বিরোধ হয়তো ঘটিতেছিল। ইহারই সূত্র ধরিয়া কি গোয়ালারা বহিরাগত শত্রুর সহায়তা করিতে নামিয়াছিল?

কার্যপদ্ধতিতে লৌকিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণ অবলম্বন করিলেও প্রথম দিকে পীরদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম- ও রাজ্যবিস্তার। তাই পীরসাহিত্যের যে অংশ ধর্ম- ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনী নিয়া রচিত সেই অংশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঝাঁঝ অনিবার্যভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে—'কাফের তুড়িয়া লও আলেমের সিরণী'—এই মনোভাব সেখানে স্পষ্ট। আর-এক ধরনের পীরকাহিনীর পরিচয় লেখক দিতেছেন। এই কাহিনীগুলি পীরদের মাহাত্ম্যকথা নিয়া রচিত। পীরগণ রোগীকে রোগমুক্ত করিতেছেন, বিপন্নকে উদ্ধার করিতেছেন, ইত্যাদি। পীরগণ কৃপা বিতরণ করিতেছেন হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে। আবার অবজ্ঞা অসম্মান করিলে পীরগণ যে শাস্তি দিতেছেন তাহাতেও হিন্দুমুসলমানভেদ নাই। ধর্ম- ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনীতে হিন্দু ভূস্বামীদের সঙ্গে পীরদের বিরোধ-বিসংবাদ প্রায় সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের কাহিনীগুলিতে এইসব বিরোধ-বিসংবাদ তো নাই-ই, বরং ঢাকার নবাবের ক্রোধ হইতে জমিদার মদন রায়কে বড় খাঁ গাজী উদ্ধার করিয়া দিতেছেন বা নারায়ণপুরের ব্রাহ্মণ জমিদারের সঙ্গে তাঁহার সমঝোতা হইতেছে, এমন ঘটনাও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, পীরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিতেছে লক্ষ্মীদেবীর ও দেবরাজ ইন্দ্রের। সম্মিলিত-ভাবে তাঁহারা ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। আর-একটা কাহিনীতে দেখিতেছি পীর বড় খাঁ গাজী দৈবাদেশ পাইয়া অপরা পৃথিবীর সন্ধানে মক্কা যাইবার পথে মহাদেবের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার কাছে অপরা পৃথিবীর খোঁজ করিতেছেন। মহাদেব সন্ধান জানিতেন না। বড় খাঁকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন দুর্গার কাছে।

এইসব কাহিনীর পীরগণ ইসলাম ধর্মের বিস্তারে বিশেষ সচেষ্ট নন। রাজনৈতিক শক্তি প্রসারের মাধ্যমও তাঁহারা নন। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে স্থান করিয়া নিয়া সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চেষ্টাই তাঁহাদের কার্যকলাপের লক্ষ্য। এই সমন্বয়প্রচেষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে সত্যপীর ও মানিকপীরের কাহিনীর মধ্যে। এই সমন্বয়ে সংস্কৃতির সূত্রেই দেখিতে পাই পীরের দরগাহ বা নজরগাহে সেবায়েত হইয়া আছেন হিন্দু ভক্ত, পীরের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে মানত করিতেছেন, হাজত-পূজা, সিরনী দিতেছেন, উরস-উৎসবে যোগ দিতেছেন, কাব্য রচনা করিতেছেন পীরের মাহাত্ম্য নিয়া, আর সেই কাব্যের পাঠক ও শ্রোতা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। পীর 'সিদ্ধিগুণে সিদ্ধপুরুষ হৈল সিদ্ধিদাতা। মুসলমানে বলে পীর হিন্দুরা দেবতা।'

পীরসংস্কৃতির এই ধারার আশ্রয়ে পুষ্টিলাভ করিয়াছে পীরসাহিত্য। ইহারই মধ্যে ধরা পড়িয়াছে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার কথা। এই কারণেই গ্রন্থকার পীরসাহিত্যকে বাংলার জাতীয় সাহিত্য বলিয়াছেন। মন্তব্যটি যে যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিকে পীর-সাহিত্য অন্যদিকে হিন্দু দেব-দেবী ও সাধু-সন্তদের নিয়া হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণযাত্রার মুসলমান গায়ক পূর্ববাংলায় একপুরুষ আগেও দেখা যাইত। সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের দৃষ্টির আড়ালে না হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাহিরে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত সংস্কৃতির ধারা যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

সমাজের নিম্নস্তরে কৃষিজীবী শ্রমজীবী হিন্দু মুসলমান দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকিয়া পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য এমনি একটা মিলিত সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই মিলিত সংস্কৃতি সমাজের উচ্চস্তরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পারে যে নাই আধুনিক কালে বাংলার ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। দীর্ঘ-কালের মিলিত সংস্কৃতি সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সমাজের নিম্নস্তরকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাও বোধহয় আশ্চর্যের নয়। সমাজের নিম্নস্তরে তো প্রতিরোধশক্তি বলিয়া কিছু ছিল না। তাই উপর হইতে চাপ আসিলে তাহার সম্মুখে অবনত হওয়া ভিন্ন কোন উপায়ও তাহার থাকিবার কথা নয়। বিশেষ করিয়া সে চাপ যদি প্রচলিত লৌকিক পদ্ধতি ও মাধ্যম অবলম্বন করিয়া আসিতে থাকে তবে নিম্নস্তর তাহাকে প্রতিরোধ করিবে কী দিয়া? একদিন পীরদের মাধ্যমে সমাজের নিম্নস্তরে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক কালে যখন মুসলিম ধর্ম- ও সমাজসংস্কারের আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহার মধ্যেও দেখিতেছি পীর-সংস্কৃতি ও পীরদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের বিশুদ্ধ আদর্শ অনুযায়ী লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি সংস্কারের প্রচেষ্টায় উচ্চস্তরের নেতারা পীরসংস্কৃতির লৌকিক মাধ্যমকেই ব্যবহার করিতেছেন। সংস্কারকরা প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন পীর হিসাবে। অন্যদিকে চলিয়াছে পীরদের ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসারমূলক কাহিনীসমূহের প্রচার। সমাজসংস্কারক আধুনিক পীরদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ফুরফুরার দাদাপীর সাহেব। মক্কায় মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া দাদাপীর বাংলায় আসিয়া সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও তেলপড়া দিতেন। এই ধরনের সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি চলিয়াছে ইসলামের বিজয়াভিযানের অগ্রদূত পীরগণের কাহিনী সংকলন করিয়া কাব্য-কাহিনী রচনার প্রয়াস। পীর গোরাচাঁদ, একদিল শাহ, গাজী-কালু-চম্পাবতীর আধুনিক উপাখ্যানগুলি এই প্রচেষ্টার ফল। লৌকিক পর্যায়ে গ্রামীণ কবিরা পীরদের নিয়া কাব্য লিখিতেছেন সহজ বাংলায়। লৌকিক গায়করা এইসব কাহিনী গান করিয়া সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিতেন। এই সহজ ভাবের পরিবর্তে আধুনিক রচয়িতাগণ অবলম্বন করিলেন আরবী, ফারসী, উর্দু শব্দের বাহুল্যময় কৃত্রিম ভাষা। এইভাবে পীরসংস্কৃতি হইয়া উঠিয়াছে আধুনিক ইসলামী পুনরুজ্জীবনের মাধ্যম।

'বাংলা পীরসাহিত্যের কথা'য় লেখক যে তথ্যসম্ভার দিয়াছেন তাহারই ভিত্তিতে এতক্ষণ কয়েকটি কথা বলিয়াছি। লেখক নিজে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই বটে, কিন্তু যে তথ্য তিনি আহরণ করিয়াছেন তাহার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বাঙালীর ইতিহাস রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদানের সন্ধান মিলিবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস উভয়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রশ্নে হয়তো সহায়ক সাক্ষ্য-প্রমাণ কোথাও না কোথাও মিলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু লৌকিক পর্যায়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিরোধ-বিসংবাদ, সংযোগ-সমন্বয়

কিভাবে ঘটিতেছিল, লৌকিক মননে ও আচরণে সংস্কৃতিসমন্বয় কোন্ রূপই বা পরিগ্রহ করিয়াছিল—এসব কথা তো আর কেহ লিখিয়া রাখেন নাই। লোকসংস্কৃতির চর্চাই সেসব জানিবার একমাত্র উপায়। এই দিক দিয়া ভাবিলে পীরসাহিত্যের কথা সম্ভবত সামাজিক ইতিহাসের প্রশ্নে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতির যে চিত্র পীরসাহিত্য ও পীরসংস্কৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তাৎপর্য আরও বেশী। আধুনিক কালে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক তো প্রধানত বিরোধ-বিসংবাদের। আজও তো দুই সমাজ মনের দিক দিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, দূরবর্তী। এমন সময়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কথা একটা যোগসূত্রের কাজ হয়তো করিলেও করিতে পারে।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ (প্রথম খণ্ড)—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আশা প্রকাশনী। কলিকাতা, ৯। মূল্য কুড়ি টাকা।

"কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" প্রকাশিত হবার চার বছর আগে, ১৮৪৪ সালে মার্কস তাঁর "ইকনমিক অ্যান্ড ফিলজফিক ম্যানাসক্রিপটস" রচনা করেন। লেনিন ও প্লেখানভের মতো তৎকালীন অনেক কমিউনিস্টের ঐ গুরুত্বপূর্ণ বইটির সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। শতাধিক বছর উপেক্ষিত থাকার পর বইটি প্রকাশিত হয় স্তালিনের মৃত্যুর পর। বইটির প্রকাশে অনেকে তরুণ মার্কস ও পরিণত মার্কসের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। কিছু বুদ্ধিজীবী তরুণ মার্কসের মধ্যে হিউম্যানিজমের প্রাধান্যকে প্রতিপন্ন করে তরুণ মার্কসকে পরিণত মার্কসের প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছেন তরুণ-পরিণত মার্কসের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা সমগ্র মার্কসকে। বিতর্কিত এই পুস্তকটিতে শ্রমের ভূমিকা বিশ্লেষণের জন্য মার্কস অনন্বিত শ্রম বা 'অ্যালিয়েনেটেড লেবার'-এর তত্ত্বকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরবর্তী রচনায় ঐ তত্ত্বকে বৃহত্তর পটভূমিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই মার্কসীয় চিন্তাধারাকে খণ্ডিত করে দেখার অবকাশ নেই।

মার্কস 'অ্যালিয়েনেশন' বা 'এসট্রেঞ্জমেন্ট'-কে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের সমস্যারূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত বলে পাশ্চাত্য দর্শন, সাহিত্য, নাটক, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হতে দেখি। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকের ভূমিকালিপিতে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার বিচ্ছিন্নতাকে 'সাময়িক আনুষঙ্গিক লক্ষণ' বলে ব্যাখ্যা করে সমস্যাটির প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপে যেন অনীহা প্রকাশ করেছেন; অথচ ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় বলেছেন যে বিচ্ছিন্নতার বিস্তার ও ব্যাপ্তি তাঁর প্রত্যক্ষের বিষয় এবং সমস্যাটি নিয়ে তিনি ভাবিত ও চিন্তিত। লেখক উনিশটি প্রবন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনার অবতারণা করে সমস্যাটির গভীরতার দিকটি তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক ও ভূমিকাকারের একই সমস্যা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য যে-কোন সাধারণ পাঠকের মনে একটা অস্বস্তিকর বিভ্রান্তির জন্ম দেবে।

লেখক ভূমিকায় লিখেছেন, 'পেশায় আমি চিকিৎসক। প্রায় ২৫ বছর ধরে মনের রোগ নিয়ে চর্চা-অনুশীলনে রত।......বিচ্ছিন্নতার মূর্ত প্রতীকের সঙ্গে নিত্য-সংস্পর্শে আমি বিচ্ছিন্নতা সমস্যার বাস্তব সমাধানের সূত্র অন্বেষণে সচেষ্ট হব, এটাই স্বাভাবিক।' (পৃঃ ৯) একদিকে

বিচ্ছিন্নতার জটিল ও দুর্বোধ্য বিশ্লেষণ এবং অন্যদিকে সমস্যাটির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত পাঠকের কাছে এইজাতীয় স্বীকারোক্তি বিষয়টি সম্বন্ধে নূতন করে আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই আগ্রহ আরও তীব্রতর হয় যখন লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার উৎস সম্পর্কে নিজেই বলেন, 'বিচ্ছিন্ন মানুষের বেদনা, যন্ত্রণা ও তাদের সংঘুক্তির আকুতির সঙ্গে আমি পরিচিত।' (পৃঃ ৯) অথবা, 'আমার ধারণা বিশ্বাস ও বক্তব্য কেবলমাত্র পুঁথি-কেন্দ্রিক নয়, বহু মানস-বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত।' (পৃঃ ১০) লেখক ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্নতার মূর্ত প্রতীকের সঙ্গে নিত্য-সংস্পর্শে এলেও, পাঠকের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেননি। তাঁর সমগ্র আলোচনা বিক্ষিপ্ত পুঁথিগত উদ্ধৃতির উপর নির্ভরশীল। মনোচিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা-বিবরণও (কেস্ হিস্ট্রি) তুলে ধরেননি। তাই তাঁর আলোচনাকে অভিজ্ঞতালব্ধ বা ফলিত জ্ঞানদ্বারা সমৃদ্ধ করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি প্রথমেই পাঠককে দিয়েছেন, তা অপূর্ণ রয়ে গেছে।

শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধগুলিতে তাঁর আলোচনা যথেষ্ট অর্থবহভাবে দানা বাঁধতে পারত যদি শুধু কতগুলি প্রাসঙ্গিক নাম থেকে নামান্তরে না গিয়ে একটি দুটি প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্যকর্মের সম্যক বিশ্লেষণ করে তার মূল চরিত্রগুলিতে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব স্পষ্টতরভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

আমরা কাফকার নাম পেয়েছি ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়। কিন্তু কাফকার কোন্ রচনায় পেঁ।ছলে বিচ্ছিন্নতার পরিপূর্ণ ভাবটি একনজরে বুঝে নিতে পারব তার কোন নির্দেশ বা বিশ্লেষণ আলোচ্য রচনাগুলিতে নেই। অথচ অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই মনে আসে, সেই আশাহত গ্রেগরের নাম বা 'মেটামরফসিস' গল্পটির উল্লেখ। তা নেই। সাহিত্যের আঙিনায় বিচ্ছিন্নতার প্রোটোটাইপ সেইসব বেপরোয়া, ব্রাত্য, সমাজছাড়া, বিক্ষুব্ধ, মানসিক-রোগাক্রান্ত চরিত্রগুলির সুখ ও সুখের অভাব, আশা ও আশাভঙ্গের ইতিহাস, তাদের সমস্যা ও তাদের ঘিরে সব সিচুয়েশন বা চিত্রকল্প, যা তাদের অন্তর-আত্মার বিবিক্তির দ্যোতক, তার সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেবার যে দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে প্রবন্ধের ছিল, তা রক্ষিত হয়নি।

সার্থক শিল্পীমন শুধু বিবিক্ত চেতনার সমীক্ষায় কর্তব্য শেষ করেন না। তাঁর শিল্পকর্মে—তা সে নাটক, উপন্যাস বা কবিতা যাই হোক,—সেখানে শুধু বিচ্ছিন্নতার নেতিবাচক দিকটি বা আশাহতের হাহাকার তুলে ধরে কাজ শেষ করেন না, সেখানে জীবনের বিপরীত দিকটার কথাও তুলে ধরেন। সেখানে বিচ্ছিন্ন মন তার ও নিকট অতীত পরিপার্শ্বের সঙ্গে একটা যোগ্য ইতিবাচক ক্যামিউনিকেশন, বা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বিরহিত সামগ্রীর সঙ্গে তার একটা আপোসের ইঙ্গিতও প্রায়শই থাকে (writer whose themes include, but transcend alienation—B. H. Gelfant. Adapted from a presentation to the Institute on Alienation, Syracuse University, February, 1970)। জীবনের শেষভাগে শুধু সিসিফাস-এর নিরর্থক যন্ত্রণার কথা বলার জন্যই সব সাহিত্যিক বিচ্ছিন্নতা-কেন্দ্রিক রচনা করেছেন, এমন নয়। আমরা যাতে সুস্থির মন নিয়ে একটা বাঁচার অর্থ খুঁজে পাই, যাতে জীবনের পুনর্মূল্যায়ন করতে পারি, তার ইঙ্গিত সাহিত্যে কিছু বিরল নয়। কাজে কাজেই বিচ্ছিন্নতাবাদী সাহিত্যের এই দিকটির বিশ্লেষণ উল্লেখ্য এবং আমাদের আলোচ্য পুস্তকে তা বিশেষভাবে অনুপস্থিত।

'শিল্পীমনের ভবিষ্যৎ : মনোবিদের জল্পনা' নিবন্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন, 'শিল্পী-সাহিত্যিকেরও বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন পরিচিতি। যথা—রোমান্টিক, বোহেমিয়ান, সুররিয়ালিস্ট, ন্যাচারালিস্ট, রিয়ালিস্ট।' (পৃঃ ১৫০) সাহিত্য -শিল্প সমা-

লোচনায় এমন শ্রেণীবিভাগ বিরল বলব, না ভ্রমাত্মক বলব বুঝছি না। দুটোই বলতে হয়। রোমান্টিক, বোহেমিয়ান, সুররিয়ালিস্ট, ন্যাচারালিস্ট—এগুলি কি পরস্পর-বিরোধী ভাগাভাগি হল? রোমান্টিকরা কি বোহেমিয়ান হতে পারে না? বোহেমিয়ানরা তো শুনেছি জন্মরোমান্টিক। যে-কোন সজাগ পাঠক এসব কথা জানেন। তাই ঐজাতীয় বিচ্যুতি তাঁদের দৃষ্টি এড়াবে না। তেমনি লেখকের 'রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণের ভূমিকা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যে বিচ্ছিন্নতা খোঁজার অতি-প্রয়াসও পাঠকের চোখে পড়বে। "হ্যামলেট" নাটকে 'ঈদিপাস কম্‌প্লেকস'-এর অনুসন্ধান শক্তিমান সমালোচকের রচনাপ্রসাদে কিছুটা উতরেছে, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে বিচ্ছিন্নতার অনুসন্ধান আরও বিচক্ষণ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে বলে মনে হয়।

কোন কোন অংশে লেখকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সার্থক। ভাল লাগে যখন লেখক বলেন, 'মানবমনের এই যন্ত্রণাকে কোনদিন রূপ দিতে পারবে কি যন্ত্র? মানবমনের অভিব্যক্তির জন্যই শিল্প-সাহিত্য বেঁচে থাকবে।' (পৃঃ ১৪৮) অথবা 'মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বাস্তব রূপায়ণ যতই সুনিশ্চিত হচ্ছে, পুরানো স্বার্থের হতাশাজনিত আর্ত চিৎকার ও বাধাদান ততই বাড়ছে।' (পৃঃ ২৯) কিন্তু যখন তিনি হতাশার সুরে বলেন, 'অজস্র নতুন তথ্য প্রতিদিন বিজ্ঞানীর ভাণ্ডারে জমছে, কিন্তু তার অনুরূপ চিত্রকল্প শিল্পীর মনে তৈরী হচ্ছে না।' (পৃঃ ১৩৯), তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কে-কবে-কোথায় ভেবেছেন বা বলেছেন 'বিজ্ঞানীর ভাণ্ডার' চিত্রকল্পের আঁতুড়ঘর? চিত্রকল্পকে বিজ্ঞাননির্ভর হতেই হবে, এমন কি কোন কথা আছে? এইসব প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। ফলে যে কোন জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে লেখকের ঐ সিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমি সম্পর্কে আগ্রহ থেকেই যায়।

বিচ্ছিন্নতার কারণ কী? ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় সঠিকভাবেই বলেছেন, 'কারণ যন্ত্র নয়, যন্ত্রকে উদ্দেশ্য-পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করার স্বাধীনতার অভাব।' (পৃঃ ২৭) আর এইজন্যই মানুষ তার কাজের অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে না; এর অনিবার্য ফল হিসাবে দেখা দিচ্ছে তার অসংগতিপূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অর্থহীন আচার-ব্যবহার। কিন্তু কেন এই অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপনে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কিভাবেই বা এ থেকে উত্তরণ সম্ভব? ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় সার্থকভাবেই এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাভলভ-এর 'রিফ্লেক্স অব পারপাস'-এর কথা এনেছেন। মানুষের উদ্দেশ্যপূরণের পথে যদি বারবার বাধা পড়ে, তা হলে ঐ 'রিফ্লেক্স'টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। জীবন ভরে ওঠে এক অর্থহীন শূন্যতায়। ক্রমে ক্রমে সে ঐ অর্থহীন, নিঃসঙ্গ ও বেদনাদীর্ণ জীবনকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিচ্ছিন্নতা পরিপূর্ণ রূপ নেয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় ২৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'রিফ্লেক্স অব পারপাস' ক্রমশ দুর্বল হয়ে একেবারে নিভে যেতে পারে', কিন্তু ঐ প্রসঙ্গেই ২৯ পৃষ্ঠায় তাঁর বক্তব্য, 'পাভলভ বলেছেন, "রিফ্লেক্স অব পারপাস" একেবারে মরে না—হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে।' এখানে প্রশ্ন ওঠে, প্রথম বচনে 'একেবারে নিভে যেতে পারে' এবং দ্বিতীয় বচনে ঐ একই বিষয় সম্পর্কে 'একেবারে মরে না' কথাটা কি পরস্পর-বিরোধী নয়? একেবারে নিভে যাওয়া মানে তো মৃত্যু ঘটা। তখনও কি কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবনকে রসসিঞ্চিত করে সতেজ করে তোলা যায়? একেবারে নিভে গেলে পাভলভ-এর 'কন্‌ডিশানিং-ডিকন্‌ডিশানিং' সূত্র কাজ করবে না। সেই কারণেই পাভলভ বলেছেন যে ঐ রিফ্লেক্সটির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু তা একেবারে মরে না।

মার্কুইসের মতে, ফ্রয়েড অনেক ক্রান্তিকারী সূত্রের আবিষ্কারক এবং সমকালীন সভ্যতার সমালোচক। ফ্রয়েড মনে করেন, আদিম প্রবৃত্তিগুলির বে-আব্রু প্রকাশ সভ্যতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে, তাই অবদমন প্রয়োজন। মার্কুইসের মতে অবদমন দু প্রকার—মৌলিক ও বাড়তি বা সারপ্লাস।

সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য মৌলিক অবদমন প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষ শ্রেণী তাদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য মানুষকে ভয় দেখিয়ে বাড়তি অবদমন করতে বাধ্য করছে। এটা মুক্ত সংস্কৃতির লক্ষণ নয়। প্রকারান্তরে তিনি অবদমিত কামের মুক্তি দাবি করেছেন। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত "ইরোস অ্যান্ড সিভিলিজেশন"-এর মধ্যে মার্কুইসের যে ইউটোপীয় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা তিনি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন তাঁর "ওয়ানডাইমেনশনাল ম্যান"-এর মধ্যে। এখানে তিনি সমকালীন সমাজের ছবি এ'কেছেন দক্ষ শিল্পীর মতো এবং অবাধ যৌনজীবনের প্রতি তাঁর বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে তীব্র শ্লেষাত্মক শব্দসম্ভারে। তিনি ফ্রয়েডকে অস্বীকার না করলেও, অনুরাগ যে কমেছে তা অনেক স্পষ্ট হয় যখন তিনি বলেন যে, 'এ যুগের জীবনসংগ্রাম হ'ল রাজনৈতিক সংগ্রাম।' (ইরোস অ্যান্ড সিভিলিজেশন, ১৯৬৬, পৃঃ ২০)। মার্কুইসের চিন্তার পরিবর্তনের দিকটি ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মার্কুইস, ফ্রয়েড ও বিপ্লব' নিবন্ধে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। আলোচ্য প্রবন্ধে মার্কুইসের যেসব রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা দেখে মনে হয় লেখক "ইরোস অ্যান্ড সিভিলিজেশন"-এর ১৯৬৬ সালের সংস্করণের উপর নির্ভর না করে ১৯৫৫ প্রকাশিত বইটির উপর এবং "ওয়ানডাইমেনশনাল ম্যান"-এর উপর নির্ভর করেছেন। মার্কুইস, মার্কসের অ্যালিয়েনেশন তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ১৯৪১-এ প্রকাশিত তাঁর "রীজন অ্যান্ড রেভোলিউশন" পুস্তকে। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় মার্কুইসের অ্যালিয়েনেশনের ধারণা ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করার সময় মার্কুইস-সমালোচক ম্যাক্ইনটায়ার-এর লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন অথচ মার্কুইস যে বইটিতে মার্কসের বিযুক্ত শ্রম, শ্রমের বিলোপ, মার্কসীয় ডায়ালেকটিক প্রভৃতির আলোচনা করেছেন তা থেকে কোন উদ্ধৃতি বা পুস্তকটির নাম উল্লেখও করেননি।

যে কোন মার্কসবাদীর দ্বিবিধ দায়িত্ব, (ক) বুর্জোআ চিন্তারীতির অসারতার দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করা, এবং (খ) বুর্জোআ চিন্তানায়কদের প্রচেষ্টায় সমাজজীবনের যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তার ফসলটুকুকে সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্পর্কে এখনই মনের অর্গল বন্ধ করা উচিত কিনা তা ভেবে দেখা। তাই মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর পক্ষে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের যুক্তিহীনতার দিকটিকে তুলে ধরা যেমন দায়িত্ব, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যে অগ্রগতি এনেছেন তার ফলকে গ্রহণ এবং সমাজ ও মানব আচরণ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা যায় কিনা একথা ভেবে দেখাও তাঁর কর্তব্য। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় আলোচ্য পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের যুক্তিহীনতার দিকটিতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,—যেন একটু মাত্রাতিরিক্তভাবেই। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে ভাববাদ ও পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক আখ্যা দিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ করেছেন। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রাবন্ধিকদের এইজাতীয় মনোভাবকে লক্ষ্য করে অধ্যাপক পল এ বারান বলেছিলেন, গমকে খোসা থেকে পৃথক করার সময় শস্যের সার অংশকেও বাদ দেওয়া হচ্ছে। একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদের ফ্রয়েড সম্পর্কে এই সতর্কবাণী প্রণিধানযোগ্য।

অমরনাথ ভট্টাচার্য

ভাষার মূল্যায়ন— পুণ্যশ্লোক রায়। শঙ্কর প্রকাশন। কলিকাতা ৬। মূল্য আট টাকা।

ইদানীংকালে অন্তত দুজন বাঙালি সমাজভাষাতত্ত্বের এলাকায় আন্তর্জাতিক সম্ভ্রম আদায় করেছেন। একজন শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত, বর্তমানে বার্কলির ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, অন্যজন শ্রীপুণ্যশ্লোক রায়। তবে শ্রীদাশগুপ্ত আসলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই লোক, রাষ্ট্রনীতির সুলুক-সন্ধান করতেই ভাষাতত্ত্বের সীমানায় তাঁর যাতায়াত। অর্থাৎ ভাষার রাজনীতি তাঁর আসল বিচরণক্ষেত্র। শ্রীপুণ্যশ্লোক রায় সর্বতোভাবেই একজন ভাষাবিজ্ঞানী। সমাজভাষাতত্ত্বের বাইরেও তাঁর ব্যাপক গতিবিধি—'ওয়ার্ড' (অধুনালুপ্ত), 'লিংগুয়া' ইত্যাদি ভাষাবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাতেও তিনি অল্পস্বল্প লিখেছেন, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'তে তাঁর আলোচ্য গ্রন্থের 'বাংলাভাষার সুর ও ছন্দ' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। তবে আজ থেকে প্রায় তেরো বছর আগে তাঁর ভাষাতত্ত্বের গবেষণাগ্রন্থটি মুদ্রিত হয়ে তাঁকে সমাজভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে বিশ্বের ভাষাবিজ্ঞানীমহলে পরিচিত করে দেয় এবং ভাষাবিধান-এর পরিবন্ধ ক্ষেত্রে সকলেই তাঁর মতামত যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তার পরে তাঁর আরো দুটি বই বেরিয়েছে ইংরেজিতে।

ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্বচর্চার পটভূমিকায় শ্রীরায়কে স্থাপন করার চেষ্টা করা যাক। মুখ্যত ইংরেজ ইয়োরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রবর্তনায় ভারতবর্ষে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যে ধরনের ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয় আমরা তার নাম দিতে পারি ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব এবং তারই সঙ্গে অনুস্যূতভাবে থাকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। এ দুয়ের প্রভেদ তাত্ত্বিকভাবে করা নিশ্চয়ই সম্ভব, কিন্তু পরস্পরসাপেক্ষতায় উভয়েই সমৃদ্ধ হয় বলে সাধারণভাবে প্রথম-প্রথম কোথাও তা করা হত না। ১৯১১-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে'র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুরু হয়। ১৯২৬-এ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Orign and Development of the Bengali Language*-এর প্রকাশে বাঙালি তথা ভারতীয়ের ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বচর্চা একটি চূড়ান্ত সফলতায় উত্তরণ লাভ করে। ১৯৩৯-এ প্রকাশিত সুকুমার সেনের "ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে সেই সফলতাই প্রতিফলিত হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে একথাই বলা যায় যে, স্বাধীনতার বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে এসেছে এবং এখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিভাগে প্রধানত তাই-ই পড়ানো হয়।

স্বাধীনতার পরে, পাঁচ দশকের গোড়ায়, লিংগুইস্টিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া প্রধানত পুনার ডেকান কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রচেষ্টায় নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সামার স্কুল' করে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় জিজ্ঞাসুদের পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। এ কাজে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন ভারত সরকার এবং মার্কিনদেশের কিছু ভাষাতাত্ত্বিক—যার অনেকেই সেখানকার সেন্টার ফর অ্যাপ্লায়েড লিংগুইস্টিকসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন ভাষাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ভারতীয়দের জন্যে ঐ দেশে নানা বৃত্তিরও ব্যবস্থা হতে থাকে এবং এভাবেই ওদেশেরও বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পীঠস্থান কর্নেল ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু ভারতীয় ছাত্র গিয়ে ভাষাতত্ত্বের উচ্চ শিক্ষা এবং একটি করে ডাক্তার ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসেন। পরবর্তী কালে তাঁরা অনেকেই ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্বশিক্ষা ও প্রয়োগের জগতে কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। শ্রীরায়, এইসব সমিতিবদ্ধ উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে ওদেশে যাননি, সুযোগ তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবেই এসেছিল। যাই হোক, সকলের সঙ্গে তাঁরও দীক্ষা মূলত বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে। সুতরাং তাঁর যাবতীয় রচনার মধ্যে তাঁর এই তাত্ত্বিক দীক্ষাই প্রকাশিত। আলোচ্য বইটির ১১ পৃষ্ঠায় নোয়াম চমস্কির নাম থাকলেও

চমস্কির মতামতের কোনো আভাস তাঁর লেখায় দেখা যায় না। তাঁর আলোচনার পটভূমিকা বিচার করলে সেটা এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হবে না। দীক্ষার দিক থেকে আমি শ্রীরায়ের পরবর্তী প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আমার চমস্কি ও তাঁর শিষ্যদের ইস্কুলে নাড়া-বাঁধা। কিন্তু সমালোচনার সময় তত্ত্বের দিক থেকে এই দূরত্ব আমি মনে রাখব না, বরং শ্রীরায় কী বলেছেন তার সারত্ব-অসারত্ব, তাঁরই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে, সাধ্যমতো বিচার করবার চেষ্টা করব।

মোট যে সাতটি প্রবন্ধের সমষ্টি এ বই তাতে শুধু একটিতেই ('বাংলাভাষার সুর ও ছন্দ') কোনো নির্দিষ্ট ভাষার নির্দিষ্ট অংশের বিশ্লেষণ বা তত্ত্বের 'প্রয়োগ' আছে। আমার নিজের ধারণা, ভাষার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ছাড়া শ্রীপুণ্যশ্লোক রায়ের সহজ অধিকারের আর-একটি এলাকা হল ফোনেটিক্স বা ধ্বনিবিজ্ঞান। এই প্রবন্ধটিতে মূলত তিনি বাংলাভাষার অতিধ্বনি 'সুপ্রাসেগমেনটালস'-এর বিচার করেছেন, এর সুর (intonation, pitch-pattern) এবং ছন্দ 'রীদ্‌ম'-কে বিচার করবার একটি গাণিতিক হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ফার্গুসন ও চৌধুরীর (১৯৬০) সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেয়ে তাঁর অনুসন্ধান ব্যাপকতর এবং সিদ্ধান্ত অনেক বেশি বিশ্বস্ত। চমস্কি ও হালে-র ধরনে সুরের ঘাটকে 1, 2, 3 ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে সুনির্ধারিত করার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। শ্রীরায়ের এই প্রবন্ধটি বাংলা ছন্দালোচনার ইতিহাসে একটি স্থায়ী নির্দেশিকা হয়ে থাকার মতো, যে-কোনো বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এটিকে স্বীকার করতেই হবে। এর সঙ্গে তুলনায় মুহম্মদ মহীউদ্দীনের লেখাটি অনেক বেশি অনুভূতিনির্ভর।

ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাপারে তাঁর শ্রুতি যে অতিশয় তীক্ষ্ম তার প্রমাণ আমরা প্রথম প্রবন্ধটিতেও পাই। এতে তিনি অনেক নতুন কথা বলেন, যেমন বাংলা 'র'-কে flapped fricative বলে অভিহিত করা, কিন্তু তাঁর কথার সত্যতা অন্তত আংশিকভাবে স্বীকার করে নিতেই হয়। তবে শব্দের প্রথম 'র' এবং দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'র'-এর মধ্যে যে চরিত্রের তফাত আছে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তো সে তথ্যও আমাদের জানিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে একটি-দুটি মন্তব্য একটু বিতর্কযোগ্য বলে মনে হয়। মানুষের মুখে উচ্চারণীয় এবং ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির 'সংখ্যা সীমাবদ্ধ, সে বিশ্বাস চলে গেছে'—একথা তো ঠিক নয়। অর্থাৎ অগণ্য ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা আমাদের আছে, কিন্তু ভাষাব্যবহারে আমাদের 'উচ্চারিত' ধ্বনির সংখ্যা অগণ্য নয়। ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা সীমাবদ্ধ, আবার পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণগুলির সংখ্যা আরো সীমাবদ্ধ। এইসব বিবেচনা থেকেই সার্বভূমিক ধ্বনিলক্ষণের ধারণায় পৌঁছানো গেছে। দ্বিতীয়ত, 'দল অর্থাৎ syllable আছে অথচ তাতে স্বর অর্থাৎ vowel নেই, জাপানি বা তিব্বতী শোনার আগে এর ধারণা হওয়া দুষ্কর' কথাটি হয়তো একটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ অত্যুক্তি। ইংরেজি bottle, button ইত্যাদি কথার দ্বিতীয় অক্ষরেই তো কোনো vowel নেই উচ্চারণে। কাজেই তিব্বতী বা জাপানি পর্যন্ত দৌড়োবার প্রয়োজন কী?

সমস্ত প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। 'ভাষার সমতা'-তে লেখক তাঁর স্বক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর মতো যোগ্যতা নিয়ে কথা বলার লোক বাংলাদেশে খুব নেই। 'ভাষার মূল্যায়ন'-এর প্রথম দিকে তিনি যেসব মতের আলোচনা করেছেন তাতে সাধারণভাবে শব্দগত বা lexical দিক থেকে নানা ভাষার ওজন করে তাদের দামের হিসেব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। তবু আমাদের মনে হয়, ধ্বনিতাগত 'ফোনোলজিক্যাল', রূপগত 'মরফোলোজিক্যাল' এবং অন্বয়গত 'সিন্‌ট্যাক্‌টিক্যাল'—এই সমস্ত স্তরেই নিয়ম অর্থাৎ 'রূল'-এর সংখ্যার কমবেশি অনুযায়ী ভাষার জটিলতার একটা হিসেব সম্ভব। এর সঙ্গে অবশ্য 'ভালোমন্দে'র ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই। কোন্ ভাষার ধ্বনিতে স্বাতন্ত্র্যলক্ষণ

বেশি আছে, পদগঠনে সংবর্তনের নিয়ম বেশি লাগছে—সেসব ধরে একটা মোদ্দা অঙ্ক পাওয়া সম্ভব। যেমন লিঙ্গের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফরাসী, জার্মান বা হিন্দী বাংলা ও ইংরেজির চেয়ে জটিল বেশি—কারণ ঐ সমস্ত ভাষাতেই এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংবর্তন (নিচুদরের বা 'লো-লেভেল') শেখার দরকার হচ্ছে। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'স্বরবর্ণ' ও 'ব্যঞ্জনবর্ণ' কথাদুটির জায়গায় 'স্বরধ্বনি' ও 'ব্যঞ্জনধ্বনি' থাকলে আমি সুখী হতাম।

'গদ্যের বিকাশ' প্রবন্ধটিও মূল্যবান, যদিও এ প্রবন্ধে, অন্যান্য প্রবন্ধের মতোই, লেখক মাঝে মাঝে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান। 'শব্দার্থের প্রকৃত রূপ' প্রবন্ধটি সাম্প্রতিককালের 'জেনারেটিভ সেমানটিক্স' বা তার পাশাপাশি বেড়ে ওঠা componential analysis-এর আলোতে নতুন করে লেখা যেতে পারত। কিন্তু এ প্রবন্ধের যা সীমাবদ্ধতা তার কারণ ঐতিহাসিক- লেখক নিজের কালকে অতিক্রম করতে পারেননি।

আসলে বাংলায় যে তাঁর বই বেরুল সেটাই যথেষ্ট খুশী হওয়ার মতো ঘটনা। এখানে অবশ্য একটা অভিযোগ আছে। শ্রীমতী লীলা রায়ের অনুবাদ সর্বত্র সুখকর হয়নি। মধ্যবর্তী পাঁচটি প্রবন্ধই তাঁর অনুবাদ। একাজে তাঁর সফলতা প্রশংসনীয়, কিন্তু মাঝে মাঝে ইংরেজি ধরনের বাক্য-রীতিতে একটু হোঁচট খেতে হয়। ভূমিকায় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের কথায় তাই কিছুতেই সায় দিতে পারি না, যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমি ইচ্ছা করলে বদলে দিয়ে বাংলার মতো করে দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে তাঁর শৈলীর সৌরভ নষ্ট হত।'

পবিত্র সরকার

ঘর—লোকনাথ ভট্টাচার্য। গার্গী-মন্তেরো। নতুন দিল্লী ১৬। মূল্য আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতা কাকে বলে তা নিয়ে কবিকুলে যত না হোক, কবিতার পাঠকমহলে তর্ক অগণন। এ তর্কে কবি যেহেতু মুখ্য আসামী, সে-কারণে তাঁর দায় দ্বিবিধ। প্রথমত, নৈরব্য অবলম্বন করে থাকা, যতদূর সম্ভব প্রকাশ্য বিতণ্ডায় পক্ষ না নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর জ্ঞানবিশ্বাসমতে যাঁকে তিনি কবিতা বলে মানেন, তার পুনঃপুন চর্চা করে যাওয়া। আমরাও সেই কবির সঙ্গে একমত যিনি বলেন, কবিতা কাকে বলে তা বোঝানোর চেয়ে কবিতা লেখা অনেক সহজ কাজ।

লোকনাথ ভট্টাচার্য তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত অষ্টাশি পৃষ্ঠার নিরবচ্ছিন্ন এই রচনাটিকে স্পষ্টত কাব্য বলেননি। আখ্যাপত্রের পিছনে উল্লেখ করেছেন text of a ritual in Bengali। অন্যত্র বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'একটি অভিনব ব্রতের উপাখ্যান'। তবে আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠাতেই এমন ইঙ্গিত আছে যা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এটি একটি 'কাব্যগ্রন্থ'। কিন্তু আখ্যাপত্রের স্বীকারোক্তিতেই কি জাতিবিচার? কবিতা বা কবিতা নয়, তা চেনবার এটাই তো একমাত্র উপায় নয়। লোকনাথবাবু একে ব্রতের উপাখ্যান বলেছেন। ব্যাপারটা লৌকিক। ব্রতকথার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন ব্রতকথা পাঠ করা হয় কিঞ্চিৎ সুর করে, কিঞ্চিৎ নাট্যরস মিশিয়ে। ব্রতকথার সরল সুরকে সাবলীল রাখতে যে ছন্দবেগ প্রয়োজন তার অভাব নেই "ঘর"-এ। কিন্তু তাও কি কবিতার অনন্য অভিজ্ঞান? না। কবিতার অন্যান্য বহুধা লক্ষণই এ-রচনায় প্রকীর্ণ। আবার কবিতা নয় তার প্রমাণও ছড়িয়ে আছে ইতস্তত—অতিকথন, পুনরাবৃত্তি, সংযমের অনস্তিত্ব—এ সবই তো রচনাকে কবিতার সার্থকতার তীর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। তবু এ কবিতা। নইলে পর্বগুলি এমন ইঙ্গিতবহ

শিরোনামে চিহ্নিত হবে কেন? কেনই বা এখানে সেখানে থাকবে এত সিম্বলের প্রয়োগ? ব্যঞ্জনার আলো-আঁধারি?

লোকনাথের "ঘর" কেতাবি অর্থে কাব্য হোক বা না হোক, সুখপাঠ্য বা শ্রুতিমধুর সন্দেহ নেই। ব্রতকথার আদর্শে অবতরণিকায় দিগ্‌বন্দনা দিয়ে শুরু। তবে দিগঙ্গনা বা দিক্‌পতিরা মূলত কবিকল্পনা—স্যুর্‌রিয়েলিজমের ফসল। উপসংহারেও আবার আসেন এঁরা। যদিও অনেকেই ইতিমধ্যে স্থানচ্যুত হয়েছেন, আদি বন্দনায় ঊর্ধ্বে ছিলেন 'জগতের চক্ষু সূর্য', অন্তিমে সেখানে 'নিঃশেষে আত্মসমর্পণে সূর্যস্নাত অভাববোধ'। আদিতে অধঃতে 'স্বপ্নের অবিনশ্বরতা', অন্তিমে সেখানে 'অন্তরে নিলীন মহলের অটল সুগভীর ভিত্তির নিশ্চিত জ্ঞান'।

অবতরণিকার পর ২১টি পর্ব বা সিকোয়েন্স, অবশেষে উপসংহার। প্রতিটি পর্ব স্থানাঙ্কিত ও তারিখচিহ্নিত- অর্থাৎ কোথায় কবে এগুলি রচিত হয়েছে তার ভূগোল ইতিহাস বিবৃত। শুরু নতুন দিল্লীতে ৩০ নভেম্বর ১৯৭৪, শেষ ভুবনেশ্বরে ১৫ মার্চ ১৯৭৫। পর্বগুলিও নামাঙ্কিত। তবে গ্রন্থের নামে যেমন অতি পরিচিত আটপৌরে আস্বাদ, পর্বের নামে তা নেই। সেখানে রচয়িতা কিঞ্চিৎ বি-'ব্রত'। 'গীতিকাব্যের মাছি', 'বিশেষত একটা ঞ', 'সময় খায় মেয়েকে' 'সীমানায় বলাৎকার' উদ্ভটকাব্য বা অ্যাবসার্ড পোয়েট্রির আভাস নিয়ে আসে। ব্রত-উপাখ্যানের শ্রোতৃমণ্ডলী এই শিরোনামগুলির জন্য প্রস্তুত নয় নিশ্চয়ই। তবে ব্যাপারটা 'অভিনব' এবং সেখানেই কবির আত্ম-রক্ষার দুর্গ। নামকরণে লৌকিক অর্থনিরপেক্ষতা লোকনাথের ক্ষেত্রে অভিনব নয়, তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন।

সমগ্র রচনাটির ধারাবাহিক সারাৎসার সম্ভব নয়, কারণ তথাকথিত ধারাবাহিকতাই এখানে গরহাজির। একটা ঘর, কতই বা তার পরিসর, তার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে এক আকাশপ্রমাণ উদ্বেল মন, স্থানকালবোধ বেমালুম গায়েব করে। তাকে 'উৎসাহ দিয়ে বলছে কেউ-বা হেঁইও-হো হেঁইও-হো হেঁইও-হো অথবা জোরসে জোরসে জোরসে, হেই-হেই-হেই আরো-জোরে আরো-জোরে আরো-জোরে, সাবাস-সাবাস-সাবাস, লোকনাথ-লোকনাথ-লোকনাথ, এবং তালে-তালে তো নিশ্চয় চলছেই হাততালি, যেন দশহাজার দর্শকের এক ক্রীড়াঙ্গন যেখানে দুই পক্ষ যুদ্ধ করে মরছে'। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা যেন অহেতুক অসংলগ্নতা ধারাবাহিক চিন্তাসূত্রের খেই হারিয়ে দিচ্ছে। আসলে চিন্তাসূত্রের জটপাকানো নয়, আধুনিক অস্তিত্বের ছিন্নভিন্নতাই এ রচনার আসল ব্যাপার। এখানে অন্বিষ্ট তাই, 'যেন লেজ একখানি, বিনুনি কারুর, জোড়া লাগতে চায় ঠিকমতো পাছায়, ঠিক খুকুর মাথায়, হাঁ-করা মুখ কার কোথাও, যাতে ঝকঝকে বত্রিশ-পাটী দাঁত সত্ত্বেও এখনো বাক্য নেই যেহেতু সে ধড়হীন।' তবে লোকনাথের সঙ্গে আমাদেরও ধারণা, 'স্যুর্‌রেয়ালিস্তরা যাকে স্বয়ংক্রিয় লিখন বলতে চেয়েছেন' এর অনেকখানি তাই। এবং স্যুর্‌রেয়ালিস্তরা যেমন এই রচনাও তেমনি 'অনেকেরই তৃষ্ণার্ত চোখের সামনে একটার-পর-একটা নিষিদ্ধ দরজা খুলে' দিয়েছে। গতির অতিমাত্রিক আবেগে এখানে দুদণ্ড বসে কথা বলার অবসর নেই। আমরাও বেশ দেখতে পাই যে গতি আমাদের 'আয়ত্তের মধ্যে আর নেই, পেঁছে যাচ্ছি অচেনা এক অন্য জগতে, অন্য এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কবলে'। এবং তখন 'ঘরের কোণায়-কোণায় দেয়ালে-দেয়ালে যে-অজস্র হুলুধ্বনি-ঢাকবাদ্যি বেজে ওঠে, তা-ই হয় সেই প্রার্থিত উচ্চারণ, বা কবিতা, অর্থাৎ নাম যদি দিতেই হয় কোনো।' লোকনাথ অবতরণিকায় স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে গেয়ে রেখেছেন, 'আমি বোধহয় আমার সীমিত জীবনের পক্ষে এক ভয়াবহ আবিষ্কারের দিকে ছুটে চলেছি। সে-আবিষ্কার ভাষা নিয়ে মেতে থাকতে-থাকতে একেবারে ভাষারই চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়ার। সেখানে আমার চেনা ভাষা বা আমার ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডার আর পারছে না, হার মানছে, সেখানেই আমার এই নবজন্ম ঘটছে।'

'আবিষ্কার' অর্থাৎ এক অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ আবিষ্কারের সাধনায় লোকনাথ বেশ কিছুকাল ধরে নিবিষ্ট এবং "ঘর"-এ এসে এই পরীক্ষা প্রায়-উত্তরণবিন্দুতে পৌঁছেছে'। আমরাও সেই সমাসন্ন জন্মলগ্নের প্রতীক্ষায় আছি। তলিয়ে ভাবলে দেখা যায় কবিতামাত্রেরই তো এই আবিষ্কারের সাধনা—ভাষা নিয়ে মেতে থাকতে থাকতে একেবারে ভাষারই চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়ার সাধনা। কবিমাত্রেই তো বলে থাকেন, 'আমার ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডার আর পারছে না, হার মানছে।'

সমগ্র রচনার প্রাণরহস্য প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্যনির্ভর- -দম-বন্ধ-করা গতিবেগ আর আটপৌরে শব্দ ও বাগ্ভঙ্গির অনায়াস প্রয়োগ। বাক্যের পর বাক্য, ছবির পর ছবি, সিকোয়েন্সের পর সিকোয়েন্স পরস্পরের মধ্যে পারম্পর্য বা ধারাবাহিক অর্থপ্রবাহ না রেখেও এমন দুর্দান্ত বেগে ছুটে চলেছে যেন রুদ্রপ্রয়াগের অলকানন্দা। কোনো কোনো জায়গায় যেন মনে হয় মুখস্থ বলা হচ্ছে। দীর্ঘ হলেও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল যাতে দুটো বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়ে : 'ঢুকেই বাঁ-হাতে একটু দূরে কোণ ও যেখান থেকে অন্য দেয়াল বা সেই দেয়ালেরও মাঝামাঝি আলমারিটা, তাতে কতগুলি তাক ও কোন্ তাকে কী আছে-না-আছে, যথা দ্বিতীয়টিতে নিশ্চয় রাসের মেলায় কেনা বৌঠাকুরণটি, সাবেকী কপালে-টিপ লালপেড়ে-শাড়ী মাছের মতো-চোখ, বা কাঠের সে-পুতুলের উপর সকাল কিম্বা দুপুর অথবা বিকালের ঘড়ির কাঁটা বুঝে কীরকম আলো পড়ে-না-পড়ে, বা কবে কখন সেই আলো দেখে দেবদূতোপম কোন্ শিশুর মৃত্যুর স্মৃতি আমাতে জেগেছে-না-জেগেছে ও তখন জাত-অজাত সকলের জন্য অনন্ত জীবন চেয়ে কী-প্রার্থনা করতে আমি বসেছি নতজানু, ইত্যাদি-ইত্যাদি...' কোথায়ও পূর্ণচ্ছেদ নেই, চোখে পলক পড়ার উপায় নেই।

সবশেষে লোকনাথের কাছে দুটি নিবেদন। রিচুয়াল বা ব্রত-উপাখ্যানের আয়োজন স্বভাবতই এ ব্যাপারটা ট্রাডিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ট্রাডিশনাল পরিবেশকে উচ্চকিত করতে উপচারের অভাব নেই—দিগ্বন্দনা, সভাজনের পদধূলি যাচ্ঞা, পুজোর কাঁসর-ঘণ্টা, কুলুঙ্গির উপর কৌটো ইত্যাদি ইত্যাদি। তথাপি 'বাংলা ভাষায় কসরতের সামান্য' এই নমুনা দেশকালকে স্পর্শ করতে পেরেছে কি? লোকনাথের রচনা কখনো ময়ূরের মতো উন্মীলিত সহস্রপুচ্ছ, পরক্ষণেই গোধূলির মতো অস্পষ্ট ম্লান এবং সবশেষে যেন অন্ধকারের গম্বুজের মতো স্তব্ধ বোবা অর্থহীন। তাই 'কবিতা বললে যাকে কম বলা হয়, বা শুধু প্রার্থিত উচ্চারণরূপে অভিহিত করলেও যার চূড়ান্ত অপরিহরণপরতা ও অপ্রমেয় ব্যাপ্তির এক অস্পষ্ট ও অপর্যাপ্ত (এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'প্রচুর', এখানে কি সেই অর্থেই ব্যবহৃত, না তার বিপরীত অর্থই এখানে অভিপ্রেত?) ইঙ্গিতই দেওয়া চলে' 'লিখিত বা উচ্চারিত হবার প্রণালীতে' সে কি অবশেষে ধর্ষিতা নারী, শিশুর মৃতদেহ বা স্বপ্নের আদিগন্ত শ্মশানভূমিতে পরিণত? ব্রুটি প্রণালীর না চিদাদর্শের?

আরেকটি কথা, ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গলভাবনা সম্পৃক্ত। সে-বিচারে এ তো কক্ষমাঙ্গলিকী। কিন্তু উপসংহারে সে মঙ্গলভাবনা বা কল্যাণচিন্তা অপসৃত কেন? তার পরিবর্তে ঘরের মানুষটি বেরিয়ে যাচ্ছে 'মূষিক হয়ে'। আগুনে ঝলসে গেছে তার সর্বাঙ্গ, ছোট-ছোট ঢিবির মতো বিষফোঁড়ার সারি গালে-চোয়ালে-চিবুকে। এই পরাভূত মানুষের সহস্র ক্ষমা-প্রার্থনার পটভূমিকাই কি তৈরি হয়েছিল পর্বে পর্বে? তাহলে এ কোন্ সে-ব্রতের উপাখ্যান, অন্তিমে যার 'বহু শবের বোঁটকা গন্ধের দমকা দমকা বাতাস—দম বন্ধ হয়ে আসে'?

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড)—ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১২। মূল্য দশ টাকা।
সংগীত-পরিচিতি—নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। হসন্তিকা প্রকাশিকা। মূল্য পূর্ব ভাগ সাত টাকা; উত্তর ভাগ নয় টাকা।

দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ময়মনসিংহগীতিকা ১৯২৩ সনে এবং পূর্ববঙ্গগীতিকা ১ম খণ্ড ১৯২৬ প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে। সেন মহাশয় সরেজমিনে ময়মনসিংহ যাননি—সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে এবং আশুতোষ চৌধুরীর প্রেরিত পালাগুলির সম্পাদনা করা ছাড়া বিভিন্ন পুঁথি বা গীতধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ তাঁর হয়নি। সংগ্রাহকদের প্রতিও সে ধরনের কোন নির্দেশ ছিল বলে বোধ হয় না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বাউল এবং কবীরের ভজনগুলি বিভিন্ন পুঁথি এবং গীতধারার সঙ্গে মিলিয়ে নেননি; জনসমক্ষে সেগুলিকে তুলে ধরাই ছিল তৎকালীন প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। এমন অবস্থায় সংগৃহীত গানে বা পালায় পাঠাশুদ্ধি বা গায়নিক অপূর্ণতা সব সময় এড়ানো যায়নি। তবু তাদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'হারামণি' কথাটি থেকে নামকরণ করে মনসুরউদ্দিন আহমদ তাঁর পাঁচ খণ্ডের সংগ্রহপুস্তক "হারামণি" প্রকাশ করেছিলেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু তাঁর সংগ্রহেও ভ্রান্তিমুক্তি ছিল না। তাছাড়া লোকসংগীতের মুদ্রিত বা লিখিত পাঠের সবচেয়ে বড় অপূর্ণতা এই যে, তার সঙ্গে গানগুলির সুর এবং তালের কোন যোগ না থাকায় সেগুলিকে নেড়া-নেড়া মনে হয় এবং অনেক সময় গ্রাম্য কবিদের অশিক্ষিতপটুত্ব অমার্জিত বোধ হয়। গানের মধ্যে এই ত্রুটি-গুলি সুরে ঢেকে যায়। তবু বিস্মৃতির কবল থেকে এগুলিকে রক্ষা করার জন্য মুদ্রণের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের বহুবর্ষব্যাপী সাধনা পূর্ববঙ্গগীতিকার ১ম খণ্ডে ছয়টি পালায় রূপ লাভ করেছে। মৌলিকমহাশয় একসময় বিপ্লবী দলে ছিলেন এবং সেই সময় পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপনকালে তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় যান এবং লোকসাহিত্যের এই দিকটি সম্বন্ধে হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ পান। দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রথম কাজ অবশ্যই ছিল তাঁর কাছে প্রথম প্রেরণা। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (১) বাইদ্যা কন্যা মহুয়া (২) সুন্দরী মলুয়া (৩) চন্দ্রাবতী (৪) দস্যু কেনারাম (৫) আয়না বিবি এবং (৬) শ্যাম রায়। দীনেশবাবুর সংগৃহীত পাঠের অতিরিক্ত সংগ্রহ এবং ভিন্নতর পাঠগুলিও উল্লিখিত হয়েছে। শব্দার্থনির্ণয়ে মৌলিকমহাশয় সতর্কতা এবং শ্রমমুখিতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই ধরনের পালাগানে মূল গায়েন বা অধিকারীর একটা বাচিক ভূমিকা থাকে যা সব সময় লিখিত পুঁথিতে উল্লিখিত হয় না অথচ এটি না হলে নাটকের ঘটনাক্রমের যোগসূত্র ঠিকমত রক্ষিত হয় না। বর্তমান সম্পাদনায় সেই যোগসূত্রগুলি দিয়ে ঘটনার পারম্পর্য অনুধাবনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তবে চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতির যতই দোষদর্শন এবং সমালোচনা করা যাক না কেন, পথিকৃতের কাজে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকবেই। তাছাড়া গানের লিখিত এবং গীত রূপের মধ্যে পার্থক্য সর্বকালে সর্বদেশে সকল প্রকার গীতরূপের মধ্যেই ছিল এবং আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্বরলিপিবন্ধ করতে না পারলে এই মৌখিক এবং গায়নিক রূপান্তরের গতি রোধ করা যায় না। যেমন মহুয়া বা বাইদ্যা কন্যা পালাটির ঘটনাস্থল সুসং পরগনা অর্থাৎ বর্তমান নেত্রকোণা মহকুমার গারো পাহাড় অঞ্চল। বর্তমান শতকের চতুর্থ দশক থেকে সারা ময়মনসিংহ জেলায় পালাটির জমজমাট পুনরুজ্জীবন হয়েছিল। গায়ন দলের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল।

বাল্যকালে শোনা এই পালার কিছু কিছু গানের সঙ্গে আলোচ্যমান সংগ্রহের পাঠের ঈষৎ পার্থক্য আছে। যেমন পালার নায়িকার প্রথম মঞ্চাবতরণের প্রাক্কালীন একটি গান মৌলিক মহাশয়ের গানে নেই। গানটি এইরূপ,

আইল আইল রে আমার রসের বাইদ্যানী। (ধুয়া)
গোলাপফুল কানে দিয়া নাচে লো কামিনী
নাচে লো কামিনী রসের বাইদ্যানী (হায় হায় আইল......)
(আমার) বাইদ্যা বড় ভাইগ্যমান
সোনা দিয়া বান্ধাইছে দুটি কান,
রূপা দিয়া বান্ধাইছে দুটি আঁখি লো সজনী। (আইল.....)

তেমনি নয়াবাড়ী বাঁধার গানের আরম্ভে ছিল,

নয়াবাড়ী বাইন্ধ্যা যে বাইদ্যা
আরে বাইদ্যা লাগায় সাধের সাজনা
সেই সাজনা বেচিয়া দিব হায় রে
আরে হায় রে মোহারাজের খাজনা
প্রাণ আমার যায় যায় রে। (ধুয়া)

সাজনা মানে সজিনা এবং মোহারাজের মানে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কাজেই গানের মতো সজীব জিনিস যদি স্বরলিপিবদ্ধ না হয় তাহলে আমাদের দেশের জেলায় জেলায় এমন কি মহকুমায় মহকুমায় উচ্চারণ এবং ভাষাগত প্রভেদের কারণে পার্থক্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক। উপরের দুটি গানই ছিল চতুর্মাত্রিক কাহারবা তালে। নির্মলেন্দু চৌধুরীকে প্রথম গানটি গাইতে শুনেছি কিন্তু তাঁর গায়নের সঙ্গে আমার শোনা সুরের পার্থক্য আছে। তিনি যে সুর এবং কথা পেয়েছেন তা হয়তো শ্রীহট্ট জেলার উৎসে প্রাপ্ত। এই অবস্থায় প্রাপ্ত পাঠের সবগুলি রূপ দেওয়াই ভাল। নতুবা গীত গান এবং লিখিত পাঠে পার্থক্য থাকবেই।

পালাগুলির সম্পাদনায় শ্রীমৌলিক যথেষ্ট নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাগ্য ভালো যে, সুনীতিবাবুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল নতুবা আমাদের একাডেমিগুলির যে দশা তাতে তাঁর এই বিপুল সংগ্রহ হয়তো পোকায় কাটত। আশা করি ফার্মা কে এল এই বই ছাপিয়ে যে সাহস এবং কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, বাকি খন্ডগুলি প্রকাশ করার ব্যাপারেও তা অব্যাহত থাকবে।

যথাক্রমে নবম ও চতুর্থ প্রকাশ বই দুটির বহুল জনসমাদরের পরিচায়ক। সংগীত যেহেতু ক্রিয়াসিদ্ধ কলা সেইহেতু তত্ত্ব এবং ইতিহাসের ভূমিকা এতে একদা খুবই নগণ্য ছিল। ধ্বনিতত্ত্ব ও স্বরের প্রতীতির জন্য কিছু কিছু তত্ত্বগত ধারণা আবশ্যিক হলেও ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এমন সব কলাবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের ধার আদৌ ধারতেন না; যেমন ঢাকার বিখ্যাত সংগীতশিক্ষক ও বেতারগায়ক গুল মহম্মদ সাহেব। কালে খাঁ সম্বন্ধে একই কথা শোনা যায়। তত্ত্ব সম্বন্ধে এঁরা খুবই অসহিষ্ণু ছিলেন। অনেকে কোন্ রাগে কোন্ স্বর লাগে তাও সঠিক বলতে পারতেন না বা এককে সময় এককে রকম বলতেন কিন্তু গাওয়ার সময় কোন ভুল করতেন না।

কিন্তু আজকাল সংগীত যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত এবং বিভিন্ন উপাধিপরীক্ষার বিষয় সেইহেতু অ্যাকাডেমিক তত্ত্ব কিছুটা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্যার্থী এবং পরীক্ষার্থীরা এতাবৎ নানা অসুবিধা ভোগ করেছেন। এ বিষয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু বই বেরিয়েছে।

নীলরতনবাবু একজন গায়ক এবং সংগীতশিক্ষক। আলোচ্য পুস্তক দুটি তার বহুদিনের অভিজ্ঞতা এবং অধ্যয়নার্জিত জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত। আলোচ্যসূচী দেখলেই বোঝা যায় যেসব প্রসঙ্গ সাধারণত পরীক্ষার্থীদের সামনে তোলা হয় সেইসব বিষয়ই তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। পূর্বভাগে ধ্বনি, শ্রুতি, স্বর, ঠাট, রাগ ইত্যাদির আলোচনা দিয়ে শুরু করে শুদ্ধ, সালগ, সংকীর্ণ, পরমেলপ্রবেশক, সদৃশ রাগের তারতম্য ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সব বিষয়ই তিনি আলোচনা করেছেন। ২২টি তালের ঠেকা দিয়ে ভারতীয় সংগীতের একটি রেখারূপও তিনি গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত করেছেন। ইতিহাসের ব্যাপারে তিনি স্বভাবতই শ্রীপ্রজ্ঞানন্দের পুনরুজ্জীবনবাদী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন যে, সামগানের পতনের যুগে তার সবকিছু অনুকরণ করেই গান্ধর্ব সৃষ্ট হয়েছিল। একথা যদি সত্য হত তাহলে বৈদিক সাহিত্যে গান্ধর্বের উল্লেখ থাকত না এবং গান্ধর্বের বিশ্লেষণ করেই সামগানের স্বরলিপি খুঁড়ে বের করা যেত। কিন্তু তা যেহেতু যায়নি অতএব এই ধর্মীয় প্রচারকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। সংগীতের উপরে ধর্ম এবং তন্ত্রের প্রভাব মতঙ্গের আমল থেকে চলে আসছে, কাজেই একদিনে এর কবল থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। তবে নীলরতনবাবুর আলোচনা মোটামুটি যুক্তিগ্রাহ্য এবং অন্য অনেকের চেয়ে পরিশীলিত ও প্রাঞ্জল। তবে দু-এক জায়গায় সামান্য কিছু বক্তব্যের অবকাশ আছে। যেমন নাদ, বিশেষ করে অনাহত নাদ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তা হচ্ছে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত। কেননা তিনি নিজেও নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, অনাহত নাদ কথাটা একটা কথার কথা, অর্থহীন এবং অসম্ভব ব্যাপার; কারণ বিনা আঘাতে নাদসৃষ্টি বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকার করা যায় না। তথাপি রাজশক্তি এবং ধর্মের প্রভাবে শাস্ত্রকারেরা এইসব আজগুবি কথা আবহমান কাল প্রচার করে এসেছেন। স্বরের বলীকরণকে তিনি লিখেছেন magnitude (পৃঃ ৪): এর পারিভাষিক যতদূর স্মরণ হচ্ছে volume।

দ্বিতীয় বা উত্তর ভাগে হিন্দুস্থানী বা উত্তরভারতীয় রাগসংগীতের সঙ্গে দক্ষিণী বা কর্ণাটকীর তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পাঠকদেরও কাজে লাগবে। রাগ এবং তাল সম্পর্কে আলোচনা এই ভাগে বিস্তৃততর। উত্তর ভারতে ঘরানার উদ্ভব এবং তৎসম্পর্কিত আলোচনা সাধারণ পাঠকেরও কৌতূহল মেটাবে। পরিশেষে পাশ্চাত্ত্য সংগীত এবং স্টাফ নোটেশন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে লাগবে। যাঁরা নিজেরা গাইয়ে বাজিয়ে না হয়েও ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে সাধারণভাবে জানতে চান তাঁরা এই বই দুটির দ্বারা খুব উপকৃত হবেন।

হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

কৃষি সংবাদ

পংকজ

পংকজ ধানের গুণ :

১। ফলন দেবে একর পিছু ১৬ থেকে ২০ কুইন্টাল।

২। বীজতলায় বোনা থেকে ধান কাটা পর্যন্ত সময় লাগে ১৫০ দিন।

৩। নাগরা, পাটনাই বা ভাসামানিকের চেয়ে আগে ধান উঠবে।

৪। সময় কম লাগে বলে একই জমিতে রবিশস্যের চাষও করতে পারবেন।

মাঝারি -নীচু আমন জমির উপযুক্ত অধিক ফলনশীল ধান

৩৫ দিনের বেশি বয়সের চারা রুইবেন না। শ্রাবণের মাঝামাঝি রুইলে ফলন বেশি পাবেন।

ভেঁপু পোকার হাত থেকে ধান গাছকে বাঁচাতে হলে আষাঢ়ের গোড়ায় বীজতলা করে শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে রুইবেন। এজন্য প্রতিবেশী কৃষকরা মিলে এক জায়গায় বীজতলা করুন যাতে পুকুর, গভীর বা অগভীর নলকূপ ইত্যাদি থেকে বীজতলায় দরকারমত সেচ দেওয়া যায়।

বীজের জন্যে আজই কাছাকাছি সরকারী খামার বা প্রতিবেশী কৃষকের কাছে খোঁজ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

আপনার মেয়ে পরের বৌ হ'বার যুগ্যি তো ?

সব বাবা মায়েরাই চান যে তাদের মেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, আনন্দে ঘর সংসার করবে, সুখে স্বাচ্ছন্দে বড় হবে। কিন্তু আপনার মেয়েকে কোন অকালে শাড়ী পরিয়ে বউ করে তুলে তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই কি সে স্বপ্ন সফল হবে ? আপনার মেয়ে কিশোরী — সংসারের দায়, সন্তানের দায়িত্ব তুলে নেওয়ার ক্ষমতা তার এখনও তৈরী হয়নি। তার জন্য তার বয়স ন্যূনপক্ষে আঠারো হওয়া উচিৎ। আঠারো বছর বয়সে মেয়েদের দেহ এবং মনের পরিপূর্ণ গঠন হয়। তখনই তৈরী হয় সাংসারিক জীবনের গুরু দায়িত্ব তুলে নেবার ক্ষমতা। রমণীকেই জননী হওয়া সাজে, কিশোরীকে নয়। তাই দেখবেন— আপনার মেয়ে যেন দেহে, মনে ও বয়সে গৃহিণী হওয়ার যোগ্য হয়। তার আগে বিয়ে নয়।

দেহ মনের পূর্ণ গঠন
মেয়ের বয়স আঠারো যখন

davp 76/500

দুরকে নিকট করেছে
ভারতবর্ষ এক গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অধিকারী। সে অতীত প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। তার সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা। তার শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের যে অসংখ্য চিহ্ন এই মহান উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তা এই দেশবাসীর কাছে গর্ব ও প্রেরণার চিরন্তন উৎস।
শতাব্দীর পর শতাব্দী যোগাযোগের অভাবে এই গৌরব চিহ্নগুলি অজ্ঞাতই ছিল। ভারতীয় রেলওয়ে সেই যোগাযোগ সম্ভব করে দূরকে নিকট করেছে এবং ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির অমূল্য অবদানকে সমগ্র জাতির সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করেছে।
পূর্ব রেলওয়ে
medium

কারিগরি বিদ্যা
ফলবতী করতে হলে চাই
অর্থের যোগান।
আপনার
শিল্প কৌশলের সঙ্গে
ইউবিআই-এর
অর্থ যোগান—
এ হবে রাজযোটক!
আমাদের যে কোন শাখা
অফিসে এসে খোঁজ করুন।
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

বর্ষ ৩৮ কার্তিক-পৌষ ১৩৮৩

সূচিপত্র

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ ডক্টর লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩৮ কার্তিক-পৌষ ১৩৮৩

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

ক. প্রস্তাবনা

বাংলায় রাজনৈতিক গণ-সংগঠনের সূচনা করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ১৯০৫-১৯০৮ সালে, অশ্বিনীকুমার দত্ত-পরিচালিত বরিশালের গণ-সংগঠন রাজনৈতিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিল বয়কট সাফল্যমণ্ডিত করিয়া। গণ-সংগঠনের কথা বাংলায় আবার উঠিল ১৯২১ সালে, অসহযোগ আন্দোলনের সময়। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল বিচ্ছিন্নভাবে। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় নেতারা অসহযোগ আন্দোলন ও কংগ্রেস সংগঠন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ধরিলেন গণ-সংযোগ ও গণ-সংগঠনের পথ। এ পথে কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলন যে-সব জায়গায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছিল তাহার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ, বাঁকুড়া ও কুমিল্লার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে আবার মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশে গণ-সংগঠন গড়িবার প্রথম দিকেই ব্যাপক গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯ অনুসারে ১৯২১ সালের প্রথমদিকে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তন করা হয়। গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ করিবার জন্য শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলন এত তীব্র ও ব্যাপক হইয়া উঠে যে সরকার বাধ্য হইয়া মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহার করিয়া নেন। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশের এই ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ-আন্দোলনই প্রথম সফল সত্যাগ্রহ।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশবাসী জনসাধারণের অবদান সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ইঁহাদের স্থান অগ্রগণ্য। এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা হইয়াছিল ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ করার মধ্য দিয়া। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মেদিনীপুরের পূর্বাংশবাসীদের মতো রাজনীতি- ও অধিকার-সচেতন জনগোষ্ঠী বোধ করি বাংলায় আর কোথাও ছিল না। আবার জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অর্থনৈতিক মুক্তির

আন্দোলনও মেদিনীপুরের পূর্বাংশের মতো অন্য কোথাও জনসাধারণের নিম্নতম পর্যায়ে প্রবল হইয়া উঠে নাই। গণ-আন্দোলনের গতি যে এই দিকেই ধাবমান তাহার ইঙ্গিতও ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ-আন্দোলনের পরেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বস্তুত, এই আন্দোলনের ফলেই মেদিনীপুরের পূর্বাংশে জনসাধারণ নিজেদের অধিকার ও সংগঠিত প্রতিরোধের শক্তি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্থানীয় শোষকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হইবার সাহসও তাঁহারা অর্জন করিয়াছিলেন এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হইতেই। ইংরাজ ও তাহার সহায়ক স্থানীয় শোষকদের যুক্ত শোষণ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা গণ-সংগঠনের মধ্যে যে গতিবেগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুরের পূর্বাংশে গণ-আন্দোলন অগ্রসর হইয়াছে ও বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহারই প্রভাবে। শোনা যায়, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পুলিশের অত্যাচার ব্যাপক ও প্রচণ্ড হইয়া উঠিলে অনেকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে বলিয়াছিলেন—এ অবস্থা লোকে সহ্য করিবে কি করিয়া? আপনি মেদিনীপুরকে থামান। তখন বোধ করি গণ-আন্দোলনের এই নিজস্ব গতিবেগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বীরেন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন—না, মেদিনীপুরের আর ফিরিবার পথ নাই।

বাংলার এই প্রথম গণ-রাজনৈতিক আন্দোলনের কাহিনী তাই একটু বিস্তারিতভাবেই বলিতে হইবে। বিভিন্ন দিক দিয়া আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে পটভূমিকার কথাও খানিকটা না বলিলে চলে না। যে ক্ষেত্রের উপর গণ-আন্দোলনের বীজ ফুটিয়া অতি দ্রুত অঙ্কুর ও শৈশব ছাড়াইয়া দৃঢ় কাণ্ড সহ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ফেলিল সেই ক্ষেত্রের কথাটা আগে বলিয়া লইতে হইবে। সেই সঙ্গে এই ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজ হইতে বৃক্ষ পর্যায় পর্যন্ত পরিবর্ধনে যিনি নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তাঁহার কথাটাও বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহার পরে আসিব আন্দোলনের বিবরণে।

খ. পূর্ব মেদিনীপুর

শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে মেদিনীপুর জেলা অখণ্ড ভূভাগ বটে, কিন্তু ভূপ্রাকৃতিক কারণে মেদিনীপুরকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা কঠিন নয়। উত্তরে রামজীবনপুর হইতে পুরাতন বর্ধমান সড়ক নাড়াজোল পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে আসিয়া তাহার পর পশ্চিমে খানিকটা বাঁকিয়া কেশপুরের উপর দিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে মেদিনীপুর শহরে; আর মেদিনীপুর শহর হইতে মোটামুটি দক্ষিণবাহী হইয়া দাঁতনের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে পুরী ট্রাঙ্ক রোড। মোটামুটিভাবে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত এই সড়ক দুইটি মেদিনীপুর জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিতেছে। সড়ক দুইটির পশ্চিমে পড়িতেছে সদর মহকুমার বৃহত্তর অংশ, ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও ঘাটাল মহকুমার সামান্য একটু খণ্ড। পূর্বদিকে পড়ে ঘাটাল মহকুমার বৃহত্তর অংশ, সদর মহকুমার কেশপুর, ডেবরা, মেদিনীপুর সদর, খড়্গপুর, পিংলা, সবং, নারায়ণগড়, দাঁতন ও মোহনপুর থানা। পূর্বদিকের অংশগুলিকে একত্রে পূর্ব মেদিনীপুর বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

সড়ক দুইটির দ্বারা মেদিনীপুর জেলা যেভাবে বিভক্ত, জেলাটির প্রাকৃতিক বিভাগ প্রায় তাহার অনুরূপ। পশ্চিম দিকে ভূমি কঠিন, উচ্চাবচ ও মাকরা পাথরে সমাকীর্ণ। এখানে নদী শীর্ণতোয়া; শীতে ও গ্রীষ্মে জলপ্রবাহ কোথাও কোথাও হইয়া উঠে অতি সংকীর্ণ। বালুকাময় নদীগর্ভের একদিকে অতি ক্ষীণ একটি প্রবাহ ধীরে বহিয়া চলে। কিছুদিন আগেও পশ্চিম অংশের লালমাটির দেশ ছিল ঘন শাল বনে সমাচ্ছন্ন, আর তাহার মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে লোকবসতি। পূর্বাঞ্চলের চরিত্র কিন্তু একেবারে পৃথক। ইহার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, আর পূর্বদিকের প্রান্ত

বহিয়া চলিয়াছে রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর সাগরমুখী প্রবাহ। কাঁসাই কালিয়াঘাই-হলদী এবং রসুলপুর নদীর মোহানাও পূর্ব মেদিনীপুরেই। মোহানা-সন্নিহিত এই ভূখণ্ড অসংখ্য নদী, নালা, খাল ও খাড়ির জলপ্রবাহ দ্বারা কতভাগে যে বিভক্ত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূমি প্রধানত এইসব জলপ্রবাহবাহিত উর্বর পলিমাটি দিয়াই গঠিত। আবার এইসব প্রবাহপথ বাহিয়া জোয়ারের সময় নোনা জল ঢুকিয়া পড়ে পূর্ব মেদিনীপুরের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত। এই লবণাক্ত জল নিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে মেদিনীপুরের লবণ-শিল্প।

গ. পূর্ব মেদিনীপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা

পূর্ব মেদিনীপুর একসময় কৃষি ও শিল্পে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ হইতেই দেখিতেছি, কৃষি ও শিল্প উভয়ই ধ্বংসোন্মুখ। সমৃদ্ধির সময় সুতীবস্ত্র, রেশম, রেশমবস্ত্র, লবণ ও চিনি ছিল পূর্ব মেদিনীপুরের প্রধান শিল্প। শিল্পগত সমৃদ্ধির অনেকটাই আসিয়াছিল ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বাণিজ্যসংস্থা ও বণিকদের রপ্তানির জন্য। রপ্তানি পড়িয়া যাওয়াতে শিল্প বিপর্যস্ত হইয়া যায়। তাহার উপর ইংলন্ড হইতে আমদানি-করা কলের কাপড় যখন দেশী তাঁতের কাপড়ের চেয়ে সস্তায় বিক্রি হইতে আরম্ভ করিল তখন স্থানীয় বাজারেও দেশী কাপড়ের অবস্থা হইয়া উঠিল রীতিমত সঙ্গীন। ইংলন্ডে তৈরী লবণ এ দেশের বাজারে বিনা বাধায় বিক্রি করিবার জন্য সরকারী আদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লবণ তৈরীও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

একের পর এক শিল্প বিপর্যস্ত হইয়া যাওয়াতে কারিকরেরা ঝুঁকিতে লাগিলেন কৃষির দিকে। বস্তুত ইহা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। লবণ তৈরীর জ্বালানি সংগ্রহের জন্য নদীর ধারে ধারে যে বিস্তৃত জালপাই (জাল = জ্বালানি, পাই = পতিত) লবণ তৈরীর উদ্দেশ্যে ফেলিয়া রাখা হইত লবণ-শিল্প ধ্বংস হইতে শুরু করিলে সেসব জমি হাসিল করিয়া কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করা হইতেছিল। ইহার ফলে কৃষিজমি কিছুটা বাড়িতেছিল বটে, কিন্তু সাধারণভাবে পূর্ব মেদিনী-পুরের কৃষি তখন সংকটাপন্ন। যে বন্যার ফলে পলির আস্তরণ পড়িয়া এতকাল ভূমির উর্বরতা বাড়িতেছিল, সংকট ঘনাইয়া আসিতেছিল সেই বন্যারই প্রকোপে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিক হইতেই অববাহিকার উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে ভূমিক্ষয়ের ফলে পূর্ব মেদিনীপুরের নদীগুলি দিয়া জলপ্রবাহের সঙ্গে পলি নামিয়া আসিতেছিল অনেক বেশী পরিমাণে। পলি একেবারে শেষ পর্যন্ত বহিয়া নিয়া যাইবার ক্ষমতা জলপ্রবাহের সারা বৎসর থাকে না বলিয়া নদীগর্ভ জুড়িয়া সর্বত্র পলি জমিতে থাকে। অবস্থা শেষে এমন হইয়া উঠিল যে বন্যার সময় অতিরিক্ত জল বহনের ক্ষমতাও আর নদীপ্রবাহের থাকিল না। বাড়তি জল নদীগর্ভ উপচাইয়া ছড়াইয়া পড়িতে থাকিল পাড় ছাড়াইয়া অনেকে দূরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে। বিপর্যয় রোধ করিবার জন্য আরম্ভ হইল বাঁধ তৈরী। কিন্তু বন্যার বেগ প্রবল হইলে মাটির বাঁধ আর ভাঙিতে কতক্ষণ। তাহার উপর নদীগর্ভ ভরাট থাকাতে বন্যার জল বাঁধের গায়ে উঠিয়া আসিত সহজেই। তাই বাঁধ দিয়া প্লাবন রোধ করা গেল না। প্রতি বৎসরই বাঁধ ভাঙিয়া শস্যক্ষেত্র, গ্রামগঞ্জ প্লাবিত হইয়া যাইত। এদিকে নদীর পাড় ধরিয়া বাঁধ দেওয়ার ফলে নিকাশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। বাঁধ ভাঙিয়া যে জল বিস্তৃত এলাকায় ছড়াইয়া পড়িত সে জল বাহির হইবার আর পথ পাইত না। জল জমিয়া শস্যক্ষেত্র হইয়া উঠিত হাজা নদীসিকস্তি জমি। কোন ক্ষেত্রে জল হয়তো চাষের সময় পার করিয়া তিন-চার মাস পরে শুকাইয়া যাইত, কিন্তু বার বার বন্যার জল আটকাইয়া যাওয়াতে জমি হইয়া উঠিত অনুর্বর।

অনেক ক্ষেত্রে আটকানো জল সম্বৎসরেও সরিত না। এমনি নদীসিকস্তি খিল জমির পরিমাণ প্রতি বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

কৃষির এই অবস্থায় জমির উপর চাপ হইয়া উঠিতেছিল ক্রমবর্ধমান। সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে বৃত্তিচ্যুত কারিকরেরা জীবনধারণের উপায় খুঁজিতেছিলেন কৃষিকার্যের মাধ্যমে। একই সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছিল জমির খাজনা এবং জমিদার ও জমিদারী কর্মচারীদের নানাপ্রকার আবওয়াব। ঘাটাল মহকুমায় তো খাজনা একর-পিছু দশ টাকার উপর পর্যন্ত উঠিয়াছিল। খাজনার সঙ্গে দিতে হইত তহরি, হিসাবানা, এমনকি জমিদারের ঘোড়া রাখিবার জন্য অশ্ববৃত্তি ও পূজাপার্বণের খরচ যোগাইবার জন্য চাঁদা পর্যন্ত। জমিদার নিজের প্রাপ্য বাড়াইয়া যাইতেন, কিন্তু নদীসিকস্তি বা পতিত জমির খাজনা তাঁহারা সাধারণত মকুব করিতেন না।

এ অবস্থায় কৃষকের দৈন্যদশা যে বাড়িয়াই চলিবে, ইহাই স্বাভাবিক। দৈন্যদশার পরিচয় পাওয়া যাইবে কৃষকের ক্রমহ্রস্বায়মান জোতের পরিমাণে ও তাহার ঋণভারগ্রস্ততায়। ১৯১১-১৭ সালে মেদিনীপুরে যে জরীপ ও বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার প্রতিবেদনে কৃষকের দৈন্যদশা খুব স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিবেদনে দেখিতেছি জমির উপর চাপ এত বাড়িয়াছে যে রায়তের হাতে জোতের গড় পরিমাণ পাঁচজনের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সর্বনিম্ন যেটুকু জমির প্রয়োজন, অর্থাৎ বারো বিঘা, তাহার অনেক নিচে নামিয়া গিয়াছে। কাঁথি, তমলুক ও সদর মহকুমায় এই পরিমাণ তিন বিঘার অল্প কিছু বেশী। ঘাটালে আবার তিন বিঘারও কম।

দৈন্য বাড়িলে কৃষকের ধার করা ছাড়া উপায় নাই। জরীপ-প্রতিবেদক দেখিয়াছিলেন, শতকরা নয় ভাগ কৃষক ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। উত্তমর্ণের হাতে চাষের জমি ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া আংশিক ঋণমুক্তিরও কোন উপায় কৃষকের ছিল না। জরীপের সময় বিগত দশ বৎসরে জমি হস্তান্তরের যে হিসাব নেওয়া হয় তাহাতে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে শতকরা কুড়িভাগ কৃষকের জমি হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে।[১] প্রতিবেদনের হিসাবগুলি অবশ্য আংশিক। কারণ, হিসাব করা হইয়াছিল রেজিস্ট্রিকৃত ঋণ ও হস্তান্তরের অঙ্ক ধরিয়া। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে রেজিস্ট্রি করিবার পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না, আজও নাই। জমি হস্তান্তরও বহুক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিকভাবে করা হইত না। এ কথা জরীপ-প্রতিবেদনেই স্বীকার করা হইয়াছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের ভাগচাষীদের অবস্থা মনে হয় আরও বেশী খারাপ। মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, খেজুরী, কাঁথি ও ভগবানপুর থানায় কৃষিজমির বেশীর ভাগটাই ছিল বড় বড় জোতদার বা চকদারের আয়ত্তাধীন। ইঁহাদের জোতের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৫০ হইতে ২,৬৫০ একর পর্যন্তও। অনেকেই অবশ্য একসঙ্গে বেশী জমি পাইয়াছিলেন জালপাই জমির বড় বড় খণ্ড বা চক বন্দোবস্ত নিয়া। তাহার পর ক্রমান্বয়ে ছোট রায়তের জমি হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব মেদিনীপুরের এইসব বড় জোতদার আবার সুন্দরবনের লটদারও। ভাগীরথীর অপর পাড়ে সুন্দরবন হাসিলের সময় বড় বড় লটের বন্দোবস্ত বেশীর ভাগ নিয়াছিলেন ইঁহারাই।

জোতদাররা জমি চাষ করাইতেন ভাগচাষীকে দিয়া। ন্যায্যত ধান ও খড়ের অর্ধেকভাগ ভাগ-চাষীর পাইবার কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগচাষীর ভাগ্যে আর তাহা জুটিত না। ক্ষেতে শস্যের তদারক করিবার জন্য দারোয়ান মোতায়েন হইবে—সে বাবদ মোতিয়ানি, ধান কাটিয়া খামারে তোলা হইবে তাহার জন্য বাহিরছিলা, খামার ঘিরিবার জন্য খামার ঘেরা, এবং ধান মাপিবার জন্য কয়ালের খরচা বাবদ কয়ালি প্রভৃতি খাতে ভাগচাষীকে নিজের ভাগ হইতে ধান জোতদারের হাতে আবওয়াব বা বাব হিসাবে তুলিয়া দিতে হইত। তাহার উপর খড়ের সবটাই জোতদার নিজে ধরিয়া রাখিতেন। প্রাপ্য খড়ের ভাগ নিতে হইলে ভাগচাষীকে দাম দিতে হইত উচ্চহারে।

এইসব জোতদারী আবওয়াব দিবার পর ভাগচাষী যাহা পাইতেন তাহাতে বৎসরের খাওয়া পরা চলিবার কথা নয়। ফলে ধার করা তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। ধার পাওয়া যাইত নিজের জোতদারের কাছেই। জোতদার ধার দিতেন শতকরা পঞ্চাশভাগ সুদে। ঋণ দেওয়া হইত পাঁচ হইতে আট মাসের জন্য, কিন্তু সুদটা নেওয়া হইত বৎসরের হিসাবে। ধার নিবার সময় সাধারণত আষাঢ় হইতে আশ্বিন, আর শোধ দিবার সময় আমন ধান উঠিবার সময় অর্থাৎ পৌষ-মাঘ। ঋণগ্রস্ত চাষী ফসল উঠিলে আবওয়াব ও সুদ দিবার পর আসলটা আর শোধ দিতে পারিত না। কয়েক বৎসর পরে সুদ সবটা দেওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিত। সেক্ষেত্রে বাকী সুদ জুড়িয়া যাইত আসলের সঙ্গে, আর তাহার উপর ধার্য হইত সুদ। এইভাবে অবস্থা শেষে এমন হইয়া উঠিয়াছিল যে ফসল উঠিলে ভাগচাষী যাহা পাইত তাহাতে তিন-চার মাসও তাহার চলিত না। ঋণের উপর ঋণ জমিয়া হইয়া উঠিত পাহাড়প্রমাণ। আর এ বোঝা বহিতে হইত পুরুষপরম্পরা। ঋণ নিলে তো এই অবস্থা। না নিলেও নিস্তার নাই। ভাগচাষী যদি ধার না করেন তবে জোতদার সুদ পান না—ইহা তো তাঁহার পক্ষে ক্ষতি। সুতরাং ক্ষতিটা পোষাইয়া নিবার জন্য ভাগচাষী যদি কোন বছর ধার নাও করেন তবুও না-করা ঋণের সুদ হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান জোতদারকে দিতে হইত।

ঘ. পূর্ব মেদিনীপুরের সামাজিক অবস্থা ও নেতৃত্ব

পূর্ব মেদিনীপুরের সর্বপ্রধান জাত মাহিষ্য। সংখ্যার দিক দিয়া তো বটেই, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নেও মাহিষ্যরাই এখানে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী। ইংরাজ অধিকার বিস্তারের আগে হইতেই পূর্ব মেদিনীপুরের অধিকাংশ জমিদার ও ইজারাদার মাহিষ্য। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসার একটা বড় অংশও ছিল মাহিষ্যদের হাতে। তুঁত চাষ হইতে শুরু করিয়া রেশম উৎপাদন ও রেশমের ব্যবসা সমস্ত পর্যায়েই মাহিষ্যরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার পর গত শতকের প্রথমার্ধে যখন শিল্প ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে আরম্ভ করিল তখন অনেক বিত্তশালী মাহিষ্য জমিদারী বা পত্তনীদারী স্বত্ব কিনিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে আবার জালপাই জমি কিনিয়া হইয়া উঠিলেন বড় জোতদার।

বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু জাতের প্রশ্নে মাহিষ্যদের স্থান বিশেষ ভাল ছিল না। বস্তুত জলচল নবশাখ জাতগোষ্ঠী ও অজলচল জাতগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল তাঁহাদের অবস্থান। জাতের পরিচয় উন্নততর করিবার চেষ্টা মাহিষ্যরা অষ্টাদশ শতক হইতেই করিতেছিলেন। পূর্ব মেদিনীপুর জুড়িয়া এই সময় হইতে তাঁহারা যে অসংখ্য মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য সম্ভবত জাতের মর্যাদা বাড়াইয়া তোলা। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এই প্রচেষ্টা সংগঠিত আন্দোলনের রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে উচ্চতর স্থান অর্জন ও সাধারণ মানুষকে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি স্থাপন করা হইল। বর্তমান শতকের একেবারে প্রথম দিকের, ১৯০১ সালের, আদমসুমারী প্রতিবেদন পড়িলে মনে হয় ইতিমধ্যে মাহিষ্যদের সামাজিক আন্দোলন বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং সাধারণ মাহিষ্যদের মধ্যে আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে যথেষ্ট।[২] আন্দোলন চালাইতেছিলেন সম্পন্ন মাহিষ্যরাই। কিন্তু উচ্চতর সামাজিক পরিচয়ের আকর্ষণে সাধারণ মাহিষ্যদের মধ্যে আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল যথেষ্ট পরিমাণে। মাহিষ্যপ্রধান পূর্ব মেদিনীপুরে সাধারণ চাষী, ছোট রায়ত ও ভাগচাষীর অধিকাংশই মাহিষ্য। ইঁহাদের পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলনের বিস্তার হইবার ফলে স্থানীয় জনজীবনের উপর

সম্পন্ন লোকদের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু বাড়িয়াই গিয়াছিল।

শুধু জাত-সংক্রান্ত পরিচয়ের প্রশ্নেই নয় আরও কয়েকটা বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের মাহিষ্যদের বেশ কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছিল। জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী—এসব বিষয়ে মাহিষ্যদের আগ্রহ যত, চাকরি বা ইংরাজী-শিক্ষায় তাঁহাদের আগ্রহ বর্তমান শতকের আগে ততটা হয় নাই। এই কারণে ইংরাজ শাসন বিস্তার ও পরিচালনায় মাহিষ্যদের স্থানও ছিল না। বস্তুত মেদিনীপুর জেলার সরকারী অফিসের কর্মচারী, আদালতের ব্যবহারজীব, স্কুলের শিক্ষক ও চিকিৎসকদের মধ্যে বড় অংশটাই ছিল বহিরাগত। চব্বিশ পরগনা, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরাই এইসব ক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেন। ফলে স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকারের যোগসূত্রও ছিলেন ইঁহারাই। জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটি, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি তথাকথিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া কিছুটা ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকারও পাইয়াছিলেন এই বহিরাগতরাই।

অন্যদিকে আবার ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রসারে অগ্রণীর ভূমিকাও ছিল বহিরাগতদের। মেদিনীপুরে ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলন বহিরাগতদের প্রচেষ্টায় কিছুটা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আবার স্থানীয় কংগ্রেসে ইঁহাদের প্রভাবটাই ছিল সবচেয়ে বেশী।

নিজের গ্রামে বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রাধান্য থাকিলেও শাসক ও শাসনব্যবস্থা এবং শাসনকেন্দ্রে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার সঙ্গে বিত্ত-ও প্রতিপত্তি-শালী মাহিষ্যদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। ঊনবিংশ শতকে যে কয়েকজন মাহিষ্য ইংরাজী-শিক্ষিত হইয়া বৃত্তি-জীবী হইয়াছিলেন সংখ্যায় তাঁহারা সামান্যই। বহিরাগতদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে তাঁহাদের স্থান ছিল স্বভাবতই গৌণ। ইহার উপর জাতের প্রশ্নে বাংলার বৃহত্তর উঁচু জাতের নেতৃস্থানীয়দের কাছে মাহিষ্যরা ছিলেন অবজ্ঞাত। বিংশ শতকের প্রথম হইতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের নামে তথা-কথিত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার কিছুটা ক্ষমতা দেশীয় নেতাদের হাতে তুলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন; তখন পূর্ব মেদিনীপুরে সম্পন্ন মাহিষ্যরা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মোটামুটি এই সময় হইতে পূর্ব মেদিনীপুরের মাহিষ্যদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হইতে শুরু হইয়াছে, বৃত্তিজীবীর সংখ্যাও এই সময় হইতে তাঁহাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান। কিন্তু জাত ও নেতৃত্বের প্রশ্নে অসুবিধাগুলি তখনও রহিয়া গিয়াছে।

৬. বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

চণ্ডীভেটির শাসমল পরিবার

ঊনবিংশ শতকে যে সামান্য-সংখ্যক মাহিষ্য ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন আধুনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত চণ্ডীভেটি গ্রামের শাসমল পরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে ইঁহারা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ ও বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কাঁথি মহকুমার প্রথম বালিকা বিদ্যালয় শাসমলদের উদ্যোগে চণ্ডীভেটিতে স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গেও ইঁহারা যুক্ত ছিলেন। ভূম্যধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই পরিবারের দুইজন ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আইন-জীবীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজসেবা, পেশা, বিত্ত, প্রতিপত্তি—সব মিলিয়া চণ্ডীভেটির শাসমল পরিবার হইয়া উঠিয়াছিলেন বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন।

বীরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন

এই পরিবারে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল জন্মগ্রহণ করেন। কাঁথিতে স্কুলজীবন শেষ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসেন। কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করিবার আগেই তিনি নিজের উদ্যোগে লন্ডনে গিয়া আইন পড়া আরম্ভ করেন। লন্ডনে ব্যারিস্টার হইয়া বীরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরিলেন ১৯০৪ সালে। পূর্ব মেদিনীপুরের মাহিষ্যদের মধ্যে বিলাতযাত্রা এই প্রথম এবং ইঁহাদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথই প্রথম ব্যারিস্টার।

বৃত্তিগত পরিচয়

দেশে ফিরিয়া বীরেন্দ্রনাথ প্রথমে যোগ দেন কলিকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু কিছুদিন পরেই যোগ দিলেন মেদিনীপুর আদালতে। মেদিনীপুরে পশার হইলে বীরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতা হাইকোর্টে। অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে ১৯২১ সালে বীরেন্দ্রনাথ যখন আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন তখন তিনি হাইকোর্টে আইনব্যবসায়ী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রাথমিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ

দেশে ফিরিবার পরেই বীরেন্দ্রনাথের রাজনীতিচর্চাও শুরু হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। তবে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল প্রধানত মেদিনীপুর শহর ও কলিকাতাকেন্দ্রিক। ১৯১৯ সাল নাগাদ শহরকেন্দ্রিক রাজনীতিতে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন মনে হয়। মেদিনীপুর জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যপদ ছাড়াও তখন তিনি মেদিনীপুর শহরে প্রধানতম কংগ্রেস নেতা। এ মর্যাদা এতদিন ছিল আদিতে হুগলী জেলার অধিবাসী ব্যারিস্টার কে. বি. দত্ত-র। মেদিনীপুরে ব্যারিস্টার হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন ইঁহার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই।

কলিকাতার কংগ্রেস মহলেও বীরেন্দ্রনাথ সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় তাহার খাদ্য ও সরবরাহ উপসমিতির সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বাংলার যে স্বল্পসংখ্যক কংগ্রেসী গান্ধীর পূর্ণ অসহযোগিতার প্রস্তাব সমর্থন করেন বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯২১ সালে বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে বীরেন্দ্রনাথ আইনব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া চিত্তরঞ্জনের প্রধান সহযোগী হইয়া উঠিলেন। চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছায় বীরেন্দ্রনাথ তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ পদে বৃত হন। কিছুদিন পরে, জুলাই মাসে, তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদ লাভ করেন। তাহার পর ১৯২৩ সালে কংগ্রেস-খিলাফৎ স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে বীরেন্দ্রনাথ হইলেন তাহার অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক। এই দলের বাংলা শাখার সম্পাদকও ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ।

সমাজসেবা

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার আগে পর্যন্ত বীরেন্দ্রনাথের রাজনীতি ছিল প্রধানত শহরকেন্দ্রিক। কিন্তু তাঁহার সেবামূলক কার্যকলাপ গ্রাম-গ্রামান্তরে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথের সেবামূলক কাজের প্রধান উপলক্ষ ছিল বন্যা। বন্যার ফলে চাষের জমি ডুবিয়া গিয়া যে ক্ষতি হইত তাহার কথা আগে বলিয়াছি। কিন্তু বন্যায় সাধারণ মানুষের সর্বনাশ যে আরও কত বেশী পরিমাণে হইত নীচের উদ্ধৃতিটুকু পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। বন্যার

প্রকোপে প্রথমে শস্যক্ষেত্র পথঘাট ডুবিয়া যাইত, আর জলের তোড়ে ভাসিয়া যাইত মানুষ, গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, গৃহপালিত পশু। জল একটু সরিতে আরম্ভ করিলে মাটির বাড়িগুলি ভাঙিয়া পড়িত। তাহার পর—"Putrid vegetation and unburied bodies and carcasses for many weeks lay strewn over the country, and the consumption of bad food and impure water less easy to deal with....(were the) fertile causes of disease which acted on a people already suffering from the loss of their relations and property and proved more fatal than the deluge which first overwhelmed them".৩

বন্যা পূর্ব মেদিনীপুরে প্রতি বৎসরেই কিছু না কিছু হয়। কিন্তু ১৯১৩ ও ১৯২০ সালে বন্যা যে করাল মূর্তি নিয়া আসিয়াছিল তাহার তুলনা খুব কমই মেলে। এই দুই বারেই বীরেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া ত্রাণকার্যে নামিয়াছিলেন। উপকরণ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন প্রয়োজনের তুলনায় সে হয়তো সামান্যই। কিন্তু ডিঙি নৌকায় কিংবা জলকাদার মধ্য দিয়া হাঁটিয়া বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীরা যে প্লাবিত এলাকায় ব্যাপকভাবে ঘুরিয়া যেখানে যতটুকু সম্ভব ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন বন্যাপীড়িত দুর্গতদের কাছে, ইহাই ছিল কল্পনার অতীত। সরকারী সাহায্য সে আমলে যেটুকু মিলিত সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাহাও আবার দয়ার দান। এ অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথের মতো লোককে দুর্গতদের মধ্যে ঘুরিয়া সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া সাধারণ লোকে যে অভিভূত হইয়া পড়িবে ইহাই স্বাভাবিক। বীরেন্দ্রনাথের এই নিরলস ত্রাণপ্রচেষ্টাই পূর্ব মেদিনীপুরের জনচিত্তে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল।

চ. পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন ও কংগ্রেস সংগঠনের সূত্রপাত

১৯২১ সালের গোড়ায় বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইতেই পূর্ব মেদিনীপুরের শিক্ষিত মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। গান্ধীর আহ্বানে আদালতের ব্যবহারজীব, স্কুলের শিক্ষক, অনেকেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ছাত্ররাও অনেকেই স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। আন্দোলনের প্রারম্ভে বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতাতেই কাজ শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মনে হইল কলিকাতায় বিশেষ সুবিধা হইবে না। ফলে বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়া পূর্ব মেদিনীপুরের অসহযোগীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ভিত্তি গড়িয়া তোলাই মনে হয় বীরেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের উদ্দেশ্য।

পূর্ব মেদিনীপুরে ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এখন বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের কাজ সংগঠিত ও বিস্তারিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহযোগীরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ইংরাজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ ও গান্ধীর গ্রাম পুনর্গঠনের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রচার চলিতে লাগিল বিভিন্নভাবে। কংগ্রেস কর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়া বলিতে লাগিলেন ইংরাজ কিভাবে দেশের শিল্প ধ্বংস করিয়া অর্থনীতি পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে, আর তাহার পর বিলাত হইতে আমদানি-করা পণ্যসম্ভার কিনিতে বাধ্য করিয়া ভারতবাসীকে কিভাবে পরনির্ভর ও ভারতবর্ষকে কিভাবে শোষণের ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে যেমন এসব কথা বলা হইতেছিল, অন্যদিকে বলা হইতেছিল কিভাবে এই শোষণের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া গ্রামসমাজ স্বনির্ভর হইয়া উঠিতে পারে : তুলা চাষ, চরকায় সুতা কাটা, গ্রামে কাপড় বোনা, সালিসের মাধ্যমে বিবাদ-বিসংবাদের সমাধান করা, বৃত্তিমূলক জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য খানিকটা সাধিত হইবেই।

সাধারণ কৃষকের আর্থিক অবস্থা দিনে দিনে তো খারাপই হইয়া আসিতেছিল। স্ব-নির্ভরতার এই কর্মসূচী তাই লোকের মন সহজেই আকৃষ্ট করিল। অন্যদিকে সূতীবস্ত্র, রেশম, লবণ শিল্প ধ্বংসের স্মৃতি তখনও লোকের মনে জাগরূক। তাই কংগ্রেসের বাণী ও কর্মসূচী পূর্ব মেদিনীপুরে প্রচার লাভ করিতে লাগিল দ্রুত। ইহার সহায়ক হইল বীরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও সহজ বক্তৃতা ও সাধারণ মানুষের সংগে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। অন্যান্য কংগ্রেসকর্মী ও নেতৃবৃন্দও গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও ক্ষীরোদচন্দ্র মণ্ডলের মতো প্রখ্যাত আইনজীবী গ্রামে গ্রামে সালিসী বিচারে বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।[৪]

এইভাবে যখন সাধারণ মানুষ ক্রমশ কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় পূর্ব মেদিনীপুরে কংগ্রেস ও জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। সংঘর্ষ বাধিল মেদিনীপুর জেলায় বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯ অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন উপলক্ষে।

ছ. ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন

বংগীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯

বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯ অনুসারে পুরাতন চৌকীদারি ইউনিয়নগুলির প্রশাসন, উন্নয়ন ও বিচারব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়। স্থির হয় বোর্ডে সদস্য থাকিবেন নয় জন। ইহার মধ্যে ছয় জন সদস্য হইবেন নির্বাচনের মাধ্যমে, আর বাকী তিনজন হইবেন সরকার-কর্তৃক মনোনীত। বোর্ডের প্রধান কাজ গ্রামের দফাদার ও চৌকীদাররা যাহাতে ঠিকমত কাজ করেন তাহার ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা, যেমন জঞ্জাল অপসারণ করা, পথঘাট পরিষ্কার রাখা, প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করাও ইউনিয়ন বোর্ডের অবশ্যকরণীয়। ইহার উপরে ইচ্ছা করিলে ইউনিয়ন বোর্ড আরও অনেক কাজ করিতে পারিত। এইসব কাজের মধ্যে আছে : (১) কুটিরশিল্প উন্নয়ন, (২) জল সরবরাহ, (৩) জনসাধারণের সুখসুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কাজ। গ্রামের রাস্তা, জলপথ, সেতু প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তব্য। অতিরিক্ত কর্তব্য হিসাবে গণ্য ছোটখাট সেচব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনা। গ্রামের ছোটখাট মামলা নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল ইউনিয়ন কোর্ট ও ইউনিয়ন বেঞ্চ।

ব্যয় নির্বাহের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে কর বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মচারী, দফাদার ও চৌকীদারদের বেতন ও সরঞ্জামী খরচার জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন সেই পরিমাণ কর ইউনিয়ন বোর্ড প্রথমেই বসাইতে পারিত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও কর বসাইয়া তুলিয়া নিবার অধিকার বোর্ডের ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের কর আইন অনুসারে বাড়িয়া মাথাপিছু বাৎসরিক চুরাশি টাকা পর্যন্ত হইতে পারিত।

স্বায়ত্তশাসনের নীতি অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ডের কাজকর্ম তদারকের ভার জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের উপর দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশনাল কমিশনারের হাতে। নির্বাচনী বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের। তাহার পর কমিশনারের কাছে আপীল করা চলিত। কিন্তু কমিশনারের রায়ই চূড়ান্ত। চৌকীদার-দফাদারকে কাজ করাইবে ইউনিয়ন বোর্ড, কিন্তু তাহাদের নিয়োগের ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের। আবার চৌকিদার-দফাদারগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহাদের থানার সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিয়া চলিতে হইবে। সন্দেহজনক কোন লোক ইউনিয়নে আসিয়া উপস্থিত হইলে বা কোন বদ লোকের দেখা পাইলে চৌকিদার-দফাদারের কর্তব্য সরাসরি থানায় খবর দেওয়া।

ইউনিয়ন বোর্ডের নিজস্ব কার্যকলাপ পুরাপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। কমিশনার যদি মনে করেন যে বোর্ড নিয়মমাফিক কাজ করিতেছে না তবে বোর্ডের কার্যবিবরণী তিনি বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন। কোন ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ ভাল না লাগিলে বোর্ড ভাঙিয়া দিতে নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা অথবা বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও কমিশনারের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। আবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইউনিয়ন বোর্ডের ধার্যকরা কর বাতিল করিয়া নূতন করিয়া কর ধার্য করিবার আদেশ দিতে পারিতেন।[৫] অর্থাৎ বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ডের হাত, পা, মুখ, চোখ দেখিতেছি সরকারী নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ বাঁধা। তবুও বিচিত্র ব্যাপার, এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল স্বায়ত্তশাসন প্রসার করা। অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা আবার এ কথা বিশ্বাসও করিতেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়-ব্যয়

মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছিল তৎকালীন চৌকীদারি ট্যাক্স পঞ্চাশ ভাগ বাড়াইয়া দিয়া। তথাচ দেখা গেল, বোর্ডের কর্মচারী ও চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন ও সরঞ্জামী খরচার পর ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে যে যৎসামান্য টাকা থাকিবার কথা তাহাতে জনহিতকর কোন কাজই তাহার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাঁথি ১নং ইউনিয়নের জনৈক অধিবাসী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন পঞ্চাশভাগ চৌকিদাবী ট্যাক্স বাড়াইবার পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাৎসরিক আয় হইতে পারে ১,২৭৬ টাকা। অন্যদিকে বোর্ডের বেতন প্রভৃতি বাবদ বাৎসরিক খরচ ১০০১ টাকা ৮ আনা। অর্থাৎ জনহিতকর কাজ ও উন্নয়ন বাবদ বোর্ডের হাতে থাকে বৎসরে মাত্র ২৭৫ টাকার মতো। ইউনিয়নে যতগুলি গ্রাম আছে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিলে গ্রামপিছু বছরে মাত্র ১০ টাকা ৮ আনা ধার্য করা সম্ভব।[৬] বীরেন্দ্রনাথ শাসমল হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে কর সর্বাধিক করিয়া তুলিলেও বোর্ডের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়। কর বাড়াইয়া বৎসরে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত করা চলে। ইহার মধ্যে বেতন ও সরঞ্জামী বাবদ ১০০০ টাকা বাদ দিলে ৬০০০ টাকা থাকে জনহিত ও উন্নয়ন বাবদ। গড়ে একটি ইউনিয়ন চব্বিশটি গ্রাম নিয়া গঠিত। ৬০০০ টাকা চব্বিশ গ্রামের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে গ্রামপিছু বছরে পড়ে ২৪০ টাকা। এই টাকায় জনহিত ও উন্নয়নের কাজ কতটুকুই বা হওয়া সম্ভব।[৭]

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯ অনুসারে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয় ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে। জলাভাব দূর হইবে, মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ইউনিয়নের মধ্যেই হইবে, এইসব ভাবিয়া না কি সাধারণ লোকে প্রথমে ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে উৎসাহিত বোধ করিয়াছিলেন, করবৃদ্ধির কোন ধারণা তখন তাঁহাদের ছিল না। ইউনিয়ন বোর্ড বসিবার সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদারি ট্যাক্স পঞ্চাশ ভাগ বাড়িয়া যাইবে—এই কথা শোনার পর হইতে ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব হইয়া উঠিল বিপরীত। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী মূল্যবৃদ্ধির জের তখনও চলিয়াছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দামই ঊর্ধ্বমুখী। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সহ্য করাই কঠিন। দেনা মিটাইতে জমি চলিয়া যাইতেছিল। ট্যাক্স দিবার জন্য বিক্রি করিতে হইতেছিল ঘটি বাটি। এই অবস্থায় বর্ধিত হারে ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের ছিল না।

ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুরে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। তমলুকের অনেক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বোর্ড তুলিয়া নিবার জন্য আবেদন জানান। জনবিক্ষোভের ফলে কাজ চালানো তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁথি মহকুমার রামনগর থানায় উত্তেজনা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে গ্রামবাসীরা দুইজন ইউনিয়ন বোর্ড সদস্যের বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলেন।[৮]

গ্রামাঞ্চলে জাতীয়তাবাদী সংগঠকগণও ইউনিয়ন বোর্ডকে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের সন্দেহ ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে ইউনিয়ন বোর্ড আসলে হইয়া উঠিবে গ্রামাঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের ক্ষমতা প্রসারের কেন্দ্রস্থল। ইংরাজ সরকারের অনুগত লোকেরা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জোরে প্রতিষ্ঠিত নেতাদের সরাইয়া ক্রমশ গ্রামের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিবে। তাহার পর ইহাদের সহায়তায় ও থানার নিয়ন্ত্রণাধীন চৌকিদার-দফাদারদের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল গড়িয়া উঠিবে সরকারী গুপ্তচর ব্যবস্থা। কোন গ্রামে কোথায় কী হইতেছে সেসব সংবাদ সরাসরি থানার মাধ্যমে সরকারী অফিসারদের কানে গিয়া উঠিবে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জাতীয়তাবাদী সংগঠন গড়িয়া তোলা হইয়া উঠিবে দুষ্কর।[৯]

ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রসার সাধারণ গ্রামবাসীর কাছেও অবাঞ্ছিত। ইহার উপর নূতন করের বোঝা তো ছিলই। তাই ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কে সাধারণ গ্রামবাসীর মনে বিক্ষোভ সর্বত্রই ছিল। এই কারণে গণ-আন্দোলন প্রসারে গ্রামীণ কংগ্রেসকর্মীরা ইউনিয়ন বোর্ডকে সরকারী নিপীড়নের প্রতীক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় প্রথম পূর্ব মেদিনীপুরে। তারপর যেখানেই কংগ্রেসকর্মীরা গণভিত্তি গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন সেখানেই দেখিতেছি ইউনিয়ন বোর্ড-ই গণপ্রতিরোধের প্রথম উপলক্ষ। বাঁকুড়ায়, আরামবাগে, নদীয়ায়, মহিষবাথানে (চব্বিশ পরগনা) বন্দবিলা (যশোহর জেলা, বাংলাদেশ) সর্বত্রই গণআন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধের মধ্য দিয়া।

পূর্ব মেদিনীপুরে স্থানীয় কংগ্রেসের ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ কংগ্রেসকর্মীদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করিল। বীরেন্দ্রনাথ তো এই বিক্ষোভকে আন্দোলন রূপে দিবার কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তবে একেবারে স্থানীয় ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করা সম্পর্কে তাঁহার মনে বোধ হয় কিছুটা সংশয় ছিল। বরিশালে অনুষ্ঠিত ১৯২১ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে অসহযোগ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মসমিতি এই বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে যে ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে অসহযোগ না করিলেই ভাল হয়।[১০] এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীর কাছে আন্দোলন আরম্ভ করিবার অনুমতি চাহিলেন। উত্তরে গান্ধী জানাইলেন সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করিবার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, তাই অসহযোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি নিজের হাতেই রাখিতে চান, তবে বীরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে নিজের দায়িত্বে আন্দোলন আরম্ভ করিতে পারেন।[১১] এদিকে পূর্ব মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এমনই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল যে রাজনীতি ও শোষণমুক্তির কথা বলিয়া কংগ্রেসের পক্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে কিছু না করাও আর সম্ভব ছিল না। আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরাও একমত। সরকারীভাবে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মতি বা গান্ধীর নিকট হইতে সাংগঠনিক পর্যায়ে অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের উপর নির্ভর করিয়া বীরেন্দ্রনাথ ইউনিয়ন বোর্ড প্রতি-

রোধের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রচার

ইউনিয়ন বোর্ড যে বিভিন্ন দিক দিয়া কত ক্ষতিকর, বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীরা সেই কথাটাই জনসমক্ষে বার বার বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। ট্যাক্স বাড়ার ব্যাপার নিয়া লোকের মনে আশঙ্কা তো ছিলই। তাহর উপর বীরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনা করিবেন ধনীরাই। সাধারণ দরিদ্র লোকের উপর ট্যাক্স বসাইয়া সেই টাকা দিয়া তাঁহাদেরই শাসন করিবার অধিকার পাইতেছেন ধনীরা। ট্যাক্স বাড়িলে ধনীদের কোন ক্ষতি নাই। তাঁহারা তো নিজের পয়সায় ট্যাক্স কখনই দেন না। ইউনিয়ন বোর্ড যদি ধনীদের উপর কর বসায় তবে তাঁহারা সে কর হয় অধমর্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবেন অথবা মজুরি কমাইয়া তুলিয়া নিবেন। এমনি করিয়াই তো তাঁহারা আয়করের টাকা তুলিয়া নেন। ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণকে যেমন নিজেদের ট্যাক্স দিতে হইবে তেমনি যোগাইতে হইবে ধনী মহাজনের ট্যাক্সের টাকা। নূতন করের বোঝাটা পুরোটা পড়িবে দরিদ্রের ঘাড়ে।[১২]

বীরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, যে জন্য এই টাকা দরিদ্র জনসাধারণকে যোগাইতে হইবে তাঁহাদের পক্ষে সে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয়। জনস্বাস্থ্য সাধারণ লোকের সমস্যা নয়। তাঁহাদের সমস্যা অন্নবস্ত্রের। আমাদের দেশের উচ্চ মৃত্যুহার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য নয়, অনাহারের জন্য। প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় না বলিয়াই লোকে রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১৩] তাহা ছাড়া জনস্বাস্থ্যের জন্য বাড়তি কর দিবার সঙ্গতিই বা কাহার আছে? "লোকে কি ঘটি বাটি বেচিয়া পায়খানা করিবে না কি?" সরকার যদি মনে করেন যে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন করা দরকার তবে নূতন ট্যাক্স না বসাইয়াই তাহা করা উচিত।[১৪]

সাধারণ লোকে টাকা যোগাইয়া যে ইউনিয়ন বোর্ড পোষণ করিবে তাহার নিয়ন্ত্রণ সবটাই থাকিবে সরকারের হাতে। ইউনিয়ন বোর্ডকে চিরকালই সরকারের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হইবে, সাবালক হইবার সম্ভাবনা তাহার নাই। এমন কি অধীন কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতাও তাহার নাই, সেও সরকারী অফিসারের হাতে। এইভাবে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করিয়া সরকার জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ করিয়াছেন।[১৫]

বস্তুতঃ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে স্বায়ত্তশাসনের নামে ইউনিয়ন বোর্ড সেটুকুও ধ্বংস করিয়া দিবে। মোড়ল, মুখ্যা গ্রামের লোকেরাই ঠিক করেন, এখন ভোটের কথা বলিয়া সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট লোকেরাই ইউনিয়ন দখল করিবেন এবং সরকারের নির্দেশমত গ্রামের শাসন পরিচালিত করিবেন। তাহার উপর চৌকিদার গ্রামের ভিতরকার সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিয়া থানায় জানাইয়া আসিবে। গ্রামের আভ্যন্তরিক ব্যাপার বলিয়া কিছুই আর গোপন রাখা চলিবে না। এমনকি লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারও থানায় জানাজানি হইয়া যাইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে এইসব কথা বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রচার চলিতে লাগিল সভা, বৈঠক, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। প্রচারের ফলে লোকের মনে ক্রমশই এ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল যে ইউনিয়ন বোর্ড থাকিলে যে শুধু নিরর্থক করের বোঝা বহিয়া মরিতে হইবে তাহাই নয়, গ্রামসমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের সব স্বাধীনতাও বিনষ্ট হইবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা যে কতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বোঝা যাইবে। প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করিবার দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ডকে দেওয়া হইয়াছিল। গ্রামাঞ্চলে পায়খানা বা প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা

কোন কালেই ছিল না, লেকে প্রয়োজনমত মাঠেঘাটেই যাইতেন। ইউনিয়ন বোর্ডকে এইসব বন্ধ করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মাঠেঘাঠে মলমূত্র পরিত্যাগ করিলে গ্রেপ্তার বা শাস্তি দিবার ক্ষমতা বোর্ডের ছিল না। যে আইন অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল অর্থাৎ বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন ১৯১৯ সালের পাঁচ নম্বর আইন, অর্থাৎ ওই বৎসরের পাঁচ আইন। ১৮৬১ সালের পুলিশ অ্যাক্টও ওই বৎসরের পাঁচ নম্বর আইন। বস্তুগুণে আইনটির খ্যাতি হইয়াছিল স্বাভাবিকভাবেই। সর্বসাধারণ এই আইনটির উল্লেখ করেন পাঁচ আইন বলিয়া। পুলিশ সংক্রান্ত এই বিখ্যাত পাঁচ আইন অনুসারে প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা দন্ডনীয় অপরাধ। ঘাটালে লোকের ধারণা জন্মিয়া গেল ১৯১৯ সালের পাঁচ আইন অর্থাৎ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনে বিখ্যাত পাঁচ আইনের মতো ব্যবস্থা থাকা অবশ্যম্ভাবী; ইউনিয়ন বোর্ড এখন পথঘাট পরিষ্কার রাখার উপলক্ষে স্ত্রীলোকের লজ্জাসম্ভ্রম পর্যন্ত নষ্ট করিবে। ঘাটালের মহকুমা শাসক উভয় আইনের পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলে কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না; গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের বাংলা অনুবাদের উপর পরিষ্কার হরফে পাঁচ আইন এই কথা লেখা আছে, তাহার পরে আর কথা কি?[১৬]

আন্দোলন সংগঠনে বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীদের ব্যক্তিগত প্রভাব

যে প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র লোককে করভারেই নিপীড়িত করিবে না, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এমনকি স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম পর্যন্ত হরণ করিয়া নিতে পারে, সে প্রতিষ্ঠানকে প্রতিরোধ করা যে অত্যাবশ্যক এ বিষয়ে লোকের মনে আর সংশয়মাত্র ছিল না। কংগ্রেস কর্মীরা সাধারণ লোককে আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তবুও কিন্তু সাধারণ লোককে নিঃসংশয়ে আন্দোলনমুখী করিয়া তুলিবার ব্যাপারে বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীদের ব্যক্তিগত প্রভাবের ভূমিকাও কম নয়। বিখ্যাত ভূম্যধিকারী পরিবারের সন্তান ও পূর্ব মেদিনীপুরের মাহিষ্যদের মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার হিসাবে বীরেন্দ্রনাথের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাহার উপর বন্যার সময় ত্রাণকার্যের মাধ্যমে বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব মেদিনীপুরের জনচিত্ত জয় করিয়া নিয়াছিলেন। এমন একজন লোক যখন কলিকাতায় আইন ব্যবসায়ের পশার ছাড়িয়া দিয়া গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া কংগ্রেসের কাজ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন লোকে অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। তাঁহার সহকর্মীরাও যে স্বার্থত্যাগ করিয়া, চাকরি বা আইন ব্যবসা ছাড়িয়া অথবা স্কুল-কলেজের লেখাপড়া ছাড়িয়া দেশের কাজে নামিয়াছেন, এ কথাও সকলেই জানিতেন। উপরন্তু বীরেন্দ্রনাথের বুদ্ধি-বিবেচনা ও সততা সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস ছিল অখন্ড। মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এস. এন. রায়কে কাঁথিতে পাঠানো হইয়াছিল ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষে লোককে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া যাহাতে ফিরাইয়া আনা যায় সেই উদ্দেশ্যে। সদরে ফিরিয়া রায় ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী প্রচার সম্বন্ধে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, "The subtlety of the whole campaign lay in the fact that Sasmal as a lawyer was interpreting the sections of the Act..(and the people were) convinced that Sasmal was right."[১৭] সোরমণী গ্রামের প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী শ্রীক্ষেত্রমোহন সামন্ত ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করিয়া বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, বীরেন্দ্রনাথকে লোকে বিশ্বাস করিত কারণ 'তাঁর বুঝবার শক্তি ছিল খুব...(আর) তিনি কাউকে ঠকাইতে চান নাই।'[১৮] এই কথার প্রতিধ্বনি পূর্ব মেদিনীপুরের প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখে সর্বত্র শোনা যায়।

ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কে সম্পন্ন সম্প্রদায়ের আগ্রহ

ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বিরোধিতা ছিল, কিন্তু গ্রামের সম্পন্ন লোকেরা জমিদার, জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, ইউনিয়ন বোর্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন সাগ্রহে। গ্রামাঞ্চলে ইঁহারাই নেতৃস্থানীয়। একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ইঁহাদের নিয়ন্ত্রণ যেমন দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে মাহিষ্যদের সামাজিক আন্দোলন প্রসারে ইঁহারাই ছিলেন অগ্রণী। বাকী ছিল শুধু শাসক ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। এসব ব্যাপারে যে পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামীণ নেতারা বাধার সম্মুখীন হইতেছিলেন সে কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রাম-পর্যায়ে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ এবং সরকারী অনুগ্রহ লাভ ও কিছুটা অনুগ্রহ বিতরণ করিবার সুযোগ ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রাম-পর্যায়ে তো বহিরাগতদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ছিল না, তাঁহাদের কার্যকলাপ সবই শহরে সীমাবদ্ধ। ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের স্থানীয় নেতারাই সরকার-পরিপোষিত রাজনৈতিক শক্তি হইয়া উঠিতে পারিতেন। শুধুমাত্র পূর্ব মেদিনীপুরেই নয়, গ্রামীণ বাংলার সর্বত্রই জমিদার-পত্তনীদারদের ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে জোতদার, মহাজন ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে যে নূতন নেতাদের উদ্ভব হইতেছিল তাঁহারা সকলেই ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সরকারী আনুকুল্য ও অনুগ্রহে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ে আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বস্তুত গ্রামাঞ্চলের নূতন নেতৃত্বের পোষকতা করিয়া, তাহার ক্ষমতা বিস্তারের সহায়তা করিয়া তাহার পর তাহারই মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই যে সরকার ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এমনটা হওয়া অসম্ভব নয়।

এসব ছাড়া মাহিষ্য জাতের সামাজিক আন্দোলনের ভাবধারাও পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামীণ নেতাদের ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে আগ্রহী করিয়া তুলিয়াছিল মনে হয়। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি ও মাহিষ্য সামাজিক আন্দোলনের মুখপত্র "মাহিষ্য সমাজ" উভয়ের পক্ষ হইতেই সরকারী আনুকূল্য অর্জনই যে জাতের উন্নতি বিধানের অন্যতম প্রধান উপায়, এ কথাটা জোর দিয়া বলা যাইত। আনুকূল্য পাইতে হইলে আনুগত্য অপরিহার্য। এইজন্যই বোধ করি "মাহিষ্য সমাজে"র প্রথম সংখ্যায় লেখা হইয়াছিল "ভগবান শুভক্ষণে এই অধঃপতিত দেশের ভাগ্যবিধাতা করিয়া ইংরাজগণকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। এই শুভ সুযোগে প্রজাবর্গের জ্ঞানধর্মোন্নতি লাভ করা কর্তব্য।"[১১] ইহারই রেশ ধরিয়া পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় বাহির হইল, "পৃথিবী আর কখনও এমন বিপুল সাম্রাজ্য দেখিয়াছে কি? পৃথিবীর প্রথম সম্রাট কখনও এমন সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কি?...সম্রাটের সমবেদনায় ও করুণায় বিক্ষুব্ধ ভারত স্নিগ্ধ হউক।"[২০]

উপরে যে উদ্ধৃতিটি দিলাম তাহার শেষ বাক্যটি পড়িলেই বুঝা যাইবে যে আনুগত্যের বিনিময়ে মাহিষ্য নেতারা চাহিতেছিলেন সরকারী অনুগ্রহ। প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে সরকারী চাকুরিতে আরও বেশী মাহিষ্য নিয়োগ এবং মাহিষ্য-অধ্যুষিত এলাকায় সরকারী উদ্যোগে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন—এই দুইটিই প্রধান।[২১] প্রতিষ্ঠিত উঁচু জাতের লোকেরা ইংরাজী শিক্ষা ও সরকারী চাকুরি পান বলিয়াই অন্য জাতের লোকেদের তুলনায় তাঁহারা প্রাগ্রসর। শিক্ষাক্ষেত্রে, আদালতে, অফিসে, স্বাধীন বৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ইংরাজী শিক্ষার ফলেই। উঁচু জাতের ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্রলোকদের হাত এড়াইয়া অফিস-আদালত বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাহারও পক্ষেই কিছু করা সম্ভব নয়। সরকারের দৃষ্টিতে যে শিক্ষিত ভদ্রলোক জনসাধারণের মুখপত্র সেও তাঁহাদের ইংরাজী শিক্ষার কারণেই। ফলে সরকার যেখানে যেটুকু অনুগ্রহ বিতরণ করেন সে ইংরাজী-

শিক্ষিত লোকেদের বাহিরে পৌঁছায় না। তাই যেটুকু ক্ষমতা সরকার দেশের লোকের হাতে ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহার ভাগ ইংরাজী শিক্ষা ছাড়া ঠিকমত পাওয়া যাইবে না। ইংরাজদের অধীনে শিক্ষিত ভদ্রলোকের হাতে যে প্রকৃত ক্ষমতা কিছু ছিল তাহা নয়। অথবা স্বায়ত্তশাসনের নামে ইংরাজ যে প্রকৃত শাসনক্ষমতা কিছু ছাড়িয়া দিতেছিলেন, এমনও নয়। কিন্তু দেশের লোকের উপর সে ক্ষমতা যে খানিকটা জাহির করা যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ক্ষমতা যত সামান্যই হোক না কেন, তাহার জন্য নিম্নতর পর্যায়ের বিভিন্ন জাত যে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিবেন সে আর বিচিত্র কি। ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহও এই ক্ষমতার ভাগ পাইবার জন্যই। বস্তুত ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই-তিন দশক ও বিংশ শতকের প্রথম তিন-চার দশকে বাংলার সর্বত্র নিম্নতর জাতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য যেসব জাত বা ধর্মভিত্তিক সামাজিক অথবা মিশ্র সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটিই দেখিতেছি শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারী আনুকূল্যের দাবিতে মুখর। এদিকে আবার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে চাষবাস দেখাশোনা করা, কি কারিকরের কাজ করা, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যও আর তখন শোভা পায় না। ওকালতির মতো স্বাধীন বৃত্তির ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত। তাই চাকুরিই তখন পরমার্থ; ইহার জন্য সকলেই আকুল। কিন্তু এ পরমার্থ তো সরকারী অনুগ্রহ ভিন্ন লাভ করা যাইবে না। তাই সরকারের প্রতি নিষ্কলুষ আনুগত্য না রাখিলেই নয়। এমনি করিয়াই তো উঁচু জাতের ভদ্রলোকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তটা এতই স্পষ্ট যে অনুকরণ না করিলেই চলে না।

ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কে সম্পন্ন সম্প্রদায়ের মনোভাবে পরিবর্তন

মাহিষ্য জাতের আন্দোলন সরকারী অনুগ্রহ প্রার্থনার বাঁধা পথ ধরিয়াছিল ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য অনেক জাতের আন্দোলনের মত শুধুমাত্র ইহার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নে নিজেদের জাতের মধ্যে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের প্রচেষ্টাও দেখিতেছি মাহিষ্য আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কৃষি ও বাণিজ্যে মাহিষ্যগণের আত্মনির্ভরতা ও উন্নতিতে সহায়তা করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল এগ্রিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ও ম্যাহিষ্য ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি। মাহিষ্যদের কৃষি, ব্যবসা ও শিল্পে ঋণের ও ঋণগ্রস্ত মাহিষ্যদের ঋণমুক্তির ব্যবস্থা এই সংস্থা দুইটি করিত। শিল্পবিস্তারের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল মাহিষ্য শিক্ষা বিস্তার ভাণ্ডার ও মাহিষ্য অনাথ ভাণ্ডার।[২২] সংস্থাগুলি চলিত বিত্তবান মাহিষ্যদের অর্থসাহায্যে। শুধুমাত্র চাকুরিজীবী না হইয়া কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিবার জন্য বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি ও "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকা শিক্ষিত মাহিষ্যদের উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। "শাক কড়াই বেগুন ক্ষেতের কথা, ধান্যে জলসেচনের কথা, মাটি পাইটের কথা ভুলিবেন না; উকীল মোক্তার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছেন বলিয়া আপনাদের সরিষা, তিসি, ছোলার খেতের লাঙল চালনের কথা বিস্মৃত হইবেন না।"[২৩] এই ধরনের কথা "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় বার বার বলা হইয়াছে। উন্নততর কৃষি ও গোপালন সম্বন্ধে "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধও প্রকাশ করা হইত।

মাহিষ্য আন্দোলনের এই স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রভাব পূর্ব মেদিনীপুরের সম্পন্ন মাহিষ্যদের একটা অংশকে ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী প্রচারের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল মনে হয়। ইউনিয়ন বোর্ড চিরদিনই সরকারী অফিসারদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে, সার্কেল অফিসারগণ বোর্ড পরিদর্শন উপলক্ষে গ্রামে আসিয়া বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বাধাইয়া দিয়া অবশেষে গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্ব করায়ত্ত করিয়া ফেলিবেন, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের বিভিন্ন

সরকারী অফিসের ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে—ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে এইসব যুক্তি সম্পন্ন লোকেদের কাহারও কাহারও মনে ধরিয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে তাঁহাদের প্রকৃত ক্ষমতা বাড়িবার পরিবর্তে খর্ব হইবার সম্ভাবনাই বেশী এমন একটা আশঙ্কা অনেকের মনেই উদয় হইয়াছিল; অফিসারদের ইচ্ছানুসারে ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালিত করিতে গিয়া তাঁহারাই সরকারী অফিসারদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া যাইবেন। গ্রামীণ সমাজে তাঁহাদের যে আধিপত্য আছে সরকারী অফিসারদের সঙ্গে বাধ্যতামূলক সহায়তার ভিত্তিতে ইউনিয়ন বোর্ড চালাইতে গেলে তাহা ক্রমশ হ্রাস পাইতে পারে। এই চিন্তা হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও প্রেসিডেন্টদের একটা অংশ পদত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়ান। পদত্যাগীদের মধ্যে কেহ কেহ আবার সরাসরি ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করিলেন।[২৩]

যাঁহারা রহিয়া গেলেন তাঁহাদের নতিস্বীকার করিতে হইল গণ-বিক্ষোভ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের চাপে। তমলুকে এই কাণ্ড তো আন্দোলন আরম্ভ হইবার আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। ঘাটালের মহকুমা শাসক দাসপুর থানায় কিছু লোককে ইউনিয়ন বোর্ড চালাইতে রাজী করাইয়াছিলেন, কিন্তু বয়কট ও ভীতিপ্রদর্শনের ফলে তাঁহাদের পক্ষে মহকুমা শাসকের কথা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।[২৪] সামাজিক বয়কট ও ভীতি-প্রদর্শনের মুখে তাঁহাদের মনোবল ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সদর মহকুমার পূর্ব দিকেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল।[২৫] এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডিভিশনাল কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন, অনুগত লোকদের সাহায্য করিবার কোন উপায়ই আমাদের হাতে নাই।[২৭] ইউনিয়ন বোর্ড হইতে পদত্যাগ করিবার জন্য চাপ কাঁথিতেও কম ছিল না। দারুয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও চারজন সদস্য পদত্যাগের পর বিবৃতি দিয়া বলিলেন, ইউনিয়ন বোর্ড জনসাধারণের অনভিপ্রেত, জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা তাঁহাদের ইচ্ছা নয় বলিয়াই পদত্যাগ করিতেছেন।[২৮]

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্র সমাবেশ

অক্টোবর মাসের মধ্যে অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ড সদস্য ও প্রেসিডেন্ট স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিলেন।[২৯] অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে ইউনিয়ন বোর্ড চালাইবার জন্য স্থানীয় সহযোগী পাওয়াই দুষ্কর। তাহার উপর সম্পন্ন সম্প্রদায়ের লোকে ক্রমশ আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইউনিয়ন বোর্ড তাঁহারা চাহিয়াছিলেন ক্ষমতার ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রবল গণবিক্ষোভের ফলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা আর ছিল না। অপর পক্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণসমাবেশ গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অন্যভাবে অর্থাৎ সরকার-বিরোধিতার পথে হইলেও, অর্জন করার সম্ভাবনা স্পষ্ট। আন্দোলনে যোগ দিলে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন ও তাহার নেতৃত্ব যে তাঁহাদেরই হাতে পড়িবে, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ ছিল না। এমন অবস্থায় আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্পন্ন সম্প্রদায়ের অনেকের কাছেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইঁহারা যোগ দেওয়াতে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী গণসমাবেশ হইয়া উঠিল গ্রামীণ সমাজের সম্পন্ন হইতে দরিদ্র সমস্ত সম্প্রদায়ের একত্রিত সমাবেশ। গণ-আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এমন ধরনের সমন্বয় হয়তো প্রয়োজনও ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ প্রবল ছিল সত্য, কংগ্রেসের সংগঠন ও নেতৃত্বের বিক্ষোভ প্রবলতর ও সংগঠিতও হইতেছিল, কিন্তু গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক নেতৃত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের সক্রিয় বিরোধিতার মুখে বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত অটুট ও অপ্রতিহত রাখা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

অপরপক্ষে সম্পন্ন সম্প্রদায় যোগদান করাতে তাঁহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির জোরে আন্দোলন হইয়া উঠিল দৃঢ়ভিত্তিক : গ্রামীণ সমাজের মধ্যে যত প্রকার শক্তি ছিল তাহার সবই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িল। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব যাঁহাদের হাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের ফলে তাঁহারাই ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী গণসমাবেশে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতারূপে আবির্ভূত হইলেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ

অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনুষ্ঠিত হইলেও ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ প্রকৃতপক্ষে আইন অমান্য আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। ১৯২১ সালে গণভিত্তিক আইন অমান্যের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এদেশে সুপরিজ্ঞাত ছিল না। ঊর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগাযোগ বিশেষ ছিল না বলিয়া স্থানীয় নেতারা সে সূত্র হইতেও সাহায্য পান নাই। ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি তাঁহাদেরই ঠিক করিয়া নিতে হইয়াছিল। আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অনুসারে আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে তাহা বীরেন্দ্রনাথ সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া স্থির করিতে লাগিলেন।[৩০]

বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন আরম্ভ হইল কাঁথি মহকুমার যে দুইটি থানায় ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হইয়াছিল অর্থাৎ কাঁথি সদর ও রামনগর থানায়। বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহ-কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার করিতেছিলেন। পাশাপাশি চলিতেছিল সংগঠনের কাজ। স্থানীয় নেতারা গ্রামে গ্রামে সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়া পল্লী সমিতি, পাঁচ বা সাতটি পল্লী সমিতি নিয়া পল্লীসংঘ গঠন করিতে লাগিলেন। কতগুলি পল্লীসংঘ একত্রিত করিয়া গঠিত হইল শাখা কংগ্রেস।[৩১] গ্রাম-পর্যায়ে প্রসারিত এই বিস্তৃত সংগঠনই হইয়া উঠিল আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যম।

কাঁথিতে নূতন ইউনিয়ন ট্যাক্স দেওয়া মে মাস হইতে বন্ধ হইয়া গেল। শুধু ইউনিয়ন ট্যাক্স নয়, ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষ হইতে রসিদ দিলে পুরাতন চৌকিদারী ট্যাক্সও আর জনসাধারণ দিতে চাহিলেন না। আবার ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়াই যে লোকে সর্বত্র নিশ্চেষ্ট ছিলেন তাহাও নয়। আদায়কারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। একবার রামনগর থানার ফতেপুর গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ট্যাক্স আদায় করিতে স্বয়ং উপস্থিত হইলে মেয়েরা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "শাসমল ট্যাক্স দিতে না বলিয়াছেন, কংগ্রেস কর্মীরা না বলিয়াছে। আমরা ট্যাক্স দিব না...জুলুম করিলে (তাহারা) প্রেসিডেন্টকে ঝাঁটা প্রদর্শন করে বলিয়া প্রকাশ।"[৩২] মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রায় তাঁহার প্রতিবেদনে বলিয়াছিলেন ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা করিলে ফল ভাল হইবে না এইভাবে ইউনিয়ন বোর্ড সদস্যদের ভয় দেখাইয়া কাঁথিতে পোস্টার দেওয়া হইয়াছিল।[৩৩] তবে সরকারী সূত্রে ভয় দেখানোর যেসব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার সবটা আবার সত্য না-ও হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। কাঁথি সদর থানায় ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও তহশীলদারদের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় করিতে না পারিয়া কাঁথির ইউরেশিয়ান সার্কেল অফিসার নিজেই ঘোড়ায় চড়িয়া ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামে ঢুকিবার মুখেই বিরাট গোলমালের শব্দ শুনিয়া পথের ধারে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকে এত তর্জন গর্জন করিতেছে কি জন্য?" উদ্দিষ্ট ভদ্রলোক আশ্বাস দিয়া বলিলেন—না সাহেব, ও তর্জন গর্জন কিছু নয়, গ্রামের লোক হরিসংকীর্তন করিতেছে। সাহেবের কিন্তু বিশ্বাস হইল না, তিনি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া কাঁথির দিকে রওনা দিলেন।[৩৪] হরিসংকীর্তনের কথাটা কিন্তু সত্য। শুধু এই গ্রামেই নয়, সব জায়গাতেই ট্যাক্স আদায়

করিতে সরকারের লোক আসিতেছে খবর পাইলে গ্রামবাসীরা একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরি-সংকীর্তন আরম্ভ করিয়া দিতেন। ট্যাক্স আদায়ে লোক আসিয়াছে, আশেপাশে এ সংবাদ জানাইয়া দিবার এইটাই ছিল সংকেত। তাহা ছাড়া গ্রামবাসীদের প্রয়োজনমত একত্রিত রাখিবার উপায় হিসাবেও হরিসংকীর্তন খুব কাজে লাগিত।

আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ করিয়া দিয়া সাধারণ গ্রামবাসীকে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করিবার চেষ্টাও সে সময় করা হইয়াছিল। ফতেপুর গ্রামের যে মহিলারা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে ঝাঁটা দেখাইয়াছিলেন তাঁহাদের বাড়ির পুরুষদের কপালে প্রচুর দুর্ভোগ জুটিয়াছিল। প্রেসিডেন্টের বাড়িতে জোর করিয়া ঢুকিয়া ঘর-দুয়ার ভাঙার অভিযোগে পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়া দিল। বিচারে তাঁহাদের শাস্তি হইল সাতদিনের কারাবাস। মুক্তি পাইবার আগের দিন গভীর রাত্রে পুলিশ কয়েদীদের রামনগরের পথের মাঝখানে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। সকালবেলা ইঁহাদের মুক্তির সময় সংবর্ধনা জানাইবার উদ্দেশ্যে বীরেন্দ্রনাথও রামনগরের পথে কাঁথি ফিরিতে-ছিলেন। মধ্যরাত্রে পথের মাঝখানে বন্দীদের পাইয়া তাঁহাদের কাঁথি শহরে ফিরাইয়া আনিলেন। সকালে ইঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া একটি শোভাযাত্রা কাঁথি শহর পরিক্রমা করিয়া আসিল। বিকালে ইঁহারা সংবর্ধনা পাইলেন প্রায় দশহাজার লোকের এক সভায়।[৩৫] পরবর্তীকালে ট্যাক্স না দেওয়াতে যখন মাল ক্রোক শুরু হইল তখন যাঁহাদের মাল ক্রোক হইয়াছে বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রকাশ্য সভায় নির্যাতনের কাহিনী বলিবার জন্য ডাকিয়া আনিতেন।[৩৬] জোতদার, জমিদার বা পুলিশের ভয়ে চিরদিন যাঁহারা মাথা নীচু করিয়াই চলিতে অভ্যস্ত, এইরূপ শোভাযাত্রা, সংবর্ধনা-সভা, বক্তৃতা, তাঁহাদের জীবনে অভাবিত অনাস্বাদিতপূর্ব আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল। এই সুযোগের জন্যই তো সাধারণ লোক মাহিষ্য জাতের আন্দোলন সাগ্রহে সমর্থন করিয়াছিলেন।

এমনি আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সাধারণ লোকে আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিতে গিয়াও পাইয়াছিলেন। গ্রাম-পর্যায়ে পল্লীসমিতি ও পল্লীসংঘ সংগঠিত ও পরিচালনা করা, চাঁদা সংগ্রহ করা, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার চালানো, ট্যাক্স বন্ধ সংগঠিত করা, মাল ক্রোকের সময় যাহাতে কোন গোলমাল না হয় তাহার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি আন্দোলন ব্যাপক হইয়া উঠিলে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকগণকে সমানভাবে করিতে হইয়াছিল। সকলেই ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ঘরে ঘরে মাল ক্রোক হইতেছে এ অবস্থায় সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা প্রসারিত হইবারই কথা। আন্দোলনের মধ্য দিয়া এইসব নানাভাবে সাধারণ লোকের মনে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ও আত্মবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে পূর্ব মেদিনীপুরের পরবর্তী গণ-আন্দোলনের সংগঠন, প্রসার ও গতি-প্রকৃতিতে তাহার প্রভাব প্রচুর।

কাঁথি ও রামনগর থানায় তহশীলদার নিয়োগ করিয়া, সার্কেল অফিসার পাঠাইয়া কোনক্রমেই ইউনিয়ন ট্যাক্স আদায় করা গেল না। উপরন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের নামে রসিদ দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়াতে চৌকিদারি ট্যাক্স আদায়ও বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হইল মাল ক্রোক। ক্রোক করিতে অবশ্য কোন অসুবিধাই হইল না। গ্রামবাসীরা যাহাতে বিনা বাধায় জিনিসপত্র ছাড়িয়া দেন স্বেচ্ছাসেবকেরা সেজন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। গ্রাম-বাসীরাও যে স্বেচ্ছায় জিনিসপত্র ছাড়িয়া দিতেছিলেন স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।[৩৭] কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল ক্রোকী মাল অপসারণ করিবার সময়। সরকারের হইয়া একজনও মাল বহিতে চাহিলেন না, কোথাও একটা গোরুর গাড়িও পাওয়া গেল না। চৌকিদাররাও মাল বহিতে অসম্মত। অবশেষে সরকারী গাড়ি আনাইয়া ক্রোকী মাল কাঁথিতে সরাইবার ব্যবস্থা

করা হইল। অক্টোবর মাসের তিন তারিখ হইতে কাঁথি আদালত প্রাঙ্গণে আরম্ভ হইল ক্রোকী মালের নীলাম। প্রথমে চড়ানো হইল দারুয়া গ্রামের কৃষ্ণ ভুঞ্যার মাল। ইহার মধ্যে অনেক মূল্যবান জিনিস-পত্র ছিল। ডাক শুরু হইল দশটাকা দাম ধরিয়া। কেহ ডাকিল না দেখিয়া দাম নামানো হইল চার টাকায়, তারপর এক টাকায়। তবুও কেহ নীলাম ধরিতে আসিল না। একই ঘটনা ঘটিতে লাগিল দিনের পর দিন। এদিকে এক মাসের মধ্যে রামনগর ও কাঁথি থানায় চার হাজার লোকের মাল ক্রোক হইয়া কাঁথি আদালত প্রাঙ্গণে আসিয়া গিয়াছে। ক্রোকী মাল জমিয়া পাহাড়প্রমাণ। উপায়ান্তর-বিহীন সরকার পক্ষ মাল ক্রোক বন্ধ করিয়া দিলেন।[৩৮] তাহার পর ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টাই বা আর চলে কী করিয়া?

কাঁথিতে কী ঘটিতেছে সে কথা পূর্ব মেদিনীপুরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। অক্টোবর নাগাদ তমলুকে আরম্ভ হইয়া গেল কাঁথির মতো প্রতিরোধ। যে কয়টি ইউনিয়ন বোর্ড তখনও চালু ছিল তাহাদের পক্ষে আর ট্যাক্স আদায় করা সম্ভব হইল না, তহশীলদার নিয়োগ করিয়াও নয়। গ্রামে ঢুকিলে তহশীলদারদের কপালে জুটিতে থাকিল যদৃচ্ছ গালি-গালাজ। আদায় করিতে গিয়া তহশীলদারদের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইত। কিন্তু লোকের বিরাগ এমনই যে তাঁহাদের পক্ষে কোথাও আশ্রয় পাওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিল।[৩৯]

একই সময়ে ঘাটালেও প্রতিরোধ ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। এখানে দেখিতেছি প্রতিরোধের রকমটা একটু বেশী চড়া। খুকুরদা গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করিতে গিয়া স্বয়ং সার্কেল অফিসারকে অবমানিত ও নির্যাতিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল।[৪০] মহকুমা শাসক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিয়াছিলেন যে লোকেরা চীৎকার করিয়া ক্ষান্ত হইবে এমন সম্ভাবনা নাই, ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধে তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। কাঁথির লোকেরা ও বীরেন শাসমল তাহাদের শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছে। বীরেন শাসমল না বলা পর্যন্ত তাহারা কিছুতেই ইউনিয়ন বোর্ড মানিয়া নিবে না।[৪১]

সদর মহকুমার পূর্বাংশেও ট্যাক্স আদায় করিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। তহশীলদারদের সর্বত্রই ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে চৌকিদার ট্যাক্স-র রসিদ দিলে জন-সাধারণ সে ট্যাক্সও দেন নাই।[৪২]

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এস. এন. রায় ও সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকগণ বিভিন্ন স্থানে গিয়া জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি দুই দন্ড দাঁড়াইয়া শুনিবে, এমন লোকই পাওয়া গেল না। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার প্রতিবেদনে লিখিয়াছিলেন যে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ট্যাক্স বারো গুণ বাড়িয়া চুরাশি টাকা হইবেই। প্রতিবাদ করিয়া বুঝাইতে গেলে লোকে মনে করে প্রতারণা করা হইতেছে। অনেক জায়গায় গ্রামবাসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া সচীৎকারে জানাইয়া দিয়াছেন যে ইউনিয়ন বোর্ড তাঁহারা কিছুতেই মানিয়া নিবেন না। অল্প কয়েকজন লোকের আচরণ একটু নম্র বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অস্বাভাবিক জেদ দেখিয়া তিনি বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই।[৪৩]

সরকার পক্ষের অসুবিধা আরও বাড়িয়া গেল চৌকিদারদের আচরণের ফলে। ঘাটাল মহকুমার বহু চৌকিদার সরকারী কাজ করিলে পাপ হয় এই বলিয়া চাকরি ছাড়িয়া দেন। মহকুমা শাসক অনেক বুঝাইয়া তাঁহাদের আর-একবার ভাবিয়া দেখিতে রাজী করান বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা ভাবিয়া কী ঠিক করিবেন তাহার কিছুই তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।[৪৪] তমলুকের মহকুমা শাসক দেখিলেন, চৌকিদাররা মাল ক্রোকের ব্যাপারে তহশীলদারদের সাহায্য করিতে অসম্মত। লোকে নাকি তাঁহাদের ভয় দেখাইতেছে। কিন্তু কে কোথায় ভয় দেখাইয়াছে

এ সংবাদ মহকুমা শাসক কোন চৌকিদারের মুখ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।[৫৫]

আন্দোলন সম্পর্কে সরকারী অফিসারদের প্রতিক্রিয়া

অবস্থা দেখিয়া সরকারী মহলের সকলেরই ধারণা হইল যে ইউনিয়ন বোর্ড চালু রাখা অসম্ভব। কাঁথির মহকুমা শাসক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইলেন কাঁথিতে ইউনিয়ন বোর্ড কিছুতেই চালানো যাইবে না। জোর করিয়া চেষ্টা করিলে, বীরেন শাসমল বলিয়াছেন, চৌকিদার ট্যাক্স দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরকম চলিতে থাকিলে যেসব জায়গায় শুরু হয় নাই সেসব জায়গাতেও আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য। সর্বত্র পরাজিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা অসম্ভব।[৫৬] জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রায়ের ধারণা হইয়াছিল ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহারে দেরি করিলে জনসাধারণ পুরোপুরিভাবে অসহযোগীদের আয়ত্তে চলিয়া যাইবে।[৫৭] ঘাটালের মহকুমা শাসক দেখিলেন এই উপায়ান্তরহীন অবস্থা চলিতে থাকিলে গোলমাল ক্রমশ বাড়িতেই থাকিবে।[৫৮] ইউনিয়ন বোর্ড চালানো সম্ভব নয়, এ বিশ্বাস সদর মহকুমা শাসকের মনেও জন্মাইয়াছিল। তবে এ আশাও তাঁহার ছিল যে ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া নিলে অসহযোগীদের হাতে আর করিবার মত কিছু থাকিবে না, তাহাদের নেতৃত্বাধীন গণসমাবেশও ভাঙিয়া যাইবে।[৫৯]

সরকার স্বেচ্ছায় দিতে চাহিতেছেন অথচ লোকে যে শুধু হাত পাতিয়া নিল না তাহাই নয়, এমনভাবেই প্রত্যাখ্যান করিল যে দেওয়া জিনিস সরকারকে আবার ফিরাইয়া নিতে হইবে এই অবস্থা দেখিয়া উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসারদের ক্ষোভ, ক্রোধ ও দুশ্চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না। এস. এন. রায় ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী আন্দোলনকে বিষাক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং বীরেন শাসমলকে তাঁহার ভন্ড বলিয়াই মনে হইয়াছিল।[৬০] আন্দোলনের প্রথম দিকে কাঁথির মহকুমা শাসক ছিলেন জ্ঞানাঙ্কুর দে। তিনি তো রাগের চোটে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে দারুয়া ময়দানে বীরেন শাসমলের সভায় আর-একটি জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি করিবেন।[৬১] দারুয়া ময়দানটির প্রায় সব দিকই লোকবসতি দিয়া ঘেরা এবং বীরেন শাসমল সভা করিলে লোক হইত কমপক্ষে দশহাজার। এই কারণেই বোধহয় জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে তুলনা করিবার কথাটা মহকুমা শাসকের মনে আসিয়াছিল। যাহাই হউক, ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহার করা অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া সরকারের মর্যাদা-হানির আশঙ্কায় এস. এন. রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।[৬২] ঘাটালের মহকুমা শাসক হরকুমার মজুমদারও দেখিতেছি অনুরূপভাবেই ক্লিষ্ট।[৬৩] তবে ইংরাজ অফিসাররা, যথা মেদিনী-পুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের মনে চিন্তা তখন অন্যরকম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহারের কারণ কৌশলগত। প্রত্যাহার করিবার পর সরকার-বিরোধীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাইবে অনেক সহজে, কিন্তু না করিলে সরকারের প্রতি জন-সাধারণের মনোভাব ক্রমশঃ কঠোরতর হওয়াই সম্ভব।[৬৪] কমিশনারের ধারণা, ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহারের মধ্যে অগৌরবের কিছুই নাই। সরকার জনসাধারণকে কিছুটা পরিমাণ স্বরাজ দিতে চাহিয়াছিলেন, লোকে যদি সে অধিকার নিতে না চায় তবে লজ্জার কথা তাহাদেরই।[৬৫]

মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহার

অবশেষে কলিকাতার সরকারী মহলও বুঝিলেন যে পূর্ব মেদিনীপুরের গণপ্রতিরোধ ভাঙা সম্ভব নয় এবং ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহার করা ছাড়া এই অসহনীয় পরিস্থিতি হইতে বাহির হইয়া আসিবার আর কোন পথই নাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিসেম্বর মাস হইতে তমলুক মহকুমার অন্তর্ভুক্ত পাঁশকুড়া থানার গোপালনগর বাদে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড

প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইল।[৩৩] ইহার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে কাঁথি মহকুমার সমস্ত ক্রোকী মাল ফিরাইয়া দেওয়া হয়।[৩৭]

পূর্ব মেদিনীপুরের পরবর্তী গণ-আন্দোলনে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রভাব

পূর্ব মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহৃত হইয়াছিল সম্পন্ন হইতে দরিদ্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমবেত প্রতিরোধের ফলে। আন্দোলনে যোগদান করিবার পর নেতৃত্ব স্বভাবতই চলিয়া গিয়াছিল সম্পন্ন সম্প্রদায়ের হাতে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা তাঁহাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন, সুতরাং আন্দোলনের সুযোগে রাজনৈতিক নেতৃত্ব হাতে তুলিয়া নেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় নাই। তাঁহাদের আয়ত্তে যে সহায়-সম্বল ছিল আন্দোলনের সাফল্যে তাহার গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল সাধারণ লোকের সাগ্রহ প্রতিরোধের ফলে। সরকার যে কোনক্রমেই ট্যাক্স আদায় করিতে পারেন নাই, সর্বত্র যে বিনা বাধায় মাল ক্রোক হইয়াছে, ক্রোকী মালের একটাও যে নীলামে বিক্রয় করা সম্ভব হয় নাই, সে নিঃসন্দেহে সাধারণ লোকের জন্য। কংগ্রেসের মধ্যে সম্পন্ন ও সাধারণ লোক এক হইয়া কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাহিরে সম্পন্ন লোকেরা তো জোতদার, জমিদার, মহাজন আর সাধারণ লোক বলিতে মাঝারি বা ছোট চাষী অথবা ভাগচাষী। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের। সম্পন্ন লোকে ঋণদাতা, সাধারণ লোকে ঋণগ্রহীতা। জমিদারী বা জোতদারী আবওয়াব সম্পন্ন লোকেরা সাধারণ লোকের নিকট হইতে আদায় করেন। তাহার পর আবওয়াবের ভারে ও ঋণের দায়ে সাধারণ লোকের জমি যখন হস্তান্তর হয়, তখন লাভবান হন সম্পন্ন লোকেরাই, কারণ জমি তাঁহাদেরই হাতে গিয়া পড়ে। তাই সম্পন্ন ও সাধারণ লোকের একত্র সমাবেশে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে আভ্যন্তরিক বৈপরীত্য যে অনিবার্য হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কী।

ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ-আন্দোলনের মধ্য দিয়াই কংগ্রেসের মধ্যে যেমন বিপরীত শক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছিল, তেমনি বিপরীত শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের পথটাও ওই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছিল। আন্দোলন উপলক্ষে সাধারণ লোকেরা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াও আন্দোলন উপলক্ষে তাঁহাদের কিছুটা আয়ত্ত হইয়াছিল। ইংরাজ সরকারের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও সমবেত প্রতিরোধের ফল কী হইতে পারে, আন্দোলনের ফলাফলে তাহাও সপ্রমাণ। নবার্জিত এইসব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক শোষণের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণ লোককে সচেতন করিয়া তুলিল।

ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধের জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে সম্পন্ন ও সাধারণ লোকের একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও আন্দোলন সংক্রান্ত প্রচারের মধ্যে সম্পন্ন সম্প্রদায়ের শোষণের কথা নানাভাবেই উঠিয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ তো এমন কথাও বলিয়াছিলেন ধনীরা নিজের টাকায় কখনই ট্যাক্স দেন না—ট্যাক্স-র টাকাটা তাঁহারা মজুরি কমাইয়া বা সুদ বাড়াইয়া সাধারণ লোকের উপর দিয়া তুলিয়া নেন। ইউনিয়ন বোর্ড হইলে সে প্রতিষ্ঠান ধনীদের হাতেই চলিয়া যাইবে, আর আপামর দরিদ্র জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইবেন ধনীরাই। এইসব কথা শুনিয়া ইউনিয়ন বোর্ড ইংরাজ ও স্থানীয় সম্পন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত শোষণের প্রতীক, সাধারণ লোকের মনে এমন ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়। তাহা ছাড়া গঠনমূলক কার্যক্রমের ভিতর দিয়া কংগ্রেস সাধারণ লোকের আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতার কথাই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একেবারে প্রথম দিকে অবশ্য বলা হইয়াছিল জনসাধারণের সুখ, সৌভাগ্য, স্বাধীনতা ইংরাজের শোষণে লোপ

পাইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রচারের সময় এইসব কথার সঙ্গে যুক্ত হইল স্থানীয় সম্পন্ন সম্প্রদায়ের শোষণের কথা।

শক্তিমানের শোষণ এবং জনসাধারণের অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা প্রচারের সঙ্গে প্রতিরোধ-সচেতনতা ও প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা যুক্ত হইবার ফলেই বোধ করি ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই সম্পন্ন সম্প্রদায়ের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সচেতনতার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৯২২ সালের গোড়ার দিকে বীরেন্দ্রনাথের উৎসাহে কাঁথির ভাগচাষীরা জোতদারদের আবওয়াব লইবার বিরুদ্ধে সংহত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিক্ষুব্ধ ভাগচাষীরা বীরেন্দ্রনাথের গ্রাম চণ্ডীভেটিতে আবওয়াব রদের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য সভা আহবান করেন। এই সভায় সমবেত হন পনেরো হাজার ভাগচাষী। নিজেরাই পালকির খরচ দিয়া জোতদারদের এই সভায় আনিবার চেষ্টা ভাগচাষীরা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র পাঁচ-ছয় জন ছাড়া জোতদারদের আর কেহই উপস্থিত হন নাই। উপস্থিত জোতদারদের মধ্যে সতীশ দিন্ডা বলেন যে-সমস্ত ভাগচাষী সুতা কাটিয়া কাপড় পরিবেন তাঁহাদের আবওয়াব তিনি সবটাই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। আর তিনজন জোতদার এ প্রস্তাব মানিয়া নিলেন। কিন্তু গোবিন্দপ্রসাদ দাস বলেন, অন্যান্য জোতদারদের মত না নিয়া এ বিষয়ে কিছু বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সময় তাঁহার একজন ভাগচাষী উঠিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন গোবিন্দপ্রসাদের জোতদারিতে আবওয়াব দিতে হয় বিঘাপ্রতি একমণ দুই সের এবং তাহার উপরে ঋণ না করিলেও সুদ হিসাবে বিঘাপ্রতি দেড় মণ ধান ভাগচাষীর নিকট হইতে কাটিয়া রাখেন। গোবিন্দপ্রসাদ তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন জমির আয় হইতেই তাঁহাকে খাজনা, ট্যাক্স দেওয়া এবং পূজা-পার্বণ ও গঙ্গাসাগরের সময় অতিথিসেবার ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। তবে ভাগচাষীরা যখন ধরিয়া পড়িয়াছেন তখন তিনি না হয় দুই সের কম করিয়াই নিবেন। গোবিন্দপ্রসাদের কথায় ভাগচাষীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়া যায়। অনেকেই বলিতে থাকেন—না, ইহাতে হইবে না। মহাত্মা গান্ধী যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথ ধরিতে হইবে। এই বলিয়া ভাগচাষীদের অনেকেই মহাত্মা গান্ধী কি জয় ইত্যাদি ধ্বনি দিয়া উঠিয়া পড়েন। অবশেষে জোতদারদের মধ্যে রাজেন শাসমল আপোসের চেষ্টা করিয়া বলেন—তিনি আবওয়াব কমাইয়া দিতে রাজী, খরচা বাবদ বিঘায় পনেরো সের ধান পাইলেই তাঁহার চলিবে। ভাগচাষীরা অন্য জোতদারদের এই হারে আবওয়াব নিতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করুক। তবে অভাব মোচনের জন্য ভাগচাষীদের উচিত চরকায় সুতা কাটিয়া নিজেদের কাপড় যোগাইবার ব্যবস্থা করা। রাজেন শাসমলের প্রস্তাবও ভাগচাষীদের মনঃপূত হইল না। অন্যত্র দলবদ্ধ হইতে হইবে ইত্যাদি আলোচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধীর জয়, বীরেন্দ্রবাবুর জয় ধ্বনি দিয়া তাঁহারা সভা হইতে চলিয়া গেলেন।[৩৮]

কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে যে বৈপরীত্যের কথা বলিতেছিলাম চণ্ডীভেটিতে ভাগচাষীদের সভার এই বিবরণের মধ্যেই তাহা পরিষ্কার। ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন যে স্থানীয় সম্পন্ন সম্প্রদায়ের শোষণ ও এই শোষণ প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণ লোককে কতদূর সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাও এই সভার বিবরণ পড়িলে সহজেই বুঝা যাইবে। ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন উপলক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে সম্পন্ন হইতে দরিদ্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাহা গান্ধীর প্রথমদিকের রাজনৈতিক সংগ্রামকৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অবস্থায় সম্পন্ন সম্প্রদায় গান্ধীর পদ্ধতি ও কার্যক্রম দিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহাও স্বাভাবিক। চণ্ডীভেটীর সভায় জোতদাররা তো তাহাই করিতেছিলেন। সুতা কাটিয়া কাপড় পরিলে অভাব মোচন হইবে, এ উপদেশ সহজেই মহাত্মা গান্ধীর নামে চালাইয়া

দেওয়া যায়। কিন্তু গান্ধীর বাণী সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছিয়াছিল অন্য অর্থ নিয়া। তাঁহাদের কাছে সে বাণীর মধ্যে ছিল শোষণমুক্তির আশ্বাস। তাহা ছিল বলিয়াই চণ্ডীভেটির সভায় গোবিন্দ-প্রসাদের প্রস্তাবে ভাগচাষীরা উত্তেজিত হইয়া বলিতে থাকেন—না তাহা হইবে না। মহাত্মা গান্ধী যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথ ধরিতে হইবে।

পূর্ব মেদিনীপুরে সাধারণ কৃষকের কৃষি-আন্দোলন শুরু হইয়াছিল এইভাবে। ইহার পর হইতেই দেখিতেছি পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন অংশে ছোট চাষী ও ভাগচাষীর দাবি-দাওয়া নিয়া বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ কংগ্রেস কার্যক্রম ও আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিক্ষুব্ধরা কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক অথবা কংগ্রেস-সমর্থক, যাঁহাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তাঁহাদের অনেকেই স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অথবা সমর্থক। তত্রাচ কংগ্রেস কৃষক আন্দোলনের প্রসার হইতেছিল এবং ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কৃষক আন্দোলন বিশেষ শক্তিও সঞ্চয় করিয়াছিল। পূর্ব মেদিনীপুরে কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন অগ্রসর হইতেছিল এই আভ্যন্তরিক বৈপরীত্য নিয়া এবং বিপরীত শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের ভিতর দিয়া।

পাদটীকা

১. জমির উপর চাপ, রায়তী জোতের পরিমাণ, খাজনার হার, কৃষকের ঋণ ও জোত হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য এ. কে. জেমেসন, "ফাইনাল রিপোর্ট অব দি সার্ভে অ্যান্ড সেটলমেন্ট অপারেশনস ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব মিদনাপুর ১৯১১ টু ১৯১৭", (কলিকাতা, ১৯১৮), পৃ. ৬৮৮ ও ১১১।
২. মাহিষ্য জাতের আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ই. এ. গেইট, "সেন্সাস অব ইণ্ডিয়া ১৯০১", ভল্যুম ৪, পার্ট ১, রিপোর্ট, (কলিকাতা, ১৯০২), পৃ. ৩৮০।
৩. এল. এস. এস. ও' ম্যালী, "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মিদনাপুর", (কলিকাতা, ১৯১১), পৃ. ৯৬।
৪. পূর্ব মেদিনীপুরে কংগ্রেসের প্রাথমিক কার্যকলাপের জন্য দ্রষ্টব্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, "স্রোতের তৃণ", (কলিকাতা, ১৯২২), দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭২, পৃ. ৭-৮ : গোপীনন্দন গোস্বামী, "বাংলার হলদিঘাট তমলুক", (রাজারামপুর, মেদিনীপুর, ১৯৭৩), পৃ. ১৬-১৭ : দিবাকর পণ্ডা "মেদিনীপুর জেলায় কেশপুর থানায় কৌয়াই কাহিনী", (অপ্রকাশিত), শ্রীপণ্ডার সৌজন্যে প্রাপ্ত : "নীহার" ফেব্রুয়ারি ১৫, ২২, মার্চ ৮, ১৫, এপ্রিল ৯, ১২, ১৯, ২৬, মে ১৭, ২৪, জুলাই ৫, ১২, ১৭, ১৯২১।
৫. ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য "বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯"।
৬. "নীহার", জুন ১২, ১৯২২।
৭. বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, 'বিঅয়্যার অব ইউনিয়ন বোর্ড', "অমৃতবাজার পত্রিকা", অক্টোবর ২২, ১৯২১।
৮. "নীহার", এপ্রিল ২৬, মে ১৭, জুলাই ৫, ১৯২১।
৯. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভারতে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন', "মেদিনীপুর পত্রিকা", শারদীয়া সংখ্যা।
১০ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, (১৯২১), পূর্বোক্ত, ৯।
১১. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত : ঝাড়েশ্বর মাঝি, "স্বাধীনতা সংগ্রামে পিছাবনী", (অপ্রকাশিত), শ্রীস্বদেশ মাঝি (পিছাবনী) ও শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (কাঁথি) মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
১২. প্রেরক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, প্রাপক জ্ঞানাংকুর দে, মহকুমা শাসক, কাঁথি, "অমৃতবাজার পত্রিকা", অক্টোবর ২১, ১৯২১।
১৩. বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, 'বিঅয়্যার অব ইউনিয়ন বোর্ড', "অমৃতবাজার পত্রিকা", অক্টোবর ২১, ১৯২১।
১৪. "নীহার", মে ১২, জুলাই ১৯, ১৯২১।
১৫. উপর্যুক্ত পাদটীকা ১৩ : "নীহার", আগস্ট ২৩, ১৯২১।
১৬. প্রেরক মহকুমা শাসক, ঘাটাল, প্রাপক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেদিনীপুর, অক্টোবর ২০, ১৯২১, গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, এল এস-জি ডিপার্টমেন্ট, লোকাল এস-জি (লোকাল বোর্ডস), জুলাই, ১৯২২, প্রসিডিংস নাম্বারস ৩৬-৩৯, ফাইল নাম্বার এল ২-ইউ-৫, সিরিয়াল নাম্বারস ১-৭।
১৭. মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এস. এন. রায়ের প্রতিবেদন, নভেম্বর ১, ১৯২১।

১৮. সোরমনী গ্রামের ক্ষেত্রমোহন সামন্তর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার।
১৯. 'অবতরণিকা', "মাহিষ্য সমাজ", ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৮, পৃ. ৩।
২০. 'অভিষেক', "মাহিষ্য সমাজ", ১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৮, পৃ. ৪৯।
২১. দ্রষ্টব্য বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির বাৎসরিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব, ১৩১৯, "মাহিষ্য সমাজ", ২য় ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, পৃ. ২১৪-১৫।
২২. দ্রষ্টব্য বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির বাৎসরিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব, ১৩১৯, মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের বাৎসরিক সভা, ১৯১২, উপর্যুক্ত, পৃ. ২১০-১৩ : "মাহিষ্য সমাজ", ২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৯, পৃ. ৯৩ : উপর্যুক্ত, ৩য় ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২০ : উপর্যুক্ত, ১১শ-১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২০।
২৩. 'মাহিষ্যের কর্তব্য', "মাহিষ্য সমাজ", ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮, পৃ. ৪৬।
২৪. তুলনীয় মাঝি, পূর্বোক্ত।
২৫. পাদটীকা ১৬ দ্রষ্টব্য।
২৬. মেদিনীপুর সদর মহকুমা শাসকের প্রতিবেদন, অক্টোবর ২৫, ১৯২১, সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
২৭. প্রেরক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেদিনীপুর, প্রাপক ডিভিশনাল কমিশনার, বর্ধমান, নভেম্বর ৩, ১৯২১, উপর্যুক্ত সূত্র।
২৮. "নীহার", জুলাই ১২, ২৬, ১৯২১।
২৯. এস. এন. রায়ের প্রতিবেদন, পূর্বোক্ত : মেদিনীপুর সদর মহকুমা শাসকের প্রতিবেদন, নভেম্বর ১, ১৯২১, সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।
৩১. মাঝি, পূর্বোক্ত।
৩২. সর্বেশ্বর পন্ডা, "রামনগর থানার স্বাধীনতা সংগ্রামের অপ্রকাশিত বিবরণ", (অপ্রকাশিত), শ্রীপন্ডার সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৩৩. এস. এন. রায়ের প্রতিবেদন, পূর্বোক্ত।
৩৪. জালালপুর গ্রামের শ্রীভূতেশ্বর পড়্যার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
৩৫. শাসমল, (১৯২২)। পূর্বোক্ত ১০ ও ১৯ : "নীহার", মে ৩০, ১৯২১।
৩৬. "নীহার", অক্টোবর ৪, ১৯২১।
৩৭. প্রেরক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেদিনীপুর, প্রাপক ডিভিশনাল কমিশনার, বর্ধমান, নভেম্বর ৮, ১৯২১, সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৩৮. কাঁথিতে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য "নীহার", জুলাই ২৬, সেপ্টেম্বর ২৭, অক্টোবর ৪, নভেম্বর ১৫, ১৯২১ : "অমৃতবাজার পত্রিকা", অক্টোবর ৭, ২১, ১৯২১ : বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।
৩৯. প্রেরক মহকুমা শাসক, তমলুক, প্রাপক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেদিনীপুর, অক্টোবর ২১, ১৯২১, সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৪০. "বেঙ্গলী", সেপ্টেম্বর ৫, ১৯২১।
৪১. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৪২. মেদিনীপুর সদর মহকুমা শাসকের প্রতিবেদন, নভেম্বর ১, ১৯২১, সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৪৩. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩৩।
৪৪. প্রেরক মহকুমা শাসক, ঘাটাল, প্রাপক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেদিনীপুর, অক্টোবর ২১, ১৯২১, সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৪৫. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩৯।
৪৬. কাঁথির মহকুমা শাসকের প্রতিবেদন, নভেম্বর ২, ১৯২১, সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৪৭. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩৩।
৪৮. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৪৯. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৪২।
৫০. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩৩।
৫১ শাসমল, (১৯২২), পূর্বোক্ত, পৃ.১৯ : জালালপুর নিবাসী শ্রীভূতেশ্বর পড়্যার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৫২. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩৩।
৫৩. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৫৪. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ২৭।
৫৫. প্রেরক ডিভিশনাল কমিশনার, বর্ধমান, প্রাপক সেক্রেটারী, গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, নভেম্বর ৭, ১৯২১, সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৬।
৫৬. নোটিফিকেশন নং ৫০২৫, লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট, ডিসেম্বর ১৭, ১৯২১, উপর্যুক্ত সূত্র।
৫৭. "নীহার", ডিসেম্বর ২২, ১৯২১।
৫৮. "নীহার"। মার্চ ৭, ১৯২২।

বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত অনেক তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে পূর্ব মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ও প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎকারের সময় স্মৃতিচারণ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করিতেছি : শ্রীপতিচরণ পণ্ডা, বড় বানতলিয়া; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মিশ্র, হিঞ্চি; শ্রীসতীশচন্দ্র জানা, বাণী মন্দির, কাঁথি শহর; শ্রীকাঙালচাঁদ গিরি, কাঁথি শহর; কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি, কাঁথি শহর; ডঃ রাসবিহারী পাল, কাঁথি শহর; শ্রীবসন্তকুমার দাস, কাঁথি শহর; শ্রীক্ষেত্রমোহন সামন্ত, সোরমনী; শ্রীগোবিন্দ দিণ্ডা, নিমদাসবাড়; শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস, কাঁথি শহর; শ্রীঅবিনাশ মাইতি, কাঁথি শহর; শ্রীপ্রাণেশ্বর পাল, বাহিরী; শ্রীমুরারিমোহন মণ্ডল, শ্রীবনবিহারী মণ্ডল, শ্রীকাঙাল মণ্ডল, শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীধরণীকান্ত মণ্ডল ও শেখ আবদুল, উত্তর আমতলিয়া; শ্রীসাধন গিরি, শ্রীসর্বেশ্বর মাইতি, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মান্না, উত্তর ডিহি মুকুন্দপুর (কাঁথি মহকুমা); শ্রীতারকচন্দ্র জানা, পুতপুতিয়া; বংশীধর সামন্ত, গঠরা; শরৎচন্দ্র জানা, বাঁপুর, শ্রীনলিনীরঞ্জন হোতা, কল্যাণচক; শ্রীহংসধ্বজ মাইতি, শ্যামসুন্দরপুর; শ্রীশরৎচন্দ্র বাগ, গোয়ালবেড়্যা; শ্রীনীলমণি হাজরা, রাজারামপুর; শ্রীপতিতপাবন জানা, লক্ষ্যা-ট্যাংরাখালি; শ্রীসতীশচন্দ্র সাউ, খোদামবাড়ী; শ্রীরবীন্দ্রনাথ গিরি, রেয়াপাড়া; শ্রীকৃষ্ণপদ বেরা, গোকুলনগর; শ্রীভাগবতচন্দ্র প্রধান, চন্দননগর; শ্রীহরিপদ দাস, মারিশদা; শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মাইতি, শ্রীবটকৃষ্ণ মাইতি ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বেরা, মহম্মদপুর; শ্রীসতীশচন্দ্র খাটুয়া, প্রিয়নগর; শ্রীসুধাংশু ভূঞ্যা ও শ্রীবলরাম গিরি, ভেকুটিয়া; শ্রীনির্মলকুমার খাটুয়া, কালীচরণপুর; শ্রীবিহারীলাল পণ্ডা, জয়নপুর; শ্রীভূপাল পণ্ডা, নন্দীগ্রাম; শ্রীললিত ধাড়া, টীকারামপুর (তমলুক মহকুমা)।

তথ্য সংগ্রহের জন্য নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি ডঃ রাসবিহারী পাল (কাঁথি শহর), শ্রীবলাইলাল দাস মহাপাত্র (কাঁথি শহর), শ্রীহিমাংশু ঘোড়ই (কাঁথি শহর), শ্রীগোপীনন্দন গোস্বামী (মহিষাদল) ও শ্রীসুধাংশু ভূঞ্যা (ভেকুটিয়া) মহাশয়ের নিকট হইতে।

পরম আশ্রয়ে

অরুণ মিত্র

বেশ কয়েকটা বাগান পেরিয়ে আসতে হল,
বলতে গেলে সেও এক চমৎকার উপকথা।
মানে সে-সব বাগানে ঢুকে আমি একান্ত বিহ্বল হই,
আমার এ চোখ দুটো টলটল সরোবর হ'য়ে যায়, তাতে কত ছবি!
মুগ্ধতার একটা স্থায়ী বাসা কোথায় রয়েছে তার খোঁজখবর নিতে থাকি,
কোথায় মালীর ঘর, বাংলো-টাংলো নয়, দিনের খাটুনি শেষ হলে
ভাঙা জান্‌লা দিয়ে আকাশের চন্দ্রাতপ উপরে যে আছে
তাই জানা, হাত পা এলিয়ে দেওয়া ঢিলেঢালা ঘুমে।
খবর কিছুই পাইনি, যেহেতু আমার তা পাবার ছিল না।
হয়তো ফুলন্ত ডালে অন্য পথের নির্দেশ ছিল, হয়তো সূর্যের রশ্মি ছেঁটে
তীরমার্কা এঁকে দেওয়া ছিল। সে-সবও দেখিনি।
সুতরাং খুঁজতে খুঁজতে কেয়ারিতে দেবদারু ঝাউয়ে লতাকুঞ্জে
খুঁজতে খুঁজতে বাগানের পর বাগান ছাড়িয়ে অবরোহে কাঁকরে ডেলায় পিছলে
ক্রমে পৃথিবীর পরম আশ্রয়ে।
মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাওয়া গেছে, এখন একবার প্রসন্নতা
যদি গর্তের ভিতরে এনে ফেলি তবে সুখ উপচে পড়বে।
এই ধুলো তো শালিধান গমদানা ফসলের বীজ,
এই তো এক বুকের নিকষ পাতা যাতে প্রতি মুহূর্তের সোনা
আড়ে দীঘে আঁকিবুকি কেটে যেতে পারে।

নিষিদ্ধ ঘর

অরুণ ভট্টাচার্য

মনের মধ্যে কতগুলি গোপন ঘর
আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি।
কোন্‌দিকে তার জানালাকপাট
কটা ঘুলঘুলি পূবে পশ্চিমে
আমি এখনো সঠিক জানি না।

আগে ভাবতুম শরীর বড় জ্বালা
এর দুঃখ যন্ত্রণা বড় নিষ্করুণ,
যৌবনকালে মনে হ'ত
এই উদ্দাম শরীরকে নিয়ে কী যে করি!

আজ মনে হয়,
মনের ভিতর এইসব ছোট ছোট ঘরে
জানালাকপাটের অন্তরালে
কী গভীর রহস্য যে—
কবে যে তার দুয়ার খুলবে জানি না
বা আদৌ খুলবে কি না।

পাপপুণ্য

সামসুল হক

নদীকে চাঁদসদাগরের ক্ষমা নেই
বেহুলা করে ক্ষমা
করেছে সে অলৌকিককে
প্রাকৃতে তর্জমা

মাটিকে দেবদূতের কোনো ক্ষমা নেই
কৃষাণী করে ক্ষমা
করেছে সে-ই লৌকিককে
অলৌকিকে শ্রীহীন তর্জমা

তর্জমা তো পাপের পথে
অন্ধ পরিক্রমা
পুণ্য যাকে করেছে খুন তাকে এই
পাপ করেছে ক্ষমা।

জনৈক সামাজিক পিঁপড়েকে

মধুসূদন সান্যাল

তুমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করো
আমি দৈত্যোপম বিশাল, শারীর জটিলতায় জ্যান্ত এক প্রতিবেশী
অনেকগুলো দৃষ্টিপাত যোগ করে আমাকে একবার দেখতে চাইলে পারতে
তোমার কৃতী প্রয়োজনে বিরোধ হানা আমার সুমিষ্ট খেয়াল-নির্ভর
বলা চলে তুমি যতোক্ষণ বেঁচে আছো
তা আমারই অনুকম্পা ও নিরিবিলি স্বভাবের কারণে

অথচ আমি দেখছি তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছো
দক্ষতার প্রশান্ত কলরোল ও বিন্যাসী অহংকারে
তুমি স্নানার্থী কখনোই নয়, বরং সদ্যস্নাতা তরুণীর
দেহগোছানোর ভঙ্গির মতো ত্বরিত চলন ও স্থিরতা তোমার
সেই গভীর ও কৃশ নিরুদ্বেগের পাহারা বসিয়ে সামাজিকভাবে
তুমি আমাকে অবিরাম উপেক্ষা করছো আমি টের পাই

গোটা প্রকৃতি আমার জানলার বাইরে
চুঁইয়ে ভেতরে আসে প্রায়ই
উৎসুক প্রকোষ্ঠ এবং নিরাবরণ মাঠ দুই-ই আমার অসহ্য
নিজস্ব বিবর্ণ ঘনত্বের জন্যে
বিশ্বাস করো এক অতি করুণ দাহ তোমার ষষ্ঠপদী বিষাদের মতো
আমার অবিচল বাহন আর অনুত্তীর্ণ আমি

ওমনি নির্বেদ লজ্জা নিয়ে আমি ময়লায় সূচ্যগ্র চরে বেড়াতে চেয়েছিলাম
ক্লেদজ কুসুমের অপারদর্শিতা আমার রম্য সূচালো অভিজ্ঞান
কিছুই হবে না জেনে এক কঠিন সংরক্ষণ
চূর্ণ আমাকে নিয়ে ফেলে দেয় সামাজিক পথে
অতএব এইবার তুমি এসো রক্তশূন্য পাতে
লুফে নাও পরিচ্ছন্ন নিরবয়ব হেঁটে
সমতলে অপ্রচ্ছদ আবিষ্ট নর্তকী।

মুক্তো কোথাও নেই

মায়া বসু

অনেক হৃদয়সাগর খুঁজে দেখেছি
মুক্তো নেই।
জ্যোৎস্নারং নিটোল মুক্তো,
কোথাও নেই।
সমুদ্রমন্থন করি প্রত্যাশার অন্বেষণ
প্রতিহত স্রোতে,
আলোকিত নিটোল মুক্তো,
কোথাও নেই।

জীবনের অনন্য পারাবারে
লবণাক্ত অশ্রুধারে
মুক্তোর উৎস খুঁজি,
ব্যর্থ বারে বারে।
শুক্তিতে লুকোনো মুক্তো
কোথাও নেই।

তিমির তরাই-এ পক্ষাঘাত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কিসের শব্দ? কেউ শুনছেন? তোমরা কেউ শুনলে? নাকি আমিই ভুল শুনলাম? কান পাতুন, আরো একটু ভালো করে—কেউ কিছু শুনছেন? নাঃ, আবার যেন সব চুপচাপ, বোধহয় ভুলই আমার হয়ে থাকবে তাহলে। অথচ আশ্চর্য, যেন মাঝে-মাঝেই শুনছিলাম— অস্পষ্ট, তবু শব্দ বটেই, অন্তত শব্দের আভাস যেন একটা। তবে ঐ তো বললাম, আজ রাতে জোর করে কিছুই বলা যায় না—কোন্‌টে ছায়া কোন্‌টে শরীর, বা শরীরের মানুষটা সত্য না ছায়ার দৈত্যটা সত্য, এসব নিয়ে দ্বিধা-প্রশ্ন-সন্দেহ যতই উঠছে, অন্ধকার ততই আরো ঘনীভূত হচ্ছে, স্পষ্ট ধ্যান-ধারণা যা-কিছু ছিল, সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এই তো দেখলেন আপনারা, খানিকক্ষণ আগেই—দেখলেন না?—এই সভাতেই, আপনাদের সামনেই, এই তো আধ ঘণ্টা কি জানিনে ঘণ্টাখানেক বা দেড়েক আগেই নিজেরাই যে-কথা উচ্চারণ করেছি, যে-কাহিনীর প্রসঙ্গ টেনেছি, সে-কথা সত্যিই উচ্চারণ করেছি কিনা বা সেই প্রসঙ্গ সত্যিই টেনেছি কিনা, তা নিয়ে পর্যন্ত কী-মারাত্মক সন্দেহটাই-না তুলে বসলাম, বসলাম না? এবং তা হয়তো এখনো বসছি, হয়তো সন্দেহ সত্যিই তুলছি কিনা, তা নিয়ে পর্যন্ত সন্দেহ তোলা চলবে এবার, অথবা আরেকটু পরে।

মরুকগে মশাই, ছেড়ে দিন, বা আমরাই এবার আপনাদের নিষ্কৃতি দিই এই অকৃতার্থ কসরত হতে, এই যখন বাইরের এত শীতলাভাস সত্ত্বেও কী-এক বৃশ্চিক-দংশনে আমরা জ্বলে-পুড়ে মরছি, হাঁটু ও গোড়ালি চুলকোচ্ছে। আবার সন্দেহ হচ্ছে, শব্দটা শুনলাম, না শুনিনি? মনে হচ্ছে, এ-রাত যতই বাড়ছে, কী-এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে আমরা ততই এগোচ্ছি এক সমূহ ধ্বংসের দিকে, অথবা আমরা নয়, সেই ধ্বংসই এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, অনিবার্য গতিতে।

আমি আবার সেই সূত্রধারই আপনাদের, সেই লোকনাথ, দেখুন আবার দাঁড়িয়েছি, কোনো-রকমে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি—তবু এখুনি যে-কান্ডটা করলাম, তার জন্য লজ্জিতও যেন নই, অথবা ভিতরে-ভিতরে সামান্য কিছু লজ্জার ভাব থেকে থাকলেও দেখুন কী-চমৎকার এক অমায়িক মুখ তুলে হাসছি আপনাদের সামনে, যেন কিছুই হয়নি, যেন যে-কান্ডটা করলাম তা আজ নয়, সর্বনাশের দিক্‌দিগন্তে আচ্ছাদিত এই সন্ধ্যার সভায় নয়, যেন যে-কান্ডটা এখুনি করলাম তা আজ না করে যদি করতাম মাত্র সাত কি আট দিন আগেই তো তখনো আমার মুরদ থাকত এভাবে এ-মুখ দেখাবার, যেন তখন আত্মধিক্কারের ভাবে নিঃশেষে মিশে যেতে চাইতাম না ধুলোর-পাঁকের কৃমির সঙ্গে। কৃত কর্মের জন্য তাই মার্জনা চাইছি না, এবং যদিও ঠিক বলতে পারছি না, কারণ জানছি না এ-মুহূর্তে আপনারা কে কী ভাবছেন, তবু হাবে-ভাবে যেন মনে হচ্ছে সে-মার্জনা আমি চাইতে বসব, এমন আশাটা আপনারাও আর করছেন না। তাছাড়া ভেবে দেখুন আজ সন্ধ্যার শুরু হতে কত মার্জনাই-না চাইলাম, কত ছিলা-অছিলায়, অতএব সেই মার্জনা চাওয়াটাকে ক্রমশই এক প্রহসনে নাই-বা পরিণত করলাম। অবশ্য এখনো যদি মার্জনা চাওয়ার থাকে, বিশেষত এখুনি যে-অপকর্মটি করলাম সেই কারণে, তো সে-মার্জনা আমার চাওয়া উচিত সর্বাগ্রে সুনন্দারই কাছে, কারণ এই অপকর্মের দ্বারা কারুর সম্মান যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সে-নারী সুনন্দাই। কিন্তু সেও কি আশা করছে কোনো মার্জনা-ভিক্ষার? একেবারেই না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তো ওর মুখের দিকেই একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন-না, ঐ তো মঞ্চের সবগুলো আলো পড়েছে ওর মুখের

উপর, আপনাদের চোখ তীক্ষ্ম হলে দেখতে পাবেন সে-মুখের সামান্যতম কুঞ্চন-রেখাকেও—দেখুন, ভালো করে দেখুন, এবং পরে আমায় বলুন ঐ মুখে কেউ কি দেখতে পাচ্ছেন অপমানিত হওয়ার কোনো ভাব প্রতিফলিত হতে?

খেপেছেন? আর কেউ কোথাও এখন অপমানিত নয়। সুনন্দা নয়, যার স্ত্রী এই সুনন্দা, সেই সুভদ্রও নয়—কারণ কই, তাকে কেউ টঁু শব্দটি করতে আপনারা দেখলেন এই সভায়? কোথায় তুমি সুভদ্র, কোন্ ভিড়ে হারিয়ে আছো, কোন্ অন্ধকারে? ঈশ্বর চোখ দিয়েছেন আপনাদের, অতএব দেখুন আপনারা ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, দেখুন দেখুন, সুভদ্র কি এগিয়ে আসছে? কোথাও আসছে না। তবে কি সে নেই এই সভায়? মোটেই নয়, খুব আছে, ভয়ংকরভাবে আছে—তার বৌএর সব কেচ্ছা সে শুনেছে, ঐ বৌএরই মুখ দিয়ে, তখন তো সাড়া তোলেইনি, এমন-কি এখনও, এই যখন আমি, আপনাদের সূত্রধার লোকনাথ ভট্টাচার্য, যে-আমি সেই সুভদ্রের এক বহু পরিচিত বন্ধু বহু দিনের, সেই আমিই যখন তার স্ত্রীকে আজ এই সভায়, এই মঞ্চের একটুখানি জায়গার চোখ-ধাঁধানো আলোকে, এই আপনাদের সকলের সারে-সার হতচকিত বিস্ফারিত নেত্রের সামনে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অপমান করতে গেলাম, করলাম, কই, তখনও কি সেই সুভদ্রকে আপনারা কেউ দেখলেন একবারটিও মাথা তুলতে, তুচ্ছতম কোনো আপত্তিও জানাতে? অত কথায় দরকার কী, এই অপকর্মের কারক যে, আপত্তিটা তো তুলতে পারতাম সেই আমিও, কারণ কর্মটা করতে গিয়ে যতটা সুনন্দাকে নয়, হয়তো তার থেকে বেশি আমি নিজেই নিজেকে অপমান করলাম। এটা তো নিশ্চিত যে যেটুকু নিজেকে নিজে আমি জানি বলে মনে করি, তাতে অন্ধকারে একলা পেলেও কোনো সোমত্ত মেয়ে বা পরনারীকে খপ করে জড়িয়ে ধরতে যাব, এমন উদ্ভট কল্পনা করতে পর্যন্ত আমার অস্বস্তি লাগবে, কর্মটার কথাটা তো বাদই দিলাম, যেটা তো নিশ্চয় করতে পারব না, তেমন ইচ্ছা থাকলেও নয়, অন্তত সেরকম কোনো কর্ম করে বসার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তো আজ পর্যন্ত এ-অধমের ঘটেনি, অর্থাৎ আজকের সভায় এখুনি যা করে বসলাম সেই কর্মটা বাদ দিয়ে। এবং সেইটেই কি সবচেয়ে আশ্চর্য নয়? কারণ এ যা করলাম তা অন্ধকারে নয়, কোনো মেয়েকে একলা পেয়ে নয়, বরং ক্যাটকেটে আলোতেই, পরিচিত-অপরিচিত শত-শত জ্বল-জ্বলে চোখের সামনে। শুধু তাই নয়, কর্মটা করলাম ও তাতে আমার দিক থেকে এতটুকু আপত্তি উঠল না, বিবেকের সামান্যতম কামড় পর্যন্ত না, বরং এত একাগ্র, এত স্পন্দিত, আবেগে এমন কম্পিত হয়েই সুনন্দার স্তনে হাত বসালাম—ওঃ হো হো, হাসব না কাঁদব বলুন তো ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, কর্মটা তো ছেড়েই দিলাম, যেটা তো করলামই আপনাদের চোখের সামনে, সেই কৃত-কর্মের কী-বৃত্তান্তই-বা এখন দিতে বসেছি, সেটাও একবার শুনুন। বলছি সুনন্দার স্তন, বলছি তাতে আমি হাত বসালাম—আশ্চর্য-আশ্চর্য-আশ্চর্য, কোনো জায়গায় বিবেকের কোনো কামড়ই নেই, কথা হল গোমুখ থেকে বেরোনো গঙ্গারই মতো নদী, আটকায় না।

এর থেকে আরো কি একটু এগোব? অনুমতি দেবেন? এবং সে-অনুমতি যদি দেন তো জানবেন যে তখনো যা বলব তা মিথ্যা বলব না। এবং সেটা হবে কী? সেটা হল এই যে সুনন্দাকে বাদ দিন, সুভদ্রকেও বাদ দিন, আমারও লজ্জা বা লজ্জার অভাবটাকে বাদ দিন। ধরুন আপনারাই, এই আপনারা যাঁরা হয়তো এখনো নিজেদের মনে করছেন বিচ্ছিন্ন, যেমন আমাদের থেকে তেমনি এই মঞ্চ হতে, ভাবছেন যা আমাদের জীবনে ঘটেছে ও যার বৃত্তান্ত আমরা দিতে বসেছি এই মঞ্চে, তার সঙ্গে আপনাদের যদি কোনো সম্পর্ক কখনো স্থাপিত হয় তো তা হবে একমাত্র শ্রোতার ও দর্শকের, ধরুন সেই আপনাদেরই মধ্য থেকে কোনো-এক লাগাম-ছেঁড়া যুবক যে-কোনো একটি রমণী বেছে নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ধরুন রমণীটি লাগাম-ছেঁড়া যুবকের এক বন্ধু-পত্নীই

এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারটা নিয়ে যে-সম্পর্কের সূত্রপাত আজ তাদের এই প্রথম, তা ঘটনাটি ঘটার আগে পর্যন্ত উভয়েরই পক্ষে সম্পূর্ণ অকল্পনীয় অপ্রত্যাশিত ছিল—ধরুন তেমন একটা ঘটনা ঘটল বা এখুনি ঘটতে চলেছে, হয়তো আপনাদেরই ওখানকার ঐ অন্ধকারে কোথাও কি চান যদি নয় কেন এই মঞ্চেই, এই ক্যাটকেটে আলোকেই, তখন দেখবেন, হুবহু মিলিয়ে নেবেন আমার কথাটাকে, যা ঘটল এখুনি আমার আচরণের মাধ্যমে, তারই পুনরাবৃত্তি এ-সভায় ঘটবে। এবং সেটা হবে কী, জানতে চাইছেন? দেখবেন, তখন ওরা কেউই আপত্তি করছে না- ছেলে তো নয়ই, কারণ সে-ই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এমন-কি যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হচ্ছে, সে-মেয়েও নয়—শুধু তাই নয়, বাজি রাখতে চান রাখুন, সে-ঘটনায় আপনাদের চোখে চশমাই থাক বা চশমা-বিহীনভাবে হত-বিস্ফারিত-নেত্রই হোন, দেখবেন আপনারাও কেউ টুঁ শব্দটি করছেন না, ওদের থামাতে নিজেদের কারুর কড়ে-আঙুলটিও নড়াচ্ছেন না।

অবশ্য এখানে বলতে পারেন, নিশ্চয়ই পারেন, যে তাই যদি হবে তো কনক-ধ্রুব-বৃন্দাবন আমায় থামাতে গেল কেন? শুধু থামাতে গেল নয়, থামিয়ে ছাড়লও, ছাড়ল না? হ্যাঁ, মানছি—কিন্তু তার জন্যে কি আমি ওদের কাছে খুব কৃতজ্ঞ? বা কৃত কর্মের জন্যে নিজেও খুব আফশোস করছি? এবং সবচেয়ে আশ্চর্য এখানে যা, তা সে-আফশোস যদি নাও করি বা ওদের প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতার ভাব যদি আমার একেবারেই না থাকে, সে-ক্ষেত্রেও কিন্তু তার মানে এটা হবে না যে ঐ একই কর্ম আমি এখুনি হোক পরে হোক আবার-কখনো করতে চাই বা সুনন্দা কি সুনন্দার শরীর নিয়ে আমার একটা দুর্বলতার সূত্রপাত হয়েছে। এবং এটাও খুবই সম্ভব যে যদি একই কর্ম আবার করতে চাই, ধরুন এখুনি করতে চাই, তো তখন হয়তো আগের মতো কনক-ধ্রুব-বৃন্দাবন আর এগিয়ে আসবে না, আমাকে থামাবে না। কেন? কারণ ইতিমধ্যে সময় আরো-একটু উত্তীর্ণ হয়েছে - অবশ্য উত্তীর্ণের চেয়ে অবতীর্ণ বলাটাই এ-অবস্থায় হয়তো আরো সমীচীন হবে- এবং সমূহ সর্বনাশের দিকে আমরা আরো-একটু এগিয়েছি, অথবা আমরা নই, সেই সর্বনাশই আমাদের দিকে আরো-একটু এগিয়ে এসেছে।

যাকগে, সময়টা যেহেতু তাই ক্রমশই অল্প, বোঁ করে বলে ফেলতে হবে যা বলার জন্যেই উঠেছিলাম এই মঞ্চে, ডেকে এনেছিলাম সমবেত এই গ্রামবাসীদের, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও, সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও যা বলা হয়ে ওঠেনি এখনো, বরং বলবার মুহূর্তটা যখনই এসে হাজির হচ্ছে-হচ্ছে বলে অনুভব করেছি, অমনি কে যেন আমাদের গলা টিপে ধরেছে, হয় স্বর একেবারেই বেরোয়নি, বা যা বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ অন্য ভাষণ। ভণিতার পর্ব কত দূর, আর কত দূর হে সূত্রধার মশাই, হে পাত্রপাত্রীগণ, সমবেত হে জনমণ্ডলী! না, আমায় ভুল বুঝবেন না আপনারা এই মুহূর্তে, এবং তেমন ভুল বোঝার ফলে নিজেদেরও জড়াবেন না এক মারাত্মক ভুলে—বলছি, যা ঘটেছে, তার ফলে যদি আমাদের ব্যবহারে বা আচার-আচরণে একটা আমূল পরিবর্তন সহসা লক্ষিত হয়, এই যেমন ধরুন সর্বসমক্ষে আজ আমি সুনন্দার উপর হঠাৎ বলাৎকার করতে উদ্যত হই ও তাতে বিস্মিত কেউ হয় না, আপত্তিও কেউ তোলে না—না সুনন্দা না আমি না তার স্বামী সুভদ্র না আপনারা কেউ—বা যদি সেরকম কোনো কাণ্ড আপনাদের মধ্যেই করে বসলেন কেউ অন্য কোনো নারী নিয়ে বা ধরুন সুনন্দাকেই নিয়ে এবং তা সত্ত্বেও আমরা-আপনারা কেউই কোনো আপত্তি কোথাও তুললাম না, এই যদি হয়, সভ্য বলে পরিচিত নরনারীদের আচরণে এ হেন অদ্ভুত এক বিপর্যয়, তাতে চমকানোর কিছু থাকবে না। বলাৎকার একটা কথার কথা, বিপর্যয়ের একটা উদাহরণ মাত্র—যা বলতে চাচ্ছি, আশা করি তা পরিষ্কার হচ্ছে।

আরে-আরে, ঐ তো সেই শব্দ আবার, না? কিসের শব্দ বলুন তো? নাকি এবারও ভুল

শুনলাম? আপনারা কেউ কিছু শুনলেন? না, এখন আর বাজছে না, কানে আসছে না—একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ, আক্রোশের মতো, রুদ্ধ গর্জনের মতো, যেন দৈত্য-একটা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছিল, কিন্তু উঠতে-না-উঠতেই আরো বড় কোন্ দৈত্য তার গলা টিপে ধরেছে। কী জানি বাবা এ কিসের আভাস!

সময় কম, সমবেত হে ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের সময় আজ ভয়ংকর কম এই সন্ধ্যায়, তিমিরাচ্ছন্ন এই তরাই প্রদেশে— যা বলবার, ফটাফট বলে নিতে হবে। সর্বপ্রথমেই, না, এ-ভুল আমরা করছি না, কিছুতে করব না, তা আমাদের আচার বা আচরণে যে-কোনো সন্দেহেরই সূত্রপাত ঘটে থাকুক-না কেন—না, না, না, তিনশো বার পাঁচ হাজার বার দশ লক্ষ বার না, যা দেখেছি তা যে আমরা সত্যিই দেখেছি, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে না। অর্থাৎ হ্যাঁ, আমরা দেখেছি সেই তুষারহীন শৃঙ্গ একের পর এক, গন্ধকের মতো পাহাড় একের পর এক, বিরাট-বিরাট কুমিরের হাঁ-এর মতো কদাকার গর্তের সারি একের পর এক। এবং সুনন্দা, তুমিও—নাকি আপনি বলেই তোমাকে সম্বোধন করছিলাম এতক্ষণ, হঠাৎ তুমি-তে চলে এসেছি যথোচিত নোটিশ না দিয়েই?—যাকগে, সে-ত্রুটি যদি হয়েই থাকে তো ধরে নিচ্ছি তা তুমি মার্জনা করবে, বিশেষত আজ যখন ঠুনকো লৌকিকতার কোনো মূল্যই আর থাকা উচিত নয়...যাকগে-যাকগে-যাকগে, তবু সুনন্দা, না, তুমিও ভুল করছ না, কিছুতে করবে না, কারণ তোমার ঘটনাটাও সত্য, ঐ বলাৎকার সত্য, ঐ স্বপ্ন সত্য, পৃথিবীর ছাদের উপর ঐ ডুকরে কেঁদে ওঠাটা সত্য। অবশ্য সন্দেহ যেটা তুলি, এই তো কিছুক্ষণ আগেই, তুমি আমি একলাই নই, আমরা প্রত্যেকেই, ও তাই সেই সন্দেহের ভঞ্জনে যে-অতিনাটকীয়তায় মাতি হঠাৎ, তাও সবই সত্য, সমানই সত্য, এবং সেটার জন্য আমরা নিজেদের দোষী সাব্যস্তও করছি না, এমন-কি মার্জনা ভিক্ষা করছি না সেই আপনাদেরও যাঁরা শ্রোতার আসন এসে দখল করেছেন কী-প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে, কী-একাগ্র এক চিত্তে। মার্জনা চাইছি না, কারণ দেখছি তো- দেখছি না?—একই খেলায় ধীরে-ধীরে আপনারাও আমাদেরই মতো সমান খেলোয়াড়, কারণ যে-সন্দেহের প্রসঙ্গ তুললাম, তার অন্তত দুটি-একটি ভঞ্জন আপনারা নিশ্চয় করতে পারতেন, এবং সে-আহ্বানও আপনাদের বারবার জানিয়ে রাখা হয়, তবু টুঁ শব্দটি কেউ তোলেননি, হয় ইচ্ছা করেই, প্রহেলিকার খেলাটা যাতে ঘনীভূত হয় এই বাসনাতেই, নয়তো কে জানে হয়তো সত্যিই যে-সন্দেহ আমাদের গ্রাস করে তা একইভাবে আপনাদেরও আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয়, এবং যার ফলে আপনারাও হয়ে ওঠেন আমাদের অংশ বা আমরাই হয়ে উঠি আপনাদের অংশীভূত, উভয় পক্ষে মিলে তুলতে শুরু করি একটি ঐক্যেরই দ্যোতনা, এবং যেটা কাম্য শুধু এই সভারই নয়, আমাদের মতো সকল পালা-গানের হোতাদেরই নয়, তা বিশেষভাবে কাম্য আমাদের এই সামগ্রিক ও অতি-বিচিত্র অবস্থায় আজ। কেন? কারণ বলেইছি তো, সে-অবস্থাটা যতখানি আমাদের, ততখানি আপনাদেরও, এই ভূমিখণ্ডের সকল অধিবাসীদের। জানি আমি জানি আপনারা বুঝছেন, আমার কথাটা সকলে ধরতে পারছেন, অন্তত একটা আভাস-ইঙ্গিতের বিদ্যুৎ এতক্ষণে চিড়িক-চিড়িক ঝিলিক মারতে শুরু করেছে, আঁতকে-আঁতকে উঠছে রাত্রির দিগন্ত--কী, ঠিক বলছি কিনা বলুন!

না, সন্দেহ তুলেছি, তাতে খেদ নেই, সে-সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমাদের পক্ষের কোনো লোক অথবা আপনাদেরই কেউ যদি এগিয়ে না এসে থাকেন, তার জন্যও অভিযোগ আনা হচ্ছে না কারুরই বিরুদ্ধে। কারণ অবস্থা যা আমাদের, মনে কিসের একটা সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ভাব, যেন জোরের সঙ্গে মুখটা ফাঁক করে বোতল-বোতল মদ গেলানো হয়েছে আমাদের—অবস্থা যখন এই, তখন কখনো-কখনো যদি কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তা নিয়ে সন্দেহ জাগে, ছায়াকে ভুল করে বসি শরীর বলে বা শরীরকে ছায়া, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, বরং সে-সন্দেহ ওঠাটাই স্বাভাবিক। তবু

সে-সন্দেহ শুধু ক্ষণেকেরই জন্য, কারণ যা ঘটেছে তা শুধু ঘটেছেই নয়, তার তীব্রতা এত সুদূর-প্রসারী, প্রচণ্ডতা এত ভয়ানক, যে তার দুঃসহ অনুভব অচিরেই দম-দম দামামা বাজাতে-বাজাতে ফিরে আসে, সব মিথ্যার আবেশ মুহূর্তে লুপ্ত করে প্রকট বিকট সত্য অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে।

এই কনক, এই বৃন্দাবন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আমায় একবার ধর্। গলাটা শুকিয়ে আসছে কেন বল্ তো হঠাৎ? কী-এক ভয়ে গা শিরশির করছে, চোখের চাউনিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে! এটা কি তবে আমার একলারই হচ্ছে, না তোমাদেরও সকলেরই? ভদ্রমহিলাগণ, ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনারাও কি কেউ কিছু অনুভব করছেন, আপনাদের শরীরের অথবা মনের ভিতর? কোথায় গেলে তুমি সুনন্দা, এসো, এসো তোমার প্রেমের ফল্গু নিয়ে এসো, তপ্ত তটিনীর স্পর্শ দাও—কুলুকুলু জলের স্বর, আশপাশ ধ্বনিত এক মুগ্ধতার সংগীতে—কই, বাজাও বাজাও সে-বীণা। অথবা মাতৃরূপী কল্যাণী কে কোথায় আছো, রক্ষা করো এবার আমায় তোমাদের আলিঙ্গনে, যা বলতে এসেছি বলতে দাও। আরো-আরো-আরো, তবু গলাটা কাঠ হয়ে আসছে যেন কেন-কেন-কেন, বলতে পারো ধ্রুব?

আমার মনে হয় অবস্থা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগে এখুনি-এখুনি একটা-কিছু না করলেই নয়, আমার মনে হয় এভাবে আমার একলা-একলা লাফানো-ঝাঁপানোর থেকে কিছু সমবেত প্রচেষ্টার দরকার, যাতে একে বল দিই অন্যকে, রুখতে বাঁধ বাঁধি, সারে-সার কোমর বেঁধে দাঁড়াই। আমার মনে হয়, এখুনি সংলাপ শুরু করা উচিত, হয়তো কথোপকথনে জিনিসটা বেরিয়ে আসবে—কী গো, তোমরা তবু প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়েই থাকবে। একটা কিছু বলো, বলো-বলো, কী কনক?

—এতক্ষণ ধরে এত কথা তো বললাম আজ, এত তো কথোপকথন হল, তবু জিনিসটা কি বার করতে পেরেছি?

—পারিনি, মানছি, তবু চেষ্টার দরকার, বিশেষত সময় যখন আর নেই বলে মনে হচ্ছে।

—কিসের একটা গর্জন যেন এগিয়ে আসছে, একটা গোঁ-গোঁ শব্দ।

—তবে তুমিও শুনেছ?

—হ্যাঁ, শুনেছি, সকলে শুনেছে।

—তবে কথাটা দুম করে বলে বসি?

—বলতে পারবে মনে করছ?

—ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলতে হবে।

—তা তো হবেই।

—কারণ একেবারে সত্য কথাটা বলার সাহস নেই, আমাদের দেশে আজ কারুরই নেই।

—আমাদের পিতৃস্থানীয়েরা তাঁদের প্রজ্ঞা হারিয়েছেন।

—আমাদের যুবকরা তাদের অন্ডকোষ হারিয়েছে।

—আমাদের মায়েরা আজ দুধ বলে বিষ এগিয়ে দিচ্ছেন।

—কোন্ নরের প্রভাবে এমন হল?

—নাকি কোন্ নারীরই প্রভাবে এমন হয়েছে?

—চমৎকার, প্রশ্নতেই দ্বন্দ্ব তুলে প্রস্তাবনাটি ঠিকমতো পাড়া গেল। শুনছেন ভদ্রমণ্ডলী, আপনারা দেখছেন সব, বুঝছেন তো? সে-ব্যাটা নর, না সে-বেটী নারী, তা পর্যন্ত বলতে পারছি না, অর্থাৎ স্পষ্ট করে বলতে সাহস পাচ্ছি না—ভাব দেখাচ্ছি, নর বা নারী, সেটা যেন জানি না।

—যেটা আসলে হাড়ে-হাড়ে জানি।

—আপনারাও সকলে জানেন।

—অথ সে যদি নর হয় তো এবার তার দেহবর্ণনা।

—কিন্তু যদি সে নর না হয়?

—তো তখন নারী হিসেবে না-হয় দেওয়া যাবে তার অন্য দেহবর্ণনা।

—কিন্তু যদি নারীও না হয় সে?

—হয় নর, নয় নারী, এ-দুয়ের একটা তো সে হবেই।

—নপুংসক হতে পারে না?

—হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, যদিও না-হওয়াটাই স্বাভাবিক।

—কেন?

—নপুংসকের এত বড় দাপট হতে পারে না। এ যে-মানুষ, একে হতেই হবে এক সত্যিকারের পূর্ণ লিঙ্গ, হয় শিশ্ন, নয় যোনি —শিশ্ন তো শিশ্নই, যোনি তো যোনিই।

—শিশ্ন না-হয় বুঝলাম, কিন্তু যোনিরও হবে এত বড় দাপট?

—ব্বাবা, বলছ কী, হবে না? তেমন-তেমন দাপট যদি একবার হয় যোনির তো সে-দাপটের সামনে দাঁড়াবে ভাবছ কোনো শিশ্নেরই লম্ফঝম্প?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ সত্যিই তো, শক্তি, আদ্যাশক্তি, দুর্গা।

—কেন, কালীমূর্তি?

—সত্যিই তো, কালীমূর্তি, বেচারা শিব পায়ের তলায় কুপোকাত।

—তো আরম্ভ করা যাক সেই যোনিরই বর্ণনা দিয়ে?

—নাকি সমীচীন হবে শিশ্ন দিয়েই শুরু করা?

—প্রশ্ন-প্রশ্ন-প্রশ্ন—এত প্রশ্ন কেন, যখন সব উত্তরই জানা? অতএব এবার আমরা হাসব না কাঁদব, তা বলে দিন হে ভদ্রমণ্ডলী।

—আচ্ছা ধরো নর নয় নারী নয় নপুংসক নয়, ধরো সে ব্যাঘ্র—হতে পারে না?

—কেন হতে পারে না? হওয়ালেই হবে। অন্তত আলংকারিক অর্থে তো খুবই হতে পারে। সে ব্যাঘ্র হবে হোক না, বা ধরো সে সিংহই হল...

—কি ব্যাঘ্রী বা সিংহী হল...

—হস্তী-জলহস্তী-গণ্ডার হল...

—কুমির বা কেউটে সাপ হল...

—সাপিনী হল...

—কিন্তু ইঁদুর সে হবে না।

—ওরে বাবা, ইঁদুরের হবে ঐ দাপট? না-না-না, কিছুতে না।

—ছুঁচো সে হবে না।

—ঐ দাপট ছুঁচোর? না-না-না, কিছুতে না।

—ঝিঁঝিপোকা সে নয়...

—পিঁপড়ে সে নয়...

—কাঠপিঁপড়েও নয়।

—তো কোন্ দেহের বর্ণনা করব আমরা?

—অথচ সেই বর্ণনা হওয়া উচিত কত সহজ, কত অনায়াসলভ্য...

—যেহেতু সে-দেহের সঙ্গে আমাদের চোখের পরিচয় আজকেরই নয়...

—অনেক দিনের।

—আর আজ তো সে-দেহ ক্রমশই বেশি চোখে পড়ছে...

—ক্রমশই একমাত্র তাকেই চোখে পড়ছে...

—সর্বত্র চোখে পড়ছে...

—তার ছবি ঘরে-ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে...

—রাস্তার ফটকে-ফটকে...

—সভায়-সভায়...

—সংবাদপত্রের প্রতিটি পাতায়-পাতায়...

—তারই মাহাত্ম্য-কীর্তনে মুখর এ-দেশের আকাশ-বাতাস...

—চন্দ্র-সূর্য...

—আপামর জনসাধারণ।

—কীর্তন মাহাত্ম্যের, না অন্য কিছুর?

—অন্য কিছুর মানে? কীর্তন একমাত্র মাহাত্ম্যেরই হতে পারে। তোমায়-আমায় নিয়ে কেউ কখনো কীর্তন করবে না ধ্রুব, তা তেমন ইচ্ছা তোমার বা আমার থাকুক বা না-থাকুক।

—তবে কি কীর্তনই সেটা, অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই?

—নিশ্চয় কীর্তন, সর্বক্ষেত্রেই কীর্তন, একমাত্র কীর্তন। কীর্তন ভিন্ন অন্য কিছু করতে চাও-না দেখি একবার, চেয়ে নিজেই দ্যাখো-না কত ধানে কত চাল!

—মানে?

—আহাহা, কবে থেকে শ্রীমান কনক ন্যাকার শিরোমণি তুমি হলে। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না, না?

—মানে?

—মানে করে একবার দ্যাখো-না ঐ কীর্তন ভিন্ন অন্য কিছু, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে না? আছো কোথায়?

—কিন্তু ধরো কীর্তন করলাম না, আবার কীর্তনের উল্টোটাও করলাম না, তখন?

—অর্থাৎ চুপ করে রইলে, এই তো?

—হ্যাঁ, যেমন চুপ থাকে কুমিরকে পেটে নিয়ে শান্ত সরোবর।

—অর্থাৎ ভেতরে যা-ই ভাবো না-ভাবো, বাইরে কিছু বলছ না, এবং বলছ না বলেই মনে করছ বোবার শত্রু নেই, এই তো?

—ধরো সেইটেই হল।

—তো সেক্ষেত্রেও উত্তরটা তোমার আগে থেকে জানা, প্রশ্ন তুমি তুলছ প্রশ্ন তোলার জন্যে। এই নিছক আদিখ্যেতা তবে কেন শ্রীমান কনক?

—সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে।

—আহাহা, তাঁরাও যেন জানেন না!

—জানেন?

—নিশ্চয় জানেন। কারণ ঐ একই কসরত তো আমরা সকলেই করছি।

—কোন্ কসরত?

—বোবা সাজার, কিছু না বলে পার পাওয়ার।

—তবে সে-পারটা আমরা পাচ্ছি, এখনো পেয়ে চলেছি?

—হ্যাঁ, অতি কষ্টে-সৃষ্টে। তবে সে-সময়ও নিশ্চয় শেষ হয়ে আসছে, ঘোড়া ছুটছে তুফান

বেগে, দরজায় পৌঁছে গেল বলে।

—কোন্ সময় শেষ হয়ে আসছে?

—বোবার সময়। নীরবতা হবে শত্রুতার সামিল।

—ঐ শব্দ, আবার শব্দ—শুনছ শুনছ? আপনারা শুনলেন?

—আবার শব্দ, কিসের শব্দ?

—কিসের শব্দ? বোধহয় জানি ওটা কিসের শব্দ।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ আমরা জানি, মনে হচ্ছে এতক্ষণে জানি, নিশ্চয় জানি।

—কারণ কী হতে পারে না-পারে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ আর বেশি একটা নেই।

—সম্ভাবনার সংখ্যা এক-দুই-তিন করে ক্রমশ কমে আসছে।

—শেষে যেটা অনিবার্য, একটি একক ঘটনা আগামী কালের, একমাত্র সেইটাই কটমট করে দৈত্যের মতো তাকাচ্ছে আমাদের চোখে।

—এখন বাঁচতে যদি চাও, পালাও-পালাও, যেখানে পারো, যেদিকে পারো।

—দূর! পালাবি কোথায়? কার সাধ্য আছে অতিক্রম করে এই মৃত্যুর হাত!

—হাতের নখগুলো দেখছ? দেখছ শিরাগুলো কেমন ফুলে-ফুলে উঠেছে?

—এ-শব্দ যখন প্রথম শুনি, সেই অস্ফুট প্রথম বার, একবার শুনেই আবার নীরবতা, এ-শব্দ যখন সেই প্রথম শুনি, মনে হয় কোথাও পাড় ধসে পড়ছে।

—ধসে পড়ছে নয়, ধসে পড়ল, একটা পাড়, কোথাও, একবার।

—হ্যাঁ, সেবার ছিল ঐ একটা পাড়েরই ধসে পড়ার শব্দ। পরেই আবার চুপচাপ।

—এর মধ্যে প্রলয়ংকরী নদী এগিয়ে চলেছে, আবার পাড় ধসেছে।

—সেই দ্বিতীয় বার।

—পরে একটা তৃতীয় বারও আসে, না?

—হয়তো একটা চতুর্থ বারও।

—হয়তো এক পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম বারও।

—আর এখন তো মনে হচ্ছে কোনো বারের প্রশ্ন নেই...

—আর নেই, ক্রমশই নেই...

—এ এক অবিচ্ছেদ্য সংগীত

—সংগীত নয়, একটানা গর্জন...

—ধীর হতে জোরে, দূর হতে কাছে, এগিয়ে আসছে এগিয়ে আসছে, ক্রমশই এগিয়ে আসছে এক হুংকার...

—ধপাধপ পড়ছে পাড়...

—পাড় নয়, পাহাড়...

—এবং কোন্ পাহাড়?

—দেবতাত্মা হিমালয়।

—ঐ লক্ লক্ করছে জিভ রাক্ষুসীর, তার নাসারন্ধ্র হতে নির্গত হচ্ছে বিষের নিশ্বাস...

—আকাশে-আকাশে মেঘে-মেঘে নাচছে তার সর্বনাশের আলুলায়িত কুন্তল...

—ঐ আসছে-আসছে-আসছে, গ্রাস করে ফেলল বলে আমাদের...

—এই কনক, বৃন্দাবন!

—এই ধ্রুব, লোকনাথ, সুনন্দা, সুভদ্র!

—অথবা আরো এমন কত নাম যারা এখন এখানে নেই...

—এবং যারা আছে, যাদের নাম এখনো জানি না...

—ব্যস ব্যস ব্যস, সময় কম, যা বলার আছে বলে ফেলো...

—ঐ-ঐ-ঐ, আবার ভয় ধরছে, কথা বেরোচ্ছে না, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে...

—ভয় নয়, ভয় ছিল কিছুকাল আগে পর্যন্ত, এখন তা সহজাত প্রবৃত্তিতে দাঁড়িয়ে গেছে...

—যেন একটা পথ, যাতে চলছি-চলছি, পরে সামনে হঠাৎ এক পাঁচিল, এক বিরাট পাঁচিল, যাতে চলাটা বন্ধ না করে উপায় নেই...

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক সেইভাবেই আমাদের কথা যাচ্ছে একটা বিন্দু পর্যন্ত, পরেই, আসল নামধাম জানানোর মোক্ষম মুহূর্তটি এলেই, আপনা থেকেই মুখ বন্ধ...

—তখন আমরা একে-অন্যের মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করি...

—চোখে-চোখে দৃষ্টি চালাই...

—এবং কী-সাংঘাতিক বোঝাপড়া সেই চাউনিতে...

—জানি আমরা পরস্পরে, কোথায় আটকে গেলাম, কেন আটকে গেলাম।

—ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, দেখলেন-না আপনারা ঠিক সময়টি আসতেই কেমন কৌশলে চেপে গেলাম, কেমন বলেও বললাম না সে নারী না পুরুষ, নপুংসক না কীটপতঙ্গ।

—এত ভয়, এ-কী আশ্চর্য এক ভয়...

—অথবা যা ছিল ভয়, কিন্তু আজ যা সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র, অর্থাৎ স্বভাবের অঙ্গ, ভয় আমাদের আজ সেই একটি স্বাভাবিক ভাব।

—তাহলে বলা কি হবে না?

—বলা হবে না? যখন বন্যা এগিয়ে আসছে, মরণ দু'হাত দূরে গর্জাচ্ছে, দেখছি ক্রমশই বড় হচ্ছে অন্তিম এক অনন্ত আঁধারের মতো কোন্ রাক্ষুসীর কৃষ্ণ-করাল হাঁ?

—এই-যে বাগ্‌দেবীর এত বন্দনা করলাম, এমন শেষ মুহূর্তেও কি তিনি আমাদের সহায়ে আসবেন না, একটি বারের জন্যেও না?

—তাঁর জন্যে আমরা অর্ঘ্য বয়ে বেড়িয়েছি উষসী প্রান্তরে, মরু-কান্তারে...

—আমাদের অস্থিতে নিহিত আর্তিকে শোনাতে চেয়েছি তাঁর আবাহন-মন্ত্রটি...

—তাঁর কৃপায় উচ্চারণে ধন্য হয়ে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছি এক তিমিরান্তিক প্রভাতে...

—শেষে সকলই কি বৃথা যাবে?

—বৃথা যাবে এই পরম মনুষ্য-জন্মও, জীবনও?

—পরম না ঢেঁকি, হ্যাক্ থুঃ! মানুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না আমাদের?

—কিন্তু আমরা কী করেছি? আমাদের তো দোষ নেই।

—দোষ নেই মানে? খুব দোষ আছে, সমস্ত দোষ আছে, হয়তো একমাত্র আমাদেরই দোষ আছে।

—সে কী, যে আসল দোষটা করল, করে চলেছে, সে কেউ নয়, কিছু নয়? সব পাপী আমরাই?

—হাড়িপা কী বলেছিলেন, মনে পড়ে?

—তিনি কি সত্যিই কিছু বলেছিলেন?

—আবার সন্দেহের ধোঁওয়া ছাড়ছ? এই যখন মৃত্যু গর্জে আসছে, দেখছি তার শাণিত-ঝলকিত নখদন্ত উদ্যত আমাদের দিকে?

—বেশ, হাড়িপা কী বলেছিলেন?

—বলেননি, এ-পাপ আমাদের সকলের পাপ, আমাদের এই সমস্ত স্থানের পাপ, এই আমাদের আকাশের-বাতাসের পাপ, আমাদের এই সমস্ত সময়ের পাপ?

—আর ও?

—কে?

—যে আসল কাণ্ডটা করছে?

—ও তো নিমিত্ত মাত্র, ও আমাদেরই পাপের এক সম্মিলিত সংহত মূর্তি।

—হাড়িপা বলেছিলেন?

—বলেননি?

—হ্যাঁ, তবে হয়তো আমাদেরই পাপ, অন্তত আমাদেরও পাপ, ওর একলারই নয়।

—বুঝছ না, আমরা তো ওকে করতে দিচ্ছি, এই আমরাই তো ওকে সব করতে দিলাম, আমরা না করতে দিলে ও করতে পারত?

—এই আমরা, এই কয়েকটি মুষ্টিমেয় তীর্থযাত্রীরা?

—হ্যাঁ নিশ্চয়, কারণ সেই আমরাই অন্তর্গত এক বহুগুণে প্রকাণ্ডতর আমরার, যারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এই বিরাট ভূমিখণ্ডের দিকে-দিগন্তরে দেশে-দেশান্তরে। যে-এক অলৌকিক পুণ্য-বৃক্ষটি ছিল আমাদের উদ্যানে...

—ফলে-ফুলে-পাতায়-পাতায় সজ্জিত...

—সকাল কিংবা দুপুর-কিংবা বিকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি ধরে মহাকাশের আলো যার উপর নানান রশ্মি ফেলেছে...

—অকল্পনীয় ভূমার সেই নানা রঙের এক অবিচ্ছিন্ন আদর...

—লোকটা...

—না মেয়েটা?

—না নপুংসকটা?

—না সিংহটা বা ব্যাঘ্রটা কি ব্যাঘ্রীটা-সিংহীটা?

—যাই হোক, উত্তর তো একটাই আছে, যে-উত্তর আমরা জানি, জানে এ-সভায় প্রতিটি জন, আমাদের কথা বলার বা নীরবতার প্রতিটি ক্ষণ...

—জানে অদূরের ঐ বন, আরো দূরের তিমিরগ্রস্তা শিলা-উপশিলা...

—যা সকলই এখন ভাঙছে...

—দুমদাম শব্দে ধসে পড়ছে...

—যাকগে যাকগে যাকগে, আপাতত লোকটাই বলা যাক তা যে যার কর্মের ফলে এত কাণ্ড হচ্ছে...

—অর্থাৎ নারী নামে তাকে অভিহিত করা নয়, বা নপুংসক নামে নয়, কীট-পতঙ্গ হিসেবে নয়?

—নয় নয় নয়...

—যদিও আসলে নারীই হয়তো সে, বা নপুংসকই হয়তো সে, বা কীট-পতঙ্গই হয়তো সে...

—বা এ-সবের কোনোটিই নয় সে...

—বেশ তবে লোকই বলা যাক...

—যেহেতু লোকই হয়তো সে...

—অর্থাৎ পুরুষ?

—হয়তো।

—হয়তো নয়ও?

—আঃ, একই প্রশ্ন বারবার? আবার? যখন উত্তরটা সকলেই জানে?

—বেশ, তবে লোকই হল। কী করল সেই লোকটা, কী করছে সে?

—সে তখন সেই অলৌকিক পুণ্যবৃক্ষটিকে আমাদের উদ্যানের...

—দাঁড়াও-দাঁড়াও। তখন মানে? কখন?

—এই তো কিছুদিন আগে...

—কয়েক দিন আগে?

—হতে পারে কয়েক দিন আগে, কি কয়েক মাস আগে ..

—কয়েক বছর আগে?

—হতে পারে, জানি না। হয়তো কয়েক বছরই আগে তবে। কিন্তু তার সেই মারটা, সেই প্রথম মারটা...

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, কোন্ প্রথম মারটা?

—আগে বলতে দাও, নইলে আমার সব গুলিয়ে যাবে—সময়ও আর বেশি নেই।

—বেশ ব'লে চলো। কী যেন বলছিলে, লোকটার সেই প্রথম মারটা?

—হ্যাঁ সেই প্রথম মারটা তার, সেটা এল যেদিন অমন হঠাৎ, তখন তা আমাদের সকলের কাছে ঠেকে এত সাংঘাতিক, এত অকল্পনীয়, এত অপ্রত্যাশিত, এত প্রচণ্ড, যে প্রায় একেবারে আক্ষরিক অর্থে আমরা বাক্যহারা হয়ে যাই। একটা স্তম্ভিত অবস্থা সকলের, এবং আমাদের সে-ঘোরটা আজো কাটেনি। তাই সময়ের আর তত হুঁশ নেই। মনে হয় যা ঘটল, তা যেন এই সবেমাত্র ঘটেছে, হয়তো কয়েকদিন আগেই, যদিও আসলে তা হয়তো ঘটে থাকতে পারে কয়েক মাস আগে কি কয়েক বছরও আগে পর্যন্ত, যেমন তুমি বলছিলে। কিন্তু সেই সময়টাও এখানে বড় কথা নয়, বলতে যাচ্ছিলাম অন্য আরেকটা কথা।

—সেই বৃক্ষ? সেই অলৌকিক পুণ্যবৃক্ষ? সেই উদ্যান?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, লোকটার সেই প্রথম মারটা তবে কী হল জানো? জানোই তো—তবু বলি?

—বলো।

—সেই-যে রত্ন-কানন আমাদের, ও হঠাৎ তার নীল-কমলটাকে উপড়ে নিল।

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, একবার বলছ উদ্যান, পরেই বলছ রত্ন-কানন—একবার বললে অলৌকিক পুণ্যবৃক্ষ, পরেই বললে নীল-কমল।

—ওটা একটা রূপক, একটা অলংকার। নানান ভাবে তো বলতে হবে যে-জিনিসটা স্পষ্ট সাদা কথায় বলা যাচ্ছে না।

—ঠিক কথা ঠিক কথা। তাছাড়া আমরা তো জানিই যা বলতে চাচ্ছ। অতএব চলো।

—সেই নীল-কমলটাকে প্রথমে সে ওপড়ালো—তার সেই প্রথম মার। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কী হল?

—কী হল?

—আমরা অন্ধ হলাম, আমাদের চন্দ্র-সূর্য নির্বাপিত হল, সন্দেহে ঝড় উঠল তখন সেই অন্ধকারে, আমরা সকলে প্রিয়জন-পরিজনে বেষ্টিত হয়ে এখনো কি আছি? কে যেন বলে উঠল নেই নেই, আমরা আর নেই...

—অথবা আমরা টিমটিম করে এখনো থাকলেও আমাদের পিতামাতা আর নেই...

—এদেশ আগাগোড়া এক অনাথের দেশ, অন্ধের দেশ, পঙ্গুর দেশ, বাক্যহারাদের দেশ।

—যাক, নীল-কমল তো সে ওপড়ালো, তার পরে?

—পরেও কি সে থামে? সে-বান্দাই সে নয়। ফুল গেছে তো ফুলটা গেল, তারপরে সে ছিঁড়তে শুরু করল একটি একটি করে বৃন্ত, যেন কত যত্নে, কত সংকল্পে, কী-একাগ্র এক অভি-নিবেশে, যেন বঁটি নিয়ে বসেছে, পাশে সাজিয়ে রাজ্যের আনাজের পাহাড়, যেন কুটনো কুটছে...

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ কুটনো কুটছে, গুন-গুন গান ভাঁজিতে-ভাঁজিতে কুটনো কুটছে...

—যেন অনেক দিনের ছিল প্রতিশ্রুতি, অবশেষে আজই সম্ভব হল আয়োজন মহাভোজের, যাতে খেতে ডেকেছে দৈত্যপুরীর আবালবৃদ্ধবনিতাদের...

—সকল রাক্ষস-রাক্ষসীদের...

—এবং সেইসব রাক্ষসরা, রাক্ষসীরা, কেমন তাদের চেহারা?

—কেমন আবার? রাক্ষসদের চেহারা যেমন হয়।

—আগুনের গোলার মতো চোখ, শুষ্ক ফাঁপা পুষ্করিণীর মতো উদর...

—দাঁত যেন তলোয়ার, লকলকে জিভ কত-না নাগ-নাগিনী, নিশ্বাস মধ্যাহ্নে মরুভূমির বাতাস...

—এবং এত বড়-বড় উদর যাদের, এত ক্ষিদে যাদের, কী খাবে সেই দৈত্যরা, সেই রাক্ষস-রাক্ষসীরা?

—খাবে কি, খাচ্ছে তো! এতদিনে ভোজ তো দিব্যি শুরু হয়ে গেছে, দেখছ না?

—আমরা যে অন্ধ হয়ে গেছি।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ আমরা তো অন্ধ হয়ে গেছি, সত্যিই তো, তাই হয়তো দেখিনি, দেখছি না।

—কিংবা হয়তো দেখেও দেখছি না...

—বা হয়তো দেখছি ঠিকই, তা সত্ত্বেও না দেখার ভান করে চলেছি...

—অর্থাৎ খাঁটি অন্ধ বলে যাদের, একেবারে ঠিক তাদেরই দশা।

—বেশ, তবে আমরা সেই দেখেও কি দেখছি না, বা দেখেও কি না দেখার ভান করছি?

—অর্থাৎ কী খাচ্ছে সেই রাক্ষস-রাক্ষসীরা?

—হ্যাঁ, পাত পেড়ে যখন তাদের সারে-সার বসানো হয়েছে, উৎসবের সানাই বাজছে দরজায়...

—সানাই না ঘেঁচু।

—আরে-আরে, হঠাৎ দাঁতে দাঁত চেপে অমন বক্রোক্তি কেন? সানাই বাজছে না? তবে কী বাজছে?

—কিচ্ছু বাজছে না, কিচ্ছু না। হ্যাঁ, আগে একটা কিছু বেজেছিল, গোড়ায়—তবে সেটা সানাই নয়, শঙ্খ নয়, মধুর কোনো ভেরী নয়, শোনবার মতো কোনো ধ্বনিও নয়।

—তবে কি ভাঙা ক্যানেস্তারাই?

—হ্যাঁ, প্রায় কাছাকাছি গেছ—আমি বলব বরং তার চেয়ে এক কাঠি ওপরে। একটা নয়, যেন অনেকগুলো ভাঙা ক্যানেস্তারা, একসঙ্গে। আসলে যা বেজেছিল, তা মরণের ডঙ্কা।

—আর এখন? সেটাও বাজছে না? কিছুই বাজছে না? এই যখন বলছ সারে-সার পাত পেড়ে বসে গেছে অতিথিরা, ভোজ শুরু হয়েছে? খাচ্ছে যারা তাদের জালার মতো পেট, আগুনের গোলার মতো চোখ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ খাচ্ছে ওরা, ঠিকই খাচ্ছে, কিন্তু কিচ্ছু বাজছে না আর, ভালোমন্দ কোনো

শব্দ নেই। নেই নেই নেই শ্রীমান লোকনাথ, নেই। বদলে কী আছে জানো?

—কী?

—এক শ্মশানের নীরবতা। শুনছ না সেই নীরবতাটাকে, শুনতে পারছ না?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ পারছি, আমরা সকলে পারছি। তাছাড়া আর কী শোনার আছে আজ?

—আছে আছে, আজ আছে, আরও কিছু শোনার আছে আজ। শুনছ না?

—ও, ঐ ধস নামার শব্দটা, ঐ ক্রমশই এগিয়ে-আসা বন্যার গর্জন? হ্যাঁ-হ্যাঁ শুনছি, নিশ্চয় শুনছি, একমাত্র সেই শব্দেই কানে এবার তালা। তার মানে বুঝছ বৃন্দাবন, কী হচ্ছে?

—কী?

—ঐ তুমি বললে-না শ্মশানের নীরবতা? এখন সেই নীরবতাটাই দ্যাখো কী-সাংঘাতিক সোচ্চার, ডাক ছাড়তে-ছাড়তে এগিয়ে আসছে।

—এক শ্মশান হতে যাত্রা করে আমাদের সে এবার নিয়ে যেতে চলেছে মহত্তর বিরাটতর বহুগুণে ভয়ংকরতর আরেক শ্মশানের দিকে।

—হ্যাঁ, বললে না তো কী খাচ্ছে? ঐ রাক্ষসগুলো?

—দ্যাখ্-দ্যাখ্ খাচ্ছে, আহাহা খাচ্ছে, দেখুন-দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, কী-খাওয়াটাই খাচ্ছে!

—হাপুস-হুপুস শব্দে, চেটে-পুটে হাতের চেটোর এ-পিঠ ও-পিঠ।

—অমন চাটছে কী, তবে কি পায়েসে পৌঁছে গেল?

—দূর-দূর-দূর, সবে তো কলির সন্ধে—এই তো খাওয়া শুরু হয়েছে মাত্র, পাতে সবে পড়েছে লুচি কি বেগুন-ভাজা। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, ও-উদরে জায়গা অনেক, একটার পর একটা ঐ উদরে এখনো জায়গা অনেক।

—বিরাট গর্ত সেখানে?

—বিরাট-বিরাট, যেখানে ধরতে পারে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড...

—হয়তো ধরবেও...

—নিশ্চয় ধরবে, একে-একে সবই ধরবে ঐ উদরে—দাঁড়াও-না, সবে তো শুরু।

—তবে অমন চাটছে-টা কী, বললে না তো?

—কোনো ডালনা-টালনা হবে, নাকি মাছের কালিয়াই, ইতিমধ্যেই?

—হতে পারে। নিশ্চয়ই কিছু প্রাথমিক ঝোল বা তরল যা পাতে পড়েছে।

—যদিও যা গিলছে বা কামড়ে-কামড়ে খাচ্ছে তা তো দেখাই যাচ্ছে।

—সে কি তবে ঐ রত্ন-কাননের নীল-কমলটাই?

—সেই অলৌকিক পুণ্যবৃক্ষটাই?

—আমাদের রূপক হয়তো একটু বড্ড বেশি দূরে যাচ্ছে, বাড়াবাড়ি হচ্ছে—ভদ্রমহোদয়গণ, মহিলাগণ, হে সমবেত জনমণ্ডলী, অপার কারুণিক সুধিবৃন্দ, কোন্ মুখে আর মার্জনা চাইব আপনাদের?

—থাক-থাক, সে-মার্জনার আর সময় নেই আমাদের, ওঁদেরও নেই—বলো-বলো, তাড়াতাড়ি বলো, কী খাচ্ছে তবে? নীল-কমলটাই? পুণ্যবৃক্ষটাই? নাকি সবে ধরেছে ঐ কমলের পাপড়িগুলো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ পাপড়িগুলো। দ্যাখো-দ্যাখো ছিঁড়ছে-ছিঁড়ছে, কত তৃপ্তিতে দাঁত দিয়ে কুটি-কুটি করছে...

—কুটি-কুটি করছে আমাদের স্বপ্ন, আমাদের স্বাধীনতা...

—এ-পৃথিবী নিয়ে যত সাধ-আশা-আহ্লাদ আমাদের...

—বাস্তবকে সুন্দর করার যত পণ...

—অবাস্তবকে নিয়ে আমাদের যত কল্পনা...

—কুটি-কুটি করছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে না বলার অধিকার আমাদের...

—গিলছে চাটছে-পুটছে কামড় দিচ্ছে আমাদের শৌর্যে বীর্যে সৌন্দর্যের অনুভূতিতে—

—মনুষ্যত্ব নিয়ে আমাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত সম্মানবোধে...

—উঃ-উঃ-উঃ, ঐ কামড় বসালো আমাদের শিশ্নে...

—ছিঁড়ল-ছিঁড়ল টেনে ছিঁড়ে আনল আমাদের যুবকদের অন্ডকোষ...

—জ্বলে গেল জ্বলছে-জ্বলছে আমাদের যুবতীদের যোনির ভিতরটা...

—সুনন্দা সুনন্দা সুনন্দা, ঐ যা হয়েছে তোমার, ঐ যা হচ্ছে তোমার...

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ যা হয়েছে আমার, ঐ যা হচ্ছে আমার। কিন্তু সেটা তো হল আমারই ইচ্ছার ফলে, অন্তত আমার আত্মসমর্পণের ফলে, স্বেচ্ছায়।

—স্বেচ্ছায় তো বটেই, ও-পাহাড়ী লোকটা তো তোমায় জোর করেনি।

—জোর হয়তো প্রথমে করেছিল, অন্তত ব্যাপারটাতে ও-ই নিশ্চয় আগে এগিয়েছিল—কিন্তু সেই আগুয়ান হাতটা ওর, যখন তা প্রথম ছুঁল আমার বুক, ধরল আমার আনত শরীরের সেই ঝুলন্ত মাংসপিন্ডটাকে, সেই বন্য গন্ধের পাহাড়ী সন্ধ্যায়, তখন কই, আমি তো কিছু করিনি, আমি তো সজোরে দূরে সরিয়ে দিইনি সেই হাতটাকে।

—না-না-না, তুমি তো দূরে সরিয়ে দাওনি, হাতটাকে দূরে একেবারেই সরিয়ে দাওনি।

—বরং বেশ ভালোই লাগছিল তোমার, লাগছিল না?

—লাগছিল তো, নিশ্চয় লাগছিল, নইলে কেন আমি ওকে অনুসরণ করতে গেলাম ঐ তাঁবুর ভেতরে? কই, কোনোরকমের কোনো জোর ও করেইনি, এমন-কি কলতলা থেকে ওর পিছু নিই, হাবে-ভাবে সের'ম ইঙ্গিত পর্যন্ত করেনি, একটি বারও না—ও যেই হাঁটতে শুরু করল, আমিও পিছু নিলাম।

—হায়-হায়-হায়, বুঝলে সুনন্দা, এবার বোঝো তুমি সুনন্দা, ঐ যে লোকটা...

—না নারীটা?

—না নপুংসকটা?

—না ব্যাঘ্রটা-ব্যাঘ্রীটা? সিংহটা-সিংহীটা?

—আঃ, আবার সেই প্রশ্ন! লোকটা-লোকটা, বলা যাক লোকটা।

—বেশ-বেশ লোকটা-লোকটা, বলা যাক লোকটা।

—হ্যাঁ লোকটা, হায়-হায়-হায় বুঝলে সুনন্দা, এবার বোঝো তুমি সুনন্দা, ঐ যে-লোকটা আজ আমাদের রত্ন-কাননে...

—ঐ-যে নীল-কমলের পাপড়ি ছিঁড়ছে...

—অলৌকিক বৃক্ষের ডালপালাগুলো সজনেডাঁটার মতো চুষছে...

—বুঝলে সুনন্দা, এক অর্থে ওরও পিছু নিয়েছি আমরা—ঠিক তোমারই মতন, বন্য গন্ধের সেই সন্ধ্যায়।

—এবং সুনন্দা, ঠিক তোমারই মতন হয়তো ভালোও লেগেছে আমাদের, বেশ ভালো লাগছে...

—অন্তত তোমারই মতন, কই, ওর হাতটাকে তো আমরাও সজোরে দূরে সরিয়ে দিইনি...

—যখন ঠিক তোমারই মতন সে-হাত ছুঁয়েছে আমাদের সুবর্ণবর্ণা যুবতীদের আনত শরীরের ঝুলন্ত মাংসপিণ্ডকে...

—খেলা করেছে-করছে সে-হাত তাদের স্তনে-স্তনবৃন্তে...

—কই, দূরে সরিয়ে দিইনি তো সে-হাত যখন তা অসামান্য কৌতুকে কাটতে বসেছে আমাদের বজ্রাংগ যুবকদের একটার পর একটা অণ্ডকোষ...

—দূরে সরিয়ে দিইনি হাত যখন তা আমাদের গলা টিপে ধরেছে...

—আমাদের বাক্য রোধ করেছে...

—অথবা যখন সে-হাত বিষ্ঠার দিকে তর্জনী দেখিয়েছে, দেখিয়ে বলেছে আহাহা দ্যাখো-তো দ্যাখো-তো কী-অভিনব ফুল, এটা হল ফুল...

—তখন আমরাও যেন সত্যের আবিষ্কারের বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করেছি, বলেছি সত্যিই তো, আহাহা দেখি-তো দেখি-তো কী-অভিনব ফুল, এটা হল ফুল...

—পারিজাত ফুল...

—বিষ্ঠা নয় বিষ্ঠা নয়, বলেছি তখন রাম-রাম-রাম, এ-কী চূড়ান্ত মূর্খতা এ-কী অজ্ঞতা আমাদের, হেন জিনিসকে বিষ্ঠা বলে এসেছি এতদিন!

—যখন আমাদের উল্টে বলার ছিল...

—নিশ্চয় বলার ছিল...

—যে কে তুমি মিথ্যাবাদী, ভণ্ড পাষণ্ড অনাচারী, পারিজাত ফুল বলে চেনাতে এসেছ বিষ্ঠাকে?

—অন্তত সেটাও যদি না বলতাম, যদি বলতে না পারতাম, তো চুপ করেও থাকা চলত।

—সেটা অবশ্য আমাদের কেউ-কেউ থেকেছে...

—এখনো থাকছে...

—কিন্তু তারা ক'জন? দু'শোজন? পাঁচশো জন? পাঁচ হাজার জন? গুনতে শুরু করো-না, করেই দ্যাখো-না একবার, দু'মিনিটও লাগবে না—যাবে না তোমার সংখ্যা বহুদূরে, সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পার।

—তাছাড়া সেই মুষ্টিমেয় তাদেরও দলে যারা ছিল, গোড়ায় যারা চুপ করে ছিল, এতদিনে তাদেরও অনেকে মুখ খুলেছে...

—কথা বলেছে...

—কী বলেছে?

—বলেছে নাক মুললাম কান মুললাম, হে বুদ্ধ-খোদাতালা-যীশুখৃষ্ট বা মা-দুগ্‌গো পরমেশ্বরি, শতবার সহস্রবার এই দণ্ডবৎ হলাম। ছি-ছি-ছি, এ-কী আহাম্মক হয়েছি, ফুলকে বিষ্ঠা বলে এসেছি এতদিন!

—বলেছে হায়-হায়-হায়, এতদিন অজ্ঞানে কী-তিমিরান্ধই না ছিলাম! আজ ধন্য হলাম, ধন্য-ধন্য-ধন্য হলাম, আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে জ্ঞানাঞ্জনশলাকায়।

—এবং তখন তারা করযোড়ে নতজানু হয়েছে, যে-গুরুর কৃপায় হেন সত্যের উপলব্ধি ঘটল, তাঁর প্রতি প্রণামের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, বলেছে নমস্কার, পথ দেখানোর জন্যে গুরুকে নমস্কার।

—কিন্তু এ-নমস্কারটা কি সত্যিই শ্রদ্ধায়, না ভয়ে?

—চুপ! আবার আবোল-তাবোল প্রশ্ন যত?

—বিশেষত সব প্রশ্নের সব উত্তরই যখন সক্কলের জানা?

—যাকগে। বেশ, তাহলে বিষ্ঠাকে ফুল বলতে শেখানো হল। এরকম আর কী লিখলাম?

—কথা শোনো ছেলের! প্রশ্নের সুরটা এমন যেন শিক্ষাটা সমাপ্ত হয়ে গেছে!

—হয়নি?

—বা-বা-বা, আছো কোথায়? প্রতি মুহূর্তেই তো শিখছি এমন কত নতুন-নতুন কথা, নিত্যই এরকম কত মিথ্যার মুখোস ছিঁড়ছি, কত সত্য উদ্ঘাটিত করছি...

—আমাদের আগাগোড়া দুনিয়াটাই পাল্টে যাচ্ছে...

—পুরনো অভিধানে জলাঞ্জলি।

—এই যেমন, ধরো বলাৎকার বলে একটি শব্দ ছিল?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ ছিল।

—ওটা কিন্তু বলাৎকার আর নয়, ওর মানেটা বদলে হয়েছে প্রেম। কী সুনন্দা, ঠিক বলছি কিনা?

—হয়তো ঠিকই বলছেন।

—বা ধরো হয়তো সবে সকালে সূর্য উঠেছে, সোনার রঙে পৃথিবী ভাসছে, তোমার ঘুম ভেঙেছে কি ভাঙেনি, এমন সময় বলা-নেই কওয়া-নেই তোমার দ্বারে এক রক্ষী।

—রক্ষী?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ রক্ষী, রীতিমতো রক্ষী। তার হাতে শিকল—তোমার পায়ে পরাবার।

—মানে আমায় ধরতে এসেছে?

—বলা বাহুল্য। সেইরকম কোনো সৎ উদ্দেশ্য না থাকলে কেন সে আসতে যাবে তোমার দরজায় ঐ সাত-সকালে, বিশেষত হাতে লৌহশিকলের মতো একটা ভারী জিনিস বওয়ার কষ্ট স্বীকার করে? কিন্তু না-না-না, তাকে দেখে তুমি বিচলিত হচ্ছ না, একেবারেই না, কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত করছ না, বরং শিকলটা দেখে হাত বাড়িয়ে বেরিয়ে আসছ এমন একখানি গদগদ-মুখ করে যে সাগ্রহে যেন তারই প্রতীক্ষা তুমি করছিলে।

—সে কি, শাস্তি পাওয়ার মতো কোনো অপরাধ করে থাকি আর নাই থাকি?

—চুপ! আবার আবোল-তাবোল প্রশ্ন?

—বেশ বাবা, বেশ।

—এবং তারপর কী কথা হচ্ছে? তোমার কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—বলা বাহুল্য বন্দীশালায়।

—ছি-ছি-ছি, আবার ব্যবহার পুরনো অভিধানের?

—তবে নতুন কথাটা কী?

—তোমায় নিয়ে যাওয়া হল উন্মুক্তদের শিবিরে। পরে পৌঁছনো গেল এক ঘরে—যেমন ঘর হয়ে থাকে ওসব জায়গায়, জানা তো আছে সকলেরই।

—অর্থাৎ জানলা-টানলা বলে বস্তু নেই...

—থাকলেও তা বড়জোর এক বৃহৎ ছিদ্র বই নয়...

—এবং সেটাও ছাদের কাছাকাছি কোনো কোণে...

—ফলে তা দিয়ে ঘরে সামান্য আলো আসে মাত্র...

—অতি সামান্য আলো...

—অর্থাৎ চাইলে যে তা দিয়ে বাইরে তাকাবে, আকাশ দেখবে, সে-গুড়ে বালি...

—কারণ অত উঁচু যে...

—গোড়ালির ওপর ভর করে দাঁড়ালেও তুমি নাগাল পাবে না...

—এবং সে-ঘরে তোমায় প্রথম পেঁাছে দেওয়ার সময় কী করা হল?

—পশ্চাদ্দেশে তোমার প্রচণ্ড এক লাথি মারা হল, সঙ্গে-সঙ্গে সে-শিবিরের স্যাঁৎসেতে দালানের অন্ধকার কাঁপিয়ে অট্টহাস্যে হেসে ওঠা হল...

—আর সেই লাথির বদলে তুমি কী করলে?

—আমি? আমি তখন বললাম বা-বা-বা, কী চমৎকার আদর, কী সৌভ্রাত্রের নিদর্শন—এই না হলে মানুষ আমরা? ধন্য, ধন্য এ-মনুষ্য-জনম।

—এই তো এবার ঠিক বলছ, ঠিক ঠিক। না-না সুনন্দা, হুবহু তোমারই সামিল আমরা হয়েছি, তোমারই মতন আমরাও আমাদের ঐ পাষণ্ড লোকটার অনুসরণ করেছি, পরে গিয়ে হাজির হয়েছি তোমারই মতন এক তাঁবুতে।

—সুনন্দা স্বপ্ন দেখেছে, গর্ভে তার তাড়কাসুর-বকাসুর-বৃত্রাসুর...

—আমাদের ঐ মহাভোজে ওরাই কি বসে যায়নি, ইতিমধ্যেই, পাত পেড়ে সারে সার?

—এ-পাপের ভাগী আমরা...

—কারণ আমরা মুখ বুজে সব সহ্য করেছি...

—কখনো তো মুখ খুলে সরাসরি মদৎও দিয়েছি...

—যখন ও ছিঁড়েই চলেছে পাপড়ি একের পর এক, পাপড়ির পরে ধরছে বৃন্ত, বৃন্তের পরে ডাল, ডালের পরে পাতা, পাতার পরে গুঁড়ি, গুঁড়ির পরে শিকড়...

—কী ভয়াবহ জেদ, কী আশ্চর্য নিষ্ঠা, একটি চালের পর ফেলছে অনিবার্য আরেকটি চাল, কোনো ছিদ্র ও রাখবে না কিছুতে কোথাও...

—গাছটাকে ও নির্বংশ করে ছাড়বেই...

—এবং তা আমাদেরই চোখের সামনে...

—এমন-কি নিয়ে পর্যন্ত আমাদেরই নাম...

—যেন এই কর্মে আমরা নিজেরাই দেখেছি আমাদের একমাত্র কল্যাণ, আর তাই যেন তাকে বলতে গিয়েছি যে হ্যাঁ-গো-হ্যাঁ, দয়া করে তুমি এবার এই গাছটাকে ওপড়াও...

—তাকে নির্বংশ করো...

—তার পাপড়িগুলো ছেঁড়ো একের পর এক...

—সেগুলো দাঁতে কেটে কুটি-কুটি করো—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ সত্যি সুনন্দা, বিশ্বাস করো, যেন আমরাই ওকে বলেছি এসব কথা, এবং যেটা হয়তো আমরা সত্যিই বলেছি...

—অন্তত ও তো বলছে আমরা বলেছি...

—এবং নিচ্ছে ন্যায়ের নামও, ধর্মের নামও, পাড়ছে আমাদের সম্পূর্ণ সম্মতির কথা।

—এদিকে যেতে যা দিলাম তা যেতে দিলাম...

—ও যা নষ্ট করছে তা নষ্ট হচ্ছে...

—যদিও হেন পাপী এ-সভায় নেই বা এ-সভার বাইরে যে-কোনো জনপদেও নেই যে জানবে না বা অন্তরে-অন্তরে বলবে না গাছটা ছিল বলেই এ-ভূমিখণ্ড ছিল...

—গাছ ছিল বলেই এ-ভূখণ্ড পুণ্য ছিল...

—সে-গাছ ছিল বলেই আমরা মানুষ ছিলাম, আমাদের স্বপ্ন ছিল, কল্পনায় অবাধ গতি ছিল, এমন সূর্যাস্ত ছিল, হিমালয়ে তুষার ছিল।

—সাবাস বৃন্দাবন, সাবাস সাবাস, মিলিয়ে দিলে দুই বিন্দুকে, যাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিগূঢ় ঐক্য ও সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের অনেকক্ষণই সন্দেহ ছিল না...

—তবু যে-সম্পর্ক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না...

—কিছুতে যাবে না।

—তবু এখনো যদি কুহেলিকা থাকে, কোথাও কারুর বুঝতে অসুবিধা হয়, তাই শ্রোতৃবৃন্দের সাহায্যার্থে আরেকবার স্পষ্ট করে বলো, নাম করে বলো তোমার দুটি বিন্দু কী-কী, কী-সম্পর্কই বা তাদের নিজেদের মধ্যে।

—বলা বাহুল্য, এক বিন্দু হলেন মহামহিমান্বিত নাগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমালয়।

—অর্থাৎ হিমালয়ের মাথায় যে-মুকুট, সেই তুষার।

—হিমালয় মানেই সেই তুষার।

—মানে আজ যা রয়েছে, তা আর হিমালয় নয়?

—নয়-নয় কিছুতে নয়—তা এক গন্ধকের পাহাড়, শুধু ক্রূর শুধু কৃষ্ণ শুধু করাল।

—গন্ধক, তবু কৃষ্ণ?

—ঐ হল আর কি! রঙের নাম দিতে চাও, সে-নাম ওল্টাতে-পাল্টাতে চাও তো কোথাও তাকে বলো কৃষ্ণ, কোথাও বলো পীত, কোথাও বলো লোহিত, এ-খেলায় আমার সাধ নেই। এখানে বা ওখানে তাতে রঙের যে-তারতম্যই থাক, আগাগোড়া ব্যাপারটা এক ক্রূর ও করালেরই যেন অনাদি-অনন্ত দিগদিগন্ত।

—সেখানে করুণার কোনো উৎসই আর সঞ্চিত নেই।

—সেখানে আকাশ-পাতাল গর্ত, কুৎসিত হাঙরের বিরাট-বিরাট হাঁ।

—বেশ, প্রথম বিন্দুটি তো গেল। করো এবার দ্বিতীয় বিন্দুটিরও নামকরণ।

—তিনি হলেন সেই রত্ন-কানন...

—কাননে এক অলৌকিক পুণ্যবৃক্ষ...

—যার শিকড় শত-সহস্র-লক্ষ মানুষের হৃদয়ে...

—অদৃশ্যে নিমগ্ন কোন্ অতলান্ত প্রেমের জলধিতে...

—শিকড়ের অনেক উপরে গুঁড়ি...

—গুঁড়ির উপরে মৃণাল-বৃন্ত...

—পরেই ডাইনে বা বাঁয়ে রেকাবির মতো বিছানো পাতা...

—পরেই, একটু উপরেই, সারা বিশ্বের নয়নগোচর ঐ প্রস্ফুটিত নীল-কমল।

—নীল-কমলের থরে-থরে সাজানো পাপড়ি, যাতে বহু-অধ্যবসায়ে বহু-স্নেহে আচ্ছাদিত-শোভিত-সংরক্ষিত মানুষের এক স্বপ্নের অন্দরমহল...

—আজ যে-পাপড়ি একটার-পর-একটা ধরছে, কুটি-কুটি ছিঁড়ছে, দাঁত দিয়ে কাটছে ঐ পাষণ্ডটা...

—ঐ লোকটা...

—না নারীটা?

—না নপুংসকটা?

—না ব্যাঘ্রটা-ব্যাঘ্রীটা?

—সিংহটা-সিংহীটা?

—বেশ-বেশ-বেশ, খাসা তো হল দ্বিতীয় বিন্দুটিরও নামায়ন। এবার হে অসমসাহসী,

আমাদের বহু-শ্রদ্ধেয় সহযাত্রী, ঐ দুটি বিন্দুর পারস্পরিক সম্পর্কটিকেও এবার বর্ণনা করে দেখি গাঁ-ভেঙে-আসা এ-কুতূহলী জনমন্ডলীর সামনে, বিশেষত ক্রমশই বেলা যখন পড়ে আসছে আজ, ধ্বংসের ডঙ্কায় কর্ণপটহ কম্পমান—সময় নেই-নেই।

—সম্পর্ক? আমাদের মনে হয়, একটি ঘটেছে বলেই আরেকটি ঘটল।

—অর্থাৎ এর মধ্যে একটা আগে-পরের ব্যাপার আছে?

—আছে, এবং সেই আগে-পরের মধ্যে একটা কার্য-কারণের সম্বন্ধও আছে।

—অতএব তোমার সত্যভাষণের অভিলাষ প্রকটিত করো এবার, বলো কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে কী কার্য, কীই-বা কারণ? জেনো এ-সভার কোণায়-কোণায় যত নীরবতা সঞ্চিত হয়েছে, যত উৎসুক দৃষ্টি ছুটছে এদিক-ওদিক, তারা সবাই তোমায় উৎসাহ দিচ্ছে—যা আছে আমাদের সকলের অন্তরে, তাকে তুমি বাইরে আনো হে ভাগ্যবান!

—আমাদের জীবনে আজ এই তিমির রজনী...

—এই ভয়ংকর শেষ ক্ষণ...

—তাকে দাও মহোৎসবের দ্যোতনা।

—এই, কে কোথায় আছিস? তোমরা কারা এ-মঞ্চে আলোকপাতের নিয়ামক-নির্ধারক? অন্ধকার থেকে উঠে এসো, একবার মুখটা দেখতে দাও, বিশেষত দেখাতে দাও আমাদের মুখটা এ-জনমন্ডলীকে—কোথায় তোমরা, আলো ফেলো, আরো জোরে আলো ফেলো আমাদের কপালের কুঞ্চনরেখার উপর...

—আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত চাউনির উপর...

—আড়ষ্ট-হতবুদ্ধি-অপ্রতিভ আমাদের এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর...

—ঘনিয়ে এলো-যে, অবশেষে আসছে-যে মহোৎসবের মুহূর্ত...

—এবং এ-গাঁয়ে নাটক হলে বা বছরে-বছরে রামলীলার সময় আবহ-সংগীতের ভার নেয় কারা?

—তাদের কেউ-কেউ তেমন নিশ্চয় আছো এ-সভার এখানে-ওখানে, অন্ধকারে মুড়ি-শুড়ি দিয়ে?

—ঢাক-ঢোল কোথায় তোমাদের? একটু বাজাও!

—জোরে-জোরে বাজাও।

—এমন জোরে যাতে ঐ এগিয়ে-আসা বন্যার গর্জন অন্তত ক্ষণেকের জন্যেও চাপা পড়ে যায়, ভাবতে পারি সত্যিই একটা মহোৎসব হচ্ছে আমাদের নিয়ে...

—আমাদের জীবন নিয়ে...

—মহোৎসব হচ্ছে এই জীবনে অন্তত একটি বার, এই শেষ বার...

—জীবনের এই চরম, পরম, শেষ ক্ষণে। বাজাও-বাজাও!

—বাজাচ্ছে না যে! কী করি বলো তো? যদি বাজনা না বেজে ওঠে? যদি ওদের কেউও এগিয়ে না আসে? আমরা কি অপেক্ষা করব তবে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব ঠুঁটো জগন্নাথের মতো?

—দাঁড়ানো-টাঁড়ানোর সময় নেই, শুনছ না মৃত্যুর হুংকার? প্রতি মুহূর্তেই তা এগিয়ে আসছে। চলো আমরা শেষ করি যা বলতে বসেছি, শেষ করি শেষ করি শেষ করি। হ্যাঁ, কোথায় এসে থেমেছিলাম?

—কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে—কী কার্য, কীই-বা কারণ।

—ঠিক ঠিক, তবে উত্তরটা দাও, এসো আমরা দিয়ে ফেলি।

—আগে অলৌকিক বৃক্ষ, পরে তুষার।

—মানে?

—মানে পাষণ্ডটা নীল-কমল ওপড়ালো আগে, পরে হিমালয়ের মাথা হতে অদৃশ্য হল তুষার।

—অদৃশ্য হল না, বলো রূপান্তরিত হল তরল মৃত্যুতে—যে-মৃত্যু এগিয়ে আসছে-আসছে, এই সারা বিশ্বকে গ্রাস করল বলে।

—ঐ হল আর কি। অর্থাৎ কারণ হল বৃক্ষ, কার্য হল তুষার।

—এই সম্বন্ধই তবে দুয়ের মধ্যে স্থাপিত করছি আমরা?

—নিশ্চয় করছি।

—হাড়িপাও করেছেন।

—কিন্তু কোন্ যুক্তিতে খাড়া করা চলে এমন একটা সম্বন্ধ? একটা মানুষের কীর্তি, অন্যটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

—মানুষ প্রকৃতিরই অঙ্গ।

—কিন্তু এখানে প্রকৃতিকেও আমরা করে তুলছি মানুষেরই অঙ্গ, নয় কি? বলছি মানুষ গাছটার সর্বনাশ করল বলেই হিমালয় হতে তুষার অদৃশ্য হল—বলছি তো?

—নিশ্চয় বলছি। এবং যুক্তিতে এমন একটা কথা যতই হাস্যকর ঠেকুক, মনে-মনে আমরা জানি, জানি-জানি নিশ্চয় জানি, এ-প্রত্যয় আমাদের ক্রমশই দৃঢ় যে যা বলছি তা সত্য বলছি।

—আসলে হাড়িপাও তো বলেন ঐ একই কথা।

—হাড়িপা বলেন বলেই যে তা বেশি সত্য হবে আমাদের কাছে তা নয়—তবে হ্যাঁ, কথাটাকে উচ্চারণ তিনিই প্রথম করেন।

—তার আগে ঐ একই কথা ছিল আমাদের মনে...

—প্রথম-প্রথম সন্দেহের আকারে...

—যখন তা হঠাৎ-হঠাৎ ধাক্কা মারতে শুরু করে আমাদের বুকের এ-কোণে ও-কোণে...

—ঠিক যেমন করে বহু দূর হতে ছুটতে-ছুটতে হাঁপাতে-হাঁপাতে আসা পথিক নাড়া দিতে থাকে দরজায়...

—এবং তখন যতই সময় যায়, কথাটাকে আমরা ওল্টাই-পাল্টাই, তাকে দেখি কখনো নিচু হয়ে কখনো উপর থেকে...

—নিরীক্ষণ করি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে...

—এবং যতই তা করি, সে-সন্দেহে ততই দানা বাঁধে, বিদ্যুৎ ছলকাতে থাকে হৃদয়ের গহন অন্ধকারে—মনে হতে শুরু করে, সত্যিই? তবে কি যা ভাবছি তা সত্যি?

—তবু মানছি, তখনো তো অন্তঃসলিলা ফল্গু মাত্র, অর্থাৎ সেই কথা বা সেই ক্রমশই ঘনীভূত সন্দেহ...

—আর হাড়িপাই তাকে বাইরে এনে হাজির করলেন সর্বপ্রথম...

—এবং তিনি কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা কেমন চমকে উঠলাম...

—চকিতা হরিণীর দৃষ্টিতে তাকালাম একে-অন্যের দিকে...

—এবং একের সেই চাউনি অন্যকে বোঝালো তখন যে আশ্চর্য, দ্যাখো কী-আশ্চর্য, আমাদেরই মনের কথাটা বলে দিল বুড়ো?

—হাড়িপা-জুড়িপা-মুড়িপা মুনি?

—তবে হে শ্রুতিধর, কথাগুলো তো বাজছে তোমার কানে—এবার আওড়ে দাও।

—যা বললেন মুনি?

—হ্যাঁ।

—তিনি তখন বললেন অন্ধকার কাঁপিয়ে, গুহার দেয়ালে-দেয়ালে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে, বললেন সারাটা দেশের পাপ, সমগ্র এ-যুগের অভিশাপ, আমাদের জাতির সমস্ত অনাচার আজ একত্রে মূর্ত-সংহত-সংঘবদ্ধ হয়েছে একটি ব্যক্তির মধ্যে, এবং সে-ব্যক্তিটি কেমন?

—কেমন?

—সে এই বিরাট ভূমিখন্ডকে মনে করছে তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে, যেন এ-দেশের লক্ষ-লক্ষ-কোটি-কোটি আপামর জনসাধারণ একমাত্র তারই ক্রীতদাস, সে ভাবছে তার চলার ছন্দে কাঁপাচ্ছে এই সসাগরা ধরিত্রীকে, দম্ভ এমন যে দুয়ো দিতে চায় যেন সূর্যকে পর্যন্ত, এবং তাইতো তাইতো তাইতো যা হয়েছে তা হল।

—কী হল?

—কী হল? দেখিনি সেই ঘটনাটাকে পৃথিবীর ছাদের উপর? এতক্ষণ ধরে কিসের বর্ণনা তবে করছি? এবং সেটা হল, কারণ ঐ হাড়িপা বললেন-না, হেন অনাচার সত্ত্বেও অবিকল থাকবে, এমন মুহূর্ত বড় কম।

—অর্থাৎ তা যাচ্ছে প্রকৃতির নিজেরই নিয়মের বিরুদ্ধে।

—হ্যাঁ, আর তাইতো এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অন্তত এইভাবেই আমরা ব্যাপারটা বুঝছি, আমাদের মতো সকলে বুঝছে।

—আসলে আমাদের জীবনে যে-বিপর্যয়টা হয়ে গেছে, যেটার সঙ্গে সম্পর্ক টানছি ঐ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের, সেটার বর্ণনা কী করে করি? কোন্ ভাষায়?

—ভাষা তো আমাদের নেই।

—থাকলেও যেটুকু আছে, তা মুখে আসছে না।

—মুখে এলেও ভয় তাকে আটকে দিচ্ছে।

—আর তাইতো এত রূপকের আশ্রয় নেওয়া, সোজা সড়ক যা হয়তো ছিল বা এখনো রয়েছে, তা এড়িয়ে ঘুরিয়ে নাক দেখানোর অলি-গলি...

—এবং যা সত্ত্বেও বলা বাহুল্য নাকটা দেখানো যাচ্ছে না...

—কারণ প্রথমত মাধ্যমটা রূপক...

—দ্বিতীয়ত যে-সর্বনাশ হয়েছে আমাদের, সহসা যে-নিঃস্বতার মধ্যে পতিত আমরা, তার সম্যক কোনো বর্ণনা হয়তো সম্ভব একমাত্র দেবতাদেরই কোনো ভাষায়...

—হয়তো তাও নয়...

—অন্তত মানুষের ভাষাতে তো তা সম্ভব নয়ই।

—এই ধরো প্রাণ বা প্রাণবায়ু, যেটা সকল জীবনের একমাত্র স্ব-ভাব, অথচ দ্যাখো যেটা কত-সহজ কত-সরল এক বস্তু, যখন আছে তখন আছে কি না-আছে সে-প্রশ্ন তুমি করছ না...

—এমন-কি যাকে অনুভবও তুমি করছ না...

—অনুভব তুমি করবে কী করে? যেহেতু তারই অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব, তোমার অন্যান্য সকল অনুভবের অস্তিত্ব।

—এবং ধরো সেটা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল...

—পরে তোমায় বলা হল, যেটা হারিয়েছ, এবার সেটার বর্ণনা দাও। পারবে তুমি তখন সে-বর্ণনা দিতে?

—প্রশ্নটা অবশ্য একটু ভুল পাড়া হল, কারণ সে-ক্ষেত্রে সে-প্রশ্ন করা হচ্ছে এমন একজনকে যার কোনো অস্তিত্ব আর নেই।

—যার প্রাণ বা প্রাণবায়ু কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে সে মারা গেছে।

—কিন্তু আমরা তো বেঁচে আছি এখনো।

—হ্যাঁ, তবে সে-বেঁচে থাকা মৃতের অধিক হয়ে। এই কারণেই উপমাটা খাটছে, বরং আমি তো বলব বড় বেশি করে খাটছে, যেহেতু যা হারিয়েছি, তাকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা যদিও নেই, তবু যে তা হারিয়েছি সেটা বুঝতে পারার মতো একটা মন আমাদের মধ্যে এখনো সক্রিয় রয়েছে।

— সক্রিয় ব'লো না, কারণ ক্রিয়ার আর কোনো ভূমিকা নেই।

—তবে কী বলব?

—বলো রয়েছে, হ্যাঁ সে-মন নিশ্চয় রয়েছে, কিন্তু রয়েছে নিষ্ক্রিয় হয়ে—এবং এখন থেকে ক্রমশই ক্রিয়াহীন সেই অস্তিত্ব হবে তার নিয়তি।

—আসলে আমাদের যত কিছু ক্রিয়া, যত স্বাধীন ছন্দ ছিল আমাদের হাঁটুতে-গোড়ালিতে, তা অগস্ত্যের মতো এক গণ্ডূষে আত্মসাৎ করে নিল ঐ ব্যক্তি...

—এবং সেটা সে করল স্বাধীনতার অজুহাত পেড়েই. মানুষকে স্বাধীনতায় আরো মহিমান্বিত করতে যে সে দৃঢ়সংকল্প, কানে তালা-ধরানো শব্দে এ-কথা ঘোষণা করতে-করতেই।

—ঠিক যেন বারাঙ্গনা বহু-গমিতা এক নারী, সে চাইছে নিজেকে খাড়া করতে কৌমার্যের বা সতীত্বের পরম দৃষ্টান্ত হিসেবে। হাসব, না কাঁদব?

—না বৃথাই রাগে জ্বলে-পুড়ে মরব?

—তবে পুণ্যের অজুহাতে পাপ, ন্যায়ের অজুহাতে অন্যায়, ধর্মের অজুহাতে অধর্ম, এ কি শুধু আজই দেখছে এ-দেশ? আকছার হেন ঘটনায় ইতিমধ্যেই নয় কি মুখরিত আমাদের পিতৃ-পুরুষের ইতিহাস?

—সত্য, তবে এবার যা ঘটল, তার তুলনা বিরল। আর তাইতো তুষার গলেছে।

—মানে এ-পৃথিবীর শেষ? এ-ভূমিখণ্ডের শেষ? আমাদের ইতিহাসের শেষ? শেষ সবাই-এর সকল-কিছুর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ?

—না-না-না, হাড়িপা সে-কথা বলেনি।

—না-না-না, আমরাও সে-কথা বলি না, বলব না। সে-কথা আমরা মানব না মানব না মানব না, আর মানব-যে না, আমাদের সেই সংকল্পের নাম দিলাম পূর্ব দিগন্ত, যেখানে উষার শোভাযাত্রা কোনোদিন শেষ হবে না, যেখানে নবারুণ-রশ্মিতে মেঘেরা রঞ্জিত হবে, রঞ্জিত হতে থাকবে।

—আমাদের হেন প্রত্যয়ের ভিত্তি কী? বিশেষত যখন রয়েছি ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে, এসে ঠেকেছি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে?

—ভিত্তি? সে-ভিত্তি যে-কথা বলছে আমাদেরই হৃদয়, ভিত্তি এই চোখের চাউনি আমাদের, যে-চাউনিতে চাইছি একে-অন্যের দিকে। তাছাড়া ভাবছ ও-তুষার অত সহজ পদার্থ? গেল বললেই গেল? চিরকালের জন্যে গেল?

—গেল না?

—নিশ্চয় না। পাপের ধাক্কাটা এত প্রচণ্ড, তাই টাল সামলাতে পারল না মুহূর্ত—ব্যাস, এবং সেই কারণেই এই বিপর্যয়। কিন্তু জানি, আমরা সকলে জানি, ও-তুষার জমা হচ্ছে আবার, অদৃশ্যে-অলক্ষ্যে, কোন্ অনন্ত প্রান্তরের দিকদিগন্ত জুড়ে দিগ্‌নাগেরা শুঁড় তুলে একের-পর-এক নমস্কার

করছে, দিক-দেবতারা স্বপ্নে মেতেছেন, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গমে এগিয়ে আসছেন শুভ্রা রজতশিখরা নিশীথিনীর দল—এবং চোখ যদি থাকে তো তোমরা দেখছ, সমবেত মহোদয়গণ হে ভদ্রমহিলাগণ, আপনারাও দেখছেন, ঐ-ঐ-ঐ, আবার-আবার তৈরী হচ্ছে কী-ভয়ংকর প্লেসিয়ার।

—জাগছে নীল-কমলও ?

—নিশ্চয় নীল-কমলও।

—কই ? কই ? কই ?

—এখুনি নয়, এখনো নয়—এটা সর্বনাশের মুহূর্ত, যে-মুহূর্ত টাল সামলাতে পারল না।

—মানে পরে একদিন অন্য কোনো মুহূর্ত সে-টাল সামলাতে পারবে ?

—পারবে না ? আগামীর সেই একদিন ইতিমধ্যেই শুনছে বীণা-বাদন। বুঝছ না, এখন না-হয় সব বেসামাল হয়ে পড়েছে, কিন্তু পিছনে তো রয়েছে কী-প্রকাণ্ড প্রচণ্ড এক ইতিহাস, এক অনড়-অটল দুর্গের প্রাচীর, রক্ষা-করতে মদত-দিতে সে এগিয়ে আসবে না একদিন ?

—সত্যি তো, কত পুণ্য সে অর্জন করেছে—কত শক্তি তার, কত প্রেম তার, কত স্মৃতি সেই ইতিহাসের।

—কিন্তু আমরা ? এই ধ্রুব-বৃন্দাবন-সুভদ্র-সুনন্দারা ? পুনরুজ্জীবনের সেই মুহূর্তে আমরাও কি থাকব ?

—উত্তর তো জানোই, কেন প্রশ্ন করছ ?

—আমরা থাকব না ?

—কী করে থাকব ? এ-যজ্ঞে আমরা বলি হলাম, আমরাই নিশ্চিহ্ন হলাম। তবে তা সত্ত্বেও সান্ত্বনা এই যে আমাদের শেষই সব কিছুর শেষ নয়।

—মানি না মানি না মানি না।

—কী হল ? অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?

—সে-সান্ত্বনা আমাদের কাছে কোনো সান্ত্বনাই নয়। বীণা বাজল কি বাজল না, নীল-কমল আবার জাগল কি জাগল না, তা জানতে আমাদের ভারী বয়েই গেছে যদি নিজেরাই না রইতে পারলাম।

—ঐ শুনছ গর্জনটা ? শুনছ-শুনছ ? এ-যে বড্ড কাছে মনে হচ্ছে, না ?

—এবার এসে পড়ল এসে পড়ল এসে পড়ল।

—এই আমরা-ভেসে-গেলাম-বলে ভেসে-গেলাম-বলে ভেসে-গেলাম-বলে।

—না-না-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না, আমায়-রক্ষা-করো আমায়-রক্ষা-করো আমায়-রক্ষা-করো।

—ও কী হল সুনন্দা ? হঠাৎ অমন পাগলের মতো দৌড়োদৌড়ি-দাপাদাপি আরম্ভ করলে কেন ?

—আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না।

—মরতে আমাদের হবেই, আমাদের প্রস্তুত হতে হবেই।

—অতএব সুধিজন, বন্ধুজন, হে জগৎবাসী, আসন্ন শেষের এই মুহূর্তে আসুন আমরা আমাদের কর্তব্য স্মরণ করি, কৃতকার্য স্মরণ করি—কর্তব্য স্মরণ করুন, কৃতকার্য স্মরণ করুন।

—না-না-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না।

—আসুন আমরা আমাদের ধ্যানে উপলব্ধি করি, অমৃতের আস্বাদযুক্ত সেই বাতাস যা বইছে বাইরের পৃথিবীতে। বলুন আপনারা বলুন, গঙ্গার যেমন যমুনা, তেমন সেই বাতাসে এবার মিলিত

হোক নিঃশেষে আমাদের প্রাণবায়ু, এ-শরীর ভস্মান্তে পরিণত হোক।

—আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না।

—রে মূঢ়া নারী, অন্ধা-অজ্ঞানা, চাই-না বললেই কি তুই ঠেকিয়ে রাখতে পারবি স্রোত?

—আমার যে সব সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল...

—আমাদের যে সকলের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেল...

—তাড়াতাড়ি-তাড়াতাড়ি! কী চেয়েছি? কী পাইনি?

—হায়-হায় কিছুই-যে মনে পড়ে না—সব-যে কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। হায়-হায়, এদিকে মুহূর্ত-যে আসন্ন, শেষ আসন্ন—বুঝছেন কি সুধিজন-বন্ধুজন, এ-সমবেত জনতার শেষ আসন্ন?

—শেষ আসন্ন এই তিমিরাচ্ছন্ন তরাই-এ...

—শেষ আসন্ন দূরদূরান্ত জনপদে...

—শেষ আসন্ন সকল প্রিয়ার, মৃগনয়নার, সকল প্রেমিকের।

—এ-শরীর ভস্মান্তে পরিণত হোক...

—আমি-মরতে-চাই না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না...

—গঙ্গায় যেমন করে মেলে যমুনা, তেমনি আমাদের প্রাণবায়ু মিলিত হোক মহাকাশের অমৃত-বাতাসে...

—সুনন্দার মতো আমিও মরতে চাই না, আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না ..

—সুধিজন-বন্ধুজন, সমবেত জনমণ্ডলী...

—ধ্রুব-সুনন্দার মতো আমিও মরতে চাই না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না...

—আসুন আমরা আমাদের কর্তব্য স্মরণ করি...

—বৃন্দাবন-ধ্রুব-সুনন্দার মতো আমিও মরতে চাই না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না...

—আসুন আমরা আমাদের কৃতকার্য স্মরণ করি...

—এ-সভায় আমরা কেউই মরতে চাই না এখনো-মরতে-চাই-না এখনো-মরতে-চাই-না...

—কর্তব্য স্মরণ করুন, কৃতকার্য স্মরণ করুন...

—ওঃ-হোঃ-হোঃ, জ্বলে-গেলাম মরে-গেলাম, খোকন-খোকন-খোকন, ঐ তোমার গলা টিপে ধরল পাষণ্ডটা...

—গঙ্গায় যেমন করে মেলে যমুনা...

—ঐ তোমার চোখ উপড়ে আনছে এবার...

—রত্ন-কাননের ঐ নীল-কমল, ওপড়ালো-ওপড়ালো...

—খোকন-খোকন, অথচ দ্যাখো আমি ওকে আটকাচ্ছি না, আমি ওকে কিছু বলছি না, এমন-কি ছি-ছি-ছি, কোন্ লজ্জায় মুখ ঢাকব, সব সত্ত্বেও আমার-যে ভালো লাগছে, আমার-যে ভীষণ ভালো লাগছে...

—কৃতকার্য স্মরণ করুন...

—আমার শরীরে ওর শরীর প্রবেশ করেছে, শতপুষ্পের বৃষ্টি হচ্ছে আমার গহনতম প্রদেশে, আমার স্নায়ুতে-শিরায়...

—মহাকাশের অমৃত-বাতাসে মিলুক আমাদের নিশ্বাস,..

—ওঃ খোকন-খোকন...

—রাখো তোমার খোকন-খোকন! ঢের হয়েছে সুনন্দা, চুপ করো!

—আরে-আরে ধ্রুব, হঠাৎ কী হল তোমার? অমন গাঁক-গাঁক করে চেঁচাতে শুরু করলে কেন? আর নারীর প্রতি এ-কী অপমান-সূচক আচরণ! কই, সুনন্দা তো তোমার কিছু করেনি।

—বেশ করছি অপমান করছি, তোমার তাতে কী! আমার নাম ধ্রুব রুদ্র, আমার পিতার নাম সুব্রত রুদ্র, আমার পিতামহের নাম মন্মথ রুদ্র, আমার প্রপিতামহের নাম কালীকৃষ্ণ রুদ্র।

—তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু তার সঙ্গে...

—তুমিও চুপ করো লোকনাথ! ঐ নেকীর হয়ে ওকালতি আর করতে হবে না। নেকী, নেকী কোথাকার—তখন থেকে খালি ফ্যাঁচ্-ফ্যাঁচ্ কান্না হচ্ছে আর ডাকা হচ্ছে খোকন! খোকন! খোকন! মরণ তোমার।

—আরে-আরে ধ্রুব...

—যা করছি বেশ করছি, বেশি রাগিও না আর—হ্যাঁ, বলে দিলাম। কী-এমন তুমি করেছ খুকুমণি যে এই সভায় আজ তোমার এত আদিখ্যেতা সহ্য করে যেতে হবে? ঐ লোকটার সঙ্গে তুমি শুয়েছ, এই তো? ও যখন তোমার বুকে হাত দেয়, তুমি আপত্তি করনি, এই তো? না-হয় ও তোমার স্তন-দুটোকে ময়দা মাখার মতো করে চটকেছে, এই তো?

—আরে-আরে ধ্রুব...

—চুপ করো যত শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, আমাকে থামিও না—হ্যাঁ, বলে দিলাম। আ-হা-হা-হা, কত ছিরি করে বলা হচ্ছে আমার শরীরে ওর শরীর প্রবেশ করছে, শুনে মরে যাই গো, মরে যাই। বলা হচ্ছে, আমার গহনতম প্রদেশে শতপুষ্পের বৃষ্টি হচ্ছে! নেকীর শিরোমণি তুমি কোন্ বৃষভানু-নন্দিনী এলে গো আজ! শতপুষ্পের বৃষ্টি হচ্ছে! তো হোক-না! সে-বৃষ্টিটাকে তো তুমি নিজেই হতে দিচ্ছ, দিচ্ছ না? এবং বৃষ্টিটা-যে হচ্ছে, তাতে তো তোমার আনন্দের শেষ নেই, ছুনু-ছুনু-সুনু-সুনু-সুনন্দা আমাদের, সুভদ্রের স্ত্রী, তুমি তো তোমার তুরীয় অবস্থায় পোঁছে গেছ তখন, পোঁছোওনি? সে-কথাটা তো নিজেই বলছ বারবার, বলছ না?

—আ-হা-হা তোমার বক্তব্যটা...

—আমার বক্তব্যটা অতি সোজা, লোকনাথ। লোকটা করতে চেয়েছিল, সুনন্দা তাকে করতে দিয়েছে, এবং শুধু মড়ার মতো পড়ে থেকে করতে দিয়েছেই নয়, সে-কর্মে সে নিজেও অতি সক্রিয় এক অংশগ্রহণ করেছে—পিছু নিয়ে তাকে ধাওয়া পর্যন্ত করলি তুই তাঁবুতে, করলি না? আমার কথা হচ্ছে, একটা সোমত্ত ছেলে আর একটা সোমত্ত মেয়ে, তারা স্বামী-স্ত্রী হোক আর নাই হোক, একে-অন্যের পরিচিত হোক বা নাই হোক, এখানে তারা স্বেচ্ছায় মত্ত হচ্ছে নারী-পুরুষের আদিম অনুষ্ঠানে। এবং সেটা যখন হচ্ছে তো তখন তা নিয়ে পরে এই মড়াকান্নাটা কেন? কেন তা নিয়ে বিশ্বসংসারের কান ঝালাপালা করা?

—আমরা কিন্তু এখনো কেউ ঠিক বুঝছি না...

—অত বোঝার কিছু নেই। ব'লে কান ঝালাপালা করার মতো পাপ যদি কেউ করে থাকে এখানে তো হ্যাঁ, সে-পাপ এই আমি করেছি, এই আমি যার নাম ধ্রুব রুদ্র, যার পিতার নাম সুব্রত রুদ্র, যার পিতামহের...

—মানে?

—ধ্যাঃ শালা, বলে ফেলি আজ, আর সময় নেই। এদিকে এ-ব্যাটার ছেলেরা চেঁচিয়ে চলেছে সমানেই, কর্তব্য স্মরণ করো, কৃতকার্য স্মরণ করো—তো বেশ, দ্যাখ্ সকলে দ্যাখ্, শোন্ সকলে শোন্ আমি আমার কৃতকার্য স্মরণ করছি।

—মানে?

—মানে সুনন্দাকে যা করল লোকটা, তা আমি করেছি আমার ভাগ্নীকে, হ্যাঁ-হ্যাঁ এই আমিই করেছি আমার নিজেরই ভাগ্নীকে, অর্থাৎ নিজের দিদির মেয়েকে, এবং যে-মেয়ের বয়স তখন নয় কি দশ। আর আমার বয়স তখন? হা-হা-হা, শোনো তবে পাপের কথা। আমার বয়স তখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টা পরীক্ষা পাশ করেও চাকরি নেই, বাড়ি বসে আছি। এক দুপুরে, ঘরে দরজা বন্ধ করে—আর হ্যাঁ-হ্যাঁ সুনন্দা, তোমারই মতন ঝমঝমে বর্ষা সেদিন। ওকে গল্প বলার প্রতিশ্রুতি দিই আগে, আর তাই দুপুরের খাওয়ার পরে দুজনে ঘরে ঢুকি—এবং ঢুকেই ভূতে পায় আমায়, খিল বন্ধ করি। কোনোদিন ভুলব না মেয়েটার সেই চাউনি।

—চেঁচায়নি?

—চেঁচাতে দিইনি। বেচারা প্রথমে বুঝতেই পারেনি, কিন্তু বুঝল যখন, পালাবার চেষ্টা করে প্রাণপণ। এত ভয় পায় যে কাঁদতে পর্যন্ত পারেনি, কেমন একটা বেগুনি রঙ হয়ে যায় মুখের। বুঝলে খুকুমণি, এ তোমার শতপুষ্পের বৃষ্টি নয়, এই হল পাপ।

—অতএব এই পাপের কথাই তুমি এখন আমাদের জানাতে চাইছ শ্রীমান ধ্রুব রুদ্র?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ এই কথাই আমি তোমাদের জানাতে চাই আজ, আমার এই শেষ ক্ষণে, জানাতে চাই এ-সভার প্রতিটি জনকে, বিশ্ববাসীকে। এই যে-কথা আমি কাউকে বলিনি এতদিন, নিজের ভেতরে চেপে রেখেছি ভয়ংকর এক আতঙ্কে, এক ভয়াবহ যত্নে, যদিও জানতাম আমি সবসময়ই জানতাম বিস্ফোরণের মুহূর্ত আসবেই একদিন-না-একদিন, যখন সে-কথা ছিটকে বেরিয়ে আসবে আমার অন্তরের অন্তস্থল হতে, বিদীর্ণ করে আমার নাড়ী-ভুঁড়ি-পাকস্থলী, অন্ত্র-যন্ত্র-মূত্রাশয়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে আমার সকল সত্তাকে। এবার দ্যাখো সবাই সে-মুহূর্ত এল, অবশেষে কী-সাংঘাতিকভাবে এল আজ এই সভায়—অতএব নেকীর শিরোমণি সুনন্দা তুমি কোন্ বৃষভানু-নন্দিনী, কোন্ ব্রজবালামুকুটমণি, হাত বাড়িয়ে ধরো এবার সেই আমার কিছু ছেঁড়া হাত, হে ভদ্র-মহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, আপনারাও গ্রহণ করুন আমার ভাঙা ফুসফুসের কিছু অংশ, আমার চূর্ণবিচূর্ণ প্রাসাদের গুঁড়ো, কোথাও এক-কণা কার্নিস, কোথাও-বা জানলার পাল্লা। হ্যাঁ সুধিবৃন্দ, এই হলাম গিয়ে আমি ও এমনই আমার কীর্তি, এ-মঞ্চে অপনাদের সামনে নত হই আরো একবার।

—আর সেই ভাগ্নী? সে এখন কোথায়?

—সে মারা যায়, পরের বছরই, কিম্বা হয়তো সেই ঘটনার মাস-কয়েকের মধ্যেই—বসন্ত হয়।

—তার মানে তোমার সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি?

—হয়েছিল, মাত্র একবার। কোনো-একটা বিয়ে-টিয়ে উপলক্ষে—আমাদেরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আমরা যাই, দিদিরাও আসে, এক সন্ধ্যার ঘটনা মাত্র।

—তখন তুমি ব্যাপারটা সহজ করে নিতে চাওনি? ওকে একটু আদর করে, বা ওর সঙ্গে কোনো কথা বলে? হাজার হলেও ছোট একটা মেয়ে বই নয়, তোমার ভাগ্নীও, স্নেহেরই পাত্রী।

—কথা বলব? সে-ফুরসত সে আমায় দেবে মনে করছ? একবার খালি চোখ তুলে তাকায় আমার চোখে, একটি বার মাত্র এবং এক পলকের জন্যে মাত্র, এবং সে-চোখে তখন আমি দেখি ঐ একই চাউনি—ও যেন দেখছে ওর যমকে, মুখটার রঙটাও তখন পাল্টে গেছে।

—হায়-হায়, তার মানে এ-জীবনে তার সঙ্গে আর কোনো বোঝাপড়া হল না তোমার?

—আর সেইটেই আমার চরমতম দুঃখ রয়ে গেল। তোমাদের সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো, আজ যখন এই মরতে চলেছি, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, আমার এই অসহায় শেষ ক্ষণে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঐ-ঐ দেখতে পাচ্ছি ওর সেই মুখটা, সেই চাউনিটা, আঁধার বিদীর্ণ করে তা ভেসে উঠছে যেন হ্রদের উপর কোন্ পাংশু চন্দ্রমার মতো। উঃ-উঃ-উঃ, কী-ক্ষমাহীন দৃষ্টি সেই,

যেন তা গোখরোর ছোবল মারছে আমার সর্বাঙ্গে —জ্বলে-গেলাম জ্বলে-গেলাম জ্বলে-গেলাম!

—উঃ-উঃ-উঃ জ্বলে-গেলাম জ্বলে-গেলাম জ্বলে-গেলাম!

—তোমারও আবার কী হল হঠাৎ সুনন্দা? শান্ত হও বন্ধুজন, যে-তোমরা এই সংকটাপন্ন ক্ষণে আমাদের পরম আত্মীয়স্বজন, যত ছটফট করবে, বেদনাও তত বাড়বে।

—না-না-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না আমি-মরতে-চাই-না।

—ছটফট করে লাভ নেই সুনন্দা, আমাদের শেষ আসন্ন— যে-শেষকে আমরা ঠেকাতে পারছি না, পারব না।

—না-না-না আমার-যে সব অপূর্ণ রয়ে গেল, সব সাধ-আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্তত তার একটা সফল হোক আজ—একটা, শুধু একটা, দুটো নয়, জয় বাবা কেদারনাথ! হে বাবা বদ্রিনাথ!

—সুনন্দা! সুনন্দা!

—আমি-যে কত-কী দেখতে চেয়েছিলাম আমি-যে কত-কী করতে চেয়েছিলাম আমি-যে কত-কী খেতে চেয়েছিলাম! আঃ, সেই জিনিসটা কী-যেন নাম, শুধু একটু চাটতে একটু কামড় দিতে...

—সুনন্দা! সুনন্দা! শান্ত হও!

—সজনে-ফুল, সজনে-ফুল ভাজা খেয়েছ কেউ তোমরা?

—দূর, সজনে-ফুল ভাজা আবার কবে হল? ডালনা, ডালনা।

—কী-যে বকছ তুমি ধ্রুব না? ভাজা-ই তো, সুনন্দা ঠিক বলেছে, সজনে-ফুল ভাজা-ই হয়। খেতে খুব সুন্দর, মনে পড়ছে না?

—ভাজা হয় না রাজা হয়, রাজা হয় না গাঁজা হয়, গাঁজা হয় না মাজা হয়, মাজা হয় না..

—এসব-কী আবোল-তাবোল বকছ ধ্রুব, তোমার হলটা কী?

—সজনে-ফুল না গজনে-ফুল, আসল নামটা আবার গজনেও নয়, মজনে, মজনে—সেই লায়লু-মজনে বলে কী-একটা কাব্য ছিল-না, একটা পিরীত-ফিরীত, একটা আখ্যান-টাখ্যান?

—যাঃ, সজনে-ফুলই তো, আমি ঠিকই বলছিলাম—কেন আপনি আবার সব গুলিয়ে দিচ্ছেন আমার এমন?

—মাগী তোর সব আজ একটু গুলিয়ে দিতে চাই আমি এমন, মাগী তোর দেহটা ধরে গোলাবো আজ, গোলাতে দিবি?

—ছি-ছি ধ্রুব, এসব-কী সাপ-ব্যাঙ বার করে আনছ তুমি তোমার ভিতর থেকে? ছি-ছি-ছি, এইভাবে কি নারীর সঙ্গে কথা বলতে হয়? বিশেষত সুনন্দার সঙ্গে, যে আমাদের সহযাত্রিণী, আমাদের সুভদ্রের স্ত্রী? মানছি আজ আমাদের অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন, কিন্তু তাই বলেই কি আমরা অমানুষ হয়ে যাব, সব ভদ্রতা আমাদের ঘুচিয়ে ফেলতে হবে?

—শাট আপ! আমার বয়ে গেছে তোমার বক্তৃতা শুনতে এখন, দেখছ-না চারিদিকে মৃত্যু ধেই-ধেই করে নাচছে, এই ক্যাঁক করে ধরল বলে আমার-গলা তোমার-গলা। এই মাগী একটু আয়-না কাছে, আরো-একটু কাছে, মাইরি, তোর দেহটাকে আমি বড্ড ভালোবাসি...

—এই ধ্রুব, কী হচ্ছে কী...

—বলব না? বেশ বলব, একশোবার বলব, আজ আমি সত্যি কথাটা বলব। আমি পুরুষের মতো পুরুষ, আমার লিঙ্গ সহস্রনাগ—আমি এ-পৃথিবীর সমস্ত মেয়ের দেহ ভালোবেসেছি, আমি সব নারীর সঙ্গে সঙ্গম করতে চাই, রাস্তায় দিব্যি শাড়ি-পরা ফুলপরী দেখলে যখন মিষ্টি হেসে কথা কয়েছি, তখন তারও আগে কল্পনার চোখে দেখতে চেয়েছি তার যন্ত্রটা, তার গুল্মাচ্ছাদিত

দরজাটা, আর কী ভালো-যে লেগেছে তখন, মরে যাই, মাইরি-মাইরি মরে যাই!

—এই ধ্রুব! ধ্রুব!

—এই মাগী. কী বলিস, অ্যাঁ? তবে আজ হয়ে যাক তোর সঙ্গে একটু? এই সভায়, এই সভা-ভাঙার মুহূর্তে? আমাদের শেষ খেল-টা দেখিয়ে দি. কী বলিস, অ্যাঁ? বেশ আমিই তোকে তবে টানছি, এই দ্যাখ্ ধরলাম তোর হাত।

—হে বাবা কেদারনাথ! জয় বাবা বদ্রিনাথ!

—কী মিষ্টি তোর কথা না! জয় বাবা কেদারনাথ! আবার বল্ আমার কানে-কানে গুনগুন কর্। খুলে তো দিয়েছিলি নিজেকে সেদিন পাহাড়টার সামনে, উৎকট গোপন গন্ধ ছড়িয়ে প্রস্ফুটিতা হয়েছিলি—আজ আমি কী-দোষ করলাম?

—ধ্রুব! কী হচ্ছে কী? এই ধ্রুব!

—জয় বাবা কেদারনাথ! জয় বদ্রিনাথ!

—ছুঁড়ী আর সময় নেই-রে, সময় নেই-নেই—তাড়াতাড়ি-তাড়াতাড়ি। ঐ-ঐ-ঐ, ঐ দেখছি যেন আলো ঝলকাচ্ছে তোর চোখে, এতক্ষণে ঝলকাচ্ছে- কথাটা মনে ধরল তবে. অ্যাঁ? কী, অমন ক্যাঙালীর মতো ওদের দিকে তাকাচ্ছিস কেন? ওদেরও চাচ্ছিস তুই? না-না-না, আমার কোনো আপত্তি নেই, একেবারেই নেই. যদি ওদের না আপত্তি থাকে। কী কনক. আপত্তি আছে? নেই? চমৎকার। বৃন্দাবন? তোমারও নেই? চমৎকার। লোকনাথ? না-না-না লোকনাথ. তোরও আপত্তি নেই, থাকতে পারে না। এসো সুনন্দা, আমরা তবে ঝাঁপিয়ে পড়ি তোমার উপর, তুমিও ঝাঁপিয়ে পড়ো এ-রণাঙ্গনে, আমাদের সকলকে হতে দাও তোমার শিকার। তেই-তা-তা-তা তেই-তা-তা-তা তেই-তা-তা-তা. কী-সাংঘাতিক অন্ত এই পালাগানের রে, আজ আমাদের কী-সাংঘাতিক এই পালা-গান রে! লায়লামজনু. মজনু না সজনু. সজনু না সজনে, সজনে না সজনে-ফুল! তেই-তা-তা-তা তেই-তা-তা-তা-থা!

তবে এই শেষ। এই শেষ, হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, হে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-তারা যারা জানি বিরাজমান আমাদের চক্ষুর অন্তরালে, বিশ্বের ওপারে বিশ্বে, আকাশ হতে আকাশে। যে-দেবতাতে শেষ, যে-দেবতাতে আরম্ভ, যিনি অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি এই সকল বিশ্বভুবন আবিষ্ট করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, আজ মৃত্যুর এই তিমিরাচ্ছন্ন তীরে দাঁড়িয়ে আমরা সেই দেবতার বন্দনা করি।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, সমবেত হে সুধিবৃন্দ, জানি না কী আশা করে আজ এসে-ছিলেন অধমের অধম এই সূত্রধারের কাছে, আমাদের এই পাত্রপাত্রীর কাছে। আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিই অনেক, হয়তো কিছুই রাখতে পারিনি—সব ছাড়িয়ে যা ধ্বনিত হয়েছে, তা আমাদের নিতান্ত অসহায় এই অবস্থা, তা আমাদের অকৃতার্থতা, দীনতা-হীনতা-অমানুষিকতা। জানি না এখনো আছেন কিনা কেউ আমার কথা শুনতে, আসলে নিজে কী বলছি, তা আমার নিজেরই কানে আর ঢুকছে না—এত শব্দ চারিদিকে। প্রথমত, দেখুন আমাদের কতিপয় সহযাত্রীরা কী-দাপাদাপিই-না শুরু করেছে মঞ্চে, অন্তিম মুহূর্ত এল দেখে বেচারাদের আর কোনো কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানই নেই। দ্বিতীয়ত, জানি না, হয়তো আপনাদেরও কেউ-কেউ মাততে চাইছেন ওদের সঙ্গে, যেন ঐ অদূরের অন্ধকারের খোপে-খোপে সভার কোণে-কোণে এখানে-ওখানে রোল উঠতে শুরু করেছে—হয়তো মৃত্যু থেকে পালাতে চান কেউ-কেউ, যদিও জানেন, নিশ্চিত জানেন, যেমন এই আমাদের, তেমনি ঐ আপনাদেরও, আর নিস্তার নেই-নেই। কারণ ঐ এগিয়ে আসে সমুদ্র, শত-লক্ষ জোয়ারের হুংকার, দেবতাত্মা হিমালয় ভেঙে খান-খান।

এবং শেষের ঐ ভয়ংকর শব্দেই, মৃত্যুর সেই একমাত্র ভেরীতেই, অন্য সকল শব্দ ডুবে গিয়েছে। জল এগিয়ে এল, আরো এগিয়ে এল, ঐ তা গ্রাস করল বলে আমাদের।

ধ্বংসের নদী তুমি, করাল জোয়ার, হে রুদ্র, আমরা আজ ভীত, কম্পিত তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দেখাও আমাদের। তুমিই আদি জননী, তুমি গর্ভধারিণী, জানি তোমার সলিলে ইতিমধ্যেই বহন করছ বহু শুক্রের অমোঘ বীজ, তোমার কল্পনায় ইতিমধ্যেই খেলাচ্ছ উত্তরকালের সেই বংশধরদের কত টিকালো নাক, ইন্দ্রধনুর মতো ভুরু, পদ্মপাতার মতো চোখ। জানো তুমি ইতিমধ্যেই জানো প্লাবনের পরে কীভাবে একদিন আবার জাগাবে তপোবন, বিশাল-বিশাল অশ্বত্থ-বট, সূর্যের নিশ্বাসে-ভরা অন্তরীক্ষ।

আমাদের সময় নেই আর, কোনো সময়ই নেই। অতএব সর্বশেষের দশদিক-বন্দনা সারছি একটি কথাতেই, তলিয়ে যাওয়ার আগে মুখ রাখছি পূর্বদিকে, অন্তত পূর্বদিক বলে যেটা মনে হচ্ছে ঐ যেখানে আবার হবে উদয় একদিন, হবেই, পৃথিবীর মুকুটে তুষার উষার কমলালেবু-রঙ মাখবে।

এই, তোরা চুপ কর্- দাঁড়া সোজা হয়ে, প্রার্থনার ভঙ্গীতে।

[সমাপ্ত]

প্রয়োজন, ইচ্ছা ও উপায়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আসল কথা, প্রয়োজন ও উপায়-উদ্‌ভাবনার পারস্পারিক সম্পর্ক ইতিমধ্যে—সর্বক্ষেত্রে না হোক, অনেকক্ষেত্রেই—পালটে গেছে। অনেকজনের জীবনে প্রয়োজন অনুভূত হবার আগেই কোনও উপায়ের উদ্‌ভাবনা যে ইতিপূর্বে কদাচ ঘটেনি, তা অবশ্য নয়। তবে সেটা ছিল ব্যতিক্রমের ব্যাপার। উপায়ের উদ্‌ভাবনা সাধারণত বহু-মানবের প্রয়োজনের সূত্র ধরেই ঘটত। অর্থাৎ কোন-কিছুর অভাব ব্যাপক-ভাবে অনুভূত হবার পরে তবেই তাকে মেটাবার পন্থা খোঁজা হত। উদ্‌ভাবিত হত নতুন কোনও উপায়। একালে তেমন হয় না। বস্তুত, তার বিপরীত ঘটনাই আমরা প্রায়শ প্রত্যক্ষ করি। দেখতে পাই যে, উদ্‌ভাবনার কাজটা অনেকক্ষেত্রে আগেভাগেই সমাধা হয়ে যাচ্ছে। তারপর—উদ্‌ভাবিত বস্তুটিকে যাতে অনেকজনে সংগ্রহ করতে উদ্‌গ্রীব হয়, তার জন্য—চলছে প্রয়োজনসৃষ্টির চেষ্টা।

ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি, তাহলে অবশ্য প্রয়োজন ও উদ্‌ভাবনার এই স্থান-বদলের ব্যাপারটাকে, এবং উদ্‌ভাবনার কাজটা আগেভাগেই সমাপ্ত হবার পরে প্রয়োজনসৃষ্টির এই চেষ্টাটাকে খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরা যাক, দাড়ি কামাতে আমাদের মোটামুটি মিনিট-পাঁচেক সময় লাগে। বিজ্ঞানী সেক্ষেত্রে এমন একটা উপায় উদ্‌ভাবন করলেন, যার সাহায্যে প্রাতঃকালীন ওই শ্মশ্রুমোচনের কাজটা—পাঁচ মিনিটের বদলে—এক মিনিটে সমাধা হওয়া সম্ভব। ধরা যাক, বিজ্ঞানীর কাছ থেকে নকশাটা কিনে নিয়ে জনৈক শিল্পপতি একটা 'স্বয়ংক্রিয় ক্ষৌরযন্ত্র' বানিয়ে ফেললেন। মুশকিল এই যে, নিতান্ত একটা-দুটো বানালে তাঁর উৎপাদনের খরচা পোষাবে না, বানাতে হবে হাজার হাজার। কিন্তু নতুন কিসিমের সেই হাজার-হাজার ক্ষৌরযন্ত্রকে তিনি—ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে—বাজারে ছাড়বেন কীভাবে, কিংবা ছাড়লেও বেচবেন কীভাবে, যদি না সেটাকে কেনবার জন্যে লোকে কোনও তাগিদ বোধ করে? ভিতর থেকে সেই তাগিদ যখন তৈরি হয়ে ওঠেনি, তখন, ব্যবসার স্বার্থে, বাইরে থেকে একটা তাগিদ বানিয়ে তোলবার চেষ্টা তাঁকে করতে হবে বই কী। সেল্‌স প্রোমোশন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে, হ্যান্ড-বিল ছাপিয়ে, চৌমাথায় হোর্ডিং লট্‌কিয়ে, হাটে-বাজারে লোক লাগিয়ে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর রেডিয়ো-টেলিভিশানের বাণিজ্যিক প্রোগ্রামে তারস্বরে চেঁচিয়ে তাঁকে সর্বজনের উদ্দেশে বলতেই হবে : এটা তোমার চাই।

কেন চাই? না এতে তোমার চার-চারটে মূল্যবান মিনিট বেঁচে যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য, আমাদের মিনিটগুলি যে এতই মূল্যবান, তা আমরা জানতুম না। এবং না-জানার দরুন আমাদের যে খুব অসুবিধে হচ্ছিল, তাও নয়। বস্তুত, আমরা বেশ নিশ্চিন্তই ছিলুম। দাড়ি কামাবার জন্যে রোজ সকালে পাঁচটা মিনিট সময় দিতে আমরা এতকাল কুণ্ঠিত হইনি। কিন্তু এখন থেকে কি একটু কুণ্ঠাবোধ করব না? চতুর্দিকে যদি বিজ্ঞাপনের ঢাক বাজতে থাকে এবং ক্রমাগত যদি আমাদের শোনানো হতে থাকে যে, রোজ সকালে চার-চারটে মিনিট আমরা অপব্যয় করছি, তাহলে সেই মিনিটগুলিকে বাঁচাবার জন্যে কি আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠব না? আমাদের কি মনে হতে থাকবে না যে, যা সময় নষ্ট হবার তা তো হয়েছেই, কিন্তু আর নয়, হোক ওর দাম আড়াইশো টাকা, তবু সময়ের সাশ্রয়কারী ওই ক্ষৌরযন্ত্রটি এবারে সংগ্রহ করাই চাই? সংগ্রহের তাগিদ আরও বাড়বে, যদি দেখি যে, আমাদের দু-চারজন প্রতিবেশী ইতিমধ্যে ওই ক্ষৌরযন্ত্রটি

সংগ্রহ করে ফেলেছেন। ইংরেজীতে যাকে বলে "কীপিং আপ উইথ দি জোন্‌সেস", আমরাও তার ফাঁদে পড়ব। দেখা যাবে, প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে, 'প্রয়োজনীয়' পণ্য বলে গণ্য করে আমরাও ওই ক্ষৌরযন্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। হাত বাড়াতে গিয়ে আরও জরুরী নানা প্রয়োজনকে আমরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি কি না, সেই খেয়ালই আমাদের থাকবে না।

থাকছেও না। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, এমন অনেক পণ্যকে আমরা 'প্রয়োজনীয়' বলে জ্ঞান করতে শুরু করেছি, উদ্‌ভাবিত হবার আগে পর্যন্ত আমরা যার অভাব বোধ করিনি। অভাববোধের সৃষ্টি হচ্ছে উদ্‌ভাবনার পরে। উদ্‌ভাবিত বস্তুটির নানাবিধ গুণপনার কথা ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত শুনতে-শুনতে তবেই আমাদের চিত্ত হঠাৎ খাঁ-খাঁ করে উঠছে। আমরা ভাবছি যে, তাই তো, এটা তো আমার না-হলেই নয়। অর্থাৎ প্রয়োজন এক্ষেত্রে উদ্‌ভাবনার সূত্র ধরে আসছে। "নেসেসিটি ইজ দি মাদার অব ইনভেনশন"—এই পুরনো লোকবাক্য তাহলে আর এ-সব ক্ষেত্রে খাটছে না। পক্ষান্তরে, উদ্‌ভাবনাই এক্ষেত্রে প্রয়োজনের জননী হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তাতে অবশ্য আপত্তি করবার কোনও কারণই থাকত না, যদি দেখতুম যে, ভিতর-থেকে-তৈরি-হয়ে-ওঠা ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিকে ইতিমধ্যে আমরা সর্বৈব মিটিয়ে নিতে পেরেছি। তা কিন্তু আমরা পারিনি। যে-সব দেশ সচ্ছল বলে গণ্য, সেখানেই যে সমস্ত মানুষের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন মেটানো গেছে, তাও নয়। সেখানেও অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। সেখানেও অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। সেখানেও অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষের উপযুক্ত-কর্মসংস্থান হয় না। অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলিকে সে-সব দেশে মেটানো গেছে বটে, কিন্তু গোটা দেশের ছবিটা তাই বলে সেখানেও একেবারে ষোল-আনা উজ্জ্বল নয়। দু-আনা অংশ সেখানেও অনুজ্জ্বল। অভাব ও দারিদ্র্যের কিছু-না-কিছু 'পকেট' ছড়িয়ে আছে সেখানেও। তবু হয়তো 'স্বয়ংক্রিয় ক্ষৌরযন্ত্র' সেখানে মানিয়ে যেতে পারে, আমাদের দেশে একেবারেই মানায় না। দরিদ্র দেশে যখন, ন্যূনতম চাহিদাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে, ফ্রিজের কারখানা গজিয়ে ওঠে, এবং যে কাঁচামাল শ্রম মূলধন সংগঠন ও উদ্যম সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর কাজে নিয়োজিত হতে পারত, তা অন্যতর লক্ষ্যার্জনে ব্যয়িত হতে থাকে, তখন সেটা উলঙ্গের গলায় নেকটাইয়ের মতই—একাধারে করুণ বীভৎস ও হাস্যকর দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতবার তুলনাটা যে কেন উঠেছিল, আশা করি সেটা বুঝিয়ে বলতে পেরেছি।

প্রশ্ন হচ্ছে, এর জন্য দোষ দেব কাকে? এই যে নিষ্ঠুর মূঢ়তা, এর জন্য কাকে আমরা দায়ী করব? নবনব-উন্মেষশালিনী প্রতিভার অধিকারী সেই মানুষগুলিকে, নিত্যনূতন উদ্‌ভাবনার যাঁরা জনক? আমরা কি তাঁদের কাছে গিয়ে বলব যে, ঢের হয়েছে, আর নয়, আপনারা অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবেন না, এবারে একটু স্থির হয়ে দাঁড়ান, কেননা, আমরা, এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ, এখনও অত্যন্ত পিছিয়ে আছি? আমরা কি এবারে স্পষ্ট করে ঘোষণা করব যে, তাঁদের নবনব উদ্‌ভাবনাগুলি আমাদের, অধিকাংশ মানুষের, কোনও কাজেই লাগছে না? এমন কী, সেই উদ্‌ভাবনার সুফলের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়াও আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর? আমরা কি তাঁদের প্রতি এই আবেদন জানাব যে, দাঁড়ান মহাশয়েরা, আপনাদের দ্বারা যে-সব কলা-কৌশল ও উপায়-ফিকির ইতিমধ্যে উদ্‌ভাবিত হয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে আগে আমাদের

ন্যূনতম চাহিদাগুলিকে আমরা মিটিয়ে নিই, তারপর আপনারা সাত সেকেন্ডে শ্মশ্রুমোচনের ও তিন সেকেন্ডে তিন কিলো মাংস সিদ্ধ করবার উপায় উদ্‌ভাবনার কাজে হাত লাগাবেন? যতদিন না আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রশিক্ষাস্বাস্থ্যগৃহ ও কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করতে পারছি, অর্থাৎ আমাদের ন্যূনতম চাহিদাগুলিকে মিটিয়ে নিতে পারছি, ততদিন কি আমরা তাঁদের অপেক্ষা করতে বলব?

বললে যে খুবই অন্যায় হবে, তা কিন্তু নয়। জীববিজ্ঞানীরা বস্তুত ইতিমধ্যেই এই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, ঢের হয়েছে। তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ অবশ্য ভিন্ন। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের বল্গাবিহীন ঘোড়ায় চেপে মানবসভ্যতা যে-ভাবে দশ দিনের পথ দশ মিনিটে পাড়ি দিচ্ছে, তাতে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করছেন মূলত এইজন্যে যে, এই প্রচণ্ড অগ্রগতির সঙ্গে নিছক একটি প্রাণী হিসেবে মানুষের অভিব্যক্তির (এভোল্যুশন) কোনও সংগতি বা সামঞ্জস্য তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা বলছেন, আর নয়, ঘোড়াটাকে এবারে বল্গা পরাবার ব্যবস্থা হোক। তাঁদের আশঙ্কা, রাশ না-টানলে টাল সামলানো যাবে না; অশ্ব হঠাৎ সামান্য একটু ঠক্কর খেলেই তার সওয়ারও তৎক্ষণাৎ মুখ থুবড়ে পড়বে।

একদিকে সভ্যতার জয়যাত্রা ও অন্যদিকে মানুষের জীবতাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। এই যে দুটি দিক, এর মধ্যে যে কোনও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি, এ-কথা ষোল আনার উপরে আঠারো-আনা সত্যি। মানুষের বয়স তো মোটামুটি দশ লক্ষ বছর। আর, সর্বশেষ হিমযুগের অবসানে যখন কৃষিকর্মের সূচনা হয়েছিল, সেই সময়টাকে যদি সভ্যতার জন্মলগ্ন বলে ধরে নিই, তো বলতে হবে যে, আমাদের সভ্যতার বয়স মোটামুটি দশ হাজার বছর হল। কোথায় দশ লক্ষ, আর কোথায় দশ হাজার! সভ্যতার বয়স, দেখা যাচ্ছে, মানুষের বয়সের একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র। একালের এক বিখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী এই অস্বস্তিকর অনুপাতের কথাটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্যের সূত্র ধরে যদি আরও খানিকটা আমরা এগিয়ে যাই, যদি শতবর্ষ-বয়স্ক একজন মানুষের কথা আমরা কল্পনা করি, এবং যদি দেখি যে, তার জীবনের নিরানব্বইটা বছর সে নেহাতই বন্য জন্তুর মতো অরণ্য-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে তারপর তার জীবনের শেষ এক বছরে হঠাৎ চাষবাস করে, শহর বসিয়ে, কলকারখানা বানিয়ে, জাহাজে-ট্রেনে-এরোপ্লেনে দুনিয়া ঘুরে, রকেটে চড়ে চন্দ্রলোকে পাড়ি দিয়েছে, তাহলে সেটাকে যতখানি বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হবে, দশ লক্ষ বছরের মনুষ্যজীবনের পটভূমিকায় দশ হাজার বছরের মানবসভ্যতার এই আকস্মিক ও অতিদ্রুত অগ্রগতিও বস্তুত ততটাই বিস্ময়কর একটি ঘটনা।

যতটা বিস্ময়কর, ঠিক ততটা অস্বস্তিজনকও।

কিন্তু জীবতাত্ত্বিকদের কথা আপাতত মুলতুবী থাক। তাঁরা এই অগ্রগতিকে যেদিক থেকে দেখছেন, আমরা—অন্তত এই নিবন্ধে—ঠিক সেদিক থেকে দেখছি না। আমরা অস্বস্তি বোধ করছি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং, এমন কী, নিতান্ত নৈতিক কারণেও। আমরা ভাবছি, বিজ্ঞাননির্ভর একালীন যে অগ্রগতি ও উদ্‌ভাবনার সুফল নেহাতই সামান্য-কিছু মানুষের লভ্য, অধিকাংশ মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলিকে মেটাবার আগেই তার ভজনা করা আমাদের উচিত কিনা।

উচিত তো নয়ই, কিন্তু সে-কথা শুনছে কে? শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা শুনবেন না; কেননা, সমাজের মঙ্গলের চেয়ে নিজেদের মুনাফার কথাই তাঁরা বেশী ভাবেন, এবং তাঁরা খুব ভালই জানেন যে, এ-সব কথা শুনতে গেলে তাঁদের মুনাফার ব্যবসা মার খেয়ে যাবে। রাষ্ট্রকর্তাদের শোনা উচিত

ছিল। কিন্তু জনকল্যাণ যার ঘোষিত লক্ষ্য, সেইসব রাষ্ট্রের কর্তারাও যেহেতু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী-মহলকে পারতপক্ষে চটাতে চান না, তাই তাঁরাও এক্ষেত্রে বধির থাকারই পক্ষপাতী। আর তাই উন্নয়নশীল যে-সব রাষ্ট্রের চোদ্দ আনা মানুষেরই দুর্দশা আজ অন্তহীন, সেখানেও---জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিকে পাশ কাটিয়ে---অন্যতর নানা প্রয়োজনকে তৈরি করে তুলবার চেষ্টা অবাধে চলতে থাকে। বিজ্ঞাপনের যুবক সেখানেও বেকার-তরুণকে জপাতে থাকে যে, স্যুটের জন্যে চাই এমন কাপড়, মাংসের ঝোল যাতে দাগ ধরাতে পারে না। বিজ্ঞাপনের যুবতী সেখানেও নিরাশ্রয় নারীকে পরামর্শ দেয়, এবারে একটি টি. ভি. কিনুন, নইলে অফিস ছুটি হবার পরে "আপনার স্বামী কেন চটপট বাড়ি ফিরবেন"?

বলা বাহুল্য, যে-কাপড়ে মাংসের ঝোলের দাগ ধরে না, তার সম্পর্কে আমাদের কারও কিছুমাত্র আপত্তি নেই। টেলিভিশন সেট সম্পর্কেও না। কিন্তু তবু যে এইসব পণ্য সম্পর্কিত বাক্যবন্ধ আমাদের কাছে অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকে, এবং এইসব পণ্যের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার প্রয়াসকে অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে হয়, তার কারণ, পৃথিবীর এই অসচ্ছল দেশগুলির বাস্তব পরিবেশকে আমরা ভুলে যেতে পারি না। আমাদের মনে পড়ে যে, মাংসের-ঝোলের-দাগ-প্রতিরোধক জাদু-বস্ত্রের কথাটা যাদের শোনানো হচ্ছে, নিতান্ত মামুলী ধরনের কাপড়ও তাদের সকলে সর্বদা সংগ্রহ করতে পারে না, মোটামুটি সেইটুকু জুটলেই তারা বর্তে যায়। মনে পড়ে যে, অনেক স্বামীই যে অফিস ছুটির পরে চটপট বাড়ি ফেরেন না, তার কারণ এই নয় যে, তাঁদের গৃহে অদ্যাবধি একটি টেলিভিশন-সেটের আবির্ভাব ঘটেনি। প্রত্যাগমনে বিলম্বের প্রকৃত কারণ এই যে, জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিকে মেটাবার জন্যে তাঁদের বাড়তি কিছু রোজগারের ধান্দায় থাকতে হয়। তার জন্যে তাঁরা ওভারটাইম খাটেন, কিংবা ট্যুইশানি করেন।

চতুর্দিকে যখন অভাব-অনটনের ছড়াছড়ি, বিস্তর মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পায় না, হাসপাতাল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যখন প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য, বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা যখন দিনে-দিনে আরও বেড়েই যাচ্ছে, এবং জনসাধারণের চোদ্দ আনা অংশেরই যখন প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত হবার উপক্রম, তখন সেই রাজ্য-জোড়া দুর্দশার মধ্যেও যদি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলিকে পাশ কাটিয়ে অন্যতর চাহিদা সৃষ্টির চেষ্টা চলে, তাহলে তাকে ধিক্কার না-দিয়ে উপায় কী।

ধিক্কারের লক্ষ্য অবশ্যই উদ্ভাবকেরা নন। তাঁদের উদ্ভাবনাগুলি---কে না জানে---আমাদের জীবনকে আরও মসৃণ করে তুলতে পারত। পারেনি, তার কারণ, সেইসব উদ্ভাবনার সুফলকে সর্বজনের লভ্য করে তুলবার দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত ছিল, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থতাটা যে কী মর্মান্তিক, ঘরোয়া একটা তুলনার সাহায্যেই সেটা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, কিছু লোক রুটি বেলছেন, কিছু লোক রুটি সেঁকছেন, এবং কিছু লোক খেতে বসেছেন। কিন্তু, রুটি বেলার কাজটা যদিও চটপট সমাধা হয়ে যাচ্ছে, সেঁকতে অত্যধিক দেরি হবার ফলে তা আর কিছুতেই ভোক্তাদের পাতে এসে পৌঁছচ্ছে না।

উদ্ভাবক, রাষ্ট্রকর্তা ও জনসাধারণের সম্পর্কটা বস্তুত এইরকমই। উদ্ভাবক তো কিছু-একটা উদ্ভাবন করেই খালাস; তার সুফলকে জনসাধারণের লভ্য করে তুলবার দায়িত্ব তাঁর নয়। দায়িত্বটা রাষ্ট্রকর্তা ও সমাজপতিদের। কিন্তু সেই দায়িত্ব তাঁরা পালন করতে পারেননি। উদ্ভাবকের কাছে তাঁরা হেরে গেছেন। উদ্ভাবক যখন এরোপ্লেন বানিয়েছেন, রাষ্ট্রকর্তা ও সমাজপতিরা তখন রেলগাড়িকেও সর্বজনের সাধ্যের সীমানায় এনে দিতে পারেননি। উদ্ভাবক যখন টেলিভিশন এনে দিয়েছেন, রাষ্ট্রকর্তা ও সমাজপতিরা তখনও এমন ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি, একটা রেডিয়ো-সেট

যাতে সর্ব-পরিবারের লভ্য হয়।

কিন্তু রেডিয়ো-সেটের কথাই বা উঠছে কেন, পৃথিবীর একটা মস্ত অংশের অসংখ্য মানুষ এখনও সেই পর্যায়েরও অনেক পিছনে পড়ে আছে। অথচ, সেই অবস্থাতেও, তাদের শোনানো হচ্ছে, "রোজ-রোজ বাজারে যেতে ভাল লাগে না বুঝি? তাহলে একটা ফ্রিজ কিনছেন না কেন?"

সত্যিই তো, কেন ওরা ফ্রিজ কেনে না? প্রশ্ন শুনে মারি আঁতোয়ানেতের কথা মনে পড়ে যায়। বিপ্লবের আগের মুহূর্তে, প্যারির রাস্তায় যখন রুটির জন্যে দাঙ্গা চলছে, ফরাসী সম্রাজ্ঞীও তখন একেবারে এই রকমেরই একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন। ওরা কেক খায় না কেন?

বিভাবরী

দিনেশচন্দ্র রায়

রীনা বুঝতে পারল যে তার দাদা আর দেবু বাড়ি ফেরেনি। সকাল থেকে দীপুর সংবাদ নেবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু চারিদিকে কড়া কারফ্যু জারি করা হয়েছে, কারো বেরুবার কোন উপায় নেই। তাই বোঝা যাচ্ছে না দীপু হোস্টেলেই আছে না অন্য কোন জায়গাতে। আজকের সকালটায় রোদের তাত একটু বেশি। কিন্তু এরই মধ্যে পুলিশের গাড়ি আর ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির আওয়াজ এবং চলাফেরাতে সমস্ত পরিবেশটা ভুতুড়ে লাগছে। চারিদিকে চাপা অমঙ্গলের আব-হাওয়া। মা একটু ভালো আছেন। হাঁটাচলা করতে পারেন। দীর্ঘ চিকিৎসার পরে শরীরটা সুস্থ হয়েছে। দাদার জন্য বাবার জন্য চিন্তাটাই বেশি। মা খুব শক্ত, মনে দুশ্চিন্তা এলেও মুখে কিছু প্রকাশ করেন না। মা বললেন,—হোস্টেলে এতগুলো ছেলের সঙ্গে দীপু রয়েছে। চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু বেলা দশটা নাগাদ একটা গুজব রটল যে পুরো হোস্টেলের ছেলেরা তলোয়ার এবং বল্লম নিয়ে রাস্তাতে নেমেছে। রীনাদের বাড়িতে এবং পাড়াতে এই নিয়ে তুলকালাম কান্ড। সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কারফ্যুর ছাড়। পাড়ার দুটো বড় ছেলে সাইকেল নিয়ে প্রথমে হোস্টেলে এবং তারপর থানাতে গিয়ে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করে অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এল। সুরেশবাবু সব শুনে বললেন,—ভালোই হয়েছে। অন্তত প্রাণে বেঁচে আছে কিনা এই নিয়ে আর ভাবতে হবে না। দীপুর মা বেশ সুস্থ বোধ করলেন। দেবুর বাবা কামাখ্যাবাবুকেও সংবাদ পাঠানো হল। আবার কারফ্যু। এইরকম সময় থেকেই দুটো গুজব খুব চালু হল। এক, আজ বিকেল তিনটে থেকে মিলিটারি নামবে। দুই, শহরের ছয় মাইল দূরে বিদেশী বর্ডার থেকে হামলা হতে পারে। বেলা যত বাড়তে লাগল, নানা সূত্র থেকে এই গুজব একেবারে গেঁজিয়ে উঠল। দুপুরে খিচুড়ি আর ডিমভাজা খেয়ে পাড়ার কর্তারা আলোচনাতে বসলেন। আলোচনাসভা বসল রীনাদের বাড়ির বাইরের বারান্দাতে। রীনা চা দিতে এসে আশ্চর্য হয়ে শুনল, ভূপেন জ্যাঠামশাই বলছেন,—এবার আমাদের পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতে এতো সিম হয়েছে যে সবাই বলছিল যে ফাল্গুনে চত্তিরে এই সিম ফেলে দিতে হবে।

যতীন মেসোমশায় ফোড়ন দিলেন,—তুমি অফিস থেকে বীজ এনে বিলিয়েছিলে, সুতরাং ফল বেশি না হয়ে পারে? ভূপেন জ্যাঠামশায় তাঁর ছোটবেলার বন্ধু যতীনের কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না, কিছুটা আপনমনেই বলে চললেন,—এখন কতদিন কারফ্যু চলে দেখ। ডাল ভাত আর ডিমভাজা প্রাণ ভরে খাও।

রীনা চা দিয়ে ভেতরে এসে আশ্চর্যভাবে ভাবল, যেখানে বর্ডার থেকে সন্ধ্যাবেলাতে আক্রমণ হতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে, সেখানে এই মামুলি ব্যাপার বড়রা কী করে আলোচনা করতে পারে? রীনা দেবুকে পাঁচখানা চিঠি দিয়েছে কিন্তু তার কোন জবাব পায়নি। বহুদিন দেবুর সঙ্গে দেখাও হয় না। বাবা দেবুকে দেখতে পারেন না। দেবু ওদের বাড়ির আশেপাশে পর্যন্ত আসে না। সপ্তাহে একদিন বা দুদিন রীনা নানাভাবে ম্যানেজ করে দেবুদের পাড়াতে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে যায় এবং সেইখানেই দেবুর সঙ্গে দেখা হয়। দেবুকে চিঠি দেবারও একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে। রীনা সেইখানে চিঠিগুলো রেখে আসে। দেবু আর রীনার সম্পর্কটা একটা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। আত্মরক্ষা করার জন্যই ওরা ওদের সম্পর্ককে গভীর গোপনীয়তার মধ্যে ঢেকে রাখে—আমার আর

দেবুর ভালোবাসাকে একটা ঝিনুকের মধ্যে রেখেছি। সাদা রুপালী সেই ঝিনুকের খোলের মধ্যে ভালোবাসাটা শুক্তির মতো বেড়ে চলেছে। কেউ টের পাবে না। রীনা যখনই দেবুর সঙ্গে তার প্রেমের কথা ভাবে তখনই খুব করুণ কোন উপন্যাসের শেষ পরিণতির কথা তার মনে আসে। রীনা খুব করুণ সিনেমা দেখতে আর উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। সে কিছুতেই ভাবতে পারে না তাদের ভালোবাসা সর্বদিক দিয়ে একটা পূর্ণতার মধ্যে শেষ হবে। তার মনে হয় সে ভালোবাসার দহনে রোগা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যাবে। রীনা দেবুকে বারবার জিজ্ঞাসা করে,—আমার এমনি মনে হয় কেন? দেবু উত্তর দেয়,—প্রথম এমনি মনে হবে। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই হঠাৎ ঠান্ডা বাতাস বইছে। মাঝ-ফাল্গুনেও বেশ শীত। উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম—চারদিক জুড়ে শুধু আগুন আর আগুন। বড় বড় ট্রাকের চলাফেরার আওয়াজ, বিস্ফোরণের শব্দ এবং জনতার কোলাহল শোনা গেল। মুখুজ্যেদের বাড়ি খুব মজবুত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মহিলারা আর বাচ্চারা মুখুজ্যেবাড়িতে আশ্রয় নিলেন। পাড়ার ছেলেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গলির মুখে। ইতিমধ্যে খুব আবছাভাবে কয়েকবার আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কাঁসরঘণ্টা এবং শঙ্খ বাজতে লাগল। বন্দেমাতরম শোনা গেল কয়েক-বার। শব্দের মধ্যে মুখুজ্যেবাড়ির ভেতরে তিনজন মহিলা জ্ঞান হারালেন। মাজায় কাপড় বেঁধে বোসবাড়ির নতুন বউ ভেতরের উঠোনের দরজায় দাঁড়াল বঁটি হাতে। ক্রমাগত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। এবার আর কোন সন্দেহ রইল না যে শহরের দক্ষিণ দিক থেকে বিদেশী হানাদারদের প্রবেশ ঘটেছে। দু-তিনটি গাড়ি তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে গেল। আগুনের লেলিহান শিখাতে দিগন্তের আকাশটা আলোকিত। ক্রমাগত বন্দেমাতরম ধ্বনি ভেসে আসছে। শাঁখ আর কাঁসরঘণ্টার শব্দ থেমে গেল। বন্দেমাতরম ধ্বনির কোলাহলে সবকিছু চুপচাপ। এই নিশুতিতে সবাই ভাসছে। সবাই কান পেতে রইল,—আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি আর শোনা যায় কিনা। কোলাহলের পরে এমনি মৌন অবস্থার কোটালের টানে বালক-বৃদ্ধ-প্রৌঢ়-যুবক-নারীরা সাত হাত জলের তলাতে ডুবে গেল। কেউ নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না, সবাই কান পেতে আছে আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি শোনা যায় কিনা। ঠিক এইরকম সময়ে জনশূন্য অন্ধকার ভূতুড়ে রাস্তাতে মাইকে শোনা গেল,—আপনারা ভীত হবেন না। আমাদের সীমান্ত পার হয়ে হানাদাররা আসছে, এটা একটা ভিত্তিহীন গুজব। আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত। কোনপ্রকার ধ্বনি শুনলে তাতে কোন গুরুত্ব দেবেন না।

দুপুর রাতে যে যার বাড়িতে ফিরে এল। রীনা ভাবল এমনি একটা ওলটপালটের মধ্যে যদি দেবু থাকত তবে ভালো হত, দুজন দুজনকে অন্তত প্রাণভরে দেখতে পেত।

বিভাবরীদের বাড়িতেও লোক ভর্তি ছিল। রাত বারোটার পর পেছনের দরজা দিয়ে যে যার বাড়িতে চলে গেল। বড় রাস্তার ওপর বড় গেটে সাময়িক দারোয়ানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বাইরের দিকে সেই চৌবাচ্চার ওপর আলো ছাড়াও আরও অনেকগুলো জোরালো আলো জ্বলছে। বাইরের দিকটা আলোতে অলোময়। বাড়ির পরিচারকরা সমস্ত জানলা কপাট বন্ধ করে আবার সেগুলো পরীক্ষা করে গেল। এখানে ওখানে দু-একটা ফালতু লাইট নিভিয়ে দিল। তারপর লাঠি-সোটা টর্চ নিয়ে ভেতরের বারান্দাতে শুধুমাত্র সিমেন্টের ওপরই ওরা শুয়ে পড়ল। বিভাবরী লক্ষ্য করল যে দাদা তার সবরকম আলস্য ঝেড়ে ফেলে নিরাপত্তার সব ব্যবস্থার তদারকি করছে। দোনলা বন্দুকটা আজ সকালে সাফ করা হয়েছে। টোটার বেল্টে টোটাগুলো সাজানো। দাদা বারবার বাইরের দিকে গিয়ে দেখে আসছে নতুন পাহারাদাররা ঠিকমতো পাহারা দিচ্ছে কিনা। এই ঠান্ডাতে এত রাতেও দাদা ছাদে উঠে ঘটনার ওপর লক্ষ্য রাখছে। রাত গভীর। শুধুমাত্র ভারী যানবাহনের শব্দ কানে ভেসে আসে। চারিদিকে এত আগুন যে আকাশের দিকে তাকাতে চোখ টাটায়। রাত আরও

গম্ভীর হল। বিভাবরী বুঝতে পারল যে দাদা ছাদ থেকে নেমে নিজের ঘরে ঢুকল। বারান্দার দিকের দরজা বন্ধ করে দক্ষিণের বিরাট জানলাটার ধারে বিভাবরী বসল। বাবা কয়েকদিন আগে চা-বাগান পরিদর্শনে গিয়েছেন। এই সময়ে বাবা বাড়িতে না থাকায় খুব ভালো হয়েছে। এই ধরনের ব্যাপক গোলমালের সময় বাবা খুবই বিব্রত হয়ে পড়েন। হঠাৎ এই মুহূর্তে বিভাবরী আজ সারাদিনের ত্রাস, উত্তেজনা আর ক্লান্তি ভুলে গেল। বালিকার মতো সে উল্লসিত। এই গভীর রাতে বিভা কিছু রহস্যময় ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে প্রস্তুত। বিচিত্র শব্দ, বিভিন্ন গন্ধ, পতঙ্গকুলের চীৎকার, বাতাসের স্বাদ থেকে বিভা অনুভব করল যে আজকের রাতেও সেই অকল্পনীয় ঘটনাটা ঘটবে। বিভা জানে, এই খেলা রোজ খেলা যায় না। সেই কবে মা মারা যাবার পর একরাত্তিরে বিভার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়তে পড়তে বিভা প্রথম বুঝেছিল ঘটনাটা নিত্য ঘটে।

আকাশে আগুনের বেড়াজালের মধ্যে চাঁদ। বাতাসে আক্রান্ত এই ছোট্ট শহর। কিন্তু আজকের সন্ধ্যাতে দীপু আসতে পারল না। দীপুর কথা মনে আসতেই বিভা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কেমন আতঙ্কিত বোধ করল। দুস্তর এক পারাবার মাঝখানে। আগুন, ফায়ার ব্রিগেডের পাগলাঘণ্টি, ভারি ভারি ফৌজি গাড়ি গমগম-ঝমঝম। শহরের স্থিতাবস্থা বিপন্ন। বাইবেল, রক্তকরবী, উপনিষদ, কোরান,—সব জ্বলছে। সবাই পাখা-ওঠা পোকার দলের মতো আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। দীপু, দীপু, দীপু। বোতামখোলা শার্টের ফাঁক দিয়ে ওর বুকের ওপরের তিলটা একটা কালো জলপোকার মতো শান্ত দীঘির জলে চলৎশক্তিহীন। গোটানো আস্তিনের ফ্রেমে হাত দুখানা তথাগত শব্দটা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মাঝখানে আগুন, খুন, ডাকাতি, গুম। রোজ বিকেলে আকাশে খণ্ড মেঘগুলো খুব চেনা লাগে। সেই ছোটবেলা থেকে দেখতে দেখতে ভীষণ পরিচিত লাগে। সব্বারই লাগে। তবু কেউ কোনদিন ভাবে না,—খুব দারুণ রোমান্টিকও কেউ ভাবে না, মেঘগুলো জানলার ওধারে দাঁড়িয়ে কথা বলবে। খণ্ড মেঘের সঙ্গে সম্পর্কের ভবিতব্য নিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। আমাদের বাঁচবার আরও প্রবল দপদপ-করা কারণ থাকা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত ভেবে বিভাবরীর মনে হঠাৎ চিন্তা হল, 'কী করে বাঁচব?' চিন্তাটা বারবার মাথার মধ্যে পুনরাবৃত্ত হতে লাগল। শুধুমাত্র শোনা যেতে লাগল, 'কী করে বাঁচব।'

প্রভা ঘুমুচ্ছে। অকাতরে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। ঘরে এই নীল আলোতে সবকিছু আবছা। সিল্যুট এবং দৃশ্যমান পরিস্থিতির মাঝামাঝি একটা স্পষ্টতাতে অলৌকিক। হঠাৎ বিভা সজাগ হয়ে গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিল। ডানহাতের করতল দিয়ে নাকমুখটা মুছতে মুছতে বিভার মনে হল সে অন্য কারও নাক মুখ মুছছে। এবার বিভা আরও সতর্ক। অন্য দিকে মন বিক্ষিপ্ত যাতে না হয় সেজন্য মনকে শাসন করল। এমন কি মাঝখানে একবার দীপু আর রেবার দুখানা মুখকে পর্যন্ত নির্বাসন দিল। ঘটনাটা যে ঘটতে যাচ্ছে বিভা সেটা বুঝতে পেরেছে। ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনির মতো শীত লাগতে লাগল। কিন্তু বিভা কম্বলটা টেনে নিল না। বিভা শীতে কষ্ট পেতে শুরু করল। তবু চাইল না আরও কিছু গরম গায়ে জড়াতে। বাইরের রাত তখন শিশিরে শীতে পয়মাল। বিভা নিজের শীতের অনুভূতি দিয়ে বাইরের রাতের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলল। দুজন দুই বোন। আবার ঠিক বোন নয়। বাইরের রাতটা গভীর এবং কখনও বা একটু ছেলে-ছেলে। কিন্তু মুহূর্তে আবার শক্তসমর্থ মেয়ে-মেয়ে। ঠিক এই সময়ে দুজন দুজনের চিবুকে চিবুক লাগালে খুব ভালো লাগবে।

অগণিত নিশিশব্দমালার এক-একটি করে দেউটি পরপর নিভবে। এ যেন ক্রমিক নম্বর অনুসারে পূর্বনির্ধারিত। শুরু হবার পর থেকে একের পর এক শব্দ স্তব্ধ হবে। কিন্তু এই চুপ করার পালার সময় যত এগুতে থাকে তত গাছের পাতা থেকে ওস পড়ার শব্দ কমতে থাকে। এক

ফোঁটা পড়ার পর অন্য আর এক ফোঁটা পড়তে অনেক সময় নেয়। তারপর অনেকক্ষণ পরে নতুন ওস পড়ার কোন শব্দ কানে আসে না। অকস্মাৎ শিশিরপাত একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এবার ঝিঁঝিঁ-পোকা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের অবিরাম সেরেনেড-এর মধ্যে ক্রিং ক্রিং ক্রিং উচ্চগ্রামের একটা কণ্ঠ-স্বর স্তব্ধ। কীটপতঙ্গ এবং ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শীতলপাটির মতো একটা নিপাট অখণ্ড স্বর-লিপি তৈরি করেছে। ক্রিং ক্রিং ক্রিং বন্ধ হবার পর সেইখানে গোল করে একটা ফুটোর সৃষ্টি হল। দ্বিতীয় পর্যায়ে তীব্র কর্কশ উঁচু গলার ঝিঁঝিঁরা থেমে গেল। এক সেকেন্ড যেতে না যেতেই পোকারা সব চুপ। বাতাস পড়ে গেছে। পথে কোন শব্দ নেই,—বিভা নিশুতিতে তলিয়ে গেল। জীবন্ত কোন শব্দের পাত্তা নেই। আকাশ বাতাস পৃথিবী নিশ্বাস বন্ধ করে নির্বিকল্প সমাধিতে স্থির, মৌন। প্রতি রাতেই কোন এক সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ মেরে যায়। কবে কখন এই অলৌকিক ঘটনাটা ঘটবে সেটা রহস্যে আবৃত, কেউ জানে না।

রীনা রাত জেগে চিঠিটা যখন শেষ করল তখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চিঠি ব্লাউজের মধ্যে রেখে আলো নিভিয়ে শুতে গেল। রীনা বাড়ির বড় মেয়ে হিসাবে একটু আলাদা প্রাধান্য পায়। ভেতরের বাড়িতেই ছোট্ট একটা ঘরে সে একা-একা থাকে। সামনে পরীক্ষা। সুতরাং পড়াশোনার জন্য তার এই আলাদা ব্যবস্থাতে সব দিক দিয়েই সুবিধা হয়। আলো নিভিয়ে ঘরের মধ্যে রীনা একটু পায়চারি করল। এবং তারপর কী ভেবে আবার বাতি জ্বালাল। বুকের ভেতর থেকে চিঠি-খানা বের করে পড়তে লাগল।

—কে বলে তোমার চোখ কটা, তোমার ঐ দুচোখের জন্য একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। আমারও পনেরো-ষোল বছর বয়স হয়ছে। সংসারে কিছু কিছু আমিও বুঝতে শিখেছি। তোমার মতো কাউকে চারপাশে দেখি না। রীনা চিঠিটা পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। রীনার গায়ের রং ফর্সা। কান্নার বেগে তার টকটকে দুগালের দুপাশ লাল হয়ে উঠল। বিস্ফারিত নাকের নীচে দুই ঠোঁট খুব চাপাচাপি লাগল। দুচোখ মোছবার পর বোঝা গেল আয়ত দু চোখের জন্য রীনা ভীষণ সুন্দরী। রীনা এবার আবার আলো নিভিয়ে বিছানায় ঢুকল। সেই সময়েই একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে সে লাফিয়ে বিছানা থেকে মাটিতে নামল। সারা পাড়া জুড়েই সেদিন পাহারা ছিল। সুতরাং অনেক পায়ের শব্দ কিছুক্ষণ এলোপাথাড়ি এদিক ওদিক করল। সব বাড়িতেই আলো জ্বলে উঠল। আজ যাদের বিশ্রামের পালা তারাও জেগে গেল। তারপর সব বাড়ির দরজা খোলার শব্দ কানে আসতে লাগল। বাবা-মা দুজন দরজা খুলে বারান্দাতে, অনেক চেনা গলা কানে আসছে। সমস্ত আগুনকে নিষ্প্রভ করে পূর্বদিকে একটা টাটকা গনগনে আগুন চরচর শব্দ করে আকাশের গা চাটছে। আবার আর-একটা বিস্ফোরণ হল। বোমা ফাটল। একঝাঁক গুলির আওয়াজ। জনতার কলরব। বিস্ফোরণে পদাঘাতে রজনী মাটিতে লুটোচ্ছে। সবাই সেই নতুন অগ্নিকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মুখে কারও কোন কথা নেই। কেউ বুঝতে পারছে না আগুন কোথায় লেগেছে। নানামুনির নানামত। 'নবাববাড়িতে নিশ্চয়ই আগুন দিয়েছে।' 'ধ্যেৎ, সেটা কী করে সম্ভব? নবাববাড়ি হেভিলি গার্ডেড। ওদের সকলকে নিয়ে ওখানেই জমা করেছে। ওখানে সূঁচ গলাবার উপায় নেই।' 'তবে মার্চেন্ট রোডে করিম সাহেবের পেট্রল পাম্প হতে পারে। যেরকম এক্সপ্লোশান হচ্ছে তাতে পেট্রল পাম্পই মনে হয়।' অনেকগুলো ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা একসঙ্গে যেন শোনা যাচ্ছে। অথবা একটা ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টাই প্রতিধ্বনিত হয়ে খণ্ড সতীদেহের মতো ছিন্নভিন্ন। শব্দ ডমরুর ধ্বনির মতো দ্রামা দিমি দিমি। শেষরাতে সুরেশ ভাবলেন, আমার বড় ছেলে দীপুটা কোথায় কী করছে কে জানে।

মুল জেলখানাটা বিরাট, প্রায় একটা শহরের মতো, বর্তমানে যে অংশগুলো ওয়ার্ড হিসেবে

চালু আছে তা থেকে অনেক দূরে বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। শুধুমাত্র একপরতা কাঁটাতারের ঘের নয়, পরপর অনেকগুলো পরতের পর। তারকাঁটাগুলো অনেক পুরনো। মরচে ধরে গেছে। শুধু মরচে ধরাই নয়, নানাভাবে জট পাকিয়ে বিচিত্র একটা বিমূর্ত বেড়াজালের সৃষ্টি করেছে। দীপু প্রথম দিন ব্যাপারটা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বলেছিল,—রক্তকরবীর রাজা যে জালের আড়ালে থাকেন সেটা অবিকল এমনি হওয়া উচিত।

বেণু বলল,—মোটেই তা নয়। এটা পুরোপুরি সাররিয়ালিস্টিক ব্যাপার।

দেবু বলল,—রাজার জাল সাররিয়ালিস্টিক হবে না একথা রক্তকরবীতে লেখা নেই। কথা শুনে একগাদা ছেলে হো হো করে হেসে উঠল। একটি রোগামতো ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে মুচকি হেসে বলল,—বেণুদা পেঙ্গুইনের পেপারব্যাক শিল্পকলার ইতিহাস পড়ছে এবং সেইজন্যই আর্টের সব জারগন ঝাড়ছে। এই কাঁটাতারের ফেন্সিংএর মধ্যে যে বিরাট হলঘরটা আছে সেইটাই ওদের জন্য কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দিয়েছে। সেই হলঘরের বারান্দাতে বসে রোদ পিঠে দিয়ে ছেলেরা গুলজার করছে। বাইরের কেউ আজ পর্যন্ত দেখা করতে পারেনি। সুতরাং বাইরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কারও কোন সংবাদ নেই। তবে জেল সুপারিনটেনডেন্ট বলেছে যে আজ প্রিন্সিপ্যাল বিকেলের দিকে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য জেলে আসবেন। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবই খবর দিলেন যে শহরের সেরা উকিলরা ছেলেদের জামিনের জন্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ। অন্তত আরও সাতদিন তাদের জেলে থাকতে হবে। এদিকে ছেলেদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপার নিয়ে শহরে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং নানা প্রতিষ্ঠান এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার পাঠিয়েছে।

আজ সকালে সেই হলঘরের বারান্দাতে ছেলেরা বসে বিভিন্ন কমিটি বানিয়ে ফেলল। মেস কমিটির জন্য চারজন নির্বাচিত হল। তিনজন কয়েদী এ ব্যাপারে ছেলেদের সাহায্য করবে। হামিদ রান্নার কাজ করবে, প্রফুল্ল এবং মানিক তার সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবে। দেবু প্রস্তাব দিল,—আমরা আমাদের নিজেদের বাসন নিজেরা ধুয়ে নেব। জামাকাপড় কাচা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজও আমরা নিজেদেরটা নিজেরা করব। পারফেক্ট ডিসিপ্লিন মানতে হবে। সুপারিনটেনডেন্ট আমাদের রাত আটটা পর্যন্ত বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন,—ঠিক আটটার সময়েই আমরা লক-আপে ঢুকব। দেবুর প্রস্তাব সবাই সমর্থন করল। বেণু বলল—আমাদের প্রতিদিনের জন্য একটা রুটিন বানাতে হবে। আমি, দেবু ও দীপু সেই রুটিন বানাব। প্রতিদিনের প্রতিটি মিনিট আমরা কাজে লাগাব। প্রতিদিন আলোচনাচক্র এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। আজ সন্ধেবেলা প্রিন্সিপ্যাল চলে যাবার পর রাতের খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে লক-আপে ঢোকার পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ওপর আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। ফোর্থ ইয়ারের রাধাগোবিন্দ প্রস্তাবনা করবে। ছেলেরা মিছিমিছি একটা মিটিং হচ্ছে এইরকম অভিনয় করে খুব জোরে হাততালি দিল। ইতিমধ্যে খুব বড় দুটো কেটলি নিয়ে হামিদ এল। পেছনে অ্যালুমিনিয়মের ডেকচি নিয়ে প্রফুল্ল আর মানিক উপস্থিত। গরম-গরম পুরি তরকারি। পরিবেশন করার ব্যাপারে সদ্যগঠিত মেস কমিটির ছেলেরা হাত লাগাল। পেটপুরে লুচি তরকারি খেয়ে চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে গ্লাসসমেত ডানহাত আকাশে তুলে সমীর চেঁচিয়ে উঠল—থ্রি চিয়ার্স ফর হামিদ ভাই, সবাই চীৎকার করে ধুয়ো ধরল। হামিদ, প্রফুল্ল আর মানিক হাসছে। লাইনটানা জেলের পোশাকে এবং টুপিতে ওদের কেমন বিদেশী-বিদেশী দেখাচ্ছে। হামিদের দাঁতগুলো সমান আর সাদা ধবধবে। প্রফুল্ল হাসলে ওর চোখ দুটো বুজে যায়। মানিক দুহাতে মুখ ঢেকে হাসছে।

এবার দীপু সমীরের কাঁধে চেপে বসল। সমীর খুব শক্তসমর্থ ছেলে। দীপুকে কাঁধে নিয়ে

একেবারে মাঝখানে দাঁড়াল। দীপু চিৎকার করে বলল,—আমি দৈনিক রুটিন কমিটির স্বনির্বাচিত সম্পাদক। আজ সকাল আটটা থেকে সাফসাফাইএর কাজ শুরু হবে। নিজেদের দেহে প্রায় তিনদিন জল পড়েনি। প্রত্যেকেরই গা দিয়ে একই রকম গন্ধ বেরুচ্ছে বলে কেউ বুঝতে পারছ না তোমাদের কার গায়ে কেমন গন্ধ। সুতরাং এখন থেকেই সব স্নানে লেগে যাও। আমাদের হেফাজতে প্রায় পনেরোটি ট্যাপ আছে। নিজেরা জোড়-বিজোড় করে ছটি দলে ভাগ হয়ে যাও। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্নান শুরু হবে। স্নান করার সময় কেউ কারোর দিকে তাকাবে না। আবার প্রচণ্ড হৈ হৈ। কিন্তু সেই গোলমালের মধ্যেই আন্ডারওয়ার প'রে, হাতে সাবান গামছা নিয়ে পনেরোটি ছেলে দৌড়তে লাগল কলতলার দিকে। গামছাগুলো জেলখানা থেকে দেওয়া। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব আইনের বাইরে কী করে দিয়েছেন কেউ জানে না। সুতরাং টকটকে লাল রঙের জোলার গামছা উড়িয়ে শুধুমাত্র আন্ডারওয়ার পরে যখন পনেরো জন যুবক একটু দূরের কলতলার দিকে ছুটল তখন মনে হতে পারে যে কাছেই কোন সমুদ্র আছে, যুবকরা সেই সমুদ্রের বালুর চড়া পেরিয়ে জলে ঝাঁপ দেবার জন্য ছুটে চলেছে। ওদের হাতে লাল রঙের গামছাগুলো সমুদ্র, বেলাভূমি এবং আকাশের মাঝখানে সাযুজ্য রক্ষা করার কাজ করছে। যুবকদের খালি গায়ে একটা মসৃণতা আছে। এই মসৃণতা কচি কলাপাতার আলো-না-পাওয়া উল্টো দিকের মতো। সুপুষ্ট উরু, তলপেট খোঁদলে, বুকের ছাতি ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে। পনেরোটি ছেলে যখন দৌড়তে লাগল তখন ওদের পিঠের মাংসপেশীগুলো নাচতে লাগল। ছেলেগুলো দৌড়তে দৌড়তেও চিৎকার করছে।

ভরদুপুরে সেই বিরাট হলঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। প্রায় আড়াই রাত্তির কারও ঘুম এবং খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হয়নি। সুতরাং হামিদের হাতে গরম-গরম ভাত, মাছের ঝোল, চাটনি খাবার পর ঘুমে সবায়ের চোখ জুড়ে আসতে লাগল। প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে দীপু বেলা চারটে পর্যন্ত ঘুমোবার রুটিন ঘোষণা করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এতগুলো যুবক ঘুমে অচেতন। বিরাট হল-ঘরের মাঝখানে মেঝেতে সারি-সারি বিছানা পাতা। সেই বিছানা জুড়ে শতাধিক যুবক ঘুমে অচেতন। দেখে মনে হবে কোন অভিশাপে এরা ঘুমিয়ে রয়েছে। বিকেল পাঁচটার মধ্যে সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়ল। কিন্তু সমীর তখনও ঘুমোচ্ছে। ছেলেরা হাতমুখ ধুয়ে এসে যে যার জামাকাপড় পরে নিল। হামিদ, প্রফুল্ল আর মানিক বিকেলের চা দিয়ে গেল। কিন্তু সমীর তখনও ঘুমোচ্ছে। ফোর্থ ইয়ারের রাধাগোবিন্দের কাছ থেকে নস্যি নিয়ে সমীরের নাকে দেওয়া হল, সমীর হাঁচল, কিন্তু তবু ঘুম ভাঙল না। চোখে জলের ঝাপটা, কানে সুড়সুড়ি, পায়ের পাতাতে বিলিকাটা—সব ব্যর্থ হল। সমীর অবলীলায় সবকিছু অবহেলা করে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অবশেষে বেণু সমীরের কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বলল,—সমীর, তুই ভুল করিস না,—মরার আগে তোর কানে হরিনাম শোনাচ্ছি না। কিন্তু এখনও যদি ঘুম থেকে না উঠিস তবে প্রীতিবাবুকে ডাকব। প্রীতিবাবু, প্রীতিবাবু, প্রীতিবাবু। এইবার সমীর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দুহাতে ঘুমন্ত চোখ রগড়াতে লাগল, তারপর,—কোথায় প্রীতিবাবু, প্রীতিবাবু কোথায়, চিৎকার করতে করতে হলঘরের একপাশ থেকে অন্যপাশ ছুটোছুটি শুরু করল। ছেলেরা সব হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কেউ কেউ সমীরের অনুকরণ করে "কোথায় প্রীতিবাবু, প্রীতিবাবু কোথায়", বলে চিৎকার করে ঘরময় দাপাদাপি আরম্ভ করল।—শালা হোমো দেখে এত ভয়! একজন চিৎকার করল। থালা আর গেলাস নিয়ে একদল ছেলে বাজনা বাজাচ্ছে। এই হট্টগোলের মধ্যে প্রথমে সুপারিনটেনডেন্ট ঢুকে বুঝতেই পারলেন না কাকে কী বলবেন। অনেকক্ষণ পর সবাই দেখল সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখ করে ডানহাত তুলে বারবার গোলমাল থামাবার জন্য ইঙ্গিত করছেন। অবশেষে অনেকবার সাহেব হাতনাড়ার পর গোলমাল থামল।—প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অফিসে বসে আছেন।

এখানে কি নিয়ে আসব? সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব বোঝাতে চাইলেন প্রিন্সিপ্যালকে এখানে নিয়ে আসবেন সুতরাং ছেলেরা যেন সেইভাবে তৈরি হয়ে নেয়। যারা যারা আন্ডারওয়্যার আর লুঙ্গি পরে ছিল তারা সবাই জামাকাপড় পরে নিল। তারপর হুড়মুড় করে সামনের খোলামাঠে জমা হল। দশ-পনেরো মিনিট পরে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের সঙ্গে ছড়ি-হাতে কালো-স্যুটপরা প্রিন্সিপ্যাল সেই ছোট্ট মাঠে ঢুকলেন। দুজন কয়েদী দুখানা চেয়ার এনে রাখল। প্রিন্সিপ্যাল একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমরা কেমন আছ?

ভালো স্যার, খুব ভালো। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব আমাদের খুব দেখাশোনা করছেন। অনেকেই একসঙ্গে জবাব দিল প্রায় বাচ্চাদের নামতা পড়ার ঢঙে।

—আগামীকাল তোমাদের জামিনের জন্য কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার আনাচ্ছি। আমি এটা সহ্য করতে পারছি না যে বিনাদোষে তোমাদের কেন গ্রেপ্তার করবে। তাছাড়া সকলেরই পরীক্ষা সামনে। রোমান সেনেটরের মতো প্রাজ্ঞ মুখ লাল হয়ে উঠল।—শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিবের কাছেও পিটিশন করেছি। রায়টের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একবার আসবেন। তাঁর সঙ্গেও আমি ইন্টারভ্যু নেব।

—কিন্তু ব্যারিস্টার আনলে অনেক টাকা লাগবে, দেবু কথাটা শেষ করতে পারল না, প্রিন্সিপ্যাল বললেন—হ্যাঁ, তা প্রায় সব নিয়ে দু হাজার টাকা লাগবে, টাকাটা আপাতত আমিই দিয়ে দেব,—তারপর যা হয় দেখা যাবে।

—আমরা চাঁদা তুলব। দুটাকা করে প্রত্যেকে দিলে একদিনে তিনহাজার টাকা আপনার হাতে তুলে দেব। বেণু জোরের সঙ্গে কথাগুলো বলল, প্রিন্সিপ্যাল একটু হাসলেন।

—স্যার, কলেজ কবে খুলবে? রাধাগোবিন্দ ধীরস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করল।

—এই সোমবার থেকেই কলেজ খুলবে। টাউনের অবস্থা খুব ভালো, প্রিন্সিপ্যাল কথাগুলো বলতে বলতে উঠলেন, তারপর সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,—এদের একটু দেখবেন। সুপারিনটেনডেন্ট হাসলেন এবং মাথা নাড়লেন।

রাত্তিরের রান্নাটা হামিদ জমিয়ে করেছে, গরম-গরম পাঞ্জাবী ধরনের ফুসফুসে রুটি আর মার-মার কাট-কাট একটা ডাল। ছেলেরা বারান্দা জুড়ে লাইন দিয়ে বসে প্রাণ ভরে খেল।—আমরা আর হোস্টেলে যাব না। এইখানেই থাকব। এমন খাওয়া জীবনে খাইনি। জয় হামিদ খানের জয়। হামিদের হাতের রুটি, লুটে নিয়ে সাঁটি। হামিদের রান্না ডাল, করে দিল লাল। চাই হামিদের তরকারি, না হলে করব হারিকিরি। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ কর। লক-আপের সময় এগিয়ে আসছে। ভেতরে গিয়ে সবাই হলঘরে বসবে। সিম্পোসিয়ম শুরু হবে।

ঠিক রাত নটাতে সিম্পোসিয়াম শুরু হল। রাধাগোবিন্দ প্রধানত পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছেলে। প্রচুর পড়াশোনা করে। রাধাগোবিন্দ কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য নয়। ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গেও খুব প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকে এবং খুব অবজেকটিভভাবে যে কোন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে পারে।

—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সালিশির দ্বারা এসেছে। গণ-আন্দোলন দ্বারা অর্জিত হয়নি। একমাত্র মহাত্মাই উনিশশো ছেচল্লিশ সালের পর থেকে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। অথচ অন্যান্য নেতারা, যাঁরা ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেলের সঙ্গে আলোচনাতে ব্যাপৃত, তাঁরা অধিকাংশই তখন বিচ্ছিন্ন ক্লান্ত উচ্চ-মধ্যবিত্ত একদল মানুষ। মাউন্টব্যাটেনের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে যে গান্ধিজীকে মূল আলোচনাতে তিনি লিপ্ত করতে চাননি। তাঁকে কিছুটা বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে রেখে দিলেন মাত্র। হিন্দু এবং মুসলমান নেতারা ক্ষমতা পেতে

ব্যগ্র—এটা ব্রিটিশ রাজশক্তি, ক্রিপস দৌত্য এবং মন্ত্রীমিশনের সফরের পর পরিষ্কার বুঝতে পেরে-ছিলেন। বোধহয় গান্ধিজী ওঁদের এই লালসার কথা জানতেন। সেই সময়ে তাঁর নানা উক্তি, তথা-কথিত কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করলে এই অনুমানের পক্ষে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে। সুতরাং ইংলন্ডের রাজার প্রতিনিধির সঙ্গে নেতাদের আলোচনা বা নিগোসিয়েশান অখণ্ড ভারতে কোন গণভোট দ্বারা সমর্থিত হয়নি। জনসাধারণের ম্যানডেটের প্রশ্ন যাতে না ওঠে, তার জন্য মুসলীম লীগের সাহায্যে ঊনিশশো ছেচল্লিশ থেকেই ব্রিটিশ সরকার একটা কৃত্রিম সিভিল ওয়ারের আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন।

রাধাগোবিন্দ থামল। ছোট ছোট করে চুলকাটা, কালো এবং অত্যন্ত গোবেচারা গোছের মানুষ এমনি অগ্নিগর্ভ হতে পারে তা অনুমানই করা যায় না।

—সুতরাং ক্ষমতা লাভ করার জন্য একটা পথই খোলা ছিল,—তা হচ্ছে মাউন্টব্যাটেন যা বলবেন মাথা পেতে মেনে নেওয়া। মাথা পাতার ব্যাপারে কংগ্রেসী এবং মুসলীম লীগের কোন আপত্তি ছিল না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নিতান্ত অপারগ হয়েই যে ভারতবর্ষ থেকে সরে যাচ্ছে এবং এখানে থাকতে চাইলেও আর থাকতে পারবে না এটা মাউন্টব্যাটেন কাউকে বুঝতে দিলেন না। তার পরিবর্তে দাঙ্গা-অধ্যুষিত উপমহাদেশে মাউন্টব্যাটেন ত্রাণকর্তা হিসেবে নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। নেতারা সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন। মাউন্টব্যাটেন লিজেন্ড তৈরি হল। ইতিহাস, রাজনীতি, ভূয়োদর্শন—সমস্ত গোল্লায় গেল। অবশেষে স্বাধীনতা এল। শুধুমাত্র দুটো জায়গাতে স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ হল,—যেখানে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ছে সেই শূন্যে আর নোয়াখালি আর বিহারের প্রান্তরে গান্ধিজীর পদচিহ্নে। মাউন্টব্যাটেনের কীর্তিকাহিনী মুখে মুখে নেতারা প্রচার করতে লাগলেন। অথচ র‍্যাডক্লিফ সাহেব পাঞ্জাবের একটা ভুতুড়ে ডাকবাংলোতে বসে অল্প আলোতে তেলাপোকার পায়ে কালি লাগিয়ে একখানা পুরনো অস্পষ্ট ভারতবর্ষের ম্যাপের ওপর ছেড়ে দিলেন। যে পথ দিয়ে তেলাপোকাটা হেঁটে গেল সেইমতো ভারতবর্ষ ভাগ করা হল। গোটা ভারতবর্ষ গ্রাস করার সময় ব্রিটিশ অভিযানকারীরা যে বেপরোয়া সংগঠন-ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত প্রতিভা দেখিয়েছিল, ভারতকে টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখে যাবার সময় মাউন্টব্যাটেন কি সেই প্রতিভা দেখিয়েছেন? মোটেই না। মাউন্টব্যাটেন যেভাবে ভারত ভাগ করেছেন তা যে কোন চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারও করতে পারত। এই ধ্বংসের রাজ-কুমারের ধ্বংস করারও কোন কালাপাহাড়ি প্রতিভা নেই।

ছেলেরা খুব জোরে হাততালি দিল। রাধাগোবিন্দ মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ ধরে সেই হাততালি হজম করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,—এই নিগোসিয়েশানের ফলে স্বাধীনতা সোজা যাঁদের হাতে এল তাঁদের মধ্যে জবাহরলাল একমাত্র খাঁটি মানুষ। কংগ্রেসের গ্রুপ পলিটিকসের সম্পূর্ণ হলাহল নিজে এখনও পান করছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে দেশকে সঠিক অর্থনৈতিক বনিয়াদে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছেন। বর্তমানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝামাঝি পরিস্থিতি। মনে হয় না কৃষির ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। তবু নেহরু প্ল্যানড ইকনমির চার দেওয়ালের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতিকে এনে অর্থনৈতিক অরাজকতাকে রুখতে পেরেছেন। সেইজন্যই নেহরু আজ নিঃসঙ্গ মানুষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যদি রক্ষা পায় তবে সাধারণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি নেহরুর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জন্যই সেটা সম্ভব হবে।

—এ আজাদি একদম ঝুটা। ন্যাশনাল বুর্জোয়াজি স্বাধীনতাকে নিজের অর্থনৈতিক বিকাশের স্প্রিংবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছে। নেহরু সেই ন্যাশনাল বুর্জোয়াদের নেতা। ভারত-বর্ষের আনাচে-কানাচে আমেরিকান ইনফিলট্রেশান হচ্ছে। কালচারাল ফ্রন্টে আপনি দেখুন অচলপত্র

ইত্যাদি কাগজগুলো কেমন অবক্ষয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে. সমীর শুধুমাত্র ঢোঁক গেলার জন্য একটু থেমেছিল কিন্তু সেই মুহূর্তমধ্যে রাধাগোবিন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ল,—সমীর, শুধুমাত্র বুলি কপচাবে না। আমাকে বুঝিয়ে বলো ভারতবর্ষের ন্যাশনাল বুর্জোয়ারা কি ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের মতো শক্তিশালী? তদের হাতে চা, পাট আর সামান্য কিছু ইস্পাত এবং এঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ছাড়া আর কিছু আছে? অস্ত্রশস্ত্র, রাসায়নিক বস্তু, ইস্পাত.—সব মৌলিক বস্তুগুলির উৎপাদন পুরো-পুরি পাবলিক সেক্টরে। এগুলো হল যে-কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণভ্রমরা। এই বেসিক ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে প্রাইভেট সেক্টরের কবল থেকে বাঁচানো কি সোজা কথা? একটি ফর্সামতন ছেলে বলল—কিন্তু নেহরু ভীষণ দুর্বল মানুষ। বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের চেহারা দেখলে মন খারাপ হয়ে যাবে, যতসব থার্ডগ্রেড লোকজন রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করেছে। পশ্চিম বাংলাতেই দেখুন সুরেন ঘোষ প্রমুখকে পুরো উৎখাত করে হুগলী গ্রুপ রবরবা রাজত্ব করছে। এইসব লোক-দের চাপেই নেহরুকে কাজ করতে হবে। হ্যামলেটের ভূমিকা ছাড়া নেহরুর আর কোন ভূমিকা নেই।

—কিন্তু ভারতবর্ষ নামক নাটক ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে কিছুতেই অভিনীত হতে পারে না,—রাধাগোবিন্দ হেসে দিল। ছেলেরাও হাসতে লাগল। একদম শেষের দিকে একটা বাচ্চামত ছেলে বসে ছিল। বাইরে থেকে এসেছে। ইন্টারমিডিয়েট কমার্সের ছাত্র। ছেলেটি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর খুব লজ্জা-লজ্জা করে বলল,—আমি একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত। মাউন্টব্যাটেন সত্যি শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। দাঙ্গা এবং অঘোষিত গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার দায়িত্ব গভর্নর-জেনারেলের। তিনি সে দায়িত্ব পালন করেননি, কারণ এই হত্যার রাজনীতি দিয়ে তিনি বিবদমান ভারতীয় নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, একটা বিশেষ পর্যায়ে নেতাদের তিনি বলেছিলেন, যদি তাঁরা তাঁর প্রস্তাব মেনে নেন তবে তিনি ন্যূনতম সময়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এইসব মারামারি থামিয়ে দেবেন। এটা স্পষ্ট এই দাঙ্গার পরিস্থিতিটাকে গভর্নর-জেনারেল একটা বারগেইনিং পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। অথচ দাঙ্গা প্রথমে পুরোপুরি থামিয়ে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব মাউন্টব্যাটেনের অবশ্যই ছিল। মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষকে কয়েকটি বিরাট কবরস্থান আর শ্মশানভূমি উপহার দিয়েছেন। লেডী মাউন্টব্যাটেন তাঁর এয়ারকন্ডিশনড প্রাসাদ ছেড়ে রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে কয়েকটি উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করেছেন, সেইজন্য তাঁর মাথার চারপাশে মেরীমাতার জ্যোতির্বলয় পরিয়ে দেওয়া হল। গান্ধিজী তখন একা নোয়াখালিতে। মৃতদেহ, রবীন্দ্রনাথের গান আর সাধারণ মানুষ তাঁর তিন সঙ্গী।

—সত্যি, দারুণ বলেছ ভাই, বেণু উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল, গান্ধিজীর স্যাক্রিফাইস এবং ক্রুসিফিকেশন একটা অসাধারণ বিষয়, জানি না মহাকাব্যের উপযুক্ত কিনা। আমাদের সমস্ত ভুল-ত্রুটির দায়িত্ব এই মানুষটি নিয়েছিলেন। আমার মনে হয় এটাই গান্ধিজীবনের পিক পিরিয়ড।

—স্বাধীনতা এবং তার প্রতিক্রিয়া যদি দাঁড়িপাল্লাতে ওজন করা যায় তবে এই লিমিটেড ফ্রীডমের মূল্য আমরা অনেক বেশী দিয়েছি বলে মনে হয়। আরও কিছুদিন মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব রুখে দিতে পারলে সেনাহীন ব্রিটিশ সিংহের দেউলিয়াপানা এক্সপোজ হয়ে যেত। স্বাধীনতা আসতই, কারণ ইতিহাসের রায় তখন বেরিয়ে গেছে, দেবু নিশ্বাস নিয়ে থামল।

—অনেক রাত হল। আজ থাক। আবার নয় আগামীকাল আলোচনা করা যাবে, রাধাগোবিন্দ মৃদু হেসে কথাগুলো বলল।—কালকের জন্য কিছু রেখো না, আমাদের সকলের একসঙ্গে থাকার দিন গোনা-গুনতি, দীপুর কথা শেষ হতেই সভা ভাঙল। সভার শেষে দীপুর কথাগুলো সবার মনে গেঁথে রইল। সমীর ভাবল, যৌবন বড় বিষমকাল। আজ আছে, কাল নেই।

সরস্বতী পুজো এবং দাঙ্গার পর গরমের ছুটিটা একটু আগে আগে দিয়ে দেওয়া হল। ফলে কলেজ যখন খুলল তখন বৈশাখের মাঝামাঝি। সাধারণভাবে ঐ সময়ে গরমের ছুটি মাত্র শুরু হয়। তাছাড়া, স্বাভাবিক গরমের বন্ধের চেয়ে এবার আরও পনেরোদিন বেশী ছুটি দেওয়া হল। ঠিক হল কলেজ খোলার পর অন্যান্য ছুটি থেকে কাটাকুটি করে এই বাড়তি ছুটিটা সামঞ্জস্য করা হবে। কলেজ খোলার পর এক মাসের মধ্যে কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশন শেষ করার জন্য সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনটি পরিচিত মুখ কলেজ থেকে হারিয়ে গেছে। দাঙ্গা সংক্রান্ত অভিযোগে জীবনগতি জেলে। কেউ জানে না কতদিন তাকে এমনি জেলে থাকতে হবে। শোনা গেল, জীবনগতির বাড়ি থেকেও নাকি এ ব্যাপারে কোন তদ্বির তদারক করা হচ্ছে না। জীবনগতির সঙ্গে তার পরিবার নাকি কিছুতেই আইডেনটিফাইড হতে চায় না। লুধিয়ানা সরকার বাজারে ইলেকট্রিক গুডস-এর বিরাট দোকান দিয়েছে। অনেকগুলো চা-বাগানে সাপ্লাইএর ব্যাপারে সরকার ভীষণ ব্যস্ত। ওর সঙ্গে আর দেখাশোনাই হয় না। হাবুরা বহরমপুর বদলী হয়ে গেল। সুতরাং ইলেকশনের দিন ঠিক হয়ে যাবার পর বেণুর ঐ তিনজনের কথা খুব মনে হতে লাগল। বেণুর মনে হল, হয়তো জীবনে ওদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখাই হবে না। জীবনগতির সঙ্গে বেণুর চিরকালই খটাখটি ছিল, বারবার জীবনগতির সঙ্গে সম্পর্কটা মারামারির পর্যায়ে গিয়েছে। তবু জীবনগতির মতো স্বাস্থ্যবান জীবনশক্তিসম্পন্ন যুবকের জন্য বেণুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। হাবুটা হাসিখুশী ছিল খুব। বেণু চুপচাপ কমনরুমে বসে ছিল। একটা রঙিন ম্যাগাজিনে মুখ রেখে বেণু এইসব কথা ভাবছিল। ওই সময়ে দীপু কমনরুমে ঢুকল। তিনদল তাস খেলছে। তাসের দল যেদিকে বসেছে সেদিকে ভীষণ গোলমাল। রাধাগোবিন্দ অন্য একটি ছেলের সঙ্গে মাথা গুঁজে দাবাখেলায় মত্ত। দুটি ছেলে কমনরুমের বড় টেবিলে নতুন প্রাচীরপত্রটা লিখছে। প্রতি পনেরো দিনে এই পত্রিকাটা প্রকাশিত হয়। এই প্রাচীরপত্রিকাতে লেটারিং-এর কাজ প্রধানত বারীন দাস করে। বারীনের লম্বা চুল, তাতে কোনদিন তেল দেয় না। লম্বা চুল শার্টের কলার ছাপিয়ে উপচে পড়েছে। গায়ে ময়লা সাদা শার্ট, আর ধুতি। বারীনের রং কালো, কিন্তু নাক-মুখ বেশ চোখা। চোখটা ট্যারা। বারীন চুপচাপ একমনে ঘসে ঘসে কাজ করে চলেছে। মাঝামাঝি জায়গাতে দাঁড়িয়ে তিন-চারটে ছেলে হেমন্ত মুখার্জীর গান নিয়ে আলোচনায় মেতে আছে। দীপু বেণুর কাছে এল,—ওরা প্যাক্ট করে ফেলল। স্টুডেন্ট ফেডারেশনের বিপক্ষে আর সমস্ত সংগঠনগুলো একসঙ্গে ক্যানডিডেট দেবে।

—ওদের ক্যানডিডেট কে?—বেণু চোখ তুলে দীপুকে জিজ্ঞাসা করল।

—প্রাণহরি,—দীপু উত্তর দিল।

—ভীষণ পোটেনসিয়াল ক্যানডিডেট। প্রাণহরির মতো অজাতশত্রু ছেলেকে ওরা দাঁড় করালে দেবুর পক্ষে জেতা ভীষণ মুশকিল হবে,—বেণু প্রায় ফিসফিস করে বলল।

—তবে আজকে এস এফ অফিসে বসে ইলেকশান ট্যাকটিস ঠিক করতে হয়, দীপু বেণুর সম্মতির আশাতে তাকিয়ে রইল।

—ঠিক আছে, সন্ধ্যাবেলাতে বসা যাবে। ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে আলোচনা করে দেবুর প্রোভাইস ইলেকশন সম্পর্কে কোন নতুন কৌশল আবিষ্কার করা গেল না। অথচ এই ইলেকশনটা খুবই গুরুতর ব্যাপার। কারণ প্রোভাইস ছাত্রসংসদের নিয়মতন্ত্র অনুসারে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা নির্বাচিত হবে। তার ফলাফলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফেডারেশনের প্রভাব অন্যান্য সংগঠন অপেক্ষা অনুপাতে কতোটা কম বা বেশী। দ্বিতীয়ত, যখন বিভিন্ন ইয়ারে প্রতিনিধি নির্বাচন শুরু হবে তখন এই নির্বাচনের ফলাফল তার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। ইয়ার অনুসারে নির্বাচন আগে হওয়ার পর প্রোভাইসের জন্য নির্বাচন হলে ইয়ারওয়ারি নির্বাচনে

যারা জিতে যায় তারা প্রোভাইস ইলেকশনের সুবিধা পায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ আম নির্বাচনটাই আগে করা হয়। অনেক আলোচনার পর দিলীপদা বললেন,—আমাদের কৌশল হবে ডোর-টু-ডোর, ম্যান-টু-ম্যান ক্যানভাসিং।—ওম্যান-টু-ওম্যানও বটে, বেণু হাসল,—কারণ ম্যানরা মোটামুটি রাজনৈতিক-ভাবে কমিটেড কিন্তু ওম্যানদের একটা বৃহদংশ প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করে ভোট দেবে। সুতরাং মা-লক্ষ্মীরাই ব্যালান্স ভোট। সবাই হেসে দিল। বেণু হাসল না, গম্ভীরভাবে বলল,—অবশ্য দেবু ভালো থিয়েটার করে। সুন্দর আবৃত্তি করে। বেতের মতো লকলকে লম্বা। সুতরাং ওর মতো লালটুবাবুর ওপর মাতৃজাতির কৃপা আছে। আবার সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এবার দীপু মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল,—দেবুর ইলেকশন ম্যানেজার হচ্ছে কবি বেণু ব্যানার্জী, যিনি মেয়েদের দাঁতে পায়োরিয়া নিয়েও কবিতা লিখেছেন। সুতরাং এটা সত্যিই রাজনৈতিক। আবার সেই হাসি। হাসতে হাসতেই সভা শেষ হল। বেরোতে বেরোতে দেবু বলল,—যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা দেবু-বেণু-দীপু রেবা এবং আর দুটি ছাত্রীকে নিয়ে শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে ঝটিকা অভিযানে নামল। ওরা ব্যাপকভাবে ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র ফেডারেশনের প্রার্থী দেবুর অনুকূলে প্রচার অভিযান চালাতে লাগল। এই প্রচার অভিযানের সময় দুটো আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়ল, কোন ছাত্রীর বাড়িতে কোন ছাত্র গেলে প্রাণহরির সিওর ভোট উল্টে দেওয়া যাবে, সে ব্যাপারে রেবার পরিষ্কার ধারণা আছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি ছাত্রীই মানসিকভাবে কোন না কোন ছাত্রের ইমেজের সঙ্গে গাঁটবাঁধা। দ্বিতীয়ত দেবু এবং প্রাণহরি দুজনেই কলেজে অভিনেতা হিসেবে বিখ্যাত। দেবু সাধারণত নায়কের অভিনয় করে এবং প্রাণহরি বেঁটেখাটো মোটা-সোটা বলে বুড়োদের পার্ট নেয়। তরুণীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের শুধু এইজন্যই প্রাণহরি সম্পর্কে কোন উৎসাহ নেই। রেবা বলল,—সন্ধ্যার পরে আজ আমাদের বাড়িতে কারা আসবে, সেই-জন্য আজ প্রথম দিন এই পর্যন্তই থাক। আগামী কাল থেকে ফুল সুইঙে কাজ করা যাবে।

দেবু জিজ্ঞাসা করল,—তোমাদের তারা কি আসবার সময় পেল না?

হঠাৎ বেণু বলল,—তোমাকে কোন পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে না তো? তুমি যেন কেমন লজ্জা-লজ্জা করছ?

—তোমরা দেখে-দেখেই তো শেষ করে ফেলেছ, পাত্রপক্ষের জন্য কি কিছু আর অবশিষ্ট আছে?—রেবা হেসে জবাব দিল। সবাই তার হাসিতে যোগ দিল। দীপু বলল,—বেণু আর মুখ খুলবি না, এমন জবাব রেবা দিয়েছে যে তার আর কোন জবাব নেই।

দেবু এসব গোলমালের মধ্যে গেল না, সে কিছুটা গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলল,—সন্ধ্যাবেলাতে কলেজ হোস্টেলের কমনরুমে ইলেকশন সাবকমিটির মিটিং আছে। সুতরাং আমরা এখান থেকেই চলে যাচ্ছি, রেবারা যে যার বাড়ি চলে যাক।

ইলেকশন সাবকমিটির মিটিং দশমিনিটে শেষ হয়ে গেল, মতিলালবাবু, ডাঃ সাহা, সত্যজিৎ-বাবু এবং মনোবিকাশবাবু সবার কাছে ইলেকশনটা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাহ করার জন্য আবেদন করলেন। প্রাণহরি তার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য দিয়ে আশ্বাস দিল,—আমাদের তরফে আমরা কথা দিচ্ছি স্যার, কোন ঝামেলা হবে না। দেবু আর আমি বন্ধু। দেবু জিতলে আমি হারলে অথবা আমি জিতলে দেবু হারলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

—আমারও একই বক্তব্য স্যার, দেবু প্রাণহরির কথাতে সায় দিল। কিন্তু আলোচনা শেষ হবার আগেই হোস্টেলের একটি ছেলে প্রাণহরির হাতে একটা স্লিপ দিয়ে গেল। মতিলালবাবু স্লিপ কাগজটার দিকে অনেকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর থেমে থেমে একটু বা অন্যমনস্ক

হয়ে নানা কথা বলতে লাগলেন। বারবার প্রাণহরির হাতের স্লিপের দিকে তিনি ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। মনোবিকাশবাবু উপস্থিত অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। সবে পাশ করে কলেজে ঢুকেছেন। সবসময় পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। চুলে তেল দেন না। চুলে তেল না দেওয়ার জন্য লালচে চুলে তাঁকে অপেক্ষাকৃত কালো লাগে। দুগালে প্রচুর ব্রণের দাগ। মনোবিকাশ কথা বলতে বলতে একটু সিরিয়াস প্রসঙ্গে এসে গেলেই ডান গালে কোন অদৃশ্য ব্রণ খুঁটতে থাকেন। কী করে কেউ জানে না, সারা কলেজে ছাত্রদের মধ্যে রটে গেছে যে ক্লাশে মেয়েদের দিকে না তাকিয়ে মনোবিকাশ পড়াত পারন না। ফোর্থ ইয়ারের ইংরেজী অনার্স ক্লাশে রটনাটার সত্যতা যাচাই করার জন্য নাকি একদিন পুরোটা পিরিয়ড মেয়েরা টেক্সট বইয়ের পাতাতে নিজেদের দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছিল এবং মনোবিকাশ হঠাৎ 'শরীরটা খারাপ লাগছে, আজ এই পর্যন্ত থাক', বলে ক্লাশ শেষ করে দেন, যদিও পিরিয়ড শেষ হতে তখনও অনেক দেরি। সেই থেকে মনোবিকাশের নাম হয়ে গেল, নাভামাবি। অর্থাৎ, নারীভাবাপন্ন মনোবিকাশ। মনোবিকাশও মতিলালবাবুর মতোই কিছুটা অস্বস্তিভাব নিয়ে প্রাণহরির হাতে সেই স্লিপটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। ডাঃ প্রাণচন্দ্র সাহা কেমিস্ট্রির অধ্যাপক। দারুণ পণ্ডিত ব্যক্তি। পূর্ব পাকিস্তানের কোন এক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আপাতত রসায়নের সিনিয়র অধ্যাপক হিসেবে এই কলেজে আছেন। শোনা যায়, শিক্ষাবিভাগের কোন উচ্চপদে শীঘ্রই চলে যাবেন। ভদ্রলোক বয়স্ক, গম্ভীর। কিন্তু কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে গিয়েই শুধু বলতে থাকেন,—এই মালটা নেই, ও মালটা নিয়ে এস, এত মাল স্টকে ছিল, এখন একফোঁটাও নেই ইত্যাদি। অর্থাৎ ল্যাবরেটরির বিভিন্ন বস্তুকে তিনি 'মাল' শব্দের বহুল ব্যবহার দ্বারা অভিহিত করেন। এইজন্যই ছেলেরা তাঁকে 'মালবাবু' বলে ডাকে। সত্যি কথা বলতে কি, মালবাবু ছাড়া অন্য কোন নামে ডাকলে কেউ ডাঃ সাহাকে চিনতেই পারবে না। ডাঃ সাহা অনেকক্ষণ খুকখাক করে কাশলেন। এটা অনুমান করা গেল যে কোন টেনশানে মালবাবুর এই কাশিটা কন্ডিশনড রিফ্লেক্স। পরিষ্কার বোঝা গেল, প্রাণহরির হাতের অনির্ণীত স্লিপ কাগজখানাই এই উত্তেজনার উৎস। সত্যজিৎবাবুর কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না, তবে তিনি চুপ করে গেলেন। সত্যজিৎবাবু বাংলা পড়ান। বেশ বেঁটে এবং মোটাসোটা লোক। সবসময় কাঁধে একখানা চাদর ঝোলে, এমনিতেই সত্যজিৎবাবু খুব কম কথা বলেন, বড় একটা হাসতে দেখা যায় না। সত্যজিৎবাবু বাংলাতে এবং সংস্কৃতে ডাবল ফার্স্ট ক্লাশ। তিনি নাকি একখানা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিধান সংকলন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কোন সহকর্মী বইখানা নিজের নামে ছলেবলেকৌশলে প্রকাশ করে ফেলেন। সে বহুদিন আগের কথা। কতদিন আগের কেউ জানে না। তখন থেকে সত্যজিৎবাবুর মুখে পড়ানোর সময় ছাড়া এমনি কথাবার্তা কদাচিৎ শোনা যায়, হাসতে একেবারেই দেখা যায় না। সুতরাং সত্যজিৎবাবুর মুখের মুখোশের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া একেবারেই বোঝা গেল না। অবশেষে অনেক উচপিচ করে, একথা ওকথা বলে, দুহাতে আঙুলগুলো শব্দ করে মটকাতে মতিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন,—ঐ স্লিপটা আবার কে পাঠাল প্রাণহরি? মতিলালবাবুর মুখটা কথা বলার সময় বিকৃত দেখাল। মনে হল আঙুলগুলো মটকাতে গিয়ে তাঁর ব্যথা লাগছে। প্রীতিবাবু ডেকেছেন, সভা শেষ করে তাঁর বাড়িতে শুধুমাত্র আমাকে দেখা করতে বলেছেন। প্রাণহরি খুব সহজভাবে জবাব দিল।—হঠাৎ এই সময়ে প্রীতিবাবু ডেকে পাঠালেন?—নাভামাবি জিজ্ঞেস করলেন। কী যেন, বলতে পারছি না স্যার,—কথা বলতে বলতে প্রাণহরি এবং তার সঙ্গী আরও দু-তিনটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। এবং বাইরে বেরুবার জন্য দরজার দিকে মুখ ফেরানোর মাঝখানে মালবাবু প্রশ্ন করলেন—কিছু আন্দাজও করতে পারছ না?

—সত্যি না, প্রাণহরি তার সঙ্গীদের নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপরে বেণুদের আর

থাকবার কোন মানে হয় না। সুতরাং দেবু-বেণু-দীপু উঠে দাঁড়াল। মতিলালবাবু বললেন,—আরে তোমরা বসো। আর একটু বসো। কথা আছে। মতিলালবাবুর কথার মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ পেল। ভাবে মনে হল, ওদের তিনজনকে এখনই না বললে চলবে না এমন কোন কথা আছে। সুতরাং ওরা আবার বসল। এবার অধ্যাপকরা সবাই চুপ করে গেলেন। কেউ কোন কথা বলছেন না। সুতরাং তিনজন ছাত্র এবং চারজন অধ্যাপক এমনি চুপ মেরে বসে রইল। অবশেষে মালবাবু বললেন,—প্রাণহরিকে হাত করার জন্য প্রীতিবাবু ওকে ডাকিয়েছেন । সত্যি ভদ্রলোকের লজ্জা বলে কোন বস্তু নেই। এতো থিকস্কিন যে কোন নিন্দা চামড়ার ভেতর ঢোকে না, নাভামবি মন্তব্য করল। তেতো খেলে যেমন বিস্বাদভাব মুখে ফুটে ওঠে সত্যজিৎবাবুর তেমনি অভিব্যক্তি। নাকের পাশ দিয়ে দুটো বলিরেখা খুব পরিষ্কার হয়ে উঠল। মতিলালবাবুর হাত অদৃশ্য গোঁফ চুলকে, মাথার সিঁথি চুলকে চশমাটাকে ঠ্যালা দিয়ে সাইক্লিক অর্ডার পুরো করল। তিনি খুব রাগতভাবে বললেন,—দেবুদের কাছে ব্যাপারটা খুলে বলাই ভালো।—বলুন, মালবাবু উস্কানি দিলেন।—না বলাই উচিত। অথচ ব্যাপারটা প্রীতিবাবুরা এমন একটা স্টেজে নিয়ে যাচ্ছেন যে আমাদেরও মুখ খুলতে হচ্ছে, মতিলালবাবু মূল বক্তব্যে আসবার জন্যই ভূমিকা হিসেবে যে কথাগুলো বললেন সেটা উপস্থিত তিনজন ছাত্রের বুঝতে অসুবিধা হল না। মালবাবু খুকখাক কাশতে শুরু করলেন। কাশি থামলে রুমাল দিয়ে মুখটাকে খুব ভালো করে মুছে রুমাল ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন,—প্রীতিবাবু হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। সুতরাং নিজের বাড়ির বাজার খরচা, ডাল চাল মশলা—সবই হোস্টেলের ওপর দিয়ে উঠে যায়। সে তো সবাই জানে। কিন্তু রিসেন্টলি হোস্টেল অ্যাপ্রোচের রাস্তাটাতে মাটি ফেলার জন্য অনেকগুলো টাকা গভর্নিং বডি স্যাঙ্কশন করেছিল। সামান্য দু-চার ঝুড়ি মাটি ফেলে সারাটা বর্ষা আর কোন কাজ হল না। অথচ গত মিটিংএ প্রায় বিশহাজার টাকার কনট্রাকটারের বিল পাশ করানোর জন্য চেষ্টা করা হল। মতিলালবাবু স্টাফ সাইড থেকে গভর্নিং বডিতে আছেন, সুতরাং ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন,—কোন কাজই হয়নি অথচ বিল পাশ হচ্ছে কী করে। কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রিন্সিপ্যাল আর প্রীতিবাবু কী করে সই করলেন? মতিলালবাবুর প্রশ্ন শুনে মালবাবু একটু থেমে জিভ কাটলেন,—প্রিন্সিপ্যাল বললেন, গত বছর জোর বন্যাতে আর বর্ষায় মাটি ধুয়ে গেছে। যেটুকু বা মাটি অবশিষ্ট ছিল তা আবার চৈত-বোশেখের শুকনো ঝড়ে অদৃশ্য। নাভামবি হাসতে লাগলেন। সত্যজিৎবাবুর তিক্ত এক্সপ্রেশনটা কিছুটা কমের দিকে। মতিলালবাবুর ডান হাতের তর্জনী যদিও সাইক্লিক অর্ডারে ব্যস্ত, তবু তিনি মুখ খুললেন,—কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। ডিসেন্ট নোট দিয়ে পুরো ব্যাপারটা থার্ড পার্টি দিয়ে অনুসন্ধান করানোর দাবি জানিয়েছি। তা না হলে আবার ঐ অ্যাপ্রোচ তৈরি করাবার জন্য এ বছর বাজেট স্যাংশন ওরা করাবেই করাবে।

—কিন্তু থার্ড পার্টিটা কে যিনি এই ব্যাপারে এনকোয়ারি করবেন? বেণু এই প্রথম কথা বলল। ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়র—মতিলালবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—ভদ্রলোক প্রাণহরির কেমন আত্মীয়। তাঁকে প্রাণহরির থ্রুতে প্রীতিবাবু ইনফ্লুয়েন্স করাতে চান।

—এবার প্রোভাইস ইলেকশনে প্রিন্সিপ্যাল যদি ভেতরে ভেতরে প্রাণহরিদের নির্বাচনী জোটকে ব্যাক করেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, নাভামবি মন্তব্য করলেন। সত্যজিৎবাবু অশ্বিনীদণ্ডে কর্মযোগে শিরদাঁড়া সোজা করে বসার নির্দেশ পুরোপুরি স্মরণে রেখে একদম সোজা হয়ে বসার পর অন্য তিনজন অধ্যাপকের চেয়ে তাঁকে লম্বা দেখাল।

—তোমাদের গায়ে একটু কম্যুনিস্ট গন্ধ আছে, তাই ভয় পায়। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল চান না তোমরা ছাত্রসংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করো। শুনেছি এ ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে

নানাসূত্রে চাপ আসছে,—মতিলালবাবু কাঁওকাঁও শব্দ করে তালু চুলকে নিলেন।

—সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমরা তোমাদের পার্টি সোর্সে অ্যাসেমব্লিতে মাটি কাটার ব্যাপারটা নিয়ে একটা কোশ্চেন স্ট্যাট করাতে পার, ডাঃ সাহা প্রধানত বেণুর দিকে তাকিয়ে প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটা বেণু পছন্দ করছে কিনা এটা বেণুর মুখের প্রতিক্রিয়া থেকে তিনি একটা আন্দাজ করতে চান,—তাহলে প্রিন্সিপ্যাল ভয়ে-ভয়ে থাকবেন। ইলেকশানে কোন চোরাগোপ্তা প্রভাব তোমাদের বিরুদ্ধে খাটাতে সাহস পাবেন না। কারণ এই প্রিন্সিপ্যালটা হচ্ছে শক্তের ভক্ত আর নরমের যম। 'প্রিন্সিপ্যালটা' বেণু, দীপু আর দেবুর কানে ভীষণ বিশ্রী শোনাল।

—অনেক রাত হয়ে গেল স্যার। আজ আমরা উঠি, বেণু উঠে দাঁড়াল। দেবু আর দীপু বেণুকে অনুসরণ করল।

—তাহলে চিন্তাভাবনা করে তোমাদের মতামত আমাকে জানাবে। চিন্তাভাবনা আর এর মধ্যে বেশি কিছু নেই। তোমরা জান, গান্ধিজীর আদর্শ মাথায় রেখে সারাজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। তোমরা যদি সাহায্য না কর তবে একাই লড়তে হবে। মতিলালবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দেবু, বেণু, দীপু মতিলালবাবুর কথার কোন জবাব দিল না, একটু হেসে বাইরে বেরিয়ে গেল। পথে নেমে দেবু জিজ্ঞাসা করল,—আমি বুঝতে পারি না প্রাণেশকাকু থেকে শুরু করে মতিলালবাবু পর্যন্ত প্রত্যেকটা লোক এইসব ব্যাপারে আমাদের জড়াতে চায় কেন?—কারণ প্রাণেশকাকু, মতিলালবাবু সবাই গোলন্দাজ। তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেবার জন্য প্রত্যেকেরই একটা করে লক্ষ্যবস্তু আছে। আর আমরা হচ্ছি সেই তোপের বারুদ,—বেণু মন্তব্য করল।

দেবু বেণুর সিরিয়াসনেসকে পাত্তা দিল না, ও বলল,—কিন্তু প্রীতিবাবুর কামানের লক্ষ্য-বস্তু কে?—আপাতত প্রাণহরি, দীপু মন্তব্য করল। দীপুর কথা শুনে ওরা হাসতে আরম্ভ করল। প্রাণহরি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়, বেণু আবার খোলামেলা মুডে ফিরে এল।

কলেজ ইউনিয়ন ইলেকশনের তিনদিন আগে ঠিক দুপুরবেলাতে একটা সংবাদ এল। সংবাদটা এল রেবার মাধ্যমে। রেবার কাছেই প্রথম সংবাদটা আসে। কারণ যে তিনটি ছেলে সম্পর্কে সংবাদ এল তাদের বাড়ি রেবাদেরই পাড়াতে। রেবা ব্যক্তিগতভবে সারা রবিবার ওদের পেছনে পড়ে-ছিল। সারা রবিবারের চেষ্টার ফলে সুধীন, সঞ্জয় আর সুবোধ কথা দিয়েছিল যে সোমবার থেকে ওরা পুরোপুরি দেবুর পক্ষে কাজ করবে। সুধীন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। খুব ভালো ফুটবল খেলে। ভীষণ হাসিখুশী ছেলে। ফার্স্ট ইয়ার আর্টস এবং সায়েন্সের ছেলেদের ভেতর সুধীনের খুব প্রভাব। সঞ্জয় দেশবন্ধু ব্যায়ামাগারের ছেলে। স্বাস্থ্য খুবই ভালো। সেকেন্ড ইয়ারের সায়েন্স এবং আর্টসে সঞ্জয়কে সবাই ভয় পায়। সঞ্জয় সব সময় পাঞ্জাবির নীচে খুব বড় একটা ছোরা রাখে। সত্যিই ছোরাটা সে রাখুক বা না রাখুক, তার সম্পর্কে গুজব তাই। ছেলেটা সেকেন্ড ইয়ারে প্রাণহরির পক্ষে মারাত্মক কাজ করেছে। সঞ্জয় রাজনীতি বোঝে না। প্রাণহরি অনেক চেষ্টা করে ওকে পক্ষে নিয়ে তারপর ওকে অ্যাকটিভ করে তুলেছিল। দেবুর পক্ষে কেউ সেকেন্ড ইয়ারে ঢুকতেই পারছে না। সুবোধ সঞ্জয়ের খুব বন্ধু। সঞ্জয় যা করবে, সুবোধ বিনা দ্বিধাতে তাই করবে। সুতরাং দেবুর জেতার প্রশ্নে সেকেন্ড এবং ফার্স্ট ইয়ারে যে সংকট দেখা গিয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য এই তিনটি ছেলেকে হয় দেবুর পক্ষে নিয়ে আসতে হবে, অথবা ওদের তিনজনকে নিরপেক্ষ করে দিতে হবে। রেবা ওদের পাড়ায় থাকে, সেই সুবাদে সুধীন, সঞ্জয় আর সুবোধের সঙ্গে যোগাযোগ করল। রেবাকে ওরা দিদি বলে। সুতরাং প্রথমে দু-চারটে ভদ্রতাসূচক কথা বলে ওরা ভেগে গেল। পাত্তাই পাওয়া গেল না। ভরদুপুরে সুধীনের বাসাতে আবার রেবা ওদের পাকড়াল। রেবা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ওদের মগজ ধোলাই করল। পদ্মিনীর মতো রেবা এই যুবকত্রয়ের

বীররস জাগ্রত করতে সফল হল। যেভাবে কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াই ওরা প্রাণহরির ক্যাম্পে গিয়েছিল সেইভাবেই ওরা সেই শিবির ত্যাগ করার ইচ্ছা ঘোষণা করল। সন্ধ্যাবেলাতে নিজেদের ফ্রন্টের এই জোর খবর দেবুর কাছে রেবা পাঠিয়ে দিল। রাতে ফেডারেশন অফিসে বসে অবস্থা পর্যালোচনার সময়ে দেবুদের ক্যাম্পে একটা নিশ্চিন্ততা ফিরে এল। সোমবারে রেবাদের ফার্স্ট পিরিয়ডে অনার্স ক্লাশ ছিল। সুতরাং রেবা বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছে। ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হতেই দেখল তাদের কমনরুমে সুবোধের ছোট ভাই স্লিপ পাঠিয়েছে। রেবা একটা কিছু ঘটেছে এটা আন্দাজ করে তাড়াতাড়ি কলেজের অফিসের বারান্দাতে এসে সুবোধের ভাইএর সঙ্গে দেখা করল। সুবোধের ভাই পড়িমরি করে সাইকেল চালিয়ে এসেছে। তখনও হাঁফাচ্ছে। ভালো করে কথা বলতে আরও কিছু সময় নিল। তারপর বলল,—সুবোধেরা তিনবন্ধু কলেজে আসবার জন্য বেরিয়েছিল। গলি থেকে বড় রাস্তাতে পড়তেই একটা গাড়ি করে একদল লোক মারধোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে থানাতে খবর দেওয়া হয়েছে। তিন বাড়িতেই কান্নাকাটি পড়ে গেছে। রেবা বুঝল এই তিনটি পরিবারই এই ঘটনার জন্য পুরোপুরি তাকে দায়ী করবে।

তড়িৎগতিতে খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে ছাত্ররা জোট বেঁধে প্রিন্সিপ্যালের ঘরের সামনে জড়ো হল। প্রাণহরি সহ দেবু, বেণু আর দীপু প্রিন্সিপ্যালের ঘরের মধ্যে ঢুকল। প্রিন্সিপ্যালকে পরিষ্কার ভাষাতে প্রাণহরি বলল,—এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। আমাদের সন্দেহ, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা স্টেজম্যানেজড ঘটনা। আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে নির্বাচনের হাওয়া ঘুরিয়ে দেওয়ার এটা একটা জঘন্য চেষ্টা। দেবু বলল,—প্রাণহরির ইঙ্গিতে অনেক কিছু হচ্ছে। কথা-কাটাকাটির মধ্যে আমরা যেতে চাই না। তাতে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। সামান্য একটা কলেজ ইলেকশনের ব্যাপারে এই গ্যাঙস্টারইজমকে আমরা নিন্দা করি। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান হোক। দোষী শাস্তি পাক।

মাঠের মধ্যে তখন অনেক ছেলে জমা হয়েছে। বোঝা গেল সেই ভিড়টা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। গরম-গরম বাদানুবাদ প্রিন্সিপ্যালের ঘরেও ভেসে আসছে। প্রিন্সিপ্যাল দেবু এবং প্রাণহরির বক্তব্য শোনবার পর একটু চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ নিজের চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন,—তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো। মাঠে এত ভিড় কেন? প্রিন্সিপ্যাল গটগট করে ঘর থেকে বেরুলেন। প্রাণহরি এবং দেবু দুজনেই লক্ষ্য করল যে মাঠের মধ্যে সাধারণ ছাত্রদের মোকাবিলা করার জন্য প্রিন্সিপ্যাল ওদের কোন সাহায্য চাইলেন না। তাঁর সঙ্গে আসবার জন্যও বললেন না। প্রিন্সিপ্যাল মাঠের মধ্যে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন,—তোমরা যে যার ক্লাশে এখনই ফিরে যাও। তা যদি না যাও এবং কোনরকম গোলমাল যদি হয় তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ডি সিকে জানাতে হবে। তিনি যা ব্যবস্থা করবেন তাই মানতে হবে। তবে কলেজ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করে দেব। আমার বিশেষ ক্ষমতাবলে ছাত্র ইউনিয়নও ভেঙে দেব। কলেজ ইউনিয়নকে ট্রেড ইউনিয়নের লেভেলে নিয়ে আসা আমার পছন্দ নয়। প্রিন্সিপ্যালের কথাতে কাজ হল। ছেলেরা ক্লাশের দিকে এবং কমনরুমে ফিরে গেল। এমনিতেই কলেজের অধিকাংশ ক্লাশই এই সময়ে শেষ হয়ে থাকে। সুতরাং অধিকাংশ ছেলেই বাইরে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কলেজের আবহাওয়ার মধ্যে একটা থমথমে ভাব রইল। প্রিন্সিপ্যাল ঘরে ঢুকলেন। নিজের চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা জল খেলেন। তারপর আবার ওদের ডাকলেন। প্রাণহরি দেখল প্রিন্সিপ্যালের মুখটা লাল হয়ে গেছে। ভদ্রলোক খুবই উত্তেজিত হয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রিন্সিপ্যাল আজকের ঘটনাকে সহজে নেবেন না। প্রিন্সিপ্যাল প্রাণহরির দিকে তাকিয়ে বললেন,—দেখ তো মতিলালবাবু আছেন কিনা। প্রাণহরি মতিলালবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। মতিলালবাবু

বসালেন, প্রিন্সিপ্যাল তাঁকে মোটামুটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন,—এখন ইলেকশন সাবকমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় দেখুন। এটা বোঝা গেল, প্রিন্সিপ্যাল ইলেকশন সাব কমিটির সভাপতি হিসেবে মতিলালবাবুকে ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত করতে চান। অথচ মতিলালবাবুর মুখটা খুশি খুশি। এই সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য তাঁকে মোটেই বিমর্ষ দেখাচ্ছে না। তিনি সোজাসুজি প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকিয়ে বললেন,—এসব বাইরের ঘটনা। এর অনুসন্ধান করবে পুলিশ। আমাদের কাজ ইলেকশনের পদ্ধতিগত বা আইনগত সমস্যার সমাধান করা। কেউ কাউকে কিডন্যাপ করলে, চাকু মারলে, রাস্তাতে মারামারি করলে তাতে আমাদের কোন ভূমিকা নেই।

—আপনি ব্যাপারটাকে খুব অ্যাবসলিউট পয়েন্টে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের দেখতে হবে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যেন কোন খুনোখুনি না হয়। সেটা দেখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধের জন্যই রায়টের সময়ে ছেলেদের জামিন মুভ করাবার জন্য কলকাতা থেকে নিজের পকেট থেকে খরচা করে ব্যারিস্টার আনিয়েছি। অথচ ব্যারিস্টার আনানোর জন্য আমার কোন অবলিগেশন ছিল না। কথা শেষ করে ঘরের মধ্যে ছেলেদের দিকে তাকালেন প্রিন্সিপ্যাল। সবাই বুঝল মতিলালবাবুর চোখে প্রিন্সিপ্যাল চোখ রাখতে চান না।

—সেটা আলাদা ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, মতিলালবাবু কথাগুলো বলে উঠে গেলেন। প্রিন্সিপ্যাল ঠিক এই সময়ে কী একটা কাগজ দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বোঝা গেল, ইচ্ছা করেই মতিলালবাবু প্রস্তাবটা আমল দিলেন না। এই সময়ে অফিসের হেড ক্লার্ক হেমবাবু ঘরে ঢুকলেন।—থানার বড় দারোগা আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছেন, পাঠিয়ে দেব?

সুভাষ সেন ঘরে ঢুকল, স্যালুট করল, তারপর প্রিন্সিপ্যাল আমন্ত্রণ করার পর তাঁর সামনে চেয়ারে বসল। সুভাষ সতর্কভাবে সব কাজ করতে চায়। কারণ রায়টের সময়ে নানা ব্যাপারে কলেজের ছাত্র এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে। দেবু সুভাষ সেনের সেই দ্বিমাত্রিক দৃষ্টির দিকে তাকাল। দেবু বুঝতে পারল, কয়েক মাস আগে সুভাষের দৃষ্টিতে যে অগভীর অংশ দেখেছিল সেটা অন্তর্হিত। সুভাষ সেনের দৃষ্টিতে এখন বিপুল গভীরতা।

সুভাষ বলল,—স্যার, দক্ষিণপাড়ার তিন বাড়ি থেকে তিনটে ডায়েরি হয়েছে। সুবোধ, সঞ্জয়, সুধীনকে নাকি কারা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। এই নিয়ে খুব কমোশন হয়েছে। আপনার এখানে আসবার একটু আগে আপনাদের থার্ড ইয়ারের—চোখ বুজে সুভাষ কপালে টোকা মারতে লাগল, তারপর চোখ খুলে বলল,—ঠিক নামটা মনে আসছে না, বোধ হয় কানাই-টানাই হবে। ছেলেটাকে ছোরা মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। আঘাত খুব বেশি নয়, তবে হি ইজ ইন এ স্টেট অব শক। ছেলেটির কাছ থেকে স্টেটমেন্ট নেবার চেষ্টা করলাম, সে বলল, বেণু কে একজন আছেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে যা বলার বলবে। ছেলেটিকে হাসপাতাল পাঠিয়ে দিয়েছি।—এই তো বেণু, ডান হাত তুলে প্রিন্সিপ্যাল দেখালেন।—ও আপনি? সুভাষ হাসল, মুখ চিনি, কিন্তু নামগুলো মনে রাখা মুশকিল। সুভাষ প্রিন্সিপ্যালের দিকে মাথা ঘোরাল। কোলের ওপর টুপিটার ওপর দুটো হাত।—কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশনের ব্যাপার নিয়ে যদি এইসব ব্যাপার ঘটে তবে আমাদের মুশকিল। কিছু করলেও আমরা আনপপুলার হয়ে যাই, আবার কিডন্যাপ এবং ছোরা মারার মতো ঘটনা ঘটলে আমরা ইনটারফিয়র না করেও পারি না।

—আমি চেষ্টা করছি যাতে পরিস্থিতির আর কোন অবনতি না হয়। তবে রাস্তাঘাটে অথবা কোন এলাকাতে এই ইলেকশনের নিয়ে কোন অপরাধ কেউ করলে আপনারা আইনমত স্টেপ নেবেন। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

—কিন্তু আমার ইনফরমেশন গোলমাল আরও হবে,—সুভাষ সেন মন্তব্যটা করবার সময় একটু হাসল।

—কিন্তু যে তিনটি ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের কি কোন খোঁজ পাওয়া গেল? দীপু জিজ্ঞাসা করল।

—ঐ তিনটি ছেলের ব্যাপার নিয়ে আমি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলব। তবে নিজেদের মধ্যে আপনারা সব কিছু মিটিয়ে ফেললে ব্যাপারটা ভালো হত। দীপুর দিকে তাকিয়েই সুভাষ কথাগুলো বলল। দীপু কোন জবাব দিল না। ছেলেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কারণ বোঝা গেল সুভাষ প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চায়।

সন্ধ্যা হবার আগে প্রাণহরিদের রাজনৈতিক দলের বইএর দোকানে একদল ছেলে আগুন দেবার চেষ্টা করল। এইরকম একটা চেষ্টা হতে পারে, সেই কানাঘুসো বিকেলের দিকেই শোনা গিয়েছিল। সুতরাং ওরা প্রস্তুত ছিল। যারা আগুন দিতে গিয়েছিল তাদেরকে নাকি বেধড়ক পিটিয়েছে। কিন্তু কারা দোকানে আগুন দিতে গিয়েছিল, পেটানি খেয়ে তারাই বা কোথায় গেল,—এসব কোন হদিশই পাওয়া গেল না। বেণু বলল,—সুবোধ-সঞ্জয়-সুধীনের কিডন্যাপের ব্যাপারটাকে কাউন্টার অ্যাক্ট করবার জন্য একটা সাজানো ব্যাপার। যারা আগুন দিতে গিয়েছিল তারা যদি ঐরকম মার খায় তবে হাসপাতালে যাবার কথা। অথচ কারও কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যার আগে দেবুর বাবা কামাখ্যাবাবু অফিস থেকে ফিরে বাইরের ঘরে বই পড়ছিলেন, হঠাৎ অনেকগুলো ঢিল পড়ল টিনের চালে। এরকম ঘটনা কোনদিনই ঘটেনি। তাই দরজা খুলে বাইরে এলেন। দেখলেন বাড়ির দরজা থেকে একটু দূরে রাস্তার ওপর পাঁচ-ছয়টি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেগুলিকে তিনি চেনেন না। দুটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল,—দেবু বাড়ি আছে?

—না।

—দেবুকে সাবধান করে দেবেন। কলেজ ইলেকশনের ব্যাপারে নিজের নাম উইথড্র না করলে আমরা ওকে খতম করে দেব, কথাগুলো কোনরকমে বলেই ছেলেগুলো, দৌড়ে পালাল। দেবুর বাবা আবার বই পড়তে বসে গেলেন। কোনরকম উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। ঠিক ঐ সময়েই দীপুর ছোট বোনের হাতে দু-তিনটি ছেলে একটা স্লিপ কাগজ ধরিয়ে দিল। বাড়িতে সেই কাগজ খুলে রীনা দেখল তাতে লেখা আছে,—দীপু যদি কলেজ ইলেকশনে দেবুর পক্ষে কাজ করে তবে আগামীকাল সকালে তার মরা মুখ দেখতে হবে। রীনা স্লিপটা পড়েই কান্নাকাটি শুরু করল। দীপুর মা সেই কান্না শুনে ছুটে এসে কাগজটা পড়ে দীপুর বাবার কাছে দৌড়ে গেলেন।

বাবা সেই সময়ে গণেশমামার সঙ্গে তাঁর চা-বাগানের শেয়ারগুলোর বিক্রির ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলেন। দুজনেই গভীরভাবে আলোচনাতে মগ্ন। গণেশমামা এবং বাবা মাকে কাঁদতে দেখে প্রথমে বুঝতেই পারলেন না ব্যাপার কী। গণেশমামাই দীপুর মার হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে পড়ল। পড়তে পড়তেই গণেশমামার মুখের সেই বাঁকা মৃদু হাসিটা গভীর হল। দাঁত বের করে গণেশমামা খুকখুক করে হাসল। দীপুর মা গণেশমামার সেই হাসি-কাশির মাঝামাঝি এই অভিব্যক্তিতে এবং খুকখুক শব্দে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। কারণ দীপুর মা জানেন গণেশ এখন দীপুর বিরুদ্ধে সুরেশবাবুকে নানা কথা বলবে। সুতরাং গণেশ যাতে বেশি কিছু না বলতে পারে এইজন্যই দীপুর মা নিজেকে সংযত করে নিলেন। প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,—এইসব কলেজ ইলেকশন-টিলেকশনের ব্যাপারে এসব ঝামেলা হবেই। প্রথমটাতে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দেখি, পাড়ার কোন ছেলেকে ডেকে ব্যাপার আগে জেনে নি।

সুরেশবাবু বললেন,—মথুরবাবুর ছেলে সন্দীপকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে

পারবে। সন্দীপও ওদের কলেজের একজন পান্ডা।—পান্ডা আপনার ছেলেও কম নয়। হাসতে হাসতে কাশতে কাশতে গণেশ কথাগুলো বলল,—বাড়ির এই অবস্থা, কাল চলবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই অথচ ছেলে পলিটিক্স করছে। গণেশের মন্তব্যে সুরেশবাবুর মুখে একটা কালো ছায়া পড়ল। তিনি মুখ নীচু করে ডানহাতের করতল দেখতে লাগলেন। সুরেশ আজকাল জ্যোতিষ-চর্চাতে খুব মন দিয়েছেন। সারাদিন জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানা পড়াশোনা নিয়ে থাকেন, পরিচিত এবং বন্ধুবান্ধবদের হাতও দেখেন। মাঝেমাঝে নিজের হাত খুলেও তাকিয়ে থাকেন। সুরেশ জানেন তাঁর পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। এক নিদারুণ অবসাদ এবং নানা সংকোচের জালে তিনি জড়িয়ে আছেন। এই ছোট্ট শহরে সবাই তাঁর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সবকিছু জানে। বাজারে তিনি কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করছেন, কাঁইয়াদের কাছে মায়ের গহনা একের পর এক বন্ধক দিচ্ছেন, গণেশমামা আর কানু মহারাজ ফিসফিসিয়ে সদাগরপট্টির চায়ের দোকানে একে ওকে সবকিছু বলে বেড়াচ্ছে। তবু ওপরে ওপরে জান প্রাণ দিয়ে তিনি ধনী লোক এই সাতপুরুষের মিথ্‌টা তাঁকে বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে। এই শহরে সুরেশবাবুর যা পারিবারিক প্রভাব তাতে চা-বাগানের হেড অফিসে কোন চাকরি জোগাড় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। এইরকম একটা চাকরি পেলে সংসারটা ভরাডুবি থেকে বেঁচে যাবে। তবু সেই প্রাচুর্যের মিথ্‌টা বাঁচাবার জন্য নারায়ণ শিলার মতো অচল অনড় হয়ে ভদ্রাসনে বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই মানসিক অচলায়তনটা সুরেশ বারবার ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুরেশ জানেন তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্য হয় তাঁকে চাকরি করতে হবে অথবা ব্যবসা করতে হবে। এই দুটোর জন্যই শহরের চার-পাঁচজন শিল্পপতির কাছে তাঁকে যেতে হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে তবে দেখা করতে হবে। তারপর নানা পাকচক্র অলিগলি পেরিয়ে কোথায় কে নিয়ে যাবে কে জানে। সুরেশ হাতটা মুঠো করলেন।

সন্দীপের সঙ্গে দীপুর মায়ের যে কথা হচ্ছিল গণেশ ও সুরেশ ঘরের মধ্যে বসে শুনতে পাচ্ছিলেন।—বেণু, দেবু, দীপু ফেডারেশন অফিস থেকে বেরিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরছিল। ঠিক হয়েছিল সন্ধ্যার পর দিলীপদা ওদের নিয়ে পুরো একজিকিউটিভএর সঙ্গে বসবে। প্রাণেশকাকুও উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু গলির মুখে একদল ছেলে লুকিয়ে ছিল। ওরা ওদের তিনজনকেই আক্রমণ করে। আমরাও রুখে দাঁড়াই। দেবু আর দীপুর কিছু হয়নি। বেণু ডানহাতে ছোরার খোঁচা লেগেছে। খুব বেশী কিছু নয়। তবে রক্ত পড়েছিল খুব। ওরা এখন হাসপাতালে।

[ক্রমশ]

স মা লো চ না

অবনীন্দ্র রচনাবলী—তৃতীয় খণ্ড। প্রকাশ ভবন। কলিকাতা, ৭৩। মূল্য ২৮·০০ টাকা।

অবনীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে প্রকাশ ভবন থেকে। তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল এর দু বছর পূর্বে, ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে। প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাস। সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও অক্ষয় সম্পদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়ে প্রকাশক সংস্থা যাবতীয় পাঠকের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। গ্রন্থখণ্ডগুলির মুদ্রণ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, মলাট ও প্রচ্ছদচিত্র প্রশংসনীয়, গ্রন্থমূল্য আজকালকার বাজারের হিসাবে সুসঙ্গত। প্রকাশক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্য একটি কারণেও আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। এই সংকলনকার্যে তিনি যাঁদের সাহায্য যাচ্ঞা করেছেন ও লাভ করেছেন—শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীরাণা বসু, শ্রীসুবিমল লাহিড়ি—এঁদের চেয়ে যোগ্যতর সহায়ক কোথাও কেউ আছেন কিনা জানি না। প্রতি খণ্ডেই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রতি খণ্ডেই সংযোজিত অংশগুলির প্রথম সাময়িকী প্রকাশের তারিখ ও আধার নির্দেশিত হয়েছে। এই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের অন্ত্যভাগে যে 'গ্রন্থপরিচয়' মুদ্রিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে :

> মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পাঠ একেবারে অভিন্ন নয়। "বঙ্গবাণী" এবং "চিত্রা"র পাঠের মধ্যেও অনেকাংশে ভিন্নতা আছে।

এই পাঠভেদগুলি যদি গ্রন্থশেষে পুরোপুরি দেওয়া হত তাহলে সম্পাদনাকার্য সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ হত। প্রথম খণ্ডের শুরুতে 'কস্ত্বং কুতোহসি কিন্নামতে' শীর্ষক যে ফটোকপিটি দেওয়া হয়েছে "আপন কথা"র একটি পাতার, সেই কপি দেখে মনে হয় না যে অবনীন্দ্রনাথ কোনো বড়ো-রকমের পরিবর্তন করতেন তাঁর রচনায়, যে ধরনের মৌল পরিবর্তন পাওয়া যায় কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল ওড্‌ কবিতায় অথবা রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতায়।

বহুরূপী নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা ছিল লেখক অবনীন্দ্রনাথের। অসামান্য প্রতিভার মৌল দুইটি লক্ষণই বিদ্যমান তাঁর রচনায়। প্রথম লক্ষণে দেখতে পাই যে তাঁর রচনাশক্তি স্বয়ংজাত, স্বয়ম্ভূত, এই শক্তি অর্জন করার জন্য তাঁকে শিক্ষানবিশি করতে হয়নি। বস্তুত তাঁর রচনার বিষয়-বস্তু ও শৈলী এমনি বিস্ময়াবহ নবত্বে মণ্ডিত, সাহিত্যের কুলপঞ্জী এমনভাবেই এড়িয়ে গেছে এই রচনা যে একে কোনো জাতি-গোষ্ঠী-শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের রচনা একমেবা-দ্বিতীয়ম্‌। এই অদ্বিতীয়তার সুবাদেই আমার (এবং খুবই সম্ভবত আরো অনেক পাঠকের) চিত্তে কৌতূহল জাগে : অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলির চূড়ান্ত রূপটি এই মহৎ লেখকের প্রাক্‌-প্রকাশ ভাবনায় এক ঝিলিকেই উদ্ভাসিত হত, না কি ধীরে ধীরে, পর্যায়ের পরে পর্যায়ে, এখানে একটি শব্দের বা বাক্যের বা স্তবকের পরিবর্তন, ওখানে অনেকগুলি শব্দের সমাহারের পরিবর্তন সাধন করে' অবশেষে একটি নিটোল পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করত? যতদূর দেখতে পাই এবং নানাভাবে জানি, এই নিটোল রচনাশক্তি অর্জন করার জন্য অবনীন্দ্রনাথকে কোনোদিন মক্‌শো করতে হয়নি, কোনো মক্‌স-কর্মের আভাস বা প্রমাণ বা প্রবাদ কিছুই নেই। এই রচনাশক্তির যেন কোনো শৈশব-

বাল্য-যৌবন হয়নি, এ যেন এক ঝলকেই পূর্ণযৌবন লাভ করল। কবে তাঁর রবিকাকা বলেছিলেন, 'তুমি লেখো-না, যেমন করে' তুমি মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো...ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি'—তাঁর কথা শুনে অবন ঠাকুর সাহস পেয়ে গেলেন, শুরু করলেন লেখা। কিন্তু সেই লেখায় তো ভাষার কোনো দোষ হয়নি। অন্যের রচনাকর্মে কত সূক্ষ্ম ত্রুটি-সংকোচ-অনুপপত্তি থাকে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের একেবারে গোড়ার রচনায়ও কোনো অসংগতি দেখতে পাই না। তাঁর রচনাগুলির হলোগ্রাফ (যাকে বাংলায় বলতে পারি স্বহস্তলিপি, রচনার যে লিপি লেখকের নিজ হাতে লেখা) কোথাও বিদ্যমান আছে কিনা জানি না কিন্তু লেখকস্বরূপে অবনীন্দ্রনাথের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যে ধরনের, তাঁর রচনামাত্রেই যে স্বচ্ছন্দ অবাধ প্রবাহ স্রোতস্বতী, সেসব লক্ষ্য করে' মনে হয় না যে কোনো প্রাথমিক নকশো কর্মকে অনেকদিন বসে' গুস্তাভ্ ফ্লোবেয়ারের মতো অথবা হেন্‌রি জেম্‌সের মতো রসিয়ে রসিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর করা অবনীন্দ্রনাথের স্বভাবসংগত ছিল, তাঁর রচনায় বরঞ্চ যেন আগাগোড়া একটা take it or leave it-গোছের বেপরোয়া ভাব দেখি : আমার যা লেখার আমি লিখেছি, তোমাদের ইচ্ছে হয়, পড়ো, নইলে সরে দাঁড়াও।—এই আমার সরলরেখ অবিলম্বিত তাৎক্ষণিক লেখনশৈলী, এর জন্যে আমি কোনো ঘষামাজা, লেপাপোঁছা, কাটিকুটি করিনি, যা বলার তা' একবারেই বলেছি, তোমরা এ জিনিস নিতে হয় তো নাও, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, হওয়ার দরকারও কিছু দেখছি না, আমার প্রথম খসড়াই আমার চূড়ান্ত লিপি।

অবন ঠাকুরের রচনার এই স্বয়ম্ভূ অনন্যতা ছাড়া আরেকটি মৌল লক্ষণও আমাদের গভীর মনোযোগের বিষয়—তাঁর বিষয়বৈচিত্র্য। তাঁর কাহিনীগুলির বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ্য করুন। তৃতীয় খণ্ডের রচনাগুলি হচ্ছে :—"আলোর ফুলকি", "খাতাঞ্চির খাতা", "বুড়ো আংলা", "হানাবাড়ির কারখানা", "বাদশাহী গল্প"। এক রচনায় অন্য রচনার বিষয়মিশ্রণ বা চরিত্রমিশ্রণ হয়নি, প্রতিটি রচনা যেন একটি নব-আবিষ্কৃত জগৎ, সবাই মিলে এক আশ্চর্য সৌরজগৎ! আর প্রতিটি রচনার ভাষা, বাক্‌প্রতিমা, কথনভঙ্গি, বাক্‌মূর্চ্ছনা ('স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতিপদ্যতে, মূর্চ্ছনা-মিতি তামাহঃ কবয়ো গ্রামসম্ভবাম্'—সঙ্গীতদামোদর) অনন্য, অন্য রচনায় তার পুনরাবৃত্তি নেই। অবনীন্দ্র-রচনাবলীর অন্য খণ্ডগুলির কাহিনীবিষয় লক্ষ্য করা যাক : প্রথম খণ্ডে আছে—"আপন কথা"; দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—"শকুন্তলা", "ক্ষীরের পুতুল", "রাজকাহিনী", "ভূতপত্‌রীর দেশ", "নালক"। আমি এখানে "ঘরোয়া" এবং "জোড়াসাঁকোর ধারে", এই বই দুখানা টেনে আনছি না কেননা অবনীন্দ্রনাথ সেগুলি **লেখেননি, বলেছেন**, যে-লিখিত রূপ আমাদের কাছে এসেছে সেটি এসেছে শ্রুতিধরী রানী চন্দর আশ্চর্য ক্ষমতা থেকে। তিন খণ্ডে বিধৃত কাহিনীগুলির প্রতিটি আমাদের নিয়ে যায় যার যার বিচিত্র স্বতন্ত্র জগতে, ক্ল্যাসিক্যাল প্রাচীন ভারতের তপোবনে এবং রাজসভায়, কপিলবাস্তুর রাজপুত্র সিদ্ধার্থের ও ঋষিসেবক বালক নালকের জগতে; "ক্ষীরের পুতুলে" আমাদের লোকসাহিত্যের প্রাচীন জগৎ যেখানে সুয়োরানী আর দুয়োরানী আর বাঁদর রাজপুত্র থাকে। আর রাজকাহিনীর সেই অবিস্মরণীয় কাহিনীগুলি যাদের কথনসুরের রেশ ভোমরার মতো পাঠকের স্মৃতিতে গুন গুন করেই যায়, 'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!', যে-সুর কাহিনী থেকে কাহিনীতে নূতন রূপ গ্রহণ করছে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা অবনীন্দ্রনাথের ভাষার শরিক, জন্মসূত্রে। এর পরে ভাবুন "আলোর ফুল্‌কি"র কথা। অমন ঐশ্বর্যময় সুর কি আর আমাদের সাহিত্যে কোথাও আছে?

কুঁকড়ো ডাক দিয়ে চললেন, 'আলোর ফুল আলোর ফু-ল-কি-ই-ই গোলাপি হোক সোনালি,

সোনালি সে রুপোলি, রুপোলি হোক সাদা আ-লো-আ-লো-র ফুল, কিন্তু তখনো দূরের খেতগুলোতে শোন্ ফুলের রঙ মেলায়নি, সব জিনিসে চমক দিচ্ছে, কুঁকড়ো ডাকলেন, 'আ-লো-ও-ও,' অমনি কাছের খেতের উপরে চট্ করে এক পোঁছ সোনালি পড়ল, পাহাড়ে ঝাউগাছের মাথায় সোনা ঝকমক করে উঠল। কুঁকড়ো পুবধারের আকাশকে ডেকে বললেন, 'খুলুক, খুলুক।' অমনি আকাশ জুড়ে পুবদিকে আলোর ছড়া পড়তে থাকল। পাহাড়ের দিকে চেয়ে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'খুলুক, খুলুক, অমনি সব পাহাড়ে পাহাড়ে গোলাপি ফুলে ভরা পদম্‌গাছ ছবির মতো খুলে গেল সোনালির চোখের সামনে। 'খুলুক, খুলুক,' দূরে ঝাপসা পাহাড় কুয়াশার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়াল। (তৃতীয় খণ্ড, ৫১)

এই অতুলনীয় বাক্‌সুরে যিনি লিখতে পারেন তিনি আবার অগুনতি অন্য কত সুরে যে গাইতে পারেন তার আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলছি। এ-অংশটি "খাতাঞ্চির খাতা" থেকে নেওয়া :

বিয়ের দিন...লালদিঘির ঘাটে-ঘাটে, গাছে-গাছে, জলে-স্থলে সেদিন সব জোনাক পোকার পিদিম দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ভূতের কেত্তন, গলাবাজি, ভোজবাজি, ভেল্কিবাজি, বাঁশ-বাজি, ডিগবাজি, লাঠিবাজি কত বাজিই হচ্ছিল। সবাই জল খাচ্ছিল, হাওয়া খাচ্ছিল, খাবি খাচ্ছিল, হোঁচট খাচ্ছিল, চোখ খাচ্ছিল, চুক খাচ্ছিল, সুদ খাচ্ছিল, ঘুষ খাচ্ছিল, খাপ খাচ্ছিল, মিশ খাচ্ছিল, ঘুরপাক খাচ্ছিল, গালাগালি খাচ্ছিল, কীল, চড়, লাথি, ঘুঁসি, গুঁতো খাচ্ছিল, জুতো খাচ্ছিল, চাবুক খাচ্ছিল, আছাড় খাচ্ছিল, হিমসিম খাচ্ছিল, মোচড় খাচ্ছিল, কানমলা খাচ্ছিল, গলাধাক্কা খাচ্ছিল, টোল খাচ্ছিল, দোল খাচ্ছিল, ভ্যাবাচাকা খাচ্ছিল, কত খাবারের নাম করব, এমন খাওয়া কোথাও খাইনি। (তৃতীয় খণ্ড, ১৫১-৫২)

পরবর্তী অংশটি "বুড়ো আংলা" থেকে নেওয়া :

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, কেবল কালো মেঘ আর বিদ্যুৎ, আর হু হু বাতাস, থেকে-থেকে পাখিরা ভয়ে চিৎকার করে উঠছে, জলের ধারে ঝুপঝাপ পাড় ভেঙে নদীতে পড়ছে, বজ্রাঘাতে বড়ো বড়ো গাছ মড়মড় করে মুচড়ে পড়ছে, এরি মাঝ দিয়ে চকা তার দল নিয়ে ডাঙায় আশ্রয় নিতে চলেছে। (তৃতীয় খণ্ড, ২৮৮)

এই অবিরাম অথচ বহু রাগিণীর অর্কেস্ট্রায় কথাগুলিকে ইচ্ছে করলেই সাজিয়ে ছন্দে ফেলা যায়, কথাগুলি কবিত্বময়তা থেকে রূপ পেয়ে যায় কবিতায়।

কও তো মিষ্টি কথা।
পাহাড়তলীর
এ কোন্ গাঁয়ের
মিষ্টি কথা কও।
জানিয়ে দিয়ে যাও
এমন কোথা পাও;
মিষ্টি বুলি
ও বুলবুলি
বলে দিয়ে যাও
কমনে তুমি রও?
মিষ্টি লতার বুলবুলিটি
একটি কথা কও! (তৃতীয় খণ্ড, ৫৫২)

অবন ঠাকুরের বিচিত্র রচনাশৈলীর অগাধ সমুদ্র থেকে যেন মাত্র এক আঁজলা জল তুলেছি উপরের

দৃষ্টান্ত কয়টিতে। এই দৃষ্টান্ত কয়টিও তাঁর শৈলীবৈচিত্র্যের যাবতীয় রূপের প্রতিনিধি নয়, এদের বাইরে তো আরো কত ধরনের শৈলী পেতে পারি। 'চাঁইদাদার গল্প'গুলিতে কথোপকথনের অপূর্ব শৈলী, তার কত বাহার, তার সুরের ভাষার কাকুর কত ঢং কত বিন্যাস!

> খুদিরাম বলে চলল—কাকটা বললে—কা কা, গবস্তি বস্তিতে সুখটা কী? গরু জবাব করলে—ক্যান এহ্যানে সবই সুখ; নাস্তি কী? এ'টো শালপাতা আছে, তাতে খে'সারি ডালের সোয়াদ আছে, ভাতের ফেনটা আছে, আর আছে নাগালের কাছে খোড়ো চালে বিচিলি—নাই বা কী? (তৃতীয় খণ্ড, ৫১৭)

এই বাক্‌শৈলীরই সগোত্র কিছু কথা পাই 'হারুন্দের কথা' কাহিনীতে :

> কর্তা আর দ্যাহেন কী? আল্লার নাম ল্যান! ওই যে কাফেরদের মন্দির, ওর মাথায় একটা জাঁতার মতো চুম্বুক-পাথর আছে, তারি টানে জাহাজের যত লোহার পেরেক সব একটি-একটি করে খুলে ওই মন্দিরের গায়ে যেয়ে লাগবে...(দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩৮)

এর বিপরীত মেরুতে দেখুন হীরকোজ্জ্বল কথোপকথনের শৈলী :

> পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রানা, এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো, শাদা-শাদা ঢেউ উঠছে দেখ। ভীমসিংহ হেসে বললেন, 'পদ্মিনী, এ যে-সে সমুদ্র নয়; এ পাঠান-বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল! ঐ দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী; জলের কল্লোলের মতো ঐ শোন সৈন্যের কোলাহল! আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিণী মূর্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে।'
>
> (দ্বিতীয় খণ্ড, ১০১-২)

এ-ও তো ডায়ালগ্, কথারই ভাষা! অবন ঠাকুরের ভাষার রূপবিস্তৃতি যে কত বিরাট, কত অগণিত মূর্তিসম্পন্ন, কত যে তার মূর্ছনা, কতই সূক্ষ্মতা, তার অতি সামান্য আভাসই দেওয়া যায় একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থালোচনায়, সম্পূর্ণ মূল্যায়ন অসম্ভব।

অবন ঠাকুরের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই তাঁর চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গ এসে যায়। স্বভাবতই এসে যায়। কিন্তু এই প্রাসঙ্গিকতার পেছনে যদি এমন মনোভাব থাকে যে অবন ঠাকুরের শিল্পকৃতিতে ভাষাশিল্প হচ্ছে জুনিয়ার পার্টনার, চিত্রশিল্প মধ্যমণি, তাহলে দুর্বিচার হবে। যে শিল্পী একাধিক মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন, সেই শিল্পীর নিজকালে অথবা তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে হয়তো তাঁর একটি বিশেষ মাধ্যম-কৃতিত্ব বেশি খ্যাতিলাভ করে থাকতে পারে, কিন্তু এই খ্যাতি শাশ্বত হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ভিক্টর ইউগো নিজকালে ছিলেন মস্ত নাট্যকার, মস্ত কবি; আজ তাঁর ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করছে তাঁর উপন্যাসের উপরে। কে জানে একটি কাল হয়তো আসবে যখন রবীন্দ্রনাথের গানই তাঁর ভাষাশিল্পের, তাঁর সর্বস্পর্শী মনোভঙ্গির সত্যতম নিকষ বলে গণ্য হবে, আজই অনেক সংস্কৃতিমান পাঠকের চিন্তা এ হেন নিকষের সপক্ষে। কে জানে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা অথবা তাঁর ছোটোগল্প রচনার প্রতিভা এতাবৎ যে স্বীকৃতি পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পাবে, পাবে আগামী অর্ধশতকের মধ্যেই।

অবন ঠাকুর চিত্রশিল্পী ছিলেন (চিত্রশিল্পের একাধিক স্বরূপেই তিনি জয়যুক্ত ছিলেন), তিনি উৎকৃষ্ট নট ছিলেন, আশ্চর্য ছিল তাঁর পুতুল গড়ার ক্ষমতা। তিনি আরো ছিলেন লেখক। এই লেখনশিল্পে যে তাঁর বৈচিত্র্য কত ব্যাপক, কত মৌলিকসৃজনীশক্তিসম্পন্ন তার অতি মৃদু আভাস উপরের স্তবকগুলিতে দেওয়া হয়েছে। এ মুহূর্তে আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে অবন

ঠাকুরের শিল্পীব্যক্তিত্বের সর্বধাত্রী মূল্যায়নের কালে আমরা যেন এমন না বলি যে তাঁর চিত্রশিল্পই উত্তুঙ্গ, তাঁর রচনাশিল্পের মর্যাদা তুলনায় খর্ব।

শিল্পের বিভিন্ন প্রকারগুলির একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক কী সে বিষয়ে মানুষের চিন্তা দীর্ঘকাল থেকেই আত্ম-নিয়োজিত থেকেছে। গ্রীক ও লাটিন সংস্কৃতির ক্ল্যাসিক্যাল যুগে মানা হত যে এক শিল্পে অন্য শিল্পের গুণ বর্তানো যায়। লাটিন কবি-তাত্ত্বিক হোরেস লিখেছেন, Ut Pictura Poesis, অর্থাৎ কাব্য হচ্ছে চিত্রতুল্য। কাব্য ও চিত্রের এই সমাত্মতায় মানুষ বিশ্বাস করেছে যুগে যুগে, বিশেষত সেইসব সমাজে যেখানে হিউম্যানিজম্ বা মানবিকতাবাদ প্রবল হয়েছে। আঠারো-উনিশ শতকে কাব্য ও চিত্র একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বারংবার। দান্তে রোসেটি তাঁর ব্লেসেড্ ড্যামোজেল কল্পনা রূপায়িত করেছেন কাব্যে এবং চিত্রে, এক শিল্প অন্য শিল্পের সম্পূরক হয়েছে। ব্লেক সেরকমটি করতেন। কিন্তু এই যুগেরই শুরুতে জার্মান তাত্ত্বিক লেসিং তাঁর বিখ্যাত 'লাওকুন' গ্রন্থে কাব্য ও চিত্রের সমাত্মতা চিন্তার কালে তাদের পার্থক্য প্রকট করেছেন। তাঁরও পূর্বে করেছিলেন লেনার্দো দ্য ভিন্চি। অ্যাবে দ্য ব প্রভেদ করেছিলেন চিত্রের signes naturels (স্বভাবসংগত অনুকৃতি) এবং কাব্যের signes artificiels (খেয়ালী অনুকৃতি), এই দুয়ের মধ্যে। এসব বিষয়ে প্রভূত চিন্তা হয়েছে ইওরোপে বিগত দুশো বৎসরের মধ্যে, সে-চিন্তার ফল দাঁড়াচ্ছে যে যদিচ শিল্পে শিল্পে আত্মীয়তা সম্ভব, এক শিল্পের আবেগ অন্য শিল্পে প্রতি-ফলিত হতে পারে, তবুও প্রতি শিল্পেরই স্বধর্ম আছে এবং স্বধর্মের অপ্রতিরোধ্য তাড়না শিল্প-কর্মগুলিতে প্রতিভাত থাকে। অতএব আমরা বলতে পারি না যে অবন ঠাকুর যদিও মহৎ চিত্রশিল্পী ছিলেন, যদিও লিখতেনও চমৎকার, তবুও তাঁর চিত্রশিল্পই তাঁর মহত্তম প্রতিভাব্যঞ্জক, অন্য শিল্প-গুলি তুলনায় খর্বাকৃতি। প্রতিটি শিল্পকর্মের বিচার করতে হবে সেই শিল্পগোত্রের স্বধর্ম অনুসারে। যখন এক শিল্পশ্রেণীর সঙ্গে অন্য শিল্পশ্রেণীর তুলনা করি তখন দেখতে হবে যার যার শ্রেণী- বা গোত্রসুলভ সৃজনরীতির নির্ভরে আমাদের (পাঠকের/দর্শকের/শ্রোতার) কল্পনা-শক্তিকে কতটা উদ্বুদ্ধ করতে পারল।

অবন ঠাকুরের মহত্তম চিত্রে যে উদাত্ত সূক্ষ্ম ভাবনার উদ্রেক হয় দর্শকের চিত্তে, তাঁর মহত্তম রচনায়ও তেমনি সুদূরাভিসারী কল্পনার উদ্ভব হয়। বৃদ্ধ শাজাহান দূরে তাজমহলের পানে তাকিয়ে আছেন, এই চিত্রে যে আবেগের সঞ্চার হয় আমাদের মনে, তদনুরূপ আবেগের সঞ্চার হয় না কি যখন আমরা পড়ি :

> তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন—রাস্তার ধুলোয়। কমলমীর—যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল—দূরে—দূরে—কতদূরে সকালের আগুনবরণ আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে। (দ্বিতীয় খণ্ড, ২১৫)

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রীসত্তায় ও লেখকসত্তায় কোনো বিরোধ নেই, কোনো উচ্চাবচতা নেই, তারা পরস্পরের সম্পূরক, যার যার শিল্পমাধ্যমে শিল্পীর বিচিত্রতম উত্তুঙ্গতম পরিণতি লাভ হয়েছে। তাঁর চিত্রশিল্পের একটি offshoot যেমন তাঁর পুতুল গড়া, তাঁর লেখনশিল্পেরও অনুরূপ একটি offshoot তাঁর খাতাঞ্চির খাতায় ও চাঁইবুড়োর গপ্পে।

অমলেন্দু বসু

বিতর্ক—পান্নালাল দাশগুপ্ত। কম্পাস পাবলিকেশনস লিঃ। কলিকাতা, ৬। মূল্য দশ টাকা।

"কম্পাস"-সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত বিবিধ জাতীয় প্রশ্নে আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্কের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তিনি সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-ডিবেট ইত্যাদির মাধ্যমে জনচিত্তকে সতত-আলোড়িত রাখতে ভালবাসেন এবং কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে দেশব্যাপী চিন্তার তুফান উঠুক, এইটাই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। বস্তুত, "কম্পাস" পত্রিকার হাল ধরার কাল থেকে বিগত চোদ্দ-পনেরো বছর সময়মধ্যে একাধিক উপলক্ষে তাঁর এই ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং মনে মনে তাঁর এই বাবদে অভিক্রম ও উদ্যমের তারিফ করেছি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবেও বিস্ময় মেনেছি, একজন প্রাক্তন বিপ্লবীর নূতন এই গঠনমূলক চিন্তাচর্চাকারীর ভূমিকায় রূপান্তর কেমন করে সম্ভব হল এবং কেনই বা সম্ভব হল। অবাক না হয়ে পারিনি যখন দেখেছি পান্নালাল দাশ-গুপ্ত আর প্রথাসিদ্ধ পেশাদার বিপ্লবীর ঢঙে কথা বলেন না, বলেন জাতীয় পুনর্গঠনের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ব্যক্তিগত স্তরে সম্পৃক্ত একজন রচনাত্মক কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব নিয়ে। তাঁর পক্ষে এই নতুন ভূমিকা কতটা মানানসই হয়েছে অথবা আদৌ মানানসই হয়েছে কিনা এমন সন্দেহও যে মাঝে মাঝে মনে উঁকি দেয়নি, তা-ও নয়। কখনও-কখনও মনের ভিতর খচখচ করেছে এই একটা কাঁটা যে, দেশবাসী হয়তো তাঁকে দেশ গড়ার কাজে লিপ্ত একজন উদ্যমী যোজনাকার হিসাবে পেয়ে লাভবানই হয়েছেন কিন্তু হারিয়েছেনও কি যথেষ্ট নয়? বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে তাঁর স্বেচ্ছায় সরে যাওয়া দেশের বিরোধী রাজনীতির পক্ষে কি ক্ষতির কারণ হয়নি?

পরে ভেবে দেখেছি, এই ধারায় চিন্তা করাটা হয়তো পান্নালালবাবুর প্রতি অবিচার। কেননা তাঁর বর্তমান রচনাত্মক কার্যধারার মধ্যেও তাঁর বিপ্লবী-অতীত-সুলভ ভাবনা-চিন্তার সাক্ষ্য মোটেই অলক্ষ্য নয়। "কম্পাস"-সম্পাদক তথা "বিতর্ক" গ্রন্থের রচয়িতা ও সংকলকের মানস-গঠন কতদূর এই আলোচনাকারী বুঝতে পেরেছেন তার থেকে বলা যায়, ওই মানুষটির মধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্মর একবগ্গা ভাব নিহিত আছে। যেযুগে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তখন বিপ্লবের হদ্দ করে ছেড়েছেন (বিপ্লবী হিসাবে তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড এতই সুবিদিত যে এখানে তার পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা দেখি না), আজ তিনি দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণচিন্তায় অষ্টক্ষণ ব্যাপৃত থেকে বহুমুখী এক কর্মযজ্ঞে আপনাকে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছেন. এটাও বিপ্লব, তবে তার চরিত্র আলাদা।

দেশকে একেবারে গোড়া থেকে ও তলা থেকে প্রস্তুত করে তোলার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেও বোঝা যায় এ এমন এক সর্বাত্মক, সর্বগ্রাসী, সর্বচৈতন্যআচ্ছন্নকারী কাজ, যাতে হাত দিলে আর অন্য কোন কাজের অবসর থাকে না। ইচ্ছাও হয় না। এ দেশের মানুষের অভাব-দৈন্য এত উৎকট ও ব্যাপক, জাতীয় চৈতন্য এত শোচনীয়রূপে জড়তাপ্রাপ্ত, চরিত্র এত অধঃপতিত যে, দেশব্যাপী সমস্যার যে-কোন একটি এলাকায় পদপাত করলেই সমাধান-প্রয়াসের বিপুলতায় স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বিশেষত, দেশের গ্রামগুলির নির্জীবতার তুলনা নেই। গ্রামীণ সমাজ বহুদিন স্তব্ধ হয়ে আছে। লোলুপ ও অনুৎপাদক নগরসভ্যতার নানামুখী ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে গ্রামগুলি ধ্বংসের কিনারায় এসে পৌঁছেছে। এক ধরনের সুকঠিন বাস্তব, যার সম্মুখীন হয়ে আর অন্য কোন কাজে মাথা দেওয়ার অবকাশ থাকে না। বিশেষ, সাধারণ মানুষের জন্য যদি অন্তরে থাকে অন্তহীন ভালবাসা।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের আগেকার জানা পান্নালাল দাশগুপ্তের তেমন অবস্থাই

হয়েছে। তিনি এইসব শতশত হৃতসর্বস্ব হতচেতন শ্রীছাঁদবর্জিত গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন-চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁর তাবৎ সময় ও উদ্যম এই এক লক্ষ্যে নিবেদিত। গ্রামের কৃষি-অর্থনীতির ভোল বদলাবার সর্বাতিশায়ী সাধনায় নিয়োজিত হয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন, গরম-গরম কথা বলে লোক খেপিয়ে রাজনীতির আশু উদ্দেশ্য সাধন করা যায়, কিন্তু দেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের কৃত্যগুলি পূর্ববৎ অনারব্ধ, অকৃতই থেকে যায়। দেশের সাধারণ মানুষ যে-তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই অপরিবর্তনীয়রূপে আবদ্ধ হয়ে থাকা তাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়ায়।

এমন অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যই পান্নালালবাবুর প্রযত্ন। আর এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলিও ঠিক এই একই উদ্দেশ্যে প্রণীত। গ্রন্থকার এই বইয়ে একাধারে লেখক ও সংকলয়িতার দায়িত্ব পালন করেছেন। বছর খানেক আগে তিনি "কম্পাসে"র পৃষ্ঠায় সর্বাত্মক জাতীয় পুনর্গঠনের 'ইস্যু'তে একটি দেশব্যাপী বিতর্ক আহ্বানের প্রস্তাব করেছিলেন। ওই প্রস্তাবের সূত্রে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে তিনি পত্রিকাটির পাতায় তার আগে ও পরে স্বয়ং যে-সকল প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং অন্য লেখকদের কিছু-কিছু রচনা সংকলন করে দিয়েছিলেন তারই সংগ্রহ এই "বিতর্ক" গ্রন্থ।

বইয়ের নামেই বইয়ের প্রকৃতি স্বপ্রকাশ। তবে বিতর্কের আকারে উপস্থাপিত হলেও গ্রন্থকারের প্রকাশিত অভিমতগুলির ক্ষেত্রে খুব যে মতভিন্নতার অবকাশ আছে, আদ্যোপান্ত বইখানা পড়ে এই আলোচকের কিন্তু তা মনে হল না। এতে এমন কিছু মতামত গ্রথিত হয়েছে, যার সারবত্তা এই ষাট কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত দরিদ্র দেশের পক্ষে, সমাজব্যবস্থার আমূল বৈজ্ঞানিক রূপান্তর সাধিত না হওয়া পর্যন্ত আরও দীর্ঘকাল সত্য হয়ে থাকবে। গ্রন্থকার যে-সব সমাধান-সূত্রের ইঙ্গিত করেছেন তার অনেকগুলিই সংস্কারধর্মী, পুরোপুরি বৈপ্লবিক সেগুলিকে বলা চলে না। কিন্তু যদি মনে রাখা যায় মুখ্যত কৃষিকেন্দ্রিক, অংশত শিল্পোন্নয়নকামী এক বিরাট বিপুল উন্নতিপন্থী কিন্তু কার্যত হতদরিদ্র দেশের অভাবমোচনের সমস্যা আর প্রতিকারহীন অবস্থায় ফেলে রাখা চলে না, চোখ বুজে থাকা চলে না তার বস্তুগত পরিস্থিতির উৎকট বৈষম্য ও বৈসাদৃশ্যগুলির দিকে; তেমন স্থলে গ্রন্থকারের প্রদর্শিত আরোগ্যের নিদানগুলিকে কোন এক দূর-ভবিষ্যতে দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব সাধিত হবে মনে করে অপরীক্ষিত রাখবারও উপায় থাকে না। অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত ভরসার পথ ত্যাগ করার কোন যুক্তি নেই। অধ্রুবের তপস্যায় ধ্রুব-সিদ্ধি হাতছাড়া করা বাতুলতা। সেই দিক দিয়ে "বিতর্ক" গ্রন্থখানিতে প্রকাশিত মতামতের উপযোগিতা।

গ্রন্থকার আধুনিক টেকনোলজির বিবিধ প্রকরণ জ্ঞানের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। দেশে-বিদেশে সমাজনির্মাণের ক্ষেত্রে কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ এযাবৎ কোন্ পথ ধরে কী প্রণালীতে অগ্রসর হয়েছে তার সব শুলুক-সন্ধান তিনি রাখেন। কিন্তু প্রযুক্তিশাস্ত্রের নানাবিধ করণ-কারণের সম্যক জ্ঞান তাঁকে মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধগুলির প্রতি মোটেই উদাসীন করেনি। এই গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গে তিনি একটি স্থায়ী ধুয়োর মত 'সরল জীবন ও উন্নতমনা মানুষের' আদর্শের জয়গান করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে এটি একটি সেকেলে আদর্শ কিন্তু কেন এই আদর্শ আজও সাতিশয় মূল্যবান ও গভীর অর্থবহ, অকাট্য যুক্তির দ্বারা তিনি তার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিঃসঙ্গ পথিক নন। আমাদের কালেরই কয়েকজন উচ্চমার্গের চিন্তানায়ক—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, মাও-সেতুঙ প্রমুখের বাণী এই ক্ষেত্রে তাঁকে সঞ্চালিকা প্রেরণা জুগিয়েছে। ভারতের নাগরিক জীবনযাত্রার পাশ্চাত্ত্যপ্রভাবিত ভোগমুখী অনুকরণাত্মক আত্ম-কেন্দ্রিক ধাঁচটিকে তিনি বারে বারে কঠোর সমালোচনার বাণে বিদ্ধ করেছেন, তিনি একে বলেছেন দানবীয় জীবনযাত্রা, 'রাক্ষসী' জীবনযাত্রা। এর মোহ থেকে মুক্ত হবার জন্যে তিনি নাগরিক সমাজের

কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছেন। পুনরপি, নাগরিক সমাজের যেটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ঘোরতর নিরাশাবাদী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মজ্জাগত কর্মবিমুখতা, ভোগলোলুপতা ও বাক্যজীবিতা দেশের সত্যিকারের উন্নতির এক প্রবল প্রতিবন্ধক। আপনাতে-আপনি-বদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের স্বার্থ-মোহঘোর কাটাতে না পারলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও সর্বনাশ, জাতিরও মহতী বিনষ্টি। কেননা প্রধানত মধ্যবিত্তের দণ্ডের উপর ভর রেখেই এযাবৎ জাতিকে চালনা করবার ভুল পথ নেওয়া হয়েছে। এ ভুলের সংশোধন না হলে বিপত্তি অনিবার্য।

'মধ্যবিত্তের দুঃস্বপ্ন' প্রবন্ধে লেখক তাঁর বক্তব্য বিস্তারিত করেছেন। তথাকথিত যুব-বিদ্রোহের বাহ্যিক ধ্বনিনিনাদ ও যুযুধানতায় ভোলবার পাত্র গ্রন্থকার নন, তিনি তাদের আস্ফালনের অসারতা ধরে ফেলেছেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপন করবার আগেই বাইরে থেকে গ্রামে গিয়ে তাদের ভাল করবার কৃত্রিম অভিযান থেকে যুবকদের প্রতিনিবৃত্ত থাকবার পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য সব যুবকই নকল বিপ্লবের কারবারী, এমন কথা তিনি বলেন না, তবে ঝুটোর দঙ্গল থেকে সাচ্চাকে বার করে নেওয়া ও আলাদা করা প্রয়োজন। কথায় কথায় গ্রামে 'ঝাঁপিয়ে পড়া'র মনোবৃত্তিসম্পন্ন অগুনতি শহুরে সেপাই অপেক্ষা স্বল্পসংখ্যক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উচ্চাদর্শবিশিষ্ট আত্মত্যাগী যুবকের মূল্য যে অনেক বেশী, এই একান্ত সার কথাটি তাঁর আলো-চনার কোথাও অব্যক্ত থাকেনি।

বইয়ের ছত্রে ছত্রে চিন্তাশীলতার ছাপ বর্তমান। বলা আবশ্যক এই চিন্তাশীলতা অলস-মস্তিষ্কচর্চার ফসল নয়, বাস্তবজ্ঞানপ্রসূত ও কর্মিষ্ঠতার বলযুক্ত। আধুনিক সভ্যতার ভোগসর্বস্ব রূপের বিশ্লেষণে লেখকের সুচিন্তিত মন্তব্যাদি জায়গায় জায়গায় সংবাদজীবিতার স্তর থেকে মনস্বিতার পর্যায়ে গিয়ে পেঁছেছে। সেগুলিতে দ্রষ্টার ছোঁয়া লেগেছে।

নারায়ণ চৌধুরী

কমুনিস—শংকর বসু। বর্ণনা। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।
অকালবোধন ও অন্যান্য গল্প—শংকর বসু। রায় এণ্ড চৌধুরী। কলিকাতা। মূল্য সাত টাকা।

"কমুনিস" শংকর বসুর প্রথম উপন্যাস। নকশালপন্থী তরুণদের নিয়ে তাঁর কাহিনী গড়ে উঠেছে। মধ্য কলকাতার পূর্ব সীমান্তে বেলেঘাটা-ট্যাংরা অঞ্চল—দক্ষিণপর্বে হিউজ রোডের শেষ সীমানা থেকে উত্তরপূর্বে বালুরচরের মাঠ, তার সংলগ্ন সি. আই. টি বিল্ডিঙে বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উপন্যাসের পটভূমি। ১৯৬৭-তে নারাণদার নেতৃত্বে ব্যাপারটা ঘটল। সাত নম্বর বস্তির ভেতর ছিল খোকার চালের গুদাম। খোকা মজুতদার। সব চাল গোরা আর তার সঙ্গীরা জোর করে ন্যায্য দামে বেচে দিল। কিন্তু 'সাতদিন না যেতে নারাণদাকে পার্টি চার্জসিট ধরিয়ে দিয়েছিল। ফ্রন্টের ইমেজ নাকি ঐ ঘটনায় ননীর পুতুলের মতো গলে গ্যাছে।' (পৃঃ ৪) নারাণদা বলেছিলেন 'এটা মজুরের পার্টি নয়। দুনিয়ার ধান্ধাবাজের আড্ডা।' (পৃঃ ২১) বুড়ো ছিল নারাণদার সব কাজের সাথী। চাবুকের মতো ছেলে। কমিউনিস্ট শব্দটা তার টাগরায় জড়িয়ে পেঁচিয়ে কী করে যেন "কমুনিস" হয়ে যায়। সেই থেকে নতুন লড়াই শুরু হল।

উপন্যাসে এসব আগের কথা। নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে গোরার স্মৃতিতে তা ফিরে এসেছে। সমগ্র কাহিনী জুড়ে থাকে কয়েকটি তরুণের বিদ্রোহী পরাক্রম—সোনা, গোরা, সুকু, মণ্টু, বুড়ো

এবং তাদের মতো গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক ছেলেমেয়ের দল। বালুরচরের কাঁচা মাটির ঝুপড়িতে নেপুর শেল্টার। তার পকেটে একটা বোমা ফেটে যায়। নির্ঘাত মৃত্যু জেনেও হাসপাতালে যাওয়ার জো নেই। দিনে একবার হাজার গলিঘুঁজি ঘুরে তার বৌ শান্তা খাবার নিয়ে আসে। ওরা একটা দিনও ঘর করতে পারেনি। যাওয়ার আগে শান্তা নেপুর খাওয়ার জায়গাটা মুছে দেয়, 'আলপনার মতো ভিজে ন্যাতার গোলাকার দাগটা এখনও ফুটে আছে। মেয়েটার হাতের চিহ্ন। আর সেদিকে চোখ মেলে হঠাৎ নেপু উষ্ণ হয়ে উঠল : 'অন্ধ্রে সাড়ে তিনশো গ্রামে গরিব রাজ কায়েম হয়েছে...' (পৃঃ ৮৭) অপর একটি মেয়ে মিনু সোনাকে ভালোবাসত। সোনার মৃত্যুর পর গোরার সঙ্গে দেখা হতে মিনু একটুও ফোঁপায় না, বলে, 'হলুদ বেটে শেষ করতে পারবো না জীবনটা। আমার কাজ চাই। কাজ দিন গোরাদা। চব্বিশ ঘণ্টা।' (পৃঃ ৯১) একসময় প্রশ্ন করে মিনু 'তখন আপনি ছিলেন? ওকে যখন...' (পৃঃ ৯২)।

স্প্রিং কোম্পানির ছাঁটাই মজুর নিবারণও আছে ওদের দলে। সর্বদা প্রতিহিংসায় জ্বলছে নিবারণ। খতম ছাড়া অন্য কোন লড়াইতে তার আগ্রহ নেই। অথচ ঘুমোলে নিবারণের পোড়াকাঠ মুখখানা অদ্ভুত কোমল শিশুর মতো হয়ে যায়। বাবু বলে আরেকটি ছেলেও ওদের সঙ্গে ছিল। এখন দূরে চলে গেছে। তার বন্ধুকে সি. পি. এম-এর লোকরা খুন করে। সেই থেকে সি. পি. এম-কাটা ওর জীবনে পাকাপাকি গেড়ে বসেছে। এ নিয়ে ওদের মতভেদ হয়ে যায়। পুলিশ বা বাইরের লোক অবশ্য বাবুকে ওদের সঙ্গী বলেই জানে।

গোরাদের সবসময়ে মদত দিচ্ছেন বিজয়দা যাঁর 'কালোকুষ্টি রিকেটের রুগী মেয়েটা'র জন্য গোরার স্নেহের অন্ত নেই; বালুরচরে বৌদি কাফের বৌদি যিনি ওদের তেষ্টায় চায়ের যোগান দেন। তার স্বামীর দুটো পা রেলে কাটা গেছে। টেনসিলের পাতলা টিন, রঙের কৌটো, আর তুলি বৌদির দোকানেই থাকে। ছেলেদের 'অনেক কথাই বোঝেনি বৌদি কাফের বৌদি। বেলা নামের সরল বৌটা। বেলা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবতো 'উফ্ গোটা দুনিয়াটাই চষে ফেলেছে। তবু বেলা বুঝত। বৌদি কাফের বৌদি। তার বোঝার মতো কথাবার্তাও হত। বেলা বুঝত, ওরা আগাপাছতলা পাল্টাতে চায়। মন্ত্রীটন্ত্রী বদল নয়। এক্কেবরে শেকড়সুদ্ধ টান। একেবারে উল্টে দিতে চায়।' (পৃঃ ৮১)।

আর আছেন সেই ছেলেদের মায়েরা যাঁদের জানলার পাল্লায় রাতবিরেতে টোকা পড়ে—। 'মা! ও মা!...রাত দুপুর নেই ওদের। ছেলেগুলোর দিন আর রাত্তির বলে ভেন্ন কিছু নেই। যখন তখন দুম করে এসে হাজির হয়। যেন মাটি ফুঁড়ে জাগে। কখনও চাট্টি মুখে দেয়, ঝটপট চান করে ফেলে। বইপত্তর ঘাঁটে : আমার সেই চটি বইখানা কি হল? কখনও এসেই কাতর হয়ে পড়ে : মাসিমা যা আছে চাট্টি দিন। ওহ্ দিনভর পেটে দানা পড়েনি।'...আবার কখনও কখনও দাঁতে কুটোগাছা কাটে না। এক দণ্ড দাঁড়ায় কি দাঁড়ায় না। ধূমকেতুর মতো একটা কথা বলেই উধাও হয়ে যায়। উধা-উ। আর দরজায় বুটের লাথি পড়তে থাকে। (পৃঃ ৫৯)

এহেন একজন মাকে গোরা তাঁর ছেলে সোনার মৃত্যুসংবাদ জানাতে যায়। অনেক অ্যাকশন থেকে কঠিন যেন গোরার এই কাজ। শেষরাতে পুলিশের গুলিতে সোনা মারা যায়, তার দেহটা পুলিশ ভ্যানে চালান গেছে। খবরটা পেয়ে একটা আর্তনাদ ওঠে 'এক গেরাস ভাত তোলেনি রে... —তারপর সারা তেইশ নম্বর বস্তির বুক ফেঁড়ে, ফাল দিয়ে উঠল কান্নার একটা রোল। কারা যেন কলজে ডলে তীক্ষ্ম স্নেহে সোনার নাম ধরে ডাকতে লাগল। আর বৃষ্টি নামল। শুরুতে ঝিরঝির করে। তারপর ডাগর ফোঁটায় গোটা দক্ষিণ বেলেঘাটার মাথার ওপরের ধোঁয়ার জাল ফাঁসিয়ে। বৃষ্টি নামল সারা বেলেঘাটা ঢেকে। ছুরির ফলার মতো।' (পৃঃ ৬৩) বেশি দিন যায় না। সোনার মা বালুচরের মাঠে গিয়ে গোরাকে, বুড়োকে খাইয়ে এলেন, দিলেন আহত সুকুর জামাকাপড়, আর

পাড়ার খবরাখবর—'খড়কুটোয় আগুন দিয়ে তোরা তো...এখন দেখতেই হবে—আর শোন ভুলেও পাড়ায় রাস্তা মাড়াসনি, কেউ বাঁচাতে পারবে না। তা হলে ঐ সোনার মতো...' (পৃঃ ১১৯)

উপন্যাসের আরম্ভে সোনার মৃত্যু। রেল ব্রীজের তলায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ওরা অপেক্ষা করছিল। লোকাল কমিটির নেতা এ. বির আসার কথা। মিটিঙটা জরুরী। ওদের কেমন মনে হচ্ছে খতমের লাইনে গলদ আছে—'রাস্তা ঠিক না করতে পারলে যাবি কোন চুলোয়। এদিকে খোচরের র‍্যালায় টেঁকাই মুশকিল, সাচমুচ দু' দশটা ফেলে দিলে যদি কাজ হত, পেছপা হতাম না। কিন্তু এতে কিছু হবার নয়।' (পৃঃ ৩৩) এ. বি-র জন্য অপেক্ষা করতে করতে সোনা অধৈর্য হয়ে ওঠে—গোরাকে বলে, 'তুমি তো জানো এসব ঘোড়ার ডিম পোষায় না আমার, মার্কসের অত ভালুম, লেনিনের...তার চেয়ে বাবা আমাকে বল গার্ড দিতে, পুলিশের ঘেরাও ভাঙতে, আগুনের ফুলকি ছোটাতে—সোনা একপায়ে রাজি।' (পৃঃ ৩২) তবু সোনাও কিন্তু আপশোসের সুরে বলে 'আজকের মিটিঙটা বড় জরুরী ছিল।' (পৃঃ ৩১) আর 'গোরার মুখে কথা নেই। এমন বেকায়দায় ও জিন্দেগীতে পড়েনি। যত দিন যাচ্ছে সব কেমন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুলিশ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সামাল দিতে জান কয়লা। গোরা তো গান্ধীর চেলা নয় যে বলবে : পড়ে পড়ে মার খা...কিন্তু...। সামনে ঝুলে পড়ে কিম্ভূতকিমাকার একটা কিন্তু।' (পৃঃ ৩৩)

এ. বি. সেদিন আসতে পারেনি। তার আগেই পুলিশের হামলা। রেল কোয়ার্টারের অন্যদিকে দু-তিনজনের একটা দল ওয়ালিং করছিল। পুলিশ অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে। গোরাদের দলটাও জড়িয়ে যায়। ওরা নিরস্ত্র ছিল। রেল লাইনের ওপর থেকে সোনা খোয়াপাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে লড়ে যায়। অন্যরা লুকোতে পারে। সোনাকে ঘিরে ফেলে পুলিশ, রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে যায়। গুলির পরে মৃতদেহটা ভ্যানে চাপিয়ে তারা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

দু'-একটি পুলিশ খতম করে সোনার মৃত্যুর বদলা নিতে গোরা রাজি নয়। সে চায় বেলেঘাটা বন্ধ। এ. বি.-র সঙ্গে তর্কাতর্কি লাগে। গোরার জিদে ধর্মঘটের ডাক অবশ্য থাকে। তবে অ্যাকশনের চেষ্টাচরিত্তিরও চলবে। পুতলীকলের গেটে স্ট্রাইকের স্লোগান দিতে যায় গোরা। কারখানার সিকিউরিটি ফোর্স ও কংগ্রেসী মাস্তানদের যৌথ আক্রমণে ওরা পালাতে বাধ্য হয়; মেথরপট্টির ভেতর দিয়ে গলি-ঘুজি নর্দমা ঘেঁষে পৌঁছিয়ে যায় শুয়োরপট্টির লাগোয়া তেরচা পার্কটায়। কারখানায় কাজ চলে। কানাঘুষোয় খবর আসে সিগকলের কাছে একটা পুলিশ খুন হয়েছে। সুকুদের কাজ। নিবারণ আর সুকু তো প্রথম থেকেই সোনার বদলা খতমের জন্য ক্ষেপে ছিল। ঘর থেকে গোরার মাকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। বিজয়দার হুঁশিয়ারি গোরাকে মানতে হয়, 'আর পাড়ায় ঢুকিস না। ঢুকলেই মরবি। সারা তল্লাট ছেঁকে তুলছে।' (পৃঃ ৭৫)

গোরা, মণ্টু, বুড়ো—তিনজনে জলদি হাঁটিতে শুরু করে বালুরচরের দিকে। তার কাছাকাছি বিল্ডিঙে ওদের শক্ত ঘাঁটি, সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। মার কথা, ছোট বোন খুকুর কথা ভাবতে ভাবতে এগোয় গোরা। ছেলেমানুষের গলায় মণ্টু বলে ওঠে—'আমরা কি পাড়ায় আর ঢুকব না।' —'আর পচাখালের ওপর, রেলওয়ে ওভারব্রীজটা পেতেই ওরা তিনজন লোহার বীমগুলো ধরে থমকে দাঁড়াল। পেছন ফিরে চোখ ঘুরিয়ে সারি সারি চিমনির ধোঁয়া আর পুতলীকলের দু নম্বর ক্লীন মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। কে জানে কেন হঠাৎ ওরা সারাটা বেলিয়াহাট্টা চোখের মণিতে গেঁথে নিতে চাইল।' (পৃঃ ৭৬)

অ্যাকশন থেকে অ্যাকশনের অনিবার্য ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় পাত্রপাত্রীরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, স্মৃতিবিস্মৃতি সবকিছুই সেই প্রত্যক্ষের গতিপ্রকৃতিতে সন্নস্ত। হিস্মতে তারা মহাকাব্যের নায়কের মতো, অথচ ইতিহাসে বন্দী এক বিচ্ছিন্ন শহরাঞ্চলে তথাকথিত

খতমের রাজনৈতিক নির্দেশনামায়। এরই মধ্যে কিছুটা তথ্য আর অনেকটা স্বপ্ন মিলিয়ে ওরা কখনো মোমবাতির আলোয় মেদিনীপুরের মানচিত্রের দিকে তাকায়, ভাবে 'এই হল খড়্গপুর স্টেশন... খাসরুট...আর মেদিনীপুর টাউন...এদিকটায় জঙ্গল...সেই বিহারের ভেতর দিয়ে শ্রীকাকুলাম অব্দি চলে গেছে...সুতরাং...' (পৃঃ ১০১) কাহিনীর প্রায় অন্তিম লগ্নে নারাণদা মতিহারী থানার ফুলিয়া গাঁ থেকে ফিরে এলেন। তখন 'তামার মতো বর্ণ, রোদেজ্বলা মানুষগুলো চোখের পিঁছিতে খরা নিয়ে ঘরের ভেতর যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।' (পৃঃ ১২৮) মনে হয় শোষিতের পরমাত্মীয় সব মানুষগুলো নিদারুণ দ্বন্দ্বে মাথা কুটছে; এক কঠিন সংকল্পে মহাকাব্যের বীরত্ব আর ইতিহাসের নির্ণয়কে তারা যেন মেলাতে চায়।

গোটা অঞ্চলটা সেই সংগ্রামের অন্যতম প্রবক্তা। কল-কুলি-কামিনের বেলেঘাটা। সস্তার বেলেঘাটা। গতর-খাটিয়ে, আর আধপেটি মানুষের বাস। চুপড়ির মতো বস্তি। সার সার কারখানার চিমনি বেয়ে ধোঁয়া আকাশটাকে পেঁচাচ্ছে। আর একটু পুবে সারা কলকাতার জঞ্জাল জমে। গলি, নর্দমা, বস্তি, মেথরপটি, শুয়োরপট্টি, চামড়াপট্টি, মালোপাড়া, চীনেপাড়া, আর বস্তিতে বস্তিতে লেপটানো নাঙ্গাভুখা মজদুরের বেলেঘাটা। সেখানে পচা খালের বদ গন্ধ আর দু-নম্বর পুতলী-কলের ভেঁপুর ডাকে সকাল হয়।

বেলেঘাটার অঙ্গে অঙ্গে পুঞ্জীভূত আছে বহু দুঃখ-লাঞ্ছনার বোঝা। তার আঙিনায় নকশালদের বিপ্লব জ্বলে উঠল। অনেকের বিক্ষোভকে সংগঠিত করবার পথে সে লড়াই এগোয়নি। তবে বেলেঘাটার জীবনপ্রকৃতিতে একটা নিহিত বিক্ষোভের জ্বালা অনুক্ষণ গুমরোচ্ছে,...বেলেঘাটার লোনা দেয়ালে এখনও জ্বলজ্বল করে মাওয়ের টেনসিলের ছাপ : নিপীড়ন হলে প্রতিবাদ হবে। পেটোর গহেরা দাগ বুকে নিয়ে পড়ে আছে ভি আই পি রোড। বেলেঘাটার বুড়ি ছুঁয়ে। বিদেশ থেকে হত্তাকত্তা ঐ রাস্তা দিয়ে ফুস করে চলে যায়। নীলাচোখে বেলেঘাটার ওপর নজর বুলিয়ে। দু'হাত ফারাকেই মুরারীর বিশ্বাসী উষ্ণ খুন বয়ে গেছে লেকের পানিতে। বালুরচরের ঢ্যাঙা বকফুল গাছটার ছালওঠা গুঁড়িতে গুলির কাঁচা দাগ মেলায়নি এখনও। অন্ধকার বেলেঘাটা নাঙ্গা-হাড়ে এইসব ছিপিয়ে ঘাপটি মেরে আছে। কখন যে ফাল দিয়ে উঠে দু'হাতে আশমান জাপটে গলার নলী ফেঁড়ে ফ্যালে : ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, দেশ কি জনতা ভুখা হ্যায়! হয়ত তখন 'ভুখ' শব্দটা হাড্ডিকল আর চামড়াপট্টির বিকট গন্ধ নিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাকস্থলীর মতো রেললাইন ধরে—ঝড়ের মতো ছুটে আসবে : ভুখ্! ভুখ্!! ভুখ!!! (পৃঃ ১৩৯)

বিপ্লবের পরিকল্পনায় ভ্রান্তি ছিল। শহরাঞ্চলে খতমের সন্ত্রাস বিপ্লবীদের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। 'কমুনিস'-এর অভিজ্ঞতাতে তা স্পষ্ট। সোনার মৃত্যুর পরে প্রশ্নগুলি গোরার মনে তীব্র হয়ে ওঠে। কমরেডরা অনেকেই তার সঙ্গে একমত নয়। সে বলতে চায় 'ইস্কুলে পেটো মারা ঠিক না...কিংবা ব্যক্তিহত্যা সন্ত্রাসবাদ...বিদ্যেসাগর লোকটা খারাপ ছিল না যাই বলিস...। এতে কি হয়! প্রচণ্ড বন্যায় খড়কুটো। এতে কিছু হয় না। কিছু না।' (পৃঃ ৮৯) সোনার কথা মনে পড়ে। একদিন সে বলেছিল, 'জানো গোরাদা সেদিন মা বলছিল : পুলিশের বৌটার ছবি দেখেছিস সোনা, একেবারে কচিরে আহা! কি বলবো বল...শালা না পারছি গিলতে না পারছি ওগরাতে।' (পৃঃ ১১৪) তারপরে অবস্থার দ্রুত অবনতিতে চরম বিপর্যয়ের দিন ঘনিয়ে আসে : 'বাছা বাছা কমরেডের লাশ হাতপা বিছিয়ে দিচ্ছে শক্ত মাটিতে। জেলের পাঁচিলটা প্রকৃতিবিজ্ঞানে পড়া কলসী-গাছের মতো গন্ধ শুঁকে একেকটা জোয়ান ছেলে টেনে নিচ্ছে পেটের ভেতর। মানুষজনের মুখে বোল নেই।' (পৃঃ ১৩৪)

নারাণদা ফিরলেন। গোরার প্রশ্নে তিনি সায় দেন, বলেন সন্ত্রাসবাদে কোন কমিউনিস্টের

আস্থা থাকে না। শান্তা বোঝে সাধরণ গরীবগরবা খেটেখাওয়া মানুষের সাথ ছাড়লে চলবে না। নিবারণের তেড়িয়া ভাবটাকে নারাণদা শান্ত করতে চান—বিপ্লব হল একটা শ্রেণীর উত্থান। আর সুকু 'যেটুকু বুঝেছে তাই আগলে নিয়ে মতিহারী যেতে চায়। কিংবা যেখানে হাঁসুয়ার ধানকাটা খস্‌খস্‌ শব্দ জাগে। দঙ্গল বেঁধে মজুররা কাজে যায়। সুকু একছুটে তাদের দলে মিশে যেতে চায়।' (পৃঃ ১৩৮) সে ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়নি। পরদিন সকালে পুলিশ সারা এলাকা ঘিরে ফেলল। গুলি খেয়ে 'মুখ থুবড়ে পড়ার আগে সুকুর গলা সাইরেনের মতো ফেটে গ্যালো : চেয়ারম্যান মাও দীর্ঘজীবী হোন!' তার সঙ্গে একলাইনে ছিল নিবারণ আর বুড়ো। গোরা, নারাণদা, মণ্টু পুলিশ ভ্যানে চালান যায়। জেলে অনেক কমরেডের মধ্যে সব দেখেশুনে ঠোঁটকাটা মণ্টু বিড়বিড় করে, কমিউনিস্ট পার্টি অব জেল ইন্ডিয়া! সোনার মা গোরার সঙ্গে দেখা করতে এলে জানা যায় শান্তা সবাইকে নিয়ে সমিতি বানিয়েছে। শুধু মিনুর কোন খোঁজ নেই।

এই কাহিনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অজস্র প্রশ্নের জটিলতা লেখক উপেক্ষা করেননি। ভালমন্দ ঠিক-ভুলের দ্বন্দ্বাকীর্ণ অভিজ্ঞতায় একটা মহৎ বীরত্বের প্রমাণ অটুট থেকে যায়। সেটা বড় কথা—'ভারতবর্ষের ম্যাড়মেড়ে রাজনীতির গদিবাজি আর বক্তিমের বমির পাল্টা ওরা নিঃস্বার্থ হিম্মত ছুঁড়ে মেরেছে।' (পৃঃ ১০৩) তাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া ইতিহাসের কোন দিক্‌নির্ণয় নেই। সে বিপ্লবে সংকীর্ণ স্বার্থের তাড়না ছিল না। হাজার হাজার তরুণ-কিশোরের বেপরোয়া আত্মাহুতিতে যে নির্মোহ নির্ভীক শক্তির পরিচয় মিলেছিল তা বহুদিন ধরে আমাদের সমাজ-রাজনীতিতে সবচেয়ে বিরল ঘটনা। অনুরূপ শক্তির অঙ্গীকার ভিন্ন তো প্রগতির সব ফতোয়াই ব্যর্থ হবে। একথা ঠিক যে সন্ত্রাসের ভুলপথে তার প্রভাব সমাজে চারিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ফলে আমূল সামাজিক রূপান্তরের গণভিত্তি নকশালপন্থী বিপ্লবে তৈরি হয়নি। কিন্তু নকশালপন্থী নয় এমন কোন দল বা মত সে পথে এগিয়েছে বলে আমি জানি না। তাই নিছক কুৎসা অথবা সাফাইয়ের অনেক ঊর্ধ্বে পুনর্জিজ্ঞাসার আয়তনটা সমগ্র হওয়া দরকার। সেই প্রয়োজনের গভীর অনুভবে "কমুনিস" এক সার্থক অবদান।

নাতিদীর্ঘ উপন্যাসটি ঘটনার পর ঘটনায় ঠাসা। চরিত্র ও পরিবেশের নানাবিধ আয়তন বিস্তৃত বিন্যাসে গাঁথা হয়নি। ঘটনাপরম্পরায় যার সম্পর্কে যেটুকু কথা এসে পড়ে তার বেশি কিছু উপন্যাসে স্থান পায় না। গোরার মনের প্রশ্নও অ্যাকশন থেকে অ্যাকশনের মোচড়ে মোচড়ে ওঠে নামে। তা কখনো ঠিক চরিত্রবিশেষের অন্তর্মুখিতায় পর্যবসিত নয়। সব মিলে রচনার এরকম ধর্তাইয়ের সঙ্গে তথ্যপঞ্জীর সাদৃশ্য আছে। এক্ষেত্রে তা বিষয়ের অনুকূল আধার। অ্যাকশনের আয়নাতে পাত্রপাত্রীদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার পর ঘটনায় অসীম সাহস, নির্ভীক সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নিরুপায় বিচ্ছিন্নতার কঠিন অবস্থা। এই বিষয়ের প্রগাঢ় সংবেদনে চরিত্র বা পরিবেশের অন্যসব প্রসঙ্গ অনেকটা নেপথ্যে চলে যাওয়া অসমীচীন নয়। সোনার মা বলতেন 'খড়কুটোয় আগুন দিয়ে তোরা তো...'। খড়কুটোদের কেমন যেন মহাকাব্যে ভর করেছে। সেটা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। তার সঙ্গে জীবনের বাঁধাধরা হেরফের বেশি জড়িয়ে গেলে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার মূল সত্যটি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর বিশেষ আঙ্গিকের নির্দিষ্ট পরিসীমায় উপন্যাসটির কৃতিত্ব বিস্ময়কর। তাই আশা করি স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত বাস্তবতার বিন্যাসেও শংকর বসু সফল হবেন।

"অকাল বোধন"-এর গল্পগুলিও সেই আশাতে শেষ হয়। তাদের দেখাশোনার ঐশ্বর্য অসাধারণ। লেখক যেন এক রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন। একটির পর একটি নিপুণ চিত্রে উদ্ভাসিত হয় দরিদ্র মেহনতী মানুষের দেহমনজীবনের নানারূপ। তার সঙ্গে হিম্মতের, ইমানের সংগ্রাম দৃঢ়

অবলম্বন খুঁজেছে প্রায় প্রতিটি গল্পের পাত্রপাত্রীতে। খণ্ড খণ্ড চিত্রের উৎকর্ষ সবসময়ে ঠিক গোটা গল্পের কাঠামোয় সন্নিবন্ধ হতে পারেনি। কিন্তু সার্থক দু'একটি গল্পের দৃষ্টান্তে আমাদের মন এই তরুণ লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

যেমন 'কপিলের মুলুকযাত্রা'। পুলিশের চোখ এড়াতে একজন পার্টি কমরেড ভার্তিয়ার মজুর কপিলের ঘরে আশ্রয় নেন। যাওয়ার সময়ে তিনি কপিলকে লেনিন-স্তালিনের ছোট ছোট ফটো দিয়ে গেলেন। কপিল কিছু কিছু জানে তাঁদের কথা। আর তার মনে হয় 'এসতালিনকা এ্যায়সা দেখনেমে হামারা মুলুক মে ভী এক ক্ষেত মজদুর হ্যায়।' তারপরে কপিল অনেক লড়াই দেখল শুনল। আনকোরা কাউকে দেখলে সে বলে লেনিন স্তালিনের কথা, 'জানতা এসতালিন কোন থা? লেনিন? নেহী তো শুন...।' একদিন কি সব ভেদবিসম্বাদের খবর এল। পার্টি নাকি ভাগ হয়ে গেছে। কপিল কোনদিকে না ভিড়ে মুলুক চলে গেল, বলল 'হাম এসতালিন কো ঢুণ্ডনে যা রহা...।' দশবারো বছর কেটে গেল কপিল আর ফেরেনি। মজুরদের আড্ডায় কপিলের কথা আজও ওঠে। কে যেন বলে 'দেখিস ও ঠিক ফিরবে।'

আরেকটি গল্প 'আকালকন্যা কুসুম'। মালোর মেয়ে কুসুম। আকালের সময় তার জন্ম। মা বাসন্তীবালা পেট খসাতে মারা যায়। বাপ ধীরেন অভাবের জ্বালায় বৌটাকে সুদ বলে ধরে দিয়েছিল। কিন্তু 'মহাজনের টোকা' পালতে চায়নি ধীরেন। তাতেই বাসন্তী মরল। কুসুমের আইমাও আড়তদারের রক্ষিতা ছিল। যে অসুখে সে মরল, মালোপাড়া বলত 'পাঁচভাতারীর ব্যামো'। মা দিদিমার নাড়ি নক্ষত্র কুসুমের জানা। তেরো বছর বয়সে তার মনে ঘর বাঁধার হাউস জাগল। বিয়ে হল জোয়ান বড়বোয়ার সঙ্গে। সে রিকসা চালায়। জমিন বেচা টাকায় রিকসা কিনেছিল বড়বোয়া। আবার আকাল এল। রিকসার খদ্দেরও খুব কম। বড় বোয়া রিকসা বেচে দেশান্তরী হল, দশটাকার একটা নোট রেখে গেল কুসুমের জন্য। কুসুমের পেটে তখন বাচ্চা আছে। মেয়ে হল। কুসুম ভেবেছিল মেয়ে হলে আঁতুড়েই মেরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত পারেনি।

তারপরে কুসুম ভাবে 'মানুষ থেকে কি ছাই লাভ হচ্ছে। যে বাঘের ভয়ে বাপ শড়কি নিয়ে যেত শালবনে, কুসুম সেই বাঘ হবে। এক হপ্তা পেট বেঁধে কুসুম নিশুতি রাতে চুল ছেড়ে বেরিয়ে এল। ফিরল খানিকটা ভাত আর রুটি নিয়ে। আশেপাশে দশটা গাঁয়ের গেরস্থরা ডাইনের ভয়ে রাতে জল করা বন্ধ করে দিল : নেবে তো চাট্টি ভাত! দু'চারজন সদর হাসপাতালে ভিরমির চিকিচ্ছে করাতে গেল।'... ছ' মাসের মেয়েটার নখ হয়েছে এক আঙুল। আর মিলিটেরী খাওয়ার খবরটা কাউখালী থেকে জেলে ডিঙ্গি করে চাপান অব্দি চলে গেছে।' রাঁঢ়ির ঝি কুসুম রাঁঢ়িগিরি ঠেকাতে ডাইন হয়েছে।'

আকালকন্যার ব্রতের এই রূপক "কমিউনিস"-এর তাৎপর্যকে আরো স্পষ্ট করে দিল।

অশোক সেন

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮৩। সম্পাদক—অশোককুমার কুণ্ডু। সাহিত্য-বিপণি, কলিকাতা-৯। মূল্য পঁচিশ টাকা।

বাংলা ভাষায় বর্তমানে নানা বিষয়ভিত্তিক পুস্তকাদি প্রকাশিত হচ্ছে; অবশ্য প্রত্যেকটি গ্রন্থই যে স্ব স্ব বিষয়ের গুরুত্বে যথাযথ অবহিত, এ সাক্ষ্য মেলা ভার। তৎসত্ত্বেও বিষয়বিস্তৃতির ক্ষেত্রে

ঐতিহাসিকতার সূত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য।

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় বাংলা ভাষার লেখকদের জীবন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির সংবাদ সংকলন। শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ সংকলিত "বাঙালী সাহিত্যসাধক" (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) পরিচিতিতে অব্দ অথবা শতকের উল্লেখ অনিবার্য; অন্যথায় তিনি কোন্ কালের মানুষ তার আবিষ্কার অসম্ভব। তদুপরি আলোচিত বিষয় তথ্য ও রচনাশৈলীর দৌর্বল্যে প্রায়শ খণ্ডিত ও গুরুত্বহীন; ফলে সাহিত্যসাধক সম্পর্কে কার্যত কোন ধারণাই পাঠকের অবহিতিতে যুক্ত হয় না। সর্বোপরি প্রত্যেক সাহিত্যসাধকের আলোচনার পর প্রমাণপঞ্জী (যেমন 'দি ডিক্‌শনারি অব ন্যাশন্যাল বাওগ্র্যাফি' প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে বর্তমান) অপরিহার্য।

কাটোয়া থেকে সোদপুর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান এবং অমল হোমের অসুস্থতার প্রসঙ্গ থেকে "হাওড়া বার্তা"র তেইশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের বিস্তৃত প্রতিবেদন সুলিখিত ও সুসম্পাদিত হলে অধিকতর আকর্ষক হত।

পত্রিকা-পরিচিতির পরিকল্পনাতেও এবংবিধ অসম্বদ্ধতা প্রকটিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "শতরূপা" পত্রিকার বিস্তৃত সূচীপত্র মুদ্রিত হয়েছে; পক্ষান্তরে অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মূল্যবান রচনাবলীর সূচী প্রায়শ অনুপস্থিত।

অতঃপর প্রায় শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রস্রবণ! দ্বিজন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি (জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য); মৃত্যুবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি (প্যারীচরণ সরকার); সার্দ্ধ [সার্ধ] জন্ম-শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি (ভূদেব মুখোপাধ্যায়); ১২৫তম জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি (প্রসন্নকুমার ঘোষ ও কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য); জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি (বিপিনবিহারী গুপ্ত, পূরণচাঁদ নাহার, সরলা-বালা সরকার, অতুলচন্দ্র সেন, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, বিধুভূষণ বসু, সরোজকুমারী দেবী) এবং অবশেষে সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিকদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি (অরুণাচল বসু, বারীণ মৈত্র, লোকেশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দুর্গাদাস সরকার, কালিদাস রায়, সুনীলচন্দ্র সরকার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নলিনীকুমার ভদ্র ও উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)। খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের উল্লিখিত ছাব্বিশটি প্রায়শ অহৈতুকী বাগ্‌বিস্তারের পরিবর্তে পরিশ্রমী নিষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে সম্পাদক নির্বাচন করতে পারতেন কতিপয় মূল্যবান রচনা। সর্বোপরি অব্দের উল্লেখ ব্যতিরেকে নিছক সাহিত্যকর্মের তালিকানির্মাণ অবান্তর।

সম্পাদকের ভূমিকাপাঠে জানা যায়, 'পাঠকের অর্থানুকূল্যে আস্থা হারিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের দ্বারস্থ' হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অ্যাডাম অ্যান্ড চার্লস ব্ল্যাক প্রকাশিত "দি রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস ইয়ার বুক"-এ সমানে অসংখ্য বিজ্ঞাপন বর্তমান। প্রকৃতপ্রস্তাবে এসব গৌণ ব্যাপারে বিব্রত না হয়ে তাঁর পক্ষে মূল বিষয়বস্তুতে গুরুত্বদানই ছিল অধিকতর সমীচীন। কারণ সুষ্ঠু প্রকল্প ও চারিত্র ব্যতিরেকে এ ধরনের প্রকাশনার মর্যাদা মেলে না।

"সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী"-তে প্রকাশকদের প্রসঙ্গ স্বভাবতই অনিবার্য। সর্বোপরি সাহিত্যিক সংস্থা, গ্রন্থস্বত্ব আইন, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকরণের পদ্ধতি, প্রকাশকদের সঙ্গে লেখকদের চুক্তির শর্ত প্রভৃতি বিষয় নিঃসন্দেহে আকর্ষক।

এতৎসত্ত্বেও এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য; সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তথ্যের গুরুত্বে না হোক, বিষয়ের চমকে তো অবশ্যই।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা
ও অন্যান্য বিবরণী
৪নং ফর্ম

[রুল ৮]

১। প্রকাশ স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
২। প্রকাশের সময় : প্রতি তিন মাসে
৩। মুদ্রাকর : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৪। প্রকাশক : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৫। সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৯/১/১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা ৩
৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা : শ্রীমতী এন. রহমান, ৮এ শামসুল হুদা রোড, কলিকাতা ১৭; এ. রহমান, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩; শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩।

আমি, আতাউর রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

আতাউর রহমান
প্রকাশক

তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

কৃষি সংবাদ

শস্য রক্ষা অভিযানে সরকারী সাহায্য

শস্য গুদামজাত করার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ইঁদুর ও নানা ধরনের কীটপতঙ্গের দৌরাত্মে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রতি বছর নষ্ট হয়। এই ক্ষতির হাত থেকে শস্য বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগ থেকে শস্য মজুত রাখার উপযোগী যে ধাতব পাত্র (বিন) কৃষকদের কাছে কিস্তিতে বিক্রি হচ্ছে তার দাম কমান হোল। ৩১-১০-৭৬ তারিখের পরে, বিন কেনার জন্য যাঁরা দরখাস্ত করেছেন বা করবেন, তাঁরা কম দামে কেনার সুযোগ পাবেন।

ধাতব বিনের সাইজ ও বর্তমান দাম

	সাইজ	দাম	পরিবহণ খরচ	মোট দাম
১।	৬·২ কুইন্টাল	২৯৫ টাকা	৪৫·০০ টাকা	৩৪০·০০ টাকা
২।	৩·১ "	১৯০ "	২২·৫০ "	২১২·৫০ "

বিনের দামের ৪০ শতাংশ ও পুরো পরিবহণ খরচ আগাম জমা দিতে হবে। বাকী ৬০ শতাংশ দাম সমান তিনটি কিস্তিতে তিন বছরে পরিশোধ করতে হবে। এই ঋণের জন্য কোন সুদ দিতে হবে না।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার এলাকার গ্রামসেবক বা এ-ই-ও বা বি-ডি-ও বা মহকুমা ও জেলা কৃষি বিপণন আধিকারিকের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

Poets want trees, not skyscrapers... so did Rabindranath
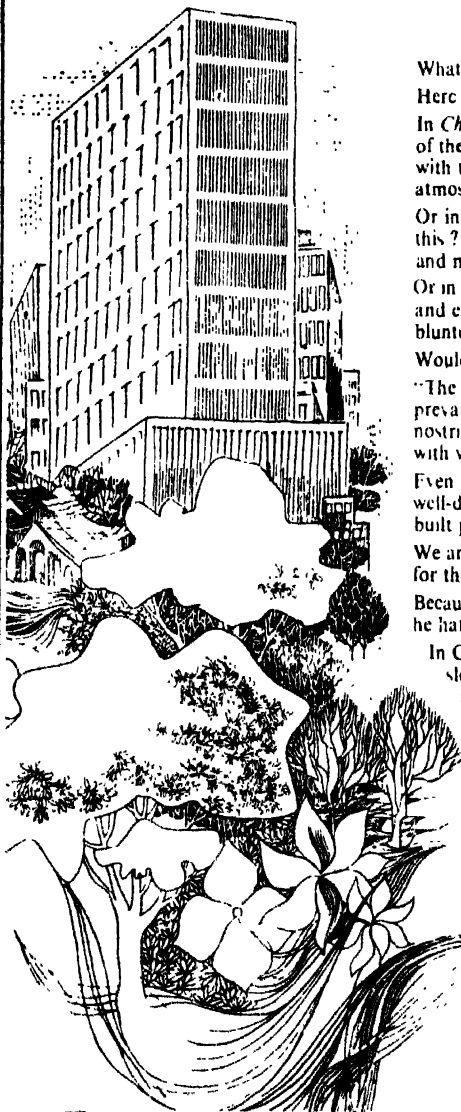
What did the poet think of Calcutta ?
Here are some random comments :

In *Chhinnapatra* he says "The Devil himself has got hold of the city of Calcutta, with each one trying for self-advancement with the Devil's help The city is precariously prospering in an atmosphere of dark and hellish inferno .."

Or in *Gora* "Is this what you call the city of Calcutta ? Just this ? Office buildings, law courts and a few bubbles of brick and mortar ? Who cares !"

Or in *Drishtidan* "Calcutta is a city of fruitless controversy and endless talk. Here one's intelligence gets immaturely blunted in no time."

Would you like to know what he says in *Bichitra-Prabandha*

"The streets of Calcutta do not present a pleasing sight. Here prevails an odd communion of mortar and bricks, dust and nostrils, horses and carriages. Here, walls are inseparably locked with walls, beams with joists and jackets with buttons."

Even in *Pather Sanchaya* : "It seems, Calcutta has no well-defined profile As if the whole city is a haphazardly built piece of many patchworks."

We are not quoting him where he is passionately pleading for the "deep forests in place of the cruel city".

Because we know that the poet loved the city as much as he hated it.

In Calcutta Municipal Gazette he writes : "Now that India is slowly coming to her own, our towns should mirror our national culture and artistic sensibility I look forward to a Calcutta which will reflect this ideal "

On his 70th birthday, Rabindranath said " Let this city of my birth be embellished with works of art and architecture, be known for its music and paintings. Let all blemishes, along with the blemish of ignorance be wiped out. Let the citizens be physically strong, well-nourished and devoted to the task of upliftment of their city with joyous determination. Let not the poisonous fumes of fratricidal feuds pollute the city. Let the character of the city remain pure and untarnished and peace undisturbed by the concerted effort of all men of good-will, irrespective of religion, caste and creed. I pray..."

This, then, is Tagore's city of hope.
Even when full of contradictions, it has a message.
Even when full of problems, it has a life.
Even when full of mistakes, it has a future.

CMDA

CALCUTTA METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY

"আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরা-গাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না মোটর-গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস-ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্কি চ'ড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে।"

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' থেকে

এ কাহিনী গত শতাব্দীর। তারপর সেই রয়ে-বসে পান-চিবোনো পায়ে-চলতি যুগটাকে রবীন্দ্রনাথ একাই এগিয়ে নিয়ে গেছেন যুগান্তরে। এগিয়ে চলাই ছিল তাঁর মন্ত্র। এগিয়ে চলতে হবে আমাদের এই নতুন যুগকেও। ছ্যাকড়া গাড়ির ছন্দে নয়। আরো জোরে। কিন্তু যাব কি করে, এ প্রশ্ন শহরবাসী সকলের।

রবীন্দ্রনাথের কলকাতা

কারণ ইচ্ছার গতি যত দ্রুত, যান-বাহনের গতি তার চেয়ে অনেক মন্থর। মন্থর এবং সংখ্যায় স্বল্প।

আমরা জানি। জানি বলেই খুঁড়িয়ে-হাঁটা এই শহরের মাটি খুঁড়ছি ভূগর্ভ-রেল পাততে। এর অনেকখানি আজ এখনও পরিকল্পনা। কিন্তু আগামীকাল এক যুগান্তর। তখন শুধু মানচিত্র পালটাবে না কলকাতার। পালটাবে এই জনবহুল শহরের গতি, উন্নতি ও প্রগতির মান।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

বছর খানেক আগে শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের ভূমিকা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রকল্প (বিশদফা কর্মসূচীর পনর নং বিষয়) প্রবর্তন করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৫৬টি শিল্প সংস্থা ইতিমধ্যেই তা কাজে পরিণত করেছে যার ফলে উৎপাদন ও দক্ষতা বেড়েছে; অপচয় কমেছে। একটির পর একটি সংস্থা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যগুলিতে ১০৭৯টি শিল্প সংস্থা এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
যেমন যেমন লাভ বেড়ে চলেছে
তেমন তেমন দেশ এগিয়ে চলেছে।

davp-76/655

হীরা আদমি হরিলাল

স্টাফ রিপোর্টার, ২৮ মার্চ—কয়েকটি শিশুর জীবন বাঁচালেন গেট ম্যান হরিলাল আপো· রাণা। বাঁচাতে পারলেন না নিজেকে। হরিলাল ছিটা গড় লেভেল ক্রসিংয়ের গেটম্যান। সকাল তখন সাড়ে ন'টা। শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেন ঝড়ের মত ছুটে আসছে। হঠাৎই হরি·লালের নজরে এল লাইনের ওপর খেলছে শিশু। একেবারে ট্রেনের মুখোমুখি। ছুটে গেলেন তিনি। লাইন থেকে শিশু সরিয়ে দিলেন ঠিকই। শুধু সরাতে পারলেন না নিজেকে। তাঁর মহান বীরত্বের সাক্ষী এখন সেই শিশুরাই।

নিজের প্রাণ দিয়ে শিশুদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন হরিলাল। একটি দুর্লভ মহত্ত্বের চিহ্ন রেখে গেলেন লোহা মাটি পাথরের ফাঁকে।

তাঁর নাম ঘিরে থাকবে আমাদের গর্ব শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা।

অযথা প্রাণের ঝুঁকি নিতে গিয়ে যদি তাঁর কথা স্মরণ করেন, যদি থেমে যান, সেই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি সত্য শ্রদ্ধার্ঘ্য। নিজের জীবন বা হরিলালের মতো আর কোন মহৎ জীবন বিপন্ন ক'রে তুলবেন না।

পূর্ব রেলওয়ে

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী : বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু করিয়া প্রতি তিন মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" বাহির হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৮·৫০ পয়সা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা। বৈদেশিক দুই পাউন্ড স্টারলিং এবং চার ডলার, উভয় ক্ষেত্রেই রেজেস্ট্রী খরচসহ।

"চতুরঙ্গে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য বাধ্যতা থাকিবে না। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটওয়ালা লেপাফা না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের মূল্য :

সাধারণ পৃষ্ঠা ৩২৫·০০ টাকা। অর্ধপৃষ্ঠা ২০০·০০ টাকা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কভার পৃষ্ঠা ৪২৫·০০ টাকা ও চতুর্থ কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা ৫০০·০০ টাকা।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ২৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি বিনিময় পত্রিকাদি চিঠিপত্র টাকাকড়ি চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :

৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা; ৭০০ ০১৩

ফোন : ২৪-৬১২৭

বর্ষ ৩৮ মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩

সূচিপত্র

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ ডক্টর লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।
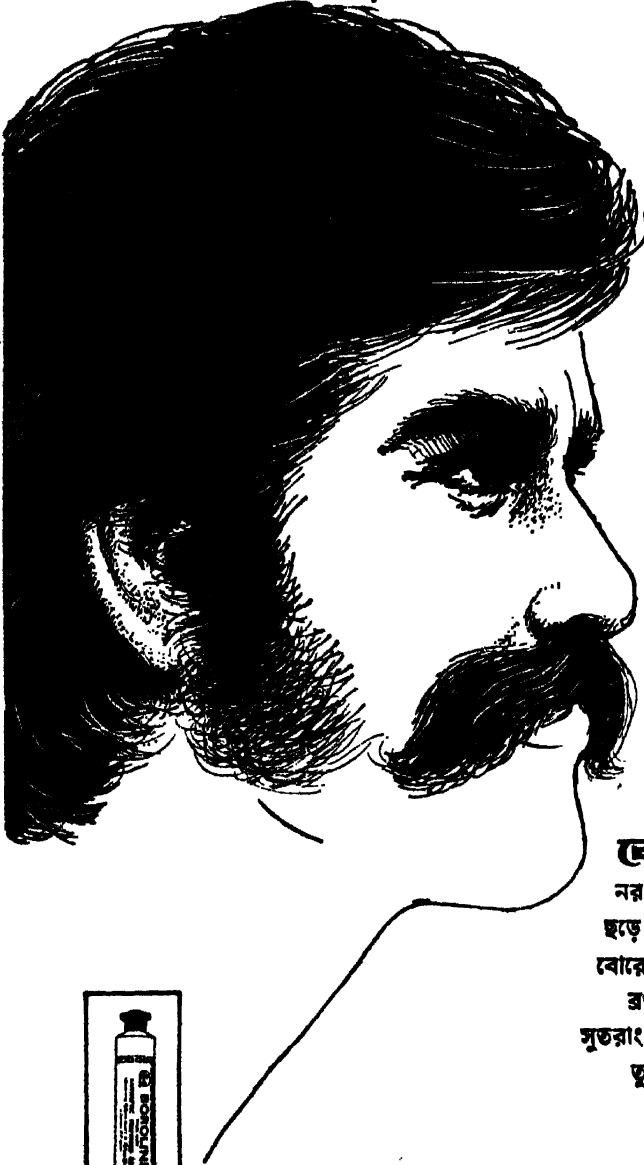
বর্ষ ৩৮ মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩

বিষ্ণুকৃষ্ণ-কথা

সুকুমার সেন

ঋগ্‌বেদে যে প্রাচীন দেবতাদের স্তবস্তুতি সংগৃহীত আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিষ্ণু। ঋগ্‌বেদীয় দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য এককথায় সোজাসুজি বলা যায় না। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিতে বিষ্ণুর বহুধা উল্লেখ আছে কিন্তু তাঁর বিষয়ে সূক্ত চার-পাঁচটির বেশি নেই। এই হিসেব ধরলে বিষ্ণুর স্থান ঋগ্‌বেদীয় দেবতাদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু বিষ্ণুর পরাক্রমের ও মাহাত্ম্যের যে বিবরণ পাই ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন সূক্তে তাতে তাঁকে প্রধানতম দেবতা ইন্দ্রের পাশাপাশি এমন কি ইন্দ্রের চেয়েও বড়ো স্থান দিতে হয়। ঋগ্‌বেদের মুখ্য দেবতা যে ইন্দ্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রায় এগারো শ সূক্তের মধ্যে ইন্দ্রের স্তব সংখ্যায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তবুও বিষ্ণুর কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্য কিছু কম নয়, এমন কি অনেক বেশি। ইন্দ্রের সকল বীরকর্মে বিষ্ণু তাঁর সহায়তা করেছেন, বৃত্রবধে, শম্বরের নিরানব্বইটি দুর্গ জয়ে (এই কাজে চল্লিশ বছর লেগেছিল), স্থূল-ওষ্ঠ দাসের মায়া শক্তিনাশে, অসুর বর্চীর লক্ষ সৈন্যের পরাভবে। সর্বত্র বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায়ক ও সখা ("ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা")। ইন্দ্র নবীন দেবতা এবং তিনি কৃতিত্বের দ্বারা সমস্ত প্রাচীন দেবতাকে পরাজিত করেছিলেন ("দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ")। তাহলে বিষ্ণুর সম্বন্ধে এই ব্যতিক্রম কেন?

বিষ্ণুর সঙ্গে যে ইন্দ্রের প্রতিযোগিতা হয়েছিল তা ঋগ্‌বেদেই পাওয়া যায়।

> উভা জিগ্যথুর্ন পরাজয়েথে
> ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ।
> ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং
> ত্রেধা সহস্রং বি তদ্ ঐরয়েথাম্॥ ৬.৬৯.৮॥

'উভয়ে লড়েছিলেন, কিন্তু পরাজিত হননি। এঁদের দুজনের কেউই পরাজিত হননি। হে বিষ্ণু আপনি আর ইন্দ্র যখন লড়েছিলেন তখন তিন হাজার বার চীৎকার করেছিলেন।'

এর থেকে অনুমান করা যায় যে বিষ্ণু-দেবতার দলের সঙ্গে ইন্দ্র-দেবতার দলের বিরোধ হয়েছিল এবং সে বিরোধের মীমাংসা হয়েছিল দেবতাদ্বয়ের সখ্যবন্ধনে। সুতরাং ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সহযোগী এবং প্রধান দেবতা।

নিজের কৃতিত্বে বিষ্ণু ঋগ্‌বেদের সর্বপ্রধান দেবতা। তিনি আকাশকে ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে

(এ ব্যাপারে অন্য দেবতার উপরও আরোপ করা আছে) এবং পূর্ব দিগন্তকে সুদূরপ্রসারী করে দিয়ে তিনি বিশ্বভুবন পায়ে বেড়িয়ে মায় দেবতা সকলের জন্যে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। তাঁরই তিন পদক্ষেপ ক্ষেত্রে "অধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা", বিশ্বভুবন বিরাজ করে। বিষ্ণুর ঊর্ধ্বতম পদ ব্যোমের উচ্চতম লোকে, তা সদা দেখতে পায় ভক্তেরা, যেন টানা চোখ আকাশের এপার ওপার ("দিবীব চক্ষুর্ আততম্")। ঊর্ধ্বতম বিষ্ণুপদ আনন্দে থাকে দেবভক্ত ব্যক্তিরা ("নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি")। মানুষেও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সেই লোকে যাবার কামনা করে। ("তা বাং বাস্তূনি উশ্মসি গমধ্যৈ")। সেখানে মধুর ঝরণা বয়ে যায়। ("বিষ্ণো পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ"), যেখানে শৃঙ্গবান্ ক্ষিপ্রগামী গোরু আছে প্রচুর ("যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অযাসঃ")।

এই যে বিষ্ণুলোকের ছবি পাই এতে তো পৌরাণিক ভাবনার গোলোকেরই পূর্বাভাস পড়েছে। তবে বৈদিক কবি পরবর্তী কালের ধর্মচিন্তকদের মতো পুরোপুরি পরলোকপন্থী ছিলেন। তাঁরা আর দুটি বিষ্ণুপদকেও—অন্তরীক্ষলোক এবং ভূলোক—অক্ষয় মধুপূর্ণ বলেছেন ("যস্য ত্রীঃ পূর্ণা মধুনা পদানি অক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি")।

কৃষ্ণের ব্রজলীলার আরও পূর্বাভাসও বেদের সূক্তে যে পড়েনি তা নয়। বিষ্ণু গোরু চরান ("বিষ্ণুর্ গোপাঃ" ১.২২.১৮)। তিনি গোয়ালের আগড় খুলে দেন সখার সঙ্গে ("ব্রজং চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে" ১.১৫৬.৪)। তবে তিনি শিশু নন, প্রকাণ্ডকায় নবযুবা। "বৃহচ্ছরীর...যুবা-কুমারঃ" ১.১৫৫.৬)।

ঋগ্বেদের ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেন পুরাণের বলদেব ও বাসুদেব। গোকুলে তাঁরা খেলাধুলায় ঝগড়া মারামারি করতেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সখা ("ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা"), তাঁরা পরস্পর লড়াই করতেন এবং কেউ কাউকে হারাতে পারতেন না।

উভা জিগ্যথুর্ ন পরাজয়ে থে
ন পরাজিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং
ত্রেধা সহস্রং বি তদ্ ঐরয়েথাম্॥ ৬.৬৯.৮॥

'দুজনেই জিতলেন, কেউ পরাজিত হলেন না। এঁদের দুজনের কেউই পরাজয় পেলেন না। হে বিষ্ণু, ইন্দ্র (আর আপনি) যখন পরস্পর যুঝেছিলেন তখন তিন হাজার বার লড়াই করেছিলেন॥'

ঋগ্বেদের বিশিষ্ট দেবতাদের মধ্যে ছিলেন যুগলদেব যাঁদের পুরানো নাম ছিল নাসত্য, কিন্তু ঋগ্বেদে যাঁরা অশ্বী (অর্থাৎ অশ্ববান্ দেবতা) নামেই প্রায় সর্বদা উল্লিখিত। এই যুগল দেবতাকে ইন্দ্র-বিষ্ণু জোটের সঙ্গে তুলনা করা যায়, বিশেষ করে বিষ্ণুর সঙ্গে (ইন্দ্রের সঙ্গে এঁদের বোধ হয় কিছু অসদ্ভাব ছিল)। বিষ্ণু মধুর ভাণ্ডারী অর্থাৎ আড়তদার, stockist আর অশ্বীরা হলেন মধুদাতা অর্থাৎ দোকানদার, distributor।

অশ্বীরা হলেন দ্যৌ-এর পুত্র ("দিবো ন পাতা"), গ্রীক ঐতিহ্যে Dios kouri। এঁদের সব কর্মই একত্র। এঁরা সহোদর, ভগিনী হল এঁদের ঊষা। ঊষা আবার প্রেয়সীও বটেন। ঘরের ঠাকুর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের ভালোমন্দের জন্যে যে দেবতার দোহাই পাড়া হয় তেমন দেবতা ঋগ্বেদে প্রধানত, এমন কি একমাত্রও বলা চলে, এঁরাই। দুঃস্থ ও দুর্গত মানুষ ও জীব এঁদের দয়ায় উদ্ধার পেয়েছে। এসব মাহাত্ম্য এঁদের উল্লিখিত আছে ঋগ্বেদে। তাঁরা ভুজ্যুকে সমুদ্রে নৌকাডুবি থেকে উদ্ধার করেছিলেন, বৃদ্ধ চ্যবনকে যুবা করে দিয়েছিলেন, অত্রিকে অগ্নিদাহ থেকে এবং বন্দনকে গভীর গর্ত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, ক্ষতবিক্ষত মৃতকল্প রেভকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, বিমদকে পত্নী জুটিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রুদ্ধ পিতা কর্তৃক অন্ধীকৃত ঋজ্রাশ্বকে চক্ষুষ্মান্

করে দিয়েছিলেন, খঞ্জ বিশ্‌পলাকে কাঠের পা করে দিয়েছিলেন, আইবুড়ো ঘোষার বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, শয়ুর বুড়ো গাইকে দুধালো করে দিয়েছিলেন, বটের পাখিকে নেকড়ে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অশ্বীরা উষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবন্ধ ছিলেন। এ'রা তিনজনে যেন রাত্রি দিন ও দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণের প্রতীক ছিলেন। বৈদিক কবির ভাবনায় যেমন নক্ত (রাত্রি) ও উষা ছিলেন দুই বোন, একজন কালো একজন ফরসা, তেমনি অশ্বী দুজনও ছিলেন রাত্রির ও দিনের প্রতীক; একজন হলেন কালো দিন ("অহশ্‌ চ কৃষ্ণম্‌") আর একজন হলেন ফরসা দিন ("অহর্‌ অর্জুনং চ")। এই কালো সাদার বৈপরীত্য পৌরাণিক কৃষ্ণবিষ্ণু-কথায় বাসুদেব ও বলরাম (এবং মহাভারতীয় আখ্যানে কৃষ্ণ ও অর্জুনের) মধ্যে দেখা যায়। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে রঙে এমন বৈপরীত্য ছিল কিনা জোর করে বলা যায় না, তবে অন্যদিক দিয়ে বৈদিক ইন্দ্রাবিষ্ণু যে পৌরাণিক সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবের ও মহাভারতীয় কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে তুলনীয় তা পরের আলোচনায় প্রতিপন্ন হবে।

ঋগ্‌বেদের পরে (অথবা সঙ্গে সঙ্গে) ঋগ্‌বেদীয় (এবং অতিরিক্ত অন্যান্য) মিথের সোজাসুজি ধারা প্রবাহিত হয়েছিল যে পথে তার কোন সমসাময়িক চিহ্ন নেই। সামান্য কিছু অথর্ববেদে আছে তবে তা পৌরাণিক মিথগুলি বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই চিহ্নবিহীন মিথের ধারা কিন্তু লুপ্ত হয়নি, তা প্রকাশ পেয়েছে পুরাণের বিভিন্ন আখ্যায়িকায়, মহাভারতে, জনশ্রুতিবাহিত লোককথা-রূপকথায়। তবে সেখানে শুধু জটই পাকায়নি খিচুড়িও পেকেছে। তাই পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বৈদিক, প্রাক্‌-বৈদিক ও অ-বৈদিক মিথের যোগাযোগ আবিষ্কার (অথবা কল্পনা) করা এত কঠিন। কিন্তু কঠিন হলেও তা সবক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। সেই অসম্ভবের চেষ্টা অনেকে করেছেন, আমিও করছি। তবে আমার দৃষ্টিকোণ আমার পূর্বগামীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভিন্ন। সে দৃষ্টিকোণ ঋগ্‌বেদের সূক্ত আর ব্রাহ্মণের গদ্যকথার পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন গদ্যগ্রন্থগুলি (তার মধ্যে মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প শ্লোকও আছে) ঋগ্‌বেদের পরবর্তী রচনা ঠিকই। কিন্তু কত কাল পরবর্তী রচনা, অর্থাৎ অব্যবহিত কিনা, সে সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। ভাষায় যে পার্থক্য দেখা যায় তার উপর নির্ভর করলে বলতেই হয় যে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি ঢের পরবর্তী কালের রচনা। কিন্তু ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিও তো সব একসময়ে রচিত হয়নি। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তের (১০.৯০) ভাষা কি প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষার চেয়ে প্রাচীনতর?

আসল কথা হল ঋগ্‌বেদ একজাতের গ্রন্থ, ব্রাহ্মণগুলি অন্যজাতের। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি ছিল সূক্তকর্তা (অথবা বিশেষ বিশেষ দেবযাজী) পুরোহিতের বংশগত সম্পত্তি এবং তা দেব-পূজার প্রধান অঙ্গ-স্তব। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি হল বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বড় বড় যজ্ঞযাজী পুরোহিত-দের দর্পণ বা হ্যান্ডবুক। তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যাখ্যান এবং কথকতাও আছে। প্রধান ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন এদেশে ধর্মকর্মে ও দেবভাবনায় কিছু কিছু নূতনত্বও এসেছিল। তখন সমাজ গড়ে উঠছে রাজাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণপুরোহিতদের দ্বারা। বাইরে থেকে এসেছে বিরাট অশ্বমেধ-যজ্ঞের রীতি, তৈরি হয়েছে রাজসূয়-যজ্ঞ। এসবের কোন ইঙ্গিত ঋগ্‌বেদে নেই। এ সবই গড়ে উঠেছিল সোমরস-পান-উৎসব উপলক্ষ্য করে। সোম-রসের উল্লেখ থাকলেও আসলে সোমরস বস্তুটি যে কী তা ব্রাহ্মণরচয়িতাদের জানা ছিল না। তাঁরা এর অনুকল্প সৃষ্টি করেছিলেন সম্ভবত ভাঙ। এই যে "রাজা", "ব্রাহ্মণ" (পুরোহিত) আর বৃহৎ যজ্ঞকাণ্ড তার সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। এ ছিল অত্যন্ত high brow ব্যাপার। জনসাধারণের

ধর্ম-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-ভাবনা সরাসরি ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের ধারা বেয়ে অন্যান্য অনেক ধারাবাহী মিথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে রূপ ও মূর্তি নিয়েছিল তার সঙ্গে ব্রাহ্মণগ্রন্থের তত্ত্বকথার সঙ্গে সরাসরি যোগ নেই। তবে গোড়ার দিকে যোগ না থাকলেও অচিরে তা ঘটেছিল। দেশে ধনীর অর্থাৎ সঞ্চিত-ধন ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ছিল এবং আভিজাত্যের জন্যে তাঁদের স্বারস্থ হতে হত ব্রাহ্মণদের। জনসাধারণের ধর্ম-ব্যাপারের মোটামুটি মিল থাকলেও তাদের এক-এক গোষ্ঠীতে (এবং জনপদে) এক-এক মিথের ও তদাশ্রিত দেবতার প্রাধান্য থাকায় তাদের মধ্যে দেবারাধনা-বৈচিত্র্য দেখা গেল। আমাদের অনুসৃত ইতিহাস-সূত্র এইখান থেকেই খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু আমাদের আলোচনায় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করতে পারি না। লৌকিক (অর্থাৎ জনসাধারণ্যে প্রচলিত) ধর্মবিষয়ের অনেক বিশিষ্ট বস্তুর মিথ ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতেই প্রথম জমে উঠেছিল। ঋগ্‌বেদের প্রধানতম দেবতা ছিলেন অগ্নি কেননা তিনি সকল দেবতার প্রতিভূ। সকল দেবতাকে প্রদত্ত ঘি দুধ রুটি (পুরোডাশ), মাংস, বসা, অগ্নিতে উৎসর্গ করতে হত। তিনি যাঁর যা প্রাপ্য তা সকলকে পৌঁছে দিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থগৃহে গৃহদেবতারূপে অগ্নি থাকত। সেই অগ্নিকে গৃহস্থকে ("গৃহপতি") বিবাহকাল থেকে শুরু করে আজীবন সযত্নে পরিচর্যা করতে হত। গার্হপত্য অগ্নিকে জ্ঞান করা হত ঘরের ছেলে ("শিশুর্ দন")।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে বড়ো হয়েও অসুরেরা দেবতাদের কাছে হটে গিয়েছিল যজ্ঞপরাঙ্মুখতার জন্যে। এই মর্মের গল্প কিছু লেখা আছে ব্রাহ্মণগ্রন্থে। তখন বিষ্ণু হয়ে দাঁড়িয়েছেন যজ্ঞের প্রতীক। সুতরাং ব্রাহ্মণে বিষ্ণুদেবতারই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। ঋগ্‌বেদে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত বিষ্ণুর ত্রিপাদ নিক্ষেপ কাহিনী ব্রাহ্মণগ্রন্থে গল্পের রূপ পেয়েছে, এবং সেই গল্পই পরে পুরাণকাহিনীতে বলি-বামনের আখ্যানে পরিণত হয়েছে। এই আখ্যান আবার প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে পরে বিষ্ণুর দুটি অবতারে—নৃসিংহ ও বামন—ব্যাপ্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচনার কালে যজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণদের উচ্চ অধ্যাত্মচিন্তা যজ্ঞকাণ্ডের নিরর্থ জটিলতায় দিশাহারা হয়ে থাকেনি। সে চিন্তা দেবতা অসুর ও যজ্ঞকাণ্ড ছেড়ে বিশুদ্ধ ব্রহ্মচিন্তায় উন্নীত হয়েছিল। এই চিন্তাই প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার উচ্চতম ক্রমের পরিচয় দেয়। প্রধান ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির পরিশিষ্ট অংশ উপনিষদ্‌গুলিতে সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মচিন্তাই স্থান পেয়েছে। বলতে পারি উপনিষদেই প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তার দূরতম টার্মিনাস। এই উপনিষদ্ থেকেই বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শমতন্ত্রের সূত্রপাত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে বাদ দিলে আমরা ঋগ্‌বেদ-অথর্ববেদ আর পুরাণ-ইতিহাসের মাঝখানে পাই প্রত্নলেখ এবং দু'চারটি প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত অথবা উদ্ধৃত কিছু কিছু তথ্য অথবা গল্পাংশ। প্রামাণিক গ্রন্থ মানে যে রচনাকে কোন নির্দিষ্ট কালে অথবা নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে লিখিত বলে ধরে নেওয়া যায়। যেমন পাণিনির সূত্র, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, পালি নিকায়গ্রন্থ, কালিদাসের কাব্য-নাটক ইত্যাদি। নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে যা ফেলা যায় না—যেমন মহাভারত ও পুরাণগুলি—তাকে প্রত্নলেখের ও নির্দিষ্ট কাল মধ্যে লিখিত রচনার ঐতিহাসিক মূল্য দেওয়া যায় না। এইখানে আমার আলোচনার স্বতন্ত্রতা। আমার বিবেচনায় মহাভারতের ও পুরাণগুলির বক্তব্যের ঐতিহাসিক নিট-কালমূল্য সেই সেই পুঁথি লেখার কালের বেশি উপরে যায় না। মহাভারত যে রূপে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার মূল রূপ ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে যায় না। মহাভারতের প্রাচীন পুঁথির —তাও সমগ্রের নয় এক-আধটি পর্বের—লিপিকাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আগে যায় না। অধিকাংশ পুঁথিই পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা। সুতরাং মহাভারতের কোন

উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব কালের ঘটনার সত্যতা নিরূপণ কল্পনার কাজ তথ্যযুক্তির নয়। পুরাণ-গুলির সম্বন্ধে এই কথা আরও বেশি করে খাটে। মহাভারত জমতে শুরু হবার বেশ কিছুকাল পরে তবেই পুরাণগুলি জমতে শুরু করে। ব্যতিক্রম হল 'হরিবংশ'। এটির প্রাচীনত্ব প্রায় মহা-ভারতের সমসাময়িক।

ঋগ্বেদের ইন্দ্রাবিষ্ণু পড়ে গিয়েছিলেন উচ্চবর্ণের—ব্রাহ্মণদের ভাগে, আর অশ্বী দুজন পড়ে-ছিলেন নিম্নবর্ণের—জনসাধারণের ভাগে। দুটি জোড়া দেবতাই পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মে মিশে গিয়েছেন—প্রথমে জোড়া হয়ে সংকর্ষণ-বাসুদেব বা কৃষ্ণ-বলরাম রূপে, এবং অল্পকাল পরে বা সমসময়ে— ভিন্ন জনগোষ্ঠীতে—এক হয়ে কৃষ্ণ-বিষ্ণু রূপে।

এখন দেখা যাক কিভাবে জোট পাকিয়ে এই নতুন জোড় গড়ে উঠেছিল।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সহকারী বিষ্ণু, ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইন্দ্র দেবতাদের বলিষ্ঠ সুতরাং জ্যেষ্ঠ এবং বিষ্ণু কনিষ্ঠ। বিষ্ণু ঋগ্বেদে নবযুবা, ব্রাহ্মণে শিশু। পুরাণে বিষ্ণুর এক নাম 'উপেন্দ্র', এর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে তিনি ইন্দ্রের ছোট ভাই। ব্রজলীলায় কৃষ্ণ প্রথমে শিশু, পরে কিশোর। তারপরে তিনি নবযুবা। ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর ক্রীড়াযুদ্ধের যে উল্লেখ ঋগ্বেদে পেয়েছি তার দু'রকম ছবি উঠেছে পুরাণে। এক বালক্রীড়ায় বিরোধ, তার উল্লেখ আছে পুরাণ-কাহিনীতে। দুই সত্য সত্য বিরোধ, যার কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই ঋগ্বেদে তবে অবান্তরভাবে থাকতে পারে। বৃত্র-ইন্দ্রের বিরোধ পুরাণ-কাহিনীতে ইন্দ্র-কৃষ্ণের বিরোধ বলে—ব্রহ্মার শিশুবৎস হরণ ও গোবর্ধন ধারণ ঘটনা —ধরে নিলে একরকম সমাধান হয়। এর সঙ্গে অথবা এ ছাড়া আর একটি ঋগ্বেদের গল্পের কিছু যোগাযোগ থাকতে পারে। একটি সূক্তের তিনটি ঋকে অর্থাৎ শ্লোকে (৮.৯৬.১৩-১৫) ইন্দ্রের বিরুদ্ধে এককৃষ্ণ (অসুর? দাস?) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অভিযান করে অংশুমতী (যমুনা?) নদীর তীরে এসে পতাকা গেড়েছিলেন। ইন্দ্র-শত্রু(?) এই প্রাক্-ঐতিহাসিক(?) কৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্লোক তিনটি এখানে অনুবাদসহ উদ্ধৃত করছি। এখানেও যুদ্ধ যেন ক্রীড়াযুদ্ধ, বাজি রেখে যুদ্ধ।

অব দ্রপ্সো অংশুমতীম্ অতিষ্ঠদ্
ঈয়ানং কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবৎ তম্ ইন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তম্
অপ স্নেহিতীর্ নৃমণা অধত্ত॥

'অংশুমতীর ভাটিতে পতাকা গাড়া (হ'ল)। দশ হাজার (সেনা) নিয়ে এসে কৃষ্ণ রইলেন (সেখানে)। আমাদের দুজনের সাহায্য পেয়ে মানুষের প্রতি দয়ালু ইন্দ্র (যুদ্ধের শাঁখ) বাজিয়ে তার উপর ধারা-বর্ষণ করলেন।'

দ্রপ্সম্ অপশ্যং বিষুণে চরন্তম্
উপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।
নভো ন কৃষ্ণম্ অপতস্থিবাংসম্
ইষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ॥

'অংশুমতী নদীর বিজন ভূমিতে একদিকে পতাকা নড়তে দেখেছি। কালো মেঘের মতো দূরে রয়েছে যে কৃষ্ণ তার সঙ্গে তোমরা দুজন বীর বাজি রেখে যুদ্ধ করো, চাই (আমি)।'

অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থে
অধারয়ৎ তন্বং তিত্বিষাণঃ।
বিশো অদেবীর্ অভ্যা চরন্তীর্
বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে॥

'এখন অংশুমতীর একান্তে পতাকা নিজের রূপের উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করতে করতে স্থির হয়েছে সখা বৃহস্পতির সহযোগে সম্মুখীন হয়ে ইন্দ্র দেবতাদের বিরোধী দলকে পর্যুদস্ত করলেন।' (ইন্দ্র ও কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ বিরোধের একটি কাহিনী আছে পুরাণে—পারিজাত-হরণ। ভার্যা সত্যভামাকে খুসি করবার জন্যে কৃষ্ণ স্বর্গের উদ্যান থেকে পারিজাত কেড়ে নিয়ে এসেছিলেন—এই গল্প।)

বেদে এক মানুষ কৃষ্ণেরও সন্ধান পাই। তিনি ছিলেন অঙ্গিরস্-গোত্রীয়, অশ্বিদ্বয়ের উপাসক কবি। ঋগ্‌বেদে সংকলিত তাঁর একটি সূক্তে অর্থাৎ কবিতায় তাঁর ভনিতা আছে (৮.৮৫)। সে ভনিতা-শ্লোক দুটি এই

অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা
হবতে বাজিনীবসু।
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে॥ ৩॥

'হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের ক্ষমতার অন্ত নেই। এই (ব্যক্তি) কৃষ্ণ তোমারে আহ্বান করছে মধু আর সোম কিছু পান করতে।'

শৃণুতং জরিতুর্ হবং
কৃষ্ণস্য স্তুবতো নরা।
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে॥ ৪॥

'হে বীরদ্বয়, কান দাও স্তবকারী কৃষ্ণের আহ্বানে--মধু আর সোম কিছু পান করতে।'

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানী গুরুবংশতালিকায় অঙ্গিরস-গোত্রীয় ঘোরের শিষ্য যে কৃষ্ণ দেবকীপুত্রের উল্লেখ আছে তিনি এই বৈদিক কবি হওয়াই সম্ভব। বৌদ্ধ ঘটজাতক-কাহিনীতে যে বাসুদেবের গল্প আছে তা এই বৈদিক কবি আঙ্গিরস-শিষ্য কৃষ্ণ দেবকীপুত্রের সম্পর্কিত বলে বোধ হয়।

ইন্দ্রসখা, ইন্দ্রশত্রু ও ঋষি কবি-পণ্ডিত এই ত্রিবিধ কৃষ্ণের ইঙ্গিত ছাড়া আরও এক কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাই বৈদিক সাহিত্যে। তিনি ছিলেন এক অপদেবতা, গন্ধর্ব, যাঁর ঝোঁক ছিল স্ত্রীলোকের উপর বিশেষ করে সমর্থ স্ত্রীলোকের উপর। গন্ধর্বগৃহীত নারীর উল্লেখ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে। এই গন্ধর্ব কালো এবং "সর্বকেশবঃ" অর্থাৎ তার সর্বাঙ্গে কেশ। অনেক পূরবর্তী কালের লৌকিক কৃষ্ণকথা থেকে এই গন্ধর্বকৃষ্ণ বা কেশব-ভূতের সূত্র আবিষ্কার করা খুব দুরূহ নয়। কৃষ্ণের তমাল বৃক্ষে অধিষ্ঠান এবং তাঁর নারীলোল্য এই সূত্রেরই হদিস দেয়। একদা যে ভূত-কৃষ্ণের কাহিনী অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ পাই বিহারের কোন কোন লোক-কথায় যেখানে বৃন্দাবনে ঈশ্বর-কৃষ্ণের নয় ভূত-কৃষ্ণের গতিবিধি ছিল (রায়চৌধুরী লিখিত, সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত "ফোকলোর অব্ বিহার" দ্রষ্টব্য)।

বৈদিক সাহিত্যের পর—অর্থাৎ বাইরে—আর পৌরাণিক সাহিত্যের আগে—তখন পৌরাণিক সাহিত্য বলতে যা ছিল তা অস্ফুট ও অপরিণত—অর্থাৎ মোটামুটি বলতে পারি খ্রীস্টপূর্ব সহস্রাব্দীর শেষ চার শতকে এবং তারপরে দু'তিন শতাব্দীতে—দুটি দেবতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি যাঁরা পৌরাণিক বলরাম ও কৃষ্ণের প্রাচীনতর রূপ। এ'রা হলেন সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব। সঙ্কর্ষণের নামান্তর ছিল 'অর্জুন' (বলদেব অর্থাৎ শুভ্রকান্তি দেবতা)। এই নামেই তিনি পাণিনির সূত্রে (৪.৩.৯৫) উল্লিখিত হয়েছেন বলে মনে করি। মহাভারতের অন্যতম নায়ক অর্জুন বেশি খ্যাত হয়ে পড়ায় বোধ করি অর্জুন নামটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। 'সঙ্কর্ষণ' মানে যিনি টেনে আনতে পারেন। বলরামের বিশিষ্ট

অস্ত্র তাই লাঙল যা ভূমিকর্ষণ করে। বলরামের একটি বিশিষ্ট কর্ম তাই যমুনা নদীকে টেনে নিয়ে যাওয়া। তাঁর জন্ম কাহিনীতেও তাই বলা হয়েছে যে তিনি প্রথমে দেবকীর উদরে জন্ম নিয়েছিলেন তারপর সেই গর্ভ টেনে নিয়ে এসে রোহিণীর উদরে স্থাপিত করা হয়। এই গল্প দুটি, বিশেষ করে শেষেরটি, সংকর্ষণ নামটিকে যথার্থ প্রতিপন্ন করবার জন্যে বিরচিত বলে মনে হয়। আর কোন বীরযোদ্ধার লাঙল অস্ত্র সাধারণ বুদ্ধিতে উপহাস্য মনে হয়। বলরাম কৃষির দেবতা নন, তাহলে লাঙল অস্ত্র চলত। তবে 'লাঙল' শব্দের একটা অর্থ ছিল আঁকশি (অঙ্কুশ)। সঙ্কর্ষণের অস্ত্র অঙ্কুশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বাসুদেব মানে মঙ্গলময় দেবতা। নামটির আসল মানে বসুদেবের পুত্র নয়। বরং পিতা বসুদেবের কল্পনা বাসুদেব নাম থেকেই গঠিত হয়েছে। 'বাসু' ও 'বসু' একই শব্দ। যে মূল ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষা উদ্ভূত সেই ভাষায় শব্দ দুটির রূপ ছিল যথাক্রমে *wesu ও *wesu; প্রথম শব্দটি আইরিশ ভাষায় চলে এসেছে, আর সংস্কৃত ভাষায় এসেছে 'বাসুদেব' এই নামে এবং 'বাসু' (অর্থ সুন্দরী নারী) ও 'বাসুরা' (অর্থ রাত্রি) শব্দে। সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব সরাসরি এসেছিলেন তাঁদের ভগিনী ও প্রিয়া একানংসা সুভদ্রাকে নিয়ে ঋগ্বৈদিক অশ্বিদ্বয় ও উষা থেকে। তাঁরা ছিলেন বিশেষ এক যৌধেয়বংশের—নাম সাত্বত (বা বৃষ্ণি)—বিশিষ্ট উপাস্য দেবতারূপে। এই উপ-কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলেছে অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে। মাড়বারে ঘোসুণ্ডী গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের উল্লেখ আছে, সেই সঙ্গে আছে 'অনিহিতা'র' উল্লেখ। এটি একানংসা-সুভদ্রার প্রাচীন নামান্তর বলেই গ্রহণীয়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে নানাখাট্ গুহালিপিতে বন্দনা অংশে ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, ধর্ম এই বৈদিক ও লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবও আছেন। এই সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের সঙ্গে পরে আরও দু'তিন জন বৃষ্ণিবংশ বীরের উল্লেখ (এবং পূজা) দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনীতে এঁরা বাসুদেবের পুত্র-পৌত্র—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, শাম্ব। এই সাত্বত-বৃষ্ণি বীরেশ্বরদের কাহিনী হরিবংশে বিস্তৃত-ভাবে আছে। এই ঐতিহ্য খানিকটা আনাতোলিয়া (ফ্রিজিয়া) থেকে আগত হতে পারে।

সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবের গল্পকথা পৌরাণিক বলদেব-কৃষ্ণের কথার সঙ্গে মিশে গেছে। অনাহিতা-একানংসা-সুভদ্রার কাহিনী তেমন মিলে যেতে পারেনি। গোড়ার দিকে যশোদানন্দিনী একানংসা চিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন এবং স্বর্গে ইন্দ্রের পূজা পেয়েছিলেন। আর শেষের দিকে তিনি বলরাম-কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রারূপে অর্জুনপত্নী হয়েছিলেন।

কিন্তু গল্পে যাই হোক না কেন, জনসমাজে ভাইবোন তিনজনের পূজা চলে এসেছে আজ পর্যন্ত—উড়িষ্যায় নীলাচলে শ্রীক্ষেত্রে। উড়িষ্যার বাইরেও যে এ ত্রয়ী দেবতার পূজার প্রচলন ছিল তার প্রতিমা ও শিলালেখের সাক্ষ্য মিলেছে।

অশ্বিদ্বয় ও বিষ্ণু-কৃষ্ণের একটি প্রধান যোগসূত্র হল 'মাধব' নামে। আগেই বলেছি বিষ্ণু বিশ্বের মধুর ভাণ্ডারী, আর অশ্বিদ্বয়ই ছিলেন মধুর বিতরণকারী। সুতরাং মাধব নামটি দু'-তরফেই সমান প্রযোজ্য। পৌরাণিক আমল থেকে আজ পর্যন্ত যজ্ঞাদি পূজার কাজে যিনি সর্বাধি-নায়ক দেবতা তাঁর মাধব নামটিই যেন বিশিষ্টতম। তুলনা করুন এই মন্ত্র

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবঃ॥

বিষ্ণুদেবতার আরাধনায় গোড়ার কথাটি আশ্রয় করে আছে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্ এই তিনটি শব্দকে আশ্রয় করে। তিনটি শব্দ সমধাতুজ, ভজ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যথাক্রমে ধাতুতে -'ত' ("ক্ত")

ও -তি' ("ক্তি") ও প্রত্যয় দিয়ে এবং ভ ধাতুজ ভগ শব্দে -'বন্ত্' ("মতুপ্") প্রত্যয় দিয়ে গড়া। 'ভজ্' ধাতুর মানে বেঁটে দেওয়া, অংশ পাওয়া, দায়াদ হওয়া। 'ভক্ত' মানে যিনি অংশভাক্, দায়াদ, ইংরেজীতে ('ক্তি') ও প্রত্যয় দিয়ে এবং ভ ধাতুজ ভগ শব্দে -'বন্ত্' ("মতুপ্") প্রত্যয় দিয়ে গড়া। 'ভজ্' ধাতুর মানে বেঁটে দেওয়া, অংশ পাওয়া, দায়াদ হওয়া। 'ভক্ত' মানে যিনি অংশভাক্, দায়াদ, ইংরেজীতে sharer, shareholder। 'ভক্তি' মানে বাঁটোয়ারা, ভাগ করে দেওয়া, ইংরেজীতে to apportion, distribute, অথবা দলভুক্তির চিহ্ন, ইংরেজী করে বললে share certificate বা share mark। 'ভগবান্' মানে ভাগ বাঁটোয়ারার মালিক, ইংরেজী করে বললে stockist, যথার্থ প্রতিশব্দ হল lord ("রুটির মালিক")। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শব্দগুলির মূলে ব্যবহার হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক (feudal) সমাজভাবনার আওতায়।

ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্ এই ত্রিমূলে আশ্রয় করে উৎপন্ন ও বিকশিত বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস নির্ভর করেছে প্রাচীনতর 'ভগ' শব্দটির উপর। এ শব্দ 'ভগবন্ত্' (ভগবান্) শব্দের মূল এবং এ শব্দ এসেছে ভজ্ ধাতুতে -'অ' ("অচ্") প্রত্যয় যোগ করে। শব্দটির মূলে মানে ছিল "ভাগযোগ্য (দাতব্য) দ্রব্য (খাদ্য) ভান্ডার"। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছরেরও আগে সংস্কৃত-গ্রীক-লাতিন প্রভৃতি ভাষা যাঁদের মাতৃভাষা ছিল তাঁদের বহু পূর্বপুরুষ যে ভাষাটি বলতেন সেই অনুমানলব্ধ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় শব্দটি প্রচলিত ছিল এখনকার দিনের ভগবান্, বিশেষ করে 'দাতা ভগবান্' অর্থে। এইখানে তখন যে দেবভাবনা ছিল তা খানিকটা সঙ্কুচিত হলেও ঋগ্বেদেও পোঁছেছিল। ঋগ্বেদে 'ভগ' দেবতা আছেন, তিনি একজন "আদিত্য" অর্থাৎ সূর্যবর্গের দেবতা। তাঁর সম্বন্ধে ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি (৭.৪.৪,৫) অনুধাবনীয়।

ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্
তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।

'হে দেবগণ, ভগ যেন দানশীল হন। তাহলে আমরা ভগবান্ (অর্থাৎ ধনী) হব।'

লক্ষ্য করতে হবে যে তখন ভগবন্ত শব্দটির আধুনিক অর্থ এসে যায়নি। বৈদিক ভগ দেবতার অন্তর্ধানের পরে তবে ভগবন্ত শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয় ভগ দেবতার প্রতিশব্দ হয়েছে। ভগ শব্দটি রয়ে গেছে ভগবন্ত্ শব্দের প্রকৃতির অর্থে (অর্থাৎ ধন, ঐশ্বর্য্য)। 'ভগ' যে একটা ফিউড্যাল ভাবনার ঈশ্বর (God) ছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে (৫.৪৬.৬) : "ভগো বিভক্তা"।

পরবর্তীকালে ধর্মবিবর্তনে 'ভক্তি' শব্দটির অর্থে পরিবর্তন ঘটেছে, 'ভক্ত' শব্দের অর্থেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু 'ভগবন্ত্' শব্দে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। যে কালে বিষ্ণু-উপাসনার উপর বাসুদেব উপাসনার গভীর ছাপ পড়ল সেই কালে 'ভগবন্ত্' শব্দটি সর্বেশ্বরের প্রধান অভিধারূপে চলে গেল। বিষ্ণু-উপাসনা যা আরও বেশ কিছুকাল পরে 'বৈষ্ণব'ধর্ম নাম পেয়েছিল তা এখন 'ভাগবত' মত বলে প্রতিষ্ঠিত হল। এর সাক্ষী মিলবে প্রচুর প্রাচীন প্রত্নলেখে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে (হেলিওদোরের স্তম্ভলেখ দ্রষ্টব্য)।

আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে বিষ্ণু-উপাসনা আমাদের দেশে চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস পরীক্ষা করলে আমরা বুঝতে পারি যে এই উপাসনায় (বা ধর্মে) ধীরে ধীরে সিংহাসন থেকে বিষ্ণুর মূর্তি মুছে এসেছে। তার স্থানে ফুটে উঠেছে বাসুদেব ও কৃষ্ণ (অথবা বাসুদেব-কৃষ্ণ)। ভাবের দিক দিয়ে বিষ্ণুর উপর বাসুদেবের ছাপ পড়ল অশ্বিদ্বয়ের। দুটি দেবভাবনা সহজে বাঁধা পড়ে গেল 'মাধব' (=মধুভান্ডারী ও মধুদাতা) অভিধার শিকলে। অশ্বি দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন, যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে রাত্রির পুত্র (=কৃষ্ণ বাসুদেব), আর একজন ঊষার পুত্র (=অর্জুন, বলদেব সঙ্কর্ষণ[২])।

'বিষ্ণু' নামটির অর্থ যখন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন 'কর্মশীল', তাঁদের মতে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'বিষ্-' ধাতু থেকে। এ ধাতুর আর একটি অর্থ হল 'পরিবেষণ করা'। ঋগ্বেদে আছে, বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্যে প্রচুর ভোজ্য পাক করেছিলেন। পৌরাণিক 'মধুসূদন' নামেও তার ইঙ্গিত রয়েছে। ('মধুসূদন' নামটির আসল তাৎপর্য ভুলে গিয়ে এবং হনন করা অর্থে এক 'সূদ'-ধাতু কল্পনা করে পৌরাণিকেরা এক "মধু" দৈত্যের নাম করেছেন।) মনে হয় 'বিষ্ণু' নামটি আসলে ইন্দো-ইউরোপীয় 'বেইস্-(weis-)' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এ ধাতুটি সংস্কৃতে বিলুপ্ত, এর অর্থ ছিল 'বেড়ে ওঠা, বিস্তীর্ণ হওয়া'। এই ব্যুৎপত্তি যে বিষ্ণুর সম্বন্ধে সব দিকেই খাটে তার প্রমাণ রয়েছে।

আগেই বলেছি যে ঋগ্বেদে বিষ্ণু শিশু নন কিশোর যুবা। তিনি "যুবাকুমারঃ"—'যুবা, বালক নন', তিনি "বৃহচ্ছরীরঃ"—'প্রকাণ্ডকায়' (১.১৫৫.৬)। তিনি লম্বা লম্বা পদক্ষেপ করেন ("উরুক্রম"), তিনি দূরগামী ("উরুগায়")। বিষ্ণু তিন পদক্ষেপ করে বিশ্বভুবনকে মেপে ফেলেন এবং তাঁর তিন পদাঙ্কে বাস করে মায় দেবতারা সমেত সবাই। বাহ্যিক অর্থেও বিষ্ণু ঋগ্বেদীয় দেবতাদের মধ্যে উচ্চতম স্থানারূঢ়। তাঁর চরমধাম দ্যুলোকের ঊর্ধ্বতম স্থানে। সে স্থান বিষ্ণু-উপাসকদের কাছে প্রতিভাত হয় যেন আকাশে বিস্তীর্ণ একটি চোখ জ্বলজ্বল করছে।

> তদ্ বিষ্ণোঃ পরমংপদং
> সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
> দিবীব চক্ষুর আততম্॥ ১.২২.২০॥

(এই ধাম প্রাচীন পৌরাণিক কল্পনার 'বৈকুণ্ঠ', নবীন পৌরাণিক কল্পনায় 'গোলোক'।) বিষ্ণু (ও ইন্দ্রের) সেই ধামে (বা আশ্রমে "বাস্তুনি") উপাসকেরা গমন করতে চান ("উশ্মসি গমধ্যৈ")। যেখানে আছে "ভূরিশৃঙ্গ" ক্ষিপ্রগামী[৩] গোরু, যেখানে মধুর পরম উৎস (১.১৫৬.৬)। শুধু সেখানে কেন বিষ্ণুর আর দুটি পদাশ্রয়েও অক্ষয় মধুর পরিপূর্ণ আনন্দ উৎসার (১.১৫৬.৪)।

বিষ্ণু ঠিক সূর্যদেবতা নন। সূর্য সবিতা বা পূষার সঙ্গে তার মিল থাকলেও তাঁকে ওঁদের কারো সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। বিষ্ণুকে বলা যায় সৌরমণ্ডলের বা কালচক্রের দেবতা। তিনিই সূর্যকে চক্রভ্রমণারূঢ় করেছেন, তিনিই দিবারাত্রি চতুসংবৎসর বিভাগ ব্যবস্থা করেছেন (১.১৫৬.৬ কখ; ১.১৬৪.৮)। পৌরাণিক ঐতিহ্যে বিষ্ণু হলেন "সবিতৃমণ্ডলবর্তী নারায়ণ"[৪] সম্ভবত এ কল্পনা এসেছে "দিবীব চক্ষুর আততম্" ভাবনা থেকে। পৌরাণিক বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র, এমন কি তাঁর সিম্বল, হল চক্র অর্থাৎ সূর্য।

বিষ্ণুর অস্ত্র চক্র তাঁর সিম্বল হবার আগে সিম্বল হয়েছিল গরুড় (পক্ষী)। ভগবান্ বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে পুরানো নজির পাচ্ছি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে (বেসনগরে হেলিওডোরের স্তম্ভ)। বিষ্ণুর গরুড় সিম্বলের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয় আবেস্তায় অহুরমজ্দার সিম্বল পাখা ছড়ানো পাখির সঙ্গে। এখানে মনে রাখতে হবে, আবেস্তায় যেমন আহুরমজ্দার কোন মূর্তি নেই বেসনগরে স্তম্ভের অথবা ওরিসম খ্রীষ্টপূর্ব প্রাচীন প্রত্ন-সামগ্রীতে বিষ্ণু-বাসুদেব-কৃষ্ণের কোন মূর্তি পাওয়া যায় না।

বাসুদেব (কৃষ্ণ) ও সঙ্কর্ষণ (বলদেব) বৈদিক ঐতিহ্যের দেবাসুর (পরবর্তীকালে দেবদানব) মিলে যেভাবে উদ্ভূত হয়েছিলেন তা নক্শা কেটে দেখালে সুগম হবে।

দেব			অসুর-দানব		
বিষ্ণু	অশ্বী (কৃষ্ণ)	অশ্বী (শুক্র)	কৃষ্ণ	বল	রৌহিণ[৫]
	বাসুদেব (কৃষ্ণ)			সঙ্কর্ষণ (বলদেব)	

বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের উপাসনা নিয়েই "ভাগবত" ধর্মের শুরু। এইটিই বৈষ্ণব-ধর্মের প্রথম নাম। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীগুলিতে এবং খ্রীষ্টপর সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই নামই চলিত ছিল। বৈষ্ণব অর্থে 'ভাগবত' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ যা আমরা জানি না পাই খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি প্রত্নলেখে (মধ্যভারত বেসনগরে প্রাপ্ত হেলিওদোরের গরুড়স্তম্ভ লিপিতে) ভাগবতধর্মের—শুধু ভাগবতধর্মের কেন ভারতীয় ধর্মচিন্তার—বোধ করি মহত্তম বাণী রয়েছে এই লেখে উৎকীর্ণ।

ত্রিনি অমুতপদানি [ইহ] [সু-] অনুঠিতানি নেঅন্তি [স্বগং] দম চাগ অপ্রমাদ॥

'তিনটি অক্ষয় সোপান সু-অনুষ্ঠিত হলে স্বর্গে নিয়ে যায়—প্রবৃত্তিসংযম, ভোগসংযম ও সজাগ সতর্কতা।'

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে শিব-উপাসনায়—যা প্রথমে "যোগী"-ধর্মের আওতায় ছিল তা স্বতন্ত্র হয়ে ভক্তি-সাধনার রঙ গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে "ভাগবত" অভিধাটি এঁদের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হতে থাকে, বিশেষ করে শিবের ভার্যা 'ভগবতী' নাম পাওয়া যায়। তার ফলে নৃপতিদের শাসনে পরমভাগবতের স্থানে "পরম বৈষ্ণব" দেখা দেয়। 'বৈষ্ণব' শব্দটি এখানে 'মাহেশ্বর' শব্দের বৈপরীত্যেই প্রযুক্ত হতে থাকে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাগবত-বৈষ্ণব ধর্মে লোকভাবনায় ও লোকসাহিত্যে শিশু-কৃষ্ণের সমাদর জাগ্রত হয়েছিল। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু শিশু নন, বালকও নন, তিনি প্রৌঢ়কিশোর বা যুবা। কিন্তু তাঁর যে অগ্নিস্বরূপ গৃহস্থের ঘরে ঘরে গৃহদেবতার মতো প্রত্যহ পূজিত হত সেই গার্হপত্য অগ্নিকে বৈদিক কবি ঘরের ছেলের মতো দেখতেন। তাই গার্হপত্য অগ্নিকে ঋগ্‌বেদের কবি বলেছেন "শিশুর্‌ দন্‌" অর্থাৎ ঘরের শিশু, ঘরের কর্তা-গিন্নির ("পতী দন্‌") বৈপরীত্যে 'ব্রাহ্মণ' নামক বৈদিক সাহিত্যের গদ্যগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণু যজ্ঞীয় অগ্নি ও যজ্ঞের সঙ্গে মিলে যায় এবং তাঁর শিশুরূপ অবলম্বন করে গল্প গড়ে ওঠে। এই গল্পে পাই যে দেব-অসুর ছিলেন বৈমাত্র জ্ঞাতিগোষ্ঠী। অসুরেরা ছিলেন কর্মিষ্ঠ, দেবতারা ছিলেন অলস। এই সূত্রে অসুরদের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধের ভাব জাগে। তাঁরা দেবতাদের না জানিয়ে পৃথিবীর সব স্থান নিজেদের খাস করে নিলেন। তখন দেবতারা খুব ফাঁপরে পড়েন। তাঁদের অন্তত সামান্য একটুও নিজস্ব স্থান চাই নইলে যজ্ঞ করবেন কি করে। তাঁরা শিশু বিষ্ণুকে সঙ্গে করে অসুরদের কাছে সামান্য একটু স্থান—বিষ্ণু শুলে যতটুকু হয় ততটুকু—যজ্ঞ করবার জন্যে চাইলেন। অসুরেরা তা দিলেন। বিষ্ণু মাটিতে শুয়ে চারিদিকে হু হু করে বাড়তে লাগলেন। তার ফলে অসুরেরা পৃথিবী (অর্থাৎ ভারতবর্ষ?) থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেলেন।

এই ব্রাহ্মণের গল্পটি ঋগ্‌বেদের উরুক্রম বিষ্ণুর মিথের সঙ্গে মিলে গিয়ে পৌরাণিক গ্রন্থে বলি-বামন উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে শিশু কৃষ্ণের লীলাকাহিনী যে সাধারণ জন-সমাজে বিশেষ করে নারীসমাজে গানে গাথায় ও গল্পে সমাদৃত ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু এই লোকভাবনার প্রত্যক্ষ ফলরূপে যে শিশু কৃষ্ণের পূজা চলিত হয়েছিল তা বলা যায় না। এখানে ইতিহাসের অনুরোধে খ্রীষ্টীয় ধর্মের কিছু প্রভাব মানতে হয়। শিশু-কৃষ্ণের বা বাল-গোপালের পূজা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দী শেষ হবার আগেই দেখা দিয়েছিল। যতদূর অনুমান করা যায় তাতে মনে হয় এ পূজারীতি দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে এসেছিল। দক্ষিণ ভারতে কেরলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সিরীয় খ্রীষ্টানের সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপিত হয়। সেই আদি

আগত সিরীয় খ্রীষ্টানদের ধর্ম-আচরণ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে তাঁরা মেরী মাতা ও তাঁর শিশু পুত্রকে পুজো করতেন। সেই সূত্রে আমাদেরও শিশু কৃষ্ণের ভাবনায় দেবভাবনার ও বিষ্ণু ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল।

গোপাল কৃষ্ণের উপাসনা আমাদের বাংলাদেশে যে অষ্টম শতাব্দীর আগেই এসেছিল তার একটি অবান্তর প্রমাণ হল পালরাজা ধর্মপালের পিতার নাম, 'গোপাল'। দেবতার নামে নাম রাখা আমাদের দেশের খুব প্রাচীন রীতি। যেমন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, দেবদত্ত, অগ্নিমিত্র, রুদ্রদাম, বিষ্ণুরাত ইত্যাদি। (ধর্মপালেরা যে বৈষ্ণব উপাসক বংশ ছিলেন তা আরও বোঝা যায় তাঁর প্রপিতামহের নাম 'দয়িতবিষ্ণু' থেকে। ধর্মপালের পিতামহের নাম 'বপ্যট'—ডাক নাম, মানে "বেয়ারা"।)

বালগোপালের উপাসনা বৈষ্ণবধর্মকে সর্বাত্মক ভক্তিধর্মে পরিণত করলে। এর মধ্যে খানিকটা বৌদ্ধ মহাযান মতেরও প্রভাব আছে। মহাযানীদের উপাস্য করুণাঘন অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণুরই যে পরিণত রূপ। চৈতন্যের ধর্ম, যা বৈষ্ণবধর্মকে তার চরম পরিণতি দিয়েছে, তাতে অবলোকিতেশ্বরের করুণার যোগান অনেকটাই আছে "জীবে দয়া"—এ মন্ত্র সেই সূত্রেই এসেছে।

এ প্রবন্ধ আর বাড়াব না। বাড়ালে শেষ হবে না। শুধু একটি কথা বলবার আছে। চৈতন্য বৈষ্ণবধর্মকে চরম রূপ দিয়ে গেছেন। সে রূপের তিনটি স্বরূপ—(১) জীবে দয়া, (২) নামে রুচি, (৩) ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক।

দ্বিতীয় স্বরূপটি চৈতন্যের ধর্মকে ইউনিভার্সাল ধর্মে উন্নীত করেছে। চৈতন্য মূর্তিপূজা করতে বলেননি, ঈশ্বরের নাম নিতে বলেছেন এবং আরও বলেছেন ঈশ্বরের অসংখ্য নাম, তার থেকে যে কোনটি নিলেই হবে। এইখানে চৈতন্য হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে মিলনের সেতু বেঁধে দিয়েছিলেন।

পাদটীকা

[১] সম্ভবত 'অনাহিতা' ঠিক পাঠ হবে। শব্দটির অর্থ একানংসার তুল্য। 'অনাহিতা' মানে অবিবাহিতা বা নিষ্কলঙ্কা, 'একানংসা' মানে এক (=অবিবাহিতা) ও অস্পৃষ্টা। দেবী অনাহিতা'র উল্লেখ আবেস্তায় ও প্রাচীন পারসীক শিলালেখে আছে।

[২] উষার পুত্র হিসাবে 'সঙ্কর্ষণ' নামটির সার্থকতা আছে। উষা জেগে উঠে তাঁর ব্রজের দ্বার খুলে দেন, গোরু বেরিয়ে আসে। তাদের ডেকে নিয়ে জড় করে যিনি চরাতে নিয়ে যান তিনিই 'সঙ্কর্ষণ'। গোপবালক হিসাবে এইখানে সার্থকতা।

[৩] হরিণের মতো শাখাময় শিঙযুক্ত গোরুর মূর্তি মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় মিলেছে।

[৪] 'নারায়ণ' শব্দটির আসল মানে হল "বীরকীর্তি"। এই অভিধাটি বিষ্ণু-কৃষ্ণের হাইফেনের মতো ক্ষীণমূর্তি দেবভাবনার স্পষ্টমূর্তি অবতারভাবনার সেতুর মতো।

[৫] ইন্দ্রশত্রু রৌহিণের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে (২.১২.) ১২।

অ্যাসেমব্লিতে

অসীম রায়

অ্যাসেমব্লিতে পুতুলেরা হাত নাড়ে
অবিকল মানুষের মতো, কারো কারো
অবিকল টাক চুল গলার আওয়াজে
অবিশ্বাস্য মিল, কিন্তু মানুষ তো নয়
মোটেই মানুষ নয়
বোধহয় জলজ উদ্ভিদ
যদি বাস্তবতা থেকে যায় আপাতিক স্তরে
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব অশরীরী
এইসব আধুনিক প্রেত।

এইসব জলজ উদ্ভিদ
কথার বুদ্‌বুদ তোলে হাওয়ায় হাওয়ায়
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নীলাভ আলোয়
কথা ঘোরে কথা ওড়ে কথা গোঁত মারে
আকর্ষণে অনিবার্য কথা
যেন প্রজাপতি কিংবা থমথমে জলভরা মেঘ
আহা এ কী কথার বাহার
জন্মমৃত্যুকাহিনীর আজন্ম দুর্যোগে!

এইসব প্রেত ছিল একদা মানুষ
একদা দুচোখে দীপ্ত ছিল সজীবতা
বাক্যে পৌরুষ, ছিল আঙুলে উষ্ণতা
যেমন ঐ যে লোকটা বাঁকুড়ার ইস্কুল মাস্টার
চোখে তার ছিল নাকি আযোজন ফাটা মাঠে নির্জলা টিউবেল
বাদামি কাদার পাশে যামিনী রায়ের মা ও ছেলে
তমিস্রায় কাঁপা-কাঁপা কেরোসিন লম্ফের করুণ আলোয়
জন্তুর জীবন, কিংবা মেদিনীপুরের ঐ সাঁওতাল নেতা
চোখে যার একঝাঁক বক মনে মনে
ভাতহীন মানুষের হাত
তাদের গলায় ছিল মানুষেরই গলার আওয়াজ
মনে ছিল মানুষের মন
এখন এ নীলাভ আলোয়
প্রেত বা পুতুল।

এ মোহিনী বাক্স থেকে ছিটকে প্যালাতেই
দেখি দীপ্ত দাবদাহ পুড়ছে ময়দান
নীলাভ ধোঁয়ায় নীল গাছ বাড়ি গঙ্গা গম্বুজ
রোদে-পোড়া যুবকযুবতী
ঘামে ভিজে প্রেম করে
বৃক্ষছায়ায়,
মাটি চাটে কয়েকটা ছাগল
গরমের ফুল ঝরে তাদের মাথায়, ঘাড়ে কাঁধে
কসাইয়ের রৌদ্রের ঝলক।

ফাঁকা থাকে না

রত্নেশ্বর হাজরা

তুমি না এলে আসে অন্য কেউ   বিশেষত মরণ
তুমি না এলে মুখের চেহারা বদলে যায় আমার
আমি দাঁড়িয়ে থাকি অবলম্বনহীন   তুমি ছাড়া
আমার ডাকনাম ধরে
ডাকার মতো যে কেউ নেই আর!

পাখির সঙ্গে পাখি উড়ছে, মানুষের সঙ্গে চলছে মানুষ
এবং সুখদুঃখের সঙ্গে সুখদুঃখ হাঁটছে পাশাপাশি
যৌবনও চায় যৌবনের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসের সুযোগ
কিন্তু নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতেই পার হয় তার অর্ধেক পথ
তখন আর ছায়ার পাশে ছায়া থাকতে পায় কতক্ষণ—
যদিও ফুলের গন্ধ যেমন ছিল তেমনি থাকে
তেমনিভাবেই সবুজ ফল হলুদ হয় ফলের বাগানে।

তুমি না এলে কেউ না কেউ চলে আসে   বিশেষত মরণ
বসতে না দিলে থাকে দাঁড়িয়ে
কথা না বললেও ফিরিয়ে নেয় না মুখ
এবং চলে না গেলেও বলতে পারি না কিছু জোর দিয়ে—
তুমি না এলে সেই শূন্যতা
কেউ না কেউ তো দখল করবেই।

আমার জন্মের ঋণ

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

থাকি এক শব্দহীন অদ্ভুত জগতে
বাড়ি ফেরা হয় নাকো আর,
ইচ্ছে নেই তোমাকে দেখার—
চলি ফিরি নিরুদ্দেশ বাঁক-ঘোরা পথে।

ফুটপাথে শুয়ে থাকি কুয়াশায় একা
কলকাতাও শুয়ে থাকে পাশে,
চাঁদ ওঠে ভৌতিক আকাশে,
স্বপ্নে ফের কোনোদিন পাব তার দেখা।

আমার জন্মের ঋণ মেটাবার কাজে
পায়ে পায়ে অভিজ্ঞতা বাড়ে,
ঘোর-লাগা ভোরে অন্ধকারে
সময়ের পেটাঘড়ি হাতে হাতে বাজে।

অগোচর মানুষের মুখ চিনি আমি
তারা-না-বলতেই বুঝি কথা—
ভাঙাচোরা ভাষার সততা।
আমার যাত্রাও তাই দূর দ্রুতগামী।

আমার নিবাস আজ গোটা কলকাতা
সকল সংসারে যাই আসি,
আসলে, যাই না—ভালবাসি।
বসন্তের মধ্যে আমি হেমন্তের পাতা।

রাবীন্দ্রিক-আধুনিক

অশ্রুকুমার শিকদার

শ্রীযুক্তা রানী মহলানবীশকে উৎসর্গ করা "শ্যামলী" কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গকবিতাটি শুধু ছন্দোবন্ধ, বাকি সব কবিতাই গদ্যছন্দে লেখা। এই বইয়ের কবিতাগুলো ১৯৩৬ সালের ২৩শে মে থেকে ৬ই অগস্টের মধ্যে লেখা। শুধুমাত্র দুটি কবিতার নিচে তারিখ দেওয়া নেই। এই কবিতা দুটো বইতে পর-পর ছাপা হয়েছে—'বঞ্চিত' আর 'অপরপক্ষ'। কেন মাত্র এই দুটো কবিতারই তারিখ নেই তার কারণ জানি না। তবে এই কবিতা দুটি "পরিচয়" পত্রিকার বৈশাখ ১৩৪৩ সংখ্যায় 'পাত্র ও পাত্রী' নামে ছাপা হয়। সেই সময় জোড়ার একটি 'বঞ্চিত'-এর নাম ছিল 'চন্দ্রমল্লিকা'। 'অপরপক্ষ'-এর নাম অপরিবর্তিত আছে। বৈশাখ ১৩৪৩-এ ছাপা হয়, সুতরাং লেখাও বেশি আগে নয়, ১৯৩৬ সালেরই প্রথম দিকে সম্ভবত। কবিতা হিশেবে খুব উঁচুদরের নয়, কিন্তু এই কবিতা দুটি পর-পর পড়া উচিত। কারণ একই ঘটনার দুই পিঠ আছে এই দুই কবিতায়। নায়িকা ও নায়ক দুজনের পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাকে দেখা। দ্বিতীয় কবিতার নাম 'অপরপক্ষ' হওয়ায় সেই পরস্পরসাপেক্ষতা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে এই কবিতা দুটিকে যুগ্মকবিতা বলা হয়েছে।

'বঞ্চিত' কবিতাটি নায়িকার জবানিতে বলা। 'ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি/পোস্টকার্ড-খানা আয়নার সামনেই,/কখন এসেছে জানি নে তো।' প্রেমিকের, যে-সময়ে লেখা সে সময়টা মনে রাখলে, স্বামীর চিঠি পেয়ে নায়িকা দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিল। তার মনে-মনে ভয় 'গাড়ি ধরতে পারব না বুঝি।'

চুলটাকে জড়িয়ে নিলুম কোনোমতে,
টবের গাছ থেকে তুলে নিলুম
চন্দ্রমল্লিকা বাসন্তীরঙের।

গাড়ির জন্যে অপেক্ষায় সময়ের ধারণা তার এলোমেলো হয়ে গেছে অধৈর্যের তাড়নায়—'পাঁচমিনিট, হয়তো বা পঁচিশ মিনিট।' গাড়ি যেন যথেষ্ট দ্রুত চলছে না। একবার বাঁকে করে ছানা এনেছে গয়লার দল, তারা দেরি করিয়ে দিচ্ছে। আবার 'মাঝখানে অকারণে গাড়িটা থামল অনেকক্ষণ,/খেতে খেতে খাবার গলায় বেধে যাবার মতো।' 'পুনশ্চ' এবং তার পরবর্তী কবিতায় ইংরেজি আধুনিক কবিতার সঙ্গে পরিচয়সূত্রে রবীন্দ্ররচনায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি এমন অনেক এলিয়টী উপমা। ধারকরা এবং অস্বাভাবিকতায় বেখাপ্পা—'সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া।' যাই হোক, 'শেষে দেখা দিল হাবড়া স্টেশন।'

চাইলেম না জানালার বাইরে,
মনে স্থির করে আছি—
খুঁজতে খুঁজতে আমাকে আবিষ্কার করবে একজন এসে,
তারপরে দুজনের হাসি।

কিন্তু কেউ এলো না, সবাই গাড়ি থেকে নেমে গেল। অবশেষে গাড়ি থেকে 'মেয়েটাকে নামতেই হল।' আগন্তুকের ভিড়ের মধ্যে নিজেকে তার মনে হল খাপছাড়া, মনে হল না এলেই ভালো হত, ভাবলো যদি থাকতো ফিরতি গাড়ি। আবার মনে দেখা দিল নানা সাংঘাতিক বিপদ-আপদের

আশঙ্কা। অবশেষে 'সামনে ছিল বাস্, উঠে পড়লুম।/ফেলে দিলুম চন্দ্রমল্লিকাটা।'

এই নারীর উক্তির উলটো দিকটা অর্থাৎ পুরুষের উক্তি আছে 'অপরপক্ষ' কবিতায়। প্রেমিক বা স্বামী যাবে স্টেশনে নায়িকাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে—'সময় একটুও নেই।' শেষ মুহূর্তে হারানো জুতো যদি বা পাওয়া গেল, চৌকাঠ পর্যন্ত এগোতে-না-এগোতে বাবা বেরিয়ে এসে শুরু করলেন সাংসারিক পরামর্শ—'ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর উঠছি ঘেমে।' রাস্তায় যখন নায়ক বেরিয়েছে তখন 'হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।' 'ট্যাক্সি ছুটল বে-আইনি চালে'—হাওড়ার ব্রিজে যখন পৌঁছুলো তখন হাতে আর ন' মিনিট মাত্র সময়। অথচ,

দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় করে।
রাস্তাটা পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে পাটবোঝাই গাড়িতে।

নিরুপায় ট্যাক্সি ছেড়ে নায়ক বেরিয়ে পড়ল পায়ে হেঁটে। কিন্তু প্লাটফর্মে ঢুকে দেখলো,

দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল,
যেন একঘেয়ে অর্থের গ্রন্থিতে বাঁধা
অমরকোষের একটা লম্বা শব্দাবলী।

মেয়ে-কামরাগুলিতে উঁকি মেরে দেখলো নায়ক নির্বোধের মতো—'ভগ্ন আশা শূন্য প্লাটফর্ম জুড়ে ভূলুণ্ঠিত।' আগের কবিতার নায়িকা নায়ককে দেখতে না পেয়ে বাসে উঠে পড়েছিল, এই কবিতার নায়কও নায়িকাকে না পেয়ে অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে পড়েছিল স্টেশন থেকে। 'বাসের নিচে চাপা পড়িনি নিতান্ত দৈবক্রমে।' নিরতিশয় হতাশায় ঐটুকু দয়ার জন্যেও সে বিধাতাপুরুষকে আর কৃতজ্ঞতা জানাতে চায় না।

এই জোড়ার দ্বিতীয়টি, 'অপরপক্ষ' পড়ামাত্র মনে পড়ে যায় বিষ্ণু দে-র 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতার কথা। বিষ্ণু দে-র কবিতাটিও পুরুষের উক্তি। এখানেও নায়িকাকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল নায়ক; হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিল সে। 'অপরপক্ষ' এবং 'টপ্পা-ঠুংরি'-র থীম্ আশ্চর্য-রকমভাবে এক। এত বেশি এক যে সন্দেহ হয় একটা পড়ে অন্যটা লেখা। এমন অনুমানের আগে সনতারিখের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। 'টপ্পা-ঠুংরি' বিষ্ণু দে-র যে বইয়ের অন্তর্গত সেই 'চোরাবালি' যখন প্রথম ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ভারতীভবন -কর্তৃক প্রকাশিত হয় তখন তাতে কবিতা-গুলির রচনাকাল নির্দেশিত ছিল না। সিগনেট প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে রচনাকাল আছে। তা থেকে জানা যায় 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির আগে। সুতরাং বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের 'অপরপক্ষ' পড়ে 'টপ্পা-ঠুংরি' লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ কি বিষ্ণু দে-র কবিতাটি পড়েছিলেন আগে? বিষ্ণু দে-র কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র- সম্পাদিত "কবিতা" পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের জুন-জুলাই মাসে।* তার আগেই রবীন্দ্রনাথের 'অপরপক্ষ' লেখা ও 'পরিচয়'-এ ছাপা হয়ে গেছে। সুতরাং নিজের কবিতা লেখার আগে বিষ্ণু দে-র কবিতাটি অন্তত ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পড়া ঘটে ওঠেনি। তবে কি তিনি 'টপ্পা-ঠুংরি' পড়েছিলেন পাণ্ডুলিপি অবস্থায়? এই প্রশ্নের উত্তর এখন জানেন শুধু কবি বিষ্ণু দে। যদি পড়ে থাকেন, তবে কি রবীন্দ্র-নাথ প্রলুব্ধ হয়েছিলেন ঐ থীমের একটি নতুন ভার্শন রচনায়, কবিতার আধুনিকতায় নিবদ্ধ সেই থীম্‌কেই রাবীন্দ্রিক স্বকীয়তায় যেন অনুবাদ করতে? "চোরাবালি" পড়ে বিষ্ণু দে-কে রবীন্দ্রনাথ

*এই তথ্য আমাকে জানিয়েছেন শ্রীঅরুণ সেন।

চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছে যে আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে। অভ্যস্ত আদর্শে বিচার করতে পারি নে, অন্য আদর্শ আমার জানা নেই। মনে ভাবি যুগের পরিবর্তন হয়েছে, দূরে পড়ে গেছি—রসভোগের রীতি হয়তো বদলেছে, বিচারের পদ্ধতিকেও নতুন রাস্তা বের করতে হবে, আমার আর সময় কোথায়। আশা করছি তোমরা কেবল নবযুগের প্রবর্তন করবে না, তাকে সুগমও করবে।' হয়তো এই দুর্ভেদ্যতার অভিযোগ "চোরাবালি"-র অন্তর্গত 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' সম্বন্ধেই বেশি, যাদের সম্পর্কে বই প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'ও-দুটি কবিতায় কেন যে এক স্তবকের পর আর-এক স্তবক আসছে, সেটা আমার কাছে সব সময় স্পষ্ট নয়।' কিন্তু "চোরাবালি"-র সব কবিতাতেই অল্পবিস্তর কূটত্বের লক্ষণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা অবশ্য পরে লেখা, ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, কিন্তু তার আগে ১৯৩৬ সালেই 'চোরাবালি'-র অন্যতম 'দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা' দেওয়া 'টপ্পা-ঠুংরি'-কে তিনি কি 'সুগম' করতে চেয়েছিলেন, দিতে চেয়েছিলেন 'দুর্ভেদ্য কেল্লায়' বিধৃত কবিতাটির একটি 'সুগম'-রূপ? মনে করা যাক 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিষ্ণু দে-র 'পঞ্চমুখ' পড়ে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অক্টোবর ১৯৩৫-এর চিঠি। তাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বিষ্ণু দে-র কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে, সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতায় অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি।' মুদ্রাদোষের দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে, জবরদস্তি বাদ দিয়েও 'টপ্পা-ঠুংরি'-র থীম্ যে কবিতা হয়ে উঠতে পারে তার জন্যেই তিনি কি লিখেছিলেন 'অপরপক্ষ' কবিতা? লিখে হয়তো, পাত্রের কথার সঙ্গে পাত্রীর কথাটিও জুড়ে দেবার উৎসাহে লিখে ফেলেছিলেন 'বঞ্চিত' কবিতাটি, যার আগের নাম, আগেই বলেছি, ছিল 'চন্দ্রমল্লিকা'।

বিষ্ণু দে-র 'টপ্পা-ঠুংরি', সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অল্প-বিস্তর অসরল'। এই অসরলতা কোনো ব্যক্তিগত খেয়াল নয়, তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আধুনিকতার চারিত্র্য। এই অসরলতা ব্যক্তিসচেতনতা, আত্মসচেতনতারই পরিণাম। বিষ্ণু দে-র এই কবিতাটি তাঁর প্রথম পর্ব অর্থাৎ এলিয়ট-প্রভাবিত পর্বের রচনা। বিষ্ণু দে নিজেই লিখেছেন যে এলিয়টের কাছ থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন আত্ম-সচেতনতার শিক্ষা—'he has made us poctically aware of self-consciousness as a reality.' বিষ্ণু দে-র কবিতাটির মধ্যে আমরা পেয়ে যাই সেই আত্মসচেতনতার আতিশয্য যা আধুনিকতার মৌলিক লক্ষণ। অথচ এই আত্মসচেতনতা কবিতায় নিয়েছে এক নৈর্ব্যক্তিক রূপ। এই আত্মসচেতনতাকে নৈর্ব্যক্তিকতায় রূপান্তরের পাঠও নেওয়া হয়েছে এলিয়ট সাহেবের বিদ্যালয়ে। বিষ্ণু দে-র কাব্যে প্রেমের মতো একনিষ্ঠ হৃদয়াবেগ শুদ্ধ সমাজ ও সভ্যতার রঙ্গভূমি।' রবীন্দ্র-নাথের কবিতাটি যেখানে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্তরে রয়ে গেছে, সেখানে বিষ্ণু দে ব্যক্তিগত বেদনাকে উত্তীর্ণ করেছন নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রণায়।

রবীন্দ্রনাথের 'বঞ্চিত' কবিতাটি শুরু হয়েছিল পোস্টকার্ডের চিঠির কথা দিয়ে। 'টপ্পা-ঠুংরি'-র আরম্ভেও সেই পোস্টকার্ড—'তোমার পোস্টকার্ড এলো।' কিন্তু এই যাত্রারম্ভের পরই আলাদা হয়ে গেল বলার ধরন, যদিও থীম্ রইলো অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অগ্রগতি সরল পথে, কোনো তির্যকতা নেই; তাঁর কবিতার সময়ও একটানা প্রবাহ। নিশ্চিতভাবে ঘটে যায় সময়ের পরম্পরায় একের পর এক ঘটনা। বিষ্ণু দে-র কবিতা অসরল, তির্যক। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যোগ-সাজসে লেখা এই কবিতায় নানা উল্লেখ, নানান প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ, নানা দেশি-বিদেশি কবিতার প্রতিধ্বনি, বিশুদ্ধ এলিয়টী কোলাজ-ধরনে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার ভাষা বা ঈষৎ বিকৃত

চরণ এসেছে অনর্গলভাবে—'এখানে নামল সন্ধ্যা', 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর', 'উপলউপকূলে', 'হে বিরাট নদী', 'জনস্রোতে ভেসে যায় জীবনযৌবন ধনমান', 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও', 'তন্দ্রালসা সন্ধ্যা'—এইসব। রবীন্দ্রজগতের স্থিতিশীল আস্তিক্যকে এইসব চরণাংশ উদ্ধৃত করে যেন বিদ্রূপ করা হয়েছে তৎকালীন বিষ্ণু দে-র নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। কখনো পাই মধুসূদনের রচনাংশের প্রতিধ্বনি—'গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে সহর, হে সহর স্বপ্নভারাতুর', অথবা 'আশার ছলনে ভুলি'। আবার এইসব বিদগ্ধ উল্লেখের মধ্যে বসে রয়েছেন লোককবিতার প্রসিদ্ধ শিবসদাগর। কিন্তু বিষ্ণু দে-র ঐতিহ্য তো কেবল বঙ্গদেশীয় নয়, তা বিশ্বমানবিকও। তাই হাওড়ার ব্রিজের উপর দিয়ে ধাবমান সায়াহ্নের ক্লান্ত জনগণ্ডলপ্রবাহ দেখে লেখা,

জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে...

চরণগুলির মধ্যে লন্ডন ব্রিজ দিয়ে ধাবমান জনপ্রবাহ দেখে এলিয়টের *The Waste Land*-এর বর্ণনার এবং নরকের পথে স্রোতের প্রবাহ দেখে দান্তের রচনার দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে পাই পিদ্‌সিকাতোর উল্লেখ, আর সমাজতত্ত্বের 'বুর্জোয়া' ও মনস্তত্ত্বের 'লিবিডো' ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার।

তুলনামূলকভাবে আলোচ্য দুটো কবিতাতেই সময় সবচেয়ে মূল্যবান প্রসঙ্গ, তাই কবিতা-দ্বয়ের কালচেতনার দিকে পাঠককে নজর দিতেই হয়। 'বঞ্চিত' কবিতাতেও 'সময় নেই একটুও', 'জানি নে কতক্ষণ গেল—/পাঁচ মিনিট, হয়তো পঁচিশ মিনিট', 'গাড়িটাকে দেরি করাচ্ছে মিছিমিছি।' মূল কবিতা 'অপরপক্ষ'-এর শুরুতেই 'সময় একটুও নেই'; তারপর পর-পর 'ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর উঠছি ঘেমে',

রাস্তায় বেরলেম :
হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।
বুকের মধ্যে রক্তবেগ মন্দগতি সময়কে মারছে ঠেলা।...
হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড,
হাওড়ার ব্রিজ, ন মিনিট বাকি।

স্টেশনে পৌঁছে অভাবনীয় আশায় বুক বাঁধে কবিতার বক্তা নায়ক

কী জানি কব্জিঘড়িটা ফাস্ট হয় যদি পনেরো মিনিট।
কী জানি আজ থেকে টাইমটেবিলের
সময় যদি পিছিয়ে থাকে।

'টপ্পা-ঠুংরি'-তেও বারে-বারে এসেছে সময়ের কথা—'দিন কাটল', 'বাস্ গেল, ক্লাস গেল কালের জয়যাত্রায় কেটে', 'নামল সন্ধ্যা', 'এদিকে আর পঁচিশ মিনিট', 'পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার সময় ধারাবাহিক, একটানা; ক্রমাগত অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তীরের মতো ধাবিত। বিষ্ণু দে-র কবিতার সময় একটানা প্রবাহ নয়, ভাঙাচোরা সেই সময়। চলিষ্ণু নায়কের গতি নানা ভাবনার, নানা আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গে ব্যাহত, বাধাগ্রস্ত; তার সময় যেন বক্রাকার, যেন পরাবৃত্তাকার। যেমন আধুনিক সাহিত্যের কালচেতনার স্বরূপ নির্ণয়

করতে গিয়ে নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছিলেন, "তাহা টানা গতি নয়, তাহা হইতেছে প্লুতগতি। একটি ধারার ছেদহীন বিরামহীন ক্রম-প্রসারণ নয়, আমাদের (অর্থাৎ আধুনিকদের) গতি যেন পৃথক-পৃথক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অসংখ্য উল্লম্ফনের সারি।"

সময়ধারার নিশ্চিত অগ্রগতি একদিকে, অন্যদিকে সময়স্রোতের বিপর্যয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে স্থিতিশীলতায় আস্থা, একটি গভীর আস্তিক্যবোধ। বিষ্ণু দে-র আধুনিক কবিতাটিতে পাই বিপর্যয়বোধ, লন্ডন ব্রিজ যে ভেঙে পড়ছে, চারিদিকে গ্রামপতনের যে শব্দ হচ্ছে তার ইশারা। রবীন্দ্রনাথের 'অপরপক্ষ' কবিতার নায়ক স্টেশনে গিয়ে নায়িকাকে পায়নি, কিন্তু পাঠক হিশেবে 'বঞ্চিত' কবিতার দৌলতে আমরা জেনেছি নায়িকা পৌঁছেছিল ঠিকই। কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতায় একেবারেই শূন্যতা, নায়িকা আসেনি আদৌ।

কোথায় তুমি! ট্রেন তো এল!
কয়লার খনি ধসে পড়ুক,
ধর্মঘট নাইবা থামল,
ট্রেন তো এল!

দয়িতার বদলে শ্যালক লাবসির আবির্ভাব সেই শূন্যতায় কোনো সান্ত্বনা নয়। বরং ভাগ্যের সুতীব্র পরিহাস। এই স্থিতিশীলতার অভাবেই সময়ধারা বিচ্ছিন্ন কালকণিকায় পর্যবসিত। বিষ্ণু দে-র 'টপ্পা-ঠুংরি'-তেও সময়প্রবাহ যেন এক-একটা স্তবকে খন্ড-খন্ড হয়ে গেছে। ছোট-ছোট স্তবক, বড়-বড় স্তবকের মাঝখানে হঠাৎ ছোট স্তবক, যেন সেই হোঁচট-খাওয়া সময়ের প্লুতগতিরই নিদর্শন, সেই উল্লম্ফনের প্রমাণ। দেশকাল বিপর্যস্ত, কবিতা তাই হয়ে উঠেছে যেন ভগ্নস্তূপের নির্মিতি, স্টিনায়ের ভাষায়, 'structured debris'। যে-স্থিতিশীলতার অভাবে সময়ের বিপর্যয়, সেই স্থিতিশীলতার অভাবেই ঘটেছে বৈয়াকরণিক বিপর্যয়। সুসম্বন্ধ ব্যাকরণের উত্তম শৃঙ্খলাবন্ধ জগৎস্থিতি। তাই শব্দের বা বাক্যের যে অন্যোন্য-নির্ভর, সুসম্বন্ধ গতিক্রম বা শৃঙ্খলা আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে পাই, তা বিষ্ণু দে-র আধুনিক কবিতাটিতে পাই না। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন,

চাইলেম না জানালার বাইরে,
মনে স্থির করে আছি—
খুঁজতে খুঁজতে আমাকে আবিষ্কার করবে একজন এসে
তারপরে দুজনের হাসি।

তখন বিষ্ণু দে লেখেন,

দেখলুম তোমার ক্লোস্-অপ্ মুখ জানালায়
—একটা কুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।

আমি জানি, অন্য অনেক আধুনিক কবিতার তুলনায় এই কালগত-ব্যাকরণগত বিপর্যয় 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে খুবই কম। তবু এই ঈষৎ আভাসগুলিই আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণের দিকে ইঙ্গিত করে। ভাষার বিরুদ্ধে সাহিত্যের আধুনিক বিদ্রোহের যেসব কথা ইদানীং বলা হচ্ছে এসব তারই প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে ন্যায়ের পারম্পর্য কোথায়ও লঙ্ঘন করা হয়নি। সমস্ত কবিতাটির অগ্রগতি হয়েছে ন্যায়ের সুশৃঙ্খল সোপান পার হয়ে-হয়ে। এবং এই কারণেই হয়তো, গদ্যছন্দে লেখা বলে নয়, কবিতাটি যেন কবিতা হয়ে ওঠেনি। হয়েছে প্রোজেইক। একই থীম্ নিয়ে লেখা বিষ্ণু দে-র

কবিতার গঠন a-logical। অবশ্য a-logical বললে নেতিবাচকভাবে বলা হলো, বরং বলা ভালো 'টপ্পা-ঠুংরি'-র গড়ন সাংগীতিক। ইঙ্গিত রয়েছে কবিতাটির নামকরণেই। কবিতাটির আভ্যন্তরিক নানা উল্লেখও সেই দিকে ইশারা করে—'যেন ছড়টানা লয়ে/পিদ্‌সিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণি/ রেডিওর ঐক্যতানে...'; নানা রাগরাগিণীর নাম—পিলু, বারোয়াঁ, পূরবী, বিভাস, ভৈরবী; তাছাড়া আছে গানের কলি, পাতাঝরার গান, মীড়, স্টীমারের বাঁশী, খালাসীর গান, ট্র্যাফিকের বেতালা বেসুরো চলা। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কবিতাটির সেই সাংগীতিক গঠনটি, নাম ভারতীয় সংগীত থেকে নেওয়া হলেও, আসলে পাশ্চাত্য সিম্ফনিক সংগীতের যেন কাব্যরূপ। বিষ্ণু দে-র ছন্দের প্রকৃত শক্তি কোথায় তা নির্ণয় করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষের মনে হয়েছে, "স্তবকে-স্তবকে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন স্পন্দন সঞ্চার, কবিতার ভিন্ন ভিন্ন চাল বা মুভমেন্টে ভিন্ন ধরনের ছন্দ বা স্তবকের আয়োজন—এই হলো সেই কেন্দ্র। অভিন্ন সুরের একটানা গীতল প্রবাহ নয়, তার পরিবর্তে বিষ্ণু দে চান যে এইভাবে তৈরি হোক এক বিচিত্র স্বরের সংগতি। হারমনি বা স্বরসংগতি, পশ্চিমী সংগীতের এই ঐশ্বর্যের দিকে তাঁর কবিতাকে এগিয়ে নিতে চান তিনি, ক্রমশ তাঁর কবিতা পেয়ে যায় একটা সিম্ফনির গড়ন।" সাংগীতিক বিন্যাসে বিষ্ণু দে-র কবিতারচনার প্রথম সার্থক চেষ্টা এই 'টপ্পা-ঠুংরি'; যে-গড়নে চূড়ান্ত সার্থকতা বিষ্ণু দে উত্তরকালে অনেকবার অর্জন করেছেন, যেমন 'জন্মাষ্টমী'-তে। নানান স্পন্দ বা রীদম্‌ আর চাল মিশে গেছে এই কবিতায়। কোথায়ও বড় চাল—'বাস গেল, ক্লাস গেল, কালের জয়যাত্রায় কেটে'; কখনো বা ক্লান্ত দীর্ঘায়িত চাল—'আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া'; কখনো-কখনো হোঁচট-খাওয়া ছোট চাল—'ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়, উঁচোট খায়/বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়'; আবার কোথায়ও দ্রুত সংলাপ বিনিময়ের ছড়ার ছন্দের চাল—

> তোমার কি অসুখ হল?
> তোমার বাবার?
> হঠাৎ দেখি লাবসি,
> বললে, এই যে, কি খবর,
> আমার জন্যে এলেন নাকি!
> দিদি আসবে সাতুই।

তারপরেই আহত-রোমান্টিকতার দীর্ঘ চাল,

> ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি ছায়ায়
> ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
> ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে
> হাতে হাত উষ্ণতায়...

আর এইসব নানান চাল মিলিয়ে এক সিম্ফনিক স্থাপত্য।

এই জটিলতাময় অসরল আধুনিক কবিতার থীম্‌কে যে রাবীন্দ্রিক ধরনেও অনাধুনিক সরলতায় উপস্থিত করা যায়, তারই দৃষ্টান্ত দেবার জন্যেই কি রবীন্দ্রনাথের 'অপরপক্ষ' কবিতা লেখা? যদি তাই হয়, তাহলে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা। অনেক বাঙালী আধুনিক কবির প্রতি ব্যক্তিগত প্রশ্রয় সত্ত্বেও, আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সংশয়ান্বিত সমালোচনাই কি লুকিয়ে আছে বিষ্ণু দে-র কবিতাটির এই রবীন্দ্রকৃত variation on the theme-এর মধ্যে?

রাজমোহিনী

হেমন্তবালা দেবী

ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রথমা কন্যা হেমন্তবালা দেবীর জন্ম কলকাতায়। ১৩১৬ সালে মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় রংপুরে, ভিতরবন্দের ভূম্যধিকারী ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে। বধূরূপে হেমন্তবালা স্বামীর মাতুলালয় নাটোর বড়-তরফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে সম্পৃক্ত ছিলেন। পুত্রের জন্মের পর অল্প বয়সেই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে এই সাধনায় আত্মসমর্পণ করতে পারেননি। তাঁর সংশয়ান্বিত অন্তর সহসা আলোর ইঙ্গিত পেল রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্পর্শে এসে।

১৯৩১-এর জুলাই মাসে হেমন্তবালা দেবী কবিগুরুর প্রথম দর্শন পান। তারপর কবির মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে বহুবার পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কটি দৃঢ় হয়েছিল অসংখ্য পত্রালাপের মাধ্যমেই। কবিগুরু-রচিত প্রায় তিনশোটি পত্রের অধিকারিণী হেমন্তবালা দেবী অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নময় পত্রে, সাবলীল রচনাকৌশলে এবং আন্তরিকতায় সদাব্যস্ত, প্রবীণ কবিকে বিচলিত করেছিলেন বারবার। তার ফলে আমরা পেয়েছি চিঠিপত্র ৯ম খণ্ডের মতো গ্রন্থ, যার অন্তর্ভুক্ত হেমন্তবালার উদ্দেশ্যে রচিত পত্রাবলীর মধ্যে কবি আপনার ধর্ম ও দর্শনসম্পর্কীয় ভাবনাই খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছেন।

হেমন্তবালার পত্ররচনারীতি কবির ভালো লেগেছিল। বারবার তার স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন। এক জায়গায় কবি লিখেছেন, 'রচনা করবার অসামান্য শক্তি তোমার আছে এইজন্যই তোমার চিঠি পড়ার আনন্দ আমাকে চিঠি লেখায় প্রবৃত্ত করে।'

সেই যুগের রক্ষণশীলতা ও নানা সংস্কারের জালে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেও হেমন্তবালা দেবী চেতনার গভীরে ছিলেন প্রসারিত ও আধুনিক মনের অধিকারিণী। আমরণ তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে নানা ধরনের রচনা করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি ছাড়া, কিছুই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রের ষোড়শসংখ্যক পত্রে লিখেছেন—'তুমি যে ভাষায় চিঠি লেখ সেই ভাষায় যদি গল্প লেখ নিশ্চয়ই সেটা উপাদেয় হবে। সাজিয়ে লিখতে গেলেই ঠকবে। তোমার জানা কথা ঘরের কথাকে গল্পে ফুটিয়ে তুললে সাহিত্যে তা আদর পাবে কেননা তোমার লেখায় সহজ রস আছে।'

অপ্রকাশিত এই গল্পটি সেই সহজ রসের ভিয়ানে জারিত একটি উপাদেয় রচনা।

রাজমোহিনী কাঁদছিল, অনেকক্ষণ ধরেই সে কাঁদছে। খড়ের চাল দেওয়া চৌচালা ঘরের শানবাঁধানো মেঝের উপর উপুড় হয়ে কাঁদছিল। এলোচুল ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। রাজমোহিনী শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি, বয়স তার ত্রিশ-বত্রিশ হবে। তার মাথার কাছে একখানা জলচৌকির উপর, পাড়ছেঁড়া সুতোর তৈরি চটের আসনে বসে দুর্গানাথ চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি বললেন, —শুধু শুধু অমন করে কাঁদছ কেন? রাজমোহিনী উঠে বসল, আঁচলে চোখ মুখ মুছে মাথার কাপড় টেনে দিয়ে বলল,—আমি কাঁদছি, কাঁদছি তাতে তোমার কী?—কাঁদবেই বা কেন, সেকথা জিজ্ঞাসা করতে পারি না?—না, পার না। তুমি আমার জিজ্ঞাসা করবার কে?—কই, আমি আসবার আগে তো কাঁদছিলে না, কাঁচা আম কুচিয়ে তেল নুন লঙ্কা চিনি দিয়ে দিব্যি করে মেখে পাথর-বাটিতে রোদে জরাচ্ছিলে, আবার নিজে নিজেই বলছিলে, পুদিনাও নেই, ধনেপাতাও নেই, দুটো শুলফো শাকও নেই। যেমনি আমি এলাম, তারপরেই খামোকা কান্না জুড়ে দিলে।—খামোকা! —তা নয় তো কী!—তা বেশ, আমার ঘরে আমি যা খুশি তাই করব, তুমি বলবার কে?—ঘাট হয়েছে, মাফ করো, আর বলব না। এখন তবে আমি যাই? তুমি যা করছিলে তাই করো—আমি কী করি না করি, সেদিকে তোমার নজর কেন? তুমি যা করছিলে তাই করো না গে।—রাজমোহিনী,

আমি কলকাতায় যাচ্ছি, কবে ফিরব, আর ফিরতে পারব কিনা তাও জানি নে। আমার কী রোগ হয়েছে, ডাক্তার কী বলবে কিছুই জানা নেই। তুমি আমার আপনজন বলেই দেখা করতে এসেছিলাম, তা তুমি এমন করে কান্নাকাটি করবে, রাগ করবে জানলে কখনোই আসতাম না।—আমি তোমার আপনজন হলাম কোন্ সুবাদে?—তুমি তরণীকুমারের বউ, তরণী আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু হলেও সম্পর্কে সে আমার ঠাকুরদাদার মামাতো ভায়ের ভায়রার বোনপোর নাতনীর ছেলে, আমার সে নাতি হয়। আবার এদিকে তোমার মামা, তিনি আমার মেসোমশায় হন। এ তল্লাটে তুমি ছাড়া আপনজন তো কেউ নেই আমার। মা বাবা নেই, ভাই বোন নেই, কেউ নেই।—তুমিও তো না থাকলেই পারতে।—তাই তো যাচ্ছি রাজমোহিনী, বোধহয় আমিও আর ফিরে আসব না। সেই-জন্যেই তো শেষবার দেখা করে গেলাম।—তোমার সেই বন্ধু না নাতি, তার খবর পেয়েছ?—না, এই তো পাঁচ বছর হয়ে গেল না? সেই যে বোম্বে হয়ে গেল চাকরি পেয়েছে বলে, তারপর তার আর কোনো খবরই পাইনি। তোমাকেও তো চিঠিপত্র বোধহয় লেখে না কিছু?—আমি খবর পেয়েছি।—কী খবর পেলে? চিঠি এসেছে?—না, এই দেখো। একখানা ছেঁড়া বাংলা খবরের কাগজ সম্মুখে মেলে ধরল। মুগের ডালের ঠোঙা ছেঁড়া। পড়ে দেখো, আবার ছবিও আছে সঙ্গে। দুর্গানাথ দেখলেন, কাগজখানা মাসখানেক আগেকার। তার সেই অংশে দুটি নরনারীর মুখের ছবি। নিচে যা লেখা তা পড়ে বোঝা গেল, "সিলভিয়া" জাহাজের কাপ্তেনের মেয়ে ফ্লোরা বোম্বাইয়ের সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিল, তরণীকুমার গুপ্ত বলে এক ভারতীয় নৌবিভাগের সামান্য কর্মচারী তাকে তুলে আনেন। কৃতজ্ঞ কাপ্তেন তাঁরি হাতে ফ্লোরাকে সম্প্রদান করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় চলেছেন। তরণী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে "সিলভিয়া" জাহাজেরই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ভবিষ্যতে তিনিই হয়তো এই জাহাজখানির মালিক হতে পারেন। কেননা, জাহাজখানি কাপ্তেনের ধনী শ্বশুরের। শ্বশুর আমেরিকান, তিনি সেইখানেই নানা রকম ব্যবসা করে থাকেন। কাপ্তেন ইংরেজ। ফ্লোরা তার মাতামহের বড় আদরের নাতনী। তারা আমেরিকায় এখন তাঁর কাছেই যাচ্ছে। সংবাদে তরণীর বা ফ্লোরার ধর্মান্তর গ্রহণের কোনো সংবাদ লেখা নাই। দুর্গানাথ বললেন,—এইজন্যে তুমি কাঁদছিলে? তা এতক্ষণ খুলে বলোনি কেন? খৃস্টানদের এক পতি বা পত্নী বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যতীত দ্বিতীয় বিবাহ হয় না। তরণী বে-আইনি কাজ করেছে, এ বিবাহ অসিদ্ধ। এমন কি আদালতেও সাজা পেতে পারে।—কে ওকে সাজা দিতে যাচ্ছে? ও চুলোয় যাক না। এ বাড়িও তো ওর নয়, আমার বাবার। আমি বাবার একমাত্র সন্তান, বাড়ি, জমি সব পেয়েছি।—সে কী, এতদিন তো জানতাম না। তরণীর বাড়ি তবে কোথায় ছিল?—পূব বাংলায়। পদ্মায় সে গ্রাম ভেঙে ভাসিয়ে নিয়েছে। এখানে বাবার কাছে এসেছিল তাঁর ধানখেতে 'জন' খাটতে। কী দেখেই যে বাবা দিলেন আমাকে!—সে কী, আমি তাহলে তো কিছুই জানতাম না। তরণীর বাবা আমার বন্ধু ছিলেন। আমরা কলকাতায় বৌবাজারে থাকতাম পাশাপাশি বাড়িতে। একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। বি এ পাস করলাম, ল' পড়লাম। উকিল হব। এরি মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন এল। পড়াশুনা ছেড়ে দিলাম দুজনে। আমি গেলাম মামাবাড়ি ঢাকায়। ও গেল ওর বাবার কাছে। তারপর তো দেখা তোমার বিয়ের পরে এখানেই। সেও তো প্রায় ষোলো বছর হয়ে গেল, তাই না?—ঐরকমই হবে।—তাহলে তোমার বিয়ের এগারো বছর পরে ও বোম্বে চলে গেছে। কিন্তু তোমাকে কোনো খবর বা টাকাপয়সাও পাঠায়নি কিছু।—যাক সে কথা। ফ্লোরার বরের সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এখন তোমার কথাই হোক্। তোমাকে আমি প্রথম দেখি আমার মামাবাড়িতে। মামাতো বোন ছায়ার বিয়েতে এসেছিলে। ছায়াই পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি আমার মাসতুতো দাদা। ইনি আমার পিসতুতো দিদি। হয়তো সে তোমার মনে নেই। তার বছর দুই পরে তুমি হঠাৎ এলে এই গ্রামে তোমার বন্ধুর

কাছে। বললে, তোমার মা বাবা মারা গেছেন অ্যাকসিডেন্টে। একটি তোমার ছোট বোন, সেও গেছে।—মোটর দুর্ঘটনায়।—তুমি বললে বাবা অনেক দেনা রেখে গেছেন। বাড়ি বিক্রি করতে হল। অবস্থা যা হয়েছে, কলকাতায় থাকা আর চলে না। বন্ধুর পরামর্শে তুমি দেনা শোধ করে উদ্বৃত্ত টাকায় এখানেই জমি কিনে আমাদের মতো করে খড়ের চালাঘর তুললে। এই গাঁয়ের মেয়ে লীলাকে বিয়ে করলে। বিয়ের মাসছয়েক পরেই লীলা মারা গেল টাইফয়েডে। তুমি আর বিয়ে করলে না। এখানেই জমিজমা করে চাষবাস করে রইলে।—এসব তো গেল ভূমিকা। আসল কথাটা তবে কী? কাঁদছিলে কেন, বলবে না আমাকে?—তুমি বন্ধুর কাছে প্রায়ই আসতে লাগলে। তিনি হলেন নাতি। আমাকে বললে নাতবৌ, কখন আবার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলে, বন্ধু কোনো আপত্তি করেননি। এখন আবার বলছ, আমি ছাড়া তোমার আপনজন নেই।—বলছিই তো।—তাই যদি মনে করে থাক, তবে বলি, আমারিবা বিশেষ আপনজন কে আছে? নিজের ভাইবোন নেই। মামাতো মাসতুতো পিসতুতো জ্যাঠতুতো এখানে কেউ নেই। আর তাই যদি হয়, পরস্পরকে দেখাশোনা তো আমাদের কর্তব্য। তুমি কঠিন ব্যারাম নিয়ে একা একা কলকাতায় চলেছ কার ভরসায়?—হাসপাতালে যাব।—কাগজে দেখো না কি হাসপাতালে রোগীদের অবস্থাব্যবস্থার কথা?—তাহলে কী করতে বলো তুমি?—আমি বলি, তোমাকে এখন আমার হেফাজতেই থাকতে হবে। আমার এক দেওর ছিলেন আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে। আমাদের দিকটা পদ্মার ভাঙনে গেলেও তাঁদের দিকটা ভাঙেনি। সম্প্রতি তিনি নিজেদের অংশটা এক মুসলমানকে বেচে দিয়ে (অবশ্য খুব গোপনে) চলে এসেছেন সেখান থেকে। এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। এখন আছেন তিনি হুগলী জেলার কী একটা গ্রাম। ঠিকানা না জানলেও খবর পাব আমার এক ভাশুরপোর কাছে। তার ঠিকানা জানি, সে থাকে শান্তিপুরে। আমার দেওর পূব বাংলার নামকরা একজন ভাল ডাক্তার। তাঁর ছেলে দুটিও নতুন ডাক্তারি পাস করে বেরিয়েছে। তাঁরা ঐ গ্রামে বাড়ি করেছেন। কলকাতায় তাঁদের বাসা আছে। ঠিকানাটা আনিয়ে তোমাকে আমি তাঁদের চিকিৎসাধীন রাখতে চাই।—কোথায় থাকা হবে?—কলকাতায় আমার সইয়ের বোনপো থাকে। তার বাড়িতে আগেও গেছি। লিখলে সে দুখানা ঘর দেবে খালি করে।—তুমি আমার কী পরিচয় দেবে তাঁদের কাছে? —যা বলেছ তাই। তোমার নাতবৌ হচ্ছি তো।—তা কি কেউ বিশ্বাস করবে?—তাহলে বলব পিসতুতো দাদা। আর লোকে কী ভাববে না ভাববে, তা দিয়ে দরকারটাই বা কী? আমরা তো ছেলেমানুষ নই।—তাহলে আজকে যাব না কোথাও?—না, সাতদিন অন্ততঃ সময় দাও আমাকে। —কিন্তু কাঁদছিলে কেন, সে কথা তো—, —আবার সেই কথা? আমার ঘরে আমি যা খুশি তাই করব, তাতে তোমার কী? চলো, তোমাকে তোমার ঘরে রেখে আসি গে। একা একা হেঁটে চলে যেতে গিয়ে রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আচ্ছা, অনেক দিন থেকে তো ভুগছ মনে হচ্ছে, কোনোদিন বলেছিলে আমাকে? চেহারাখানি তো বেশ তৈরি করেছ, আমাকে একটু খবর দিতে বাধা ছিল কিছু? নাও নাও, এখন চলো। সব কথার জবাব দিতে হবে না।

রাজমোহিনী উঠে হাত মুখ ধুয়ে এসে একখানা মোটা চাদরে গা মাথা ঢেকে ঘরে তালা দিয়ে বলল,—এসো আমার সঙ্গে। দুর্গানাথ নীরবে তার অনুসরণ করলেন। খানিকদূরে গিয়ে রাজমোহিনী মুখ ফিরিয়ে বলল,—কই, রাস্তা দেখিয়ে দাও। এর আগে আমি কি কোনোদিন গিয়েছি তোমার বাড়িতে, না কি আমার পাড়াবেড়ানো স্বভাব?—ও, চলো. এই দিকে। দুর্গানাথের বাড়িটি একটু নির্জনে। একটা বাঁশবনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। বাড়িখানা ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সামনে দরজা আছে। দরজায় তালা লাগানো। প্রাচীরের মাথায় লোহার শিক কাঁটা, কাঁচ ভাঙা। একলা থাকেন বলেই একটু সতর্কতা। পকেট থেকে চাবি বের করে দুর্গানাথ দরজা খুলে

বললেন,—এসো।—যাবো কী? বাড়ির এই ছিরি করে রেখেছো? নিজে না পার, ঠিকে লোক দিয়ে সাফ করাতেও পার না কি? তোমার না হয় পায়ে জুতো রয়েছে, আমি যাই কেমন করে এত কাঁটা মাড়িয়ে? কাঁটানটে, গোক্ষুর, শেয়ালকাঁটা—কী নেই তোমার বাড়িতে?—একটু দাঁড়াও, ঠিক করে দিচ্ছি। দুর্গানাথ তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে একখানা ভাঙা, উইখাওয়া কাঠের পাল্লা অতিকষ্টে টেনে এনে মাটিতে ফেললেন। এর উপর পা রেখে চলো।—এটা কী পদার্থ?—দেখতেই পাচ্ছ, উই-খাওয়া কপাটের পাল্লা। আরো একখানা আছে, দরকার হবে কি?—এতেই চলবে। ঐ তো তোমার সিঁড়ি, ঠিক যাচ্ছি তো?—রোসো, দরজাটা আগে খুলি। এমনি করে প্রথম পর্ব সারা হল। ঘরের ছিরিও বাইরের মতোই। কলকাতায় যাবেন বলে বাক্স প্যাঁটরা, বিছানা সব বাঁধা। রাজমোহিনী সেসব খুলে ফেলল।—ঝাঁটাটা কোথায়, বলো দেখি?—ঝাঁটা নেই, যাব বলে আর কেনা হয়নি।—চমৎকার! ঐ তো একটা নারকোল গাছ রয়েছে, না, চার পাঁচটা আছে দেখছি। ঝাঁটা কিনতে হয় কেন?—ঝাঁটা তৈরি করবে কে? ওসব তো করিনি কখনো।—বেশ আছ তুমি। একখানা ছেঁড়া চট পাওয়া গেল আপাতত তাই দিয়ে ঝাঁটার কাজ চালানো হল।—তোমার বিছানা কোথায় পাতব? ঘর ধোওয়া নয়, শুধু শুকনো ঝাঁট দেওয়া।—এই যে, এ ঘরে এসো। কিন্তু এসব তুমি করছ কেন?—তোমার না অসুখ? চুপ করে বসে থাকো। এই যে, এ ঘরখানাও তো ঝাঁট দিতে হবে। এই বুঝি তোমার তক্তপোশ? থাক কেমন করে? এর যে একটা পায়া নড়নড় করছে! এই চেয়ারটাও তো ভাঙা, এতেই বসতে হবে। কই, তোমার লণ্ঠনে তেল আছে তো? তা আজকের মতো হয়ে যাবে। এমনি করে বকে বকে রাজমোহিনী পাঁচখানা ঘর বারান্দা ঝাঁট দিল। তারপরে দড়ির আলনার কাপড় গুছিয়ে রাখল, বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দিল। ছেঁড়া মশারিতে দুটো তিনটে গিঁট দেওয়া, বিছানা মশারি সব আধময়লা।—লোকে যে বলে বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন, তোমার হয়েছে তাই। রাত্তিরে খাবে কী?—থাক, একটা রাত না হয়—, —রাত-উপোসী থাকতে নেই। আমি যাচ্ছি তবে, গিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।—পারবে একা যেতে? না হয় আমি—, —না না, তোমাকে আর যেতে হবে না, আমি রাস্তায় চেন্নৎ করে রেখে এসেছি।—সেটা আবার কী? —ফিরতে হবে তো অচেনা পথ দিয়ে, তাই ঠোঙায় করে চুন এনেছিলাম, ছড়াতে ছড়াতে এসেছি এখনো আলো আছে, আমি তবে যাই, কাল আসব।

রাজমোহিনী চলে গেল। রাত আটটায় তার চাকর হাবুল এসে দরজার কড়া নাড়ল, দুর্গানাথ উঠে দরজা খুলে দিলেন। হাবুল বলল,—মাঠাকরুন দিয়েছেন। সুজির রুটি, কাঁচা পেঁপের তরকারি, দুধ, সন্দেশ। বাসন দেয়নি, কাঁধ উঁচু থালায় করে পাঠিয়েছেন। কলাপাতা, মাটির বড় ভাঁড়, মাটির গেলাস। মাটিতে জল ছিটিয়ে ঠাঁই করতে হবে। দুর্গানাথ কুয়ো দেখিয়ে দিলেন। দড়ি-বালতি দিলেন, ঘটি দিলেন। হাবুল বসে রইল। খাওয়া হলে হাত মুখ ধোবার জল দিয়ে, এঁটো সাফ করে, আরো জল তুলে রেখে সে যাবে। দুর্গানাথ কিছু বললেন না। শরীরটা সত্যই বড় দুর্বল। বোধ হয় এটুকু সাহায্য না পেলে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতেন। পরের দিন বেলা আটটায় এল ছুতোর মিস্ত্রী, এল ঝাড়ুদার, এল ঘরামী। নয়টায় হাবুল এল কবিরাজ মশায়কে নিয়ে। ডাক্তার এখন পাওয়া যাবে না। এ গাঁয়ে ডাক্তার যিনি ছিলেন, মারা গেছেন। অন্য গ্রাম থেকে ডাক্তার আনতে দেরি হবে। কবিরাজটি ভাল, বিচক্ষণ। তিনি এসে নাড়ি টিপলেন, জিভ দেখলেন, চোখ দেখলেন, পেট টিপে দেখলেন। ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেলেন। টাকা নিলেন না। রোগ সারলে টাকা নেবেন বলে গেলেন। দুর্গানাথের ভক্তি হল। তিনি মনে করলেন কবিরাজ কবিরাজই সই। ডাক্তার আর কেন? হাবুল দুধ সাগু খাওয়াল।

দুপুরে আবার খাবার এল। হাবুলের হাতে নয়, এক প্রৌঢ়া বিধবা খাবার নিয়ে এলেন।

বললেন,—বাবা, আমি আপনার স্বজাতি, বৈদ্যের মেয়ে। মাঠাকরুন আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার সেবাযত্নের জন্যে। আমার একটি ছেলে আছে। নাম ভাস্কর। আমরা এখন গরিব হয়ে পড়েছি। মা বলে দিলেন, আমরা দুজনেই এখানে থাকব।—তিনি কি আসবেন এখানে?—বিকেলে আসার কথা আছে। আপনাকে বললেন ঠাণ্ডা না লাগাতে। আর, একটু কষ্ট করে আমাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন একটু, কোথায় কী আছে। হাবুল এসেছিল, সে সব দেখেশুনে নিয়েছে। সে খাবার জায়গা করে দিল। দুর্গানাথের নির্দেশমত বাঁধাছালা খুলে বাসনপত্র বের করে মেজে আনল। পুরোনো সরু চালের ভাত, পটলপোড়া, পলতার ঝোল, কাঁচা মুগের ডাল শিলিপাতা দিয়ে, আলু পটল বেগুন ডুমুর দিয়ে ঝোল, আলু ভাতে। তার আগে গরম জলে স্নান। আপাতত হাবুলই এক-বেলাকার সমস্ত কাজ করে দিল। বিকেলে ভাস্করকে নিয়ে রাজমোহিনী এলেন। ভাস্করের বয়স পনেরো-ষোলো হবে। শ্যামবর্ণ, একটু দোহারা গড়ন। ছেলেটি শান্ত নম্র। রাজমোহিনী বললেন, —এঁরা স্বজাতি, চাকরি করবেন না, মাইনে নেবেন না, তোমার আত্মীয়ের মতো কাছে থাকবেন। খেতে পরতে দিতে হবে। যখন যা দরকার, দিতে হবে। না পার যদি, তোমার আপনজনের সাহায্য নিতে হবে। 'না' করতে পারবে না।

ভাস্কর নারকেলগাছ থেকে শুকনো ডাল ভেঙে ঝাঁটা বানাল দুখানা। ঝাড়ুদার জঙ্গল সাফ করে চারদিক পরিষ্কার করে দিল। এক বাউরী মেয়ে এসে গোবরমাটি দিয়ে উঠোন নিকিয়ে দিয়ে গেল। ছুতোর তক্তপোশ, চেয়ার, জলচৌকি, টেবিল সব সরিয়ে দিয়ে গেল। ঘরামী সব ঘর দেখে-শুনে গেল। পরদিন ঘর ছাওয়া হবে, মেরামত হবে। নতুন করে মাটির প্রলেপ দিতে হবে বাঁশের বাখারির উপর। বাড়িতে একখানি ছোট পাকা একতলা ঘর, সেটি শোবার ঘর, তার বারান্দাও আছে দুদিকে, বাকি চারখানা কাঁচা ঘর। খড়ের চাল। বাঁশের বাখারি আর সরু সরু বাঁশের উপর খড় তুষ পাট গোবর মাটি আলকাতরা পুরু করে ধরিয়ে তাব উপর চুন বালি ধরানো। চুনসুরকির মেজে। ভেঙেচুরে গেছে। ঘরামী সব ঠিক করে দেবে। রান্নাঘর আছে একটা, সেটাও সারাতে হবে। আগে ঐ ঘরগুলোতে নানারকম জিনিস থাকতো। এখন দুখানা ঘর তো পরিত্যক্ত। একখানাতে জিনিসপত্র, আরেকটায় রান্না, ভাঁড়ার। সবক'খানাই মেরামত করা হচ্ছে। ভাস্কর আর তার মা যোগানন্দার থাকার ব্যবস্থা ওখানেই।—কী, টাকা পয়সা হাতে আছে তো? যাচ্ছিলে তো কলকাতায় খাবারদাবার সংস্থান আছে কিছু? দুর্গানাথ চুপ। আচ্ছা, সেসব হিসাব পরে হবে এখন। আপাতত দু'শো টাকা দিয়ে যাচ্ছি, যারা কাজ করছে, তাদের পাওনা চুকিয়ে দিও। কালকে আর দু'শো নিয়ে আসব। একসঙ্গে বেশি আনা হবে না। আর, বাজার আমি পাঠিয়ে দেব। ভাস্কর একবার চলে গেল। খানিক পরে নিজেদের বিছানা, বাসন, বাক্স, কাপড়চোপড় সব নিয়ে এল মাথায় করে। বাবুর ঘরের বারান্দায় এনে সব রাখল।—আজ আর ঘুম আসবে না মা, ভুলো আর আমি দুজনে তাস খেলে রাত জাগব। ভোরে ঘুমোব। বুঝলে? বেলায় উঠব, সকালে ডেকোনি আমাকে।—ভুলো রাত জাগবে?—না জাগলে চলবে কেন? মাঠাকরুনকে বলে ওকে একটা টাকা দিও।

রাজমোহিনী চলে গেল। হাবুল কিছু কিছু বাজার করে আনল। যোগানন্দা বাবুর জন্যে সুজির রুটি, কাঁচা পেঁপের তরকারি, কাঁচকলা ভাজা, দুধ করলেন। নিজেদের জন্যে রুটি করলেন আটার। পরদিন এল দুরকম চাল, ভাস্করের জন্যে আর আলাদা নয়। বাবুর সরু চাল, এদের মোটা আতপ কেননা যোগানন্দা সিদ্ধ চাল খান না। বাবুর জন্যে মসুর, কাঁচামুগ, এদের জন্যে খেঁসারি মটর অড়হর আর ছোলার ডাল কিছু কিছু। এরা তো একটু বেশি খাবে। বাবুর রান্না আলাদা হবে। বিধবা মানুষ রাঁধবে, নিরামিষ রান্নাই হবে। আর কিছু খাবার দরকার হলে ভাস্করকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। দুর্গানাথ বললেন,—না না, আমার আর কিছুর দরকার নেই। কবিরাজ

রোজ আসেন। তিনি রাজমোহিনীকে কথা দিয়েছেন, তিন মাসে রোগ সারিয়ে দেবেন। কেন শুধু শুধু কলকাতায় যাওয়া! যখন দেশে ডাক্তার ছিল না তখন কী হত? কত্তারা দীর্ঘজীবী ছিলেন। অবশ্য জমিদারদের কথা আলাদা। ইচ্ছে করে অনাচার করে পরমায়ু খোয়ালে তার জন্য দায়ী কে? কিন্তু এই বৈদ্যরাই তো অসাধ্য সাধন করেছেন এতদিন। কত গঙ্গাযাত্রীকে ফিরিয়ে এনেছেন। একবার আয়ুর্বেদকে পরীক্ষা করেই দেখুন না হয়। দুর্গানাথেরও সেই ইচ্ছা। একলা মানুষ। কাঁদতে ককাতে কেউ নেই। জীবনের এত মায়া কিসের? ভুল হয়েছিল, গাঁয়েই বৈদ্য আছেন, সে কথা মনে হয়নি। কলকাতায় গিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে চেয়েছিলেন। হাসপাতাল না যমদ্বার!—এই ভালো। কিন্তু রাজমোহিনীর এখনি পাঁচ ছয়শো টাকা যাচ্ছে যে! এ টাকা শোধ দিতেই হবে। দুর্গানাথ সেরে উঠুন আগে। আচ্ছা, রাজমোহিনী কেন এতটা করছে? ওর এত কিসের টান? চকিতে মনটা কেমন যেন করে ওঠে। আবার মনে মনেই মনকে বোঝান। রাজমোহিনী নিঃসন্তান। স্বামীটি হাতছাড়া হয়ে গেল। একটা অবলম্বন চাই তো! চুপ করে থাকাই ভাল। রাজমোহিনী রোজ বিকেলে এসে দেখে যান। মুখে অরুচি, তাই জারকলেবু, খুব পুরোনো তেঁতুল, পুরোনো আমসি একটু আধটু দিয়ে যান। লঙ্কা খেতে বারণ। চৈ দিয়ে ঝোল হবে। গোলমরিচ চলবে। আবার যোয়ান, হিং, আমসি বিট্‌লবণ আমলকী দিয়ে মুখরোচক দ্রব্য একটা বানিয়ে দেয় রাজমোহিনী।—রাজু, আর জন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে।—আর জন্ম জানিনে বাবা, এ জন্মেই তো আপনজন পাতালে! আপনজন যখন, তখন একটু সহ্য করে নাও।

তিন মাসে নয়, ভাল করে সেরে উঠতে প্রায় পাঁচ মাস লেগে গেল। কবিরাজির এই এক দোষ, ডাক্তারির মতো তড়িঘড়ি পারে না কিছু করতে। কিন্তু যা করবে তা ঠিকই করবে। এখন দুর্গানাথ সম্পূর্ণ সুস্থ। কার্যক্ষম। রাজমোহিনী বলেন—বসে খেতে হবে না। কাজে লাগো।—কী কাজ করব, বলো।—বদ্যির ছেলে, কবরেজ মশায়ের কাছে তাঁর বিদ্যেটা শিখে নাও।—আজকাল কি বদ্যির আদর আছে রাজমোহিনী?—তবু তুমি শিখে রাখো। জানো না, নামের গুণে কত কাজ হয়। ওষুধগুলোকে বেশ গালভরা নতুন নাম দিয়ে দিলেই পেটেন্ট ওষুধ বলে চলে যাবে।—ঐ সঙ্গে না হয়—, —না না, খিচুড়ি পাকাতে যেয়ো না। লাভের লোভ কোরো না। আয়ুর্বেদকে খাঁটি আয়ুর্বেদই থাকতে দাও।—কবিরাজ মশায় কী করে সংসার চালান জানো? বদ্যিগিরি করে নয় কিন্তু। ওঁর দুই ছেলে শহরে ওকালতি করে।—করুক। তোমাকে সংসার চালাতে বলা হচ্ছে না। কুঁড়েমি না করতে বলা হচ্ছে।—সংসার চলবে কিসে?—সে আমি বুঝব। তোমার আপনজন বুঝবে। কাজেই।

এদিকে গোপনে গোপনে রাজমোহিনী দেওরের ঠিকানা জোগাড় করে দেওরকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। দেওর ধরণীকুমার গুপ্ত বললেন,—দাদাকে ধরে রাখতে পারলেন না তো? আপনার সংসার নেই, ছেলেপিলে হল না, ওঁর কাঁধে জোয়াল চাপল না, হাতছাড়া হয়ে গেলেন।—সে যাকগে। এখন আপনি বলুন আমাকে সাহায্য করবেন কিনা।—বৌঠান, আপনি কি ভাবেন, এই ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া কলেরা টাইফয়েডের ডিপোতে আমি ছেলেদের পাঠিয়ে দেব? আপনি তো জানেন, গ্রামের অনেকেই লেখাপড়া জানা। অনেকেরই টাকাপয়সা আছে, তা না হলে চোরডাকাতে নজর দিত না এদিকে। তবে কেন আত্মরক্ষার জন্যই এরা নিজের গ্রামের উন্নতি করে না? ডাক্তার কবরেজ বেটে খাওয়ালেও এদের কিছু হবে না জানবেন।—আপনি কিছু একটা উপায় করে দিন।—দেব। আমার বুড়ো কম্পাউন্ডারকে দিচ্ছি পাঠিয়ে। সে ডাক্তার না হলেও বহুদর্শী বটে। সে আপনাকে সাহায্য করবে। টাকা চাই? ওর খাওয়াপরার খরচটা না হয় দিলাম, আর কিছু পারব না দিতে। —যথা লাভ।

যথাকালে বৃদ্ধ ভীমচন্দ্র সেন এলেন।—আপনিও বদ্যি? ভালই হল।—ডাক্তারবাবু পাঠালেন

আমাকে, বললেন, যান, গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে ওখানে গেলে। সদ্গতি পাবেন।—এখনি গঙ্গাপ্রাপ্তি হতে দিলে তো? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু আমার বাবার চেয়ে বয়সে ছোটই হবেন, কাকা বলে ডাকি, কেমন?—আপনার দয়া। আমি যতো সব গরিব আর ছোটলোকদের ছেলে এনে দেব কুড়িয়ে। আপনি আর দুর্গানাথবাবু ওদের তৈরি করুন। দুর্গাবাবু নিজেই গিয়েছিলেন কবিরাজি শিখতে। কবিরাজ বললেন, বড্ড বয়স হয়ে গেছে, আপনি পারবেন না, ছেলেছোকরা জুটিয়ে দিন, তৈরি করে দেব। এখন আপনার কাজ হবে কবিরাজকে ডাক্তারি বোঝানো। তাঁর কাজ হবে আপনাকে আয়ুর্বেদ বোঝানো। যেখানে মিল বা গরমিল, সেখানে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখবেন।—কিন্তু একটা কথা, আপনার পয়সা আছে?—ঐ কথাটা ভুলে যান কাকা। এখন আপনি তো গঙ্গাযাত্রা করেই এসেছেন। এসব কাজ ব্রত হিসেবেই নিতে হয়। আমি এজন্যে দুখানা ঘর দেব। একটায় আপনি থাকুন, অন্যটায় পাঠশালা হোক। আপাতত দশটি ছাত্র পাবেন। এর পরে উন্নতি হবে। মেয়েরাও আসবে।—ওরা কী পড়বে? লেখাপড়া জানে কিছু?—দুর্গানাথ বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, আপনি স্বাস্থ্য, দেহতত্ত্ব, রোগ আর চিকিৎসা। কবিরাজ বায়ু পিত্ত কফ, নাড়িজ্ঞান, দ্রব্যগুণ। আর দুজনে মিলে ওষুধ পরীক্ষা, টোটকা, ওষুধ তৈরি।—কী ওষুধ?—গাছগাছড়া আর শস্তায় যেমন হতে পারে, তেমনি। কিন্তু ডাক্তারি-কবিরাজির খিচুড়ি নয়।—আচ্ছা, দেখব।

দেখো দুর্গাবাবু, তোমার সহযোগী এনে দিলাম। কাজে লেগে যাও।—রাজমোহিনী হিসেবে দেখলাম প্রায় হাজার টাকা গেছে তোমার আমার জন্যেই; এসব লোকসান হচ্ছে তোমার। কী করে শোধ হবে?—ব্যাগার খেটে শোধ করো। গতর গিয়েছিল, গতর ফিরে পেয়েছ, ভুলো না সে কথা। —অনেক কথাই ভুলব না। ইতিমধ্যে ভিক্ষেশিক্ষে করে কিছু নতুন জমি জায়গাও কিনেছি।—ওটা আমাকে দাও। ভাল করে একটা গোশালা হবে। আমার গোয়ালঘরটায় কুলোচ্ছে না।—কিন্তু ধান চাল—, —মরবে তাহলে। দেখছ না দেশে সব কী হচ্ছে আজকাল? ধান চাল কিনে খেতে হবে। বা খাবার অভ্যাস বদল করতে হবে।—কী খেতে বলো? কাঁঠালের বীচি, আলু, কাঁচকলা, কচু, মানকচু, মেটে আলু, ভুট্টা। অবশ্য ধান গম বাদ দিয়ে নয়, ধান গম অল্প করে খাও। দুধ দই ছানা খাও।—গরিব ছেলেরা পাঠশালায় পড়বে, খাবে কী?—কতকজনকে পাঠিয়েছি শহরে। ভিক্ষে করবে।—বলো কী!—জানো না তো, ও ব্যবসায় প্রচুর লাভ আছে।—লোকে নিন্দে করবে যে। —চুরি ডাকাতি নরহত্যা সবই যদি চলে যায় দেশসেবার নামে, তবে ভিক্ষেই বা কী অপরাধ করল। —আজকাল লোকে ভিক্ষে দেয় কি?—ওরা নেচে গেয়ে ভিক্ষে করবে। ওরা জুতো পালিশ করবে। লোকের ফাইফরমাশ খাটবে। ছেলেপিলে মানুষ করবে। যা পাবে, তার এক অংশ এখানে দিতে বাধ্য হবে। অভিভাবক আছে সঙ্গে।—এত সব জোটাও কী করে?—মা গঙ্গার দয়ায়। আমি রোজ গঙ্গা-পুজো করি।

রাজমোহিনী আপাতত লোক লাগিয়ে নিজের বাড়ি থেকে দুর্গানাথের বাড়ি পর্যন্ত জায়গাটা জঙ্গলমুক্ত, সমতল করল। রাস্তা বানাল। এতে কিন্তু অনেক কথা উঠল গাঁয়ে। রাজমোহিনী গ্রাহ্য করল না। সে দশটি গরিব বামুন বদ্যি কায়েত ছাত্র জুটিয়ে আনল। তারা স্বাস্থ্যবিধি, দেহতত্ত্ব, রোগনির্ণয় আর ওষুধ তৈরি শিখবে। ভেষজ পরীক্ষা, দ্রব্যগুণ। এরা শিক্ষিত হয়ে এখানেই একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলবে। এরা অবস্থাপন্নদের কাছ থেকে পয়সা নেবে, গরিবদের কাছ থেকে গতরের সাহায্য নেবে। এরাই গোটা গ্রামের চিকিৎসা করবে। জঙ্গল সাফাই, উঁচু-নিচু জমি সমান করা, নদীর ধারে বাঁধ দেওয়া, রাস্তাঘাট বানানো, এসব করাবে। কারা খাটবে? ওদের ভূতপূর্ব রোগীদের লোকেরাই। ঐ হল ওদের ভিষক্-দক্ষিণা। দুর্গানাথ বললেন,—রাজমোহিনী, তুমি একা আমারই নও, সমস্ত গাঁয়ের যথার্থ আপনজন।—তোমার আপনজন হতে গিয়েই তো এইসব ঢুকল মাথায়।

তুমিই তো বর্ষ্মোদেশি গুরু।

যে দশটি ছেলে এসেছে, তারাও উদ্বাস্তু ঘরেরই ছেলে। চারজন বামুন, দুজন বদ্যি, চারজন কায়স্থ। এই কায়স্থ ছেলেদের বাবা গেছেন কলকাতায়, কয়েকটি হতদরিদ্র হরিজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ওরাই সব ভিক্ষে, জুতো পালিশ, ফাইফরমাশ খেটে নিজেরা খাবে, এখানেও কিছু পাঠাবে। কায়স্থটিও কাজ খুঁজে নেবে আর ওদের তদারক করবে। খেয়ে না-খেয়ে কষ্টে দিন কাটিয়েও ওরা টাকা পাঠায়। সেই টাকায় কুলোয় না। রাজমোহিনী একবেলা খেতে দেন সকলকে নিজের টাকায়। আর বামুন আর বদ্যিরাও কিছু টাকা দেয়। চলে যাচ্ছে কোনোমতে। পাঁচ বছরেই এরা মোটামুটি শিক্ষিত হয়ে উঠল। আবার কয়েকটি ছাত্র এল। এদের ডিগ্রী নেই, লাইসেন্স নেই, হতদরিদ্র গ্রামবাসী যারা, এরা তাদেরি সেবা করে, বড়লোকের বাড়ি যায় না। রোগীরা চাল ডাল দেয়, তরকারি ফলমূল দেয়, তাদের বাড়ির লোকেরা গতরে খেটে দেয়। যে যেমন পারে, সাহায্য করে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাবুদিগকে। এদের চেষ্টায় আরো ছেলে এল। তারা অবস্থাপন্ন ঘরের। তারা হল স্বেচ্ছাসেবক। তারা অর্থসাহায্যও দেয়। তারা এসব শিখে নিজেদের আর গ্রামের দরিদ্রদের চিকিৎসা করে। নাম দেয় নব আয়ুর্বেদ শিক্ষালয়।

বৌঠানের সাফল্যের সংবাদে দেওর খুশি হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে টাকাও পাঠান কিছু। একবার এসে দেখেও যান সব।

এমন সময় দুটি ঘটনা ঘটল। ফ্লোরাকে নিয়ে তরণীকুমার এল হঠাৎ, সঙ্গে একটি বাঙালী ছেলে আর দুটি মেয়ে। ছেলেটির নাম তরুণ, তার বোনেদের নাম নীপা আর দীপা। মা-বাবার সঙ্গে ছিল তারা আমেরিকায়। হঠাৎ বাবা-মা মারা গেলেন। খুব বড়লোক নয় এরা। তরণী ছিলেন প্রতিবেশী, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সেখানকার আসবাবপত্র বেচে দিয়ে টাকাপয়সা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে চলে এলেন। হঠাৎ অসময়ে এসে উপস্থিত। রাজমোহিনী বলল,—খবর না দিয়ে এভাবে আসার মানে? এটা হিন্দুবাড়ি, কোনো হোটেল নয়।—নিজের বাড়ি তো!—না, তাও নয়, বাড়ি আমার বাপের। মনে থাকে না সব কথা!—তাই বলে খেদিয়ে দেবে নাকি?—তা এখানে কেন, কলকাতা ছেড়ে?—এরা বাংলাদেশের গ্রাম দেখতে এসেছে।—এ বাড়িতে জায়গা হবে না। অন্য ঠাঁই দেখতে হবে। আর তোমার মেমগিন্নী জানেন আমি কে?—তিনি অবুঝ নন, সব বোঝেন।—কী পরিচয় দিয়েছ তাঁর কাছে?—যাই বলে থাকি না কেন, কোনো ক্ষতি হয়নি তাতে। আচ্ছা, এই দুপুরবেলায় সকলকে বাসিমুখে ফিরিয়ে দেবে?—তোমার লজ্জা নেই, তাই মরতে এসেছ তাই বলো। চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।

সেদিন ছিল ছুটি। আয়ুর্বেদ পাঠশালায় জায়গা হল। খিচুড়ি আর ভাজাভুজি তার সঙ্গে দই পায়েস ছেলেরাই করে দিল। ছেলেরাই আতিথিসৎকার করল। দেখেশুনে ফ্লোরা খুশি। দুর্গানাথ, ভীমসেন, কবিরাজ আর ছেলেদের বাবা তারাচরণ দাশগুপ্ত, বাঁধুলীচরণ চক্রবর্তী এগিয়ে এসে আলাপ করলেন।

ওরা সাতদিন থেকে চার-পাঁচখানা গ্রাম দেখেশুনে ফিরে যাবার সময় দীপা বলে মেয়েটি আর যেতে চায় না। তারা কায়স্থ। কিছুতেই যাবে না। অগত্যা রাজমোহিনী তাকে নিজের কাছে রাখতে বাধ্য হল। তার আগে দীপা নখ কেটে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিল। নীপা আর তার দাদা কলকাতায় মামাবাড়িতে থাকবে। দীপা গেল না কিছুতেই। যাবার সময় ফ্লোরা রাজমোহিনীকে বলল,—আপনার কথা শুনেছি। কথা গোপনেই রেখেছি। আপনার কাজ দেখে খুশি হয়েছি। সামান্য কিছু দিয়ে যেতে চাই আপনার এই গ্রামসেবার জন্যে আর সেই সঙ্গে আপনার এইসব আয়ুর্বেদ শিক্ষালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের জন্যে। কার হাতে দিতে হবে? রাজমোহিনী দুর্গানাথকে

দেখিয়ে দিল। ফ্লোরা দশ হাজার টাকার চেক দিয়ে গেল দুর্গানাথের হাতে। তারপর তারা চলে গেল।

রাজমোহিনী বললেন,—দীপা, তুমি গেলে না কেন? দীপা বলল,—আমাকে সম্মোহিত করেছে।—সম্মোহিত করেছে, সে কী? এখানে কে ওসব করবে?—ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি করেছে। দীপা দেখিয়ে দিল দুর্গানাথকে। মাথা খারাপ নাকি? না, আমেরিকায় আধুনিক খামখেয়ালি নানা নামের, নানা জাতের, নানা সাজপোশাকের আর নানান ধরনের ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশে এইসব শিখেছে? দীপা বলে,—ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে আকর্ষণ করেছেন। আমি ওঁর গৃহিণী হব। বলে কী মেয়েটা! দীপা নাছোড়বান্দা। রাজমোহিনী বলে,—কী গো দাদাশ্বশুর, কী করবে এখন?—ও তো নাবালিকা। —ওর দাদা কিছু বলল না, ওকে ফেলে চলে গেল। ও থাকবেই বা কোথায়? আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না বলে দিচ্ছি।—দীপা, চলো, তোমাকে কলকাতায় আমি নিজে রেখে আসি।—তাহলে তোমাকেও সেখানে থাকতে হবে। দুর্গানাথ বললেন,—আমি বাড়িঘর ছেড়ে কোথায় গিয়ে থাকব?—আমার কাছে থাকতে হবে।—আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন, চলো।

তখনো তরুণেরা স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। দুর্গানাথ দীপাকে নিয়ে একটি ট্রাক ড্রাইভারকে ধরে তার সাহায্যে ওদের কাছে গেলেন। বললেন,—এই পাগলী মেয়েকে ফেলে যাচ্ছেন কেন আপনারা?—পাগলী বলেই ফেলে যাচ্ছি। একটা দায়মুক্ত হই।—কিন্তু কার জিম্মায় থাকবে এ? আর দেখুন, আপনারা বে-আইনী কাজ করছেন, শেষ পর্যন্ত পুলিশে একে নিয়ে যাবে। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে দুর্গানাথ দীপাকে ওদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করলেন। নিজে ফিরে এলেন গ্রামে।

কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁকেও ঐ রোগে ধরল। সোজাসুজি এসে বললেন রাজমোহিনীকে, দেখো রাজমোহিনী, আমাকে বিদায় দাও, আমি মরে গেছি।—বিদায় আর আমি দেব কী, ওই তো কুয়োর দড়ি রয়েছে, গলায় বেঁধে বাকিটা ঐ আমগাছের সঙ্গে বেঁধে কুয়োর ভিতর ঝুলে পড়ো।—তুমি ঠাট্টা করছ রাজমোহিনী?—আমি তোমাকে ঠাট্টা করবার কে?—আমি ক্ষেপে যাব মনে হচ্ছে। —রাঁচী যাও। টাকা দিচ্ছি।—রাজমোহিনী, তুমি কী নিষ্ঠুর!—আর তুমি লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে এইসব শোনাতে এসেছ? ভাল, বছর দুই সবুর করো, মেয়েটা সাবালিকা হোক, তখন দেখো, ও তখন পর্যন্ত তোমাকেই চায় কিনা।—কিন্তু আমি—, —তুমি একটা আস্ত বলদ। যাও, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। ঢং করতে এসো না।

দুর্গানাথ ধীরে ধীরে চলে গেলেন। প্রথমে গেলেন কবিরাজের কাছে। কবিরাজ বললেন হঠাৎ বায়ুপিত্তের প্রকোপ। ওষুধ দিলেন। তেল দিলেন। তারপর গেলেন যে জোতদারের জিম্মায় তাঁর কিছু জমিজমা আছে তার কাছে। জোতদারকে অনুরোধ করলেন, ফসল উঠলে যেন বাড়িতে নিয়মমত দেওয়া হয়। যোগানন্দাকে বললেন বাড়ি পাহারা দিতে এবং ফসল এলে ঘরে যত্ন করে তুলতে। কিছু নগদ টাকাও দিলেন হাতে। সেই দশ হাজার টাকার চেকটা কবিরাজের হাতে দিলেন রাজমোহিনীকে দেবার জন্যে।

তারপর সেই দিন—সেই গভীর রাত্রেই দুর্গানাথ গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। প্রথমে গেলেন নবদ্বীপ, সেখানে তাঁর জানাশোনা এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তারপর শান্তিপুর, কালনা, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, বাঘনাপাড়া, গুপ্তিপাড়া এবং হাওড়া-হুগলী-নদীয়া-বর্ধমান-বীরভূম-মেদিনীপুরের যাবতীয় তীর্থদেবালয় দর্শনে। তারপর চলে গেলেন শ্রীক্ষেত্র-ভুবনেশ্বরে আর উৎকলীয় সমস্ত তীর্থদেবালয় দর্শনে। তারপর গেলেন পশ্চিমে। গয়া কাশী মথুরা বৃন্দাবন জয়পুর করৌলি উদয়পুর এবং অন্যান্য স্থানে। অযোধ্যা চিত্রকূট নৈমিষারণ্য। উত্তরে হৃষীকেশ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন। তারপরে আর বেশি ঘুরতে পারলেন না, অর্থাভাবও বটে, শরীরেও শক্তি নেই। ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে এলেন কাশীতে। সেখানে বাঙালীটোলায় ঘর ভাড়া করে রইলেন। বসে খেলে চলে না।

গঙ্গার ঘাটে বসে রামায়ণপাঠ শুরু করে দিলেন। দুর্গানাথ কথকতা ভাল জানেন। গানের গলাও আছে। সুতরাং তাঁর শ্রোতা, বিশেষত শ্রোত্রীর অভাব হল না। অবসরকালে সাধুসঙ্গ করেন। মনে বৈরাগ্য আনার চেষ্টা করেন। মনে হয়, নারীর রূপ দেখে ভোলার বয়সও আর নেই, আর কাজটাও গর্হিত বটে। বাড়িতে ফিরে যেতেও ইচ্ছা করে না। একখানা উইল লেখালেন আইনজ্ঞদের সাহায্যে। উইলে রাজমোহিনীকে নিজের বাড়ি, জমি সমস্ত দান করলেন। সে উইল পছন্দ না হওয়ায় একখানা দানপত্রই লিখে ফেললেন তাড়াতাড়ি। সেটা রেজেস্ট্রি করে কিছু টাকাসহ ইনশিওর করে পাঠালেন রাজমোহিনীর নামে।

প্রায় দশ মাস হল দুর্গানাথ দেশান্তরী। নিঃশ্বাস ফেলে রাজমোহিনী ভাবল, পর কখনো আপন হয়? এবারে হঠাৎ এই দানপত্র পেয়ে সে দুর্গানাথের ঠিকানা জানতে পেরে যোগানন্দা, ভীমসেন, কবিরাজ আর ধরণী গুপ্তের উপর সব ভার দিয়ে কাশীতে রওনা হয়ে গেল। যথাস্থানে পৌঁছে দেখল, খাটো ময়লা কাপড় পরে দুর্গানাথ অপটু হাতে নিজের খাবার বাসন মাজতে বসেছেন।—সরো, আমি দেখছি। বলে দুর্গানাথকে ঠেলে সরিয়ে রাজমোহিনী বাসন নিয়ে বসল। কলে জল এসেছে, বাসন ধুয়ে বলল—কোথায় রাখতে হবে, বলে দাও।—তুমি কেন কষ্ট করে এলে? —আমার কাজের কৈফিয়ত তোমাকে দিতে বাধ্য নই। আমার খুশি, এসেছি। দুর্গানাথ জায়গা দেখিয়ে দিলেন। একতলার আলোবাতাসবর্জিত স্যাঁতসেতে ঘরের এক কোণে বাসন রেখে রাজমোহিনী বলল,—এইখানেই থাকা হবে না কি?—মনে তো সেইরকমই ইচ্ছে। বাবা বিশ্বনাথ যা করেন। রাজমোহিনী উঠে বেরিয়ে গেল। প্রথমে গঙ্গাস্নান করল। তারপর একটা দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়ে নিল। তারপর একে ওকে ধরে একটা বাড়িতে আলোবাতাসওয়ালা দুখানা ঘর ভাড়া করে ফেলল। ঘর দুখানা দোতলায়। জানালা দিয়ে গঙ্গাদর্শন হয়। একটি ব্রাহ্মণী আর একটি ঠিকে ঝি ঠিক করে ফেলল। তারপর তিনখানা রিকশা ভাড়া করে এনে দুর্গানাথকে বলল,—চলো। —কোথায় যাব?—আমি যেখানে নিয়ে যাই। দুর্গানাথ বিনাবাক্যব্যয়ে তার অনুগামী হলেন। জিনিসপত্র সব রাজমোহিনী গুছিয়ে নিল। নতুন বাসায় এসে দুর্গানাথ বললেন,—এর ভাড়া কত? —তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

ব্রাহ্মণী আর দাসীর সাহায্যে ঘর গোছানো সারা হল। দুর্গানাথের জন্যেও দোকান থেকে সরু চিঁড়ে, মিষ্টি দই সন্দেশ, নুন লংকা আমের আচার এল। আজ আর রান্না নয়। একটু মোটা চিঁড়ে, টক দই, গুড়-কলাও এল ব্রাহ্মণী আর রাজমোহিনীর নিজের জন্যে। পরদিন দুর্গানাথ হিসেব করে পুরোনো বাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। রাজমোহিনী বলল,—সব তো দিলাম গুছিয়ে। দীপা-দীপা করে ক্ষেপে উঠো না। দীপা এমন কিছু নয়। বিয়ে করতে চাও তো বলো, কন্যে দেখি। এখানে চেষ্টা করলে সমস্তই পাওয়া যায়।—না না, আমার কন্যে চাইনে। আমি এখন জপতপ সাধনভজন নিয়েই থাকতে চাই।—চলেছ কোথায়?—বিশ্বনাথের আরতি দর্শনে।—বিশ্বনাথ তো রয়েইছেন, আমি যাচ্ছি চলে। আমার হিসেবগুলো—, —মাফ করো রাজমোহিনী, হিসেবটিসেব আর কেন, আমি এখন সমস্ত হিসেবের বাইরে। ওসব তুমি করো গে। কিন্তু দর্শনে যাবে না?—আমার দর্শন মাথায় থাকুন, কাজের বোঝা তো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এসেছ। তোমার বন্ধু যেমন, তুমিও তেমনি। আমার কি আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় আছে? আমি যাচ্ছি চলে। তোমার জন্যে শ' পাঁচেক টাকা রেখে যাচ্ছি। দেখো, হারিয়ো না যেন। এই দিয়ে কয়েক মাস চালাতে হবে, মনে রেখো। চললাম তবে।—আর কয়েকটা দিন থেকে গেলে হত।—আবার কেন? ঐ তো দুর্বলতা। তুমি আবার সাধনভজন করবে। হুজুগে মেতেছ বই তো নয়। চলি তবে। কত কাজ আছে। বসে থাকলে চলে?—যদি ঈশ্বর না করুন, কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়, তখন কাজের কী হবে?—ঐ তো,

অমঙ্গল ডাক ডাকতে লেগেছ, যাত্রায় বাধা দিচ্ছ। আচ্ছা যাও দর্শনে। আজকে যাওয়া বন্ধ রাখলাম। কাল কিন্তু নিশ্চয়ই যাব।—না, তীর্থে এসে তীর্থকৃত্য না করে যাবে না। হিন্দুর মেয়ে নও তুমি? —হিন্দু! হিন্দু বলে কোনো জাতের নাম তো রামায়ণ-মহাভারতে দেখি নে। কৌশল্যা বা কুন্তী ঘর ছেড়ে কোথাও তীর্থ করতে গেছেন বলেও তো লেখা নেই।—তোমার সঙ্গে তর্কে পারবে কে? চলো না, একটু বেড়িয়ে আসবে। অগত্যা রাজমোহিনী কাপড় ছেড়ে গরদ পরে ব্রাহ্মণীকে সব বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে রেখে চলল দুর্গানাথের সঙ্গে। সন্ধের আগে বেরিয়ে রাত ন'টা অবধি ঘুরে সব দর্শন করে এল। নাতবৌ, ভালো লাগছে না?—ভালো লাগা মন্দ লাগা সব ভুলে গেছি দাদাশ্বশুর, তুমি আর কাঁদিয়ো না আমাকে।—জীবনটাকে মেশিন করে ফেলো না রাজু। বাজারে বেছে বেছে একখানা ভালো শাড়ি, ব্লাউজপীস, উড়নি কিনলেন দুর্গানাথ। কচুরী গলির রাবড়ি, জিলেপি। —এই তোমার গরিব দাদাশ্বশুরের উপহার রাজমোহিনী, যদিও তোমার যোগ্য নয়। তোমাকে মণি-মানিক দিয়ে সাজাতে ইচ্ছে করে।—টাকা পেলে কোথায়?—কথকতা করে, রামায়ণপাঠ করে পেয়েছি। একটা সোনার কলসীও পেয়েছি।– বাড়ি গিয়ে দেখাবে চলো তো। তুমিও রোজগার করতে শিখেছ? বাঃ, ভারি খুশি হয়েছি দাদাশ্বশুর। খুব ভালো লাগছে। আজকের দিন রাতটা মনে থাকবার মতো। —তাই তো বলি, তাড়াতাড়ি চলে যেয়ো না। সারা জীবন পড়ে রয়েছে। সিনেমার ফিতে আরো কিছু সঞ্চয় করে নাও। পরে আর কবে দেখা হবে, কে জানে! নৌকায় চড়বে রাজমোহিনী? কেমন ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে দেখো।—তুমি আবার সাধনভজন করবে, তবেই হয়েছে।

একটা নৌকো ভাড়া করে দুজনে অনেকদূর অবধি গঙ্গায় বেড়িয়ে কেদারঘাটের কাছে নৌকো থেকে নামলেন। বাসায় এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে ছাতে বসে দুজনে গল্প। বাসায় অন্য ভাড়াটে নেই, ছাতটা এখন নিজেদের দখলে। দীপার মধ্যে কী পেয়েছ দাদাশ্বশুর?—কিছু না, একটা মোহ, ক্ষণিকের মায়া। সেই মায়া কাটাবার জন্যেই তো বেরিয়েছি।—আমার কথা মনে থাকবে তোমার? —তুমি আমার মা, আমার বোন, আবার সখী, আবার কন্যাও। তোমাকে ভুলতে পারি? জানো না, প্রতিদিন সকালসন্ধ্যায় প্রণাম করি তোমাকে। তুমিই তো আমার অন্নপূর্ণা।—তোমরা পারো বটে কবিত্ব করতে। এককালে তোমার বন্ধুও করত, যতদিন ফ্লোরার পাল্লায় না পড়েছিল।—ফ্লোরাকে কেমন দেখলে রাজু?—ভালো, খুব ভালো। কাজের মেয়ে বটে। কিন্তু কী দেখে যে মেমসাহেব তোমার বন্ধুর গলায় মালা দিল, তাই ভাবি। ওঁর তো কোনো গুণই আমার চোখে পড়ল না।— বড্ড কাছের বে, তাই দেখতে পাওনি। একটু দূরত্ব, একটু রহস্যভাব থাকা চাই। মেমসাহেব যা পেয়েছে ওর কাছ থেকে, তুমি তা পেলে না।—আহা, কী আমার নব কার্তিক রে!—রূপের কথা হচ্ছে না রাজু, মোহমায়ার কথা হচ্ছে। একটু মায়ার অঞ্জন চোখে লাগিয়ে নিলে যা কুরূপ, তাও অপরূপ হয়ে ওঠে।—হবে, আমার চোখে তো কোনো অঞ্জনই লাগল না।।—তার চোখেও লাগেনি। তাই তোমাকে ফেলে যেতে পারল এত সহজে। ফ্লোরার গুণে ভুলেছে কিন্তু।—ফ্লোরার বয়সও কম, রূপও আছে। তবে স্বভাবটিও সুন্দর।—আমার মত কুঁদুলে নয় বোধ করি।—চলো যাই, রাত হয়েছে। আবার ভোরে উঠতে হবে।

সাতদিন কাশীবাস করে রাজমোহিনী দেশে ফিরল। আসার সময় খুব কাঁদল।—কেঁদো না রাজু, আমাকেও কাঁদিয়ো না।—আমি কী নিয়ে থাকব দাদাশ্বশুর, মেশিন হয়ে যাব যে।—আমি যাব. আমি যাব রাজমোহিনী, মনটাকে আগে শান্ত করে নিই।—না, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই দাদাশ্বশুর, তুমি এখানেই বেশ আছ। এখানেই থেকো। বরং বড্ড মনটা ক্লান্ত হলে আমিই এসে এসে দেখে যাব তোমাকে। আমারও তো একটু সান্ত্বনা চাই। চলি তবে।

ঠিক দু' বছর পরে দীপা এল কাশীতে।—উঃ, কত কষ্ট করে খুঁজে খুঁজে এলাম। আপনি

ভুল করেছেন আমাকে চিনতে না পেরে। আমি ঠিক জানি, আপনি আমার আর জন্মের স্বামী। আমি কালীঘাটে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছি। এক সাধুর কাছে মন্ত্র নিয়েছি। আপনাকে খুঁজতে কোথাও বাকি রাখিনি। আমাকে আপনার নিতেই হবে। নইলে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। কী ভাবছেন, আমি পাগল? মোটেই না,—লুম্বিনী, রাঁচী ঘুরে এসেছি। সবাই বলেছে নর্ম্যাল। অত্যন্ত সুস্থ আমি।—দীপা, তুমিই তো বলেছ আমি বৃদ্ধ ব্যক্তি।—সেইজন্যেই তো এত টান। এ যে সতীর টান বিশ্বেশ্বরের প্রতি। আমি আপনার শক্তি। এখন বয়স আঠারো পার হয়ে উনিশ। চলুন পণ্ডিতের কাছে।—পণ্ডিত কী করবে?—কোষ্ঠী মেলাবে।—আমার কোষ্ঠী নেই।—পণ্ডিত হাত দেখে মুখ দেখেই সব বলে দেবে। চলুন।—তোমার জানা কেউ আছে নাকি?—আছেই তো। নইলে এলাম কিসের জোরে? আমার এক জ্যাঠামশায় থাকেন এখানে। তিনি জ্যোতিষবিদ্যা জানেন। আমি কায়েতের মেয়ে, আপনি বৈদ্য। এরকম বিবাহ অনেক হয়।—আমি বৈদ্য, এ খবরও নিয়েছ?—কোনো খবরই নিতে বাকি রাখিনি। এখন চলুন।

ইতিমধ্যে গাড়ির শব্দ। এক বৃদ্ধ পণ্ডিতসহ তরুণ ও নীপা এসে উপস্থিত। এই যে এখানে! আমরা সারা কাশী তোলপাড় করে এলাম। কী মশায়! কী জাদু টোনা গুণ জ্ঞান জানেন আপনি? কী করেছেন মেয়েটার?—বিশ্বাস করুন আপনারা, আমার কিছুই জানা নেই। আমি কিছু করিনি। নীপা বলল,—আর কিছু না-ই করে থাকেন যদি, মুখে একটু আলকাতরা মাখতে ভুলে গেছেন।—সে আবার কী?—ওই চেহারা দেখে, রূপ দেখে, মুখ দেখে আমারি মন ভুলে যাচ্ছে, দীপা তো দীপা।—আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।—আর বুঝতে হবে না, আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই চলবে।—আপনারা আমাকে—, —না না, মশায় আপনি কিছু মনে করবেন না। ওরা দুটো বোনই পাগল। একটু উনিশ আর বিশ।—ওঠো দীপা।—না, আমি উঠব না। জ্যাঠামশায়, আপনিও ওদের দলে?—নীপা তুই বুঝিয়ে বল্।—দেখ দীপা, জ্যাঠামশায় আমাদের দুজনের জন্যেই দুটি সুপাত্র ঠিক করে আমাদের এখানে আনিয়েছেন। তুই এরকম পাগলামি করলে তাঁর যে মাথা হেঁট হয়ে যাবে। আজই রাত্রে বিয়ের লগ্ন। দুই বিয়ে একসঙ্গে হবে। অনেক অনুষ্ঠান বাকি আছে। সময় বয়ে যাচ্ছে। শিগগির ওঠ। ওঠ বলছি।—আমি এঁকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না। আমার বয়স এখন আঠারো পেরিয়ে গেছে।—তুই আমাদের নামে কেস করবি নাকি? তোর হাত-পা বেঁধে রাখা হবে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বেত খাবি, মনে থাকে যেন।—মশায়, আপনারা ওঁর প্রতি—, —তাহলে মশায় আপনিও এই ষড়যন্ত্রে আছেন বোধ হচ্ছে। দীপা, এ যে ঘাটের মড়া! এর গলায় মালা দিলে তুই তে-রাত্তিরে বিধবা হবি।—আমি সাবিত্রীর বর মেগে নেব। এঁকে শতায়ু করব। না পারলে সহমরণে যাব। সময় নষ্ট হচ্ছে। মশায়, আপনি একটু সরে যান। ওকে আমরা জোর করে নিয়ে যাব।—পারবে না, পারবে না। আমার মৃতদেহ নিয়ে যাবে। আমার কাছে অস্ত্র আছে।—নীপা, গা খুলে দেখ তো কী লুকিয়ে রেখেছে। ও মশায়, আপনি অন্য ঘরে যান না।—মশায়, আমি বৃদ্ধ হতে পারি অনাত্মীয় হতে পারি, কিন্তু চোখের সম্মুখে অত্যাচার হতে দেব না। আপনারা পারেন যদি, বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু জোর জুলুম করবেন না।—হাত-পা বেঁধে মারতে মারতে নিয়ে যাব। আমি ওর গার্জেন। নীপা, দেখলি?—নীপা কী দেখবে? আমি কুম্ভক করব, দম নেব না। এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে বলল,—বাবা, একজন ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।—ভিতরে এনে বসাও।

অনতিবিলম্বে একজন প্রৌঢ়, দুজন যুবকসহ ভিতরে এলেন। অতগুলি চেয়ার ছিল না, সতরঞ্চি পাতা হল। তাঁরা দাঁড়িয়েই রইলেন। প্রৌঢ় বললেন, পণ্ডিতমশায়, খবর পেলাম আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর মাথা খারাপ। ফাঁকি দিয়ে পাগলী গছাতে চেয়েছিলেন। আমরা এই দুটো বিয়েই

ভেঙে দিচ্ছি। পুলিশে খবর দিইনি, এটাই ভাগ্য মনে করবেন। তাঁরা যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

কী করা যায় এখন? কারা যেন ভাংচি দিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।—এমন সুন্দর ঘর বর টাকা পয়সা সব গেল।—নীপা, কী করবি এখন বল। নীপা বলল,—তোমরা আমাদের দু' বোনকে এখানেই রেখে চলে যাও। দেখি ঐ ঘাটের মড়া কী করে।—আহা, ওঁর দোষ কী? নিরীহ বেচারা, কেমন হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে। পণ্ডিতমশায় বললেন,—নীপা ঠিকই বলেছে। দীপা কয়েকদিন থাকুক এখানে। ও বুড়ো মানুষকে জানি, দেখছি তো কিছুদিন। ওঁর দ্বারা কোনো অনিষ্ট ঘটবে না। আমি ইতিমধ্যে আরো চেষ্টা করে দেখি। আরো দুটি ছেলে আছে আমার হাতে।—কী মশায়, একখানা ঘর ভাড়া দিতে পারবেন?—ঘর আমার নয়, আমি কর্তা নই। আমার মনিব ঠাকরুন আছেন দেশে, তাঁকে বরং 'তার' করতে পারি।—আপনার চলে কিসে?—ওনার মাসোহারায়। আমি ওনার পুরোনো চাকর, কর্মচারী। কাশীবাস করতে এসেছি। উনি পেনশন দিচ্ছেন।—আচ্ছা, ভাড়া না দেন, দু-একদিন থাকতে দিতে পারেন তো?—পারি, যদি পণ্ডিতমশায় দায়িত্ব নেন।—ঘর তো বেশ বড়-বড়ই দেখছি। আচ্ছা, একখানা ঘর ছেড়ে দিন, আমরা তিনজনেই থাকব। হোটেলে খাব।—আমি হোটেলে খাব না দীপা বলে।—আমি আমার কত্তার পাতের প্রসাদ খাব।—দেখুন ব্যাপারখানা জ্যাঠামশায়, এ পাগলীকে নিয়ে করব কী?

এগিয়ে এলেন ব্রাহ্মণী। অপরাধ নেবেন না বাবা, আমি একটা নিবেদন করতে চাই।—আপনি কে? আমি এনার কাজ করি। আমি বলছি কী, বাবার বয়স খুব বিস্তর হয়নি। আমি শুনেছি, ওঁর এই ষাট চলছে। অসুখে পড়েছিলেন বলে রোগা রোগা দেখাচ্ছে। এমন তো কত হয়! বাবা ধার্মিক লোক, ওঁর আয়ুও আছে। আপনারা ছোট খুকীমাকে দিতে পারেন ওঁর হাতেই।—ওঁর আয় কত. করেন কী?—বললাম তো, দেশ থেকে টাকা আসে। এখানেও অনেক ভক্ত আছেন। গঙ্গার ঘাটে পাঠ করেন, গান করেন, অনেক দক্ষিণা পান।—এইরকম একটা মূর্খ ভ্যাগাবন্ডের হাতে বোন দেব, লোকে বলবে কী? পণ্ডিত বললেন,—তরুণ, তুমি থামো। এই নিরীহ ভদ্রলোককে তাঁর বাড়িতে বসে অপমান করতে তোমার লজ্জা করে না? আচ্ছা মশায়, দেশে থাকতে আপনার পড়াশুনা কতদূর হয়েছিল যদি জিজ্ঞাসা করি তাহলে দোষ নেবেন না তো?—বি এ পাশ করে আইনের খানিকটা পড়ে স্বদেশীতে নামি। তার পরে নিজের বাড়িতে কিছু কিছু পড়েছি। সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, ষড়দর্শনও কিছু কিছু জানা আছে। কথকতা শিখেছি। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রও কিছু কিছু পড়েছি।—আর ইংলিশ?—ওদিকে বড় একটা মন দিইনি। তবে কিছু কাব্য, নাটক পড়া আছে অবশ্য আগেকার দিনের। শেকসপীয়র-দান্তে-গ্যেটের অনুবাদ, মিলটন, টেনিসন।—শেলী, কীট্স্, বায়রন বা ব্রাউনিং দেখেননি?—চসার থেকে শুরু করে সবই কিছু কিছু দেখা আছে, তবে আধুনিক বই পড়িনি।—কী হবে জ্যাঠামশায়? তরুণ বলে। নীপা বলল,—দীপাটাকে ফেলে রেখে চলো আমরা যাই এখান থেকে। মনে করো ও মরে গেছে। পণ্ডিতমশায় বললেন,—কী মশায়, আপনার মত কী?—আমি আর কী বলব, আমি মূঢ় মূর্খ নির্বাক হয়ে আছি।—বিয়ে করবেন দীপাকে? —আমার এরকম অভিপ্রায় নেই।—তবে কী রকম অভিপ্রায় আছে তাই শুনি?—আমি করযোড়ে গলবস্ত্রে নিবেদন করছি দীপা দেবী, আপনি ওনাদের সঙ্গেই যান।—আপনি যদি আমাকে স্থান না দেন, আমি গঙ্গার ঘাটে ভিক্ষা করে খাব, ওদের সঙ্গে যাব না। দীপা বলে।—জোর জবরদস্তি করলে ওদের নামে দোষ দিয়ে আত্মহত্যা করব।—তাহলে পণ্ডিতমশায়, আপনি দীপাদেবীকে নিয়ে দয়া করে কয়েকদিন থাকুন এখানে, আমি মনিব ঠাকরুনকে 'তার' করে দিই, তিনি কী হুকুম করেন দেখি।—তিনি যদি বিবাহের আদেশ দেন? দীপা বলে।—তাহলে, তাহলে দুর্গানাথ মাথা চুলকাতে

থাকেন।—শুনুন, আপনার সব শুদ্ধ বিদ্যে কতদূর? ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারেন? —তা বোধহয় পারি। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পারব। সায়েন্স পড়িনি তো তেমন করে। এর বেশি পারব না। তবে সায়েন্সটা নিজের জন্যেই একটু চর্চা করে নিতে হবে।—দীপা সায়েন্স পড়েছিল। ও বি এসসি পাশ করেছিল। ও আমেরিকানদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদেরি মত হয়ে উঠেছিল। অর্থাভাবে চলে এলাম আমরা। তা না হলে এই ন্যাস্টি দেশে কেউ থাকে? তরুণ বলে।—আপনি যদি ঐভাবে কথকতা ফথকতা ছেড়ে দিয়ে টিউশনি করেন, ভদ্রলোকের মতো থাকেন, তাহলে দীপাকে দিতে পারি আপনার হাতে।—কিন্তু আমি যে নিতে ভয় পাই।—ভয়ের কী আছে? না হয় মরেই যাবেন। আজকাল তো বিধবাবিবাহ চলছে।—আমি সেকেলে মানুষ। বিধবাবিবাহটা তেমন সমর্থন করি না। বিশেষতঃ যিনি আমার সহধর্মিণী হবেন—দীপা বলল,—আমি একটা কথা বলব? আপনাকে কী বলে ডাকব জানি না। আমি বলি, আপনার আমাকে বিয়ে করে কাজ নেই। আমি নিজের খরচপত্র নিজেই বেশ চালাতে পারব। আপনি শুধু আমাকে একটু থাকার জায়গা দিন।—লোকের কাছে কী পরিচয় দেব?—বলবেন, আপনি আমার দাদামশায় হন, আমি আপনার নাতনী।—মিথ্যে কথা বলব, কাশী-স্থানে?—মিথ্যে হবে না যদি জ্যাঠামশায় একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেন।—তা আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসব, তিনি আপনার সঙ্গে একটা ধর্ম-সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে পারবেন এখন।—দীপাদেবী কি চিরকুমারী ব্রত পালন করতে পারবেন?—আমি দুশ্চরিত্রা নই। আমি আপনাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি। আপনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন, তবে কুমারীর মতো থাকা ছাড়া উপায় কী আছে? দীপা বলল। পণ্ডিতমশায় বললেন,—আমি বলি কী, আপনি দীপাকে বিবাহই করে ফেলুন। বৈদ্যে কায়স্থে এমন বিবাহ অনেক হয়েছে। আমি কায়স্থ। জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, তন্ত্রশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছি বলে লোকে আমাকে পণ্ডিত বলে ডাকে। আসলে আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নই।—তাহলে মনিব ঠাকরুনকে সংবাদ দিতে হয়।—তবে তাই দিন।

সেদিনকার মতো সবাই এই বাসায় থেকে গেলেন। ব্রাহ্মণী রেঁধে বেড়ে সবাইকে খাওয়ালেন। বললেন,—বাবা নিরামিষ খান। আপনাদের এখন এখানে একটু কষ্ট করেই—, —না না, কষ্ট আর কী! রাত্রে হোটেলে গিয়ে ভাল করে খেলেই চলবে।

'তার' গেল। সঙ্গে সঙ্গেই রাজমোহিনী চলে এলেন।—এসব কী ব্যাপার? আমি থাকব কোথায়?—তুমি আমার ঘরে থাকো। আমি ছাতে গিয়ে শোব এখন।—হ্যাঁ, আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধিয়ে ভোগাও আমকে। আচ্ছা, আমি দেখছি। এল দরমা, এল ত্রিপল। ছাতে ঘর হল রাজমোহিনীর নিজের জন্যে। রাজমোহিনী সব শুনল। দীপাকে বলল,—তুই আমার ঘর ভাঙতে এলি?—আমার বিয়ে হলে আপনার ঘর ভাঙবে?—ভাঙবে না? ও আমার বন্ধু হয়। তুই এলে ওর কি আমার কথা মনে পড়বে?—আমি মনে করিয়ে দেব। আমি আপনার দাসী হয়ে থাকব।—আর দাসী সাজতে হবে না। ন্যাকামি রাখ, যা করতে এসেছিস, তাই করে ফ্যাল্। দিন দেখুন তো পণ্ডিতমশায়। যা ভবিতব্য, তা খণ্ডাবে কে?—আমি খণ্ডাব। আমি ওঁকে শতায়ু করব।—আরে পোড়ারমুখী, তোর বরকে তুই সহস্রায়ু কর না, তাতে আর আমার কী? আমার যে ছিল, সে বোধ হয় এখুনি মরে গেছে। তা মরুক গে। তোরা সুখী হ'। রাজমোহিনী তারপর বাজারে গেল। মস্ত বড় চ্যাঙাড়ি, ঝুড়ি, ডালি, ধামা, থলে, বস্তা, ট্রাঙ্ক কত কী এসে গেল। দুর্গানাথ বললেন, —দোহাই রাজু, এত খরচপত্র কোরো না। আর ঋণের বোঝা বাড়িয়ো না।—এসব তো তোমারি টাকা। তোমার যথাসর্বস্ব তো আমার জিম্মায়। ওদিকে পণ্ডিতমশায় বসেছিলেন না, হাতে পায়ে ধরে নীপার জন্যে আগেকার ছেলেটিকেই ধরে আনতে পেরেছিলেন। দু' বোনের বিয়ে হয়ে গেল। একই লগ্নে আর একই বাড়িতেই। রাজমোহিনী বলল,—জানেন আপনারা, উনি আমার হচ্ছেন দাদাশ্বশুর।

নতুন জামাই নীপার বর বলল,—উনি আমারো দাদাশ্বশুর। আর এই উপলক্ষে আমি হলাম আপনাদেরও আপনজন। কেমন? মেনে নেবেন তো?—অগত্যা।—আপনজন হলে তো লোকসান নেই, পর হলেই মুশকিল।

এবার দেশে ফেরার সময় রাজমোহিনী কাঁদল না। হাসিমুখে দীপার কপালে চুমো খেয়ে বিদায় নিল।—ভাবিস নে, তোর বরের সব সম্পত্তি আমার হাতে। বাংলাদেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, ওখানে তোরা গিয়ে থাকতে পারবি না। আমি সমস্ত বেচে দিয়ে তোর নামে টাকা পাঠাব। সাবধানে রাখিস।

দীপাকে নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে ঘর বাঁধতে হয় দুর্গানাথকে। বলেন, দীপা, আমার অপরাধ নেই, তুমিই জেনে শুনে বিষ পান করেছ। ভুলো না, আমি বৃদ্ধ শুধু নই, রুগ্নও।—আমি কি আপনার কাছে কোনো দাবি জানিয়েছি।—কিন্তু আমার বিবেক যে—, —বিবেককে বলুন, তিনি যেন আমায় জিজ্ঞাসা করেন।

দীপা অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের ঘর সাজিয়ে তোলে। ঘর তো এই ফ্ল্যাটে মাত্র দুখানা। তবে বেশ বড়-বড়। সেই বড়-বড় ঘরে পার্টিশন করে পড়ার ঘর, স্টুডিয়ো (দীপা আঁকতে জানে), একটি ঠাকুরঘর তৈরি করে। নিজের আঁকা চিত্রপট আর দোকানে কেনা ছোট ছোট বিগ্রহ দিয়ে সে ঘর সাজায়। বলে,—কত্তা, আপনি যেন মন্তর পড়ে আমার ঠাকুরের জাত না মারেন। আমার এই বিনা মন্তরের ঠাকুরকে আমরা বন্ধুরা মিলে যেন ইচ্ছামত সেবা করতে পারি।—আচ্ছা, তুমি আমাকে আপনি-আজ্ঞা করে কথা কও কেন?—কী করি বলুন, বয়সে বড়, সম্পর্কে বড়, এ তো লভ ম্যারেজ নয়, এ যে বিশুদ্ধ পতিভক্তি। পতি পরম গুরু।—কলিকালে এসব হয়?—তাহলে দেখছি অপ্রিয় সত্য কথাটা আমার মুখ থেকে বার করে না নিয়ে ছাড়বেন না। এক আমেরিকান সাহেব আমাকে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপে উঠেছিল। দাদাকে অনেক টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল। তার হাত থেকে আপনি আমাকে পরিত্রাণ করেছেন।—বুঝেছি সব, কিন্তু দীপা, তোমার তো বয়স অল্প।—দেখুন কত্তা, আপনার আমার পূর্বপুরুষদের সংসারে কত মেয়ে কুলীন পাত্রের অভাবে কুমারী থেকে যেত, কত মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হত, আপনি কি বলতে চান, তারা সবাই ভ্রষ্টা হয়েছিল?—কষ্ট বোধ করেছে তো।—তা করুক। যার কপালে যা। যেখানে মুশকিল, সেখানে কোনো না কোনো আসান আছেই।—তুমি বড্ড খাটছো দীপা।—এই খাটুনিতেই আমার আসান। কুঁড়ের মাথায় যত পাপের চিন্তা। কাজের ধান্দায় থাকা ভালো।—দেখছ দীপা, তোমার দাদা একবারও তোমার খোঁজখবর নিচ্ছেন না।—নেবেন কেন, অতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়ে গেল যে। তার রাগ ভুলতে সময় লাগবে। আর সেই সাহেব!—ওর তো চোখের নেশা। দু'দিন বাদেই সেরে যাবে।—সেই সাহেবটার ভয়েই তুমি—, —অন্য পাত্র খুঁজে পেলে না?—দেখুন কত্তা, আপনি আর জ্বালাবেন না আমাকে। একটু সাবান মেখে নেয়ে এসে মুখে একটু পাউডার লাগিয়ে আয়নাখানার সামনে দাঁড়াবেন তো।—তোমার দিদিও ঐ কথা বলেছিলেন। সত্যি বলছি দীপা, স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে আমি আর আরসিতে হাত দিইনি। নাপিত দিয়ে ক্ষৌরী করাই।—তাঁকে ভুলতে পারেন না বুঝি?—তোমরা ভাবো, তোমরাই বুঝি পতিব্রতা। শ্রীরামচন্দ্রকে ভুলে যাও।—তাহলে তো আমি ঠিকই করেছি, আপনাকে ভোলাতে যাইনি, দিদিমণির শাপমন্যি কুড়োইনি।—কিন্তু তুমি সত্যই ভুলিয়েছ আমাকে, শুধু রূপ দিয়ে নয়, গুণ দিয়েও। তোমার দিদিমণি সাধ্বী ছিলেন, তিনি অপরাধ নেবেন না, আশীর্বাদ করবেন। —কাকে? আমাদের দুজনকেই। তিনি যা চেয়েও পেলেন না, তুমি তাই অর্জন করছ।—কী সে জিনিস?—ঘরকন্না। বিয়ের পরে বেশিদিন তো বাঁচেননি, কত সাধ ছিল মনে।—আমাকে দেখে তাঁর হিংসে হবে না?—না, তোমার মধ্যেই তিনি নিজেকে আরোপ করে নেবেন।—আপনিও তাই নেবেন বুঝি?—না, আমি দুজনকে দুদিকে রেখে দেখব। দেখব দুটি বোনের মতো।—তিনি দেখতে কেমন

ছিলেন? কোনো ফটো আছে তাঁর?—না, পাড়াগাঁয়ে ফটোগ্রাফার আসবে কোথা থেকে? তত বড়লোক তো আমরা ছিলাম না যে শহরে যাব ফটো তোলাতে। সেটা দরকারই মনে করিনি, এখনো করি না। মনের মাঝেই তো সব থাকে।—আমি আপনার ধ্যানে বাধা দিচ্ছি না তো?—না গো না, শোনোনি দিলীপ রায় বলেছেন,—এ দুয়ের রঙ আলাদা।—আচ্ছা, কার কেমন রঙ বলুন দেখি।—তুমি আমার ছোট্ট পাখিটি—, —আর তিনি ছিলেন বুঝি গরুড় পক্ষীর বোন?—অতদূর নয়। শকুন্তলাকে যে আড়াল করেছিল পাখা দিয়ে তার মতোও নয়। তবে মনে কর, সে ছিল আমার সম জুটি। বয়সে যাকে যেমনটি মানায়। আর তুমি আমার অকালবসন্তের নতুন ফুলকুঁড়িটি।—ও বাবা, আপনি যে কবিত্ব করতে লেগে গেলেন।—তা আর কী করি বলো, স্বর্ণালঙ্কার দেবার তো সামর্থ্য নেই, বাক্যালঙ্কার দিয়েই সাজাই।—বাক্যালঙ্কার না কাব্যালঙ্কার? দেখুন কত্তা, আমি তো আপনাকে ভোলাতে যাইনি, আপনিও ভোলাতে আসবেন না যেন আমাকে।—তবে কি বেকার হয়ে থাকব? —না, আসুন আমরা কাজে লেগে যাই। একটা গুরুতর দুশ্চিন্তায় পড়েছি, জট ছাড়াতে পারছি না। সাহায্য করুন আমাকে।—তুমি যদি আমাকে 'আপনি আপনি' করো দীপা, তাহলে পেরে উঠব না। আচ্ছা, ব্যাপারখানা কী বলো দেখি?

দীপা বলতে লাগল। দীপার এক পত্র-বান্ধবী ছিল, তার নাম রক্তিমা। সে থাকত কলকাতায়। তার বাবা তার বিবাহ দিলেন এক ধনকুবের ব্যারিস্টারের একমাত্র ছেলের সঙ্গে। কিন্তু তার মন পড়ে আছে তার বাল্যবন্ধু রজতের কাছে। সে কিছুতেই স্বামীর ঘর করতে পারছে না। স্বামী রণজিৎকুমার অগাধ টাকার মালিক, কাজকর্ম করতে হয় না। সুন্দরী বউ নিয়ে সুখে থাকবে, তার এই কামনা। মা-বাবাও তাই চান। বাবা এখন প্রৌঢ় থেকে বার্ধক্যে যাব-যাব করছেন। তাঁরা ছেলে-বউকে ঘরকন্না বুঝিয়ে দিয়ে দুজনে শৈলাবাসে বাস করতে যাবেন। বাদ সাধল রক্তিমা। সে রজতকে চায়। রণজিৎ একটু ভীতুপ্রকৃতির লোক। খুনখারাপী তার আসে না। অথচ নিজের বউ পরকে ভেবে রাতদিন কাঁদবে, মন খারাপ করে থাকবে, স্বামীর ধারেকাছে আসবে না, সংসার দেখবে না —এই বা কী করে সহ্য করা যায়? রণজিৎ দেখতে মন্দ নয়, সুশ্রীই বলা যেতে পারে, ফর্সা, দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান যুবা। রজত শ্যামলা মাঝারি, সাদাসিধে। রজতও গুন্ডাপ্রকৃতির নয়। রণজিৎ ইংরেজিতে এম এ পাশ করেছে। রজত বাংলা আর সংস্কৃতে ডবল এম এ। স্বভাবও তাই দুই রকমের। রণজিৎ ইংরেজ ছেলের মতো, রজত খাঁটি গ্রাম্য বাঙালী। শ্বশুর শাশুড়ী বিরক্ত, বাপ মা বিরক্ত, রজত ঝামেলা এড়াবার জন্য গ্রামে চলে গেছে, তার বাপ-মাও সব শুনেছেন, মহা ভাবনায় পড়েছেন পাছে ব্যারিস্টার সাহেব কোনো শত্রুতা করে বসেন। তাঁদেরো ঐ একমাত্র সন্তান। রজত গ্রামে গিয়ে স্কুলের হেডমাস্টারি করছে। বি টি পাশ করেছিল। সে বিয়ে করতে চায় না। তার মতো সাদাসিধে মধ্যবিত্তকে কন্যা দিতেও কারো বিশেষ মাথাব্যথা নেই। রক্তিমার বাবা অ্যাডভোকেট, তাঁরও ঐ একটিমাত্র কন্যা। তবে তাঁর এক ভাইপো আছে মাতৃপিতৃহীন, তাঁর কাছেই মানুষ, তাঁর নাম চারুদর্শন। নামেও যা, রূপেও তাই। রক্তিমার ভাই বলে চেনা যায়। অল্পদিন হল বিবাহ করেছে। বউ পূর্ববঙ্গের মেয়ে, তার নাম সুন্দরমণি। রণজিৎ ওদের কাছে নিজের অবস্থা জানিয়ে দুঃখ আর বিরক্তি প্রকাশ করে। রক্তিমা বলে,—আমি বিষ খাব। ব্যাপারটা এই।

দীপা বলে,—এখন তুমি বলো, বান্ধবীটির জন্যে আমরা কী করতে পারি? ও লিখেছে, হয় তুমি আমাকে নিয়ে যাও, না হয় খানিকটা বিষ দাও পাঠিয়ে। ভুলেছে যে, ওকে বিষ পাঠালে ওর সঙ্গে আমাকেও সহমরণে যেতে হবে!—সমস্যা বটে। রজত কী বলে?—সে তো পালিয়ে বেঁচেছে। ভীরু, কাপুরুষ, সে আবার বলবে কী?—বিয়ে করল না কেন?—সেও রক্তিমাকে ভাল-বাসে বোধহয়।—আজকাল তো বিবাহবিচ্ছেদ হচ্ছে।—রক্তিমার সে সুযোগ হচ্ছে না। স্বামী, বাবা

মা, শ্বশুর শাশুড়ী ভাই ভাজ সবাই ওর বিপক্ষে। ওকে কার্যত কয়েদখানায় রাখা হয়েছে। ওর সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার, পরনে দামী দামী শাড়ি। দুই দাসী ওর সেবার নাম করে পাহারা দিচ্ছে। খেতে দেয় দামী দামী খাবার। একমাত্র সুযোগ, কাশীতে ওর দিদিশাশুড়ী আছেন, নাতবৌয়ের মুখ দেখতে চান। ওরা আসছে। তাই রক্তিমা আমাকে কাঁদাকাটি করে চিঠির পর চিঠি লিখছে। —ওর চিঠি লেখার সুযোগ আছে তাহলে?—না, ও নিজে লিখতে পারে না। পাশের বাড়ির এক বউ ওর সহপাঠিনী। দেখা করতে যায়, তাকে কেউ সন্দেহ করে না। ও যা যা বলে দেয়, সে লেখে আমাকে। তার নাম জয়া। খুবই দুঃখের কথা, সে অল্পদিন হল বিধবা হয়েছে। কোলে একটি ছেলে। শ্বশুর শাশুড়ী, মাসশাশুড়ী, পিসশাশুড়ী (তাঁরাও বিধবা) দুই কুমারী ননদ, দুই দেওর (বিয়ে হয়নি) আছেন। ওর সংসারে রাতদিন খাটুনি। ওরি মধ্যে রাত জেগে চিঠি লিখে ছেলের আয়াকে দিয়ে ডাকে পাঠায়।—তাই তো! দুর্গানাথ মাথা চুলকোতে থাকেন। দীপা মুখে একটু আদরের সুর এনে বলল,—কী গো, চুপ করে আছ যে?—দোহাই দীপা, তুমি আর এর মধ্যে জড়িয়ো না আমাকে। আমি শান্তিপ্রিয় বুড়োমানুষ, রোগামানুষ, তোমার কি একটু দয়া হয় না?—তা মেয়েটা যে পাগল হয়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত ও কি মনের দুঃখে বিষ খেয়ে মরবে? কিছু একটা উপায় বলো।—উপায় ওঁকে গিয়ে বুঝিয়ে বলা। যাও না তুমি একদিন বেড়াতে। বলো গে, যা হবার, হয়ে গেছে। মানুষ যা যা চায়, সবই পায় কি? কপালে যা লেখা ছিল, হয়ে গেল। সুখের আশা পরিত্যাগ করুন। ভক্তিভরে পতিসেবায় মন দিন। অবসরকালে রজতকে স্মরণ করে প্রণাম করুন। এ ছাড়া কী উপায় আছে, তা তো আমার জানা নেই।—রজতটা পালিয়ে গেল!—তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। রণজিতের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। সে একটি পতিব্রতা স্ত্রী পাচ্ছে না।—রণজিতের জন্যে তোমার এত মায়া কেন?—আমি তাকে দেখেছি যে, সে আমার একেবারে অচেনা নয়।—তাহলে তাকেই তো বলা উচিত মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে।—পাগল হয়েছ, আমি বলতে যাব সেই কথা, বুড়ো বয়সে পুলিশে ধরবে আমাকে!—তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি দেখি কী করতে পারি। —তোমাকে বেঁধে রাখা আমার সাধ্য নয় জানি, তবু পরামর্শ দিই, ও ফ্যাসাদে তুমিও জড়িয়ে পোড়ো না। পার তো, ওঁর মন ফেরাতে চেষ্টা কর।—রণজিৎকে ও যে একটুও ভালোবাসে না। —তাহলে সাহস করে স্বামীকেই সেই কথা ওঁর জানানো উচিত।—আচ্ছা, আমি কালকে যাব দেখা করতে। ওরা আছে রামপুরায়।

কয়েকদিন পরে।—ওগো আমাদের আর কিছু করতে হল না, তারা নিজেরাই ব্যবস্থা করে ফেলেছে, তবে তোমার কিছু খরচ হবে।—আমার?—আমার হলেই তোমার।—খুলে বলো।—রক্তিমা দিদিশাশুড়ীর পা জড়িয়ে ধরে বলেছে যে, রজতের সঙ্গে বহুদিন পূর্বেই সে কালীঘাটে গিয়েছিল। সেখানে মাকালীর সাক্ষাতে গোপনে ওদের গান্ধর্ব বিবাহ হয়ে গেছে। তাই শুনে দিদিশাশুড়ী —ছি ছি, থু থু করে উঠলেন। নাতিকে ডেকে বলে দিলেন, ওকে এক্ষুনি বাড়ির বাইরে রেখে এসো আর রটিয়ে দাও ও গঙ্গায় ডুবে মরেছে।—রণজিৎ তাই করল বুঝি?—রণজিৎ কী করলেন জানি না, তবে রক্তিমা আজ বেলা এগারোটায় আসছে আমাদের কাছে। ওর হাতে টাকা নেই। এখানেই থাকবে, খাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করবে।—বেশ তো, তোমার একটি সঙ্গিনী হল।—ওর মা বাবা কী করবেন, তাই ভাবছি।—বয়স কত?—তা তো ঠিক জানি না, আমি এর আগে দেখিইনি ওকে। সেদিনই প্রথম দেখলাম। ও ছিল আমার পত্র-বান্ধবী, আমি যখন আমেরিকায়। ও ভারতের নানা গল্প লিখত আমাকে। ওর কাছ থেকেই তো আমি ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি সভ্যতার খবর পেয়েছি। তা না হলে মেমসাহেব বনে যেতাম।

যথাসময়ে রক্তিমা এল, একা নয়, সঙ্গে ওর ভাই চারুদর্শন। রণজিৎ চারুকে জরুরী 'তার'

করে আনিয়ে তার হাতেই তার বোনকে দিয়েছেন সঁপে। চারু এসে দুর্গানাথকে প্রণাম করে বলল, —রণজিৎবাবুর মুখে শুনেছি, আপনি ওঁর মামার বিশেষ বন্ধু হন। আপনার আশ্রয়ে আসতে রক্তিমাকে উনিই উপদেশ দিলেন। জানেন বোধহয় সব।—কিছু কিছু।—এই আমার বোন। একে আপনার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছি। কিছু কিছু টাকা পাঠাতে চেষ্টা করব আপনারই নামে। ওর হাতে বেশি টাকাপয়সা দেবেন না। একটু লক্ষ্য রাখবেন, মাথায় ছিট আছে। হিস্টিরিক।—কিন্তু—, —রণজিৎবাবু বলেছেন, মাঝে মাঝে তিনি এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। সুযোগ পেলে আমরাও আসব। এখন তো ও পড়াশুনো করবে বলছে, তারপর একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে।

চারুদর্শন সেদিন এখানেই স্নানাহার সেরে নিলেন। পরের দিন চলে গেলেন তিনি। দুর্গানাথের হাতে দুশো টাকা দিয়ে গেলেন। রক্তিমা সুন্দরী, সুশ্রী, বয়স প্রায় উনিশ-কুড়ি হবে। সে দীপাকে দীপাদি আর দুর্গানাথকে দাদা বলে ডাকল।—দাদা, আমার হাতে খাবেন কি আপনি? —কেন খাব না, তুমি কী?—আমি যে স্বৈ-চারিণী।—ওসব পাগলামি ভুলে যাও। তুমি—, ধরো তুমি কুমারীই।—বিশ্বাস করুন দাদা, সত্যই আমি তাই।—বিশ্বাস করি। ভেবো না ওসব। মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। সবাই ঘরকন্না করতে জন্মায় না। কী করবে এখন?—পড়ব। বি এ পাশ করেছিলাম। আরো পড়ব সংস্কৃত আর দর্শন নিয়ে।—তারপর?—দেখি কী হয়।

রাজমোহিনীর পত্র : দাদাশ্বশুর, ভুলে গেছ আমাকে? আগেই জানি, ও মুখ দেখলে কি আর খেঁদিপেঁচির কথা মনে থাকে? তা, শোনো আমার দুঃখের কাহিনী। ফ্লোরা মারা গেছে। আশ্চর্য হোয়ো না। ফ্লোরাকে আমি সত্যই ভালোবেসেছিলাম, ওর চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের খবর হল এই যে, ফ্লোরার স্বামী, তোমাদের টি কে গুপ্ত সাহেব (শ্বশুর শাশুড়ী দাদাশ্বশুর সবাই মারা গেছেন শুনলাম) ফ্লোরার স্থাবরাস্থাবর বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে এখন আমার গালে টিকের ছ্যাঁকা মারতে এসেছেন। আবার বলেন কিনা, কালীঘাটে গিয়ে প্রাচিত্তির করে হিন্দু হয়েছেন। মরণদশা আর কী! উনি ফ্লোরাকে বিয়ে করেননি, ফ্লোরার টাকাকে বিয়ে করেছিলেন। সেখানে থেকে ফ্লোরার স্মৃতিরক্ষা করেননি, এসেছেন টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে। আমি এখানে আর থাকতে পারছি না দাদাশ্বশুর, তোমার কাছে যাব। আমার জন্যে ঘর রেখো। ভয় নেই, ভিক্ষে করে খাব, তোমার গলগ্রহ হব না। দীপাকে বোলো, ওর ঘর ভাঙার মতলব নিয়ে যাচ্ছি না। পারবও না ওর মতো রূপে গুণে বিদ্যাধরীর সঙ্গে টক্কর দিতে। যাচ্ছি কিন্তু।

পড়লে তো?—পড়লাম তো, এ বাড়ি অনাথাশ্রম হয়ে উঠল দেখছি।—রাগ করলে না তো? —আরে রাম, কী যে বলো তুমি।—বলবার একটু কারণ আছে দীপা।—যতই থাক, আমি বোকা নই।

রাজমোহিনী এলেন। সঙ্গে দুটো বাক্স, একটা সুটকেস, বিছানা, একছালা বাসনপত্র, ছোট বড় চারটে বালতি, দুটো ঘটি, একটা বড় মগ। বাড়িতে তো খুব বেশি ঘর নেই। কিন্তু দুর্গানাথ বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে আর দুখানা ঘরের একটা ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন রাজমোহিনীর চিঠি পেয়েই। দুর্গানাথ চারুদর্শনের দুশো টাকা ছাড়া নিজেও পেয়েছিলেন কিছু টাকা এক জমিদারবাড়িতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে। দীপাও বসে থাকেনি, সে সেলাই করে, বুনে কিছু টাকা হাতে পেয়েছিল। তার উপর রণজিৎ দিয়ে গেছেন একশো টাকা। রণজিৎ এসেছিলেন।—আপনি আমার মামার বন্ধু, কী বলে ডাকবো?—মামার সম্পর্ক মামার কাছে, তোমার সম্পর্ক তোমার কাছে। কেউ কেউ আমাকে দাদাশ্বশুর বলেও ডাকেন। রণজিৎ হেসে ফেলেছিলেন।—আমিও তাই ধরে নিচ্ছি। আপনি জানেন, হিন্দুবিবাহে বিবাহবিচ্ছেদ সত্যিই হয় না। ওটা আধুনিক ব্যভিচার। আমি মন্ত্র পড়ে রক্তিমার পাণিগ্রহণ করেছিলাম। খবর নিয়েছি, কালীঘাটের গল্পটা ওর একেবারেই বানানো।

রজত ওর মাথায় সিন্দুর দেয়নি, ওরা মালাবদলও করেনি। আসলে রজত কিছুই করেনি। সে ভাল ছেলে। সে জানে, সে গরিব, মধ্যবিত্ত। সে যদি বা মনে মনে ওকে একটু লাইক করে থাকে, মুখে বা কাজে কিছুই করেনি। ও-ই মরেছে। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেয়ে শুয়ে বেড়িয়েও ও রজতকে দাদা বলে ডাকতে কোনোদিন পারেনি তো সে কথা গোপন রেখেছিল কেন? বিয়ের সময় চুপ করে না থেকে আমাকেই গোপনে চিঠি লিখে সব জানাতে পারত। এখন তো আর শাস্ত্র ওলটানো যায় না। এখন আমরা দম্পতি। তা ও যাই ভাবুক, আমি কেন ওর মতো পাগলামি করতে যাব? আমি জানি, আমার স্ত্রী এখন অসুস্থা। স্বামীর যা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে। কী, ভাবছেন কী আপনি, অমন বিষণ্ণবদন হয়ে? সেকেলে মেয়েরা সহমরণে যেত, আর আমরা এটুকু করতে পারি নে? তারা তো অনেকে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারিণী হয়েও থাকতো, আমরা তাদের চেয়ে হীন? একটু সাহেবি করি বলে কী ভাবেন আপনারা আমাকে?

দুর্গানাথ কোনো কথা না বলে রণজিতের হাতে হাত রেখেছিলেন। সুতরাং আরেকখানা দু-ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া হল নিজেদের ফ্ল্যাটের ঠিক পাশেই। একখানা ঘর রক্তিমার, একখানা রাজ-মোহিনীর।—এই যে দাদাশ্বশুর, গোছানো হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। ভালো ভালো, খুশি হলাম দেখে। মাস্টারনীর গুণ আছে। কী ছিলে, আর কী হয়েছ। পাশের ঘরখানা? আচ্ছা, ওসব গল্প পরে শুনব, আগে গঙ্গা নেয়ে আসি। ও বাবা, গাড়ি ভাড়া তুমিই সব দিয়ে চুকিয়েছ? কত ধার করব? একপয়সাও না? কেন, তুমিই আমাকে পুষবে নাকি? দাদাশ্বশুরের টাকায় প্রতিগ্রহের পাপ হয় না কাশীতে? তোমার কাছেই মাধুকরী করতে হবে আমাকে? তা বেশ বেশ।

এমনি করে জমে উঠল। দুই ফ্ল্যাটের মাঝখানকার বন্ধ দরজা খুলে ফেলে দুই ফ্ল্যাট এক করা হল।—ওগো গিন্নী, শোনো, একটা দরখাস্ত আছে। তোমরা তো দু বোনের মতো দেখছি, দুজনেই সুন্দরী। তা, ঐ ফুটফুটে রূপ নিয়ে গোলাপী গাল নিয়ে অত আগুন তাতে নাই বা গেলে। ও কাজটা আমাকেই মানাবে। তোমরা বরং একটু যোগান দিয়ো। দেখো দাদাশ্বশুর, আমি সত্যই হাতে কিছু টাকা নিয়ে আসিনি। সব দিয়ে এসেছি। তোমার বাড়ি দুবেলা রান্না করব, দুটি খেতে পরতে দিয়ো। বুঝলে?—টি কে সাহেবকে কার হাতে সমর্পণ করে দিয়ে এলে?—ওগো, তোমার টিকেতে আগুন ধরাবার লোকের অভাব হবে না। আমি কলকাতায় গিয়ে আদালতে দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি। সেই যে মিত্তিরদের সোদামিনী? ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াত, কুল পেয়ারা চুরি করে খেত পরের বাগানে? সদ্যোবিধবা হয়ে ফিরে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। শ্বশুর এক পয়সাও দেননি, বরং বিয়ের পণ যৌতুক নিজের ঘরে তুলে রেখেছেন নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন বলে। শাশুড়ী লুকিয়ে একশোটি টাকা হাতে দিয়ে অপয়া বলে বিদেয় করেছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘর-জামাই রাখবেন ঘরে। তা, ওকে সান্ত্বনা দেবার লোক চাই তো? টি কে-র চেহারাখানি তো সাহেব-সাহেবই বটে। বয়স যাই হোক, স্বাস্থ্যখানা মন্দ নয়। আর হাতে টাকাও অঢেল। আমার বাড়ি দিয়ে এসেছি। বাড়ি ভেঙে পাকা তিনতলা উঠবে। আর, ফ্লোরার দিব্যি দিয়ে বলে এসেছি, বেইমানি কোরো না। ফ্লোরার নিজের টাকায় প্রতিষ্ঠিত আমার কাজগুলো দেখো শুনো সততা বিশ্বাস ঠিক রেখে। তা বলে প্রতিষ্ঠানের টাকা ওর হাতে দিইনি। অন্য বিশ্বাসী লোকের হাতে আছে টাকা। ও দেখবে শুনবে, সবাই বড়বাবু বলে ডাকছে। সোদামিনীকেও বলে এসেছি, খবরদার, সব খবর রাখছি, যদি প্রতিষ্ঠানের একটু এদিক ওদিক হয় তো তোর চুলের মুঠি ধরে দুই গালের গোলাপে সত্যিকারের টিকের ছ্যাঁকা দিয়ে ছাড়বো।—বাব্বা! তুমি কম নও তো! ননদ হলে তোমাকে রায়-বাঘিনী বলা যেত।—সতীন কাঁটা বিষম কাঁটা, ননদের চেয়ে বেশি।

গেল কিছুদিন। ক্রমশঃ রাজমোহিনীর হাতে রান্না, ভাঁড়ার, বাজারের একচ্ছত্র আধিপত্য এসে

পড়ল।—দীপা, আমাকে একটু দেখিয়ে দিবি রে, তোদের আধুনিক রান্নার তো আমি কিছুই জানি নে।—কী হবে দিদি, আপনার দাদাশ্বশুর তো ওসব কিছুই খান না। তিনি খাঁটি বামুনপণ্ডিতের মতই বৈদ্যপণ্ডিত।—তা বলে তোরাও খাবি নে? গীতা পড়েননি দিদি, যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত-দেবেতরো জনঃ। উনি তো শ্রেষ্ঠ বটেন।—তাই তো রে, বুড়ো তোদের শুধু যৌবনে যোগিনী সাজিয়ে ছাড়ল। তা নিরিমিষিতে নানা রকমের রান্না আছে, একটু বলে টলে দিস।—দিদি, ওসব তো আপনার কাছেই আমরা শিখব। আপনার চেয়ে ভাল রান্না আমরা কি রাঁধতে জানি?

কয়েক বছর যায়। রক্তিমা ভালভাবে পাশ করে এক দেশীয় রাজার প্রৌঢ়া রানীজীর সঙ্গিনী হয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেল। সে বাপের-বাড়ি শ্বশুরবাড়ির টাকা আর নেবে না। রজতকে বহু অনুনয় করে চিঠি লিখে দিল বিবাহ করতে। রণজিৎকে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে চিঠি লিখে দিল। একখানা ঘর খালি হল। দীপা বলল,—আমার শোবার ঘর নেই দিদি, ওঁর ঘর তো প্রায় বৈঠকখানা। এ ঘরখানা আমি নেব।—আর তোর কত্তা কি ঐ বৈঠক-খানায় একা পড়ে থাকবে?—আপনি যদি কিছু মনে না করেন—, —ও, আমার জন্যে? আমি তো কানা কালা মানুষ, আমাকে তোর ভয় করতে হবে না। আমি নিজের হাতে তোদের ঘর গুছিয়ে সাজিয়ে দেব, চল।—যা ভাবছেন, তা নয় দিদি, আমিও এক দাদাশ্বশুরেরই সেবা করছি।—সে কী রে, তুই বলিস কী? বুড়ো তোকে একটু সোহাগ-টোহাগও করে না? দীপা ম্লান মুখে হাসল। —করতে দিই না দিদি। একেই তো ঐ বুড়ো মানুষ, রোগা মানুষ, অত কবিত্ব সইবে কেন?—তা বলে তুই—, —ছেড়ে দিন দিদি, আমি রক্তিমার কথা ভাবছি। ও না আবার কোনো দুষ্টু রাজার কবলে পড়ে যায়। শুনেছি, রানীজীর বর ভাল হলেও দেবরটা নাকি তেমন ভাল নয়।—যার যার ভাবনা, তাকেই ভাবতে দে, তুই নিজের ভাবনা ভাব। হ্যাঁরে, তোর কথা শুনে আমার যে মনে বড় ব্যথা হচ্ছে, বুড়ো মরে গেলে তুই থাকবি কী নিয়ে? একটা ছেলেপিলে হবে না?—আপনি আছেন কী নিয়ে দিদি, আমি আপনারই চেলী হব। রাজমোহিনী হেসে উঠলেন,—তুই আমার চেলী হবি? লাল চেলী, না ময়ূরকণ্ঠী?—সে চেলী নয় দিদি, চ্যালার স্ত্রীলিঙ্গে চেলী। আমি আপনার শিষ্যা হব।—দিদিভাই, আমি একটা মস্ত গুরুমা হয়ে উঠিনি। আমার জীবন হচ্ছে ঘা-খাওয়া, পোড়-খাওয়া ব্যর্থ জীবন। তোমাকে আমি এ পথে আসতে দিচ্ছি না। কালকেই আমি দাদাশ্বশুরকে ডাক্তার দেখাব।

পরদিন দাদাশ্বশুরে নাতবৌতে রীতিমত ঝগড়া। ঝগড়ায় দুর্গানাথ জিততে পারেন না কোনোদিন। রোগ না থাকলেও রোগী সাজতে হবে। হাওয়া খেতে হবে। ভাল ভাল খাবার, মাখন, দুধ দই ফলমূল খেতে হবে। বৌকে নিয়ে শহরের বাইরে বেড়াতে যেতে হবে অথবা নৌকোয় করে গঙ্গায়। অসাধারণ আবদার, আবদার তো নয় শাসন। ভীতু, শান্তচিত্ত দুর্গানাথের পক্ষে প্রতিরোধ করা অসাধ্য। যথা আজ্ঞা। ইতিমধ্যে রাজমোহিনী গোপনে কোথায় একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছেন পার্ট টাইম। কোন গৃহস্থদের বাড়িতে। চারজন লোকের একবেলাকার রান্নার চাকরি। স্বামী স্ত্রী, দুটি ছেলেমেয়ে। সাদাসিধে রান্না। গঙ্গাস্নানের নাম করে বেরিয়ে যান, ফেরেন দেরি করে। প্রশ্ন করতে বাড়িতে সাহস নেই কারো। দীপা সন্ধান নেয়। মুখ ফুটে বলতে পারে না সাহস করে। স্বজাতির ঘরে রান্নার কাজ, ঘটকালির কাজ, শেলাই শেখানো, এমন কী ঘুঁটে দিয়ে ঘুঁটেওয়ালী-দের কাছে পাইকারি দরে বেচা, তা ছাড়া আবার সুপুরি কুচিয়ে পানের দোকানে বেচা, বড়ি দেওয়া, মুড়কি বানানো, কত কী? ক্রমে দেখা গেল রাজমোহিনী একখানা ঘর ভাড়া করেছেন অন্য পাড়ায়। সেখানে গিয়ে ঐ নানা ধরনের কাজ করা হয়। মুড়িমুড়কি, চিঁড়েভাজা, ফুলুরী বেগুনী আলুর দম তৈরি করে দোকানে দোকানে দেওয়া। ক্রমে দেখা গেল দুজন সহকারিণী জুটেছে।

অবশেষে দীপা সইতে না পেরে একদিন দুর্গানাথকে সব বলল। দুর্গানাথ বললেন,—উনি যখন গোপনে আমাদের আড়াল করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করছেন, তখন আমাদের দরকার কী আড়াল ভেঙে দেবার? ওঁর যা খুশি, তা-ই করুন। যতদিন শক্তি আছে।—দেহে কুলোবে কেন? —এখন কথা বলতে গেলেই ঝগড়া বেধে যাবে। ওঁর সঙ্গে ঝগড়াকে আমি বড় ভয় করি। এদিকে রাজমোহিনীর ভাব ভাষা কথাবার্তা ক্রমশ গ্রাম্য পর্যায়ে উঠছে।—কী লো মাগি, এখন পর্যন্ত যে একটি ছেলে কি মেয়ে উঠল না কোলে, বাঁজা হয়ে রইলি, খ্যাঁদা প্যাঁচা কালো কুট্‌কুটেও একটা ছেলে বিয়োতে পারলি নে? দীপা মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসে।—ও হাসি আমি শুনব না, নির্বংশ হয়ে মরতে পারব না, মরতে দেব না। দে আমাকে একটা ছেলে এনে, সেটাকে দেখে মরি।—আমার ছেলে দিয়ে আপনার বংশরক্ষা হবে?—তা আর কী করি বল্‌, নাই-মামার চেয়ে কানামামা ভাল।—আমার ছেলে হবে না দিদি।—না, হবে না, বলেছে তোকে। কেমন না হয় দেখে নেব তো। চল আমার সঙ্গে ডাক্তারখানায়।—আর ডাক্তার দেখাতে হবে না দিদি, আমার স্বাস্থ্য কিছু খারাপ নয়। —তবে? —দীপা চুপ করে থাকে।—ও, বুঝেছি, লীলা বেঁচে থাকলে ঝাঁটাপেটা করত বুড়োকে। বুড়োর বড় বাড় বেড়েছে। আমার লাজলজ্জা আর রাখল না। রও, আসুক আগে।—না না দিদি, ওঁকে আপনি কিছু বলবেন না।—কেন রে, এত ভয়টা কিসের? ছারছার করে শুনিয়ে দেব না দশ কথা? —না না, দিদি, আপনার পায়ে পড়ি। রাজমোহিনী ছটফট করেন। দীপা রাত্রে স্বামীকে বলে, —দেখো, মনে হয় দিদির মাথা খারাপ হয়েছে।—কেন?—আমাদের ছেলে না হলে নাকি ওঁর বংশ-রক্ষা হবে না।—ও, তাই বুঝি? একটু পরে,—ওঁর মাথায় একটু ছিট আছে বটে। তা ওঁকে আমি ছেলে এনে দেব। একটা নয়, তিনটে।—সে কি, তিনটে ছেলে, সে আবার কোথাকার?—বলছি। দেখ, এখানে আমার এক অনুগত ভক্ত আছে। শুনে রেখো, আমার মতো সাধারণ মানুষেরও আবার ভক্ত থাকে! তা, সেই চন্দ্রচূড় নন্দী, জাতে তিলি, দেশে মড়ক হয়ে সব মরে ঝরে গেল, কাশীবাস করতে এসেছিল। এক স্বজাতির মেয়ে পেয়ে গেল, অনাথা, বাপ নেই, মা বিয়ে দিতে চায়, তেমন পাত্রও জোটে না, টাকাপয়সাও নেই হাতে, তাই বিয়ে দিতে আর পারে না। সেই চোদ্দ বছরের মেয়েকে বিয়ে করে ঘর বাঁধল পঞ্চান্ন বছর বয়সে। সেই মেয়েটি তিনটি ছেলে রেখে পরশু সকালে মারা গেছে হাসপাতালে। একটি চার বছরের, একটি দু-বছরের, আরেকটি ছয় মাসের। শাশুড়ী গেছে বদরীনারায়ণ। ফিরতে দেরি। কী আতান্তরে পড়েছে চন্দ্রচূড়, বলে,—বাবা, আপনি রক্ষে করুন।—আরে, আমি রক্ষে করব কী করে, আমি কি শিব? সে কথা শোনে কে?—ওর টাকা পয়সা আছে তো?—তা থাকলে কি আর ওকথা বলে? ওর মনে নাকি এখন বৈরাগ্য এসেছে। যাবে অযোধ্যায়, এক রামাইৎ সাধুর চেলা হয়ে থাকবে সেখানে। ছেলে তিনটেকে এখন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়।—কোনো রোগ-টোগ নেই তো?—রোগ-টোগ? না তো, দিব্যি ফুটফুটে ছেলে-গুলো।—রক্তিমা থাকলে একটাকে নিতে বেশ পারত।—হ্যাঁ, ভাল কথা, রক্তিমার খবর কী বলো তো? চিঠিপত্র লেখে? রণজিৎ জিজ্ঞাসা করছিল।—উনি বুঝি ভুলতে পারেন নি ওকে? হ্যাঁ, চিঠি এসেছে বই কী, তবে এক মাস আগে। লিখেছে, বেশ ভাল আছে। রানীজী বড় সাবধানী, বড় হুঁশিয়ার, ওকে পর্দায় ঘিরে রাখেন। খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা। পুরুষ চাকর বামুন পর্যন্ত এ মহলে আসা নিষেধ। কেবল রাজাবাহাদুর আসবেন। তা লিখেছে, রাজা খুব ভাল, দেখতে শিবের মতো। ওর কাজ রানীজীর কাছে কাছে থাকা, তাঁর যত ফায়টা ফরমাসটা খাটা, আর সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়ে তার হিন্দীতে টীকা ব্যাখ্যা করে শোনানো। আবার উপনিষদ, গীতা এসবও পড়তে হবে আলাদা করে রাজামশায়ের কাছে বসে। ওঁরা দুজনেই খুব শাস্ত্রচর্চা করেন। বয়স হয়েছে ওঁদের, ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, বিয়ে হয়েছে, আলাদা মহলে থাকে। এঁরা দুটিতে নিরিবিলি থাকেন

শাস্ত্রচর্চা নিয়ে। রক্তিমাকে মেয়ের মতোই দেখেন। অন্য মহলে যেতে দেন না। রক্তিমার সঙ্গে কারো দেখা হয় না। সে একরকম জেলখানায় আছে বলতে পারা যায়। লিখেছে, মাঝে মাঝে প্রাণটা হাঁফিয়ে ওঠে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। রানীজী ওকে পাতিব্রাত্য, নারীধর্ম এইসব নিয়ে উপদেশ দেন। রণজিৎকে চিঠিপত্র লিখতে বলেন। ও চুপ করে থাকে, এতে তিনি একটু বিরক্ত হন।—বেচারা রণজিৎ স্ত্রীকে ভালবেসে ফেলেছে। সে ওকে পেতে চায়। বলছে, যাবে একবার সেই রাজামশায়ের কাছে, স্ত্রীর নামে নালিশ জানাতে। হয়তো একটা চাকরিও চেয়ে বসবে।—ওঁর তো টাকার অভাব নেই।—ঐ রক্তিমার জন্যেই যাবে আর কী! চাকরি পেলে রক্তিমার খোঁজখবর নিতে পারবে।—তা ছেলেগুলিকে তুমি আনবে নাকি?—মনে করছি তো। এখন, তোমার কী মত?—তোমার মতেই আমার মত।—তাহলে কালকেই নিয়ে আসব।

পরের দিন। এ কী রে, দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছিস? এ জোগাড় করলি কোথা থেকে? দীপা সব বলল। রাজমোহিনী বললেন,—নিঃস্বার্থ পরোপকার করতে চাও, করো, কিন্তু সব গাছের জোড় কলম সব গাছে লাগে না জেনো। এরা তোমার কোনো কাজেই আসবে না।—নিজের ছেলেই কি সব সময় আপন হয় দিদি? কত কুলাঙ্গার জন্মায়।—এই, তোদের নাম কী রে?—আমান্নাম গণু, এ লনু, এ ধনু। দুর্গানাথ এলেন।—এরা হচ্ছে গণেশ, রণেশ আর ধনেশ; চন্দ্রচূড়ের তিন ছেলে। দেখতে কেমন সুন্দর, দেখেছ রাজু? আর কেমন শান্ত?—তোদের বাবা মা কোথায়?—মা মলে গেতে, বাবা তলে গেতে। কাঁদো-কাঁদো মুখে বড় ছেলেটি বলল।—যতো সব যন্ত্রণা জোটাতে পার। —নিজের হলে কী হত?—নিজের হলে তো বাঁচতাম। না হয় দাদাশ্বশুরের ছেলে খুড়শ্বশুরকে আমিই মানুষ করতাম।—এখনো তা-ই করো। এখন আমরাই তো বাবা মা। গজর গজর করতে করতে রাজমোহিনী বললেন,—যতো সব জঞ্জাল ঘাড়ে এনে চাপালে তো! নিজের তো করতে হবে না কিছু। —কেন হবে না? এসো, ভাগাভাগি করা যাক। গণু আমার ভাগে, রণু তোমার ভাগে, ধনু দীপার ভাগে। কেমন দীপা?—ঐ বাচ্চাটা কী খেয়ে বাঁচবে?—ফুড এনেছি, বোতল আছে।—আমার তো ওসব নিয়ে থাকলেই চলবে না, অন্য কাজ আছে। আমার কাজ কে করছে?—আপনি ভাবছেন কেন দিদি, আমিই সবকটাকে সামলাতে পারব। দীপা বলে।—হ্যাঁ, এখন থেকে অভ্যেস করে রাখ্, যদি নিজের কপালে কোনোকালে জোটে, এই শিক্ষা তখন কাজে লাগবে।

শরৎসাহিত্যের অনুবাদ-প্রসঙ্গ

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার

শরৎচন্দ্রের ভারতে বিস্তার ও জগতে প্রচার আজকের আন্তর্জাতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই মনে আসে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস একাধিকবার অনূদিত হয়েছে। গুজরাতী ও হিন্দী এ বিষয়ে পুরোধা উত্তর ভারতে, আর দক্ষিণে কন্নাড় ও তেলুগু। অসমিয়া ও ওড়িয়াতে অনুবাদ অকিঞ্চিৎকর। ঘরের কাছে এ দুটি ভাষাতে যে আরো বেশী অনুবাদ হয়নি তার কারণ, এই দুই ভাষার শিক্ষিত জন মূল বাংলা থেকেই রসাস্বাদ করে থাকতেন। আজ অবশ্য নূতন করে অনুবাদের অবকাশ আছে এবং সাম্প্রতিক প্রকাশনাই তার প্রমাণ।

শরৎচন্দ্রের তিরোভাবের আগে এবং পরেও বিশ বছর তিনি ছিলেন হিন্দী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখকের সারিতে। ১৯৬২ পর্যন্ত এক হিসেবে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে প্রথম স্থান "বিরাজ বৌ" ও "পল্লীসমাজ"-এর (প্রতিটির ৯ খানা অনুবাদ); তারপর "বিপ্রদাস", "পরিণীতা", "শেষের পরিচয়", "শ্রীকান্ত" ও "শুভদা" (প্রতিটি ৭ খানা করে); "বিন্দুর ছেলে", "দেবদাস", "নিষ্কৃতি", "পণ্ডিতমশাই", "পথের দাবী", "শেষ প্রশ্ন" (প্রতিটি ৬ খানা করে); "দত্তা" ও "চরিত্রহীন" (প্রতিটি ৫); "অরক্ষণীয়া", "গৃহদাহ" ও "স্বামী" (প্রতিটি ৪)। এই পনেরো বছরে আরো অনুবাদ হয়েছে। হিন্দীর সাথে অথবা আগে আগেই চলত গুজরাতী; মহাত্মা গান্ধীর সচিব মহাদেব দেশাই ও বন্ধু নরহরি পারিখ গুজরাতে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ ঘটান। শেষোক্ত দুজন অনুবাদ করেন "বিরাজ বৌ", "বিন্দুর ছেলে", "রামের সুমতি" ও "মেজদিদি"। গুজরাতীরা শরৎচন্দ্রকে নিজেদের লেখক বলেই মনে করতেন। একই বছরে তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিভিন্ন নামে অনুবাদ হয়েছে। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র, গ্রামীণ জীবন ও পারিবারিক স্নেহমমতার আলেখ্য গুজরাতী সাহিত্যকে অপরিসীম প্রভাবিত করেছে। শরৎ-সাহিত্যের অনুকরণে ও প্রভাবে অনেক লেখা হয়েছে।

দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে কন্নাড়ে শরৎচন্দ্রের প্রভাব সর্বাধিক মনে হয়। এখনও ওখানকার সাহিত্য খানিকটা সনাতনপন্থী এবং সাধারণ মানুষের কাছে শরৎচন্দ্র ও তাঁর চরিত্ররা জীবন্ত। তেলুগু ভাষা ছিল আরও প্রাচীনপন্থী। শরৎচন্দ্রের প্রভাবে ঐ ভাষার মেজাজ ও রাজ-রাজড়াজাতীয় চরিত্ররা বেশ নাড়া খেয়েছিল। অনুবাদও অনেক হয়েছিল, সব যে সার্থক সে কথা অবশ্য বলা যায় না। তামিল শরৎচন্দ্রকে অনেকখানি নিলেও এদের ভাষার গঠন ও সাহিত্যের প্রয়াস মূলত সংস্কৃতের বিরুদ্ধে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার। তাই বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তথা হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্যের প্রেরণা নিয়ে শুরু করলেও পুনর্জাগরণের প্লাবনে শরৎচন্দ্রের প্রভাব সীমিত হয়ে রইল। ওঁর প্রভাব মনে হয় সবচেয়ে কম মালয়ালম সাহিত্যে। কেরলে উপন্যাস রচনার ঐতিহ্য আর একটু পুরনো, তাই বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় ওখানে পথনির্দেশ করেছিলেন, শরৎচন্দ্র পারেননি।

ভারতের বাইরে রুশ ভাষায় "গৃহদাহ", চার পর্ব "শ্রীকান্ত" ও দুটি ছোট গল্প; ইতালীয় ভাষায়. "শ্রীকান্ত" (সম্ভবত প্রথম পর্ব) এবং ইংরেজীতে সাতখানি ছোট-বড় উপন্যাস অনূদিত হয়েছে বলে জানা গেছে। নীচে বর্ণানুক্রমিকভাবে শরৎবাবুর লেখা সাজিয়ে দিলাম। তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, কেননা অনেক অনুবাদকে নামবৈষম্যের জন্য মূলের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারিনি।

তবে নামগুলি খুঁটিয়ে দেখলে বিভিন্ন ভাষার ঝোঁক ও মেজাজ বোঝা যাবে। যেসব বাংলা নাম অনুবাদে কঠিন বা কষ্টকল্পিত মনে হবে সেখানে অনুবাদক পাত্রপাত্রীদের মধ্য থেকে প্রিয় নামটি চয়ন করেছেন। এক-একজনের এক-একটি প্রিয়, তাই চয়নে বিভিন্নতা।

১ অনুপমার প্রেম : কন্নাড় (অনুপমেয় পত্র, অনুপমেয় প্রেম), গুজরাতী (অনুপমা), তামিল (অনুপমা ২), হিন্দী (অনুপমাকা প্রেম)

২ অনুরাধা : কন্নাড় (অনুরাধা ২, মালতা অনুরাধা), গুজরাতী (অনুরাধা ৪, অনুরাধা আনে বিজি ত্রাণ নওয়ালকথাও), তামিল ২, তেলুগু ২, মারাঠী, মালয়ালম ২, হিন্দী ২

৩ অন্নপূর্ণার মন্দির : কন্নাড় (দুর্গামন্দির)

৪ অভাগীর স্বর্গ : ইংরেজী, কন্নাড় (অভাগিনী, অভাগিনিয়া স্বর্গারোহণ ২), গুজরাতী (অভাগীনু স্বর্গ), মারাঠী (অভাগিনীচা স্বর্গ), হিন্দী (অভাগী কা স্বর্গ)

৫ অরক্ষণীয়া : উর্দু (গরীব কি দুনিয়া), কন্নাড় (অরক্ষণীয়া, অরক্ষিতা), গুজরাতী (অরক্ষণীয়া, দুর্গা, জ্ঞানদা—শেষ দুটি নববিধান ও মেজদিদিসহ একত্রে অনূদিত গল্প-গ্রন্থ), তামিল (মাদার অব ডটার), তেলুগু ২, মারাঠী, হিন্দী (অরক্ষণীয়া ৫, কুসুম)

৬ আঁধারে আলো : ইংরেজী, কন্নাড় (চঞ্চলা, চঞ্চলে), গুজরাতী (রাধারানী), রাশিয়ান, হিন্দী (অন্ধকার মে আলোক)

৭ আলো ও ছায়া : তামিল, হিন্দী (প্রকাশ অর ছায়া)

৮ একাদশী বৈরাগী : কন্নাড় (একাদশী বৈরাগী, বৈরাগী), হিন্দী (একাদশী বৈরাগী, বৈরাগী ৩)

৯ কাশীনাথ : কন্নাড় (কাশীনাথ, কাশীনাথ বৃন্দাবন), গুজরাতী (কাশীনাথ, কাশী আনে বিজি বাতো, কাশীনাথ আনে বিজিতুংকী বাতো), তামিল (কাশীনাথন ২), তেলুগু মারাঠী ২, মালয়ালম (কাশীনাথন), হিন্দী ২

১০ গৃহদাহ : ইংরেজী (দি ফায়ার), উর্দু (খামমান বরবাদ, মঞ্জিল), কন্নাড় (আরাগিন মানে, গৃহদাহ), গুজরাতী (অচলা, গৃহদাহ ৪, মঞ্জিল), তামিল (অচলা, গৃহদাহম), তেলুগু (গৃহদহনম), মারাঠী (গৃহদাহ-পুরবধ), রাশিয়ান (সোজেন্নাই ডোম ২), লিথুয়ানিয়ান (সুদেগিনটি নামাই), হিন্দী ৪

১১ চন্দ্রনাথ : অসমিয়া, ইংরেজী (কুইনস গ্যাম্বিট), কন্নাড় (চন্দ্রনাথ ২, পরিত্যক্তে), গুজরাতী ৩, তেলুগু, মারাঠী, মালয়ালম (চন্দ্রনাথন), হিন্দী (চন্দ্রনাথ ৩, চন্দ্রনাথ ওয়া অন্য কহানিয়া,—এই গল্পগুচ্ছে আরও আছে মহেশ এবং অভাগীকা স্বর্গ)

১২ চরিত্রহীন : ইংরেজী, উর্দু (আওয়ারা), ওড়িয়া, কন্নাড় (চরিত্রহীন ৩, প্রেমযোগিনী), গুজরাতী (কিরণময়ী, কুলবতী ২, চরিত্রহীন ২, প্রণয়পঙ্ক, রূপমাধুরী ২), তামিল (সাবিত্রী), তেলুগু (চরিত্রহীনুলু ২), পাঞ্জাবী (আওয়ারা), মারাঠী ২, মালয়ালম (সতীশচন্দ্রণ), হিন্দী ৬

১৩ ছবি : ইংরেজী, কন্নাড় (ভাবচিত্র, ছবি), গুজরাতী ২, হিন্দী (তসবীর)

১৪ ছেলেবেলাকার গল্প : কান্নড় (বাল্যাদা কথেগলি), গুজরাতী (শরদবাবুনি বালাবাতো)

১৫ দত্তা (নাট্যরূপ বিজয়া) : অসমিয়া ,ইংরেজী (দি বিট্রথড), উর্দু ২, ওড়িয়া, কন্নাড় (দত্তা ২, বিজয়া), গুজরাতী (দত্তা ৪, বিজয়া, শ্রীমতী বিজয়া), তামিল (জমিনদারিণী, পল্লীনাটপু), মারাঠী (বিজয়া ২), মালয়ালম (নরেন্দ্রবাবু, বিজয়া), হিন্দী (দত্তা ৪, বিজয়া ২)

১৬ দর্পচূর্ণ : কন্নাড় (দর্পচূর্ণ ২, গর্বভঙ্গ), তেলুগু (গর্বভঙ্গন), মারাঠী, মালয়ালম (এণ্ডে তরটয়ু, দর্পচূর্ণম), হিন্দী (দর্পচূর্ণ, অভিমানিনী)

১৭ দেনাপাওনা (নাট্যরূপ ষোড়শী) : উর্দু (আওরত), কন্নাড় (ভৈরবী, ষোড়শী), গুজরাতী (ভৈরবী, লেনদেন, অলকা—এটি নাট্যরূপ), তামিল (ভৈরবী ২, টুনাই—এটি নাট্যরূপ), মারাঠী (ভৈরবী), মালয়ালম (ভৈরবী), হিন্দী (দেনাপাওনা ২, লেনদেন ৩, ষোড়শী)

১৮ দেবদাস : অসমিয়া, ওড়িয়া, কন্নাড়, গুজরাতী (চাঁদমুখ, দেবদাস ৬, পারু), তামিল, তেলুগু (দেবদাস, দেবদাসু, দেবদাস নাটক), মারাঠী (দেবদাস ২, দেবদাস আনি বিন্দু চেমাই), মালয়ালম (দেবদাস, দেবদাসন), সিংহলী, হিন্দী ৭

১৯ নববিধান : উর্দু (প্রায়শ্চিত), কন্নাড় (নববিধান, হোস বাড়ুক), গুজরাতী (নববিধান, সোয়াকি মা, বিমাতা), তামিল (উষা), তেলুগু, মারাঠী, হিন্দী (নববিধান ২, নয়া বিধান)

২০ নারীর মূল্য : কন্নাড় (হেপ্পিয় স্থান মান), গুজরাতী (নারীনু মূল্য), হিন্দী নারী কা মূল্য ২)

২১ নিষ্কৃতি : ইংরেজী (দি ডেলিভারেন্স), উর্দু (শিকস্ত), কন্নাড় (নিষ্কৃতি), গুজরাতী (উদ্ধার, ডেরানি জেঠানি, ত্রাণ বসাও, সিদ্ধেশ্বরী, ছুটকারো, নানি বহু), তামিল (শৈলজা, টুরা উল্লম), তেলুগু (নিষ্কৃতি ২), মারাঠী, মালয়ালম (মাধুরী, তরাওয়া টাম্মা), হিন্দী (ছুটকারা ৪, নিষ্কৃতি, উদ্ধার)

২২ পণ্ডিতমশাই : উর্দু (পণ্ডিতজী, সমাজ কদর), ওড়িয়া (শিক্ষক মহাশয়), কন্নাড় (বৃন্দাবন), গুজরাতী (পণ্ডিতজী ২, জীবনযাত্রা, মহাজ্ঞানী, বৃন্দাবন), তামিল (কুসুম, পায়াল কোয়ানটালু), তেলুগু (পনটালু গারু), মারাঠী (পণ্ডিত মহাশয়), হিন্দী (কুসুম, পণ্ডিতজী ৫, বুশবু—চিত্রনাট্য)

২৩ পথনির্দেশ : অসমীয়া, কন্নাড়, (পথী, প্রেমপথ), গুজরাতী (হেমা বহেন), তেলুগু (তিরানিকোরি কালু), মারাঠী, মালয়ালম (হেমা), হিন্দী

২৪ পথের দাবী : ওড়িয়া (চলা পথের দাবী), কন্নাড় (অধিকার), গুজরাতী (অপূর্ব-ভারতী, পথের দাবী ৩), তামিল (ভারতী ৩), তেলুগু (ভারতী), মারাঠী (ভারতী, সাব্যসাচী), হিন্দী (অধিকার, পথ কে দাবীদার ৫)

২৫ পরিণীতা : অসমিয়া, ওড়িয়া, কন্নাড় (গুরুচরণ ২, পরিণীতা, মঙ্গলসূত্র), গুজরাতী (পরিণীতা ২, বিবাহিতা), তামিল (ললিতা), তেলুগু ২, মারাঠী ২, মালয়ালম, পরিণীতা, ললিতা ২, আওরল বিবাহিা য়ান্দু), হিন্দী ৮

২৬ পরেশ : কন্নাড়, গুজরাতী, মারাঠী, মালয়ালম, হিন্দী

২৭ পল্লীসমাজ (নাট্যরূপ রমা) : উর্দু (দিহাতী সমাজ), কন্নাড় (কর্মভূমি, বিশ্বেশ্বরী, পল্লীয় সমাজ, ভূমতে মাট্টু মনিরা), গুজরাতী (পল্লীসমাজ ২, রমা, রমা-রমেশ, আনবধাপো অথবা গামদীয়ো সমাজ), তামিল (গ্রাম সমাজম, রমা), তেলুগু (পল্লীরুলু, রমা), মারাঠী (গামোয়া গঙ্গা), মালয়ালম (গ্রাম সমাজম), সিংহলী গাবী সবাজয়), রবা), বারাঠী (গামোয়া গঙ্গা), মালয়ালম (গ্রাম সমাজম), সিংহলী গামী সমাজয়), হিন্দী (গ্রামীণ সমাজ, দেহাতী দুনিয়া ২, দেহাতী সমাজ ৪, রমা, সমাজকে অত্যাচার ২)

২৮ বড় দিদি : উর্দু (বড়ী দিদি), কন্নাড় (আক্কাজি), গুজরাতী (অভিমান, বড়ী দিদি, বড় দিদি, মোটি বহেন), তামিল (রাজিককুপ্পাজি), তেলুগু (বড় দিদি, বড়ী বহনী), মারাঠী (মাধবী ২), মালয়ালম (ওয়াল্লিয়ে তাট্টি), হিন্দী (বড়ী দিদি ৬, বড়ী বহেন)

২৯ বামুনের মেয়ে : উর্দু (ব্রাহ্মণ কি বেটী), কন্নাড় ব্রাহ্মণার হুড়ুগি), গুজরাতী (বিপ্র-কন্যা, বামন নি দিকারী), তামিল (সন্ধ্যা ২), তেলুগু ব্রাহ্মণ পিল্লা ২), মারাঠী ব্রাহ্মণা চি মুলগি), মালয়ালম (ব্রাহ্মণ পুত্রী), হিন্দী (ব্রাহ্মণ কী বেটী ২)

৩০ বাল্যস্মৃতি : তেলুগু, মারাঠী, হিন্দী (বচপন কী কহানিয়াঁ ৩), বাল্যস্মৃতি)

৩১ বিন্দুর ছেলে : কন্নাড় (বিন্দুবাসিনীয় মাগ), গুজরাতী (নানি বহু, বিন্দু ২, বিন্দুনো কিকো, ছোটি মা, শরৎবাবুনি প্রাণ বার্তাও—এটি রামের সুমতি ও মেজদিদিসহ গল্পগুচ্ছ), তেলুগু (বিন্দুগারি আব্বাই), মালয়ালম (প্রেমসাগরম ২), হিন্দী (বিন্দু-বাসিনী, বিন্দো কা মালা, বিন্দো কী লালা ২, বিন্দু কা বেটা, বিন্দো কা লড়কা, ছোটি মাঁ ৩)

৩২ বিপ্রদাস : কন্নাড়, গুজরাতী ২, টামিল, তেলুগু ২ (বিপ্রদাস, বিপ্রদাসু), মারাঠী ২, মালয়ালম (প্রেমপরিণাম অথবা বিপ্রদাস), হিন্দী ৮)

৩৩ বিরাজ বৌ : অসমিয়া, উর্দু (বিরাজ বহু), ওড়িয়া (বিরাজ বহু), কন্নাড় (সতী বিরাজ, গৃহদেবী, কুলবধূ), গুজরাতী (বিরাজ বহু ৪, বিরাজ বৌ), তেলুগু (সুশীলা, বিরাজ বহু ২), পাঞ্জাবী (বিরাজ বহু), মারাঠী (বিরাজ বহিনী), মালয়ালম (বিরাজ বহু), হিন্দী (বিরাজ বহু ১০, বিরাজ বহু—বচপন কী কহানিয়াঁ, বিরাজ)

৩৪ বিলাসী : ইংরেজী, কন্নাড়, তেলুগু (বিলাসী, বিলাসিনী), মারাঠী (বিলাসিনী), হিন্দী

৩৫ বৈকুণ্ঠের উইল : কন্নাড় (বৈকুণ্ঠন মৃত্যুপত্র, বৈকুণ্ঠন উইলু), গুজরাতী সওয়াকি মা—এটি গল্পগুচ্ছ অনুপমা ও বামুনের মেয়েসহ, পিতানো ওয়ারাসো, বৈকুণ্ঠনু উইল), তামিল (বৈকুণ্ঠন উইল), মালয়ালম (বৈকুণ্ঠনতে মরণপত্রম, অচনতে ওস্যাত্তু), হিন্দী (বৈকুণ্ঠ তড়মপত্র)

৩৬ বোঝা : হিন্দী (বোঝ)

৩৭ মন্দির : কন্নাড়, তামিল (টেম্পল), হিন্দী

৩৮ মহেশ : ইংরেজী (দি ড্রাউট), কন্নাড়, মারাঠী, রাশিয়ান ২, হিন্দী

৩৯ মামলার ফল : কন্নাড়, হিন্দী (মুকদ্দমে কা নতীজা)

৪০ মেজদিদি : কন্নাড় (হেমাঙ্গিনী), টামিল (হেমা, হেমাঙ্গিনী ২), তেলুগু (চিন্নাক্কা), পাঞ্জাবী (মাঞ্ঝলী দিদি), মারাঠী (হেমাঙ্গিনী), মালয়ালম (কিসু), হিন্দী (মঝলা দিদি, মঝলী বহেন, মঝলী দিদি ২)

৪১ রামের সুমতি : ইংরেজী (দি কমপ্লায়ান্ট প্রডিগাল, রামের সুমতি), কন্নাড় সুমতি ৩, গুজরাতী, তামিল (মটানি, অনপু উল্লম, সিস্টার-ইন-ল), তেলুগু (রামাউনি বুদ্ধি-মানতু নিতানামু), মারাঠী (ছোটা ভাউই, সীমা), মালয়ালম (সুমতি ২), হিন্দী রামকি সুমতি, সুমতি, নটখট রামু, ভাবী কা পেয়ার, ছোটা ভাই ৪)

৪২ শরৎপত্রাবলী : হিন্দী

৪৩ শুভদা : কন্নাড়, গুজরাতী ৩, টামিল (মালতী), তেলুগু ৩, মারাঠী, হিন্দী ৭

৪৪ শেষ প্রশ্ন : উর্দু (সওয়াল), ওড়িয়া, কন্নাড়, গুজরাতী (কমলা কমলিনী, নবীনা অথবা শেষ প্রশ্ন, শেষ প্রশ্ন ২), তামিল (কমলা), তেলুগু ২, মারাঠী, মালয়ালম (তেট্টিদধরিক্কা পেট্টাওয়াই), হিন্দী ৭
৪৫ শেষের পরিচয় : গুজরাতী (শেষ পরিচয়, নওয়ি বহু, রেণুনি মা), তেলুগু (সবিতা ২), মারাঠী (আখেরচি ওলাখ, শেওয়াতচ পরিচয়), হিন্দী (শেষ কা পরিচয় ২, সবিতা ৪, সবিতা অথবা শেষ কা পরিচয়, অন্তিম পরিচয়)
৪৬ শ্রীকান্ত ১ম পর্ব : ইতালিয়ান, ইংরেজী (দি অটোবায়োগ্রাফি অব এ ওয়ান্ডারার), গুজরাতী (ইন্দ্রনাথ)
৪৭ শ্রীকান্ত (অংশবিশেষ) : ইংরেজী, কন্নাড় (রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্ত, শ্রীনাথ), তামিল (শ্রীকান্তন), তেলুগু, মারাঠী, মালয়ালম (শ্রীকান্তন, পিয়ারী, বিকৃতি), হিন্দী ৬
৪৮ শ্রীকান্ত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব : গুজরাতী ২, মারাঠী রাশিয়ান, হিন্দী ২
৪৯ সতী : কন্নাড় (মহাসতী, নির্মলা), গুজরাতী, মারাঠী, মালয়ালম, হিন্দী
৫০ স্বদেশ ও সাহিত্য : কন্নাড় (সাহিত্য ব্যাসঙ্গ), গুজরাতী (শরদ-বাণী)
৫১ স্বামী : উর্দু (সপেরান), কন্নাড় ২, গুজরাতী (পতিমন্দির, স্বামী ৩), তামিল (সৌদামিনী), তেলুগু, মারাঠী (স্বামী, সৌদামিনী), মালয়ালম (সৌদা), হিন্দী ৪
৫২ হরিচরণ : মারাঠী, হিন্দী
৫৩ হরিলক্ষ্মী : কন্নাড়, তামিল, তেলুগু, মারাঠী, মালয়ালম, হিন্দী

পাদটীকায় বলি, যেখানে আলাদা করে নাম নেই সেখানে মূলের নামই অনুবাদে রাখা হয়েছে এবং যেখানে একাধিক অনুবাদ এক নামে হয়েছে সেখানে সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে। শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাস ও ছোট গল্প অনূদিত হয়েছে। প্রকাশের সময় অনুযায়ী সাজিয়ে এই ২৫খানাকে ধরা হয় উপন্যাস : বড়দিদি (১৯১৩), বিরাজ বৌ, পরিণীতা ও পণ্ডিতমশাই (১৯১৪), পল্লী-সমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল ও অরক্ষণীয়া (১৯১৬), শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, দেবদাস, নিষ্কৃতি ও চরিত্রহীন (১৯১৭), দত্তা ও শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (১৯১৮), গৃহদাহ ও বামুনের মেয়ে (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), নববিধান (১৯২৪), পথের দাবী (১৯২৬), শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (১৯২৭), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (১৯৩৩), বিপ্রদাস (১৯৩৫), শুভদা (১৯৩৮) এবং শেষের পরিচয় (শেষার্ধ রাধারানী দেবী রচিত) (১৯৩৯)। প্রবন্ধ বা স্মৃতিমূলক রচনা অনূদিত হয়েছে নারীর মূল্য (১৯২৪), স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২) এবং শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (১৯৪৮)। বাকী সব লেখাকে গল্প ধরা হয়, যদিও শ্রেণীবিভাগ সর্বসম্মত বলা যায় না। শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পই ছোট উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। গল্পগুচ্ছগুলিও প্রকাশনকাল অনুযায়ী সাজিয়ে দিই : বিন্দুর ছেলে (রামের সুমতি ও পথনির্দেশসহ) ১৯১৪, মেজদিদি (দর্পচূর্ণ ও আঁধারে আলোসহ) ১৯১৫, কাশীনাথ (আলো ও ছায়া, মন্দির, বোঝা, অনুপমার প্রেম বাল্যস্মৃতি ও হরিচরণসহ) ১৯১৭, স্বামী (একাদশী বৈরাগীসহ) ১৯১৮, ছবি (বিলাসী ও মামলার ফলসহ) ১৯২০, হরিলক্ষ্মী (মহেশ ও অভাগীর স্বর্গসহ) ১৯২৬, অনুরাধা, সতী ও পরেশ ১৯৩৪ এবং ছেলেবেলার গল্প ১৯৩৮। শরৎচন্দ্র নিজে তিনখানি উপন্যাসকেই নাট্যরূপ দিয়েছিলেন : দেনাপাওনা (ষোড়শী) ১৯২৭, পল্লীসমাজ (রমা) ১৯২৮, এবং দত্তা (বিজয়া) ১৯৩৪।

অনুবাদ সম্বন্ধে আর একটু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। বিদেশী ভাষায় শরৎ-চন্দ্রের প্রথম প্রকাশ স্বভাবতই ইংরেজীতে। ১৯২২ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও থিয়োডোসিয়া টম্পসন-এর যুগ্ম প্রয়াসের ফলে শ্রীকান্ত ১ম পর্ব। পরে ১৯৪৫ সালে ওটিই কিছু রদবদল করে ক্ষিতীশচন্দ্র সেন কাশী থেকে প্রকাশ করেন দি অটো-বায়োগ্রাফি অব এ ওয়ান্ডারার নামে। ১৯৪৪ সালে দিলীপকুমার রায়-অনূদিত দি ডেলিভারেন্স (নিষ্কৃতি) বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। এটির অনুবাদ কথাশিল্পীর মৃত্যুর পূর্বে ১৯৩৫ সালেই বোধ হয় শেষ হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ এটির কিছু সংশোধন করেছিলেন ও রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তারপর বহুদিন চুপচাপ, অনুবাদে আবার জোয়ার এল ষাটের দশকে।

কলকাতার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড রবিবাসরীয় সংখ্যায় পর্যায়ক্রমে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের টুকরো ইংরেজীতে ছাপতে লাগলেন। প্রথম ১২ই জুন ১৯৬০এ 'স্নেক চার্মার' নামে—শ্রীকান্ত ১ম পর্বের শাহজী ও অন্নদাদিদি অংশটুকু। তারপর ৪ জুন ১৯৬১ থেকে ২৯ অক্টোবর ১৯৬২ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ছাপা হয় : দি ইমমরালিস্ট, আয়রন নার্ভ, আপরুটিং দি হেরিডিটি, দি ওয়েডিং গেস্টস, হো হো দি ব্রেকার্স বোর্ড, এ গোস্টস স্টোরি, স্নেকস ভেনম্, আই স্যালুট দেম, শ্যালো অ্যাজ এ এলেগ্যুন এবং হি গাইনস ফর এ সেকেন্ড। ১৯৬০ সালেরটি ছাড়া সবকটিরই অনুবাদক উমানাথ ভট্টাচার্য। এর মধ্যে আয়রন নার্ভ শ্রীকান্ত ১ম পর্বের ইন্দ্রনাথ কাহিনীর রূপান্তর। বাকী-গুলি ঠিক ওঁর লেখনীপ্রসূত বলা যায় না। দি ইমমরালিস্ট সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে বলা চরিত্রহীনের নেপথ্যকাহিনী, আপরুটিং দি হেরিডিটি হল সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপ-কথন এবং বাকীগুলি গোপালচন্দ্র রায় সংকলিত 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প'-এর অনুবাদ।

বোম্বে থেকে ১৯৬২তে চরিত্রহীন, ১৯৬৮তে দিলীপ রায়ের দি ডেলিভারেন্স ও কমপ্লায়ান্ট প্রডিগাল (রামের সুমতি) এই দুটি নভেলেট নিয়ে মাদার্স অ্যান্ড সন্স এবং ১৯৬৯এ শচীন্দ্রলাল ঘোষ-অনূদিত কুইন্স গ্যাম্বিট (চন্দ্রনাথ) প্রকাশিত হল। এর আগেই কলকাতার শিল্পিসংস্থা শচীন্দ্র ঘোষকে দিয়ে দুটি বই অনুবাদ করালেন : দি বিট্রথড (দত্তা) এবং দি ফায়ার (গৃহদাহ)। দুটিই ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত। ১৯৭০ সালে নয়া দিল্লী থেকে সাহিত্য আকাদমি 'দি ড্রাউট অ্যান্ড আদার স্টোরীজ' নামে শশধর সিংহ-অনূদিত ছয়টি গল্প নিয়ে একটি বই ছাপালেন—অগ্রনামী গল্প মহেশ, তারপর বিলাসী (দি স্নেক চার্মার্স ডটার), আঁধারে আলো (এ গ্লীম অফ লাইট), রামের সুমতি (রামলালস কনভার্শন), ছবি (দি পোট্রেট) ও অভাগীর স্বর্গ (অভাগীস হেভন)। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল শ্রীকান্ত চারটি পর্বই ইংরেজীতে তর্জমা হয়, এখনও হল না।

তবে রাশিয়ান ভাষার দৌলতে সে ইচ্ছার মরণোত্তর পূরণ হয়েছে একথা বলতে পারি। ইনস্টিটুটে অফ এশিয়ান পীপলস ইন মস্কো ১৯৬০ সালে চার পর্বের অনুবাদ নিয়ে একক গ্রন্থ প্রকাশিত করেছে। এ ছাড়া ১৯৫৮ ও ১৯৭১ সালে গৃহদাহের দুটি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে : এরই মধ্যে রুশ অঙ্গরাজ্য লিথুয়ানিয়াতেও স্থানীয় ভাষায় গৃহদাহের এক সংস্করণ হয়েছে (১৯৬১)। ভারতীয় ছোট গল্পের রুশ সংকলনে শরৎচন্দ্রের মহেশ ও আঁধারে আলো স্থান পেয়েছে ও উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। অনুবাদের লিস্ট পূর্ণ করতে রইল ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে ইতালিয়ান ও ফরাসী এবং দেশের পাশে সিংহলী। শ্রীকান্ত ১ম পর্ব যেটি ইংরেজী মহলে শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচিতি ঘটাল, ডঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী ওটিকে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন (১৯৪২)। ফরাসী ভাষায় শরৎচন্দ্রের কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছে 'দাঁস লা উভর' নামে ডঃ তারাপদ বসুর হাতে ও প্যারিসের বাঙালী সমিতির উদ্যোগে। সিংহলী ভাষায় প্রকাশ সাম্প্রতিক : ১৯৬১ সালে গামি সমাজায় (পল্লীসমাজ) এবং ১৯৬৪ সালে দেবদাস। দুটিই কলম্বো থেকে প্রকাশিত এবং রুপালী পর্দায় কিছু ধরে।

অসমিয়া, ওড়িয়া, উর্দু ও পাঞ্জাবীতে শরৎচন্দ্রের অনুবাদ সীমিত। অসমিয়া ও ওড়িয়াতে

স্বাধীনতাপূর্ব যুগে কোন অনুবাদ নেই। কারণ সহজ, ওঁরা মূল বাংলায়ই রসাস্বাদন করতেন। অসমিয়া ভাষায় প্রথম অনুবাদ হয় ১৯৫১ সালে—দেবদাস বইটি। তারপর পরিণীতা ও বিরাজ বৌ (১৯৫৫), চন্দ্রনাথ (১৯৫৬) এবং দত্তা ও পথনির্দেশ (১৯৬৪)। সবশুদ্ধ ছয়খানা বই। প্রতিটি শিলং থেকে বী বী চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। ওড়িয়া ভাষায় প্রথম অনুবাদ হয় বিরাজ বহু ১৯৫২ সালে কটক থেকে। তারপর কটক থেকে চরিত্রহীন ও তাক্রাদা, জিলা গঞ্জাম থেকে দেবদাস বেরোতে দশ বছর কেটে গেল—১৯৬২। ১৯৬৪ সালে বহরমপুর (গঞ্জাম) থেকে বেরুল আর একটি অনুবাদ—পরিণীতা। ১৯৬৬তে কটক থেকে আর দুটি—চলাপথের দাবী (অনুবাদক মদনমোহন মিশ্র) ও শেষ প্রশ্ন এবং বহরমপুর থেকে শিক্ষক মহাশয় (পণ্ডিতমশাই)। বহরমপুর থেকে প্রকাশিত দুটি অনুবাদই শেখ কারিম-কৃত।

উর্দুতে প্রথম প্রকাশিত পাচ্ছি কলকাতা থেকে হরিদাসী নামে একটি গল্পগুচ্ছ; কোন্ কোন্ গল্প আছে সে বিবরণ জোগাড় করতে পারিনি। এর পর ১৯৪২ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত শিকস্ত (নিষ্কৃতি), দেহাতী সমাজ (পল্লীসমাজ) ও পণ্ডিতজী (পণ্ডিতমশাই)। তার লাহোর থেকেই অরক্ষণীয়ার দুটি অনুবাদ : ১৯৪৩ সালে বেকাস ও ১৯৪৪এ গরীব কি দুনিয়া। ১৯৪৪এ আরো প্রকাশিত হয় আওয়ারা (চরিত্রহীন), প্রায়শ্চিত্ত (নববিধান) ও সওয়াল (শেষ প্রশ্ন) লাহোর থেকে এবং খাম্মান বরবাদ (গৃহদাহ) দিল্লী থেকে। এর পর একেবারে ১৯৬০ সাল যখন দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় বড় দিদি, বিরাজ বহু এবং দেবদাস। পাঞ্জাবী (গুরুমুখী)-তে প্রথম অনূদিত হয় আওয়ারা (চরিত্রহীন) অমৃতসর থেকে, তারপর ১৯৬১ ও ৬২তে জলন্ধর থেকে যথাক্রমে বিরাজ বহু ও মাঝলি দিদি।

দক্ষিণ ভারতে শরৎচন্দ্রে উৎসাহ দেখানোর পুরোভাগে কর্ণাটক। কন্নাড় ভাষায় ওঁর যে বইখানি প্রথম অনূদিত হয় সেটি দেবদাস—১৯৩৯ সালে গুরুনাথ যোশীর অনুবাদ ধারওয়ার থেকে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৪টি কাহিনীর কন্নাড় সংস্করণ প্রকাশিত হয় : দর্পচূর্ণ (১৯৪৩), বড় দিদি, রামের সুমতি ও অনুরাধা (১৯৪৪), বৈকুণ্ঠের উইল, বিরাজ বৌ, ও দেনাপাওনা (১৯৪৫), মন্দির, কাশীনাথ, শ্রীকান্ত, স্বামী ও দত্তা (১৯৪৬) এবং অনুপমার প্রেম ও বিপ্রদাস (১৯৪৭)। ধারওয়ার ও মৈসুর থেকে অধিকাংশ প্রকাশ; গুরুনাথ যোশী ছাড়া এইচ কে বেদব্যাসাচার্য প্রধান অনুবাদক। আজ পর্যন্ত ৪৫টির মত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ অনূদিত হয়েছে, কয়েকটি একাধিক হওয়ায় মোট প্রকাশিত বই ৭৫এর উপর।

তারপর আসে তেলুগু যেটি কন্নাড়ের নিকটতম ভাষা। মোট ৩২টির মত রচনা অনূদিত হয়েছে, বইয়ের সংখ্যা ৫০এর উপরে। প্রথম প্রকাশ অরক্ষণীয়া ১৯২৯ সালে; তারপর সুশীলা বা বিরাজ বৌ ১৯৪৭ সালে, দুটিই রাজামন্দ্রি থেকে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত হিসাব নিতে গেলে : মেজ দিদি বা চিনাক্কা (১৯৪৯), বিন্দুর ছেলে (১৯৫০), অনুরাধা, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, পরিণীতা, পথনির্দেশ ও শেষ প্রশ্ন (১৯৫৪), বামুনের মেয়ে, দর্পচূর্ণ, দেবদাস, হরিলক্ষ্মী ও রমা (১৯৫৫) —মোট ১৩ খানা। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে বিজয়ওয়াড়া থেকে শরৎসাহিত্যম নামে ওঁর গ্রন্থাবলী ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়, অনুবাদক বোনডলপতি শিবরামকৃষ্ণণ। ইনি ছাড়া অনুবাদে বেশী করে হাত লাগিয়েছেন নীলকণ্ঠন ও গড্ডে লিঙ্গইয়া। বিজয়ওয়াড়া থেকে অধিকাংশ ও রাজমন্দ্রি থেকে কিছু কিছু প্রকাশ, মাদ্রাজ থেকে মাত্র একখানা।

অপর দুটি সমগোত্রীয় ভাষা তামিল ও মালয়ালম-এ অনুবাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। উভয় ভাষায়ই ২৫ খানার মত রচনা ও ৪০ খানার মত বই। তামিলে প্রথম প্রকাশ গৃহদাহ ১৯৪১ সালে মাদ্রাস থেকে—একটি গৃহদাহম নামে এ কে জয়রামনের অনুবাদ, অপরটি অচলা নামে আর

সম্মুখে সুন্দরমের অনুবাদ। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত হিসেব দিই : মেজ দিদি ও নববিধান (প্রথমটির দুটি অনুবাদ দুটিই হেমাঙ্গিনী নামে ও দ্বিতীয়টি ঊষা নামে) ১৯৪৩, দেবদাস (১৯৪৫), পরিণীতা, স্বামী ও চরিত্রহীন (প্রতিটি নায়িকার নামে) ১৯৪৯। যে দুটি অনুবাদকের নাম করলাম ওদের হাতেই অধিকাংশ রচনা অনূদিত। মাদ্রাস আর কয়ম্বাটুর এই দুই শহর থেকেই সব প্রকাশ।

মালয়ালমে কিন্তু শরৎচন্দ্রের রসাস্বাদন তামিলের আট বছর আগে। ১৯৩৩ সালে ত্রিবান্দ্রম থেকে আর নারায়ণ পানিক্করের অনুবাদে চন্দ্রনাথ প্রকাশিত হয়। তার পর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত হিসেব দিই : দত্তা (১৯৩৭), পরিণীতা (১৯৩৮), রামের সুমতি (১৯৪০), অনুরাধা (১৯৪৬), বিন্দুর ছেলে, কাশীনাথ ও নিষ্কৃতি (১৯৪৭), বিজয়া ও চরিত্রহীন (১৯৪৮) এবং দেবদাস (১৯৪৯)। পানিক্কর ছাড়া কারুর নারায়ণের হাতে অনেক অনুবাদ হয়। প্রকাশস্থল কেরালার ছোট বড় অনেক শহর : কালিকট, ত্রিচুর, কুইলন, আলওয়ে, কোট্টায়াম, পালঘাট, তুরাউর, অট্টিঙ্গল এবং পরায়ুর।

উত্তর ভারতে শরৎচন্দ্রকে তুলে ধরতে গুজরাতীরা যে প্রীতি ও নিষ্ঠা দেখিয়েছেন সে কথা আগেই বলেছি। কিছু স্ট্যাটিস্টিকস দিলেই এটি বিশদ হবে। এই ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় দত্তা শ্রীমতী বিজয়া নামে কৃষ্ণপ্রসাদ মণিশঙ্কর শাস্ত্রীর অনুবাদে আহমদাবাদ থেকে ১৯২১ সালে। তারপর অনূদিত হয় চরিত্রহীন প্রণয়পঙ্ক নামে ১৯২৪ সালে ওখান থেকেই। ত্রিশের দশকে অনুবাদের কাজ বেশ এগোয়থ : অরক্ষণীয়া, কাশীনাথ ও নববিধান (১৯৩২), চন্দ্রনাথ (১৯৩৩), স্বামী ও নিষ্কৃতি (১৯৩৪), দেনাপাওনা ও দেবদাস (১৯৩৫), শ্রীকান্ত ১ম ও ২য় পর্ব (১৯৩৬), ৩য় ও ৪র্থ পর্ব (১৯৩৭), বিপ্রদাস (১৯৩৭), অনুরাধা, শেষ প্রশ্ন ও শুভদা (১৯৩৮), এবং চরিত্রহীন (১৯৩৯)। আর হিসেব না বাড়িয়ে বলি এই ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ৩০এর উপর রচনা প্রায় ১১৫টি বইতে। একাধিক শরৎগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদকের মধ্যে বিশিষ্ট ভোগীলাল গান্ধী, রমণলাল পীতাম্বর সোনি, শ্রীকান্ত ত্রিবেদী এবং চমনলাল গান্ধী। প্রথম দিকের সব প্রকাশ আহমদাবাদ থেকে, ৫০ ও ৬০এর দশকে বেশ কিছু বোম্বে থেকে এবং সামান্য কখানা সুরাত থেকে।

সহোদরা ভাষা মারাঠীতেও গুজরাতীর মতো ৩০খানা রচনা হলেও পুস্তক প্রকাশে শরৎবাবু অনেকখানি পিছিয়ে—৫০এর নিচে। প্রথম প্রকাশ পাচ্ছি ১৯১৯এ গৃহদাহ ও ভৈরবী—দুটিই বী ভী ভরেবকরের অনুবাদ, বোম্বে থে কপ্রকাশিত। তারপর স্বামী (১৯২৭), পরিণীতা (১৯৩৪), শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (১৯৩৯), গামোয়াগঙ্গা বা পল্লীসমাজ (১৯৪১), বিরাজ বৌ (১৯৪৩), চন্দ্রনাথ ও পণ্ডিতমশাই (১৯৪৪), পথের দাবী (ভারতী নামে ১৯৪৬ ও সব্যসাচী নামে ১৯৪৮), শুভদা (১৯৪৭), চরিত্রহীন (১৯৪৮), শেষের পরিচয় (১৯৪৯), একখানি ঐ নামে, অপরটির নাম আখেরচি ওলাখ)। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এর তুলনায় অনেক কম প্রকাশিত হয়েছে। দুচার খানা পুণে থেকে প্রকাশ, বাকী সব বোম্বে থেকে। প্রায় সব ভরেরকরের হাতে, এ ছাড়া একাধিক বই অনুবাদ করেছেন জসবন্ত টেণ্ডুলকর।

হিন্দীতে অনুবাদ একটু দেরিতে শুরু হলেও ওঁরা পুস্তকপ্রকাশ, সাহিত্যবিচার, জীবনদর্শন সবকিছু মিলিয়ে শরৎবাবুকে নিয়ে চাঁদের হাট বসিয়েছেন। এমন কি হিন্দীভাষী অনেকের ধারণা শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ কিংবা কিষণচন্দ্রের মতো আদিতে হিন্দী লেখক। ভাগলপুরে শিশুনিবাস বলে শরৎবাবুকে অনেকে আবার ভুল করেন ওখানকার সন্তান বলে। সে সবই শ্লাঘার কথা। গোনাগুনতিতে পাচ্ছি ৩৫ খানার মত রচনা অনূদিত হয়েছে—প্রকাশসংখ্যা ১৭৫এর উপর। অর্থাৎ এক বইয়ের বহু অনুবাদ—জনপ্রিয়তার নিশ্চিত সূচক।

শুরু হয়েছিল ১৯১৯এ কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের প্রকাশ ও চন্দ্রশেখর পাঠকের অনুবাদ—বিরাজ বহু। তারপর অরক্ষণীয়া (১৯২৭) এবং ছুটকারা বা নিষ্কৃতি (১৯৩৭) —দুটিই রূপনারায়ণ পাণ্ডের অনুবাদ ও এলাহাবাদের প্রকাশন। ১৯৩৭এই শ্রীকান্ত বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের অনুবাদক হেমচন্দ্র, ৩য় পর্বের ধন্যকুমার জৈন ও ৪র্থ পর্বের কমল যোশী। তারপর শুভদা (১৯৪০), রূপনারায়ণ পাণ্ডের চার পর্ব শ্রীকান্তর অনুবাদ (১৯৪১), শেষ কী পরিচয় (১৯৪৬), দত্তা ও গৃহদাহ (১৯৪৭)। হিন্দী বই উপরের শহর ছাড়াও উত্তর ভারতের অনেক জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়েছে—ছাপরা, বালিয়া, কাশী, লখনউ, মথুরা ও দিল্লী। স্বাধীনতার আগে লাহোর থেকেও একখানা ছিল। ষাটের দশকে পকেট বুক আকারে অনেকগুলি বইয়ের সংস্করণ হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদ পাণ্ডে ও জৈন এ দুজনের হাতে। কিছু কিছুতে আছেন মহাদেব সাহা, রামনাথ সুমন, রামচন্দ্র ভর্মা ইত্যাদি এবং কয়েকজন বাঙালী অনুবাদক।

বিভাবরী

দিনেশচন্দ্র রায়

সন্দীপের কথাগুলো শুনে সুরেশবাবু চুপচাপ বসে রইলেন। গণেশ 'মাতব্বরি, পাকামি, এসব ছেলেকে চাবুক মারা উচিত' বলে বাইরে বেরিয়ে এল। -দিদি কান ধরে এনে ছেলেকে ঘরে বন্ধ করে রাখুন। বাড়িতে এসে বাড়া ভাত পেলে এইসব ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো চলে। দুদিন খেতে দেবেন না, দেখবেন এই ঝামেলার মধ্যে খাওয়া ছেড়ে দেবে। দীপুর মা গণেশের কথাগুলো যেন শুনতে পেলেন না, এমনি ভাব দেখালেন। সন্দীপের সঙ্গে কথা চালাতে লাগলেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো গণেশকে তিনি যেন দেখতেই পাচ্ছেন না।--তবে ভয়ের কিছু নেই। অধ্যাপকরা আর প্রিন্সিপ্যাল সবাই হাসপাতালে। পুলিশ গোটাপাঁচেক ছেলেকে অ্যারেস্ট করেছে। আমাদের ওদের দু দলের ছেলেই তার মধ্যে আছে। আজ রাতে যা হয় কিছু একটা মীমাংসা হবে। সন্দীপ থামল। —ঘণ্টা হবে, গণেশ যেন ফোঁস করে উঠল,—লেখাপড়ার নামগন্ধ নেই, শুধু পার্টিবাজি করার জন্য তোমরা কলেজে নামটা রাখ মাত্র। তিনবেলা বাড়িতে বাপের হোটেলে পরিপাটি করে খেয়ে মার্কস এঙ্গেলস ঝাড়। গণেশ খুকখুকিয়ে কাশল।—দিদি, আবার বলছি, ছেলেকে বলুন ভালোভাবে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিক এবং তারপর উপার্জনের একটা চেষ্টা করুক। ছেলে এখন বড় হয়েছে, তার কাছে সংসারের অবস্থা খুলে বলুন। সন্দীপ গণেশের মুখ চেনে। কিন্তু কোনদিন কথাবার্তা বলেনি। গণেশের সেই তিক্ত-কষায় মন্তব্যগুলো শুনে অবাক হয়ে গণেশের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর 'এখন আমি চলি' বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। গণেশের দিকে যাতে না তাকাতে হয় সেইজন্যই দীপুর মা সন্দীপের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গণেশ ব্যাপারটা লক্ষ্য করল, তারপর কিছুটা নিজেকে সমর্থন করার ভঙ্গিতে বলল,—সত্যি কথা বলতে কি, আবার খোঁজ নিয়ে দেখুন ছেলে প্রেমটেম করছে কিনা। পরীক্ষার পর ওকে যে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দিন।

—গণেশ, আমার ছেলের জন্য তোমার একদম চিন্তা করতে হবে না। সে প্রেম করুক না করুক, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। দীপুর মা ফুঁসে উঠলেন।

—আপনি এত রেগে রেগে কথা বলছেন কেন? গণেশ দীপুর মা'র দিকে তাকিয়ে বলল।

—রাগার কোন ব্যাপার নেই। আমার ছেলে খারাপ, সেটা আমি বুঝব। যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাগদারের ঘোড়া। তুমি কি কোনদিন কলেজে পড়েছ যে জান কলেজে পড়লে ছেলেরা কী কী করে? দীপুর মা গণেশের দিকে সোজাসুজি না তাকিয়েই কথাগুলো বললেন,—সবসময় আমাদের অবস্থা নিয়ে তুমি ঠেস দিয়ে কথা বল, তুমি ভাব আমি কিছু বুঝি না।

গণেশ কিন্তু রেগে নয়, হেসে বলল,—কিন্তু আমি আপনাদের জন্য যথেষ্ট করছি,—

দীপুর মা গণেশকে কথা শেষ করতে দিলেন না,--তুমি কী করেছ? আমাদের জিনিস নিয়ে বাজারে বেচে দিচ্ছ। মাঝখানের ব্যাজ তুমি খাচ্ছ। ব্যাজ দিলে বহু লোক পাওয়া যাবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না। এরপর গণেশ দাঁড়াল না, সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে গেটের বাইরে গেল, তারপর গেটটা বন্ধ করল। সাইকেলে ওঠবার জন্য তৈরি হতে হতে গণেশ বলল,—বেশ, ভাত ছড়ান, বহু কাক হয়তো আসবে, কিন্তু আমি আর কোনদিন আসব না।

হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার বন্ধ হবার পর সবাই সামনের খোলা জায়গাতে এসে জমা হতে লাগল। কলেজ থেকে প্রায় বারোজন অধ্যাপক এসেছেন। ধুতি-পাঞ্জাবি আর কালো ছড়ি

হাতে নিয়ে প্রিন্সিপ্যালও আছেন। প্রাণহরি নেই। কিন্তু প্রাণহরির লেফটেনান্ট হোস্টেল সেক্রেটারি হারাধন আছে। হারাধন ওদের পার্টির তিনজন নেতাকে সঙ্গে করে এনেছে। এঁদের মধ্যে একজন উকিল, একজন মোক্তার এবং অন্যজন ডাক্তার। প্রাণেশ এবং দিলীপও উপস্থিত। দীপু আর দেবুকে প্রিন্সিপ্যাল ডাকলেন। একটু দূরে যেখানে প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দীপু এবং দেবু এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল কোন কথা বললেন না। কথা শুরু করলেন ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক ডাঃ রাসবিহারী চক্রবর্তীর সঙ্গে। রাসবিহারী চক্রবর্তী এই কলেজের সবচেয়ে প্রবীণ অধ্যাপক। তিনি কোনপ্রকার দলাদলি বা মনকষাকষির মধ্যে নেই। ওঁর একমাত্র ছেলে গতবার একটা জটিল অসুখে মারা গেছে। তার জন্য তিনি ভেঙে পড়েননি। স্ত্রীকে নিয়ে রোজ হাঁটেন। ছাত্রদের প্রত্যেকটি শুভকাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখেন। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট দিনে নিজের পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে বসে থাকেন। শেষ মুহূর্তেও যারা ফী জোগাড় করতে পারে না, এমন ছেলেদের খুঁজে খুঁজে বার করেন। তাদের ফী দেবার ব্যবস্থা করে দেন। কেউ বুঝতেও পারে না। আর বি সি পৈতৃক সূত্রেও ধনী। তাঁর বাড়িতে বাইরের পাঁচটি ছাত্র সবসময়ে লজিং থাকে। রাসবিহারীবাবু বললেন,—দেখো, তোমাদের দুজনের আর প্রাণহরির উচিত ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলা। তোমাদের নামে চারিদিকে ছিছিক্কার পড়ে গেছে। কলেজ ইউনিয়ন আর ট্রেড ইউনিয়ন এক কথা নয়। দেবু আর দীপু মাটির দিকে চোখ রেখে কথাগুলো শুনল।

—যদি সম্ভব হয় তবে আজ সন্ধ্যাতেই আমরা হোস্টেলে বসতে পারি। প্রাণহরিকে খবর পাঠালে সে নিশ্চয়ই আসবে। তা না হলে আমাদের পুলিশের হাতে সমস্ত ঘটনাটা ছেড়ে দিতে হবে।

—আর সেটা কোন দিক থেকেই শোভন হবে না, রাসবিহারীবাবুর মুখ থেকে প্রিন্সিপ্যাল কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন।

—আচ্ছা স্যার, আমরা পাঁচ মিনিট আলাপ করে এসে আপনাদের জানাচ্ছি, দেবু বেশ নম্র-ভাবে প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকাল।

—কার সঙ্গে আবার আলাপ করবে? আর বি সি জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমাদের পার্টি লেভেলে, দীপু জবাব দিল।

—এর মধ্যে পার্টি আসে কী করে? প্রিন্সিপ্যালের চোখ দুটো বিস্ফারিত হল, ফলে কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। রাসবিহারীবাবু হাসলেন। তাঁর মুখখানা ভরা। হাসলে দুটো গালে ভাঁজ পড়ে। থুতনিটা একটু ফুলে ওঠে, সন্তদের মতো দু চোখে জল চিকচিক করে।

—কনফ্রন্টেশানটা এখন সেই লেভেলেই গেছে, সুতরাং পার্টি লীডারশিপের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে বোধ হয় কিছু করা যাবে না। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, মনে হয় ওদের ক্ষেত্রেও এটা একই ব্যাপার। দেবু গলাতে সেই বিনীত ভাবটি বজায় রাখল। রাসবিহারীবাবু এবং প্রিন্সিপ্যাল দুজনেই দেবুর কথার মধ্যে 'আমাদের' এবং 'ওদের' এই দুটি শব্দ থেকে পরিষ্কার-ভাবে বুঝতে পারলেন সমস্ত ছাত্ররা যুধ্যমান দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছে।—আচ্ছা, তবে আলাপ করে এসেই বলো, আর বি সি-র কণ্ঠে একটু বিষাদভাব লক্ষ্য করা গেল। তিনি বেশ টেনে টেনে কথা বললেন।

—কিন্তু প্রাণহরিদের পক্ষে কে কথা বলবে? প্রিন্সিপ্যাল প্রশ্ন তুললেন।

—ওদের নেতারাও আছেন, দেবু জবাব দিল। দেবু আর দীপু পেছন ফিরে নেতাদের গ্রুপের দিকে হেঁটে চলল। পেছন ফিরতেই ওরা দুজন শুনল,—ছেলে আমাদের, ঝগড়া আমাদের, অথচ মেটাবে দাদারা, দুর্ভাগ্য। গলাটা আর বি সি-র না প্রিন্সিপ্যালের, মুহূর্তের মধ্যে সেটা বোঝা গেল না। দেবু এবং দীপু দুজনেই মাথা ঘুরিয়ে কণ্ঠস্বরটাকে চিনতে চাইল, কিন্তু ঘাড় ঘোরাতে

ভীষণ লজ্জা লাগল। মাথা নিচু করে, হসপিটালের ঘাসহীন মাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নেতাদের দিকে এগিয়ে চলল। দেবু ফিসফিসিয়ে বলল,—মন্তব্যটা কে করল দীপু?

—কারও কণ্ঠস্বরই নয়। এটা ডেলফিক ওরাকেল। ডেলফিক মন্দিরের দৈববাণী।

রীনা খুব কাঁদল। নিজের ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তারপর সন্ধ্যার ঘোর-ঘোর সময়ে কুয়োপাড়ে গিয়ে চোখে মুখে খুব ভালো করে জল দিয়ে তুলসীতলাতে বাতি দিল। ঘরে এসে শঙ্খে ফুঁ দিল। কাঁদবার পর নিজের মাথাটা ভীষণ হালকা লাগছে। রীনা একবার গরমের ছুটিতে ওদের দেশে গিয়েছিল, তখন ও খুবই ছোট। সেই সময়ে অনেকটা রাস্তা ওদের নৌকো করে নদীপথে যাবার সময় দেখতে পেয়েছিল, জ্বলন্ত প্রদীপসহ ছোট ছোট কী যেন সব ভেসে বেড়াচ্ছে। মাকে জিজ্ঞাসা করলে মা বলেছিলেন,—মানত করে মেয়েরা এইসব আলো ছোট ছোট কলাগাছের ডোঙাতে ভাসিয়ে দেয়।

—তাহলে এমনি অনেক মানুষের অনেক মানত নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। রীনার কথার জবাবে মা আর কোন কথা বলেননি। নদীর বাতাস আর মাঝিমাল্লাদের চিৎকারে আর কোন কথা বলা হল না। রীনা নিজেকে তেমনি নদীর জলে ভাসা প্রদীপের মতো ভাবতে লাগল। নিজেকে যতটা সম্ভব করুণ অবস্থার মধ্যে কল্পনা করল। কলেজের গোলমালের ব্যাপারে দেবু এবং দীপুদের জন্য তার ভীষণ ভাবনা হয়েছিল। সেইসব কথা ভেবেই রীনার চোখে জল এসেছিল। কিন্তু কান্না গভীর হবার পর এবং কান্না থেমে যাবার পর সেই মূল চিন্তা থেকে সে সরে এল। রীনা নিজেকে কোন নাটকের খুব করুণ দৃশ্যে সবচেয়ে বঞ্চিতা মেয়ে হিসেবে কল্পনা করল। সে ভাবল, এ অবস্থায় তার মরাই উচিত। অথচ মরেও সবকিছু সে দেখতে চায়। সে দেখতে চায় সে মারা যাবার পর লোকে তার জন্য কত দুঃখ করে। চারিদিকে তাকে নিয়ে কে কী বলে তা সে নিজের কানে শুনতে চায়। প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া সে নিজের চোখে দেখতে চায়। একটা ধোঁয়াটে ধূসর ছবি হয়ে চারিদিকে কান্নার মধ্যে রীনা মরেও বেঁচে থাকতে চায়। তার চিন্তার আশেপাশে তখন দেবু সম্পর্কে কোন দুশ্চিন্তা নেই। দেবু যদি তাকে আঘাত না করে এবং সেই আঘাতে শরাহত রাজহংসীর মতো সে যদি দুঃখের প্রতীক না হতে পারে, তবে রীনা মরে যাবে। দুঃখ ছাড়া তার কোন ভাবমোক্ষণ হবে না। সুতরাং লোকে জানুক সে দেবুকে ভালোবাসে, দেবুও তাকে খুব খুব ভালোবাসে, তবু শেষে এমন একটা কিছু হোক যাতে সে খুব কাঁদতে পারে।

প্রাণেশকাকুর বাসাতে বৈঠক বসল। প্রাণহরির পক্ষে উকিলবাবু, ডাক্তারবাবু আর মোক্তারবাবু এলেন। দেবু আর দীপু ছাড়া প্রাণেশ আর দিলীপ রইল। শুধু শেষ মুহূর্তে রেবাকে সংবাদ দেওয়া হল। কারণ সুবোধ, সঞ্জয়, সুধীনের রহস্যজনক অন্তর্ধানের ব্যাপারের সঙ্গে রেবার যোগাযোগটা প্রত্যক্ষ। রেবা এসে সব কথা খুলে বলল। দুই দলেরই বড় নেতারা বলল,—আমরা কোন বিশদ আলোচনার মধ্যে এ ব্যাপারে যেতে চাই না। তবে ঘটনাটা পুলিশ অনুসন্ধান করুক, এটাও আমাদের ইচ্ছা নয়। সুতরাং আধঘণ্টার মধ্যে যাতে হারিয়ে-যাওয়া এই তিনটি ছেলে এই সভাতে একবার দেখা দিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা দুই পক্ষের ছাত্র-নেতারা অথবা অন্য যে কোন তৃতীয় পক্ষ করুন। ছাত্র-নেতারা সবাই চোখ মাটিতে রেখে বসে রইল। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। মনে হচ্ছে হত্যার অপরাধে তাদের বিচার হচ্ছে। এবং চোখ তুলে তাকালেই হত্যাকারী কে তা বোঝা যাবে। এই পরিস্থিতিতে একটা সর্বব্যাপী ভয়ে ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চোখ তোলা ভীষণ বিপজ্জনক। ব্যাপারটা নেতারা বুঝল। প্রাণেশ বলল,—একদিকে দীপু

আর দেবু এবং অন্যদিকে প্রাণহরি থাকলেই হবে। রেবা, তুমিও বাড়ি যেতে পার।

দেবু, দীপু, প্রাণহরি ছাড়া আর সবাই চলে গেল। দীপুরা জানে বড় নেতারা তাদের সঙ্গে বসবার আগে শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মোটামুটি কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শহরে আগামী পৌরসভার নির্বাচনে স্থানীয় ভিত্তিতে কতকগুলি বোঝাপড়া করতেই হবে। তা না হলে কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। এমনি পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটুক যাতে পার্টি পর্যায়ে তাদের সম্পর্ক তিক্ত হোক, এটা নেতারা চান না। দ্বিতীয়ত, ছাত্রদের মধ্যে যদি আন্তঃপার্টি লড়াই হয় তবে উভয় পক্ষের নেতারা পৌরসভার নির্বাচনে সমঝোতাতে আসতে চাইলে ছাত্ররা সেই সমঝোতার বিরুদ্ধে দুই দলের নেতাদের ওপরেই চাপ সৃষ্টি করবে। সেই চাপের শক্তিকে সত্যি তখন হেসে-খেলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সুতরাং সম্ভাব্য এই প্রতিক্রিয়াগুলোকে আগে থেকেই এড়াতে গেলে উভয় পক্ষের নেতাদেরই উদ্দেশ্য ছাত্রফ্রন্টে একটা ঐক্য ফিরিয়ে আনা। এই ছাত্রদেরই দুদিন পরে একজোটে বাঁধা দুই দলের প্রার্থীদের পক্ষে পৌর নির্বাচনে দাঁড়ানো এবং জয়লাভ করা রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সাধনের জন্য দেবুর দলকে আর প্রাণহরির দলকে নির্বাচনী জোট বাঁধতেই হবে। এই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উকিলবাবু, ডাক্তারবাবু, মোক্তারবাবু আর প্রাণেশকাকু নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াতে বেশি সময় নেননি। সেই শীর্ষ বৈঠকের পরেই বর্তমান আপোস-আলোচনার সভা শুরু হল। প্রথম অ্যাজেন্ডাতে সুধীন, সঞ্জয় আর সুবোধকে আধঘণ্টার মধ্যে দেখবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি কথাও আর বলা হল না। যদিও পাঁচজন নেতাই মনে মনে এ ব্যাপারে সময়ের হিসাব করে চললেন এবং এটাও অলিখিতভাবে ঠিক হয়ে রইল যে নিরুদ্দেশ হওয়া তিনটি ছেলে এই সভাতে দর্শন না দেওয়া পর্যন্ত সভা অপেক্ষা করবে, তা যত রাত্রিই হোক।

দ্বিতীয় অ্যাজেন্ডাতে আলোচনার সময় কোনপ্রকার বাদানুবাদ নেতারা আমন্ত্রণ করলেন না। শীর্ষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাণেশ ঘোষণা করল,—আজ রাত নটা থেকে সবরকম হোস্টিলিটি বন্ধ। আগামীকাল সকালে প্রাণহরি এবং দেবু যুক্তভাবে কলেজে ক্যাম্পাসে চক্কর দেবে। পরশু ইলেকশানের আগে আর কোন প্রচার আর ক্যানভাসিং-এর প্রয়োজন নেই। প্রিন্সিপ্যাল এবং পুলিশকে এখান থেকেই প্রাণেশ টেলিফোনে এই মিটমাটের কথা জানাবে। উদ্দেশ্য, প্রিন্সিপ্যাল শান্তিভঙ্গের ভয়ে যাতে ইলেকশান বন্ধ না করে দেন এবং পুলিশ আশংকার বশে আর কোন ব্যবস্থা না নেয়।

—কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে প্রথমে প্রাণহরি এবং তারপরে আমি কথা বলব। আমাদের মিটমাটের কথা আমরাই জানাব। পুলিশকে আপনারা ফোন করুন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই, দেবু কণ্ঠির-মালা-পরা মোক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে কথা বলল। মোক্তারবাবু এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। শুধুমাত্র একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে দেবু কথা বলাতে ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসলেন। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা মুখে দেবুর চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিলেন। ডাক্তারবাবু ততক্ষণে 'আমার একটা আর্জেন্ট রুগী আছে', বলে কেটে পড়লেন। সুতরাং প্রাণেশের বাড়ির ভেতর থেকে যখন চা এল, তখন ডাক্তারবাবুর চা-টা ফালতু হয়ে গেল। ঐ চায়ের কাপটার ভবিষ্যৎ ঠিক করা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল। কারণ কাপটা ভেতরে ফেরত পাঠানো সহজ ছিল না। যে লোকটা চা দিয়ে গেল প্রাণেশ তার নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করলেও তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। সুতরাং প্রত্যেকেই নিজের নিজের নির্দিষ্ট প্রাপ্য চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিতে দিতে ঐ উদ্বৃত্ত এক কাপ চায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে লাগল। রাজনীতি, আপোস-আলোচনা, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত চা পান-রত নেতা এবং

ছাত্রদের মাথায় রইল না। সবাই ওপরে ওপরে ঔদাসীন্য দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে সেই ডাক্তারবাবুর ভাগের চায়ের কাপ তাঁর অবর্তমানে উদ্বৃত্ত হওয়াতে উদ্বিগ্ন বোধ করল। ডাক্তার ঐ চা পান করলে কারও কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু যেহেতু ডাক্তার নেই সুতরাং সেই চায়ের কাপ কে পাবে এবং কে পেতে পারে, এটা নির্ধারিত হওয়া উচিত, ঠিক এমনি আবর্তের মধ্যে আলোচনাসভা তখন প্রায় অচল অবস্থাতে পৌঁছেছে তখন বাইরের সিঁড়িতে কথাবার্তা শোনা গেল। সবাই কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, এমনি প্রত্যাশাতে সবাই আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। আর সেই সময়ের মধ্যে সুধীন, সঞ্জয়, সুবোধ হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। ওরা বসল। তারপর তড়িঘড়ি করে প্রাণেশ সুবোধের হাতে সেই ফালতু পড়ে থাকা চায়ের কাপটা তুলে দিল। চায়ের কাপটা সুবোধের হাতে কেন তুলে দেওয়া হল এটা আর কেউ বিশ্লেষণ করল না। কিন্তু চায়ের কাপটার একটা গতি হওয়াতে সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করল। কিছুক্ষণ পরেই আরও দু কাপ চা এসে গেল।

—স্যার, আমি প্রাণহরি কথা বলছি। প্রথমত, আমাদের গোলমাল সব মিটে গেছে। দ্বিতীয়ত, ঠিক হয়েছে, ইলেকশান আগামী পরশু হবে। তৃতীয়ত, আমরা আর কোন ক্যানভাসিং কাল থেকে করব না।

—থিয়েটারের বাইরে তোমরা নাটক অভিনয় করলে প্রাণহরি। শূন্য থিয়েটারে বসে অন্ধকার মঞ্চের দিকে তাকিয়ে নিজেকে ভীষণ বোকা লাগছে। গোলমাল আমার কলেজের, আমার ছেলেদের মধ্যে, অথচ মেটাবে থার্ড পার্সন।

—স্যার, তার জন্য আমরা মাপ চাইছি। কিন্তু এই যুগটাই থার্ড পার্সনের যুগ। আমরা শুধু ভিকটিম অব সারকামস্টানসেস। স্যার, দেবুর সঙ্গে কথা বলুন।

—দেবু কথা বলছি স্যার। প্রাণহরি যা বলল আমার বক্তব্যও তাই।

—দেবু ধন্যবাদ। তবে আমাকে সংবাদটা কেন জানাচ্ছ জানি না। আমি তো প্যাসিভ ভয়েস।

—সে কী হয় স্যার, আপনি আমাদের পিতৃতুল্য।

—তা বলতে পার। তবে তোমাদের পিতা কে?

—স্যার, আজ আর আমার জবাব দেবার ক্ষমতা নেই। তবে মনে হয় আমরা পিতৃহীন।

ওদিক থেকে হাসি ভেসে এল। সুতরাং দেবুও হাসল। তারপর সে ফোন রেখে দিল।

নতবাবু এসে বললেন, মেথলিগঞ্জের একটা পার্টি আছে। সুরেশবাবুর শেয়ারগুলো সে কিনতে চায়। চায়ের কাপে অর্ধেক চা পড়ে রইল। নতবাবুর সঙ্গে মঞ্জু বোর্ডিং-এর চোদ্দ নম্বর ঘরে সেই পার্টির সঙ্গে দেখা করার জন্য কানু রওনা দিল। এত সকালে এই বৃষ্টির মধ্যে শেয়ার মার্কেটে তখনও আর কোন দালাল আসেনি।

ভদ্রলোক আসলে দেওনীয়া। প্রচুর পয়সার মালিক। খুব কালো চেহারা। চাঁদি পর্যন্ত ছাঁটা চুল। নাক মুখ সব-কিছু একটু ফোলা-ফোলা। প্রথমে দেখলে মনে হয়, লোকটার শরীরে জল জমেছে। চোখের দৃষ্টি হলদেটে। সোজা তাকাতে গেলে দু চোখের দুটো মণিই ঝুলে নীচের দিকে নেমে আসে। চোখের মাঝখানে মণিদুটো স্থির থাকে না। খালি গায়ে বিছানাতে বসে আছে। লোকটার গায়ের রং বেশ তেলচকচকে এবং মসৃণ। সারাটা শরীরে কোন গোটাগুটি, এমন কি ফুস্কুরি পর্যন্ত নেই। অথচ দুটো হাত দিয়ে লোকটা সারাক্ষণ শরীরের নানা অংশ চুলকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ডান হাত এবং বাঁ হাত দিয়ে নিজের পিঠেই থাপ্পড় মারছে, অদৃশ্য মশামাছি তাড়ানোর

ভঙ্গিতে। নিজের পিঠে থাপ্পড় মারতে মারতেই লোকটি হাসল। হলদে দাঁত, সেই হলদেটে চোখে কালো মণিদুটো নীচে নেমে এল। কানু বুঝল, লোকটা তাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। কানু অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে এইরকম কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ঘাগু ক্রেতারা প্রথমবারে এমনি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দালালকে দেখে নেয়। সেই প্রথম বারের দেখার পর এইসব ক্রেতারা দালালের একটা রেখাচিত্র নিজের মনে গেঁথে নেয়। তারপর আর ফিরেও তাকায় না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলে। ঝানু দালালরা এজন্য পার্টির ঘরে ঢুকেই কথা শুরু করে না। দালাল জানে, পার্টি তাকে ভালোভাবে খুব মন দিয়ে না দেখে কোন কাজকর্ম করবে না। সুতরাং তার দেখার ব্যাপারটাতে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এসব ক্ষেত্রে ঘটনাগুলো প্রায় ছকে বাঁধা, শুধু একই ফর্মুলাতে পরপর ঘটতে থাকে। কানু এবং নতবাবু আসন গ্রহণ করার পর চা এল। তিনজন পরস্পরের মধ্যে বিড়ি সিগারেট বণ্টন করল। পার্টি নিজের পিঠে অনেকগুলো থাপ্পড় মারতে মারতে সিগারেট ধরাল। তারপর আরামে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবহাওয়া, বৃষ্টি, মেখলিগঞ্জ থেকে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধার কথা আলোচনা করলেও ঝানু পাকা দালাল হিসেবে কানু জানে যে কেনাবেচার ক্ষেত্রে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মনে একটা বিশেষ মনস্তত্ত্ব কাজ করে। বাড়ি, জমি, সোনা, শেয়ার, পুকুর, আসবাব অথবা প্রাচীন তৈলচিত্র যাই হোক না কেন—যখন একটা লোক তা দালালের মাধ্যমে বিক্রি করে তখন সেইসব সম্পত্তিকে সাধারণভাবে নারীর সমার্থক চিন্তা করা হয়। বিক্রি করার জন্য প্রত্যেকটা জিনিসের গুণমানমূল্য অনুসারে তাকে কিশোরী, তরুণী, যুবতী এবং মধ্যবয়স্কা—এই চার প্রকার নারীর প্রতীক ভাবা হয়। যদিও কোনদিন সেটা প্রকাশ্যে বলে না। এই তুলনার জন্য কোন স্থির মানদণ্ড নেই। বিক্রেতার ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে এই তুলনাগুলো কোন কোন সময় ভুল হয়। খুব বেঠিকও হয় না, আবার ঠিকও হয় না। আবার একেবারে নির্ভুল হয়। ক্রেতাও কোন স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি কেনবার সময় সেই সম্পত্তির চরিত্র এবং গুণানুসারে বিভিন্ন বয়সের অবয়ব চোখের সামনে ভাসে। নানাভাবে জিনিসটা অথবা সম্পত্তিটা ভাবী ক্রেতার কত সাহায্যে বা সুবিধায় আসবে দালালের কাছে তার বিশদ বর্ণনা দেয়। সম্পত্তির গুণপনা শোনবার সময় বার বার কানু অনুভব করে যে তার একটা শিহরন হয়। ভোগ্যপণ্য হিসেবে নারীকে ক্রয়বিক্রয় করার একটা অলীক উত্তেজনা কল্পনাতে কানু বোধ করে। যে কিনবে তার কাছে গিয়ে কানু আরও ভালোভাবে শেয়ার বা অন্য সম্পত্তির আর্থিক লাভের দিকটা বর্ণনা করে। বিক্রেতা যে মূল্য দাবি করে তার চেয়ে জিনিসের দাম কানু যত বাড়াতে পারবে কানুর ততো লাভ। বিক্রেতাকে তার মূল্য দিয়ে বাড়তিটা সে নিজে নেবে। ভাবী ক্রেতার সামনে বসে আর-দশটা দালালের মতো কানুও মৃদু উত্তেজনাতে তাড়িত বোধ করে। ক্রেতাকে কতটা ভজাতে পারবে, তাকে আস্তে আস্তে নিজের বশে আনতে পারবে, কানুর এবং সাধারণভাবে দালাল-দের তাড়নাবোধ তত পরিতৃপ্তির দিকে এগুবে। ডীল কমপ্লিট হবার পর দালালির টাকা হাতে এসে জ্বর ছেড়ে যায়। খুব সূক্ষ্মভাবে টাকা হাতে আসবার পর যে ক্ষণিকের নিশ্চিন্ততা আসে তাতে দালালরা পূর্ণ যৌনতৃপ্তির আনন্দ পায়।

কানু জানে, মেখলিগঞ্জের পার্টিকে ভজাতে কতকগুলি ক্রাইসিস তাকে পেরুতেই হবে। যে কিনবে তাকে বশে আনতে এই অচলাবস্থার পর্যায়টা কিছুতেই এড়ানো যায় না। সেইসব সময় মনে হবে যে এইখানে বৃথা সময় নষ্ট করা হচ্ছে। হয়তো এই পার্টির সঙ্গে আর দরাদরি করে কোন লাভ নেই। বাণিজ্য এখানে হবার নয়। কিন্তু এইরকম পরিস্থিতিতে হয় নতুন কোন সূত্র ধরে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং কেনাবেচা সম্পূর্ণ হয়ে যায় অথবা আলোচনা ভেঙে যায়। এই অচলাবস্থাতে সমস্ত পরিস্থিতি এতটাই অনির্ণীত থাকে যে পরমুহূর্তে কী ঘটবে এটা পর্যন্ত

আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কানু মেখলিগঞ্জের পার্টির দিকে সোজা তাকাল। পার্টি তখন দুই হাত দিয়ে সমানে নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছে। চাপড়ানো শেষ করেই আবার হাঁটু চুলকোচ্ছে। পরমুহূর্তেই ঘাড়ের পেছনে ডান হাতের তালু দিয়ে ঘসতে লাগল। কানু লোকটাকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার পর বুঝতে পারল যে পার্টিটা মালদার। সুতরাং সিগারেটের ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে গলগলিয়ে ছেড়ে কানু খুশি-খুশি ভাবে বলল,—তাহলে কাজের কথাতে আসা যাক। নতবাবু কানুর আধো-আধো কথার পরিবর্তে স্পষ্ট উচ্চারণে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল।—মোগলকাটার প্রায় কুড়িখানা শেয়ার আছে। মোগলকাটা ইন্ডিয়ান কনসার্নে সবচেয়ে ভালো বাগান। হাজার টাকার কমে ডিভিডেন্ড দেয় না,—কানু কথা শেষ করে সিগারেটে একটা জোর টান দিল। নাক মুখ দিয়ে কানু আবার একরাশ ধোঁয়া বের করল। পার্টির মুখের দিকে তাকাল। কাল্পনিক মাছি তাড়ানো বন্ধ হল। ভদ্রলোকের দুহাত কোলের ওপর। চোখ বন্ধ। চোখ খুলল। তারপর হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি বলল, —কিন্তু ভাও বলুন। বাচ্চারা যেমন খুব দ্রুত লয়ে ছড়া আবৃত্তি করে ভদ্রলোক তেমনি সুরে কথাগুলো বলল।

—দামটা কোনক্রমেই বাজারদরের বেশি হবে না।

—বাজারদর কত?

—মোগলকাটার একটা শেয়ারের দাম দশহাজার টাকা।

—অসম্ভব। আমার ক্ষমতার বাইরে।

ভদ্রলোক চোখ বুজে পিঠ চাপড়াতে লাগল। কানু সিগারেটটা টিপে টিপে অ্যাশট্রের মধ্যে নেভাতে লাগল।

—তবে মোগলকাটার শেয়ার খুবই সরেস। ভদ্রলোক চোখবোজা অবস্থাতেই মন্তব্য করল, হাত দুটো তখন স্থির। কানু এর মধ্যেই লক্ষ্য করেছে ভদ্রলোক কথা বলার সময় হাত দুটো নাড়াতে পারে না। যখনই ভদ্রলোক কথা বলবে, হাত দুটো তখনই স্থির হয়ে থাকে। ভদ্রলোকের হাত দুটো স্থির দেখে কানু বুঝল ভদ্রলোক আরও কিছু বলবে।

—আট হাজার করে দাম হলে বিশখানা শেয়ার নিতে পারি। নাম জারির খরচা আমার নিজের।

—অসম্ভব।

—তাহলে আসুন।

ভদ্রলোকের কথাতে কানু রাগ করল না। যদিও 'আসুন' এই কথাটার দ্বারা কানুকে এবং নতকে ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে বলেছেন, এবং কানুর বারেন্দ্র ট্রাডিশনে এতে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, তবু কানু রাগ করল না। দালালদের রাগ করতে নেই। রাগ দালালি ব্যবসার পরম শত্রু। ভদ্রলোক আবার মতপরিবর্তন করল। হঠাৎ বলল,—বসুন, বাথরুম থেকে আসছি। এই সময় কানুর সুন্দরী-মোহনের কথা মনে পড়ল। সুন্দরীমোহন বি এ পাশ করার পর আর পড়াশোনার লাইনে গেল না। সে প্রথম দফাতে ভেবেচিন্তে পাঁচটি চা কোম্পানিকে বেছে নিল, এবং টাকা জমা দিয়ে শেয়ার-হোল্ডার লিস্ট জোগাড় করল। সুন্দরীমোহন ভারতীয় চা কোম্পানিগুলোর ইতিহাস জানে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সাহেবদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে কিছু শোষিত বাঙালি, প্রধানত উকিলরা এই চা-বাগানগুলো খোলেন। তখন এই নতুন জেলা-শহরের পত্তন শুরু হয়েছে। শহরে গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে উকিল, মোক্তার আর ডাক্তাররাই প্রধান। এই উকিল মোক্তার আর ডাক্তাররা পাবনা এবং ঢাকা জেলা থেকে এসেছিলেন। পাবনার থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা প্রধানত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং ঢাকা থেকে আগত বাবুরা কায়স্থ। সুন্দরীমোহন এটাও জানে যে পরবর্তী কালে এইসব বাবুদের ন্যাশনালিস্ট ভাবধারা ক্রমে ক্রমে লোপ পায়, এবং চা-কোম্পানিগুলোর রবরবা সময়ে কায়েত বামুন

টেনশান তীব্র হয়ে ওঠে। এইসব চা-কোম্পানিগুলো প্রথম অবস্থাতে সুপরিচালিত ছিল। শেয়ার-গুলো প্রধানত ঢাকা পাবনা অঞ্চলে এই কোম্পানিগুলোর উদ্যোক্তাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিলি করা হয়। দেশবিভাগের পর এইসব শেয়ারহোল্ডাররা নানা জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ে। শেয়ারহোল্ডার লিস্ট থেকে সেইসব ছোট ছোট শেয়ারহোল্ডারদের নতুন ঠিকানাগুলো সুন্দরীমোহন জোগাড় করল। এইসব কোম্পানিতে তখনও শেয়ারগুলো কেন্দ্রীভূত হয়নি। অর্থাৎ কোন একজন, দুইজন অথবা তিনজন ব্যক্তি পুরো শেয়ারের একান্ন শতাংশ কুক্ষিগত করে কোম্পানির সত্যিকারের মালিকে পরিণত হয়নি। সেটা শুরু হয় পরে। সুন্দরীমোহনের জন্যই কোম্পানি দখলের প্রবণতা প্রথম এই শিল্পে সৃষ্টি হয়। তারপর অন্তত দশটা কোম্পানি সুন্দরীমোহনের কারুকার্যের জন্য হাতবদল হয়। বাঙালীরা চা-কোম্পানিগুলোর পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে পুরোপুরি সরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত শেয়ারগুলো অসংখ্য ছোট ছোট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। সুন্দরী-মোহন মা-বাবার একমাত্র ছেলে। সুতরাং প্রাথমিক মূলধন জোগাড় করতে তার কোন অসুবিধা হল না। চিঠি লিখে, পায়ে হেঁটে, রেলগাড়িতে চেপে এইসব শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে সুন্দরী যোগাযোগ করল। দেশভাগের পরে বাঙালী মধ্যবিত্তের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। বছরে হয়তো সেইসব শেয়ারহোল্ডাররা প্রতি শেয়ারে দশটাকা ডিভিডেন্ড পায়। তাই সুন্দরী যখন প্রতি শেয়ারের জন্য একশো টাকা দিতে চাইল তখন সবাই শেয়ার বিক্রি করা শুরু করল। অনেকে একসঙ্গে দুটো-তিনটে-চারটে শেয়ার বিক্রি করে অনেক টাকা হাতে পাবার লোভ সামলাতে পারল না। দূরে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে শেয়ারগুলো এইভাবে বিক্রি হতে লাগল। কেউ টেরই পেল না। সুন্দরীমোহন শেয়ার-গুলো নামজারিতে দিল না। বিক্রেতাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা চিঠি লিখিয়ে আনল যে, আমার ঠিকানা বদল হয়েছে। পাকা ঠিকানা না জানানো পর্যন্ত ডিভিডেন্ড পাঠাবেন না। চিঠি-গুলো কোম্পানিতে পাঠানো হল। সুতরাং সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড কোম্পানিতেই জমা পড়ে রইল। দেড় বছরের মাথাতে সুন্দরী দেখল তার হাতে দুটো কোম্পানির ব্যালান্স শেয়ার। অর্থাৎ কোম্পানির পরিচালনাভার রামবাবুর হাতে। রামবাবুর হাতে যে শেয়ার আছে তা হয়তো মোট শেয়ারের শতকরা ত্রিশ ভাগ। কিন্তু শ্যামবাবুর হাতে এককভাবে মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ শেয়ার আছে। সুতরাং পরিচালনাতে শ্যামবাবু আসতে পারে না। রাম আর শ্যাম পঁয়তাল্লিশ ভাগ শেয়ারের মালিক। এই পঁয়তাল্লিশ ভাগের অনুপাতে রামের হাতে শেয়ার বেশি থাকাতে কোম্পানি তার হাতে। বাজারে যে পঞ্চান্ন ভাগ শেয়ার পড়ে ছিল সেটা সামান্য কিছু বাদে এখন সুন্দরী-মোহনের হাতে। সুন্দরীমোহন যদি এখন শেয়ারগুলো রামকে দিয়ে দেয় তবে রাম কোম্পানির পুরো মালিক হয়ে যাবে। যদি শ্যামকে দিয়ে দেয় তবে শ্যাম রামকে শেয়ারের জোরে হটিয়ে কোম্পানি দখল করবে। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজা কে হবে সেটা ঠিক করবে সুন্দরী-মোহন। সুন্দরীমোহনের হাতে কোম্পানির প্রাণভোমরা। সুন্দরীমোহন শেয়ারটা রাম অথবা শ্যাম —এদের দুজনের কাউকেই দেবে না। শ্যামকে সে বলল,—আমার হাতে ব্যালান্স শেয়ার সুতরাং আপনি কোনদিন জীবনে কোম্পানির মালিক হতে পারবেন না। মালিক হতে না পারলে কোন লাভ নেই। কারণ রাম প্রতি বছর চুরি করে কোম্পানি ফাঁক করছে। প্রতি বছরই এরপর লোকসান হবে। সুতরাং এক পয়সা ডিভিডেন্ড পাবেন না। অতএব টাকাটা শেয়ারে ব্লক হয়ে থাকবে। আপনাকে আমি এই দাম দিচ্ছি। শেয়ার আমাকে বেচে দিন। টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে আপনি যে সুদ পাবেন তা ডিভিডেন্ডের চেয়ে বেশি। রামকে আমি চিট করব।

শ্যামবাবু দুটো জিনিস পরিষ্কার বুঝল : এক, তার আর্থিক ক্ষতি নেই; দুই, রামবাবুকে সুন্দরীমোহন সায়েস্তা করবে। সুতরাং বিক্রিবাটা শেষ হয়ে গেল। শ্যামবাবুর শেয়ার বেচবার পর

বাজারে গবেষণা শুরু হল। প্যানিক ছড়াল। রামবাবু ব্যাঙ্ক থেকে হ্যান্ডনোট দিয়ে বাজারে শেয়ার কিনতে নামলেন। "ক" কোম্পানির শেয়ারের দাম হু হু করে বাড়তে লাগল। ব্যাপারটা আগর-ওয়ালারা টের পেল। টাকা তাদের সিন্দুকে গজগজ করছে। পতিতা টাকার রং এত কালো যে বাজারে বের করা মুশকিল। সুতরাং শেয়ারগুলো কিনে ব্যাপারটাকে কিছুটা ভদ্রস্থ করা যাবে। তাছাড়া পুরো কোম্পানির একান্ন ভাগ শেয়ার হাতে এলে টাকাটা দু বছরে উঠে আসবে। একটা কোম্পানি হাতে আসা কি সোজা কথা! সুন্দরীমোহন চার গুণ দামে সেই ব্লক শেয়ারগুলো আগর-ওয়ালাদের কাছে বিক্রি করল। আগরওয়ালারা ক কোম্পানির শেয়ার কিনে নিল। পরে এইরকম কেনাবেচা ইন্টারলকিং নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ইন্টারলকিং-এর ফলে হাজার হাজার শেয়ার-হোল্ডারের শেয়ার একজনের অধিকারে এল। রামবাবুরা নির্বাসিত হলেন। শ্যামবাবুরা হারিয়ে গেলেন। সুন্দরীমোহনরা লক্ষপতি হল। সেই সুন্দরীমোহন বলেছে,—শেয়ার কেনাবেচার সময় কোন কথাতে রাগ করতে নেই। কারণ দালালশ্রেণী ক্রেতার মূত্র ও বিক্রেতার মল থেকে সৃষ্টি হয়েছে। লোকে নিজের মলমূত্রকে সর্বদাই ঘৃণা করে। সুতরাং দালালদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য নেই। দালালকে মুক্তপুরুষ হতে হবে। অল্পদিনে প্রচুর টাকা করার জন্য একটু মুক্ত থাকলে ক্ষতি কী। কথাগুলো রোমন্থন করে কানু নিজের বারেন্দ্র ট্রাডিশনকে শান্ত করল। ইতিমধ্যে মেখলিগঞ্জের পার্টি ঘরে ফিরে এল। লোকটার হাত-পা এবং মুখ ভেজা-ভেজা। এখনও অনেক জলকণা লেগে আছে। বিছানার ওপর বসেই পার্টি বলল,—নেব শেয়ারগুলো। নিয়ে আসুন। পেমেন্ট চেকে না ক্যাশে?

—ক্যাশ পেলেই ভালো, কানু জবাব দিল।

—বেশ।

দেবুর বাবা কামাখ্যাবাবু চিরকাল পর্দার অন্তরালের লোক। নাট্যশালাতে তিনি অদৃশ্য দর্শক। তিনি সব দেখেন, সব শোনেন, সব বোঝেন কিন্তু কিছু বলেন না। অদ্ভুত একটা নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে তিনি রান্না-বান্না করেন, অফিসে যান, ট্যুইশনি করেন। অবসর যতটুকু পান সবটুকুই বই পড়ে কাটান। ভদ্রলোকের অস্তিত্ব কেউ বুঝতে পারে না। কারও সঙ্গে তিনি বেশি মেশেন না। সারাদিন নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কামাখ্যাবাবু যে আছেন, চলছেন, ফিরছেন—এটা বোঝাই যায় না।

বিকেলের দিকে, তখনও সন্ধ্যা হয়নি, বর্ষাকালের মেঘের রাজ্যে কী একটা প্রচণ্ড আলোড়ন হয়ে গেছে। সারা আকাশ জুড়ে মেঘগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খণ্ডমেঘ,—কোনটা কালচে কিন্তু রুপোর পাড় দেওয়া, ফিরোজা অথবা সাদা-কালো কিংবা ধবধবে সাদা। আকাশ নীল, কিন্তু এই মেঘগুলোর অবিরত ঘোরাফেরার জন্য অসীম নয়। সারা আকাশ জুড়ে এই খণ্ডমেঘের ভিড়ে আকাশকে ভীষণ আপন লাগছে। বাতাস বইছে। সূর্য অস্ত গেছে। রেললাইন বরাবর আকাশে কোন আগুন-লাগা মাঠের মধ্যে আকাশটা শেষ হয়ে যাবে। কামাখ্যাবাবু অফিস থেকে ফিরবার সময় বাজার হয়ে ফিরলেন, হাতে বাজার, চোখ মাটিতে। দেবুর বাবা রাস্তাতে চলবার সময় এদিক ওদিক তাকান না। সোজা কোন অনির্দেশ্য শূন্যে দৃষ্টি রেখে অথবা মাথা নিচু করে তাঁর হাঁটা অভ্যাস। কোন তাড়াহুড়ো নেই, উদ্বেগ নেই তবু শম্বুকগতি নয়। বাড়ির সামনে এসে বাজারের থলেটা বাইরের বারান্দার একপাশে রেখে কামাখ্যা প্যান্ট থেকে চাবি বের করলেন। একটা ন্যাকড়ামতো রুমালের সঙ্গে চাবির গোছা বাঁধা। খুব ধীরে ধীরে তিনি সদর দরজার চাবিটা খুঁজে খুঁজে বের করলেন। মনে হতে পারে এই চাবির গোছাটা নতুন। অথবা সদর দরজার চাবি কোন্‌টা

সেটা তিনি জানেন না। আসলে চাবি খুঁজতে সময় নিয়ে কামাখ্যা একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন। বিশ্রাম নেওয়া, আঘাত হজম করা, কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়াকে পরিপাক করা কামাখ্যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি জানেন, প্রকাশ্যে হাঁপ ছেড়ে একটু প্রাণ খুলে বিশ্রাম নিলে কেউ তাঁকে কিছু বলবে না। তবু সেই হাঁপানোর নিরামিষ কাজটা পর্যন্ত প্রকাশ্যে করতে চান না। কামাখ্যাকে দেখলে মনে হবে তিনি গ্রীকদের মতো সমুদ্র এবং মহাদেশ দেখবার পর গৃহকোণে ফিরে এসে যাকে দেখবেন আশা করেছিলেন তাকে পেলেন না। ফলে তিনি নিরাশ হয়েছেন। নৈরাশ্য প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়। তাঁর মনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সেই নৈরাশ্য তিনি পরিপাক করে ফেললেন। সেই থেকে তিনি শুধু পরিপাক করেই চলেছেন। কামাখ্যার চোখে মুখে অনেক গল্প-গাথা-উপকথা জুড়ে থাকার কথা। কামাখ্যাবাবু শিক্ষিত মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের সাহিত্যের নামকরা ছাত্র। গ্রীক উপকথা এবং মহাকাব্য তাঁর খুব ভালোভাবে পড়া আছে। সুতরাং তাঁর ধারণা তিনি ইউলিসিসের মতো একটা ভয়েজ শেষ করে যখন ঘরে ফিরলেন তখন গরম ভাতের গন্ধ, বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের ঘ্রাণ, একজোড়া প্রতীক্ষমাণ আঁখির প্রয়োজন ছিল।—হ্যাঁ, পেনিলোপ। পেনিলোপকে আমার এই সময়ই প্রয়োজন ছিল। অথচ সে প্রয়াত। একটা চিঠিতে স্ত্রীবিয়োগের পর কামাখ্যা এক বন্ধুকে এই কথাগুলো লিখেছিলেন। বন্ধুটি থাকত এক গণ্ডগ্রামে। দু মাস পরে সেই চিঠি ফিরে এল। লিখিত ঠিকানাতে ডাকঘর চিঠির মালিককে খুঁজে পায়নি। চিঠিটা ঘুরে আসাতে কামাখ্যা খুশি হলেন। কারণ তিনি জানেন দুঃখের প্রকাশ যেভাবে তিনি এই চিঠিতে করেছেন ভবিষ্যতে তা আর কোনদিনই করতে পারবেন না। আকাশে খণ্ডমেঘের ছুটোছুটি। সন্ধ্যা হয়-হয়। বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর সদর দরজার চাবি খুঁজতে হয়। আজ পঁচিশ বছর চাবি খুলে খুলে তবু চাবি চেনা হয় না। কারণ যখনই বাইরে যান চাবির গায়ে খোলা হাওয়া লাগে। চাবির রং পালটায়। আকার পালটায়। দরজা খোলবার পর হাঁ-হাঁ করবে বাড়ি-ঘর। তারপর সন্ধ্যা হল। অন্ধকার ঘনাবে। মাস্তুলে একটা কালিপড়া লণ্ঠন বেঁধে দরিয়াতে নৌকা ছাড়তে হবে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সোজা ভাঁড়ারঘরে চলে গেলেন কামাখ্যা। তারপর ভাঁড়ারঘরে সব গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রেখে এসে শোবার ঘরে ফিরে জামা খুললেন। খাটের স্ট্যান্ডের সঙ্গে জামাটা ঝুলিয়ে একখানা হাতপাখা নিয়ে পা ঝুলিয়ে খাটে বসে বসে হাওয়া খেতে খেতেই কামাখ্যা টেবিলের ওপর সাদা খামটা দেখতে পেলেন। সাদা খামটা দেখেই কৌতূহলী হলেন। একটু বা নিজে নিজে হাসলেন। তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দিল। পাখা চালিয়ে চললেন। কোন ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর কামাখ্যা ঝাঁপিয়ে পড়েন না। সুতরাং চোখ বুজে পাখার হাওয়া উপভোগ করতে করতে ভাবলেন, খামে কোন টিকিট নেই, সুতরাং হয়তো লোকাল চিঠি। বাড়িতে কেউ এসেছিল, পায়নি, তাই দেবুর হাতে চিঠিখানা রেখে গেছে। কামাখ্যার বুকভর্তি লোম। শরীরটা হৃষ্টপুষ্ট, কিছুটা থলথলে। সাবেকী গম্ভীর চেহারা। মুখখানা খুব সাধারণ। দাড়ি, গোঁফ সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে সেই পুরনো সেফিল্ডের খুর দিয়ে কামান। আজ নিশ্চয়ই কামানোর দিন নয়। সেইজন্য গালে গজিয়ে-ওঠা দাড়ির একটা কালচে আভা আছে। সবকিছু ঠিক চলবে এটা অনেক দেখেশুনে কামাখ্যা যেন বুঝে নিয়েছেন। চোখ দুটো খুব বড়ও নয় আবার খুব ছোটও নয়। চোখের মণিদুটো কুচকুচে কালো নয়, মরচের রং। পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড এবং সমুদ্র ভ্রমণের সময় অ্যালবাট্রস নিধন প্রত্যক্ষ করে অথবা কোন বসন্তনিদাঘে লেক ডিস্ট্রিক্টের কুটীরে অগ্নিকুণ্ডের পাশে কবিতা নিয়ে কথোপকথনে বুকের রক্ত চমকে ওঠে। গভীর রাতে সেই আলাপচারী ম্যানিফেস্টোতে পরিণত হয় এবং আকাশের ব্রহ্মাবর্তের তারকামণ্ডলীতে দপদপ করতে থাকে। ডায়ালগের ব্রহ্মসূত্র সমস্ত গ্রীক দর্শনে আর নাটকে নিয়তির লাল ঘোড়া বারবার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করে দিচ্ছে। বাজার করা, রান্না করা,

উনান ধরানো, এসব পবিত্র নারীর কাজ। আমি মিথ্যা কথা বলি না। পরনিন্দা করি না। কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোনপ্রকার দান পরিগ্রহ করি না। সুতরাং আমি কোন পবিত্র নারী এবং মুক্ত নদীস্রোতের তুল্য অভিযাত্রীর যুগ্ম সংস্করণ। দেবুকে বাঁচাতে হবে, দেবুকে উপযুক্ত করতে হবে, —এই বালকের অভিযানে বের হতে আর দেরি নেই। পাখাটা আস্তে কোনপ্রকার শব্দ না করে বিছানার ওপর রেখে কামাখ্যা উঠে দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত শিশুকে বিছানাতে শুইয়ে দেবার সতর্কতা পাখাটা রাখার মধ্যে ফুটে উঠল। আস্তে এগিয়ে এসে খামখানা হাতে নিলেন। ঝোলানো জামার পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে দিয়ে দেখলেন যে খামখানার ওপরে দেবুর হাতে 'বাবা' কথাটা লেখা। হঠাৎ দেবুর আর নিজের মধ্যে একটা দুস্তর দূরত্বের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাতে কামাখ্যা পীড়িত বোধ করলেন। কামাখ্যা স্থান, কাল এবং পাত্রের বাস্তব সংস্থান ভুলে ভাবতে লাগলেন যে দেবু বহুদূরে কোন পরবাস থেকে তাঁকে চিঠি লিখছে। কামাখ্যার পুরুষালী ভাবটা মুহূর্তের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করল, 'পরবাস' শব্দটা তাঁর কাছে ভীষণ মিনমিনে মনে হল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কামাখ্যা শব্দটাকে ত্যাগ করলেন। চিঠি খুলে লণ্ঠনজ্বালা ঘরের প্রদোষ অন্ধকারে তাতে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য নচিকেতার অগ্নির তাপে কামাখ্যার হর্ষবোধ হল।

ইলেকশানে হেরে যাবার পর দেবুর কোন পরিবর্তন বোঝা গেল না। হাঁসের মতো সে ঝটপট পাখা থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলল। কিন্তু বেণু পড়ল মুশকিলে। কারণ তার আর করার কিছু নেই। একটা লাইনও কবিতা লিখতে পারছে না। লিখবার উপায়ও নেই। আমাদের পুরো তিনটে পেপারের নোটিং শেষ করতে হবে। টেস্ট পরীক্ষার মাত্র দু মাস দেরি। অনার্স পেতেই হবে। একটা ভদ্রকমের অনার্স পেলে অন্তত সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে একটা কাজ পাওয়া যাবেই। বি এ পাশ করার পর চাকরি করতে করতে এম এ দেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। সুতরাং বেণু কলেজে আসা কমিয়ে দিল। সারাদিন সে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অনার্স পেতেই হবে। অনার্স না পেলে উপায় নেই। যে কোনদিন অনাহারে কাটাতে হতে পারে এমনি অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচা মুশকিল। প্রতি মাসে কিছু নগদ টাকার নিশ্চিত ব্যবস্থা চাই। দেবু আর দীপু সেইজন্যই বেণুকে বিরক্ত করে না। দেবু সন্ধ্যার দিকে বান্ধব নাট্যসমাজে যায়। সেখানে নাটকের রিহার্সাল দেয় অথবা ক্যারাম খেলে। রাত নটাতে বাড়ি ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। বিকেলটাতে তিন বন্ধুর কারও সঙ্গে কারও আর দেখা হয় না।

বিভাদের ঘরে ঢোকবার পরও দীপু অনেকক্ষণ প্রভার সঙ্গে কথা বলল। প্রভার গায়ে আজ একটা হালকা জামা। তাতে ছোট ছোট লাল ফুলের প্রিন্ট। মাজার কাছে অনেক কুঁচি। ফলে ঘাগরার মতো জামাটা প্রভার হাঁটুর ওপর উপচে পড়েছে। প্রভা আস্তে আস্তে কথা বলে। অবিকল বিভার মতো।—দাঁড়াও, আমি দেখে আসি দিদির সাজগোজ হল কিনা, প্রভা বাইরে গেল। দীপু একখানা পুরনো ধরনের কালো বার্নিশকরা চেয়ারের ওপর বসে ছিল। প্রভা বাইরে যাবার পর স্বভাবতই চারিদিকে তাকাল। চারিদিকে ভালো করে দেখে দীপু বুঝতে পারল যে বিভা এই ঘরেই থাকে। সারা ঘরময় একটা পাউডার-পাউডার গন্ধ। গন্ধটা পরিচিত অথচ কোন্ পাউডারের সেটা বলতে পারবে না। দীপু মুহূর্তের মধ্যে নিজের ঘ্রাণশক্তিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলল। সেই তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি ডুবুরির মতো পাউডারের ম-ম-করা গন্ধের গভীরে ডুব দিল। নিশ্চয়ই কোথাও আরও গন্ধ লুকিয়ে আছে। দীপু বুঝল তার অস্তিত্বের একটা অংশ তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই একান্ত সুবাস খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছায়াপথে বাতাসের মতো অথবা কোন সাধুসন্তের আত্মার মতো দীপুর শরীরচ্যুত সেই অস্তিত্বের খণ্ডাংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে সারা ঘরময় ঘোরাঘুরি করে ফিরে

এসে তার শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল।—কী ব্যাপার, আপনি একা? দীপু উঠে দাঁড়াল। চোখ তুলে দেখল বিভাবরী সদ্য-সদ্য সন্ধ্যার আগে স্নান করে এসেছে। পরনে একটা সাদা শাড়ি কিন্তু খুব চওড়া সোনালী পাড়। মুখে পাউডারের প্রলেপ। চোখের ভাবটা বোঝা গেল না। তবে খালে বিলে জলের ওপর ঝাঁকড়া জামগাছের ডাল পড়লে সেখানে চোখের পাতা এবং আঁখিপল্লবের একটা ছায়া অনুমানে আসে। বিভাবরীকে আজ সন্ধ্যাবেলাতে ভীষণ রিমোট লাগছে। তা ছাড়া দীপুর তো একাই আসবার কথা। হঠাৎ আপনি একা? এই প্রশ্ন করে বিভা ইঙ্গিত করছে কেন যে তার সঙ্গে আরও কারও আসবার কথা ছিল। রহস্য ঘনীভূত হল। খালের জলের যে জায়গাতে জামগাছের ডাল ঝুঁকে পড়ে ছায়া সৃষ্টি করেছে দীপু সেইখানে খুব গভীরভাবে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,—আমার সঙ্গে কয়দিন দেবু অথবা বেণুর দেখা হচ্ছে না। বেণুর যা পারিবারিক পরিস্থিতি তাতে ওর অনার্স না পেলে উপায় নেই। খুব পড়াশোনা করছে। দেবু কয়দিন থেকে বান্ধব নাট্যসমাজে রোজ সন্ধ্যাবেলা যাচ্ছে। দেখাই হয় না। বিভা হাসল। খুব খোলাখুলি শোনাবে এইজন্য দীপু উল্লেখ করল না যে তার একাই আসবার কথা। হাসতে হাসতেই বলল,—পড়াশোনা শুরু করেছেন? আমার কিছুই হচ্ছে না। দীপু জানে কারো সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য বিভার একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। প্রথমত কারো ব্যাপারে বিভা অসম্ভব চিন্তিত এটা কোন সময়েই সে কাউকে বুঝতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, বিভার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সেন্টিমেন্ট একেবারেই নেই। বিভা খুব ঋজু। বিভা নিজেকে উন্মোচিত করে না। বিভার ব্যক্তিত্বের পাপড়িগুলো খুলবে, কিন্তু সেই পরম সাহসী যুবাপুরুষ কে? দীপু মনে মনে হঠাৎ খুশি-খুশি বোধ করল, হেসে বলল,—আমার যা অবস্থা তাতে এখনি পড়াশোনা শুরু না করলে ডুবতে হবে। বিভাবরী এবার দীপুর দিকে গভীরভাবে তাকাল। বিভার কোলে মাথা রেখে প্রভা কী আবোল তাবোল বকে চলেছে। বিভার হাত প্রভার চুলের মধ্যে। বিভাবরীর সেই দৃষ্টিতে পলকের মধ্যে দীপু খেই হারিয়ে ফেলল। দীপু চোখ নামিয়ে নিল।—এই যে এইখানে ছোট টেবিলটার ওপর রাখো। একজন পরিচারক ছোট টিপয়ের ওপর খাবারের ট্রে রেখে গেল।—আগে মিষ্টি খেয়ে নিন। তারপর নোনতার সঙ্গে চা দেব। প্রভা এবার মাথা তুলল। দীপু ট্রের দিকে কোনরকম মনোযোগ না দিয়ে প্রভার হাত ধরে টানল। প্রভা এক হাতে তার দিদির হাত ধরে রেখে দীপুর আকর্ষণকে রুখতে চাইল। এই টানাটানিতে বিভার ভারসাম্য বাধাগ্রস্ত হল, বিভা একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।—আরে, জল দেয়নি। একটু বসুন, আপনার জন্য জল নিয়ে আসি। বিভা জলের গ্লাস নিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে দেখল প্রভা দীপুর দুই হাতের মধ্যে আটকা পড়েছে। বিভা বলল,—সিগ্রেট খাবেন? দাদার ঘর থেকে নিয়ে আসি। দারুণ মজার একটা সিগ্রেট কেস। একটা সাঁওতাল যুবক; মাথাটাই স্যুটকেশ। সেটা খুলতেই তার মধ্যে সিগ্রেট বোঝাই। মুণ্ডটা খুলে ফেললেই সেটাকে একটা কৌটার মতো লাগে। বিভা আবার বেরিয়ে গেল। বিভা বুঝতে পারছে দীপুর উপস্থিতি তার মধ্যে একটা অহেতুক উল্লাসের সৃষ্টি করেছে। সিগ্রেট ধরাবার পর দীপু প্রথম উপলব্ধি করল, বিভাদের বাড়ি অসম্ভব চুপচাপ। মাথার ওপরে ফ্যানের শব্দটা ঝড়ো বাতাসের মতো ঝাপটে বেড়াচ্ছে। সাধারণত সন্ধ্যাবেলাতেই ঝিঁঝিঁপোকার ডাক এত তীব্র হওয়া উচিত নয়। পরিচারক অথবা অন্যান্য কাজের লোকদের কথাবার্তাগুলো খণ্ড-খণ্ড ভাবে শোনা যাচ্ছে। এই নিশ্রুতির জন্যই সেই কণ্ঠস্বরগুলোকে জলবাহিত মনে হয়। প্রভা একটা ছড়া শোনাল। গ্রামোফোনে হেমন্তর দুটো গান শোনা গেল। দীপু ভাবল এবার উঠব। সমস্ত কথাগুলো গোল পাকিয়ে গেল। কোন কথাই বলা হল না।—তা হলে এখন উঠি, দীপু প্রভার দিকে তাকিয়ে কথা বলল।—আর একটু বসুন। আপনাকে খুব ভাল করে এক কাপ কফি খাওয়াব। বিভা আবার বেরিয়ে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে ফিরে এল।—আপনি ভীষণ ফর্মাল। ভাবছেন রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে, আর বসা উচিত নয়। মাত্র আটটা বাজে। বিভা কথার শেষে হাসল। দীপু খুব আশ্চর্য বোধ করল। কারণ বিভা এমনি পরিষ্কার করে কোনদিন কথা বলে না। দীপু আর একটু বসুক, বিভা এটা চায়—এটা বোঝাবার জন্য বিভা কোনপ্রকার ইঙ্গিত করতে পারে এটা অভাবনীয়। কারণ বিভাবরী স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃতির মতো। তার আলো, মেঘ, আকাশ, নদী, সমুদ্র দেখে তবে তার সম্পর্কে কেবল অনুমান করা চলে। সে অনুমান যে সব সময়ই সত্য হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। ঝিরঝিরে বাতাসের মতো বিভাবরীর কথাগুলো ক্লান্তিহরণ করে। দীপু যেন নিশ্চয়তা ফিরে পেল। যদিও সে জানে বিভা অনুমানের অতীত। দীপুর এই আত্মবিশ্বাস এবং সাহস হয়তো তার একটা পরবর্তী মন্তব্যে জলে ডোবা মানুষের মতো নুনের বস্তার তলাতে চাপা পড়বে। এই মুহূর্তে খোলা আকাশের নিচে তারাদের মুখোমুখি হতে দীপুর ভীষণ ইচ্ছা করল। তারাদের অনুসঙ্গ ছাড়া বিভাকে এই মুহূর্তে ভাবা যাচ্ছে না। কফির গন্ধে সারাটা ঘর ম-ম করছে। পট থেকে কফি ঢেলে নিপুণভাবে বিভা দু কাপ কফি তৈরি করল। দীপু রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমের স্মৃতি ছাড়া এমনি পট থেকে চা এবং কফি ঢালা চিন্তাও করতে পারল না। কফির পেয়ালাতে চুমুক দিতে দিতে দীপু ভাবল, এ কথাটা কি এখন বলা ঠিক হবে যে সে জীবনে প্রথম কফি খাচ্ছে। শুধু দুজনের মধ্যে কথাটা কবুল করলে বোকা-বোকা শোনাবে। কফির আমেজে দু চোখ বুজে আসতে চাইল। সত্যি এত মজার জিনিসটার এতদিন স্বাদই পায়নি। দেবু আর বেণুকে বলতে হবে। তারপর চাঁদা করে বেণুর ঘরে কফির একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দীপু কেন যেন ধরেই নিল যে তাদের বাড়িঘরের চলিত ব্যবস্থার সঙ্গে কফিটা চালু করা যাবে না। নিষিদ্ধ নয় অথচ নাগালের বাইরের একটা অতিপ্রাকৃত ব্যাপারটাকে একমাত্র বেণুর ঘরে মানাতে পারে।—কফিটা ভালো হয়েছে তো? বিভা চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করল।—অপূর্ব, দীপু উচ্ছ্বসিত হল। বিভা তখনও তাকিয়ে। দীপুও এবার চোখ নামিয়ে নেবার আগে একটু সময় নিল।

কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে সুরেশবাবুর পরিচয় আছে। তবে তেমন কিছু নয়। তবু ঐ ছোট্ট শহরে অনেকদিন একসঙ্গে থাকবার জন্য উভয়ের সঙ্গে উভয়ের জানাশোনা আছে এটা ধরেই নেওয়া হয়। সুরেশবাবু প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পর ধরতেই পারলেন না কামাখ্যা হঠাৎ কেন এলেন। আজ পর্যন্ত কোনদিন আসেননি। সুরেশবাবু জানেন কামাখ্যা চা-পান করেন না। সুতরাং ভিতরে গিয়ে তিনি দীপুর মাকে ভালো জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন। কামাখ্যাবাবুর আগমনবার্তা শুনে দীপুর মা একটু হেসে বললেন,—খাবার তৈরি হলে আমি খবর দেব, ভদ্রলোককে ভেতরে নিয়ে এসো। বাইরের ঘরে সব সময় লোকজন আসছে; ওখানে ভদ্রলোক স্বস্তিমত খেতে পারবেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পর কামাখ্যাবাবু সুরেশবাবুদের বড় ঘরে তক্তপোশের ওপর আরাম করে বসে সিগ্রেট ধরালেন। কামাখ্যাবাবু খুব নিপুণভাবে খেলেন। খাবার সময় প্রতি পদ চেখে চেখে পুরো স্বাদ গ্রহণ করলেন। তৃপ্তির সঙ্গে ভালোভাবে জলযোগ করবার পর সুরেশবাবুর বাড়ির পারিবারিক পরিবেশে কামাখ্যাবাবু খুব শান্তি বোধ করলেন। দীর্ঘদিন নির্জনগৃহাবাসের পর লোকালয়ে এসে কামাখ্যা তাঁর জীবনের অনেকগুলো অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা ভুলতে প্রস্তুত হলেন। সুরেশ বুঝলেন কামাখ্যার এই অকস্মাৎ এবং অনির্ধারিত আগমন শুধু শুধু নয়। কামাখ্যা নিশ্চয়ই কোন কিছু বলতে চান। সুরেশ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে লাগলেন। কামাখ্যাবাবুর হঠাৎ আগমনে তিনি কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। কামাখ্যাবাবুর আজকে এই সময়ে আসাটা যেন খুব স্বাভাবিক। এটা যেন জানাই ছিল তিনি আসবেন।

কামাখ্যাবাবু সিগারেটটা একটা ছাইদানির মধ্যে ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন,—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে সুরেশবাবু। কথাটা কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না।

—আমাকে আপনি কিছু বলবেন তার জন্য অত ভাববার কিছু নেই। আপনি কোনরকম সংকোচ না করে আমাকে যা বলার বলুন।

—আমার একটা মাত্র ছেলে। পড়াশোনাতেও ভালো। ভাবছি এম এ-টাতে যদি ভালো করে তবে আমাদের অফিসে আর ঢোকাব না। যদিও কর্তা এক কথাতে আজই ওকে নিতে রাজী,—কামাখ্যা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুরেশ তাতে বাধা দিলেন। সুরেশ বললেন,—হ্যাঁ, আপনার ছেলেটি বেশ ব্রাইট দেখতে। শুনেছি লেখাপড়াতেও ভালো। তবে নাকি খুব সিনেমা দেখে?

কামাখ্যাবাবু হাসলেন, কোন জবাব দিলেন না। কামাখ্যাবাবু জানেন দীপুর মা পাশের ঘরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সুতরাং কামাখ্যা তাঁর বক্তব্য এবং আলোচনাকে একটা সচেতন পরিশীলিত স্তরে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন। কামাখ্যা মূল বক্তব্য থেকে সরে গেলেন না,—বাড়িটাও আমার নিজের। বড় রাস্তার ধারে দোকানগুলো থেকে যা ভাড়া আসে তা থেকে ছোটখাট একটা সংসার চলে যায়। সবচেয়ে বড় কথা আমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। কামাখ্যা কথা শেষ করে হাসলেন। সুরেশও আবার হাসলেন। কামাখ্যাকে আজ ভীষণ অন্তরঙ্গ লাগছে। কামাখ্যা বললেন,—একটু তাড়াতাড়ি হলেও দেবুর বিয়ের কথা ভাবছি। এমন কি এম এ পড়তে কলকাতা যাবার আগে বিয়ে দিতেও আপত্তি নেই, কামাখ্যা থামলেন। সিগারেটে টান দিয়ে হেসে বললেন,—অবশ্য যদি বেকার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি থাকে তবে দু-আড়াই বছর অপেক্ষা করতেই হবে। এই সময়ে দরজার ওপারে একটা সংকেত শোনা গেল। দীপুর ছোট বোন এসে বলল,—বাবা, মা তোমাকে ডাকছেন। সুরেশ উঠে দরজার ওপারে গেলেন। কামাখ্যা ক্ষণিকের জন্য হলেও একা। তাঁর বাড়ির একাকিত্বে মানসিকভাবে ফিরে অন্যমনস্ক। বাইরে নিশ্চয়ই মেঘ করেছে। গুরুগুরু মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে।

পরিষ্কার করে না বললেও এটা যখন সুস্পষ্ট যে কামাখ্যাবাবু রীনার সঙ্গে দেবুর বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে কোন আলোচনা না করেই ধরে নেওয়া হয়েছে সুরেশ এই প্রস্তাবে রাজী। বিয়ের সম্ভাব্য সময় এখন প্রধান বিচার্য বিষয়। কামাখ্যা প্রস্তাবটা এমনভাবে উত্থাপন করেছেন যাতে এটা ধারণা হয়েছে ঘটনাটা যেন উভয় পক্ষের দ্বারা স্বীকৃত। সুরেশ এবং কামাখ্যা মূল আলোচনা শুরু করলেন।—কামাখ্যাবাবু, আমার স্ত্রী বললেন,— আপনার প্রস্তাবে আমাদের কোন আপত্তি নেই। দেবুর বি এ পরীক্ষার পরই বিয়ে হতে পারে। আপনার সংসার বলতে ওরা দুজনেই। আপনাদের অফিসে ছেলের চাকরি পাকা। সুতরাং এম এ-তে ভর্তি হবার পর প্রথম যে ছুটিটা পড়বে সেই সময়েই বিয়েটা চুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে আজ যখন এসেছেন তখন দেনা-পাওনা সম্পর্কে কথাটা পাকা করে নিলে আমরা আস্তে আস্তে প্রস্তুত হতে পারি।

কামাখ্যাবাবু খুব প্রাণ খুলে হাসলেন। তরপর উঠতে উঠতে বললেন,—বিয়েতে কোন দেনাও নেই, পাওনাও নেই। ওসব নিয়ে কোন কিছু ভাববার নেই। এ প্রসঙ্গ আর উল্লেখও করবেন না। বাইরের বারান্দাতে এসে সুরেশবাবু বললেন,—কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ কেমন অকস্মাৎ ঘটে গেল। এমনি করে একটা পাকা কথা হবে কল্পনাই করা যায় না। লোকে বলে,—লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।—গতকাল বাড়িতে ফিরে দেখি দেবু আমার নামে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। তাতেই সব জানলাম। ওর মা নেই। কাছাকাছি কোন আত্মীয়স্বজনও নেই। সুতরাং কম্যুনিকেশনের একটা অসুবিধাও আছে। চিঠি না লিখে বেচারা করবেই বা কী, কামাখ্যা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে মুখ ঘুরিয়ে বললেন,—আপনার স্ত্রীকে বলবেন দীপুর মাধ্যমে দেবুর কানে যেন আজকের কথা-

বার্তা পেঁৗছে যায়। ও জানুক সব ঠিকঠাক হচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই। সুরেশ এবং কামাখ্যা প্রাণ খুলে হাসলেন।

সুন্দরীমোহন লম্বা মানুষ কিন্তু থপথপে। নাকটা টিয়েপাখির ঠোঁটের মতো সামান্য একটু বেঁকে গেছে। থুতনির নিচে গলার গ্ল্যান্ডটা ছোট পাতিলেবুর মতো ঢোক গেলার সঙ্গে ওঠানামা করে। ধোপদুরস্ত ধুতিপাঞ্জাবি পরে আজকাল মোটগাড়িতে যাতায়াত করে। সম্প্রতি বাবা বিশ্বনাথের কাছে মন্ত্র নিয়েছে। মন্ত্র নেবার পর থেকে সুন্দরীমোহন একটা কণ্ঠির মালা সব সময় গলাতে পরে থাকে। বাবা বিশ্বনাথ বলেছে,---ব্যাটা তুই কারবারী মানুষ। সব সময় অর্থচিন্তা করিস। কিন্তু সকালবেলা খুব ভোরে হাতে তালি দিয়ে একশোবার হরিনাম করবি। সুন্দরী উত্তর দিয়েছিল,—বাবা, সকাল ছয়টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এক মিনিট সময় নেই। কখন একশোবার হরির নাম হাতে তালি দিয়ে করব?—ব্যাটা, ভোর পাঁচটার সময় উঠবি। পাঁচটা থেকে ছয়টা এই একটা ঘণ্টা শুধু ভগবানকে দে। বাকি তেইশ ঘণ্টা ধরে শুধু টাকা পয়সা কামিয়ে যা। গুরুর কথা ফেলতে পারেনি সুন্দরী। কিন্তু গুরুর আদেশের সঙ্গে ডাক্তারের নির্দেশটা মিলিয়ে নিয়েছে। সুন্দরীর কী করে যেন এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আরথ্রাইটিস হয়েছে। নানা ওষুধপত্রের সঙ্গে ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছে, যদি দিনে ঘণ্টাখানেক সাইকেল চালাতে পারে তবে পায়ের জয়েন্টগুলো অ্যাকটিভ থাকবে। খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। প্রথম বয়সে সুন্দরী শুধুমাত্র সাইকেলের সওয়ার হয়ে তার ব্যবসা শুরু করে। সাইকেল চালাতে সুন্দরী খুব ওস্তাদ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সারাদিন সাইকেলে বসে থাকলেও তার কোন ক্লান্তিবোধ হত না। হাত ছেড়ে শুধুমাত্র প্যাডেল করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাইকেল চালাতে পারত। সুতরাং তার প্রসিদ্ধ ব্যবসাবুদ্ধিকে প্রয়োগ করে সমস্যাটির খুব সহজ সমাধান করে ফেলল। প্রতিদিন সকালে ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে সে সাইকেল চালায় এবং দুহাতে তালি দিয়ে একই সঙ্গে হরিনাম করে। সুন্দরী প্রথম জীবনের চাতুর্য এখনও ভোলেনি। সুতরাং সাইকেলটাতে স্পিড তুলে শুধুমাত্র প্যাডেল করেই ভারসাম্য রাখতে কোন অসুবিধা হয় না। দুই হাতে তালি বাজিয়ে মনের আনন্দে হরিনাম করে। অত ভোরে কানু মহারাজ যখন সুন্দরীমোহনের বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকল তখনও সাইকেল চালাতে চালাতে সুন্দরীর হরিনামসংকীর্তন পুরোদমে চলছে। তবে কানু ভাবসাব দেখে বুঝল শেষ হতে আর দেরি নেই। সুন্দরী মালকোঁছা দিয়ে কাপড় পরেছে। গায়ে পরিষ্কার গেঞ্জি। গলায় কণ্ঠির মালাতে সুন্দরীকে কেমন যেন বয়স্ক-বয়স্ক লাগছে। হাঁপাতে হাঁফাতে সুন্দরী হরিনাম করছে। মাঝে মাঝে সাইকেলটা আঁকাবাঁকা হয়ে যাবার জন্য দুটো হাত অনেক সময় মেলাতে অসুবিধার জন্য বাঁহাতে সাইকেলের হ্যান্ডেলটা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ভারসাম্য রাখতে-রাখতে সেইসব সংকটের মুহূর্তে নিজের ডান উরুতে ডান হাত দিয়ে চাপড় মেরে মেরে সুন্দরী হাততালির বিকল্প চালাচ্ছে। পরিশ্রম এবং হাত ছেড়ে সাইকেল চালানোর সার্কাসের পরিস্থিতির জন্য সুন্দরীর চোখে মুখে উদ্বেগ স্পষ্ট। তার ঠোঁটের দু কোণে জমা থুথু, ঘেমে মুখখানা চকচক, মুখ দিয়ে অবিরত 'হরিবোল' বিকৃত হয়ে হবিল-হবিল। কানু ভাবল, লোকটা এত টাকাপয়সার মালিক হয়ে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি? হাবিল-হাবিল করে ডাকলে হরি কি শুনতে পাবেন? হরির কথা মনে আসতেই কানু হাত তুলে উদ্দেশে নমস্কার করল। কানু ভাবল, যাঁর যা নাম তা ছাড়া অন্য নাম ধরে ডাকলে তিনি কেমন করে জবাব দেবেন। হাবিল শব্দটা ভীষণ মুসলমান-ঘ্যাঁসা। কানু আতঙ্কিত বোধ করল। কানু আর একবার সুন্দরীর মুখের দিকে তাকাল। কানু তাকাতেই সাইকেলটা খুব জোরে একটা চক্করের ঘোরনাতে বেঁকে গেল। তখন সুন্দরী আলগোছে বাঁ হ্যান্ডেল ধরে আছে, ডান হাত দিয়ে থোড়াতে

থাপ্পড় চলেছে এবং মুখের হাবিল-হাবিল শব্দটা প্রায় চিৎকারে পরিণত। চক্করটা পুরো করবার পর সুন্দরী সাইকেল থেকে নামল। একটা লোক দৌড়ে গিয়ে সুন্দরীর হাত থেকে সাইকেলটা নিয়ে একখানা সাদা ধবধবে তোয়ালে তার হাতে দিল। সুন্দরী তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দক্ষিণমুখে বিরাট বারান্দাতে যেখানে কানু বসে ছিল সেই দিকে এগিয়ে এল। বারান্দাতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা বেতের চেয়ারে বসতেই একটা লোক ফ্যান ছেড়ে দিল। সাদা তোয়ালেটাকে তখন চাদরের মতো জড়িয়ে একটু ঢেকেঢুকে সুন্দরী বসল। বসা অবস্থাতেই পিছন তুলে মালকোঁছার খুঁট পেছন দিক থেকে খুলে টেনে সামনের দিকে নিয়ে এল। এই কাজটা করার মধ্যে 'উঃ' করে দম বন্ধ করল এবং 'আঃ' করে দম ছাড়ল। কানু লক্ষ্য করল, সুন্দরী তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসাহাসি করলেও তখনও কোন কথা বলেনি। নিজের শারীরিক অনেকগুলো উত্থানপতন এবং ভঙ্গিপরিবর্তন করতে করতেই একখানা ঝকমকে স্টেইনলেস স্টীলের ট্রের ওপর একগেলাস শরবত, এক কাপ চা, এক প্লেট কাজুবাদাম এসে গেল। ট্রেটা বড়। এতগুলো জিনিস থাকা সত্ত্বেও পাশে অনেকটা জায়গা থাকে, সেখানে সুন্দরীর চশমার খাপ। চশমাটা সুন্দরীমোহন তুলে নিল। খাপ থেকে চশমা বের করে দুটো কাঁচেই মুখ হাঁ করে ভাপ দিল, তারপর কোঁচার খুঁট দিয়ে কাঁচ-দুটোকে পরিষ্কার করতে লাগল। চশমাটা দু-তিনবার উঁচু করে তুলে সুন্দরী নিশ্চিত হতে চাইল কাঁচে আর কোন দাগ নেই। চশমাটা চোখে দেবার পর গলার কণ্ঠির মালা বেশ মানানসই দেখাল, কানু বুঝতে পারল না যে মালাটা সুন্দরীর গলাতে এতক্ষণ হাস্যকর লাগছিল চশমা পরার পর সেটা মানিয়ে গেল কী করে। চশমা পরেই সুন্দরী নিজের শরবতের গেলাসটা টেনে নিল। —তারপর, কানুদা কেমন আছেন? চুমুক দেবার আগেই সুন্দরী কথা বলল, কথা শেষ করার পর সঙ্গে সঙ্গে একটু লম্বা চুমুকে খুব শব্দ করে একটা টান দিল। কানু হাসল, তারপর বলল,—
সঙ্গে সঙ্গে একটু লম্বা চুমুকে খুব শব্দ করে একটা টান দিল। কানু হাসল, তারপর বলল,
—তোল এখানে একেবারে ছাহেবী কায়দা। সুন্দরীমোহন হাসল কিন্তু জবাব দিল না। আবার আর-একটা চুমুকে গ্লাস শেষ করে বাদামের প্লেটটা সুন্দরী কানুর দিকে এগিয়ে দিল। কানু একমুঠো বাদাম তুলে নিতে নিতে বলল,—আমাকে দেকেত কেন?—কানুদা, আমার মাথাতে একটা প্ল্যান এসেছে। সেইজন্যই আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম। সুন্দরী থামল। প্লেট টেবিলে নামিয়ে রেখে তা থেকে নিজে একমুঠো কাজু মুখে পুরে আবার কথার খেই ধরল।—আপনাকে এবার দূরে পাঠাব।

—কোথায়?

—বেনারসে. সুন্দরী বাদামগুলো চিবিয়ে গেলবার আগে কথা বন্ধ করল। যে-কোন খাদ্য খাবার সময় সেটাকে গেলবার আগে সে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে। আজকাল এই ভয়টা কেমন বেড়ে গেছে। আগে মাঠেঘাটে সময়ে অসময়ে যা তা গিলেছে, কিন্তু কোনদিন মনেই হয়নি যে চিবানোর পর খাদ্যবস্তুটা হঠাৎ শ্বাসনালীতে ঢুকে যাবে। চিবিয়ে গেলবার আগে আজকাল প্রতি-মুহূর্তে মনে হয় খাবারটা যে-কোন সময়ে তার শ্বাসনালীকে ব্লক করে দিতে পারে। পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। পানের বিষম লেগে অনেক লোক মারা গেছে, এমন কাহিনী প্রায়ই শোনা যায়। সুন্দরীর দ্বিতীয় ভয় সাপ। কাজের জন্য সুন্দরীর বাইরে যেতে হয় এবং অধিকাংশ সময় বাইরে থাকতেও হয়। সেইসব সময়ে সুন্দরী বিশেষ সাবধানে চলাফেরা শোয়াবসা করে। যে ঘরে বা তাঁবুতে সুন্দরী শোয় সেই ঘর এবং তার আশপাশ পুরো কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে ধোওয়া-মোছা করা হয়। যত রাত্তিরই হোক, সুন্দরী দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার সামনে বিছানা পাতা হয়। বালিশের ওয়াড়গুলো খুলে আবার পরানো হয়। তোশক উল্টোপাল্টা করে ঝাড়ার পর মশারির কানাতে খুব

ভালোভাবে গংজে দেবার পর বিছানার মধ্যে ঢুকে সে সব সময় টর্চটা পরীক্ষা করে নেয়। ঘুম আসবার আগে সুন্দরীর চোখের সামনে প্রতিদিন নানা জাতের সাপের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। নানা বর্ণের এবং দৈর্ঘ্যের সাপগুলো দেখে পরদিন কেমন যাবে, সেটা সে বুঝতে পারে। কালো কুচকুচে জাতগোখরো জমি থেকে সাড়ে তিন হাত মাথা তুলে ফণা বিস্তার করে ফোঁসফোঁস করছে, এটা দেখতে পেলে বোঝে তার মোটা মোটা ডিলগুলোর বেশির ভাগ আগামীকাল পাকা হয়ে যাবে। পুঁইগাছের ঘন সবুজ সাঁওতালী যৌবনকে জড়িয়ে একটা লাল টকটকে খুব লম্বা সাপ যদি ফণা না তুলে মাথা নাড়ায়, তবে বুঝতে হবে কাজে বাধা আসবে। সারা পথ জুড়ে হেলে সাপ কিলবিলিয়ে ঘুরছে এবং সুন্দরী কোন অচেনা সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে, পথে নামতে পারছে না—এমনি ছবি যদি চোখ বুজে দেখতে পায়, তবে নতুন শেয়ার বুক করার ক্ষেত্রে গোলমাল হবেই হবে। শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন মা মনসার শাস্তর বলত। শোনবার কেউ ছিল না। মা নিজের মনে মনেই বলে নিজেই শুনত। বহুবার ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে তার শাস্তরটা একেবারে মুখস্থ। ভুটানের একটা উপত্যকার কিনারে নতুন গজিয়ে-ওঠা জনপদের একটা বাংলোতে কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধে তোলপাড়া হওয়া ঘরের জানলা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া ঢুকছিল। ঠান্ডা শুকনো বরফের ওপর দিয়ে বয়ে আসা কোন গিরিশিখর থেকে হিমপ্রবাহের মতো বাতাস সুন্দরীর ঘরের কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধকে ঝেঁটিয়ে সরাতে লাগল। সুন্দরী নানাভাবে একথা ওকথা বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারাদিন ধরে নানা কাজের মধ্যে নানা লোকের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে এই অঞ্চলে সাপের ভয় আছে কিনা। সবাই প্রায় একসংগে বলেছে, আরে মশায়, এই ঠান্ডাতে এবং এই অলটিটিউডে কোন সাপ বোধ হয় থাকতে পারে না। প্রায় প্রত্যেকটা লোকের মুখে একই ধরনের মন্তব্য শুনেও কিন্তু তার ভয় কাটল না।—একটু জ্বর-জ্বর লাগছে, এমনি ছুতো করে স্থানীয় ছোট্ট হাসপাতালে গেল। ডাক্তারবাবু ভালোভাবে দেখাশোনা করে বলল,—তেমন তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তবে হয়তো হঠাৎ এই এলিভেশানের জন্য একটু বা ফিভারিশ বোধ করতে পারেন।—আসবার পথে হঠাৎ একটা সাপ গাড়ির সামনে পড়ল। ভাবলাম সর্পদর্শন শুভলক্ষণ। কিন্তু কোথায় কী আজকাল এসব কিংবদন্তীর কোন ঠিক নেই। ওপরে এসেই শরীর খারাপ লাগছে।—আমি মশাই চব্বিশ বছর আছি। কোনদিন একটা সাপ এই পাহাড়ে দেখিনি। এই হাইটে আর ওয়েদারে সাপ থাকতেই পারে না। আপনি নিশ্চয়ই সর্পভ্রমে রজ্জু দেখেছেন। ডাক্তারের হাসিতে যোগ দেবার পর সুন্দরী নিশ্চিন্ত বোধ করল। সুতরাং কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে ঘর ধোয়া-মোছার পর তার ধারণা হল যে ঠান্ডা হাওয়া যদি খোলা জানলা দিয়ে ঢোকে তবে সারা ঘরে সাপ থাকার আশঙ্কা আরও কমে যাবে। সারা ঘর হিমকাতর হয়ে এল। সুন্দরী সেই ঠন্ডাতে বাতাসে শীতল শবের মতো সোফার ওপর অনেকক্ষণ এলিয়ে চোখ বুজে এবং অসহ্য অবস্থাতে হাজার হাজার জানলা বন্ধ করে বড় লাইট নিভিয়ে ছোট্ট নীল রাত-আলো জ্বালিয়ে বিছানাতে ঢুকল। বিছানাতে গরম জলের ব্যাগ ছিল। জানলা বন্ধ করার পর ইলেকট্রিক হিটার অন করে দিল। সুতরাং ঠান্ডা-হিম-হওয়া আস্তে আস্তে গরম হতে শুরু করল। লেপের মধ্যে কম্বলের নিচে ঢুকে সে শুনতে পেল বাতাস বন্ধ, জানলার ওপর ফিসফিসিয়ে মা মনসার শাস্তর বলছে।

—একটা কথা বলেই তুমি এতক্ষণ চুপ করে কী ভাবছ?

—কানুদা, আপনাকে বেনারসে গিয়ে সোজা মা আনন্দময়ীর আশ্রমের পাশে হরিবাবার কুটীরে যেতে হবে। আপনি তো বেনারসে অনেকদিন ছিলেন, জায়গাটা আপনার চেনা। সেই হরিবাবা সর্পশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছে। সে তার ঘনিষ্ঠ ভক্তদের খুব জোরাজুরি করলে এমন একটা শেকড় দেয় যা লাল সুতো দিয়ে ডান হাতে পরলে একশো হাতের মধ্যে সাপখোপ আসতে পারে না।

—সাপ নিয়ে তোমার এত চিন্তার কারণ কী?
—জলজঙ্গলে ঘুরি কানুদা, একটু প্রোটেকশন নিয়ে চলাফেরা করা ভালো।
—তা কবে যেতে হবে?
—যেদিন আপনি যাবেন। সমস্ত খরচখরচা বাদে আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব।
—বেশ, তবে আগামীকাল রওনা হব।
—জয়, কানুদার জয়।

রাধাগোবিন্দ হরিনামব্রত ব্রহ্মচারীর কাটোয়া আশ্রমে যোগ দিল। কেউ ভাবতেও পারেনি। রাধাগোবিন্দ রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে আধুনিকতম চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছে। রাধাগোবিন্দর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কেউ খুব বেশি জানে না। তবে রাধাগোবিন্দর বয়স অনেক। প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাধাগোবিন্দ যোগ দিয়েছিল। তখন সে সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তারপর উনিশশো আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত সে সামরিক বিভাগেই ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর সে মুক্ত হয়নি। স্বাধীনতালাভের পরে গোটা প্রতিরক্ষা দপ্তর নানারকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। রাধাগোবিন্দ এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একজন ব্রিটিশ অফিসারের অধীনে কাজ করছিল। প্রতিরক্ষা দপ্তরের নানা সরঞ্জাম ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মধ্যে বণ্টনের কাজ তখনও শেষ হয়নি। কাজটা যখন শেষ হল তখন উনিশশো পঞ্চাশ সাল, সেই ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গী হিসেবে দিল্লীতে পেঁছেই সে সংবাদ পেল যে তাদের রেজিমেন্ট ডিমবিলাইজড হবে এবং সেই উপলক্ষে পুরো রেজিমেন্টকে পুনাতে জমায়েত হবার জন্য আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু রাধাগোবিন্দের সাহেব অফিসারটি মুক্ত সৈন্যদের পুনর্বাসনের জন্য দিল্লীতে যে দপ্তর তখন কাজ করছে সেইখানে একজন বন্ধুকে খুঁজে পায়। তারই চেষ্টাতে রাধাগোবিন্দ নিজের শিক্ষা আরও বাড়াবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী খুব ভালো একটা স্টাইপেন্ড পেয়ে যায়। পুনা থেকে রাধাগোবিন্দর কলকাতাতে যাবার পরিকল্পনা ছিল। হঠাৎ নিজের এক সহকর্মীর সঙ্গে ট্রেনে দেখা হবার পর সে সোজা এই শহরে চলে আসে। রাধাগোবিন্দ এই অচেনা অজানা উত্তুরে শহরে হঠাৎ কী করে এসে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে গেল তার পুরো রহস্য কারও আজও জানা নেই। তবে এই শহরে আসবার পর রাধাগোবিন্দ এক ঘণ্টার জন্যও হোস্টেল ছেড়ে কোথাও যায়নি। সে রাতদিন তার ঘরে থাকে। পড়াশোনা করে। চিঠি লিখে কলকাতা থেকে বইপত্তর আনায়। শুধু পড়া আর পড়া। পড়াশোনার বাইরে রাধাগোবিন্দের অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন কৌতূহল নেই। কোন ছেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দানা বাঁধেনি। অথচ প্রত্যেকের সঙ্গেই তার ভাব। রাধাগোবিন্দ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক। অথচ কোন ছেলের বিপদে আপদে, অসুখবিসুখে রাধাগোবিন্দ প্রাণ দিয়ে সাহায্য এবং সেবা করে। তখন সে আর কোনদিকে তাকাবে না। কারও সঙ্গে কোন কথা বলবে না। নিজ মনে নিঃশব্দে সব ভার নিজে হাতে তুলে নেবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে তার ছোট্ট সিঙ্গল সীটেড ঘরে আবার রাধাগোবিন্দ অদৃশ্য। রাধাগোবিন্দ ধন্যবাদের জন্য অপেক্ষা করে না। বিদায়-সম্ভাষণ জানায় না। সময় এবং নিয়তির হাতে নিশ্চিন্তে নিজেকে সমর্পণ করে ভালো, মন্দ, নিন্দা, স্তুতি, জয় পরাজয় প্রভৃতি দৈনন্দিন উত্তেজনা থেকে সে মুক্ত। বিখ্যাত এবং বহুপঠিত ইংরেজী কবিতা গ্রামারিয়ানস ফিউনিরালের পানিসী হিসাবে রাধাগোবিন্দকে ভাবা খুব স্বাভাবিক। নিঃসঙ্গ বৈয়াকরণ হিসেবে সকলের অজ্ঞাতে সে একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তার সম্পর্কে এটা সহজেই ভাবা যায়। অথচ এই ইমেজটা বারে বারে সবার মনে এলেও কারও মনেই সেটা পাকাপাকিভাবে দানা বাঁধেনি। কারণ রাধাগোবিন্দের অসম্ভব পড়াশোনা এবং সাম্প্রতিকতা তার চরিত্রের নেসফিল্ডিও

রহস্য শ্যাওলাকে ঘষেমেজে একেবারে মরচেহীন ইস্পাতের মতো ঝকমকে করে রেখেছে। রাধা-গোবিন্দ অনেক পুরনো একটি মজবুত দালাল। মনে হবে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের শরীরবিদ্যার ছাত্র কঙ্কালের পূর্বজন্মের জীবনকাহিনী সারা রাত ধরে এই বাড়িতেই শুনেছিল। সুতরাং জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে রাধাগোবিন্দ নামে দরদালানকে সংরক্ষণের জন্য দাবি তোলার কথা দর্শক ভাবতে পারে। অথচ চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেই দেখা যাবে, সভ্যতার আধুনিকতম ফসল সেখানে জীবন্ত। কোন লম্বা করিডোরে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সাদা মানানসই ট্রাউজার্স এবং হাত অর্ধেক গোটানো স্ট্রাইপড শার্ট পরা উজ্জ্বল তরুণরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা অত্যন্ত সপ্রতিভ। দ্রুত টেলি-ফোনে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। টকটক করে এলিভেটর থেকে নেমে বিরাট কাঁচের পুশডোর ঠেলে মধ্যবয়সীরা বাইরে যাচ্ছে। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো কোন একটা যন্ত্রের আওয়াজ। লম্বাচুল একদল ছেলে জোরে কবিতা আবৃত্তি করার পর কতকগুলি অর্থহীন অপ্রচলিত শব্দ বিমূর্ত প্রতিধ্বনি হয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে উড়ে উড়ে বসল। অর্থাৎ বাড়িটির প্রতিটি স্নায়ুতে গরম লাল রক্ত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, বাড়িটা নেই। ঝড় হয়নি। ভূমিকম্পের কোন চিহ্নই নেই, অথচ বাড়িটা হাওয়াতে উড়ে গেছে। রাধাগোবিন্দ দেনাপাওনা মিটিয়ে ঠিক পরীক্ষার আগে আগে কোথায় চলে গেল। সে প্রায় দুমাস আগের কথা। অনেক রটনা দীপুর কানে এসেছে। প্রথমে শোনা গেল রাধাগোবিন্দ প্রকৃতপক্ষে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর। সে ভারতীয় মফস্বলী যুবকদের ধ্যানধারণা নিয়ে স্টাডি করছিল। তার কাজ শেষ হওয়াতে সে চলে গেছে। ক্রমে ক্রমে এই প্রচারটা কমে এল। কিন্তু পিঠোপিঠি আবার নতুন করে শোনা গেল যে রাধাগোবিন্দ খুব মারাত্মক রকমের একটা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। আত্মগোপন করার জন্যই এতদিন সে পড়াশোনার ছুতো করে এখানে লুকিয়ে ছিল। আপাতত সে টের পেয়েছিল যে এই শহরে তার খবর শত্রুপক্ষের লোকেরা পেয়ে গেছে। সুতরাং যেমন হঠাৎ রাধাগোবিন্দ এখানে এসেছিল তেমনি অকস্মাৎ সে হারিয়ে গেল। কোন নারী তাকে নাকি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর সেই নারীর মনে দীর্ঘদিন পরে আবার পরিবর্তন এসেছে। তার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে রাধাগোবিন্দ ছুটে গেছে। সমস্ত গুজবের অবসান ঘটিয়ে রাধাগোবিন্দ তার অন্তর্ধানের দিন পনেরো বাদে কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে একটা চিঠি দেয়। কারণ তার ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান বিবেচনা করে রাধাগোবিন্দ নাকি অনুভব করেছে বর্তমানে প্রিন্সিপ্যালই তার নিকটতম পুরুষ যার কাছে তার হঠাৎ চলে আসবার মতো ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে কিছু লেখা যায়। অবশ্য প্রিন্সিপ্যালকে নাকি রাধাগোবিন্দ একথাও লিখেছিল যে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কও শেষ হল। সেই চিঠিতেই প্রথম জানা যায় যে রাধাগোবিন্দ কাটোয়া শহরে হরিনামব্রত ব্রহ্মচারীর আশ্রমে যোগ দিয়েছে। আজ হঠাৎ দীপু সকালের দিকের ডাকে রাধাগোবিন্দর একটা চিঠি পেল। দীপু জানে না রাধাগোবিন্দ আর কাউকে এমনি চিঠি লিখেছে কিনা। গোটা গোটা অক্ষরে একটা চিঠি। দীপু চিঠিখানা অনেকবার পড়ল। চিঠিখানা পড়তে পড়তে দীপুর ভীষণ মন খারাপ হল। চিঠিখানা মুড়ে সে টেবিলের তলাতে রাখল। টেবিলক্লথের তলাতে চিঠিখানা রাখতে রাখতে সে ভাবল, রাধাগোবিন্দ মায়ের পেট থেকে বেরিয়েই স্বেচ্ছানির্বাসনে আছে। যেখানেই সে থাকবে সেখানে কিছু গাছপালা এবং কয়েকজন মানুষ তার আপন হয়ে যায়। চলে গেলে তারা আবার পর হয়ে যাবে। অথচ এই চিঠি পাবার আগে কোনদিন ভাবতেও পারেনি রাধাগোবিন্দ এত ভীতু মানুষ। লোকটা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। দিনে রাতে, সব সময়ে এই প্রচণ্ড ভয়ে জড়সড় হয়ে সে মরে যাচ্ছে। ভয় রাধাগোবিন্দের চরিত্রের একমাত্র তাড়না। এই তাড়কা রাক্ষসীর তাড়নাতে ঘরময় ছুটোছুটি করে না বেড়ালে রাধাগোবিন্দ বাঁচতে পারবে না। ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই রাধাগোবিন্দ সচল আছে। এই বিভীষিকাটা থাকলে উত্তরমেরুর হিমবাহের তলাতে রাধাগোবিন্দ

মারা যেত। দুহাজার বছর পরে তার জীবাশ্মে নির্বাসনপ্রবণতার জীবাণু সূক্ষ্মতম অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের তলাতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ যে মানুষ একা একা কোন নিরক্ষীয় অরণ্যের মধ্যে কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে শুধু পাতার কুটীরে বছরের পর বছর কাটায়, সে ইচ্ছা করলেই মরতে পারে। তার পক্ষে মরা খুব সহজ। অথচ এই স্বেচ্ছানির্বাসনীরা কোনদিন আত্মহত্যা করে না। শুধুমাত্র অরণ্য থেকে পাহাড়ে, পাহাড় থেকে উপত্যকাতে, উপত্যকা থেকে দ্বীপে, দ্বীপ থেকে তুষারে ঢাকা পর্বতচূড়াতে ঘুরে ঘুরে বাস করে। এরা পাতালগামী। পাতালের গভীরতা এবং শব্দহীনতার আনুপাতিক গুণের ওপর এরা কোন জায়গাতে কতদিন থাকবে তা নির্ভর করে। নিরক্ষীয় অরণ্যে রাতের বাতাসের কোলাহল বিরক্ত বোধ করলে আরও একধাপ নিচে পাহাড়ের গুহার পাতালে। সেখানে মড়ার খুলিতে ভরদুপুরের ঘূর্ণিবাতাসের মতো ঝিঁঝির কাঁদুনি ভালো না লাগাতে জনহীন উপত্যকার গোচারণভূমিতে হঠাৎ আসা যাযাবর মানুষদের তাঁবু এবং সন্ধ্যাতে তাদের উনোনের আগুনে পাতালের ছায়া নিহত হবার আগেই জনমানবহীন দ্বীপে একা-একা একটা ক্যানো নিয়ে হাজির হয়। ক্যানোখানা টেনে ডাঙায় তুলে সেখানে বসবাস শুরু করে এবং শরৎকালে সাইবেরিয়া ও অন্যান্য শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে বেলে হাঁসের ঝাঁক আকাশ অন্ধকার করে এই জনশূন্য দ্বীপটিতে বিকেলে এসে নামে। তখন সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হওয়াতে হ্রস্বদিনগুলো খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। সেই লোকটা তার ক্যানো আবার জলে ভাসায় এবং ঘুরতে-ঘুরতে কোন পাহাড়তলিতে নেমে অনেক অনেক দূরে পাহাড়ের চূড়া লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকে। তখন দিন আরও ছোট হয়ে আসে। পাহাড়ের এই উচ্চতাতে গভীর রাতে ব্লিজার্ড তাড়া করে, তারপর রাধাগোবিন্দের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

বেণুর কথা॥ মনে হয় যেন রিভলভিং স্টেজে অভিনয়। স্যুটবুটপরা লোকগুলো চুরুট মুখে মঞ্চ ঘুরতেই খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবি পরে আবার প্রবেশ করল। দেখে মনে হবে না এই ভদ্রলোকরা কোনদিন স্যুটবুট পরে একটা রায়বাহাদুরি বা ও বি ই-র এর জন্য বুড়োশিবতলাতে শিরনি চড়িয়েছে। আরও আশ্চর্য লাগে, সেই স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতাদের সঙ্গে হঠাৎ এই নতুন নেতাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। একটা অলিখিত শত্রুতার চুক্তি যেন খারিজ হল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে এই খয়েরখাঁরা বড় বড় পদ পেল। কারণ পুরনো নেতারা প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অনুপযুক্ততার ব্যাপারে হীনম্মন্যতাতে ভুগছেন। তাঁরা জানেন, এই এস্টাবলিশমেন্ট চালাতে হলে কিছু এই ধরনের সময়ের সেবকদের প্রয়োজন। বল্লভভাই লোকসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে সুদক্ষ প্রশাসক হিসেবে প্রাক্তন সিভিল সার্ভিসের সভ্যদের উপযোগিতা এখনও আছে। বল্লভভাই জীবিত থাকলে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করত, এই সোনার খাঁচার পাখিরা যে ভাষাতে কথা বলে জনসাধারণ কি সেটা বোঝে? যে পোশাক এরা পরে জনতা তা কি কোনদিন দেখেছে? এইসব রাজপুত্তুররা চিরকাল সাহেবদের জমিদারি রক্ষার নায়েবের কাজ করেছে,—পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রে এরা কী করে পৌঁছবে? পায়ে ফোস্কা পড়বে। রোদে সর্দিগর্মি হবে। গ্রামের ভূতবাংলোতে ঘুম আসবে না। অথচ আমি বেণু, তরতাজা তেইশ বছরের যুবক—বসে আছি। আমার সামনে কোন প্রোগ্রাম নেই। দুবেলা আমার খাওয়া জোটে না। চারটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চারজন সর্বভারতীয় মন্ত্রী যুবকদের দেশের কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন। অথচ কোন প্রতিষ্ঠানে একটা চাপরাশির কাজও খুঁজতে গেলে সে পাবে না। কথার উদরাময়ে এই মন্ত্রীরা ভোগেন। মন্ত্রিতন্ত্র একটা নতুন শ্রেণী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শুধু তাই নয়, টার্নকোটরাই আজ রাজনৈতিক ফ্যাশনের প্রধান প্রবক্তা। তবে আমি বেণু কী করে বাঁচব। আমি সংসারে কৃমিকীট

হয়ে বাঁচতে চাই না। আমার সামনে বাঁচবার কোন উপায় দেখছি না। সেদিন সমীরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম পরীক্ষার পর হঠাৎ তুই আর রেবা একটা বোকার মতো কাণ্ড কেন করলি? কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল। আমরা বন্ধুরা ছিলাম। তোরা দুজন বন্ধুদের কাছে বললেই আমরা পুরো প্রোটেকশান দিতাম। সমীর নিরালা রেস্তোরাঁতে চায়ে চুমুক দিয়ে প্রথমে গুম হয়ে বসে রইল। তারপর সিগারেট ধরাল। সিগারেটে অনেকগুলো লম্বা টান দিয়ে বলল, —এখনও যদি তোর বন্ধুদের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট থাকে তবে তোকে আমাদের গল্প শোনাতে পারি। —বোকার মতো কথা বলিস না সমীর। পরস্পর সম্পর্কে আমরা কৌতূহল কী করে হারাব, আমি রাগ চেপে সমীরকে কথাগুলো বললাম। আমার কথাগুলোর মধ্যে তবু রাগ যেন গোমরাতে লাগল। সমীর এবার মিষ্টি করে হেসে বলল,—তবে শোন।

আমার আর রেবার মধ্যে পুরো চার বছরের কলেজ জীবনে কোন হার্দ্য সম্পর্ক গ্রো করেনি। হার্দ্য কথাটাই ব্যবহার করলাম। আজকাল লক্ষ্য করছি রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখার রীতি যা আমাদের কলেজ জীবনের প্রথমেও কথা বলার আদর্শ ছিল–সেটা ভেঙে যাচ্ছে। কথার মধ্যে আজকাল স্ল্যাং-এর ব্যবহার প্রচুর। অশ্লীল শব্দের ছড়াছড়ি। তাই আমি এখন কনসাসলি তৎসম শব্দ ব্যবহার করি। ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এই একক ক্রুসেড কিছুটা কুইকসোটিক। যাই হোক, আপাতত এই প্রসঙ্গ থাক। যে কথা বলছিলাম আবার সেই প্রসঙ্গে ফিরে যাই। পরীক্ষা দেবার কিছুদিন আগে থেকেই আমি বুঝতে পারছিলাম ছাত্রসম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে আমার অস্তিত্বের যে মূল্য ছিল তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কোন শোভাযাত্রাতে, সভাতে, খেলার মাঠে, কলেজ ক্যাম্পাসে অথবা করিডোরে আমার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকত। সম্ভাবনার প্রত্যাশাতে আমি দপদপ করতাম। অথচ আমি কেমন বোকা-বোকা দেখতে হয়ে গেলাম। আমার মনে এলিয়টের সেই উপমাটা বারবার ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। আমি যেন অচেনা একটা লোকের দুই আঙুলের ফাঁকে একটা নিঃশেষিত সিগারেটের ছাই। আঙুল দুটো একটু ঝাড়া দিলেই ঝরে পড়ব। যদিও এলিয়ট ইমেজটা অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু আমার মনে দগ্ধপ্রায় চুরোটের তুলনা এইভাবে এল। চিন্তা, কাজের স্বপ্ন, বৃহৎ মানবিক ঘটনাগুলো নিয়ে বাদপ্রতিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগলাম। আমি দেখলাম ব্যক্তি-গতভাবে আমার পায়ের তলাতে কোন জমি নেই। সম্প্রদায় হিসেবে যেটা ছিল সহজ, ব্যক্তি হিসেবে সেটা অসম্ভব। পুরোপুরি নাগালের বাইরে। এই প্রথম বুঝলাম এস্টাবলিশমেন্টের দরজা খোলবার জন্য ওপেন সিসেমি আমি জানি না। আরও বুঝলাম, আমি একা। আমরা সব বিচ্ছিন্ন। কারও সঙ্গে কারও কোন বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। যেসব লোক আগে দেখে জ্বলজ্বল করে উঠত, তাদের মুখের ভূগোল পাল্টে গেল। কাছে গেলেই ভাবে আমি কোন ধান্দাতে এসেছি। নিজেকে নির্বাসিত মনে হতে লাগল। এই সময়ে আমি বহুবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। কোলিয়ারিতে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলন এবং গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মধ্যে কাজ করার কথা মনে এসেছে,—এমনকি সন্ন্যাসী হবার কথা ভাবিনি এমন নয়। এই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা একা-একা নদীর পাড়ের বাঁধে হঠাৎ রেবার সঙ্গে দেখা। রেবা আমাকে দেখে কেঁদে ফেলল।

—সমীর, আমি সত্যি মরে যাচ্ছি। শহরে কত ফাংশন হচ্ছে, আমাকে কেউ ডাকে না। আমাদের পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে, কী রেবা, ভালো তো? কেমন আছ? এখন কী করবে ভাবছ? তবে বলো সমীর, আমি কি ফুরিয়ে গেছি। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের সফরের সময় মাত্র আট মাস আগে তিন হাজার ছাত্রীর বিরাট মিছিল নিয়ে আমি সার্কিট হাউস অবরোধ করিনি? বেণু সেই ঘটনাটা নিয়ে অবরোধ নামে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছিল। রিকশা করে রাস্তা দিয়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখত। তোমার মনে আছে সমীর, টাউন ক্লাবের ময়দানে তিন রাত ধরে

আমরা সংস্কৃতি সম্মেলন করেছিলাম। পঁয়তাল্লিশ রকমের গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্রের অর্কেস্ট্রা। লোক পাগল হয়ে গিয়েছিল। তারপর ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া নৃত্যনাট্য,—আজ ভাবতে পারো সমীর যে সমস্ত শহরকে কী-রকম উত্তাল করে তুলেছিল? হাজার হাজার দর্শক খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। ঘটনাটা পরপর ঘটল। আর আশ্চর্য, তিনটে ঘটনাই দারুণ সাকসেসফুল। রক্ত-করবীতে নন্দিনীর অভিনয় দেখে পুরন্দর আত্মহত্যা করেনি? সোজা কথা সমীর? একটি পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির সবল যুবক যার কোঁকড়ানো লালচে চুলের বাবরিতে প্রজাপতি আটকে যেত, যার হাসি গমকে গমকে মরা বাগানে ফুল ফোটাত,- সে আমাকে দেখে এবং আমাকে পাবে না জেনে নিজেকে নিজে ধ্বংস করল। ওর স্মৃতি একটা টকটকে লাল ফুলের মতো আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে। আমি জানি, কালে কালে ঐ লাল ফুলটা একটা জীবাশ্মে পরিণত হবে। তারপর একটা মাণিক্যের মতো ওটা আমি মালা করে গলায় পরব। আমার কথাগুলো হিস্টিরিয়া রোগীর মতো শোনাচ্ছে তা আমি জানি। আমার আবেগ, আক্ষেপ মাজাতে-আঘাত-লাগা সাপের মতো মাটিতে দাপাচ্ছে। কারো সঙ্গে দেখা হয় না। চারিদিকে স্থূল কথাবার্তা। আমি কেমন করে কোথায় নিজেকে প্রকাশ করব। যৌবন আমার কাছে অমূল্য রতন। কাউকে আমি এ জিনিস দিতে পারব না। এমনকি মহাকালকেও না।

রেবার সেই অতিনাটকীয় কথাবার্তা, কান্না, চিৎকার, আর্তনাদ আমার সেদিন খারাপ লাগেনি। কারণ, আমি তেমনি দলছুট এবং জীবনছুট। রেবার মৃগীরুগীর মতো আচরণে আমার কিছুটা ভাবমোক্ষণ হল। তখন অন্ধকার। খরস্রোতা নদীতে প্রবল কোলাহল। পুরো আকাশজোড়া মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাঁধ পেরিয়ে আমি আর রেবা শহরের প্রধান রাজপথে নামতে নামতে জ্ঞান ফিরে পেতে শুরু করেছি। শহরের পথে আমরা প্রচণ্ড বিষ্টির মধ্যে দৌড়ে একটা দোকানে উঠলাম। দুজনের কারো কাছেই পয়সা নেই। অবশ্য পয়সা না থাকবার মতো পরিস্থিতি নয়, তাতে সেদিন সত্যি এমনি হঠাৎ আমাদের কারো কাছে পয়সা ছিল না। সুতরাং চা খাবার প্রবল ইচ্ছা প্রশমন করে আমরা হিসাব করলাম এই অঞ্চলের একশো আটটা স্কুল, তিনটে কলেজ, একটা পলিটেকনিক এবং আরও গোটা দশেক খুচরো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাত্র একজন ভদ্রলোক নিয়ামক। তাঁর সম্মতি ছাড়া ঐসব জায়গাতে একটা মাছিও ঢুকতে পারবে না। রেবার বাড়ির অবস্থা ভালো। শুধু ভালো নয়, খুব ভালো। কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবন বাঁধতে হলে বাড়ির অবস্থার ওপর নির্ভর করলে চলবে না। চাকরি চাই। অথচ প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের অবরোধ করার পর বীরাঙ্গনা রেবাকে ঐ ভদ্রলোক কী করে চাকরি দেবেন? তাঁরা ব্যাপারটা মনে মনে পুষে রেখেছেন। সুযোগ পেলেই হিট ব্যাক করবেন। আমার কথা তুমি জানো বেণু। অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ। তবু সেই রাতে আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম আমরা পালাব।

টাকাপয়সার ইমিডিয়েট কোন প্রোব্লেম নেই। দাদার অনেকগুলো টাকা আমার কাছে ছিল। সমীরকে আমি বলেই দিয়েছিলাম, তোমাকে টাকাপয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। কলকাতার ট্রেন কাটিহার ছাড়বার পর খুব ঝেঁপে ঝড়বৃষ্টি এল। সমীর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড গতিতে দার্জিলিং মেল ছুটে চলেছে। ঝড় আর বৃষ্টি প্রাণপণে ট্রেনটাকে আটকাবার চেষ্টা করছে। ফলে একটা তুমুল কাণ্ড ঘটতে শুরু করল। সেই সময়ে আমার ভেতরে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল। আমার সমস্ত শরীর গরম। চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে আমার মনে হল, আমি একটা সরু তীর হয়ে যাচ্ছি। একজন অদৃশ্য ব্যাধ তার ধনুকে জুড়ে আমাকে জ্যামুক্ত করল।

দ্যাখ বেণু, সত্যি বলছি মণিহারিঘাট পর্যন্ত গিয়ে আমি বুঝতে পারি যে রেবার আকস্মিক অন্তর্ধানের ব্যাপারটা রীতিমত গোলমেলে। কারণ আমার ঘুম ভাঙার পর প্রথম রেবাকে দেখতে

না পেয়ে ভাবলাম যে রেবা বাথরুমে গেছে। মণিহারিঘাট আসতে তখনও আধ ঘণ্টা। অন্ধকার কার্টেন। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আশেপাশে সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করাতে কেউ কোন জবাব দিল না, সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমার পরিষ্কার মনে আছে হাফশার্ট-পরা বিরাট-গোঁফওয়ালা একটা বুড়ো চোখ বুজে বিড়ি খাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা আমার পাশে যে ভদ্রমহিলা ছিলেন তিনি কোথায় গেলেন? ভদ্রলোক প্রথমে আমার কথা শুনতে পাননি এমনি ভাব করলেন, তারপর চোখ খুলে বন্ধ করলেন, আবার চোখ খুললেন এবং পুনরায় চোখ বুজলেন। সামনের বেঞ্চে দুজন ভদ্রমহিলা ঘোমটা দিয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। ট্রেনটা তখন জলে বাতাসে নিজের চাকার শব্দে একটা শব্দ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রথম ভদ্রমহিলাটি খুব ফর্সা। রাতজাগার ফলে কিছু পদদলিত ফুলের গলিতভাব এবং পচা সুবাস তাঁর চারপাশে। দুটো চোখই বোজা। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক।—শুনুন, শুনছেন, আমার পাশে ভদ্রমহিলাটি কোথায় গেল দেখেছেন? ভদ্রমহিলা চোখ খুললেন। তাড়াহুড়ো করে বুকের কাপড় ঠিক করলেন। দু হাতের তেলো দিয়ে দুটো চোখ অনেকক্ষণ ঘসলেন। তারপর ড্যাবড্যাব করে কামরার ছাদে লাইটের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপারগ হয়ে দ্বিতীয় মহিলাকে ধরলাম।—মাসীমা, আমার পাশে যে মেয়েটি ছিল তাকে দেখেছেন? মাসীমা বিপুলা। গালভর্তি গতরাতের বাসি পানের ড্যালা। দু চোখ ভর্তি ক্যাতর। মাসীমা আমার প্রশ্ন শুনে পরপর অনেক-গুলো হাঁচি দিলেন। প্রকৃতির প্রলয়কাণ্ডের সঙ্গে সেই হাঁচি মিলে রেবার জন্য আমার তালাস অনু-সন্ধান গুম হয়ে গেল। ততক্ষণে মণিহারিঘাটে আমরা পৌঁছে গেছি। ট্রেন থেমে গেছে। লাল কামিজ গায়ে কুলিরা ছুটে আসছে।

আমি ভাবতেও পারিনি রেবাদের বাড়ি থেকে উচ্চ পর্যায়ে একটা ধরপাকড় হয়েছে। প্রাপ্ত-বয়স্কা রেবা যদি আমার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে তবে সেটা ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারা অনুসারে অপরাধ বলে গণ্য হয় সেটা আমি জানতাম না, আজও জানি না। তবে অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি আইনের প্রয়োগের ব্যাপারটা কোন সময়েই অ্যাবসলিউট নয়। তদ্বির-তদারকিতে বৃহৎভাবে যে-কোন আইনের প্রয়োগকে প্রভাবিত করা যেতে পারে। অত ভিড়ের মধ্যে পুলিশ কী করে আমাকে চিনতে পারল সেটা আজও আমার কাছে রহস্য। আমার এবং রেবার সামান্য মালপত্র যা ছিল পুলিশ সেগুলো বাজেয়াপ্ত করল। এমনকি একটা টুথব্রাশহীন কাঙালের মতো ভিজে ভিজে মণিহারিঘাটের পুলিশের একটা অস্থায়ী এবং সামরিক ছাউনিতে ঢুকলাম। জোলো হাওয়াতে আমি ঠকঠক করে কাঁপছি। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। চশমার কাঁচে জল লাগাতে কোন কিছু পরিষ্কার করে দেখতে পাচ্ছি না। একটা প্রকাণ্ড বালির ঢিপির ওপরে পুলিশের ছাউনি। কাঁচা মাটির মেঝে, দরমার বেড়া, ওপরে টিনের ছাউনি। ঝাঁপ টেনে সব জানলাগুলো বন্ধ। একটা জানলা পুরো বোধহয় বন্ধ হয় না। একটু ফাঁক থেকে যায়। সেই ছোট্ট ফাঁক দিয়ে অঝোর বৃষ্টিতে অস্পষ্ট চারিদিকের মধ্যে অনেক-গুলো লাল রেলগাড়ির কামরা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। স্টিমারের ভোঁ গভীরভাবে সারা গঙ্গা জুড়ে ঘুরে বেড়াল। সেই ফাঁক দিয়েই সপসপে ভেজা লাল কামিজপরা কুলিরা ছুটছে। প্রচণ্ড জোরে ছুটছে। বাতাসে আমাদের আস্তানাটা তখন কেঁপে কেঁপে অস্থির। আমি ঘরের এক কোণে বসে-ছিলাম। ঘরের মাঝখানে চেয়ার টেবিল নিয়ে যে পুলিশ অফিসারটি বসেছিল সে বয়সে তরুণ, খুব রোগা, চোখ দুটো গর্তে। কিন্তু লোকটার নাকটা চোখা এবং অসম্ভব রকম বড়। মনে মনে লোকটাকে আমি নাকু বলে ডাকলাম। লোকটির হিক্কা উঠছিল। হিক্কাটা থামাবার জন্য ভদ্রলোক প্রথমে অনেক-ক্ষণ নাক চেপে বসে রইল। তারপর ঢকঢক করে একরাশ জল খেল। হিক্কাটা থামল না। সাপ ব্যাঙ ধরলে অনেকক্ষণ থেমে থেমে ব্যাঙটার গোঙানি শোনা যায়, হিক্কার শব্দটা তেমনি শুনতে হল। হিক্কার মধ্যেই লোকটা অনেকক্ষণ ধরে কাশল। কাশির গমকে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল।

আমি ভাবলাম, এবার নিশ্চয় হিক্কাটা থামবে। কিন্তু আশ্চর্য, থামল না। সারা ঘরে আমি ঝড়তুফান হিক্কা এই গ্রহস্পর্শ যোগ পুরো হবার পর আমি চুপ করে গেলাম। আমার কথা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। আমি চোখ বুজে সেই ঘরের কোণে চুপচাপ বসে রইলাম। ঘন্টা দুই ঝিমোনোর পর চোখ বুজেই বুঝলাম আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। ততক্ষণে জামাকাপড় গায়ে গায়ে শুকিয়ে গেছে। হাফপ্যান্ট-পরা গেঞ্জি-গায়ে একটা লোক এই সময়ে একটা থলিতে খানচারেক রুটি, একটু ডাল আর এক গেলাস চা নিয়ে এল। একটা ছোট টুলে ওগুলো রেখে ঝপাঝপ জানলার ঝাঁপগুলো খুলে দিল। ইচ্ছে হল রোদ্দুরে গিয়ে দাঁড়াই। ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি এই চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে দাঁড়াবার জন্যও আমাকে অনুমতি নিতে হবে। সুতরাং খাবার কোনপ্রকারে মুখে দিয়ে চা খেতে খেতে দেখলাম, ঘরের মাঝখানের সিংহাসনে সেই হিক্কা-ওঠা লোকটা আর নেই। চেয়ারটা শূন্য কিন্তু দরজার সামনে বিরাট লম্বা একজন আর্মড্ পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে। পুলিশটা খুব লম্বা। দাড়ি গোঁফ খুব পরিষ্কারভাবে কামানো। মনে হয়, খেউরি হবার পর লোকটা মুখে তৈলাক্ত কিছু মেখেছে। আমার চা শেষ হতেই একখানা জীপগাড়ি এসে দরজার কাছে থামল। দুজন অফিসার অন্য কোন প্রসঙ্গ ইংরাজীতে আলাপ করতে করতে ঘরে ঢুকল। একজন সিংহাসনে অন্যজন মুখোমুখি চেয়ারে বসল। বলবার সুবিধার জন্য সিংহাসনে বসা লোকটাকে এক নম্বর আর অন্যজনকে দুই নম্বর বলব। এক নম্বর ছোকরা। তবে উচ্চপদের অফিসার। যারা সোজাসুজি বড় চাকরিতে ঢোকে তাদের কামানো মুখে একটা নিশ্চিন্ততা এবং উগ্রতা মিশে থাকে। মাঝে মাঝে দুটো অনুভূতিই তাদের ঠোঁটে এবং থুতনিতে প্রকাশ পায়। এক নম্বর খাকি ইউনিফর্ম-পরা, ক্লীন সেভড। চোয়াল ভাঙা। চোখ গর্তে। হাফশার্ট পরার জন্যই বোঝা গেল, কনুইটা খুব সরু। দ্বিতীয় নম্বর গুঁফো, ভরা গাল, থুতনিটা খুব ছোট। চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। থুতনি খুব ছোট হওয়ার জন্য লোকটাকে প্রোফাইলে ভীষণ উদ্ধত দেখতে। এক নম্বর ইংরেজীতে বলল। --পুরো রেললাইনটা জরীপ করার পরেও কোন বডি পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনা ঘটেছে আনুমানিক রাত তিনটাতে। আমরা সার্চ পার্টি ট্রলিতে বের হয়েছি ভোর পাঁচটাতে। সারা রাত প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে ছিল সুতরাং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই দুর্যোগ আর অন্ধকারের মধ্যে বডি রিমুভ করাও সম্ভব নয়। আমি মোটামুটি শতকরা আশি ভাগ নিশ্চিত যে মেয়েটি রেলে কাটা পড়েনি। দ্বিতীয় লোকটি এবার জিজ্ঞাসা করল,—তবে ব্যাপারটা কী হতে পারে? এক নম্বর হেসে জবাব দিল, সেটাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। দুই নম্বর এবার বলল,—হয় মেয়েটি বাড়ি থেকে ঐ ট্রেনে আসেনি, না হয় ট্রেনে উঠে মাঝখানে কোথাও নেমে গেছে, অথবা গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেবার পর তার মৃতদেহ কেউ রিমুভ করেছে। এক নম্বর বলল,—আপনার তৃতীয় অনুমানের ভিত্তিতে আমরা অনুসন্ধান শুরু করব, সেটাতে সফল না হলে দ্বিতীয় থিয়োরি ট্রাই করা যাবে এবং ফল না পেলে আপনার প্রথম অনুমানকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করব।—অর্থাৎ আপনি পিরামিডটাকে উল্টে দিয়ে ফ্ল্যাট অংশ বেয়ে সরু সাইডে পৌঁছুতে চাইছেন। দ্বিতীয় নম্বরের এই মন্তব্য শুনে খুব হাসাহাসি হল। হাসাহাসি থামলে আমার দিকে তাকিয়ে এক নম্বর প্রস্তাব দিল, আসামীর একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে বিকেলের মধ্যে লক-আপে পাঠানো হোক। ফারদার ইন্টারোগেশন সি আই ডি করবে। মেয়ের পক্ষ আপার লেভেলে শুরু করেছে।

—আপনাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা জানেন?

—না।

—রেবা, হ্যাঁ রেবা, আপনার সহপাঠিনী এবং বান্ধবী।

—হ্যাঁ।

—তাকে আপনি গতকাল শেষরাতে দার্জিলিং মেল কাটিহার স্টেশন ছাড়বার পর চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন।

—না।

—তবে রেবা কোথায় গেল?

—জানি না।

—আপনারা দুজন একসঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতা আসছিলেন অথচ আপনি জানবেন না রাস্তার মাঝখানে মেয়েটা কোথায় গেল? সেটা কি সম্ভব?

—রেবা আমার সঙ্গে আসেনি।

—তার মানে?

—তার মানে আমি একা যাচ্ছিলাম।

—কেন?

—সেটা আমি বলতে বাধ্য নই।

এক নম্বর দু নম্বরের মুখের দিকে তাকাল। ততক্ষণে আমার মাথা বনবন করে ঘুরছে। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। আর আমার কিছু মনে নেই। সমীরের গল্পটা শেষ হবার পর বেণু বলল,—সেসব কথা তোর মনে আনবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুই আমাকে বল রেবার কী হল?

সমীর বলল,—মঞ্চ থেকে যদি চরিত্র অভিনয়ের পর অভিনেত্রী প্রস্থান করে তবে তাকে খুঁজে বের করবার জন্য কেউ কোনদিন থানাতে ডায়েরি অথবা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। সীতা নাটকে সীতার পাতালপ্রবেশের পর সীতাকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে মিসিং পারসোনস স্কোয়াডের কেউ দ্বারস্থ হয়?

সমীরের গল্প পুরো শোনবার পর আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেছে। রেবাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না। আমি, দীপু এবং দেবু এখনও বর্তমান। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শীর্ষসময়। নদীনালা বাঁধা হচ্ছে। অহল্যাভূমি জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। ঝরনা জলপ্রপাত বেগবতী নদী গৃহলক্ষ্মীর মতো কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে লক্ষ্মী পা ফেলে ফেলে গাঁয়ে আসবে। কিন্তু সমীর একবারও লক্ষ্য করেনি দূর গাঁয়ে গাঁয়ে হিমঘর তৈরি হচ্ছে। রেবা সমগ্র পরিকল্পনার একখানা ব্লু-প্রিন্ট গর্ভে ধারণ করে হয়তো এইসব হিমঘরের কোন একটাতে শুয়ে আছে। হিমঘরগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ কবরখানার স্মৃতিসৌধের মতো। নিজের স্বয়ংশাসিত জেনারেটারে চলে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমস্ত বাড়তি ফসলকে খুব চড়া দরে কোন কালোমুদ্রার প্রহারে নিহত করে সেই ফসলগুলো শুয়ে থাকবে এই হিমঘরগুলোতে, তারপর ইচ্ছামত বাজারে ছাড়া হবে। দাম কী হবে তা হিমঘরের মালিকরাই ঠিক করবে। কালো ঘোড়াতে চেপে মুষ্টিমেয় সৈন্য বল্লালসেনের ভারতবর্ষকে জয় করে নিচ্ছে। দেবুকে পাঠাতে হবে রেবার খোঁজে। দীপুকে যেতে হবে রেবার হদিশ করতে। রেবা কোথায় আছে খুঁজে দেখতে আমাকেও বের হতে হবে। কাজ ভাগ করে নেব। দেবু হিমঘরগুলো দেখবে, দীপু রিফুইজি ক্যাম্প, আমি লাসঘর যাকে ভদ্র ভাষাতে ব্যাঙ্ক বলা হয় সেইগুলো উল্টেপাল্টে দেখব সেখানে রেবাকে কোন রাসায়নিক আরকের দ্বারা মমি করে স্থায়ী আমানতে পরিবর্তিত করা হয়েছে কিনা। বিভাবরী আমাদের সংযোগরক্ষাকারী হিসাবে নিযুক্ত হবে। তার কাছেই আমরা আমাদের অনুসন্ধানের রিপোর্টগুলো পাঠাব। রেবার সম্পর্কে বিভার যতই ঠান্ডাভাব থাকুক, রেবার পরিণতি জানতে সে নিশ্চয়ই উৎসুক হবে। রেবাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দেওয়া নৈতিকভাবে সম্ভব নয়। রেবার গর্ভে পুরো পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট।

দেবুর কাহিনী॥ এক বছর কোন রিপোর্ট পাঠাইনি। হিমঘরগুলোতে নানাভাবে এবং এবং কৌশলে আমি প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছি। কোথাও রেবার কোন সন্ধান আমি পাইনি। এই এক বছরের প্রবজ্যার ফলে আমি কৃশকায় হয়েছি। আমার দু চোখে এখন একজন নদীর উৎস-সন্ধানীর গভীরতা। এই দেশের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম এই চারদিকে মোট দু হাজারটি হিমঘর আছে। গড়ে পাঁচশো করে হিমঘর প্রতিটি দিকে আছে। আমার ধারণা রেবাকে টুকরো টুকরো করে এইসব হিমঘরে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হয়েছে। রেবার অস্তিত্বের সেই অংশগুলো খুব পাতলা স্লাইসে কাটা হয়েছে এবং তারপর লগ্নিকৃত কালোটাকার মূলধন দ্বারা সেইসব পাতলা স্লাইসগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে প্রায় অর্ধেক রান্না করে তাকে এইসব তুন্দ্রা অঞ্চলের চিরতুষারের তলাতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এইসব চিরতুষারের দেশে কোনদিন সূর্য উঠবে না। এই মেরু অন্ধকারের দীর্ঘ রাত ভোর হতে অনেক দেরি। অথচ আগামী গ্রীষ্মের আগে নতুন অভিযান চালানোর কোন উপায় নেই। আপাতত রেবাকে খুঁজে বের করবার টীম থেকে আমি সরে যাচ্ছি। যদি তুমি পার কথাটা দীপু আর বেণুকে জানিয়ে দিও। দক্ষিণ ইউরোপের একটা শহরে এখন বসন্তকাল, সেইখানে এক অচেনা সঙ্গিনীর হাত ধরে আমি আপাতত যাব। দীপুকে বলে দিও রীনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি প্রথম স্থান অধিকার করেছ, আমার অভিনন্দন জেনো।

দীপুর রিপোর্তাজ॥ পশ্চিম বাংলার পঁচিশটি উদ্বাস্তু শিবিরে খুঁজে রেবাকে বার করতে পারিনি। আমার ধারণা, রেবা ছদ্মবেশ ধরে এইসব শিবিরগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও সে তেরাত্তিরের বেশি থাকে না। মিনিটে মিনিটে সে ভোল পাল্টায়। আমার সারা অঙ্গে ভিখিরির মতো ছিন্ন পোশাক। এই কাঙালের বেশে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সন্ধ্যাবেলাতে উদ্বাস্তু শিবিরের গন্ধে পাগল হয়ে গেলাম। উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর দম-বন্ধ-করা এক ধরনের ঘ্রাণ আছে। অনেক মানুষ খুব কাছাকাছি ঠেসাঠেসি করে থাকলে তাদের সম্মিলিত অস্তিত্ব থেকে একটা গন্ধ উঠে আসে। সেই তীব্র কুঘ্রাণ বাতাসকে ভাড়া করে খুনের কাজে লাগায়। ভাড়াটে খুনে বাতাস শ্বাসরোধ করে তার হত্যার অভিযান শুরু করে। সাধরণত দু ভাবে এই খুন করা হয়। রেশমী ধরনে সরু চকচকে খুব শক্ত দড়ির ফাঁস হঠাৎ গলার মধ্যে ফেলে দিয়ে হ্যাঁচকা টানে আটকে দেয়। তারপর আস্তে আস্তে ফাঁসটা গলাতে কষতে শুরু করে। শিকার নিজের দুটো হাত দিয়ে ফাঁসটা আলগা করতে গিয়ে দেখতে পায় যে দুটো হাতই তার অচল, দুই বাহু এক ইঞ্চিও নড়ছে না। শিকারের সমস্ত দেহটা উদ্বেগে এবং যন্ত্রণাতে ফুলে ফেঁপে দাপাতে থাকে। দাপাতে দাপাতেই সারা দেহ ঘামে ভিজে যায়। তারপর স্থির। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শুধু দু হাতের দশটি আঙুল দিয়ে কার্যসিদ্ধি করা হয়। পেছনের দিক থেকে হঠাৎ আঙুলগুলো গলাটা চেপে ধরে। ডান হাঁটু দিয়ে ঠ্যালা মেরে শিকারের দেহটা দূরে রাখা হয়। তার ফলে শিকার কোন সময়েই তার শরীর এবং হাত আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে পারে না। শিকারের জিভ বেরিয়ে আসে। বিস্ফারিত দুটো চোখ কোটর থেকে ঠিকরে আসে, গলাতে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হয়। তবে দশ আঙুলে গলা টিপে মারবার সময় খুনী একটা ইনস্ট্যান্ট গিল্ট কমপ্লেক্সে ভোগে। এই কমপ্লেক্সের আক্রমণের জন্য শিকারের মৃত্যুর আগে কোন এক সময়ে খুনীর আঙুলগুলি একটু ঢিলে হয়ে আসে। এই গীতোক্ত অর্জুনীয় বিষাদ খুনীকে যাতে বিমুখ না করে সেজন্য সাহায্যকারী খুনীকে এই সময় চাবুক মারে। ফলে হনন করার জন্য খুনী আবার তার দার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পায়। তোমাকে সত্যি করে বলছি, এই খুনীর হাত থেকে আমি বাঁচতে চাই। সুতরাং রেবাকে খোঁজা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই গ্রেট কোয়েস্ট আমি

ত্যাগ করলাম। সংবাদ পেলাম দেবু রীনাকে বিয়ে করেছে। আমি খুব আঘাত পাইনি। কলেজ ইলেকশানে একজন আর-একজনকে যেভাবে বিয়ে করে তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব আমি ঘটনাতে দিইনি। কিন্তু বাড়িটা পুরোপুরি অচল। ঈশ্বরপ্রেরিতের মতো প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাবান একজন ভদ্রলোক আমাকে একটা ভালো চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন। চাকরিটার জন্য আমাকে জঙ্গলে যেতে হবে। যেতে রাজী হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য অভিনন্দন।

বেণুর ইতিবৃত্ত॥ রাজধানীতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঢুকেই বাধা পেলাম। ব্যাঙ্কটার সামনে ধূসর কালো যে অতিকায় যক্ষদম্পতি পাহারায় আছে তারা দুজনেই বাধা দিল। যক্ষ বলল,—তোমাকে ঢুকতে দেব একটি শর্তে।

—কী সে শর্ত?

—তোমাকে ভগবানের বাবার নাম বলতে হবে। প্রশ্নটা শুনে থ' মেরে গেলাম। কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝতে পারলাম এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে যক্ষিণী বলল,—দেখলে তো, তুমি কিছুই জান না। আমি বললাম,—আমি কুবেরের ধনভান্ডারে ঢুকতে চাই না। তবে উত্তরটা আমাকে বলে দাও। যক্ষিণী হাসল। খুব মিষ্টি রিনরিনে হাসি। তারপর বলল,—ঈশ্বরের পিতার নাম সৎ পরিশ্রম। সৎ শ্রমের ঔরসে ঈশ্বরের জন্ম।

সুতরাং সেইদিন থেকে রেবাকে আর খুঁজি না। মোটামুটি একটা কাজ করছি। রাতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ছি। এম এ দিয়ে ডক্টরেটও করার ইচ্ছা আছে। পরীক্ষাতে তুমি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছ জেনে খুব খুশি হলাম।

সমস্ত চিঠিগুলোকে একটা বান্ডিল করে বিভাবরী বিছানার তোশকের নিচে রেখে দিল। বিভাবরী দাদার বিয়ে ঠিক করেছে তাদের খুব চেনাশোনা একটা লক্ষ্মী মেয়ের সঙ্গে। আর এক হপ্তা পরেই বিয়ে। বিয়ের পরে সংসার আর প্রভাকে নতুন বউ-এর হাতে তুলে দেবে। তারপর কলকাতা রওনা হবে। এম এ ক্লাস একটা দিনও সে নষ্ট করতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেষ যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে হোস্টেলে সিট পাওয়া যাবেই। বিভাবরী এই মুহূর্তে আর কোন জটিল পরিস্থিতির মধ্যে জড়াতে চায় না।

॥ সমাপ্ত ॥

স মা লো চ না

Malayalam Short Stories: An Anthology. Kerala Sahitya Akademy. Trichur. *Rs* 25.00

অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাহিত্যকর্মের পারস্পরিক পরিচয়স্থাপনের যে সংগঠিত প্রচেষ্টা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট শুরু করিয়াছেন কেরালা সাহিত্য একাডেমী-কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদে মালয়ালম ছোটগল্পের এই সংকলনটি তাহারই অংগ বলা যায়। জাতীয় সংহতির প্রশ্ন আজকাল নানাভাবে উঠিতেছে। সভা, সমিতি, সম্মেলন বা বক্তৃতায় সদিচ্ছাপ্রকাশের মাধ্যমে সংহতির প্রশ্নে আলোড়নও মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়ে। হইতে পারে, জাতীয় সংহতি অর্জনের ইহা অন্যতম উপায়। কিন্তু মানসিক পরিচয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে পারস্পরিক অনুভূতি গড়িয়া উঠে তাহার প্রভাব অনেক বেশি কার্যকর। এই দিক দিয়া দেখিলে কেরালা সাহিত্য একাডেমীর বর্তমান প্রয়াস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের প্রচেষ্টা কেরালা সাহিত্য একাডেমী রাজ্য বা ভাষাগোষ্ঠী পর্যায়ে প্রসারিত করিয়া দিতেছেন। ভারতের সর্বত্র আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজী ভাষা সুপ্রচলিত। ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া কেরালা সাহিত্য একাডেমী মালয়ালম ছোটগল্পের সম্ভার ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের লেখা মোট সাতাশটি গল্প এই সংকলনটিতে স্থান পাইয়াছে। একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমিত গন্ডীর মধ্যে পাত্রপাত্রীর ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অনুভূতি বা বিশেষ অভিব্যক্তি অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য। কাহিনীগুলির মধ্যে রহিয়াছে বিভিন্ন ভাব ও প্রবৃত্তির বিচিত্র প্রকাশ। কিন্তু মানবহৃদয়রহস্যের গভীরতর ইঙ্গিত ধরা পড়িয়াছে প্রেমের গল্পগুলিতে। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিই।

থাকাড়ি শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের "এ ব্লাইন্ড ম্যানস কনটেনমেন্ট" গল্পটি রচিত হইয়াছে স্বৈরিণী ভার্গবীর প্রতি অন্ধ পাপ্পু নায়ারের ভালবাসা নিয়া। ভালবাসার টানে পাপ্পু মায়ের আশ্রয় ছাড়িয়া ভার্গবীকে বিবাহ করিয়া তাহার আশ্রয়ে চলিয়া আসিল। ভার্গবী কিন্তু সে ভাল-বাসার মর্যাদা দেয় নাই। তাহার একান্ত দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে প্রেমের মর্যাদা দিবার অবকাশও বোধ করি খুব একটা ছিল না। সে পরের দুয়ারে খাটিয়া খায়। কাজ না থাকিলে ভিক্ষা বা উপবাস ছাড়া তাহার আর কোন উপায় থাকে না। দারিদ্র্যের তাড়নাতেই সে নানা পুরুষের কাছে দেহ দান করে; বাধ্য হইয়া তাহাদের সন্তানদের তাহার গর্ভে ধারণ করিতে হয়। শুধু দাম্পত্য জীবনের বঞ্চনাই নয়, পারিবারিক জীবনেও পাপ্পু সাধারণ পরিজনের প্রাপ্যটুকুও পায় না। এমনকি ঘরে সংস্থান থাকিতেও স্ত্রী তাহাকে অনাহারে রাখিয়া দেয়। তাহার সন্তানরা পাপ্পুকে লাঞ্ছিত করে। অন্ধ হইলেও পাপ্পু সবই বোঝে। কিন্তু সে নিরুপায়। ঘরের দুয়ারে একাকী বসিয়া সে রামায়ণ গান করে। বর্তমানের দুঃখ ভুলিয়া থাকিবার ইহাই তাহার একমাত্র উপায়। আর ভবিষ্যতের জন্য সে অবলম্বন খোঁজে স্ত্রীর গর্ভজাত অপরের সন্তানদের মধ্যে। স্নেহধারায় শিশুগুলিকে সে সিঞ্চিত করিয়া দিতে চায়, তাহাদের মধ্য দিয়া তাহার অক্ষম জীবনের সযত্নলালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে সার্থক করিয়া তুলিতে চায়। পাপ্পুর এ আত্মপ্রবঞ্চনা প্রতিবেশিনী কুট্টি আম্মার আর সহ্য

হয় না। একদিন সে পাপ্পুকে আসিয়া বলিল—তুমি কি কিছুই বোঝ না? উত্তরে দৃষ্টিহীন চোখ দুইটি মেলিয়া পাপ্পু বলিল—আমি সবই জানি। কিন্তু ভাবিয়া দেখো, ভার্গবী অনাহারে কতদিনই না কাটাইয়াছে। দেহদান করা ছাড়া বাঁচিবার অন্য উপায়ই বা তাহার কী আছে। এ অবস্থায় জগতের সামনে স্বামী বলিয়া দেখাইবার মতো একজন কাহাকেও তো তাহার চাই। স্নেহময় হৃদয় ও নিঃস্বার্থ প্রেম সমস্ত বঞ্চনা, লাঞ্ছনার আঘাত হইতে অন্ধ, অক্ষম পাপ্পু নায়ারের অসহায় জীবনকে রক্ষা করিয়া যাইতেছে।

আর-একটি প্রেমের গল্প করূর নীলকণ্ঠ পিল্লাই রচিত 'দি রিং'। যৌবনের গোপন ভালবাসা কুঞ্জু খুড়ার জীবনে রূপলাভ করিল যখন তাহার বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে। খুড়া ছিল গ্রামের জমিদারবাড়ির মাহুত। জমিদারের সুন্দরী উপপত্নী কুনহিকাভুর প্রতি তাহার কামনা প্রকাশ করিবার সুযোগ সে কখনও পায় নাই। প্রভুর উপপত্নী যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট, এ কথা তো তাহার পক্ষে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিবার নয়। গোপন আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়া তাহার যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পার হইয়া গেল। এখন তাহার বয়স সত্তরের উপর। শরীরও রোগগ্রস্ত। ইতিমধ্যে জমিদার পরলোকগত। কুনহিকাভুর প্রৌঢ়ত্বও অতিক্রান্ত। এমন সময় তাহার কাছে আসিয়া—কী অবিশ্বাস্য মধুর বিস্ময় —কুনহিকাভু আম্মা ধীরে ধীরে হৃদয় খুলিয়া ধরিল। তাহাদের মধ্যে আজ আর যৌবনের আবেগ-বিহ্বলতা নাই, দেহমিলনের আকাঙ্ক্ষাও অবলুপ্ত। এখন যাহা আছে সে সঙ্গকামনা, কাছাকাছি বসিয়া স্মৃতিরোমন্থন, সামান্য উপহার, একটু পিঠা বা মিষ্টান্ন বা দুই-এক খিলি পান আদান-প্রদান এইমাত্র। কিন্তু বার্ধক্যের অবসন্নতার মধ্যেও পারস্পরিক সঙ্গের উত্তাপে বিগত যৌবনের বিস্মৃত আবেগ অকস্মাৎ ফিরিয়া আসে। কুঞ্জু খুড়া হয়তো তখন কুনহিকাভু আম্মার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া নেয়, অথবা গল্প করিতে করিতে দুইজনে উঁচু গলায় হাসিয়া উঠে। বার্ধক্যের পরিণত বুদ্ধির স্থৈর্য ও বিস্মৃত যৌবনের আকস্মিক আবেগে যে প্রেম ধীরে ধীরে যুগপৎ ঘনীভূত ও আন্দোলিত হইতেছিল তাহারই প্রতীক হিসাবে দরিদ্র কুঞ্জু খুড়া তাহার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সঞ্চয়, একটি সোনার আংটি, কুনহিকাভু আম্মার আঙুলে পরাইয়া দেয়। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই কুঞ্জু খুড়া মারা গেল। পরিবার-পরিজনেরা অনেক খুঁজিয়াও খুড়ার আংটিটি পাইল না। সকলেই বুঝিল আংটিটি কাহার কাছে। কুনহিকাভু আম্মা ছাড়া আর কেহই তো কুঞ্জু খুড়ার কাছে আসিত না। কিন্তু কেহই সে কথা উচ্চারণ করিয়া বলিল না। কুঞ্জু খুড়া আর কুনহিকাভু আম্মার অন্তঃশীলা প্রেম বালুকাস্তরের উপর একবার ঝকমক করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে প্রেম আবার গোপনতার অন্তরালেই ঢাকা পড়িয়া গেল।

ব্যক্তিজীবনের পরিচয় ও হৃদয়রহস্য উদ্ঘাটনে মালয়ালম সাহিত্যিকগণ যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহার অনুপাতে তাঁহাদের সমাজবোধ কিন্তু অনেক সীমিত। সামাজিক পরি-বেশের ভূমিকা যেখানে বড়, পটভূমি যেখানে বিস্তৃত, পাত্রপাত্রীর সংখ্যা যেখানে বেশি, তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেখানে নানাদিক দিয়া নানাভাবে প্রকাশ পায়, সেখানেই দেখিতেছি মালয়ালম গল্পকারদের কল্পনার গতি শ্লথ, দ্বিধাগ্রস্ত, কলাকৃতি দুর্বল। ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়া বৃহত্তর কোন সমস্যা বা ভাবের উপর আলোকপাত করিয়া গল্পের সঙ্গে তাহাকে গ্রথিত করিয়া দেওয়া তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে বলিয়াই মনে হয়। গল্পের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের ইঙ্গিতময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা অভিব্যক্তি তাঁহারা সৃষ্টি করিতে পারেন, ব্যক্তিচরিত্রের কেন্দ্রবিন্দুর উপর তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে রশ্মিপাতও করিয়াছেন, কিন্তু সামাজিক মানুষকে তাঁহারা চিনিতে পারেন নাই অথবা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে নানা ভাব ও ঘটনার সংঘাতে মানুষের যে জটিল ও বিভিন্নমুখী পরিচয় ফুটিয়া উঠে তাহাকে স্পষ্টভাবে তাঁহারা দেখিতেও পারেন নাই। পারেন নাই বলিয়াই সামাজিক অত্যাচার,

অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার পটভূমিকায় লেখা গল্পগুলি ঘটনাসংস্থান ও ভাবের দিক দিয়া শিথিল ও বর্ণহীন। ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে ললিতাম্বিকা অন্তরাজনম-রচিত "দি কনফেশন অফ গিল্ট", পঞ্জিক্কারা রফি-রচিত "দি গোল্ড ওয়াচ", নাগাবল্লী আর এস কুরুপ-রচিত "দি হোলি কণ্ঠ", ই এম কভুর-রচিত "দি সল্ট অব দি আর্থ" এবং ভি কে এন (ভি কে নারায়ণন কুট্টী)-রচিত "এ ডে ইন দি লাইফ অব এ সোস্যাল ওয়ার্কার ইন এ দিল্লী স্লাম" গল্পগুলিতে।

তবে ব্যতিক্রম যে নাই এমন নয়। ব্যতিক্রমের নিদর্শন হিসাবে এন পি মহম্মদের "দি কক ক্রু থ্রাইস" গল্পটির উল্লেখ করতে পারি। গল্পটি লেখা হইয়াছে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিকায়। বিপ্লবীরা টেলিফোন-স্তম্ভ, সেতু, কালভার্ট, রেললাইন উড়াইয়া দিতেছে। সিঠি থঙ্গল ও শেখরন নায়ার ছিল এই দলে। শেখরন ধরা পড়িল প্রথমে, তাঁহার পর থঙ্গল। ধরা পড়িবার পর থঙ্গল থানায় আসিয়া দেখিল সার্কেল ইনসপেক্টর আপ্পু মেনন বুট পরিয়া শেখরন নায়ারের মুখে লাথি মারিতেছে। অবশেষে লাথি মারিয়া মেনন তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। মেনন এইবার থঙ্গলের মুখে গোটাকয়েক ঘুঁষি মারিয়া বলিল—থঙ্গল, আমি সব জানি। তোমাদের মধ্যে কে কে বোমা তৈরি করেছিল? বোমা বসিয়েছিলে কোথায়?

—আমি জানি না।

—আমি জানি যে তুমি জান।

—কিন্তু, কিন্তু...

—শোনো, একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। এই কেসে তুমিই একমাত্র সাক্ষী—আপ্পু মেনন হাসিল।

—আমি সাক্ষী হব না।

—তোমার চেয়ে ঢের পুরনো কংগ্রেসীকে আপ্পু মেনন সাক্ষী বানিয়েছে।

—আমি...

—ঠিক?

থঙ্গলের পেটের উপর একটা ঘুঁষির আঘাত আসিয়া পড়িল। যন্ত্রণা যেন কটিদেশ হইতে এক ঝলকে উঠিয়া আসিল মাথায়।...থঙ্গলের ধুতিটি ভিজিয়া যাইতেছিল। খদ্দরের ধুতিটি সে আঁকড়াইয়া ধরিল।

—১০৩৪!

কনেস্টবল বলন নায়ার প্রবেশ করিল। ......স্যার...

—ওদের নিয়ে এসো।

—আজ্ঞা হুজুর।

থঙ্গলের শিরায় শিরায় যেন রক্ত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ...তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল—শেখরন নায়ার, আমি কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। জাতির সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না। কিন্তু সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

বলন নায়ার বোরখায় ঢাকা দুইটি মূর্তিকে ভিতরে ঠেলিয়া দিল। থঙ্গল নিচের দিকে না চাহিয়া পারিল না। কালো রেশমী বোরখার নিচের দিকে ছেঁড়া। মেহেদী-রাঙানো দুইটি শুভ্র ক্ষুদ্র পায়ের উপর মল দুইখানি আটকাইয়া রহিয়াছে। থঙ্গল অন্য পা দুটির দিকে চাহিয়া দেখিল। পা দুটি বৃদ্ধার। চামড়া কুঁচকাইয়া গিয়াছে।

শিরায় শিরায় রক্ত তাহার টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। কে যেন তাহার শরীরে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। ধোঁয়ায় তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। থঙ্গল স্তব্ধ হইয়া

গেল। দুই হাতে সে লোহার রেলিং চাপিয়া ধরিল। উঃ, কী ঠান্ডা! পা দুটি তাহার কাঁপিতেছে।

ব্যাটনের ডগা দিয়া আপ্পু মেনন প্রথম বোরখাটি তুলিয়া ধরিল। থঙ্গল দেখিল তাহার বিবির চোখ দুটি জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

তাহার প্রেয়সী।

—আল্লা! বিবি কাঁদিয়া উঠিল।

থঙ্গলের খদ্দরের চাদরটি পড়িয়া গেল। শেখরন নায়ার যেখানে পড়িয়াছিল চাদরটি গিয়া পড়িল সেইখানে। শেখরনের রক্তে চাদরটি ভিজিয়া যাইতেছে।.........

আপ্পু মেনন এবার দ্বিতীয় বোরখাটি তুলিয়া ধরিল। থঙ্গলের মা দাঁড়াইয়া। মায়ের দুই চোখে দরবিগলিত অশ্রু।

—বাবা আমার।

শেখরন নায়ারের পা দুটি কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল—একটু জল।

দিনের আলো ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। শেখরন বলিল—থঙ্গল ভুল বুঝো না। এ'দের দুজনকে আজ রাত্রের মতো পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

তাহার মুখের উপর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। আশেপাশে কিছুই আর সে দেখিতে পাইতেছে না। পাদুটি তাহার কাঁপিতেছে। তাহার বোধ হইল সে যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে, নরকের সূচীভেদ্য অন্ধকারে তলাইয়া যাইতেছে আর দূর হইতে কে যেন বলিতেছে,—তুমি সাক্ষী হবে না?

থঙ্গলের শুষ্ক ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। (বঙ্গানুবাদ : বর্তমান লেখক)

'দি কক ক্র থ্রাইস' গল্পটি হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম, কারণ ভাব ও কলাকৌশল উভয় প্রশ্নেই এই গল্পটিকে মালয়ালম ছোটগল্পসংকলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইয়াছে। পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা ও অপমান এবং স্বাধীনতালাভের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আহ্বানে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার মধ্যে থঙ্গল তাহার জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ হইতে সে জাতীয় আন্দোলনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। আজ একদিকে সেই কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুতি, এমনকি জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন, আর অন্যদিকে স্ত্রী ও মায়ের উপর অকল্পনীয় নির্যাতনের নিশ্চিত সম্ভাবনা। পাশবিক নিপীড়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বলিতে গেলে মুহূর্তের মধ্যেই, তাহাকে স্থির করিতে হইবে সে এখন কী করিবে। এ অবস্থায় সে যে কী করিবে সেটা বড় কথা নয়। এ মুহূর্ত তাহার জীবনের চরম ট্রাজিক মুহূর্ত। সে যাহাই করুক না কেন, স্বামী বা পুত্র হিসাবে অথবা স্বাধীনতাসংগ্রামী হিসাবে নিদারুণ গ্লানি ও বেদনা তাহার হৃদয় ভাঙিয়া দিবে—এ ট্রাজেডি তাহার অবশ্যম্ভাবী। সুবৃহৎ পটভূমিকায় অল্প কয়েকটি ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্য দিয়া মহম্মদ এই মুহূর্তটিকে টানিয়া আনিয়াছেন অনিবার্যভাবে, ইহাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প ও বাক্‌ভঙ্গি দিয়া। আর এই ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্য দিয়াই তুলিয়া ধরিয়াছেন পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানি ও অপমান, স্বাধীনতা-সংগ্রামীর কর্তব্যকঠোর জীবন এবং ভারতের দূরতম প্রান্তে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান যে সাড়া জাগাইয়াছিল তাহার পরিচয়। থঙ্গলের মনে পড়ে, আগেকার দিনে বাৎসরিক ছুটি উপলক্ষে চেরুমকাল ক্ষেত-মজুররা গান বাঁধিত মারক্কারদের নারিকেলগুদাম প্রবল বর্ষণে ভাঙিয়া যাওয়ার বিষয় নিয়া। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গানের বিষয়ও বদলাইয়া গেল। নতুন গানের কয়েকটা কলি থঙ্গলের মনে আছে :

মহম্মদ আলি মুসলমান
সৌকত আলি মুসলমান
আর গান্ধী সর্দার
সর্দার গান্ধী অর্থ বা পদের জন্য লালায়িত নয়।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমাজের নিম্নতম স্তরেও কী আলোড়নই না সৃষ্টি করিয়াছিল! সেই আলোড়নের ঢেউই তো লাগিয়াছিল থঙ্গলের জীবনে। আজ যে ট্রাজিক মুহূর্তের সে সম্মুখীন, সে-ও সেই আলোড়নেরই ফল।

অল্প কয়েকটা ঘটনার মধ্য দিয়া বৃহত্তর সামাজিক জীবন ও সমস্যাকে উপস্থাপিত করা এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ভাব ও কল্পনার আন্দোলনে মানুষের জীবনকে চরম মুহূর্তে দাঁড় করাইয়া দেওয়ার মতো কল্পনাশক্তি ও কলাকুশলতা মালয়ালম ছোটগল্পকারদের মধ্যে আর কাহারও নাই। মহম্মদের গল্পটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত, তাঁহার সাফল্যও হয়তো অনেকটা বেশি। কিন্তু যে জগতে অধিকাংশ মালয়ালী ছোটগল্পকার বিচরণ করিয়াছেন অর্থাৎ ব্যক্তির হৃদয় ও বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের পারস্পরিক সম্পর্কের জগৎ, সেখানেও কিন্তু পাত্রপাত্রীর অনুভূতি- তাহাদের বেদনা বা আনন্দ ব্যক্তিবিশেষেরই অভিজ্ঞতামাত্র, সার্বজনীনতার আবেদন তাহাতে নাই। প্রেমের গল্পগুলি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। 'এ ব্লাইন্ড ম্যানস কনটেনমেন্ট' গল্পে পাপ্পু নায়ারের বঞ্চনার বেদনা ও আত্মরক্ষার করুণ প্রয়াস, 'রচিয়াম্মা' গল্পে (রচনা—উরব) রচিয়াম্মার নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও ত্যাগ, 'স্টেডিলি ফ্লোজ দি যমুনা' (রচনা—পি কেশব দেব) প্রেমিক ও স্বামীর মধ্যে বিভক্ত যমুনার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণা, 'দি রিং' গল্পে কুঞ্জু খুড়ো ও কুনহিকাভুর গোপন প্রেমের স্নিগ্ধ মাধুর্য—এ-সবই সংশিলষ্ট পাত্রপাত্রীদের একান্ত নিজস্ব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করিয়া সাধারণ মানুষের হৃদয় অভিভূত করিবার মতো তীব্রতা ও গভীরতা কোনক্ষেত্রেই সঞ্চারিত হয় নাই। যে ভাবানুভূতিগুলি এই গল্পগুলিতে রূপলাভ করিয়াছে সেগুলি যে সার্থক ছোটগল্পের উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। উপাদান খুঁজিয়া বাহির করিবার মতো দৃষ্টি মালয়ালম ছোটগল্পকারদের আছে। কিন্তু ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়া ভাব ও কল্পনার আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়া তাহাকে সার্বজনীন অভিজ্ঞতায় রূপায়িত করিবার সুকঠিন কলাকৌশল তাঁহাদের আয়ত্তাধীন নয়। বর্তমান গল্পসংকলনটির ভিত্তিতে তাই মনে হয় মালয়ালম ছোটগল্প এখনও পরিণত হইয়া উঠে নাই। ইহার মধ্যে এন পি মহম্মদের 'দি কক ক্র প্রাইস' গল্পটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা—ভারবি। কলিকাতা ১২। মূল্য আট টাকা।

কবিতা নিয়ে আলোচনায় এলিয়টের একটি মন্তব্য ছিলো, কবির বক্তব্য সঠিকরূপে অন্যের প্রকাশ করবার রাস্তা নেই, কারণ অনুভূতিকে ব্যক্ত করবার জন্যে যে-সব উপকরণ দরকার সেইসব উপকরণ মনের ভিতর কিভাবে স্থান করে নিয়েছে, তা কবি ভিন্ন অন্যের জানার উপায় নেই। যে-কোন কবিতার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই ধরনের স্বীকারোক্তিই বোধ হয় স্বচ্ছ স্বীকারোক্তি। যাঁরা এলিয়টের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাগুলো পাঠ করেছেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর ওপর আই এ রিচার্ডসের মন্তব্য কিভাবে এলিয়ট বাতিল করেছেন, 'I will admit that I think that

either Mr. Richards is wrong, or I do not understand his meaning.' এই ধরনের প্রতি-বাদকে সামনে রেখে বলা যায়, কবির প্রকৃত ভাবমূর্তি প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য। এবং এলিয়টের ধারণা নিয়ে এই কথাই বলা যায়, তা কবির প্রকৃত ভাবমূর্তি না-হয়ে অন্যরকম হয়। সেজন্যে কবিতা সম্বন্ধে বলতে গেলে কবি সম্বন্ধে জানার একটি প্রশ্ন আসে—কবি যে রকম অবস্থায় তাঁর বক্তব্য সাজিয়েছেন তার উৎপত্তির ইতিহাস, এবং অনুভূতিকে রক্ষা করবার জন্যে কী ধরনের শব্দ গ্রহণ ও বর্জন করতে চেয়েছেন; এগুলো যদিও বিবর্তনমূলক ধর্ম হতে পারে, তবু এগুলো প্রয়োজন বোধ হয়। প্রয়োজনের জন্যে আলোচ্য গ্রন্থে অমিয় চক্রবর্তীর একটি কবিতা উদাহরণ হিসেবে রক্ষা করা যাক :

ইটবাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহু লোক। এই গ্রাম
তাহলে
উঠে যাবে। (ইতিহাস)

জানি অমিয় চক্রবর্তী বহু দেশে ঘুরেছেন, বহু গুণিজনের সঙ্গলাভ করেছেন। এবং সেইজন্যেই প্রশ্ন ওঠে, এই কবিতার জন্মমুহূর্ত কোন্ স্থানে এবং কখন—যেখানে গ্রামের অব-লুপ্তির পর একটি শহর তৈরী হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে একটি আবেগও থেকে যাচ্ছে,—'এই গ্রাম তাহলে উঠে যাবে'?

আর একটি উদাহরণ রাখলে এর অর্থ আরও স্পষ্ট হয়,

টোমাটোর লাল রস ঝকঝকে ছোট্ট গেলাসে
তারি পাশে সাদা-ফেনা শ্যাম্পেন, হলদে লেসের
জালি-কাটা পাত্রে খুদে কেক, ডিপ্লমাসি দ্রুত জমে
মসৃণ ঢাকায় ঘোরা আতিথ্যের ঘরে; দামী ধোঁয়া,
উচ্চ কণ্ঠ টেবিলের চতুর্দিকে; স্বামী সামনে গিয়ে
প্লেটে তুলে দেন কাঁচ শসা আর চীজ্-স্যান্ডুয়িচ, (আন্তর্জাতিক)

এ ছবি এদেশীয় নয়, তা যেমন বর্ণনায় মনে হয় আবার কবিতার নামরূপের দ্বারাও; আবার যখন কবিতার ভিতর পরবর্তী এই লাইন দেখি—'নিরালা সোনায় ঢাকা জেনিভার নিস্তরঙ্গ লেক'—তখন প্রশ্ন ওঠে এই কবিতা জন্ম নিয়েছিলো কি জেনিভায়? এগুলো বাহ্যিক প্রশ্ন যেমন, তেমনি আবার অন্তরঙ্গ-ও হয়। যেমন, যদি ধারণা করা যায়, কবি কি নির্বিকার থেকে বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন? শ্রুতিসাহিত্যে আমরা দ্রষ্টার দুটো লক্ষণ দেখেছি—এক দর্শক আর একজন স্বাদু ফল খেয়ে ভোক্তা। এখানে কবির প্রেরণা কি নিয়ে সম্বন্ধ? লক্ষ্য করলে ধরা যায় এই কবিতার আমেজে শ্লেষের লক্ষণও আছে। যদি তাই হয় তবে কি তিনি ভোক্তা? দার্শনিক চর্চায় নির্বিকার দর্শক একটি বিশিষ্ট সংবাদ। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তা বোধ হয় কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ, কারণ সাহিত্য যখন বস্তু তৈরী করবার দর্পণ তখন তাকে আলেখ্য তৈরী করতে হবে। যদিও জানি, আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে পাউন্ড এবং এলিয়ট কিভাবে 'ইমপারসনাল' শব্দের গুণের দ্বারা বর্ধিত হতে চেয়েছিলেন! তবু ব্যক্তির দৃষ্টি 'পারসনাল' হয়, পাউন্ডে না-হলেও এলিয়টে হয়েছিল, অন্তত প্রুফ্রকের প্রেমসঙ্গীতে তা আছে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়-ও সেইরকম করে আছে। যেমন,

হাত থেকে পড়ে যায় খসে
অবশ আধলা ধুলোয় (১৩৫০)

যাঁরা ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের খবর জানেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন, এখানে 'আধলা' শব্দটি কী

বীভৎসরূপে ভয়ংকর; কিংবা 'সনেট' কবিতায় মেদিনীপুরকে সামনে রেখে সর্বভারতের মূর্তির প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অগাস্ট বিপ্লবের ঘটনা দিয়ে যেভাবে তুলে ধরেন,

ওদিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা,
বেঁধে
মারে 'কংগ্রেসী কোথায় সঙ্গে, যম
দেশী
সৈন্য হাসে' (সনেট)

ইতালীয় ভাষায় সনেটের অর্থ করা হয়, ধ্বনি কিংবা যন্ত্রণা, সেই অর্থে সনেটের সেই বিভূতি কী সোচ্চার! সেইজন্যে এলিয়টের বক্তব্যকে সামনে রেখে বলা যায়—কবি ও কবিতার পাঠকের কাছে তার মূল্যায়ন একত্র হতে পারে আবার ভিন্নতর হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অজিত চক্রবর্তীর বর্ণনা, আবার এলিয়টের চোখে আই এ রিচার্ডসকে নিয়ে অসূয়া।

যে-কোন আলোচনার ক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োজন? বোধ হয় প্রয়োজন। কারণ হার্ডি একসময় দুঃখ করে বলেছিলেন, সমালোচকেরা কিভাবে তাঁর দুর্বল লাইনগুলো তুলে তাঁকে কষাঘাত করেছেন। এ-ও আলোচকের কাছে একটি তথ্য, কবিতার ক্ষেত্রে দুর্বল লাইন থাকতে পারে, যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থের সব কবিতাই যোগ্য নয়। কিন্তু পাঠকদের প্রশ্ন অন্যখানে, কবিতার বোধগম্যতা নিয়ে, যেমন এলিয়টের কোলরিজ সম্বন্ধে একটি উক্তি ছিলো—তিনি দর্শনের পাঠ একটু কম করলে ভাল করতেন। আমাদের কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতা নিয়ে অভিযোগ শুনেছি। আবার এ-ও দেখেছি, সেই অসন্তোষ প্রতিনিবৃত্ত হয়েছিল যখন সেই ধরনের কবিতার পাঠ-গ্রহণের পদ্ধতিটা স্পষ্ট হলো। সেজন্যে কবিতার ক্ষেত্রে যে বিবর্তন চলে তার গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে পাঠকের সম্বন্ধ রক্ষা করাও একটা প্রয়োজন—Education in poetry requires an organisation of these experiences.—এলিয়টের এই উক্তি সেই অর্থে দেখতে পারি, কিংবা তাঁরও পূর্বসূরী ডঃ জনসন যে-ভাবে বলেছিলেন, To judge rightly of an author we must transport ourselves to his time.

কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী নিজের সম্বন্ধে এত স্বল্প কথা বলেছেন যে তার থেকে তাঁর কবিতা সম্পর্কে ধারণা করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই। কবিপরিচিতির জন্যে এই বই-এ প্রকাশকের তরফ থেকে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা প্রায় অপূর্ণ। এবং কবি-ও ভূমিকা হিসেবে যে বক্তব্য রেখেছেন তা এত সংক্ষিপ্ত যে তাতে পাঠকের কৌতূহল মেটে না। 'নিজের ভূমিকা লিখতে চাই না। শিল্পের মধ্য দিয়ে ভাব, তথ্য, রূপের শিল্পিত প্রকাশ।' কথাটা এক অর্থে সত্যকথন, কিন্তু যে অর্থে এলিয়ট ও জনসন কবিতার সম্পর্ক খুঁজতে চেয়েছেন, সেই অর্থে পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। 'কৌতূহল' শব্দটা একেবারে অযথার্থ নয় এই কারণে, যখন জানা যায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে সঙ্গ রক্ষা করেছেন, সেইহেতু তাঁর কবিতায় একটি বিশেষ সংযম, নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহারের জন্যে কি অনায়াস ব্যবস্থা! উল্টো করে এই ধরনের আলোচনাকে আবার ঘুরিয়ে দিয়ে বলা যায়—কবিতার প্রাক্‌ইতিহাস জেনে কবিতাকে পেলেও কবিকে বোঝা যায় না। ওটা আরও ভিতরের। কিন্তু সঙ্গ সৃষ্টির প্রথম সূত্র যদি হয় কবিতার পাঠ, তাহলে আলোচ্য গ্রন্থের 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন' কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তার আন্তর শ্লেষের প্রখরতার জন্যে তা অনেকের মুখেই আবৃত্তি শুনেছি, কবি ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার এ-ও বোধ হয় এক গোপন সূত্র। যদি জানা যায়, গান্ধীজীর সহযোগিরূপে তিনি কাজ করেছেন তখন তাঁর 'সত্যাগ্রহ' কবিতার অন্তরস্বাদ

ধরতে আরও সহজ হয়, কিংবা যদি জানা যায়—তিনি দর্শনের পাঠ নিয়ে সময় কাটিয়েছেন, তখন 'শঙ্করাভরণ' কবিতার চরণ—'ঘন মায়া, ঘন মায়া'—এই ব্যঞ্জনা ধরতে আরও সহজ হয়। ধরা যাক নিম্নোক্ত কবিতা :

(দ্বাদশ অধ্যায়
গীতা পড়ে দেখ) জাতি-দেহের সংসার
দুর্বল প্রত্যংশ তবু সবাই গিয়ে ঠেকে
বিকট ইউ-এন্ দেহে : অন্তিম অন্যায়

প্রাণরঙ্গে ভঙ্গ দেয়া, আরো দুরাচার
রণে হানা মারণাস্ত্র (কৃষ্ণবাক্য ভূয়ো
যেখানে বোমারু তিনি;) (চতুর্দশপদী)

'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন' কবিতায় যে শ্লেষ ছিলো সীমাবদ্ধ আয়তনে, সেই শ্লেষ এখানে জাগতিক মারণাস্ত্রের ধর্ম নিয়ে আরও প্রসারিত, গীতার উল্লেখ রেখে তির্যক! এই 'চতুর্দশপদী'-র আর এক অংশ, যা শ্রুতির বিরোচন-সংবাদ নাম রেখে বলা হয়েছে, আসুরি-উপনিষৎ,

আমি বিরোচন, নব্য। শুনো না শ্মশান-
বৈরাগ্য-মানা অন্ধ ভূত-ভারতীয়
পৌরোহিত্য।
সযত্নে নতুন নেক-টাই
পরেছি, গন্ধের পালিশ চুলে। স্বকীয়
মুখশ্রী দেখেছি জলপাত্রে, মূল্যবান
অমর মহিমা সর্বোৎকৃষ্ট : কোনোটাই
বাদ নেই রূপে যশে; (বৃদ্ধ প্রজাপতি
মনে হল অলংকৃত শোভা দেখে অতি
তুষ্ট।) (আধুনিক বিরোচনের প্রবেশ)

শ্রুতিতে আসুরিক উপনিষৎ-এর কাহিনী ছিলো খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বৎসর পূর্বে, আর এই আসুরি উপনিষৎ দেখানো হল এই শতকের ৭০-এর পরে। কাব্য যদি মনের প্রকাশ হয়, কবির বিশেষণ—'শিল্পিত প্রকাশ'। এই প্রকাশ আবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনায় এইভাবে বলে-ছিলেন : 'Self-creation, according to Tagore, lies at the root of human existence, and self-creative urge of man makes him use the materials of life by mastering the law of perfect being.' বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বর্ণনায় শেষ শব্দকটি লক্ষণীয়। লক্ষণীয় এইজন্যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্চা যে দিকেই ধাবিত হয়েছে, সংযম তার আত্মিক গঠনের রূপ নিয়ে হয়েছিলো, তাঁর আলোচকও কী সেই ধারণার পোষক? 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে বেতার আলোচনায় তাঁর আরও একটি উক্তি, 'লেখকের কাজ বিচার না প্রকাশ করা।' এবং অমিত ও লাবণ্য সম্বন্ধে এই বিশেষণ রেখেছিলেন : 'তাদের রচিত কবিতা এতই উৎকৃষ্ট যে বই থেকে বার করে নিয়ে স্বতন্ত্র ব্যবহারই স্বাভাবিক মনে হয়। একথা সেক্সপীয়র সম্বন্ধেও খাটে।'

এখানে যে-কথাগুলো ব্যক্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, যেমন লেখকের কাজ হচ্ছে প্রকাশ করা এবং অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় : 'শিল্পিত প্রকাশ'। কিংবা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বিশেষণ : self-creative urge। এইসব

কথা এইজন্যেই বলা হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই বোধ হয় এই লেখক নিজেকে তৈরী করেছেন। 'বোধ হয়' শব্দ সন্দেহসূচক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে যেমন বাংলা কবিতাকে চিন্তা করা যায় না, এবং রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে বাংলা কবিতার মূল্যায়ন কোন সময়েই অপ্রাসঙ্গিক নয়। অমিত-লাবণ্যের কবিতা নিয়ে বিশেষণ যে, 'এতই উৎকৃষ্ট'—এই উৎকৃষ্ট শব্দটি অমিয় চক্রবর্তীর মানসিক অনুভূতির আরও একটি বিশেষ শব্দ, যা তাঁর মানসিক ক্রিয়ার অন্তরস্বাদের সংবাদ। এ কথাগুলো এ কারণের জন্যেই বলা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার-অস্বীকার নিয়ে বাংলাসাহিত্যে কিছু প্ররোচনা উঠেছিলো। প্রশ্নটা উঠেছিলো, পশ্চিমি সাহিত্যকে সামনে রেখে। যেমন ষষ্ঠ দশকে একজন মন্তব্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ গ্যাটের মত পাত্র-পাত্রী সৃষ্টি করতে পারেননি। কথাটা অসম্বন্ধ এই কারণে, পাত্রের কালানুসারে পাত্র তার রূপ নেয়, সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ-ই, গ্যাটে হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো। গ্যাটে সম্বন্ধে জার্মান পণ্ডিতের-ই বিশেষণ ছিলো : Goethe is now colossal, now petty ; now a defiant, ironical, world-storming genius, now calculated complacent, narrow philistine.—এনগেলস্-এর এই বিশেষণ কট্টর গ্যাটে-পন্থীরা মানবেন কিনা জানি না, কিন্তু এইরূপ অতি বিরুদ্ধ মানসিকতার পোষণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আধুনিক মানস য়ুরোপের এই দ্বিধার দ্বারা বিভক্ত। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে স্বীকারও যেমন করেছেন আবার অস্বীকারের জন্যে বোদলেয়ারের মানসিকতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদের দ্বারা পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করতে পারেননি। কিন্তু য়ুরোপীয় চিন্তামানসে অনেক আগে থেকেই পরিবর্তনের কথা পেঁাছে গিয়েছিলো। যেমন এটস্-এর উক্তি : In England I sometimes hear men complain that the old themes of verse and prose are used up. Here in Ireland the marble rock is waiting for us almost untouched, and the statues will come as soon as we have learned the use of chisel.—এই কথাগুলো ইংরেজী কবিতার একটা দিকের কথা, কিন্তু ঋতুবদলের জন্যে অন্যদিকেও হাত বাড়াতে চেয়েছিল, এটস্-কাব্যের ব্যাখ্যার জন্যে ভারতীয় শ্রুতির দিকে হাত বাড়াতে হয়েছিল, এলিয়ট কাব্যের ভিতর তার স্থান করে দিয়েছিলেন, হাক্সলি তাঁর মানসিকতার চশমা পাল্টে ফেলেছিলেন। কাব্য নৈর্ব্যক্তিকতার সংবাদ, এলিয়টের ভাষায় যা 'এ্যান্টি রোমান্টিক'। পাউন্ড তাঁর গাণিতিক বোধে আরও কট্টর। Poetry is a sort of inspired mathematics, which gives us equations, not for abstract figures, triangles, spheres, and the like, but equations for the human emotions. এগুলো ইংরেজী কবিতার ঋতুবদলের বিষণ্ণ সংবাদ; জানি না জীবনানন্দ দাস বাংলার প্রকৃতি নিয়ে কী অর্থে রোমান্টিক হয়েছিলেন, যদি তা এটস যে-অর্থে নিজ দেশের কবিদের আয়র্ল্যান্ডের দিকে মুখ ঘুরাতে চেয়েছিলেন —সেই অর্থেই জীবনানন্দ দাস বাংলার ইতিহাস খুঁজেছিলেন কিনা। কিন্তু পাউন্ড-এলিয়ট যে-অর্থে 'ইমপারসনাল' হতে চেয়েছেন সেই অর্থে জীবনানন্দ 'ইমপারসনাল' নন। তিনি পুরোপুরি রোমান্টিক, তাঁর আদিগুরু যদি হন মধুসূদন, জীবনানন্দ তার শেষ পুরোহিত। তারপর বাংলা কবিতায় ক্রান্তিকালের চিহ্ন।

কিন্তু এই গোষ্ঠীর ভিতর ব্যতিক্রম অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে নিয়েছেন, আবার যে-অর্থে পাউন্ড-এলিয়ট 'ইমপারসনাল' সেই অর্থে তিনি ভাবের প্রয়োজনে নৈর্ব্যক্তিক, শব্দ এবং বিষয় নির্বাচনে। চিন্তায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে, এবং বিবরণে! যেমন,

> রাত্রি মাঠ। তারা জ্বালা, প্রদীপ-জ্বালানো পথ, ঘর।
> মেলাবার দৈব, এই মাটি জুড়ে আমার বুকে

সত্তার আধারে জানাও তুমি একবার,
কোন মিল মৃত্যুর, মাটির, ভবিষ্যতে? ভোরের জীবন লোকে? (যৌগিক)

কিংবা,

অগণ্য ধান-খুশী সোনালি
প্রসন্ন মেঘ,
বিষণ্ণ পুকুরজলে চাঁদের ছায়া, ডোবা চাঁদের ফালি। (সংসার)

ইংরেজী নিয়মে symbolic expression-এর অর্থ এরকমও করা হয়—a representation of what really exists only and only unchangeably—উপরোক্ত বর্ণনায় সেইরূপ ধারণা করে নেওয়া যায়, কিন্তু জীবনানন্দের 'ধানসিঁড়ি'-র কথা 'ধানখুশী' শব্দে মনে করালেও এ মেজাজ জীবনানন্দীয় নয়। অমিয় চক্রবর্তীর মেজাজ কিভাবে নৈর্ব্যক্তিক হতে চায় তা ধরা যাবে নিম্নোক্ত বর্ণনায় :

হয়েছে ত্রিকোণ
মধ্যস্থলে শান্তদৃষ্টি কবিযোগী
দুই দিকে অরণ্যস্পন্দিত সন্ধ্যা, পুষ্পের পুণ্যাহ
একটি মুহূর্ত সরবরাহ।
ওহারা মার্কিনী নদী চলেছে উদ্যোগী
শিলাশান্ত তীরে ম্লান রোদের সম্প্রীতি,
বালিমৃদু ঝিকঝিকে—
রূপধারা মধ্যকায়া ছায়া ভিন্নহীন
চিত্রস্থিত। (নির্দয়)

এই বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায়, রবার্ট ফ্রস্টের সাথে এই কবির সান্নিধ্য দিলো, 'ওহারা মার্কিনী নদী' দিয়ে বোঝা যায় এই কবিতার কাল ও পাত্র মার্কিনী প্রকৃতির, কিন্তু কোন মার্কিনী কবি তাঁর বর্ণনায় 'কবিযোগী' আনবেন না; কিম্বা হয়তো 'পুষ্পের পুণ্যাহ'রূপ শব্দদ্বয়, কারণ এই দেশের ছায়ায় ঐ ধরনের আত্মিক বিকাশ চলতে পারে, যার অমিয় চক্রবর্তী বিশেষণ দিয়েছেন—'by mastering the law of perfect being'। আবার এই বিকাশ-ই ঘরে আসার আনন্দে অন্যরকমভাবে প্রকাশ পায়।

কচি ঘাস, মাঠ, পাশে জল
বসুমা, তোমার আঁচল
এখানে বিছাও—
মাথা রেখে শোবো আর দেখবো উধাও
মেঘে মেঘে চলে নীলাকাশ
শেষ করে দূর পরবাস
ফিরে আসি ধরিত্রীর ছেলে,
মাটি, তুমি নাও বুক মেলে। (আঁচল)

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির শব্দগুলো সরল, দান্তে সম্বন্ধে এলিয়টের উক্তি—দান্তেকে পড়তে গেলে কি সরল মনে হয় কিন্তু অনুসরণ করতে গেলে মনে হয় কি দুরূহ! অমিয় চক্রবর্তী কী তাই? উত্তর—পরবর্তী অনুসরকদের।

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস— দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ । কলিকাতা, ৭৩। মূল্য পনেরো টাকা।

মোট কুড়িটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ঘরানার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সঙ্গীতেরই প্রায় চারশ' বছরের ক্রমিক বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ কাজ একাধিক কারণেই দুরূহ। প্রথমত, আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ রাজাবাদশার কাহিনীকেই এতকাল ইতিহাসের মৌল বিষয় মনে করেছেন। আইন-ই-আকবরীতে যে সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনাও স্থান লাভ করেছিল, চলতি ইতিহাসপাঠে তা আমরা জানতে পারি না; অথবা রাজা মানসিং তোমার যে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য সঙ্গীতসম্মেলন আহ্বান করে বর্তমানকালের তথাকথিত সিম্পোসিয়াম বা সেমিনার প্রবর্তন করেছিলেন সেকথাও সচরাচর ঐতিহাসিকগণ গুরুত্ব দেন না। অথচ কোন্ বাদশার কশ' বেগম ছিল, কোন্ রাজার হরিণ শিকারে কত সময় ব্যয় হত ইতিহাসকারগণ তা যথোচিত মর্যাদা সহকারে পেশ করে থাকেন। সেকারণে প্রাচীন ইতিহাস থেকে সঙ্গীত বিষয়ে, বিশেষত ঘরানার ইতিহাস জাতীয় গবেষণা, খুবই দুরূহ কাজ, সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত, সঙ্গীত বিষয়ে তাত্ত্বিকগণ সঙ্গীতের ঔপপত্তিক দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন, প্রাচীনকালে রাগরাগিণীর গঠন ও তার ব্যাকরণ বিষয়ে ও সামান্য নান্দনিক আলোচনাও করেছেন। কিন্তু গায়ক-বাদকদের বংশলতিকা বা শিক্ষাধারার কথা সবিশেষ বিবৃত করে যাননি। সেকারণে আজও চলচ্চিত্রে দেখতে পাই তানসেন ও বৈজু বাওরার মধ্যে সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা, আমীর খাঁ ও প্যলুস্করের কণ্ঠে চারশ' বছর পূর্বে খেয়াল গানের শৈলী ও অতিদ্রুত তান-কর্তব! এহেন ইতিহাস-বিমুখতা যে গবেষণার অন্তরায় সঙ্গীত বিষয়ে নিষ্ঠাবান লেখকমাত্রই তা বুঝবেন।

সামান্য ক'টি প্রামাণিক গ্রন্থের 'পর নির্ভর করে লেখককে অগ্রসর হতে হয়েছে। এ ছাড়া যেসব গুণী কলাবন্ত এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁদের কাছে মুখে মুখে শুনে কিছু কিছু ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। কিন্তু অনেক সময় তা সঠিক হয় না। বিভিন্ন ঘরানার গায়কবাদকদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব এখনো বর্তমান, ফলস্বরূপ ঘটনা সব সময়ে সত্যকে আশ্রয় করে চলে না। এতৎসত্ত্বেও ইতিহাসকার তাঁর সত্যনিষ্ঠা বজায় রেখে এ কাজে ব্রতী হন। এসব কারণেই এজাতীয় গবেষণা অতি দুরূহ বলে আমার মনে হয়েছে।

সবশুদ্ধ কুড়িটি ঘরানার ইতিহাসের মধ্যে এগারোটি ঘরানা কণ্ঠসঙ্গীতের, ছ'টি যন্ত্রসঙ্গীতের এবং তিনটি তবলা পাখোয়াজ বা বাদ্যযন্ত্রের। প্রথমেই তিনি কণ্ঠসঙ্গীতের যে ঘরানার কথা আলোচনা করেছেন তাকে ইতিপূর্বে অন্য কোন ইতিহাসকার বিশেষ গুরুত্ব দেননি। লেখক এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্নসহকারে পুরনো ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। তিনি এই ঘরানার নাম দিয়েছেন 'প্রসন্দু মনোহর' ঘরানা অর্থাৎ এই ঘরানার শ্রেষ্ঠ দুই সঙ্গীতজ্ঞ—যাঁরা উভয়েই ছিলেন ঠাকুরদাস মিশ্রের (কোন মতে ঠাকুরদয়াল) সন্তান, প্রবর্তন করেন একটি বিশেষ গায়নরীতি—যার দ্বারা ঘরানা চিহ্নিত হতে পারে। এই ঘরানাকে কোন কোন সঙ্গীতবিদ্ 'বারাণসী ঘরানা' বলেও অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গীত-ইতিহাসে এঁদের অবদান বিস্ময়কর—লেখক এই তথ্যটি শিষ্যবংশপরম্পরায় তুলে ধরেছেন। কিন্তু ছোট রামদাসজীর উল্লেখ না থাকায় এই বংশের একজন উজ্জ্বলচিহ্নিত গায়কের নাম লুপ্ত হবার সম্ভাবনা। মহেশ ওস্তাদ, গোন্দলপাড়ার মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুগায়িকা কিরণময়ী, ধ্রুপদী ধীরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি গুণী শিল্পীদের ধারা বাংলাদেশের আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত; শিবা-পশুপতির নাম এখনো পুরনো গায়কদের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বেতিয়া ঘরানার কিছু উত্তরাধিকার বাংলাদেশে রয়েছে, বিশেষ করে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর অবদান কোনদিনও ভুলবার

নয়। এই ঘরানার প্রবর্তক দুই ভ্রাতা আনন্দকিশোর ও নওয়লকিশোর উৎকৃষ্ট ধ্রুপদরচয়িতা ছিলেন, আনন্দকিশোরের তিনটি ধ্রুপদ—ছায়ানট, সুরট ও ভৈরবীতে—লেখক উদ্ধার করেছেন। তবে শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদের আনুকূল্যেই এই ঘরানার গান বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। 'ধামারী' বিশ্বনাথ রাও বাংলাদেশে একটি সুপরিচিত নাম--তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন লালচাঁদ বড়াল, দানীবাবু, অমরনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। শিবনারায়ণের শিষ্য বিনোদ গোস্বামীর উল্লেখও প্রয়োজনীয় ছিল। রাধিকাপ্রসাদের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্প্রতি পরলোকগত), ললিত মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞান গোস্বামী ভারত-বিখ্যাত গায়কের মর্যাদা লাভ করেন। স্মরণীয় যে গিরিজাশঙ্কর বাংলাদেশে স্বয়ং একটি ঘরানা স্থাপন করে গিয়েছেন---তিনি মুজফ্ফার খাঁর কাছে দীর্ঘদিন ভারী চালের ধ্রুপদ-খেয়ালও শিখেছিলেন। আবার ঠুংরী গানের এক বিশেষ ধারা গিরিজাশঙ্করই প্রবর্তন করেছিলেন—এটি স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে।

বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানা বলতে বিষ্ণুপুর। লেখক সে সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক গবেষণা পূর্বেই করেছেন এবং বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে বাহাদুর খাঁ বলে কোন মুসলমান গায়ক এই ঘরানা সৃষ্টি করেননি; এবং গদাধর চক্রবর্তী বলেও কোন গায়ক এই ঘরানায় ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যই কোন এক 'পণ্ডিতজী'র কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করে এই বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবর্তন করেন। এই বিষয়ে তিনি অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। লেখকের মতে 'বিষ্ণুপুরের সাঙ্গীতিক ক্ষেত্রে বাহাদুর খাঁ নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত'—প্রমাণিত হলে একটি সুষ্ঠু গবেষণা স্বীকৃত হবে। একটা কথা, বিষ্ণুপুরে বাহাদুর খাঁর নামে একটি অঞ্চল রয়েছে এবং একদা, বারাণসীর কবীর চৌবার মত (তবলাবাদকদের পীঠস্থান), সেটিও গানবাজনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লেখকের মতগুলি আরো কিছু তথ্যগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে, বিশেষত এমন হতে পারে গদাধর ভট্টাচার্য এবং গদাধর চক্রবর্তী একই ব্যক্তি এবং রামশঙ্কর পিতার কাছেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছিলেন—সেক্ষেত্রে গদাধর চক্রবর্তী প্রক্ষিপ্ত ব্যক্তি এহেন মন্তব্য হয়ত আরো নিশ্চিত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই ঘরানার বংশ ও শিষ্যলতিকা খুবই সমৃদ্ধ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতাও বটে), অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, রমেশচন্দ্র, সত্যকিঙ্কর পর্যন্ত ধ্রুপদশৈলীর ধারা বহন করে এসেছেন।

গয়া শহর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সঙ্গীতের জন্য একদা খ্যাতকীর্তি ছিল—লেখক তাকে আলাদা করে গয়া ঘরানা বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ঘরানার পূর্বপুরুষ নারায়ণদাস বাবাজী গোয়ালিয়র থেকে আসেন—এ তথ্য অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। লেখক মূলসূত্রটি লিপিবদ্ধ করলে গবেষকদের সুবিধে হত। তবে, হরিদাস থেকে যে বংশ ও শিষ্যলতিকা দিয়েছেন তা সর্বজনস্বীকৃত। এই ঘরানার হনুমানদাসজী স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান এবং গয়া ঘরানাকে হনুমানদাসজীর ঘরানা বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর পুত্র সোহনীজী (মতান্তরে, সোনী মহারাজ বলেই অধিক পরিচিত) এবং অপর শিষ্যবর্গ কানাইলাল ঢেঁড়ী, বুলাকিলাল, ভেলুবাবু (যোগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়), শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতকীর্তি পুরুষ। এস্রাজ বাদনে ভেলুবাবু ও শীতলচন্দ্র ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের সম্মান পেয়েছেন। ঢেঁড়ীজির শিষ্য হাবু দত্ত একসময়ে যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঢেঁড়ীজির শিষ্য এ খবরটি আমার জানা ছিল না। তবে, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যিনি একই সঙ্গে পাখোয়াজ ও এস্রাজে সমান গুণী ছিলেন, তিনিও হনুমানদাসজীর শিষ্য এটি উল্লেখিত হলে ভালো হত। বিষ্ণুপুরের মতোই কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে এই ঘরানা সমান প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বহির্বঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীতের চারটি প্রখ্যাত ঘরানা আছে—আগ্রা, গোয়ালিয়ার, কিরাণা এবং কিছুটা রামপুর—যা প্রসঙ্গত মুসলমান গায়কদের দ্বারা সমৃদ্ধ। লেখকের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে আগ্রা ঘরানায় গোয়ালিয়রের মিশ্রণ ঘটেছে। দীর্ঘকাল আগ্রা এবং আত্রৌলী ঘরানার অধীনে শিক্ষালাভ করে আমার ধারণা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত—সেজন্যে লেখকের এই মন্তব্যে আমি নিঃসন্দেহ। আগ্রা এবং আত্রৌলী পরস্পর বিবাহসম্বন্ধেও নিকট এবং দুটি ঘরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার জন্য সাঙ্গীতিক মিশ্রণ ঘটেছে। মিশ্রণটি, আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এরূপ : আগ্রা ঘরানার ভারী চালের আলাপপদ্ধতির ধারায় খেয়ালভঙ্গিম বিস্তারের প্রাধান্য কম। ছন্দ, বোলতান পর্যায়ে দ্রুত খেয়ালের মাধুর্য। অন্যপক্ষে আত্রৌলী ঘরানায় বিলম্বিত খেয়ালের বন্দেজ এবং বিস্তারাংশ খুবই সুষ্ঠু ক্রমপর্যায়ভুক্ত; সুরের অচঞ্চল স্থিতি ও গাম্ভীর্য গোয়ালিয়র ও আগ্রার নিজস্ব—আলাপীরীতিতে স্বরপ্রক্ষেপ ফৈয়াজ খাঁ আহরণ করেছেন ঘগ্গে (আমি ওস্তাদ আত্তা হুসেন খাঁর কাছে খগ্গের পরিবর্তে ঘগ্গে শুনেছি) খুদাবক্সের পুত্র গোলাম আব্বাসের কাছে। এবং শ্বশুর মেহবুব হুসেন খাঁর (আত্তা হুসেনের পিতা) কাছে বহু বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের বন্দেজ গান পরবর্তীকালে। আত্রৌলী ঘরানার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন একদিকে আল্লাদিয়া খাঁ, আবার রামপুর ঘরানার মুস্তাক হুসেন খাঁ। (আল্লাদিয়া খাঁর নিজস্ব গায়নভঙ্গী পাওয়া যায় অসাধারণ গায়িকা কেশরবাঈ কেরকার-এর কণ্ঠে। মল্লিকার্জুন মনসুর ইদানীং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। দুর্ভাগ্য, খাঁ সাহেবের পুত্র মুঞ্জে খাঁ অল্পবয়সে মারা যান।) এর ফলস্বরূপ বিচিত্র রীতিতে মিশ্রণ ঘটেছে। সে কারণে ফৈয়াজ খাঁ যেমন নিজস্ব ভঙ্গী দাঁড় করিয়েছিলেন, বর্তমান কালে সেই ঘরানায় নতুন কোন প্রতিভা পাওয়া যাচ্ছে না যিনি এতগুলি গায়নরীতিকে একাত্ম করে নতুন সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে পারেন। আগ্রা ঘরানার গায়নরীতি সম্পর্কে লেখক খুবই সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তবে এই ঘরানার আদিতে ছিলেন দুই হিন্দু গায়ক, অলক দাস ও মুলক দাস যা তিনি উল্লেখ করেননি (ওস্তাদ আত্তা হুসেনের নিকট শুনেছি)। অলক দাসের পুত্র ধর্মান্তরিত হন এবং হাজি সুজান নামে খ্যাতিমান হন, কিন্তু মুলক দাসের বংশই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে শ্যামরঙ্গের ধারায়—তাঁরই পরে পুত্রবংশ মুসলমান হয়ে যান এবং তাঁর প্রথম পুত্রের ধারায় নত্থন খাঁ এবং চতুর্থ পুত্রের ধারায় ঘগ্গে খুদা বক্স খ্যাতিলাভ করেন। নত্থন খাঁর প্রথম পুত্রের ধারায় বসির খাঁ, কন্যার ধারায় খাদিম হুসেন ও লতাফৎ হুসেন বিখ্যাত হন। তবে সঙ্গীতে বিশেষ দান রেখে গেছেন নত্থন খাঁর পুত্র বিলায়েৎ হুসেন খাঁ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য। ঘগ্গে খুদা বক্সের প্রথম পুত্রের ধারায় গোলাম আব্বাস—এবং তাঁরই দৌহিত্র আফ্তাব-এ-মৌসিকী ফৈয়াজ খাঁ—যিনি ভারতীয় সঙ্গীতে এক নতুন দিগন্ত প্রসারিত করেন। ছোট পুত্র কল্লন খাঁর ধারায় তসদ্দুক হুসেন খাঁ। ফৈয়াজ খাঁ বিবাহ করেন আত্রৌলীর ওস্তাদ মেহবুব খাঁর কন্যাকে। মেহবুব খাঁর পুত্র আত্তা হুসেন পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা ফৈয়াজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অদ্যাবধি ফৈয়াজ খাঁর ঢঙে ও পিতৃদেবের ঘরানার গায়নভঙ্গীর সুপরিকল্পিত মিশ্রণরীতিতে শিক্ষাদান করছেন। তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই প্রধানত ফৈয়াজের শেষ বয়সের ছাত্র। প্রথিতযশা হচ্ছেন রমারাও নায়েক, স্বামী বল্লভদাস, দেবপ্রসাদ গর্গ, রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরাফৎ হুসেন খাঁ প্রভৃতি। তবে ফৈয়াজ খাঁর গায়নরীতি অবিকৃতভাবে রেখেছেন দুজন শিল্পী, সোহন সিং এবং লতাফৎ হুসেন। আগ্রা ঘরানার অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীরা হলেন মথুরার চন্দন চৌবে, আলতাফ হুসেন, খাদিম হুসেন, দিলীপচাঁদ বেদী, শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজংকার (ইনি মুখ্যাত ভাতখণ্ডেজীর শিষ্য), আজমৎ হুসেন এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (বাদল খাঁর শিক্ষাধীনেই ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, কিন্তু শেষজীবনে ফৈয়াজ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন)। কিন্তু ভীষ্মদেব বাদল খাঁ, করিম খাঁ এবং

ফৈয়াজ খাঁর তিনটি ভঙ্গীকে আশ্রয় করে সুরবিস্তার করতেন বলে আমার ধারণা। আগ্রা ও আত্রোলীর মিলিত ধারা ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতে বর্তমানকালে সম্ভবত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ (রাগরূপায়ণে এই ঘরের দক্ষতার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় আলাউদ্দিন খাঁর ঘরানা। আলাউদ্দিন খাঁকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘরানার প্রবর্তক বলে মনে করাই সমীচীন বলে বোধ হয়)।

গোয়ালিয়র ঘরানার আদিতে রাজা মান সিং তোমারের নাম উল্লেখ করে লেখক প্রকৃত ঐতিহাসিকের কাজ করেছেন। তবে রাজা মানের সহধর্মিণী রানী মৃগনয়নীর অবদান সঙ্গীতের প্রচারে কোন অংশে কম নয়। কথিত আছে, তানসেনের প্রথম আশ্রয়দাত্রী ছিলেন সঙ্গীত-প্রেমিক এই রানী। একথা উল্লেখিত হলে ভালো হত। তাঁদের ঘরানার বিবরণ খুবই জরুরী। বর্তমান কালে খেয়াল গানের প্রসারের মূলে এই দুই গুণীর অবদান তর্কাতীত। হদ্দুর শিষ্যকে লেখক রহিমৎ খাঁ বলেছেন। দুর্ধর্ষ ও ভারতবিখ্যাত গায়ক রহমৎ খাঁ-ই তাঁর প্রকৃত নাম শুনেছি। হস্সুর শিষ্যমণ্ডলী থেকেই গোয়ালিয়র মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের ধারার উৎপত্তি অর্থাৎ রামকৃষ্ণ বুয়া বালকৃষ্ণ বুয়া প্রভৃতি। অবশ্য মহারাষ্ট্রীয় গায়কদের অন্য একটি ধারা কিরাণা ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। শঙ্কররাও পণ্ডিত এবং গঙ্গুবাই হাঙ্গলের গায়নরীতি লক্ষ্য করলেই এই দুই মহারাষ্ট্রীয় ঘরানার পার্থক্য বোঝা যাবে। আবার বিষ্ণু দিগম্বর নিজেই প্রায় একটি ঘরানার প্রবর্তক বলা যায়—তাঁর অকালপ্রয়াত মধুরকণ্ঠী গায়ক-পুত্র প্যালুস্কর এবং প্রখ্যাত শিষ্যমণ্ডলী অনন্তমনোহর যোশী, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, নারায়ণরাও ব্যাস এবং বিনায়করাও পট্টবর্ধন—এঁরা একটি স্বতন্ত্র গায়নপদ্ধতির দিকে চলে গিয়েছেন—যেখানে ভক্তিমার্গ প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বিচারে মহারাষ্ট্রীয় গায়কবৃন্দ তিনটি সুস্পষ্ট ধারায় অগ্রসর হয়েছেন। লেখক এ বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত দিলে তাঁর বিশ্লেষণ আরো সুসংবদ্ধ হত। তবে তাঁর এই বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য যে গোয়ালিয়রের এই খেয়াল ঘরানা সেনীয় ঘরানার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।

কিরাণা ঘরানা বলে যা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা মূলত সারেঙ্গীবাদক আবদুল করিম খাঁর একক প্রচেষ্টায়। আবদুল করিম, লেখক জানাচ্ছেন, পিতা এবং পিতৃব্যের কাছে তালিম পেয়েছেন, কিন্তু পিতা-পিতৃব্যের নাম লেখক জানাননি। যতদূর জানা যায়, শাহুর খাঁর পুত্র নান্নে খাঁ ছিলেন আবদুল করিমের পিতা। নান্নে খাঁ তাঁর সময়ে গায়কমহলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মজা এই যে আবদুল করিম এবং তাঁর ভগিনীপুত্র আবদুল ওয়াহিদ-এর সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীই হিন্দু এবং প্রায় সবাই খ্যাতকীর্তি—সুরেশবাবু মানে ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলী রামভাই কুন্দকোলকর ও তাঁর শিষ্য-মণ্ডলী প্রভৃতি মিলে বর্তমান ভারতে এই ঘর আগ্রা ঘরানার সমতুল্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। হীরাবাঈ এবং গাঙ্গুবাঈ ব্যতীত রয়েছেন বাসবরাজ রাজগুরু, ভীমসেন যোশী, মানিক বর্মা এবং বিশেষত রোশনারা বেগম (বর্তমানে পাকিস্থান-নিবাসী) কীর্তিমান শিল্পিবৃন্দ।

রামপুর ঘরানাকে অবিকৃতভাবে সেনীয় ঘরানা ধরা হয়। লেখকও বংশলতিকা সেভাবেই দিয়েছেন। বিগত শতাব্দীতে উজীর খাঁর প্রভাবে, বিশেষত তাঁর স্বনামধন্য ছাত্র আলাউদ্দীন খাঁর জন্যই এই ঘরানা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই ঘরের অবদান মুস্তাক হুসেন খাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া রয়েছেন রামপুর নবাববংশের শেষ পুরুষ ছম্মন সাহেব। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতে এক ঐতিহাসিক পুরুষ, যেমন ছিলেন নবাব আলী খাঁ। তানসেনের কন্যাবংশে উজীর খাঁ রামপুর নবাবের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন। আলাউদ্দীন রামপুরে গিয়ে যেভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেন তা চমকপ্রদ ইতিহাসকেও ম্লান করে। আলাউদ্দিন ও তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যের ধারা বর্তমান ভারতে যন্ত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। রবিশঙ্কর, আলী আকবর, অন্নপূর্ণা (ইনি বাইরে বাজান না, একবারই মাত্র ওঁর সুরবাহারে আলাপ শোনবার সুযোগ

হয়েছিল), বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীখ্যাত শিল্পী—সবই আলাউদ্দীনের অবদান—তাই রামপুরের যন্ত্র-ঘরানা বলতে গেলে আজ তা আলাউদ্দিন ঘরানায় পর্যবসিত হয়েছে। ডাগরদের ধ্রুপদ ঘরানাও সবিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত। পূর্বপুরুষ বাবা গোপাল-দাসের বংশধর বহরাম খাঁ নিজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, কিন্তু তাঁর ভ্রাতা হায়দার খাঁর বংশই পরবর্তীকালে খ্যাতিমান হয়ে পড়ে। জাকরুদ্দিন ও আলাবন্দে কীর্তিমান ভ্রাতৃযুগল। আলাবন্দের পুত্র নাসিরুদ্দিন রাগালাপে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর বংশধর ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় এবং ভ্রাতা রহিমুদ্দিন। এই বৃহৎ গায়কপরিবারের শেষতম গুণী পর্যন্ত লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'পাতিয়ালা' এবং 'মেওয়াটি' ঘরানা দুটিই স্বীকৃত। একদিকে কালে খাঁ, গোলাম আলী এবং অন্যদিকে পণ্ডিত মনিরাম, জয়সরাজ প্রভৃতি গুণীদের স্বতন্ত্র আলোচনা থাকলে ঘরানার ইতিহাস পূর্ণ হত। আমার আক্ষেপ এই, ভারতবিখ্যাত শিল্পী তারাপদ চক্রবর্তী বিষয়ে উনি কোন আলোকপাত করেননি। ব্যক্তিগত ধারণায় বলতে পারি, গত ত্রিশ বছরে তারাপদ চক্রবর্তীর মত সুরেলা সুকণ্ঠ এবং ভাব ও ভক্তিমার্গের গায়ক ভারতবর্ষে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি প্রথমে পিতৃব্য, পরে সাতকড়ি মালাকর ও গিরিজাশঙ্করের শিক্ষাধীনে রাগসঙ্গীত আয়ত্ত করেন, পরবর্তীকালে নিজ প্রতিভাবলে ফৈয়াজ খাঁর ছন্দকৌশল এবং আবদুল করিমের সুরবিস্তার আত্মীকরণ করে এক নিজস্ব ভঙ্গী তৈরী করেন। অনেকের ধারণা, তারাপদ চক্রবর্তীর কোন ঘরানা নেই, কিন্তু ঘরানাদার দুই শ্রেষ্ঠ গায়ক সাতকড়ি মালাকার ও গিরিজাশঙ্করের দীর্ঘ তালিমপ্রাপ্ত সৃজনীপ্রতিভা তারাপদ নিজস্ব ঢং ও শৈলী প্রবর্তন করেন। বস্তুত কোন প্রতিভাই কি বিশেষ কোন ঘরানাদার গানের অনুকরণ মাত্র! বর্তমান ভারতে কণ্ঠসঙ্গীতে বাংলার প্রধানতম পরিচয় তারাপদ চক্রবর্তী—তাঁর প্রসঙ্গে লেখক কিছুটা উদার হলে এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমার অভিযোগ থাকতো না।

এ ছাড়া রয়েছে সেতার ও সরোদ এবং আলাপী রীতিতে সুরশৃঙ্গার, সুরবাহার ইত্যাদি যন্ত্র-ঘরানার পরিচয়। নিয়ামৎউল্লা ও শাজানপুরের সরোদ ঘরানা। সরোদ যন্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাস দিয়ে লেখক প্রকৃত গবেষকের কাজ করেছেন। বাসৎ খাঁ, কাসেম আলী, কৌকভ খাঁ এবং তাঁর বাংলা-দেশের শিষ্যমণ্ডলী প্রসঙ্গে সুন্দর বিবরণ রয়েছে। ধীরেন বসুর নামোল্লেখ লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রদান করে। অন্য শরদ ঘরানায় আয়েৎ আলীর অবদান লেখক অকুণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এমদাদ খাঁর ঘরানা প্রসঙ্গে স্বতঃই তাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ ও পৌত্র বিলায়েৎ-এর কথা মনে পড়ে। ব্রজেন্দ্রকিশোর ছিলেন এঁদের পৃষ্ঠপোষক—দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বসবাস করছেন। ইন্দোর-এ বীণকার ঘরানার বর্তমানে কোন বিশিষ্ট শিল্পী নেই; এটা দুঃখের বিষয়।

তবলা পাখোয়াজ ইত্যাদি বিষয়ে লেখক তিনটি ঘরানার উল্লেখ করেছেন : লক্ষ্ণৌ, বারাণসী ও ফারুখাবাদ। এঁদের বাজনার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিশ্লেষণ করেছেন। রামসহায়ের জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও নাটকীয় ঘটনাবলী এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। লক্ষ্ণৌ বাজের ধারক মুন্নে খাঁ, আবেদ হুসেন, ওয়াজেদ হুসেন এবং বাংলার খ্যাতকীর্তি হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি প্রসঙ্গে লেখক যথার্থ আলোচনা করেছেন। আজরারা ও ফরাক্কাবাদ ঘরানার উল্লেখ রয়েছে। দিল্লীবাজকে কি পৃথক ঘরানা ধরা হয় না, যার প্রধান ধারক ছিলেন হবিবুদ্দিন! কণ্ঠে মহারাজ, থেরকুয়া সাহেব প্রভৃতি দিক্‌পালদের কাহিনী লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। প্রতিটি ঘরানার বংশলতিকা গবেষকদের কাজে সাহায্য করবে।

অরুণ ভট্টাচার্য